বঙ্গদর্শন।

(নবপর্য্যায়)

অষ্টম বর্ষ—১৩১৫।

এই বর্ষের লেখক ও লেখিকাবর্গের নাম ;—

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন, মহামহোপাধ্যায় গুরুচরণ তর্কতীর্থ, মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, (জষ্টিস্) শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী, শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাস, শ্রীমতী হেমলতা দেবী, শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার, শ্রীযুক্ত বেহারীলাল গোস্বামী, শ্রীযুক্ত লোকনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশদেউস্কর, শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়, শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র চন্দ্র, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গোলোক বিহারী মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুধীর চন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি।

কলিকাতা,
২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, মজুমদার লাইব্রেরী হইতে
এস্, সি, মজুমদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

অষ্টম বর্ষের সূচী।

বঙ্গদর্শন।

জাতীয় বন্ধন।

১

মনুষ্যজাতি, কুক্কুরজাতি, বিড়ালজাতি প্রভৃতি বৃহৎ জাতির কথা বলিতেছি না; তাহা প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের আলোচ্য বিষয়। ইংরাজ, বাঙ্গালী প্রভৃতি খণ্ড জাতিই এই প্রবন্ধের লক্ষ্য।

একটি একটি ব্যক্তি লইয়াই জাতি। ব্যক্তিগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকিলে বৃহজ্জাতিত্বের কোন ক্ষতি হয় না, কিন্তু খণ্ড জাতিত্ব অসম্ভব হইয়া উঠে। কুক্কুর ভয়ানক স্বজাতিদ্বেষী, দুইটা কুক্কুর সদ্ভাবে একত্র থাকিতে পারে না; তথাপি আমাদের হিসাবে সারমেয়জাতি এক। একজন ইংরাজের সঙ্গে একজন বাঙ্গালীর ভয়ানক ভালবাসা থাকিতে পারে; ইংরাজ মনিবটি মরিলে বাঙ্গালী ভৃত্যটি ভালবাসার টানে সহমরণ পর্য্যন্ত যাইতে পারে; কিন্তু স্থান-কাল-পাত্র-বৈষম্য বর্ত্তমান থাকিতে ইংরাজ ও বাঙ্গালীকে এক খণ্ড-জাতিতে পরিণত করা বোধ হয় বিধাতারও অসাধ্য।

হস্তী, বীবর, পিপীলিকা প্রভৃতি কতকগুলি যৌথ জীব (পাঠক ক্ষমা করিবেন—কারবারে যৌথ শব্দের প্রয়োগ "বঙ্গবাসী"র কীর্ত্তি, আমি সে অর্থ এখানে লইতেছি না) যূথ বা দল বাঁধিয়া থাকে, এই তাহাদের স্বভাব। দলের দুইটিতে কখন কখন মারামারি রক্তারক্তি পর্য্যন্ত হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া কেহ কখনও দল ছাড়িয়া চলিয়া যায় না।

স্বভাব সকল জন্তুর উপরেই ক্রিয়া করে, কিন্তু মানুষের উপরে তাহার ক্রিয়া কিছু স্বতন্ত্র রকমের। স্বভাব নদীর স্রোতঃ, জীব সেই স্রোতে ভাসমান তরণী; সেই তরণী অবিরাম-গতিতে একভাবে স্রোতের টানে চলিয়া যাইতেছে। মানব-জীবনও এইরূপ তরণী বটে, কিন্তু তাহা কর্ণধার-চালিত, সুতরাং তাহা প্রয়োজনমত এ পাশে ও পাশে, কখনও বা স্রোতের বিপরীত দিকেও চলিতে পারে। মানুষের বিচার বল, বুদ্ধি বল, কৌশল বল, ইহা সেই কর্ণধার। মানুষও প্রকৃতির অধীন বটে, কেন না সে নদীটা মুছিয়া ফেলিতে পারে না; কিন্তু সে ইতর জন্তুর ন্যায় প্রকৃতির একান্ত দাস নহে; স্রোতের অনুকূলে প্রতি-

কূলে ইচ্ছামত বিচরণ করিবার প্রয়োজন হইলে নদীর স্রোতঃ পর্য্যন্ত ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করিবার শক্তি বা অধিকার তাহার আছে। ইহাকেই মানব-শক্তি দ্বারা প্রকৃতির পরাজয় বলা হইয়া থাকে। কিন্তু প্রাকৃতিক বিঘ্ন উল্লঙ্ঘন করিয়া অভীষ্ট সাধন করিবার এই যে শক্তি, ইহা কি মানবের সৃষ্ট, না প্রকৃতি হইতে প্রাপ্ত? বাস্তবিক ইহাও প্রকৃতিরই অংশ—প্রকৃতি; ইহার অভাবে পশু সম্পূর্ণ পরাধীন, ইহার প্রভাবে মানুষ অনেক পরিমাণে স্বাধীন। এই শক্তিই মানবীয় শ্রেষ্ঠতার নিদান। বাধা বিঘ্ন পরাজয় করিবার এই শক্তি মানুষ যে পরিমাণে লাভ করে, সেই পরিমাণে সে শ্রেষ্ঠ; যে পরিমাণে উহা হারায় বা ছাড়িয়া দেয়, সেই পরিমাণে সে নিকৃষ্ট। মানুষ পশুও হইতে পারে, দেবতাও হইতে পারে; কিন্তু যে পশু সে চিরদিনই পশু। তাত্ত্বিক মর্লি হাতে অস্ত্র পাইয়া ভারতবাসীর একদিককার পথ বন্ধ করিতে, একখানি পাখা কাটিয়া দিতে চাহিয়াছেন; তিনি বলিয়াছেন, ভারতবাসী বর্ত্তমান যথেচ্ছাচারের দাসত্ব অতিক্রম করিবে, ইহা তিনি কল্পনাও করিতে পারেন না। তাত্ত্বিকের কল্পনা যে অতি দুর্ব্বল, তাহা সর্ব্বজন-বিদিতই আছে; কিন্তু এই উক্তি তাঁহার তাত্ত্বিকতাতেও সন্দেহ আনিতেছে। তিনি হয় ভারতবাসীকে মনুষ্য বলিয়া গণ্য করেন না, আর না হয় সাম্রাজ্য মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তাত্ত্বিকতার আর কোন ধারই ধারেন না।

এই শক্তি যখন মানুষের প্রকৃতি, তখন সকল মনুষ্যেই ইহা অল্লাধিক পরিমাণে বর্ত্তমান আছে। যতদিন এই শক্তি বিযুক্ত ও বিচ্ছিন্ন থাকিয়া ভিন্ন পথে ভিন্নাগ্রভাবে চলিতে থাকে, ততদিন তাহা জাতি-গঠনে অসমর্থ, ততদিন তাহার নিষ্ফল ক্রিয়া ক্ষুদ্রত্বে পর্য্যবসিত, ততদিন জাতীয় বিরাট ভাব দূর-পরাহত। কিন্তু যখন এই বিচ্ছিন্ন শক্তি সংযুক্ত হইয়া একপথে একাগ্র-ভাবে চলিতে থাকে, তখনই তাহা জাতীয় বিরাট অজেয় শক্তি; আর যাহাদের বিচ্ছিন্ন শক্তি এইভাবে সম্মিলিত হয়, তাহারাই একটা জাতি। যে সকল উপকরণ এই বিচ্ছিন্ন শক্তিগুলিকে সংযুক্ত ও একাগ্র করিয়া দেয়, সেই গুলিকেই জাতীয় বন্ধন বলিতেছি। সে সকল উপকরণ কি, তাহা দেখা যাউক।

১। নৈসর্গিক সীমা। দুরতিক্রম্য পর্ব্বত, সমুদ্র, এবং বৃহৎ নদী যে দেশের প্রাকৃতিক সীমা, তত্রস্থ অধিবাসিবর্গ সহজেই একটা জাতি হইতে পারে। ভারতের এবং বঙ্গের চতুঃসীমা জাতি-গঠনের অনুকূল।

২। ইতিহাস। যাহাদের অতীত স্মৃতি, অতীত ঘটনাবলী এক, যাহারা একপ্রকার সুখে দুঃখে হাসিয়াছে কাঁদিয়াছে, একই শত্রুর প্রতিকূলতায় জয় পরাজয় ভুগিয়াছে, একই অতীত কাহিনী-শ্রবণে উৎসাহিত বা বিষাদিত হইতেছে, তাহারা একজাতি হইতে নিতান্তই বাধ্য।

ভারতবর্ষে স্মরণাতীত কাল হইতে হিন্দুদিগের ইতিহাস এক। মধ্যে মধ্যে রাজায় রাজায় যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটিত বটে, কিন্তু সেটা কেবল সম্পত্তির বিবাদ এবং পারিবারিক শত্রুতা মাত্র, তাহা জাতিকে স্পর্শ করিতে পারিত না।

মুসলমানের পূর্ব্বে যে সকল জাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহারা আপনাদের জন্ত পৃথক্ কিছু না রাখিয়া সমস্ত অস্তিত্বটুকু

হিন্দুকে শিখাইয়া দিয়াছিল—হিন্দু জাতিতে দুর্ব্বলতা না আনিয়া বল-সঞ্চয়ই করিয়াছিল।

সর্ব্বাগ্রে মুসলমানই একটা পৃথক্ সভ্যতা এবং স্বতন্ত্র ইতিহাস লইয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন, এবং ভারতের স্থায়ী অধিবাসী হইয়াও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে থাকেন। এই সময় হইতেই ভারতের ইতিহাস দ্বিধা বিভক্ত।

কিন্তু হিন্দু মুসলমানের পার্থক্য প্রধানতঃ বীজগত নহে, ধর্ম্মগত। যে সকল বিজয়ী মহম্মদ-শিষ্য তরবারি হস্তে লইয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, ভারতে তাঁহাদের বংশধরদিগের সংখ্যা এখনও মুষ্টিমেয়; যে সকল হিন্দু ছলে বলে কৌশলে বাধ্য হইয়া, কুত্রাপি স্বার্থে লুব্ধ হইয়া, অধিকাংশ স্থলে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ ব্যতীত অনিবার্য্য মৃত্যু-ভয়ে ভীত হইয়া মুসলমান হইয়াছিলেন, মুসলমানদিগের মধ্যে তাঁহাদের বংশধর দিগের সংখ্যাই অত্যধিক। এই সকল বল-গৃহীত মুসলমান যদি অতীত কাহিনী স্মরণ রাখেন, অশ্রু-শোণিত পরিপ্লুত পূর্ব্ব পুরুষগণ কি অবস্থায় পড়িয়া মুসলমান হইয়াছিলেন, তাহা যদি ভাবিয়া দেখেন, তাহা হইলে হিন্দু-মুসলমানের ঐতিহাসিক জাতীয় বন্ধন যে খুব দুর্ব্বল এমন বোধ হয় না। ফুলার সাহেব মিষ্ট সত্যকথাটা বলিতে যাইয়াও স্বভাবের দোষে তাহাকে তিক্ত অতিরঞ্জিত করিয়া মুসলমানদিগের প্রতি তাঁহার ভাক্ত স্নেহের পরিচয় দিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, পূর্ব্ববঙ্গের অধিকাংশ মুসলমানই জাতিমাত্র নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর সন্তান। কেন, শ্রেণীর উল্লেখ না করিয়া হিন্দুর সন্তান বলিলেই কি যথেষ্ট হইত না? অনেক প্রসিদ্ধ বংশের হিন্দু যে মুসলমান হইয়াছিলেন, অদ্যাপি যে তাঁহারা সোদরবৎ ব্যবহারে উভয় জাতির মধ্যে সদ্ভাব রক্ষা করিতেছেন এ কথা কি তিনি জানিতেন না? আসল কথা, চিনির প্রলেপে মারাত্মক হলাহল ঢাকা পড়ে না।

সৌভাগ্যের বিষয়, হিন্দু-মুসলমানের ঐতিহাসিক বন্ধনে যে শিথিলতাটুকু আসিয়াছিল, ইংরাজের আগমনে তাহা দূর হইয়াছে। ইংরাজ ভিন্নদেশী, ভিন্নজাতি, ভিন্ন ইতিহাসের স্তাবক, ভিন্ন সভ্যতার সেবক। ইংরাজের শৌর্য্য-বীর্য্য বা ছল-বল-কৌশল, উভয়কেই হৃতসর্ব্বস্ব করিয়াছে, ইংরাজের প্রবঞ্চনা প্রতারণায় উভয়েই তুল্যভাবে প্রবঞ্চিত-প্রতারিত হইয়াছে. ইংরাজের দম্ভ-দর্প-অহঙ্কারে উভয়েই তুল্যভাবে জীবন্মৃত হইয়া রহিয়াছে। ইতিহাসের বন্ধন যদি কিছু শিথিল হইয়াছিল, ইংরাজ আসিয়া আবার তাহা কসিয়া দিয়াছেন।

৩। স্বার্থ। ইংরাজের স্বার্থের সঙ্গে ভারতবাসীর স্বার্থের যে স্বাভাবিক বিরোধ, তাহা ভারতবাসী ব্যক্তিমাত্রকেই স্পর্শ করিতেছে। এটি যেন অহি-নকুলের বিরোধ, যেন অগ্নি-জলের বিরোধ, যেন জীবন-মরণের বিরোধ। এ বিরোধে এক পক্ষের লাভে অন্য পক্ষের ক্ষতি নিশ্চয়, এক পক্ষের উন্নতিতে অন্য পক্ষের অবনতি নিশ্চয়, এক পক্ষের সর্ব্বরক্ষায় অন্য পক্ষের সর্ব্বনাশ নিশ্চয়। সাত সমুদ্র তের নদীর অপর পারে থাকিয়া একটি মুষ্টিমেয় ক্ষুদ্র জাতির স্বার্থের জন্য একটা সুসভ্য সুসমৃদ্ধ সুব্যবস্থিত বিশাল রাজ্যের শাক্ত-শাসন যেমন নিতান্ত অস্বাভাবিক, তেমনই তাহার ফলও ফলিতেছে নিতান্ত কটু, নিতান্ত অপ্রিয়, নিতান্ত আশঙ্কাজনক। ইংরাজ সবেমাত্র হয় কে নয়, শাদাকে কাল, ভালকে মন্দ,

ন্যায়কে অন্যায় বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন; বহুযত্নে সঞ্চিত, বহুদিনে বহুরক্তপাতে লব্ধ স্বাধীনতাপ্রিয়তা, ন্যায়পরতা, উদারতা প্রভৃতি সদ্‌গুণকে পদদলিত করিতে ইংরাজ সবেমাত্র উদ্যত হইয়াছেন, স্বার্থান্বেষণের জন্য তাঁহার দৃষ্টি দূরে চলিতেছে না; কিন্তু এই আরম্ভের পরিণাম চিন্তা করিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। পার্থিব স্বার্থের জন্য অন্যায়, অসত্য, অত্যাচারও অসাধুতাকে প্রশ্রয় দেওয়া যেন শিশুর পক্ষে অগ্নি লইয়া খেলা করা; ইহার পরিণাম কোন দেশে কোন জাতিতে শুভাবহ হইতে দেখা যায় নাই। এই অপথ্যগ্রাসিনী নীতির ফল, অগ্রে চরিত্র-নাশ, মধ্যে শক্তি-নাশ, অন্তে সর্ব্বনাশ। ইন্দুরে প্লেগের বীজ বহন করে বলিয়া ইংরাজ বড় ভীত; কিন্তু ভারতপ্রবাসী ইংরাজচরিত্র যে মারাত্মক বিষের বীজ ইংরাজ-সমাজে বহন করিতেছে, তাহার প্রতিরোধ করিবার চিন্তা পর্য্যন্ত বর্ত্তমান নীতিতে স্থান পাইতেছে না!

যাহা হউক, ইংরাজ পরের মুখে নিজের মঙ্গলের কথা শুনিবার জাতি নহে, আর আমাদেরও দুঃখ-দাহে জলন্ত হৃদয়ে আপাততঃ পরের শুভাশুভ চিন্তা করিবার অবসর নাই। ইংরাজের পদার্পণ যে ভারতকে একই স্বার্থে বাঁধিয়া দিয়াছে, ইহাতেই আমরা সুখী, ইহাতেই আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেছি। ইহা প্রকৃতির শিক্ষা, মানুষের চেষ্টা বা কৌশল ইহা ব্যর্থ করিতে পারে না। পরস্পর যুধ্যমান ষণ্ড-যুগল ব্যাঘ্র দেখিলেই যুদ্ধ ছাড়িয়া পাশাপাশি পরস্পরের সহায় হইয়া দাঁড়ায়; পরস্পর যুধ্যমান সারমেয়-যুগল শৃগাল দেখিলেই তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হয়, ইতর জন্তুকে এ শিক্ষা প্রকৃতি ভিন্ন আর কে দেয়? ইংরাজ মিষ্ট কথায় পিঠে হাত বুলাইয়া আত্মঘাতিনী নীতিতে যাহাদিগকে দীক্ষিত করিবার চেষ্টায় ফিরিতেছেন, তাহাদিগকে কি ষণ্ড সারমেয় অপেক্ষাও অল্পবুদ্ধি মনে করেন? ইংরাজ যখন আসিলেন, তখন কিন্তু ভারতের হিন্দু-মুসলমান পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত ছিল না; তখন তাহারা প্রণয়ভরে বাহুপ্রসারিত করিয়া পরস্পরের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, তখন হিন্দুর জন্য মুসলমান এবং মুসলমানের জন্য হিন্দু প্রাণ উৎসর্গ করিয়া রণোৎসবে মাতিতেছিল। তখনই যদি এতটা হইতে পারিয়াছিল, তাহা হইলে, ভাবিয়া দেখ ইংরাজ বাহাদুর! এখন কতটা হইতে পারে। ফলত উৎসবেই হউক আর ব্যসনে বা রাজদ্বারেই হউক, আর শ্মশানেই হউক, ভারতবাসী হিন্দু-মুসলমান এক স্বার্থে বাঁধা, সুতরাং পরস্পরের সহায়; জানি না এই প্রাকৃতিক বন্ধন ছিন্ন করিবার স্পর্দ্ধা কে রাখে! সত্য বটে হিন্দু-মুসলমানের স্বার্থকে বিভক্ত বলিয়া প্রতীয়মান করিবার অনেক চেষ্টা হইয়াছে, অনেক চেষ্টা হইতেছে; কিন্তু মানুষ প্রকৃত স্বার্থে অন্ধ হইয়া কত কাল থাকিতে পারে? শাদাকে কাল করিয়া কত দিন পরিচয় দেওয়া চলে? সত্যকে চক্ষের ঠারে কত দিন ঢাকিয়া রাখা যায়?

৪। ধর্ম্ম। ধর্ম্মগত পার্থক্যের জন্য জগতের অনেক দেশে অনেক কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। মুসলমানের সঙ্গে খৃষ্টানের ধর্ম্ম-বিরোধ ইতিহাস প্রসিদ্ধ। মুসলমানের শৌর্য্য বীর্য্য ছিল বলিয়াই সে সম্মিলিত ইউরোপীয় ধর্ম্মোন্মত্তের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছে। নতুবা তাহার অদৃষ্টে কি হইত বলা যায় না।

খৃষ্টানের ধর্ম্মান্ধতা—ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সংকীর্ণতা চির প্রসিদ্ধ। আর্ম্মাণিয়া, রুমানিয়া, মেসিডোনিয়া, গ্রীশ প্রভৃতি যে সকল দেশ খৃষ্টান এবং মুসলমান উভয় জাতির অধ্যুষিত, সে সকল দেশে উভয় জাতির মধ্যে কিরূপ ভাব চলিতেছে, কত কাণ্ড হইতেছে, যাঁহারা বর্ত্তমান রাজনৈতিক সংবাদ রাখেন তাঁহারাই জানেন। ক্রীট দ্বীপে খৃষ্টানেরা মুসলমানের উপর যেরূপ অত্যাচার করিতেছে, অথচ ইউরোপের খৃষ্টান রাজমণ্ডলী যেরূপ নির্লিপ্ত ভাবে দাঁড়াইয়া অবিচলিত চিত্তে তাহা দেখিতেছেন, মুসলমানেরা খৃষ্টানের উপর ঠিক ঐরূপ অত্যাচার করিলে তাঁহারা এইভাবে দাঁড়াইয়া দেখিতেন কি?

অন্য ধর্ম্মের কথা দূরে থাকুক, এই খৃষ্ট ধর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন শাখায় যেরূপ গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ চলিয়াছে, এক শাখার শোণিত-স্রোত অন্য শাখার পিপাসা-পরিতৃপ্তি যে ভাবে সাধন করিয়াছে, তাহা স্মরণ করিলে শরীর শিহরিয়া উঠে! ইংলণ্ডের ভূমি, ইংলণ্ডের ইতিহাস যে কত ধর্ম্ম-প্রাণ মানবের শোণিতে কলঙ্কিত রহিয়াছে, তাহা নির্ণয় করা যায় না। ধর্ম্ম—জ্ঞান, ভক্তি, বিশ্বাস এবং সাধনের বিষয়, উহা তরবারির কি ধার ধারে? ভারতবর্ষে বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য, রামমোহন প্রভৃতি বড় বড় মহাত্মার প্রবর্ত্তিত সংস্কার অবাধে সম্পাদিত হইয়াছে। এক বিন্দু রক্তপাতের প্রয়োজন হয় নাই। ইহার কারণ, ভারতবাসী সাত্ত্বিক জাতি, এবং ইঁহাদের ধর্ম্ম সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম। জগতের সমস্ত ধর্ম্মকে আপনার দেশে; আপনার সমাজে, আপনার ঘরে আপনার কোলে স্থান দিতে পারে কেবল হিন্দু-ধর্ম্ম—আর্য্যধর্ম্ম। যে সে জাতি এই পবিত্র আর্য্য-নামে দাবি করিতে পারে; কিন্তু কোন জাতি যথার্থ আর্য্য কিনা, তাহার পরিচয় এই ব্রহ্মাণ্ডোদরী সাত্ত্বিকতায়।—

> "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
> মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥

জগতের মানবমাত্রেরই পরিত্রাণের এই অভয় বাণী ভগবানের মুখে কেবল হিন্দুর নিকটই প্রকাশ পাইয়াছে। হিন্দু এই ভগবদ্বাক্য উচ্চারণ করিয়া বাহুপ্রসারণপূর্ব্বক জগদ্বাসীকে চিরস্থির বন্ধুত্বের জন্য আহ্বান করিতেছে, হিন্দু পর-পদ-দলিত এবং অশেষ নির্যাতন-প্রাপ্ত হইয়াও এই অপূর্ব্ব অমূল্য বাক্যের উত্তরাধিকারী ও প্রচারক বলিয়া জগতের নিকট স্পর্দ্ধা করিতেছে—চির দিন এ স্পর্দ্ধা করিবে।

রাজসিক এবং তামসিক জাতিদিগের নিকট অন্তর্জগৎ অপেক্ষা জড় জগৎই অধিক প্রত্যক্ষ, ধর্ম্ম-বল অপেক্ষা বাহু-বলেই তাহাদের অধিক আস্থা। তাহারা প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে ন্যায়-সত্য-যুক্তিতর্কে না পারিলেই তরবারি হাতে লয়, তরবারির সাহায্যেই লোকের চিত্ত-ক্ষেত্রে ঈশ্বর-বিশ্বাস হইতে রাজভক্তি পর্য্যন্ত সমস্ত দুর্লভ শস্য জন্মাইতে চায়। ইহারাও শক্তির উপাসক বটে, কিন্তু অতি নিম্নশ্রেণীর অধিকারী।

যে সকল আর্য্য-সন্তান মুসলমান হইয়াছেন, তাঁহারা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা পূর্ব্বপুরুষের রক্তের সঙ্গে তাঁহাদের সাত্ত্বিকতাও অধিকার করিয়াছেন, কিছুতেই তাঁহারা এ অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে পারেন না। ভারতবর্ষীয় মুসলমানের উদারতা, হিন্দুর সঙ্গে তাঁহাদের সদ্ভাব ও আত্মীয়তা, হিন্দু-সমাজের সঙ্গে তাঁহাদের মিশামিশি ও

কৃত্রিম কুটুম্বিতা, হিন্দু-মুসলমানের বহুতর পালি পার্ব্বণে উভয় জাতির যোগদান, হিন্দুর দেবালয়ে ও মুসলমানের দরগায় উভয় জাতির সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন, সত্যপীর প্রভৃতি নামে হিন্দু-দেবতার সঙ্গে মুসলমান পীরের একীকরণ, ইত্যাদি দৃশ্য ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র, বিশেষত বঙ্গদেশে সমধিক পরিমাণে, বিদ্যমান। আরও অনেক দেশে অনেক জাতির সঙ্গে মুসলমানের বাস আছে, কিন্তু সে সকল স্থানে এমনটি হয় না কেন—প্রাণে প্রাণে এই মধুর বন্ধনটি দেখা যায় না কেন? ইহার কারণ, ভারতবর্ষীয় মুসলমানের পূর্ব্বপুরুষ হইতে লব্ধ এই সাত্বিকতা, এই উদারতা, এই বিশ্বালিঙ্গী আত্মজ্ঞান।

কেহ কেহ বলিবেন, এরূপ অবস্থা অন্যত্রও দেখা যায়, দৃষ্টান্ত যথা কাবুলের আমীর এবং তাঁহার দেশ। কিন্তু আমীর কোন্ জাতীয় এবং তাঁহার দেশ কোথায় অবস্থিত, সে পরিচয় মহাভারতাদিতে দ্রষ্টব্য।

বড়ই দুঃখের বিষয়, মুসলমানের গোবধ লইয়া অনেক সময়ে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতি-ভঙ্গ হয়। কিন্তু এই প্রীতি-ভঙ্গ প্রধানত নিম্নশ্রেণীতেই নিবদ্ধ। ইহাও ক্রমশ শিক্ষা-বিস্তার ও হিত-চর্চ্চার গুণে কমিয়া আসিতেছে; বিশেষত চিন্তাশীল উদার-হৃদয় মহামান্য আমীর বাহাদুর ভারতভ্রমণে আসিয়া ভারতের মুসলমানদিগকে যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন ও যে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহার সুফল শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক অবশ্য ফলিবে।

কর্জ্জন-সৃষ্ট পূর্ব্ববঙ্গের জামালপুর প্রভৃতি স্থানে কিছুদিন যে ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল, তাহা মারাত্মক হইলেও মহামারী প্রভৃতি আকস্মিক বিপদের ন্যায় অস্থায়ী। এই সাময়িক প্রীতি-ভঙ্গের নায়ক অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর মুসলমান। কে ইহার কারণ, সুতরাং ইহার জন্য দায়ী, তাহা আবালবৃদ্ধ হিন্দু-মুসলমান স্ত্রীপুরুষের ভাল করিয়া বুঝিয়া চিরদিন স্মরণ রাখা উচিত, কেননা ইহাই এই তুমুল ব্যাপারের শিক্ষা, সুফল, লাভ।

ধর্ম্মমতের বিভিন্নতা জাতীয় বন্ধনের প্রতিকূল ভারতবর্ষে ত হইতেই পারে না, অন্যত্রও ইহার তীব্রতা দিন দিন মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে। ইউরোপ ও আমেরিকার বহু জনপদে এখন খৃষ্টধর্ম্মের নানা শাখার বাস। অথচ ইহারা পরস্পরের রক্তমোক্ষণ পরিত্যাগ করিয়াছে, রাজনীতি-ক্ষেত্রে একযোগে একমতে চলিয়া আপন আপন জাতীয় স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতেছে। এই উদারতা ইহাদের সাত্বিকতার ফল নহে, কিন্তু দীর্ঘকাল-ব্যাপী তীব্র ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার ফল। অন্যজাতি কিম্বা অন্য ধর্ম্মের সান্নিধ্য বা সংস্রব ইহারা এখনও সহিতে পারে না। আফ্রিকা ও আমেরিকা প্রভৃতি ইউরোপের নবাধিকৃত স্থানসমূহে যাহা ঘটিতেছে, তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই এ বাক্যের যাথার্থ্য উপলব্ধি হইবে।

৫। আচার। একদলের এক পথের যাত্রীদিগকে ভিন্ন ভিন্ন আচার-সম্পন্ন হইতে হইলে কিছু অসুবিধা হয় বটে, কিন্তু ইহা অনুল্লঙ্ঘনীয় অন্তরায় নহে। যে আচারের মূল খুঁজিয়া শাস্ত্রে পাওয়া যায় না, তেমন আচারের উচ্ছেদ সাধন কঠিন নহে। পূর্ব্ববঙ্গের (কর্জ্জনের পূর্ব্ববঙ্গ নহে) বিধবাগণ ফলমূল-দুগ্ধ খাইয়া একাদশীর ব্রতপালন

করেন; পশ্চিমবঙ্গের সপ্তমবর্ষীয়া বালবিধবা একাদশীতে মরিলেও গঙ্গাজলটুকু খাইতে পায় না। আহারের সময়ে মুখের ভাত গায়ের কাপড়ে পড়িলে বঙ্গের ব্রাহ্মণ কাপড় কাচিয়া এবং গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া শুচি বোধ করেন; কিন্তু মহারাষ্ট্রের বেদপারগ ব্রাহ্মণ এরূপ অবস্থায় বামহস্তে ভাতটি খুঁটিয়া ফেলিয়াই শুদ্ধ হন, জলের অপেক্ষা রাখেন না। বঙ্গদেশে অশুচি বা অস্পৃশ্য কেহ গৃহে প্রবেশ করিলেই খাদ্য নষ্ট হয়; কিন্তু পশ্চিমে এমন স্থান আছে, যেখানে ঐ সকল জাতি ব্রাহ্মণের খাদ্য হস্ত দ্বারা স্পর্শ না করিয়া ভারে বহন করিয়া দিতে পারে। বঙ্গদেশে সগোত্রা বা বয়োজ্যেষ্ঠা কন্যা বিবাহ করিলে ব্রাহ্মণ পতিত হয়, কিন্তু পশ্চিমে অতি-উচ্চ সারস্বতাদি ব্রাহ্মণের মধ্যেও এ সব দূষ্য নহে। ইত্যাকার অসংখ্য আচার-ভেদের কত নাম লইব? কিন্তু এই আচার-ভেদের একটা হজমী বড়ি আছে—দেশাচারে দোষ নাই, এই এক কথা সর্ব্বত্র সকল আপত্তির নিষ্পত্তি করিয়াছে। পরস্পরের মেলা-মেশা ভালবাসা যত বাড়িবে, নানা স্থানে নানা দেশ নানা জাতি দেখিয়া শুনিয়া চক্ষু কর্ণের বিবাদ যত ভাঙ্গিবে, এই দেশভেদে আচারভেদ—সঙ্গে সঙ্গে জাতিভেদে আচারভেদ ততই কমিয়া যাইবে।

৬। বিবাহাদি সামাজিক বন্ধন। যাহাকে ভালবাসিতে চাই, অথচ কোন মতেই ভালবাসিতে পারি না, তাহাকে ভালবাসিবার একটি অমোঘ উপায়, তাহার হাতে নিজের কন্যা-সমর্পণ। পরস্পর বিচ্ছিন্ন দুই কুলের মধ্যে মধুর সৌহার্দ্দ ও সহানুভূতি স্থাপনে বিবাহের ন্যায় আর কিছুই তেমন কার্য্যকর হয় না। এ বিষয়ে শাস্ত্রানুশাসন লঙ্ঘন করিতে বলিতেছি না, কিন্তু শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া যতটুকু করা যাইতে পারে, আমরা তাহা করি কই? বঙ্গদেশেই এক ব্রাহ্মণের মধ্যে রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, বৈদিক; এক কায়স্থের মধ্যে বারেন্দ্র, বঙ্গজ, উত্তর-রাঢ়ীয়, দক্ষিণ-রাঢ়ীয়। ইহাদের মধ্যে পরস্পর বিবাহ-কার্য্যে শাস্ত্রীয় কোন নিষেধ আছে কি? রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, বৈদিক, এ তিনেরই মূল কাণ্যকুব্জে; মূলের সঙ্গে শাখার এ চির-বিচ্ছেদ কেন? এ সকল প্রশ্ন নিবিষ্টভাবে চিন্তা করিবার সময় বোধ হয় সম্পূর্ণরূপেই উপস্থিত হইয়াছে।

জাতীয়বন্ধন সম্বন্ধে সাহিত্যের কথা বারান্তরে।

শ্রীশরৎচন্দ্র চৌধুরী।

আনন্দমঠ।*

আনন্দমঠে মোটামুটি তিনটি স্তর দেখিতে পাই, ১ম—সাধারণ ঔপন্যাসিক স্তর, ২য়—নৈতিক বা লৌকিক শিক্ষার স্তর, ৩য়—আধ্যাত্মিক স্তর। এখন দেখা যাউক কোন্ কোন্ স্তরে কি কি বিষয় বা শিক্ষা পাওয়া যায়।

১ম—সাধারণ ঔপন্যাসিক স্তর বা ইহার কাব্যাংশ:—এ স্তর সম্বন্ধে আমার অধিক বক্তব্য নাই। ইহাতে ইহার গল্পাংশ, ঘটনাবলী, তাৎকালিক ইতিহাস, নানাপ্রকারের চরিত্র প্রভৃতি সাধারণ উপন্যাস-সুলভ বিষয়গুলি পাওয়া যায়। এই অংশ বঙ্গভাষার অনেক উপন্যাস হইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ হইলেও বঙ্কিমবাবুর অন্যান্য উপন্যাসের তুলনায় তাদৃশ প্রকৃষ্ট নহে। ইহাতে দুর্গেশনন্দিনী বা চন্দ্রশেখরের সে অসাধারণ চরিত্রাঙ্কন কুশলতা নাই, বিষবৃক্ষ, মৃণালিনী বা কৃষ্ণকান্তের উইলের সে চিত্তসংমোহক ঘটনাপারম্পর্য্য ও হৃদয়ালোড়নকারী দৃশ্যাবলীর অবতারণা নাই, কপালকুণ্ডলার সে স্বপ্নদুর্লভ অপরূপ সৌন্দর্য্যসৃষ্টিও নাই। তথাপি এক এক স্থান কাব্যহিসাবে বড় সুন্দর লাগিয়াছে তাহার ২।৪টির উল্লেখ করি।

(১) কল্যাণীর স্বপ্নদর্শন বর্ণনা ও বিষপান।

(২) শান্তির রূপ বর্ণনা।

(৩) আনন্দমঠে ভবানন্দ কর্ত্তৃক কল্যাণী চিন্তা।

(৪) মহেন্দ্র ও কল্যাণীর যুদ্ধান্তে পুনর্মিলন।

(৫) মহাপুরুষ কর্ত্তৃক সত্যানন্দের ধারণ।

আর এক স্থান আছে—অতি স্বল্পমাত্র, দুই ছত্রব্যাপী, কিন্তু সেই দুই ছত্রেই যে গভীর মর্ম্মোচ্ছ্বাস ও প্রাণস্পর্শী ভাব আছে তাহা বোধ হয় শত শত পৃষ্ঠাব্যাপী কবিতা পুস্তকেও কেহ কখনও প্রকাশ করিতে পারেন না। সে অংশটী এই—প্রায়শ্চিত্তান্তে জীবানন্দ ও শান্তি উভয়ে মিলিয়া "মায়ের মঙ্গলের জন্য" হিমালয়ে তপস্যা করিতে চলিয়া গেলেন—তাই গ্রন্থকর্ত্তা হৃদয়ের আবেগে বলিতেছেন—"হায়! আবার আসিবে কি মা! জীবানন্দের ন্যায় পুত্র, শান্তির ন্যায় কন্যা, আবার গর্ভে ধরিবে কি?" স্বদেশের জন্য যাহার প্রাণ কাঁদিয়াছে তাহারই আকুলহৃদয়ের শোণিতধারা দ্বারা যেন এ অংশটি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই ছত্রটী যেন আমাদেরই মর্ম্মপীড়িতা, জীবানন্দ শান্তির ন্যায় পুত্রকন্যা-বিরহে কাতরা মাতৃভূমির নয়ননিঃসৃত অশ্রু-ধারাবৎ, হৃতসন্তানা, শোকতাপদগ্ধা জননীর প্রাণের আর্ত্তনাদবৎ আমাদের মর্ম্মস্থলকে আলোড়িত করে। তাহার পর আনন্দ মঠের ঐতিহাসিক অংশ। এই অংশ ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক রাজ্যের সৌধতোরণাদিশোভিত, কোলাহলপূর্ণ, বহুজনবিচারিত রাজনগর ত্যাগ করিয়া আমাদিগকে অতি নির্জ্জন, নিভৃত, স্নিগ্ধচ্ছায়, একপল্লী প্রান্তরে লইয়া যায়।

* ভাগলপুর বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের অধিবেশনে পঠিত।

ইহাতে বাদসাহী কীর্ত্তি বা রাজপুত মহারাষ্ট্রাদি বীরজাতির গৌরব সম্বন্ধে কোনরূপ আড়ম্বরময় ঐতিহাসিক বিবৃতি বা পাণ্ডিত্যগর্ব্বপ্রণোদিত, কোন নূতন ঐতিহাসিক তথ্যের অবতারণা নাই। ইহাতে আছে কতিপয় বাঙ্গালী সন্ন্যাসীকর্তৃক বৃথা দেশোদ্ধার চেষ্টা। কেন যে বঙ্কিমবাবু এই অপেক্ষাকৃত স্বল্পজনবিদিত, ও অপ্রসিদ্ধ ঘটনাটীকে ভিত্তি করিয়া তদুপরি তাঁহার এই অপূর্ব্ব আনন্দ মঠ রচনা করিয়াছেন, তাহার বিশেষ কারণ আছে, পরে বলিব।

২য়, নৈতিক বা লৌকিক শিক্ষার স্তর। আনন্দ-মঠ নীতিপ্রধান বা লৌকিকশিক্ষাপ্রধান উপন্যাস। ইহার অর্থ এরূপ নহে যে ইহাতে Moralityর উপর এক প্রকাণ্ড Sermon আছে—কোন ভাল উপন্যাসে তাহা থাকে না। ভাল ঔপন্যাসিক বা কবি কখন স্পষ্টত নীতিশিক্ষা দেন না। তিনি কেবল এরূপ সুন্দরভাবেও নিপুণতার সহিত তাঁহার অঙ্কিত চিত্রটি সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত করেন যে পাঠক তাহা হইতে হিতোপদেশ পাঠাপেক্ষাও সমধিক শিক্ষালাভ ও চিত্তোৎকর্ষ সম্পাদন করিতে পারেন। এখন দেখা যাউক কি কি লৌকিক শিক্ষা আনন্দ-মঠ পাঠে লাভ করা যায়।

আনন্দ মঠের প্রথম ও প্রধান শিক্ষা স্বদেশ প্রেম। বঙ্কিম বাবুর পূর্ব্বে আর কেহ কখনও স্বদেশকে বিষ্ণুর অঙ্কশায়িনী মোহিনীমূর্ত্তি মাতৃরূপে কল্পিত করিয়া স্বদেশ ভক্তিকে এত উচ্চাসনে উন্নীত করিয়াছিলেন কিনা জানি না। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে একটী ভাব এই সূক্ষ্মদর্শী, স্বদেশপ্রেমিক, গীতাসর্ব্বস্ব, ব্রাহ্মণসন্তানের মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল, সেই অপূর্ব্ব ভাবটী তাঁহার পূর্ব্বে আর কেহই লোকশিক্ষার জন্য এরূপ পরিস্ফুট ও হৃদয়গ্রাহীভাবে প্রকাশ করিতে পারেন নাই। সে ভাবটী এই যে সন্ন্যাসী না হইলে স্বদেশোদ্ধারের ন্যায় গুরুতর কার্য্য সাধন করা যায় না। তাঁহার পরে আর একজন মহাত্মা এই মহানুভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ভারতবাসীকে তদনুযায়ী শিক্ষা দিতে দিতে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি আর কেহই নহেন বঙ্গের অপর গৌরব সন্ন্যাসী বীর স্বামী বিবেকানন্দ। ওজস্বিনী বক্তৃতাই বল, আর অগ্নিময়ী লেখনীই বল, আর যুদ্ধ বিগ্রহই বল, যতদিন অন্তত দেশের নেতৃগণ এই সন্ন্যাসভাবে অনুপ্রাণিত না হন, ততদিন এই মহৎ কার্য্য সাধিত হইবার কোন আশা নাই। গেরুয়া কাপড় পরিলেই বা গায়ে ছাই মাখিলেই সন্ন্যাসী হয় না, একথা বোধ হয় আমার বলিয়া দিবার আবশ্যক নাই। সন্ন্যাসীর কিরূপ হওয়া আবশ্যক তাহার কতকটা আদর্শ আমরা সত্যানন্দের চরিত্রে পাই। তিনি চিকিৎসকের ন্যায় মহাজ্ঞানী গুরুর দ্বারা চালিত, অথচ ভবানন্দ জীবানন্দ প্রভৃতি বীরগণের চালক। দেশের সেবায় তুচ্ছদেহ পরিত্যাগে সদা প্রস্তুত, অথচ শারীরিক বলাধানেও বিশেষ মনোযোগী; সর্ব্বত্যাগী অথচ দেশোদ্ধারের নিমিত্ত অর্থাস্ত্র সংগ্রহে সদা যত্নশীল; পরমভক্ত বৈষ্ণব অথচ রজোগুণের উপাসক; অনর্থক প্রাণীহিংসায় কাতর অথচ দেবদ্বেষী গণের নিধনের জন্য ধৃতাস্ত্র এবং শিশুর ন্যায় সরল হৃদয় অথচ সন্তান সম্প্রদায় গঠনে কেমন সুকৌশলী। এদিকে মহর্ষিগণের ন্যায় সংযমী ও জিতেন্দ্রিয়; অথচ সেই প্রখর বুদ্ধিশালিনী, সার্দ্ধ হস্ত পরিমিত কৃত্রিম শ্মশ্রুধারিণী, নবীনানন্দরূপী শান্তির

চোখের আগুনও তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি এড়াইতে পারিল না। যখন ভবানন্দ জীবানন্দের ন্যায় বীরগণ, মহেন্দ্রসিংহের ন্যায় সুশিক্ষিত ধনীপুত্রগণ, স্ব স্ব বীরত্বাভিমান, শিক্ষাভিমান, ধনগর্ব্ব প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া, পুত্রকলত্রের মায়া ত্যাগ করিয়া সত্যানন্দের ন্যায় সন্ন্যাসীর শিষ্যত্ব গ্রহণ ও কায়মনোবাক্যে গুরূপদিষ্ট পথানুসরণ করিবে—আর—আমি বঙ্কিমবাবুর নিজের ভাষাতেই বলিতেছি আর "যবে মার সকল সন্তান মাকে মা বলিয়া ডাকিবে," তখনই এই "পরম রমণীয় অপার্থিব, পবিত্রতাযুক্ত মাতৃসেবা ব্রতের" উদযাপন হইবে। শক্তিসঞ্চয় এই ব্রতের উপকরণ, ভক্তি ইহার হোমানল,—স্বার্থ, আত্মাভিমান, মায়া ও ইন্দ্রিয়পরতা ইহার আহুতি, আর ইহার মন্ত্র সেই প্রাণস্পর্শী, হৃদয়োন্মত্তকারী আমাদের মুমূর্ষু জাতীয়শক্তির মৃতসঞ্জীবনী প্রায়—হ্রদশোষবিক্লবা শফরীর পক্ষে প্রথম বর্ষার স্নিগ্ধধারাস্বরূপ—সেই "বন্দেমাতরম্"।

কিরূপ সময় ও অবস্থায় এইরূপ ব্রতীদিগের আবশ্যকতা ও উদ্ভব হয় তাহারও উজ্জ্বলচিত্র আমরা গ্রন্থারম্ভে পাই। যখন অজন্মা, মন্বন্তর, রোগ, মহামারী প্রভৃতি, পিশাচদলের ন্যায় দেশবক্ষে তাণ্ডবনৃত্য করিতেছে, যখন দেশের তথাকথিত রাজা ও পিশাচান্তর মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক শবরূপী প্রজাদের অস্থিকঙ্কাল চর্ব্বণ ও শেষ শোণিত বিন্দুপান করিয়া আপনার পৈশাচিক ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি করিতেছে, তখনই ইহাদের উত্থান।

ইহাতেই স্পষ্ট বুঝা যায় কেন বঙ্কিমবাবু অন্যান্য ঐতিহাসিক ঘটনা ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীবিদ্রোহ অবলম্বনেই এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন। আবার বঙ্কিমবাবুর ওজস্বিনী ভাষাতেই বলি—"যখন আমাদের মা আর সে পদ্মাসনা সর্ব্বালঙ্কার পরিভূষিতা, হাস্যময়ী, বালার্কপ্রভা ঐশ্বর্য্যশালিনী সুন্দরী" নহেন, যখন তিনি "অন্ধকার সমাচ্ছন্না, কালিমাময়ী, হৃতসর্ব্বস্বা এইজন্য নগ্নিকা, কঙ্কালমালিনী, আপনার শিব আপনি পদতলে দলন করিতেছেন" তখনই সত্যানন্দ ভবানন্দ জীবানন্দের প্রয়োজনও সম্ভব। এই শ্মশানবাসিনী স্বশিবদলনীর ভৈরব নৃত্য হইতেই যেন ইহারা সমুদ্ভূত, সুতরাং ইহারাও সর্ব্বত্যাগী, স্বসুখ নিরভিলাষী, রজোগুণোপাসক, বীরহৃদয় সন্ন্যাসী। দিগ্‌দিগন্তপ্রসারিণী, প্রলয়ঙ্করী কাদম্বিনী যেমন তমিস্রা তেমনই বজ্রগর্ভা।

এই স্বদেশপ্রেম সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবু আর এক অপূর্ব্ব শিক্ষা দিয়াছেন। প্রায়শ্চিত্ত শেষে জীবানন্দ ও শান্তি চলিলেন—কোথায়? কেন? না—হিমালয়ে কুটীর প্রস্তুত করিয়া যাতে মার মঙ্গল হয় সেই প্রার্থনা করিতে। এই শিক্ষাটী অতীব সুন্দর ও সুমহান্। যখন জননী জন্মভূমির ভক্ত সন্তানেরা সারাজীবন সাধ্যমত কাজ করিয়া, কর্ম্মজীবন অতিবাহিত করিয়া, শেষে মায়ের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা ও আরাধনা করেন—সে প্রার্থনা, সে আরাধনা শত শত কর্ম্ম হইতেও শক্তিশালিনী ও ফলবতী। এ প্রার্থনার প্রত্যেক বাক্য, প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক স্পন্দন, লহরীতে লহরীতে গগনমার্গে উঠিয়া যাঁহার উদ্দেশ্যে প্রেরিত তাঁহারই জ্যোতির্ম্ময় সিংহাসনের জ্যোতিঃ বৃদ্ধি করে। এ প্রার্থনার হেমবন্ধনই তাঁহার পাদপদ্মের সহিত এই পাপতাপপূর্ণ পৃথিবীকে বদ্ধ রাখিয়া ইহাকে কেন্দ্রচ্যুত হইয়া রসাতলে যাইতে

দিয়েছে ত্রা। এই কল্পনাটী যেমনই মধুর, তেমনি মহৎ। ইহা শিলাসংঘর্ষণনাদিনী, মধুরকল্লোলিনী, স্রোতস্বিনীর তর তর শব্দের ন্যায়, প্রাচী সমুদিত উষামুকুট জ্যোতির ন্যায়, তুহিনশিকর শীতলা, প্রসন্নপুণ্য সলিলা গঙ্গোত্রীর ন্যায় ইন্দ্রিয় মন প্রাণ স্নিগ্ধকর। এই কল্পনাস্রোত পাঠকের হৃদয় প্লাবিত করিয়া সে অতল, জলধিরাশি উদ্দেশ্যে স্বয়ং ধাবিত, যেন তাহারই মধ্যে লইয়া যায়। ইহার অনুরূপ কল্পনা আমি কখনও কোথাও পাই নাই। এই মুখ্যালৌকিক শিক্ষার সহিত আরও কয়েকটী গৌণ শিক্ষা আনন্দমঠে আছে। তাহার মধ্যে প্রধান ২।১টীর উল্লেখ করিব। (ক) "বাঙ্গালীর স্ত্রী অনেক অবস্থাতেই বাঙ্গালীর প্রধান সহায়, অনেক সময় নয়।" এ কথাটী আনন্দমঠের প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন হইতে উদ্ধৃত। গ্রন্থকার উভয়বিধ স্ত্রীরই জাজ্জ্বল্যমান্ উদাহরণ গ্রন্থে দিয়াছেন। জীবানন্দের শান্তি ও মহেন্দ্র সিংহের কল্যাণীর কথা ভাবিয়া দেখুন। এই স্থলে একটী কথা বলিয়া রাখি। আনন্দমঠের নায়ক সম্বন্ধে সন্দেহ বা বিভিন্ন মত থাকিতে পারে—কিন্তু নায়িকা সম্বন্ধে সেরূপ সন্দেহ বা মতানৈক্যের কোন কারণ নাই। শান্তিই আনন্দমঠের নায়িকা অর্থাৎ প্রধান স্ত্রী চরিত্র। আনন্দমঠ সাধারণ উপন্যাসের ন্যায় হইলে নায়িকাও সাধারণ নায়িকার ন্যায় হইত। কিন্তু এখানে তাহা হইলে চলিবে কেন? এখানে মূলমন্ত্র স্বদেশপ্রেম, রমণীপ্রেম নহে। এখানকার নায়ক বীর, সংযমী, জন্মভূমির সেবায় উৎসর্গীকৃত জীবন—কামিনী কটাক্ষলোলুপ ভোগবিলাসপরায়ণ যুবক নহেন। যতক্ষণ জীবানন্দ শান্তিকে নবীনানন্দরূপে পার্শ্বে না পাইয়াছেন, ততক্ষণ বাস্তবিকই তাঁহার পূর্ণমাত্রায় সন্ন্যাসী জীবন হয় নাই। ততক্ষণ সন্তানজীবনের দায়িত্ব, আত্মত্যাগ ও সন্ন্যাসিত্ব তাঁহার পূর্ণমাত্রায় উপলব্ধি হয় নাই। আত্মাকে যে পরিমাণে শুদ্ধ, উন্নত ও শক্তিশালী করা যায় আত্মত্যাগের সার্থকতাও সেই পরিমাণে হইবে। দান বা উৎসর্গের সামগ্রী এমনটি হওয়া চাই, যাহা অপেক্ষা ভাল আমি দিতে পারি না ও আমার সাধ্যমত যাহার উৎকর্ষ সাধন করিয়াছি। এরূপটি হইলে সে দানে জগতের উপকার, ত্যাগেরও পরম চরিতার্থতা। বৃষকেতু বধের পূর্ব্বে কর্ণের দাতাকর্ণ নামের সার্থকতা হয় নাই, সীতানির্ব্বাসনের পূর্ব্বে রামেরও প্রজারঞ্জক নামের সফলতা হয় নাই। আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে নবীনানন্দরূপী শান্তির সহিত সাক্ষাতের পূর্ব্বে আত্মার এই উৎকর্ষ সাধন জীবানন্দের তাদৃশ হয় নাই। তৎপূর্ব্বে তিনি প্রায়শ্চিত করিলেও সে প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইত না। এই পূর্ণতা ও সর্ব্বাঙ্গীন সৌন্দর্য্য শান্তির সংসর্গেই ঘটিল। কিরূপ শিক্ষা ও সংযমের ভিতর দিয়া তাহা ঘটিয়াছিল তাহার আভাস বঙ্কিমবাবু দুই এক স্থলে দিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি স্থান উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না :—

"জীবানন্দ বিষণ্ণ হইয়া বলিলেন—'দেখ শান্তি! এক দিন আমার ব্রত ভঙ্গ হওয়ায় আমার প্রাণ ত উৎসর্গ ই হইয়াছে। যে পাপ, তাহার প্রায়শ্চিত্তও করিতেই হইবে। এত দিন এ প্রায়শ্চিত্ত করিতাম। কিন্তু কেবল তোমার অনুরোধেই করি নাই। কিন্তু একটা ঘোরতর যুদ্ধের বিলম্ব নাই। সেই যুদ্ধের ক্ষেত্রে আমার সে প্রায়শ্চিত্ত—করিতেই হইবে।

আমার মরিবার দিন'— "শান্তি আর বলিতে না দিয়া বলিল, 'আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী,—সহধর্ম্মিণী, ধর্ম্মের সহায়। তুমি অতিশয় গুরুতর ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছ। সেই ধর্ম্মের সহায়তার জন্যই গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। দুই জনে একত্র ধর্ম্মাচরণ করিব বলিয়া গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়া বনে বাস করিতেছি। তোমার ধর্ম্ম বৃদ্ধি করিব। ধর্ম্মপত্নী হইয়া তোমার ধর্ম্মের বিঘ্ন করিব কেন? বিবাহ ইহকালের জন্য ও পরকালের জন্য। ইহকালের জন্য যে বিবাহ, মনে কর, আমাদের সে বিবাহ হয় নাই। আমাদের বিবাহ কেবল পরকালের জন্য। পরকালে দ্বিগুণ ফল লভিবে। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের কথা কেন? তুমি কি পাপ করিয়াছ? তোমার প্রতিজ্ঞা স্ত্রীলোকের সহিত একাসনে বসিবে না। কৈ, কোন দিন ত একাসনে বসো নাই। প্রায়শ্চিত্ত কেন? হায় প্রভু, তুমিই আমার গুরু, আমি কি তোমায় ধর্ম্ম শিখাইব? তুমি বীর, আমি তোমায় বীরব্রত শিখাইব?' "জীবানন্দ আহ্লাদে গদ গদ হইয়া বলিলেন, 'শিখাইলে ত!' "

অন্ধতমসাচ্ছন্ন রাত্রে সৌদামিনী যেমন নিবিড়কাননের নিভৃততম কোণগুলি পর্য্যন্ত ক্ষণকালের জন্য উদ্ভাসিত করে, এই সন্ন্যাসী-দম্পতীর এই কথোপকথনটিও সেইরূপ তাঁহাদের প্রচ্ছন্ন, কঠোর, সন্ন্যাসজীবনের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত ক্ষণেকের নিমিত্ত আমাদের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে খুলিয়া দেয়। সন্তানধর্ম্মে যে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে, তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব শান্তি কি বিশদরূপে প্রণিধান করিয়াছিলেন দেখুন! প্রায়শ্চিত্তান্তে চিকিৎসকের কৃপায় জীবানন্দ পুনর্জ্জীবিত হইয়া, আবার সন্তানদের সহিত যোগ দিবার জন্য ব্যস্ত, কিন্তু শান্তি তাহাকে কি বলিয়া নিরস্ত করিতেছেন?—"তুমি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সন্তানধর্ম্মের জন্য দেহত্যাগ করিয়াছিলে। এই পুনঃপ্রাপ্ত দেহে সন্তানের আর অধিকার নাই। আমরা সন্তানের পক্ষে মরিয়াছি"—কিঞ্চিৎ পরে আবার—"তোমার দেহ মাতৃসেবার জন্য পরিত্যাগ করিয়াছ। যদি আবার মার সেবা করিতে পাইলে তবে আবার প্রায়শ্চিত্ত কি হইল? মাতৃসেবায় বঞ্চিত হওয়াই এ প্রায়শ্চিত্তের প্রধান অংশ। নহিলে তুচ্ছ প্রাণ পরিত্যাগ করা কি ভারি একটা ভারি কাজ?" আবার এক স্থলে সত্যানন্দকে কি বলিতেছেন দেখুন—"ইহলোকে স্ত্রীর পতি দেবতা, কিন্তু পরলোকে সবারই ধর্ম্ম দেবতা—আমার কাছে আমার পতি বড়, তার অপেক্ষা আমার ধর্ম্ম বড়, তার অপেক্ষা আমার কাছে আমার স্বামীর ধর্ম্ম বড়। আমার ধর্ম্মে আমি যে দিন ইচ্ছা জলাঞ্জলি দিতে পারি, আমার স্বামীর ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিব? মহারাজ তোমার কথায় আমার স্বামী মরিতে হয় মরিবেন, আমি বারণ করিব না!"

এরূপ স্ত্রী যদি সহায় না হয় তবে কে হইবে? আবার অন্য দিকে দেখুন, কল্যাণী যতক্ষণ মহেন্দ্রসিংহের পার্শ্ববর্ত্তিনী ততক্ষণ মহেন্দ্রসিংহ সন্তানধর্ম্মে যোগদানে অসমর্থ। যতক্ষণ না তিনি স্বপ্নাদিষ্টা হইয়া বিষপান করিয়া মহেন্দ্রসিংহের পার্শ্ব হইতে অপসৃতা হইলেন ততক্ষণ মহেন্দ্র দীক্ষিত হইবার অযোগ্য ছিলেন। এই স্থলে এই দুই চরিত্র একবার তুলনা করিবেন। উভয়েই সাধ্বী, পতিব্রতা, ধর্ম্মে অনুরাগশালিনী, কিন্তু একজন পতিপার্শ্বে উপস্থিত থাকিয়া পতির বীরধর্ম্মে সহায়তা

করেন, অপরা তৎপার্শ্ব হইতে অপসৃতা না হইলে তাঁহা দ্বারা স্বদেশচর্য্যারূপ, গুরুতর কার্য্য সম্ভবে না। একজন হৃদয়ের দৃঢ় ধর্ম্ম-বল ও পতির বীর ধর্ম্মের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তিদ্বারা চালিতা হইয়া পতিকে অভেদ্য অক্ষয় কবচরূপে বেষ্টন করিয়া রহিলেন; আর অপরার পতিমায়াপাশ ছেদ করিবার জন্য দৈবস্বপ্ন রূপ খড়্গের আবশ্যক হইল। একের উপস্থিতিতে বলাধান ও সিদ্ধিলাভ, অপরার অনুপস্থিতিতে দৌর্ব্বল্যাদি অন্তরায়ের অপগমন। জীবানন্দ সত্যানন্দের প্রিয়তম শিষ্য, এরূপ গুরুর শিক্ষা ও শাসনে থাকিয়া তিনি সাহসী, তেজস্বী ও কর্ম্মক্ষম—কিন্তু বন্দুক ঘাড়ে করিয়া বনে বনে ঘুরিয়া ও যুদ্ধ বিগ্রহাদি কঠোর কর্ম্মে রত থাকিয়া অন্তরের কোন কোন স্থান কিছু অপূর্ণ ও শুষ্ক, সঙ্কীর্ণ ও অগভীর। সেই অপূর্ণকে পূর্ণ করিবার জন্য, শুষ্ককে সরস করিবার জন্য, সঙ্কীর্ণতাকে প্রসার দিবার জন্য ও অগভীরতাকে গভীরতা দিবার জন্য, শান্তির ন্যায় সহধর্ম্মিণীর পার্শ্বে থাকা আবশ্যক। নচেৎ যে গুরুতর কার্য্যে হাত দিয়াছেন তাহা সুসম্পন্ন হয় না। এদিকে মহেন্দ্রসিংহ সুশিক্ষিত, বলিষ্ঠ, স্বধর্ম্মানুরাগী, ধনী জমীদার, কিন্তু নিতান্ত সাধারণ লোকের ন্যায় সন্তান কলত্রের মায়াপাশে একেবারে নিবদ্ধ, সুতরাং এই শিক্ষা, বল, স্বধর্ম্মানুরাগ, অর্থ, বিদ্যাবুদ্ধি প্রভৃতি মাতৃসেবায় উৎসর্গ করিতে অসমর্থ—অতএব সেই পাশছিন্ন করিয়া; তাঁহাকে সন্তান কলত্র হইতে বিছিন্ন হইতে হইল, তবে তিনি স্বদেশার্চ্চনার উপযোগী হইলেন।

গ্রন্থশেষে স্বদেশসেবীদিগের জন্য এক অতি জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দেওয়া আছে। এটী পরমজ্ঞানী চিকিৎসকের মুখ দিয়া বলান হইয়াছে ও অনেকে ঐ অংশটীকে আনন্দ মঠের প্রধান শিক্ষা বলিয়া মনে করেন। এই অংশের ভিতর লৌকিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা অতিশয় নিপুণতার সহিত গ্রথিত হইয়াছে। লৌকিক শিক্ষাটী এই যে এক ভিন্ন জাতি আসিয়া দেশ জয় করিল বলিয়াই যে রক্তস্রোতে দেশকে প্লাবিত করিয়া তদ্দণ্ডেই তাহাদের উচ্ছেদ সাধন না করিলে আর দেশোদ্ধারের উপায় নাই, ইহার কিছু অর্থ নাই। সে সময়ে ভাবচক্ষু মুদ্রিত করিয়া জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেখিবে যে ঐ ভিন্ন জাতির আগমন যদি এরূপ সময়ে হয় ও তাহারা এরূপ চরিত্রবান্ হয় যে সে সময়ে দেশ তাহাদের হাতে থাকিলে দেশের উপকার অবশ্যম্ভাবী, তবে তাহাতে বাধা দিবেনা—অন্তত তাহাদের নিকট হইতে স্বকার্য্যসাধনোপযোগী শিক্ষা লাভ করিয়া লইতে হইবে। এইরূপ গভীর জ্ঞান ও অভ্রান্ত বিবেচনা শক্তি দেশের প্রত্যেক লোকের নিকট প্রত্যাশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। কিন্তু নেতাদের ইহা থাকা অত্যাবশ্যক। নেতার তেজস্বী উৎসাহশীল ও আন্তরিকতা পূর্ণ হওয়া যেরূপ আবশ্যক; সংযত, স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন, ও জ্ঞানী হওয়াও তেমনই আবশ্যক। তাহা না হইলেই অনর্থক সমাজবিপ্লব উপস্থিত হয়—বঙ্কিম বাবু মুখবন্ধে ইহাকেই আত্মপীড়ন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কাহারও কাহারও মতে এই অংশটী কেবলমাত্র তীক্ষ্ণবুদ্ধি, রাজবেতনভোগী, কর্ম্মচারীর রাজভক্তিজ্ঞাপন চেষ্টা—সাহসী, সহৃদয় স্বদেশভক্তের পরামর্শ নহে। আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধি কিন্তু এই মতের অনুমোদন করিতে অক্ষম। অবশ্য বঙ্কিম বাবু অতি সাবধানে, সুকৌশলে ও

বিচক্ষণতার সহিত এই অংশ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় বা প্রতিপাদ্য বোধ হয় উপরোক্ত মতাবলম্বীরা ভাল করিয়া লক্ষ্য করেন না। সেটী এই—"যতদিন না হিন্দু আবার জ্ঞানবান্ গুণবান্ ও বলবান্ হয়; ততদিন ইংরাজরাজ্য অক্ষয় থাকিবে"। অর্থাৎ জেতার সহিত চিরবিরোধাচরণ করিলেও চলিবে না বা নয়ন মুদ্রিত করিয়া চিরকালের জন্ম তাহাদিগের চরণে আত্মসমর্পণ করিলেও চলিবে না। পরন্তু তাহাদিগকে আমাদের পূর্ব্বোন্নতি শিখরে আরোহণের নিমিত্ত সোপানবৎ ব্যবহার করিবে। অতএব যিনি প্রকৃত দেশ হিতৈষী তিনি এই বহির্বিষয়কজ্ঞানে সুপণ্ডিত, লোকশিক্ষাপটু জাতির সাহায্যে সাধ্যমত এবং লক্ষ্যভ্রষ্ট না হইয়া জ্ঞান সঞ্চয়, গুণসঞ্চয় ও শক্তিসঞ্চয় করিবেন। কি কি উপায়ে তাহা করা সম্ভব তাহার অনেকটা আভাস এই আনন্দমঠ পাঠেই পাওয়া যায়—তাহার অধিক বলিবার এ স্থানও নহে, কালও নহে।

তৃতীয়—আধ্যাত্মিক স্তর—

বলা বাহুল্য, এই স্তরটী সর্ব্বাপেক্ষা অন্তর্নিহিত অর্থাৎ বহির্ভাগে অনুমেয় নহে। এটী বুঝিতে হইলে কিছু চিন্তাশীলতা, সহৃদয়তা, ও অন্তর্দৃষ্টির আবশ্যক। বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসাবলী মধ্যে দুইখানি মাত্র আধ্যাত্মিক শিক্ষামূলক বলিয়া প্রসিদ্ধ—দেবী চৌধুরাণী ও সীতারাম। আনন্দমঠ আধ্যাত্মিক শিক্ষামূলক উপন্যাস নহে বটে—ইহা স্বদেশ প্রেম মূলক উপন্যাস,—কিন্তু ইহাতেও ২।১টী আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত আছে—মালার সূত্রের ন্যায় নানা চরিত্র, বহু ঘটনাবলীকে একত্র গ্রথিত রাখিয়াছে। কিন্তু ইহা বহির্দৃষ্টির বিষয় নহে। এই আধ্যাত্মিক শিক্ষা সকল গুলিই গীতামূলক। বঙ্কিমবাবু হিন্দু ধর্ম্মের সার তত্বগুলি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত ও একেবারে নিজস্ব করিয়া রাখিয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার প্রণীত কৃষ্ণচরিত্র, ধর্ম্মতত্ব, দেবী চৌধুরাণী ও সীতারাম পাঠে একথা সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। গীতা-সমুদ্র মন্থন করিয়া যে অমৃত তিনি স্বয়ং পান করিয়াছিলেন তাঁহার উপরোক্ত গ্রন্থগুলিতে তাহার কণা মিশ্রিত করিয়া দিয়া স্বীয় পাঠকবর্গকেও অমরত্বে অধিকার দেওয়া তাঁহার জীবনের এক প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। আর সে উদ্দেশ্যে তিনি কতকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। আমার বিশ্বাস বঙ্কিমবাবুর এই সকল গ্রন্থ প্রকাশের অব্যবহিত ফল স্বরূপ তাহার পর হইতে শিক্ষিত বঙ্গবাসীর মধ্যে গীতা পাঠ ও গীতা চর্চ্চার বেশ একটা আগ্রহ জন্মিল। সে অমৃতাস্বাদ পাইয়া পাশ্চাত্য সভ্যতা, পাশ্চাত্য সাহিত্য, পাশ্চাত্য দর্শন প্রভৃতি পাশ্চাত্যের অন্ধস্তাবকদের মতিগতি ফিরিল।

এখন দেখা যাউক কি কি আধ্যাত্মিক শিক্ষা আনন্দমঠে লাভ করা যায়। প্রথমে উৎসর্গ পত্রে উদ্ধৃত গীতার শ্লোক কয়টী আপনারা একবার স্মরণ করুন। এই কয়টী শ্লোক গীতার ভক্তিযোগাখ্য ১২শ অধ্যায় হইতে উদ্ধৃত। ইহাতে গ্রন্থকারের অভিপ্রায় এইরূপ বুঝা যায়, যে যে প্রকারের ভক্তি ভগবান্ অর্জ্জুনকে মোক্ষলাভের সোপান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন স্বদেশসেবকেরও মাতৃভূমির প্রতি ঠিক সেই রূপ ভক্তির প্রয়োজন। এই ভক্তির উপাদান (১) অনন্যমনস্কতা বা তদ্গতচিত্ততা (২) কর্ম্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ, ও (৩) চিত্ত সমাধান। এই চিত্তসমাধান ব্যাপারটী অতীব

দুষ্কর, সুতরাং কি উপায়ে সেই দুষ্কর ব্যাপারকে আয়ত্ত করা যায় তাহাও তন্নিয়ে নির্দ্দিষ্ট আছে। সেটী অভ্যাস যোগ—অর্থাৎ পূর্ব্বাভ্যাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক এরূপ কর্ম্ম অভ্যাস করিবে যাহাতে চিত্ত-সমাধানের অন্তরায় সকল দূরীভূত হয় ও যাহা মনকে সমাহিত করিবার পক্ষে অনুকূল হয়। কিরূপ অভ্যাস ও আদর্শ স্বদেশভক্তের আবশ্যক, তাহা বঙ্কিমবাবু সন্তানদের শিক্ষা, দীক্ষা, কার্য্য-কলাপ, রীতিনীতি প্রভৃতিতে বর্ণনা করিয়াছেন। উপক্রমণিকাতে এই ভক্তির আবশ্যকতা, স্বরূপ ও মাত্রা প্রকারান্তরে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

গ্রন্থ মধ্যে মহেন্দ্রসিংহ সমীপে সত্যানন্দ কর্ত্তৃক সন্তান ধর্ম্মের ব্যাখ্যাতেও একটী সুগভীর আধ্যাত্মিক শিক্ষা পাই। সত্যানন্দ বলিতে-ছেন—"প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্মের লক্ষণ দুষ্টের দমন, ধরিত্রীর উদ্ধার। কেন না বিষ্ণুই সংসারের পালন কর্ত্তা। দশবার শরীর ধারণ করিয়া পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছেন।..চৈতন্য দেবের বিষ্ণু প্রেমময় কিন্তু কেবল প্রেমময় নহেন, তিনি অনন্ত শক্তিময়"। কিছু পরে আবার বলিতেছেন—"রজোগুণ হইতে তাঁহার [অর্থাৎ ভগবানের] শক্তির উৎপত্তি, ইহার উপাসনা যুদ্ধের দ্বারা, দেবদ্বেষীদিগের নিধন দ্বারা, আমরা তাহা করি।" গ্রন্থে বর্ণিত দেশের অবস্থায় এই রজোগুণোপাসনার আবশ্যকতা বঙ্কিমবাবু আমাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল করিবার প্রয়াস পাইয়া-ছেন। "অহিংসাপরমো ধর্ম্মঃ" "যুদ্ধবিগ্রহ-দ্বেষাদি হিন্দুধর্ম্মবিরোধী"—Universal brotherhoodই সার ধর্ম্ম—এই সকল মহাবাক্য সম্বন্ধে সাধারণতঃ যে সকল ভ্রমাত্মক ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ দেখা যায় তাহার অপনোদন এই অংশের অন্যতম উদ্দেশ্য। এই রজোগুণাভাবে বর্ত্তমান হিন্দুর কিরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে ও তাহার প্রতীকার কি তাহা ইহা অপেক্ষাও ওজস্বিনী ভাষায় আর একজন বলিয়া গিয়াছেন। যাঁহার সারা জীবন সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের এবং কর্ম্মযোগ ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগের সামঞ্জস্য বিধানের একটা অবিরাম উদ্যম ছিল, যাঁহার মেঘমন্দ্রধ্বনি অদ্যাপি ভারতবর্ষের কর্ণে বাজিতেছে, সেই মহাত্মা স্বামী বিবেকানন্দের এ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। —"সত্ত্বপ্রাধান্য অবস্থায় মানুষ নিষ্ক্রিয় হয়, পরম ধ্যানাবস্থা প্রাপ্ত হয়। রজঃপ্রাধান্যে ভাল মন্দ ক্রিয়া করে, তমঃ প্রাধান্যে আবার নিষ্ক্রিয় জড় হয়। এখন বাইরে থেকে, এই সত্ত্ব প্রধান হয়েছে কি তমঃ প্রধান হয়েছে, কি করে বুঝি বল। সুখ দুঃখের পার ক্রিয়াহীন, শান্তরূপ, সত্ত্ব অবস্থায় আমরা আছি, কি প্রাণহীন জড়প্রায়, শক্তির অভাবে ক্রিয়া-হীন, মহাতামসিক অবস্থায় পড়ে, চুপ্ করে ধীরে ধীরে পড়ে যাচ্ছি, একথার জবাব দাও—নিজের মনকে জিজ্ঞাসা কর। জবাব কি আর দিতে হয়? ফলেন পরিচীয়তে। সত্ত্ব প্রাধান্যে মানুষ নিষ্ক্রিয় হয়, শান্ত হয়; কিন্তু সে নিষ্ক্রিয়ত্ব মহাশক্তি কেন্দ্রীভূত হয়ে হয়; সে শান্তি মহা-বীর্য্যের পিতা। সে মহাপুরুষের আর আমাদের মত হাত না নেড়ে কায করে বেড়াতে হয় না, তাঁর ইচ্ছা মাত্র, অবলীলাক্রমে সব কার্য্য সম্পন্ন হয়ে যায়। সেই মহাপুরুষই 'নির্বৈরঃ সর্ব্ব ভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ' ইত্যাদি। আর ঐ যে মিন্‌মিনে পিন্‌পিনে ঢোক্ গিলে গিলে কথা কয়, ছেঁড়ান্যাতা সাত দিনের উপবাসীর মত সরু আওয়াজ, সাতচড়ে কথা কয় না, ওগুলো হচ্ছে তমোগুণ, ওগুলো মৃত্যুর চিহ্ন, ও

সত্ত্বগুণ নয় ও পচা দুর্গন্ধ। অর্জ্জুন ঐদলে পড়েছিলেন বলেইত না ভগবান্ এত করে বোঝাচ্ছেন গীতায়। প্রথম ভগবানের মুখ থেকে কি কথা বেরুল—দেখ— "ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থঃ"—শেষ "তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশোলভস্ব", ঐ জৈন বৌদ্ধ প্রভৃতির পাল্লায় পড়ে, আমরা ঐ তমোগুণের দলে পড়েছি। দেশ শুদ্ধ পড়ে কতই হরি বল্‌ছি, ভগবানকে ডাকছি, ভগবান্ শুনছেনই না, আজ হাজার বৎসর। শুনিবেনই বা কেন? আহম্মকের কথা মানুষেই শোনে না, তা ভগবান্। এখন উপায় হচ্ছে ঐ ভগবদ্বাক্য শোন "ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ"—"তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশোলভস্ব"।

গ্রন্থের শেষাংশে অর্থাৎ সত্যানন্দ চিকিৎসকের কথোপকথনে কেবলমাত্র ভক্তি বা হৃদয়ের আবেগের অসম্পূর্ণতা গ্রন্থকর্ত্তা বুঝাইতেছেন। সত্যানন্দ তত্ত্বজ্ঞানহীন ভক্ত, যুদ্ধ জয়ান্তে দেশ ছাড়িয়া যাইতে হইতেছে বলিয়া কাঁদিয়া আকুল ও শত্রুশোণিতে সিক্ত করিয়া মাতাকে শস্যশালিনী করিব বলিয়া বৃথা হৃদয়াবেগ প্রকাশ করিতেছেন। মহাপুরুষ সেই জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত করিয়া সত্যানন্দের যেটুকু অসম্পূর্ণ, সেটুকুকে সম্পূর্ণ করিতে তাহাকে লইয়া গেলেন। গ্রন্থকর্ত্তা দেখাইলেন—ভক্তি জ্ঞান বিচ্ছিন্ন হইলে চলিবে না। ভক্তি জ্ঞান দ্বারা মার্জ্জিত ও ধ্রুবসত্য পথে চালিত হইবে ও জ্ঞান, ভক্তি দ্বারা সরস ও বিশ্ব কল্যাণোন্মুখ হইবে, তবেই উভয়ের সার্থকতা, জগতেরও মঙ্গল। সত্যানন্দ আদর্শভক্ত, মহাপুরুষ ও আদর্শজ্ঞানী। উভয়ে মিলিত হইয়া হিমালয়ের মাতৃমন্দিরে তপস্যা করিবেন, তবেই দেশের মঙ্গল হইবে। গ্রন্থারম্ভে (অর্থাৎ উৎসর্গপত্রে ও উপক্রমণিকাতে) ভক্তিমার্গ, গ্রন্থমধ্যে কর্ম্মমার্গ ও গ্রন্থশেষে জ্ঞানমার্গ নিদর্শিত হইয়াছে। গ্রন্থের সার আধ্যাত্মিক শিক্ষা এই যে ঐকান্তিক ভক্তিপ্রণোদিত হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে সদ্‌গুরু লাভ হইবে ও তাঁহার সাহায্যে কর্ম্মান্তে পরম জ্ঞান- চক্ষু লাভ হইবে।

মহাপুরুষ কর্ত্তৃক সত্যানন্দ ধারণের উপমা কয়টী বড় সুন্দর। যদি মহতের সহিত ক্ষুদ্রের উপমা মার্জ্জনীয় হয়, তবে আমি আর একটী উপমা যোগ করিয়া বলিব "কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে ধরিলেন"। বাস্তবিক এই অংশের সহিত ভগবদ্গীতার বেশ একটু সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। প্রভেদ এই যে গীতায় ভগবান অর্জ্জুনকে আত্মীয়ের প্রতি বৃথা মমতা ত্যাগ ও স্বধর্ম্ম সাধনার্থ তাঁহাদিগকে যুদ্ধে বধ করিতে উপদেশ দিতেছেন। আনন্দমঠে কতকটা তদ্বিপরীত শিক্ষা, অর্থাৎ অনর্থক শোণিতপাত ও পরদ্বেষ ত্যাগ করিয়া স্বদেশের মঙ্গলার্থ বিজাতীয়ের সহিত সখ্য স্থাপন। একক্ষেত্রে তমোগুণাধিক্য নিরাকরণের জন্য রজোগুণের প্রয়োগ, অপর ক্ষেত্রে রজোগুণাধিক্য নিরাকরণের জন্য সত্ত্বগুণের প্রয়োগ। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই গুরু কর্ত্তৃক শিষ্যের মোহাপনয়ন ও জ্ঞানচক্ষুরুন্মীলনের প্রয়াস।

এই গেল আনন্দমঠের তিনটী স্তর—সর্ব্বোপরি শুভ্রফুল্লশতদলরাজিবৎ ইহার কাব্যস্তর, তন্নিম্নে অগাধ, স্বচ্ছ, মধুর, সন্তাপহারক, স্বদেশপ্রেমরূপ দ্বিতীয় স্তর, আর সর্ব্বনিম্নে সেই অর্জ্জুনের মোহাপহারক, নিষ্কাম, ধর্ম্মের শিক্ষক, শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা পরম পুরুষের স্বরূপ প্রতিবিম্বিত।

শ্রীমন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু সমাজ।*

১

হিন্দু সমাজে আজ মহাবিপ্লবের ঘোর অমানিশা! অজ্ঞান, ঈর্ষা, লোভ এবং অহঙ্কারের উন্মাদকর আবেগ—প্রলয়ের মেঘমালার ন্যায়—সমাজাকাশের এক প্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত নিবিড়ভাবে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। মধ্যে মধ্যে শক্তিশালী ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থ সংগ্রামের প্রবল ঝটিকায়—ভীম ঘাত প্রতিঘাতে—সমাজের শিথিলস্কন্ধ শাখা প্রশাখাগুলি ইতস্তত ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে। আর কোথায় কোন্ অন্ধকারে পড়িয়া শুকাইয়া যাইতেছে—তাহার ইয়ত্তা করে কে? করিবারি সামর্থ্যই বা কাহার আছে?

তাহার উপর আবার মধ্যে মধ্যে ভীষণ কোলাহলময় আত্মকলহের ভীম বজ্রাঘাতে সমাজের মূলভিত্তি পর্য্যন্ত কম্পিত হইয়া উঠিতেছে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া যাইতেছে—ভারতের বাহিরে—পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ – যেদিকেই চাহিনা কেন—সকলদিকেই অভ্যুদয়ের মঙ্গলময় সুপ্রভাত! সৌভাগ্য রবির স্বর্ণকিরণের উজ্জ্বল আলোকে নব নব অভ্যুদিত মনুষ্যসমাজের গৌরব গীতির মধুরধ্বনি!—কিন্তু কৈ? আমাদের সমাজের এই দুঃখ ও অশান্তিময় অমানিশার অবসানের কোন চিহ্নও ত এখনও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। কেন এমন হয়?—পৃথিবীর অন্যান্য মনুষ্যজাতি যাহা অনায়াসে করিতে পারে, আমরা তাহা কিছুতেই করিয়া উঠিতে পারি না কেন?—

আমার বিবেচনায় আমাদের সমাজের প্রকৃতি কি? তাহা ভাল করিয়া না জানিয়া সমাজ সংস্কারে প্রবৃত্ত হই বলিয়াই, আমরা এ পর্য্যন্ত আমাদের সমাজের কোন একটা সংস্কার কার্য্যেও পূর্ণমনোরথ হইতে পারিতেছিনা—অন্যান্য সভ্যজাতির সমাজ এবং আমাদের সমাজ একরূপ নহে সুতরাং অন্যান্য সভ্যজাতির সমাজ সংস্কারের যাহা পথ, সেই পথ আমরা অবলম্বন করিয়া যদি সমাজ সংস্কার করিতে উদ্যত হই, তাহা হইলে আমাদের সমাজের সংস্কার কিরূপে সাধিত হইবে?

বর্ত্তমান সকল সভ্যদেশেই সমাজ এবং ধর্ম্ম এই দুইটী পৃথক পদার্থ। একের সহিত অপরের নানাপ্রকার সম্বন্ধ থাকিতে পারে বটে, কিন্তু ঐ সকল সম্বন্ধ অপরিবর্ত্তনীয় নহে—আমাদের সমাজ এবং আমাদের ধর্ম্ম কিন্তু সেরূপ নহে। এক কথায় বলিতে গেলে ধর্ম্মই আমাদের সমাজের আত্মা। ধর্ম্মকে দূরে রাখিয়া যেমন অন্য দেশে সমাজসংস্কার সম্ভবপর আমাদের দেশে সেইরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই—এই ধর্ম্মরূপ জীবনের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া এ পর্য্যন্ত আমরা

* গীতাসভায় পঠিত।

যতপ্রকার সমাজসংস্কারের জন্ত প্রবৃত্ত হইয়াছি তাহার মধ্যে কোনটাতেই কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই এবং ভবিষ্যতে যে পারিব তাহারও সম্ভাবনা নাই।

যাঁহারা সমাজের নেতা, যাঁহাদের মতের উপর নির্ভর করিয়া সমাজের লোকসমূহ ঐহিক বা পারত্রিক কার্য্যকলাপের অনুষ্ঠান করে, তাঁহাদের মধ্যে ঐকমত্য ব্যতিরেকে সমাজের আবর্জ্জনা দূর করা যায় না—তাঁহারা একমত না হইলে সমাজের কোনপ্রকার অভ্যুদয়ের উপায় অবলম্বিত হইতে পারে না—ইহা সকলকেই মানিতে হইবে।

আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, এক্ষণে আমাদের সমাজের এইপ্রকার নেতা কে? হিন্দুসমাজ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উপর অবস্থিত সুতরাং বর্ণের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ, তাঁহারাই আমাদের সমাজের নেতা এইপ্রকার উত্তর—আমরা চিরদিনই শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ব্রাহ্মণের নেতৃত্বে কি বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ যথার্থ উন্নতির পথে পরিচালিত হইতেছে? আমার বিবেচনায় ব্রাহ্মণগণ বর্ত্তমানকালে আমাদের সমাজের প্রকৃতভাবে নেতৃত্ব করিতে পারিতেছেন না। বিষয়টা একটু ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করা যাক্।

এ সময়ে দেশে ব্রাহ্মণসম্প্রদায় দুইভাগে বিভক্ত—প্রথম ব্রাহ্মণপণ্ডিত সম্প্রদায়, দ্বিতীয় বিষয়ী ব্রাহ্মণসম্প্রদায়। ইঁহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ আমাদের সমাজের নেতা ইহা অধিকাংশ লোকেরই মত। কিন্তু তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে আমাদের সমাজের কি পরিমাণে নেতৃত্ব করিতেছেন ও করিতে সমর্থ-তাহাই একবার বিচার করিয়া দেখা যাক। প্রথমত দেখিতে হইবে যে নেতা হইতে গেলে সমাজ এবং সমাজের মূলভূত ধর্ম্মের তত্ত্ব যথাযথ জানিতে হইবে। বর্ত্তমান সময়ের যে সকল ব্রাহ্মণপণ্ডিত, তাঁহারা সকলেই কি আমাদের সমাজ এবং সমাজের মূলস্বরূপ হিন্দুধর্ম্মের তত্ত্ব যথাযথরূপে অবগত আছেন?—আমি বলিতে চাহি—আমাদের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ এক্ষণে যেভাবে শিক্ষিত হইতেছেন, তাহাতে তাঁহারা কিছুতেই আমাদের সমাজের এবং সমাজমূল হিন্দুধর্ম্মের তত্ত্ব যথাযথরূপে জানিবার অধিকারী হইতেই পারিতেছেন না। কেন যে পারিতেছেন না তাহাও বলি। ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের শিক্ষাস্থান হইতেছে চতুষ্পাঠী বা টোল। এই টোলগুলি আমাদের দেশে কি ভাবে পরিচালিত হয় এবং কি কি পুস্তক সেখানে কি ভাবে পঠিত হয়? তাহাও দেখা যাক্। ভারতের অন্তান্ত দেশের কথা এখানে বলিব না, আমাদের বঙ্গদেশের টোলের কথাই অগ্রে বলিব—এই বিশাল বঙ্গদেশে পঞ্চাশবৎসর পূর্ব্বে প্রায় প্রতি হিন্দুপল্লিগ্রামেই অন্তত একখানি টোল ছিল বলিলে বড় একটা অত্যুক্তি হয় না। এক্ষণে কিন্তু সে ভাবের যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এক্ষণে প্রতিগ্রামে টোল ত আকাশ কুসুম! একটী জিলার মধ্যে মোটের উপর ২০ খানি টোল এক্ষণে আছে কিনা সন্দেহ!

চব্বিশ পরগণা, নদীয়া, হুগলি, বিক্রমপুর, বরিশাল, মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমান—এই কয়টী জিলায় এখনও টোলের পরিমাণ কিছু অধিক হইলেও হইতে পারে কিন্তু ইহা ছাড়া অন্তান্ত জিলায় টোলের অবস্থা যে দিন দিন নিতান্ত শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে তাহা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট অবিদিত নহে।

এই কয়টী জিলার মধ্যে নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী, ত্রিবেণী, বিক্রমপুর ও বাকলা—এই কয়টী স্থানকে সমাজ স্থান কহে। কারণ এই সকল স্থানে পূর্ব্বে টোলের সংখ্যা খুব বেশী ছিল এবং এখনও এই সকল স্থানে অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যক টোল দেখিতে পাওয়া যায়। পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে এক্ষণে নবদ্বীপ ও ভট্টপল্লী—এই দুইটী সমাজই প্রধান বলিয়া পরিগণিত। পূর্ব্ববঙ্গে বিক্রমপুর ও বাকলা এই দুইটী সমাজই প্রধান। তবে পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গ এই উভয় ভাগেরই সর্ব্বপ্রধান সমাজ বলিলে এক্ষণে নবদ্বীপ এবং ভট্টপল্লী এই দুইটী সমাজই বুঝা যায়। সুতরাং নবদ্বীপ এবং ভট্টপল্লী এই দুইটী শীর্ষস্থানীয় সমাজের টোলগুলি কি ভাবে পরিচালিত হইতেছে, তাহা বুঝিলেই মোটামুটি সমগ্র বঙ্গেরই টোলগুলির প্রকৃতি অনেকটা বুঝিতে পারা যাইবে।

এই দুইটী স্থানেই ন্যায়শাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্রের টোলকে এখনও প্রধান টোল বলিয়া ধরা যায়। তাহা ছাড়া ব্যাকরণ, জ্যোতিষ এবং কাব্যশাস্ত্রেরও টোল আছে। সাংখ্য বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্র পাঠের জন্য পৃথক্ টোল স্থাপন করিবার প্রথা আমাদের দেশে নিতান্ত নূতন। গভর্ণমেণ্ট উপাধিপরীক্ষা স্থাপনের পূর্ব্বে সমগ্র বঙ্গদেশে এমন একখানি টোল ছিল না, যেখানে পৃথক্‌ভাবে সাংখ্য বা বেদান্তদর্শনের পাঠনা হইত। ইহার মধ্যে দেখিবার বিষয় এই যে হিন্দুধর্ম্মের মূলস্বরূপ বেদ বা মীমাংসাশাস্ত্র পড়াইবার জন্য কোন সমাজেও একখানি টোল নাই বা কখনও ছিল না।

যাহা হউক ন্যায়শাস্ত্র এবং স্মৃতি শাস্ত্রই এদেশের প্রধান শাস্ত্র বলিয়া বহুকাল হইতে প্রসিদ্ধ হইয়া আসিতেছে। এখনও এদেশে নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণ সর্ব্বোচ্চ বিদায় পান। বিশেষ প্রাচীন ও বড় গোছের স্মার্ত্তপণ্ডিত না হইলে কেহই নৈয়ায়িক পণ্ডিতের তুল্য বিদায় বা সম্মান পান না। ইহার মধ্যে যাঁহারা ন্যায়শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করেন, টোলের নিয়মানুসারে ধারাবাহিকরূপে অন্তত তিনি দশ বৎসর কাল অধ্যয়ন করিতে বাধ্য। ন্যায় শাস্ত্রের টোলে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে তাঁহার ব্যাকরণ এবং কাব্যের সাধারণ জ্ঞান থাকিলেই যথেষ্ট! সেই জ্ঞানটুকু লাভ করিতে হইলে টোলের নিয়মানুসারে অন্তত ছয় বৎসর অতিবাহন করিতে হয়। আট বৎসর বয়সে বিদ্যারম্ভ করিয়া এই ষোল বৎসরকাল টোলে পাঠান্তে একজন ব্রাহ্মণসন্তান কৃতকার্য্য হইলে নৈয়ায়িক পদবী লাভ করিতে পারেন। মোট দাঁড়াইতেছে যে ২৪শ বৎসর বয়ঃক্রমের কমে এক জন নৈয়ায়িক হওয়া কোনরূপে সম্ভবপর নহে। অবশ্য কোন কোন অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ বালকের পক্ষে ইহা অপেক্ষা কিছু অল্প কালেও ন্যায়শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যলাভ অসম্ভব নহে—কিন্তু এরূপ স্থল অতি বিরলই দেখিতে পাওয়া যায়।

এক্ষণে দেখা যাক এইরূপ ন্যায়শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য হইলে হিন্দুধর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞান কতদূর হওয়া সম্ভব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ন্যায়শাস্ত্র পাঠের পূর্ব্বে সাধারণভাবে কাব্য ও ব্যাকরণের জ্ঞান আবশ্যক। তাহা ছাড়া ন্যায়শাস্ত্রের যে কয়খানি পুস্তক টোলে পড়াইবার নিয়ম আছে তাহাতে হিন্দুধর্ম্ম বা সমাজসম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় অতি যৎসামান্যই আছে। অনুমান করিতে হইলে যাহা জানা আবশ্যক অর্থাৎ পক্ষ, হেতু ও সাধ্য কাহাকে বলে? হেতুর সহিত সাধ্যের

সম্বন্ধ কিপ্রকার? কিরূপ হেতু দুষ্ট? বাদির সহিত তর্ক করিতে যাইয়া কিরূপভাবে নিজের পক্ষ সাজাইতে হয়? এইরূপ কতকগুলি শুষ্ক তর্কের বিষয় ছাড়া আমাদের দেশের ন্যায়-শাস্ত্রের টোলে আজকাল হিন্দুধর্ম্ম বা হিন্দু সমাজসম্বন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য কোন তত্ত্বের বিশেষ উপদেশ হয় না। আত্মার অমরত্ব, পরলোক, পুনর্জ্জন্ম প্রভৃতি ধর্ম্মসংক্রান্ত গুরুতর বিষয়-গুলির কথঞ্চিৎ আলোচনা ন্যায়শাস্ত্রের টোলে হইলেও যে সকল গ্রন্থে ঐ সকল বিষয় প্রধান ও বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইতেছে—দুর্ভাগ্য-ক্রমে বঙ্গের চতুষ্পাঠীতে ঐ সকল গ্রন্থগুলির অধ্যাপনা এখন একেবারে হয় না বলিলেও বড় একটা অত্যুক্তি হয় না। আত্মতত্ত্ববিবেক, বাৎস্যায়ন ন্যায়সূত্র ভাষ্য, ন্যায়বার্ত্তিক তাৎপর্য্য টীকা প্রভৃতি প্রাচীন ন্যায়ের গ্রন্থগুলি বঙ্গদেশে সম্প্রতি অপ্রচলিত গ্রন্থের মধ্যে পরিগণিত। কেবল অনুমানখণ্ড ও শব্দখণ্ডের শুষ্ক তর্ক বহুল বাগাড়ম্বর পূর্ণ কয়েকখানি গ্রন্থ পড়িয়া অপরের দুর্ব্বোধ্য ভাষায় সভায় বিচার করিবার শক্তি অর্জ্জন করিতে পারিলেই বঙ্গদেশে এখন প্রধান ব্রাহ্মণপণ্ডিত হইতে পারা যায়। এই প্রকার বড় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইলেই যদি হিন্দুধর্ম্মের নেতা হওয়ার অধিকার পাওয়া যায়, তাহা হইলে হিন্দু ধর্ম্মের চরম অবনতির দিন যে অতি নিকটবর্ত্তী হইয়াছে তাহা কে অস্বীকার করিবে? নৈয়ায়িকের কথা আপা-তত ছাড়িয়া স্মার্ত্তের কথা আলোচনা করা যাক্। অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন যে বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের সমস্ত ব্যবস্থাই আমাদের দেশের স্মার্ত্তপণ্ডিত-গণের প্রধান অবলম্বন বলিয়া কথিত আছে। দিল্লীর সিংহাসনে যখন পুণ্যাত্মা সম্রাট্ আকবর বিরাজমান ছিলেন—সেই সময়ে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য নবদ্বীপে তাঁহার নিবন্ধগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সেই সময়ে নবদ্বীপ এবং তাহার চতুর্দ্দিকের সমাজে স্থানে স্থানে হিন্দুদিগের মধ্যে যে সকল আচার এবং ক্রিয়াকলাপ বহুবাদি-সম্মত ভাবে প্রচলিত ছিল সেই সকল আচার এবং ক্রিয়া কলাপগুলি যে ঋষিগণের অনু-মোদিত অর্থাৎ তাহা বেদ বা বেদমূলক শাস্ত্র-দ্বারা অনুমোদিত—তাহাই প্রমাণ ও যুক্তির দ্বারা ব্যবস্থাপন করিবার জন্যই রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিনিবন্ধ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। রঘুনন্দনের স্মৃতিনিবন্ধ গ্রন্থ, তাহা ছাড়া তৎপূর্ব্ববর্ত্তী নিবন্ধ-কার শূলপাণি এবং জীমূতবাহন কৃত আরও কয়েকখানি স্মৃতিনিবন্ধ—ইহাই হইল বঙ্গের বর্ত্তমান কালে স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণের উপজীব্যগ্রন্থ। এই কয়খানি গ্রন্থে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, হিন্দুর পক্ষে তাহা ছাড়া অন্য কোন প্রকার কর্ত্তব্য আছে—একথা স্বীকার করিতে আমাদের দেশের বর্ত্তমান স্মার্ত্তসম্প্রদায় একে-বারেই নারাজ। আবার এই কয়খানি নিবন্ধ-গ্রন্থে যাহা নিষিদ্ধ বলিয়া ব্যবস্থাপিত হইয়াছে তাহা কখনও কাহারও পক্ষে কর্ত্তব্য হইতে পারে একথা তাঁহারা কিছুতেই মুখে স্বীকার করি-বেন না। অথচ সমাজে প্রতিক্ষণ তাঁহাদের চক্ষুর সম্মুখে সুস্পষ্ট দিবালোকে কত কার্য্য চলিয়া যাইতেছে যাহার কর্ত্তব্যতা বিষয়ে রঘু-নন্দন, শূলপাণি বা জীমূতবাহন কিছুই উল্লেখ করেন না, আবার তাঁহারা যে সকল কার্য্য করিলে হিন্দুর হিন্দুত্ব পর্য্যন্ত লোপ পায় বলিয়া স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই সকল কার্য্য নিঃসঙ্কোচে সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তিই অনুষ্ঠান

করিতেছে। কৈ স্মার্ত্তপণ্ডিতগণ ঐ সকল কার্য্যে কোন প্রকার আপত্তি করিতেছেন না কেন? জিজ্ঞাসা করি এই যে কৌলীন্যপ্রথা যাহার প্রভাবে কুলমর্য্যাদা রক্ষার জন্য অতি অল্পকাল পূর্ব্বে সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ ললনা জীবনে একবারও পতিমুখ দেখিবার আশা হৃদয়ে স্থান দিতে পারিত না, এই কৌলীন্যপ্রথা আমাদের কোন্ ধর্ম্মশাস্ত্র সম্মত?—কুলীনের সন্তান সন্ধ্যা জানুক বা নাই জানুক, সুরাপানে তাহার অণুমাত্রও আপত্তি না থাকুক, মা সরস্বতীর সহিত তাহার পুরুষপরম্পরাক্রমে মুখ দেখা দেখি নাইবা থাকুক, সকল প্রকার অনাচারের সে সমুজ্জল দৃষ্টান্ত হউক না কেন, তবু তাহারই হস্তে সোণারপ্রতিমা কন্যাকে সম্প্রদান করিতেই হইবে। যাহার কুল নাই এমন পাত্র যদি সর্ব্বগুণে গুণবান্ হয়, সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী হয়, তবুও তাহার হস্তে কন্যা দান কখনই হইতে পারে না—তাহা হইলে যে সর্ব্বনাশ! কৌলীন্য ভাঙ্গিবে! তাহা প্রাণ থাকিতে দেখিতে পারিব না! এইরূপ অন্যায় অবিচার শত শত বৎসর হইতে আমাদের সমাজে চলিয়া আসিতেছে? কৈ দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যাপকগণ একদিনের জন্য সমবেত হইয়া এই কুপ্রথা রহিত করিবার জন্য এ পর্য্যন্ত কোন চেষ্টা করিয়াছেন, ইহা কি কেহ বলিতে পারেন? জিজ্ঞাসা করি, এই যে সর্ব্বনাশকর কৌলীন্য প্রথা, ইহা কোন্ সময়ে এদেশে প্রচার লাভ করিয়াছিল? ইংরাজিশিক্ষা বা ইংরাজ যখন এদেশে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই —যে সময় জীমূতবাহন, শূলপাণি, রঘুনন্দন, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, লক্ষ্মীকান্ত ন্যায়পঞ্চানন প্রমুখ ধর্ম্মশাস্ত্রের অবতারকল্প পণ্ডিতগণ দেশের ধর্ম্ম ও সমাজের নেতা ছিলেন সেই সময় হইতেই ত আমাদের সমাজে এই জঘন্য প্রথা প্রবল হইয়া আসিতেছে—আজ যে এই দুরন্ত কৌলীন্য প্রথার প্রতি লোকের শ্রদ্ধা কমিতেছে—ইহা কি স্মার্ত্তব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের প্রভাবে, না, পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসাদলব্ধ বিবেক এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বর্দ্ধনশীল দারিদ্র্য ইহার উচ্ছেদের পথকে প্রশস্ত করিয়া দিতেছে? চারিদিকে চাহিয়া দেখুন কি দেখিবেন? প্রতিদিন সমাজ নূতন নূতন কার্য্য করিতেছে, প্রতিদিন প্রাচীন নিয়মগুলির মধ্যে একটী না একটীর মস্তকে সগর্ব্বে পদাঘাত করিতেছে—ইহা কি দেশের স্মৃতিশাস্ত্রবিদ্‌গণের অবিদিত? রেলপথে ভ্রমণকালে যবনের সহিত একাসনে বসিয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে কত ব্রাহ্মণ বৈদ্য ও কায়স্থ সন্তান কতপ্রকার অখাদ্য ভক্ষণ করিতেছে—ইহা কি সমাজ জানে না? জিজ্ঞাসা করি এইপ্রকার কদাচার কোন্ হিন্দুশাস্ত্রের অনুমোদিত? কোন্ সংহিতাকার ঋষি এইপ্রকার জঘন্য আচারকে অনুমোদন করিয়াছেন? এই সকল অসদাচারীকে দণ্ডিত করিবার জন্য দেশের স্মার্ত্তসম্প্রদায় এ পর্য্যন্ত কোনপ্রকার চেষ্টা করিয়াছেন কি? এই যে বঙ্গের প্রতি নগরের প্রতি গণ্ডগ্রামের পানের দোকানে বা মুদির দোকানে প্রত্যহ ডজন ডজন সোডা লিমোনেড বিকাইতেছে, ইহার ক্রেতা কে? কয়জন ব্রাহ্মণ বৈদ্য বা কায়স্থ বলিতে পারেন যে এই অমেধ্য অস্পৃশ্য পানীয় দ্রব্য আমি স্পর্শ করি না, বা, যে যে ইহার ব্যবহার করে আমি তাহার সহিত সামাজিক সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়াছি বা করিতে প্রস্তুত আছি? কৈ? দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থাপকগণ এই অসৎ প্রথাকে নিবারণ করিবার

জন্ত এ পর্য্যন্ত কি চেষ্টা করিয়াছেন বা করিতে প্রস্তুত আছেন ?

আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যবস্থাপকগণের মতানুসারে চলিতে হইলে প্রত্যেক দ্বিজকে প্রত্যহ রীতিমত তিনটী সন্ধ্যার অনুষ্ঠান করিতে হয় ও পঞ্চযজ্ঞের সমগ্র অনুষ্ঠান করিতে হয়। প্রত্যেক মৃতপিতৃক ব্যক্তিকে মাসে অন্তত একটী পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিতে হয়, অশৌচান্ত দিনে প্রত্যেকের মস্তক মুণ্ডন করিতে হয়, অশৌচকালে ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন করিতে হয়, মৎস্য মাংস বর্জ্জন করিতে হয়, প্রত্যহ পঞ্চদেবতার পূজা করিতে হয়, যবন বা ম্লেচ্ছ স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হয় ইত্যাদি ইত্যাদি—ইহা সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য ধর্ম্ম। ইহার মধ্যে কোন একটীকে একেবারে পরিত্যাগ করিলে হিন্দুর হিন্দুত্ব বিলোপ পায়। আমি জিজ্ঞাসা করি বিষয়ী হিন্দুর কথা দূরে থাক্, কয়জন ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আজকাল এই সকল নিয়ম বিশ্বাসের সহিত যথাযথভাবে প্রতিপালন করিতে পারিতেছেন ? শতকরা পাঁচজন ব্রাহ্মপণ্ডিতও যদি সকলের সমক্ষে দাঁড়াইয়া পরমাত্মাকে সাক্ষী করিয়া বলিতে পারেন যে আমি যথাযথভাবে এই সকল নিয়ম প্রতিপালন করিতেছি—তাহা হইলে আমি বিবেচনা করিব যে আমাদের দেশে এখনও সত্যযুগ বর্ত্তমান। ইহা ছাড়া পাপ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিবার যেরূপ ব্যবস্থা আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে, সেই অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত যে এক্ষণে আমাদের সমাজে শতকরা নিরানব্বইজন পাপী করে না—তাহা কোন্ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অবিদিত আছে ? কেন যে প্রকৃতরূপে পাপের প্রায়শ্চিত্ত এখন হয় না তাহাও বলি—ধর্ম্মশাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে যে একবার জানিয়া শুনিয়া গ্রাম্য কুক্কুট ভক্ষণ করিলে ব্রাহ্মণের দুইটী প্রাজাপত্য ব্রতরূপ প্রায়শ্চিত্ত এবং পুনঃসংস্কার করিতে হয়।

প্রাজাপত্যব্রত কি তাহাও বলি—

ত্র্যহং প্রাতস্ত্র্যহং সায়ং ত্র্যহমদ্যাদযাচিতম্
ত্র্যহং পরং চনাশ্নীয়াৎ প্রাজাপত্যং চরন্ দ্বিজঃ।

ইহার অর্থ এই যে—প্রাজাপত্যব্রত করিতে হইলে তিনদিন প্রথমে দিবসেই নিয়মিত ভোজন করিতে হইবে—রাত্রিতে কিছুই খাইবে না; তাহার পর তিনদিন রাত্রিতেই একবার ভোজন করিবে—দিবসে কিছুই খাইবে না; তাহার পর তিনদিন একবার করিয়া আহার করিবে কিন্তু নিজের বা আত্মীয়ের দ্রব্য খাইবে না—যদি কেহ অযাচিত ভাবে কোন খাবার দ্রব্য দেয় তবে তাহাই একবারমাত্র ভোজন করিবে; তাহার পর তিনদিন্ একেবারে উপবাস করিয়া কাটাইবে অর্থাৎ কিছুই খাইবে না।

এই ত প্রাজাপত্য ব্রত। ইহার উপর আবার অন্যূন দশজন ব্রাহ্মণভোজন করান—একটী পার্ব্বণ শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান এবং যথাশক্তি দক্ষিণা প্রভৃতি প্রায়শ্চিত্তের অবশ্য কর্ত্তব্য অঙ্গগুলিরও অনুষ্ঠান করিতে হইবে। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি আমাদের সমাজে একেবারে যে কুক্কুটভোজী ব্রাহ্মণ নাই ইহা বলিবার যো নাই, কিন্তু কয়জন কুক্কুটভোজী ব্রাহ্মণ এ পর্য্যন্ত এইপ্রকার প্রাজাপত্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন ? অবশ্য শাস্ত্রেবিহিত আছে যে মুখ্যকল্পে প্রায়শ্চিত্তের বিধান যে করিতে অসমর্থ—তাহার পক্ষে গৌণকল্পে অনুষ্ঠান করিলেও চলে। আচ্ছা সেই গৌণকল্পটা কি ? শাস্ত্রেই বলিতেছে যে—

প্রাজাপত্য ব্রতাশক্তৌ ধেনুদদ্যাৎ পয়স্বিনীম্।

প্রাজাপত্যব্রত করিতে যে ব্যক্তি অসমর্থ

সে একটী দুগ্ধবতী গাভী দান করিবে। সকলেরই ঘরে সকল সময় যে দানের যোগ্য একটী দুগ্ধবতী গাভী থাকিবে, তাহা ত সম্ভব নহে। সেই স্থলে কি কর্ত্তব্য তাহাও শাস্ত্র বিধান করিতেছেন যে—

ধেনুঃ পঞ্চভিরাঢ্যানাং মধ্যানাং ত্রিপুরাণিকী।
কার্ষাপণৈক মূল্যা হি দরিদ্রাণাং প্রকীর্ত্তিতা।

অর্থ এই যে যাহারা ধনী তাহাদের পক্ষে ধেনুমূল্য পাঁচকাহন কড়ি, মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষে তিনকাহন কড়িই একটী ধেনুর মূল্য হইতে পারে এবং দরিদ্র ব্যক্তির পক্ষে ধেনুর পরিবর্ত্তে এক কাহন কড়ি দিলেও চলিতে পারে।

এক কাহন কড়ির মূল্য বর্ত্তমান সময়ের একটী সিকি সুতরাং শাস্ত্রবিহিত নিয়মানুসারে ধনী হিন্দু যদি জ্ঞান পূর্ব্বক গ্রাম্যকুক্কুট উদরসাৎ করেন, তাহা হইলে তিনি একজন ব্রাহ্মণকে পাঁচ সিকা বা আড়াইটী করিয়া টাকা দান করিতে পারিলে এবং পুনঃসংস্কারের জন্য সাড়ে বাইশ কাহন কড়ি দিতে পারিলেই পাপ হইতে খালাস। বর্ত্তমান কালে এই জাতীয় প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান দ্বারা হিন্দুসমাজের পাপের মাত্রা কমাইতে যাঁহারা চাহেন তাঁহারা অদ্বিতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রবিদ্ দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হইতে পারেন হউন, তাহাতে বড় একটা কিছু আসে যায় না। কিন্তু তাঁহাদের মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান যে কিছুই নাই তাহা বলিতে আমি অণুমাত্রও কুণ্ঠিত নহি। আমাদের সমাজে যাহাদের মাসিক আয় হাজার টাকার কম নহে তাহারা যদি প্রত্যহ গ্রাম্য কুক্কুট ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে তাহার আমরা কি শাস্তি করিতে পারি? প্রতিদিন প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ২৷৷৹ টাকা দান করিতে পারিলেই সে পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। তাহাকে ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে সমাজে লইয়া ব্যবহার করিতেও কোন বাধা নাই। মাসান্তে একবার ৭৫ টাকা দান, সাড়ে বাইস কাহন কড়ি উৎসর্গ এবং দশজন ব্রাহ্মণভোজন করাইতে পারিলেই তাহার নিষ্কৃতি হইল! এইত গেল যে প্রায়শ্চিত্ত করিবে তাহার কথা, যে কিন্তু একেবারে প্রায়শ্চিত্ত করিতেই চাহে না অথচ আমরা নিঃসন্দিগ্ধভাবে জানি যাহার বাটীতে উইলসন্ সাহেবের হোটেলের খানা বাবুর্চ্চি মহাশয়ের শিরোদেশে চাপিয়া মাসের মধ্যে অন্তত ১০।১২ দিন সম্মানের সহিত প্রবেশ লাভ করে—সেই হিন্দুপ্রবর যখন গরদের জোড় পরিয়া নিজেরই তুল্যধর্ম্মাক্রান্ত স্বর্গীয় পিতার শ্রাদ্ধে রূপার যোড়শ দান করেন, তখন তাঁহার বাটীতে নিমন্ত্রণ পত্র না পাইলে কোন্ বিদায়জীবি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পৃথিবীকে অন্ধকারময় না দেখেন? আমরা ধর্ম্মের ঠাট বজায় রাখিবার জন্য কেবল জিদ করিতেছি মাত্র কিন্তু যাহার নাম প্রকৃত ধর্ম্ম তাহার মস্তকে পদাঘাত করিবার জন্য অণুমাত্রও কুণ্ঠিত হইতেছি না—এই প্রকার কাপট্যপূর্ণ ব্যবহারে হিন্দুসমাজ উৎসন্ন যাইতেছে। তাহার প্রতিকারের জন্য কোন চেষ্টাই হইতেছে না—পরে যে হইবে এ পর্য্যন্ত তাহার কোন চিহ্নও দেখিতেছি না।

সুতরাং দেখিতে পাওয়া গেল যে বর্ত্তমান সময়ে আমাদের টোলের শিক্ষিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সম্প্রদায় যে ভাবে চলিতেছেন তাহাতে তাঁহাদের দ্বারা আমাদের সমাজ ও ধর্ম্মের যে সংস্কার হইবে তাহার আশা সুদূরপরাহত! সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুধর্ম্মের কি প্রকৃতি ছিল, বৌদ্ধযুগের প্রবল সংঘর্ষে ধর্ম্মের কোন্

ভাবে কিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে—মুসলমান সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ের সঙ্গে হিন্দুর জাতীয় স্বাধীনতা বিধ্বস্ত হইবার পর হিন্দুধর্ম্ম কি ভাবে এ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে—এই সকল ঐতিহাসিক ব্যাপারগুলি বিস্তৃত ও বিশদ ভাবে না জানিয়া ব্রাহ্মণপণ্ডিত সমাজ যদি হিন্দু সমাজের নেতৃত্ব করিতে চাহেন, তাহা হইলে শিক্ষিত হিন্দুসমাজ তাহাদের নেতৃত্ব কেন স্বীকার করিবে? ইহা কি দেশের গণ্যমান্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ একবারও ভাবিয়া থাকেন? ৩০০।৪০০ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুসমাজ ও ধর্ম্মের যে চিত্র আমরা স্মৃতিনিবন্ধকারগণের গ্রন্থে দেখিতে পাই সেই চিত্রানুসারেই বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎ হিন্দু সমাজ বা ধর্ম্ম চলিতেছে বা চলিবে—এই প্রকার বুদ্ধির সাহায্যে যাঁহারা এদেশের হিন্দুত্ব বজায় রাখিয়া সমাজ সংস্কার করিতে চাহেন—তাঁহাদের সাহস প্রশংসনীয় হইতে পারে কিন্তু তাঁহাদের অভীষ্ট সিদ্ধি কোন দিন হইতেই পারে না।

পশ্চিম জগতের একটী সুসভ্য জাতি যে দিন হইতে আমাদের ভাগ্যচক্রের প্রবর্ত্তক হইয়া বসিয়াছেন, সেই দিন হইতেই হিন্দুসমাজ ও হিন্দুধর্ম্মের ঘোরতর পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা নূতন নূতন অভাব এবং নূতন নূতন আকাঙ্ক্ষা সামাজিক জীবনে প্রত্যহ জাগাইয়া দিতেছে। এদিকে সমাজের কেন্দ্র শক্তির অভাব হওয়াতে সমাজও দিন দিন লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছে। দুর্ম্মূল্য অন্নের দুরন্ত ভাবনায় পড়িয়া সমাজ কি ভাল কি মন্দ তাহা বুঝিতে পারিতেছে না। তাহার উপর নিত্য নিত্য নূতন নূতন রোগ জীর্ণ সমাজের চরম বিধ্বংসের পথকে ক্রমেই প্রশস্ত-তর করিতেছে—এই ভয়ঙ্কর দুর্দ্দিনে সমাজকে রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করিতে হইলে নেতৃগণের যে শিক্ষা ও শক্তির একান্ত আবশ্যকতা সেই শিক্ষা ও শক্তি (বড়ই দুঃখের বিষয়!) আমাদের দেশের সরল প্রকৃতি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ বহুকাল হইতে হারাইয়া বসিয়াছেন। তাঁহাদের দ্বারা সামাজিক সংস্কারসাধন করিবার জন্য এখন চেষ্টা করা বিড়ম্বনামাত্র। আজ যদি আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে মিলিয়া আমাদের টোলে শিক্ষাপ্রণালীর আমূলসংস্কার করিতে পারি, পাশ্চাত্য শিক্ষার যাহা কিছু ভাল সে সকলই গ্রহণ করিয়া সেইগুলিকে হিন্দুত্বের ছাঁচে ঢালিয়া লইতে পারি, সেই সঙ্গে আমাদের প্রাচীন ইতিহাস, বিজ্ঞান, ধর্ম্মশাস্ত্র, জ্যোতিষ, বেদ সংহিতা, ব্রাহ্মণ, কল্পসূত্র, ধর্ম্মসংহিতা, পুরাণ, চিকিৎসাশাস্ত্র ও বাণিজ্য নীতি, কৃষি, স্থাপত্য ও শিল্প বিস্তার প্রচুর পরিমাণে প্রচার করিবার জন্য আমাদের টোলগুলির আমূল সংস্কার সাধন করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের আশা পূর্ণ হইতে পারে—নচেৎ নহে। সেই পুনঃসংস্কৃত টোল হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া যে সকল কর্ম্মবীর চরিত্রবান্ ত্যাগী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ দেশের সমাজ এবং ধর্ম্মের প্রকৃত নেতৃত্ব ভার গ্রহণ করিবেন তাঁহাদের হস্তেই এই অধঃপতিত সমাজের পুনঃপ্রাণপ্রতিষ্ঠার ভার, সমাজ নিঃসঙ্কোচে অর্পণ করিতে পারিবে এবং তাঁহাদের নিঃস্বার্থ পরিশ্রমের সাহায্যে আবার এই ভারতে নূতন হিন্দু সমাজ গঠিত হইবে। আবার তখন পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, হিন্দু সভ্যতার গৌরবগীতিতে মুখরিত হইতে থাকিবে—ইহাই আমার হৃদয়ের চিরপোষিত

আশামরীচিকা! এবং ইহাই আমার আন্তরিক বিশ্বাস।

আমাদের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সম্প্রদায় যে পর্য্যন্ত এই ভাবে গঠিত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ না করিতেছেন, সেই পর্য্যন্ত কি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কি বিষয়ী হিন্দু, কোন সম্প্রদায়ের লোকের দ্বারাই যে আমাদের সমাজের অভ্যুদয় সাধিত হইতে পারে না—সে বিষয়ে আমার অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে এক্ষণে তবে আমাদের কর্ত্তব্য কি? আমার বিবেচনায় আমাদের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য এই যে হিন্দু সমাজ ও হিন্দু ধর্ম্মের যথাযথ তত্ত্ব কি তাহা সাধারণকে অতি সরল ভাবে বুঝাইয়া দেওয়া। ইহা বুঝাইতে হইলে হিন্দু সমাজ ও ধর্ম্মের প্রকৃত ইতিহাস প্রণয়ন করিতে হইবে। সহস্র সহস্র বৎসর হইতে হিন্দু সমাজ এবং হিন্দু ধর্ম্মের আকৃতি ও প্রকৃতি কিরূপ ভাবে পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত, প্রসারিত বা ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, তাহা ইতিহাসের সাহায্যে আবিষ্কার করিয়া সাধারণের মানসপটে আমরা যে পর্য্যন্ত ভাল করিয়া অঙ্কিত করিতে না পারিব সে পর্য্যন্ত হিন্দুধর্ম্মের বা হিন্দু সমাজের প্রকৃতি ও গতি সম্বন্ধে আমরা কিছুতেই এক মত হইতে পারিব না। আবার ঐকমত্য না থাকিলে কোন কাযই হইবে না।

এক্ষণে আমাদের দেশে দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধ দল হইয়া পড়িয়াছে। প্রথম দলের পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবক ও মধ্যবয়স্কগণ ক্রমেই পুষ্টি লাভ করিতেছে; দ্বিতীয় দলই দেশের অশিক্ষিত সাধারণ দল, গুরুপুরোহিত এবং অধ্যাপক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ এই তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম দল দ্বিতীয় দলকে অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাপন্ন বলিয়া অবজ্ঞার সহিত দেখিয়া থাকে। দ্বিতীয় দলের নেতাগণ আবার প্রথম দলকেই বিকৃতমস্তিষ্ক, ম্লেচ্ছভাবাপন্ন ও অবিশ্বাসী ভাবিয়া হিন্দুসমাজ হইতে ছাঁটিয়া ফেলিবার যোগ্য বিবেচনা করিয়া থাকেন এবং নিজেরাই সর্ব্বপ্রকারের নেতা হইতে চাহেন। এই দুই দলের মধ্যে কিন্তু এমন লোক অতি অল্পই আছেন যাঁহারা এই যুগযুগান্তরব্যাপী বিরাটকল্পহিন্দু ধর্ম্মের যথার্থ মূর্ত্তিকে ইতিহাস রূপ শক্তিসম্পন্ন নেত্রের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইয়াছেন; সমর্থ না হইবার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল তাঁহাদের পড়াশুনার অল্পতামাত্র।

এদিকে প্রথম দলের যাঁহারা নেতা হইতে প্রস্তুত, তাঁহারা ইংরাজিই অধিক পরিমাণে জানেন—সংস্কৃত অল্পই জানেন। স্বার্থের নানাবিধ তাড়নায় হিন্দুশাস্ত্রের অল্পবিস্তর পুস্তক দেখিয়া নিজের স্বভাবসুলভ কল্পনার সাহায্যে অধিকাংশ ইউরোপীয় সংস্কৃত বিজ্ঞগণ হিন্দুধর্ম্মের বা হিন্দুসমাজের যে অসম্পূর্ণ বা বিকৃত মূর্ত্তি চিত্রিত করিয়া জগতে প্রচারিত করিয়াছেন বা করিতেছেন, আমাদের নব্য পাশ্চাত্য শিক্ষিত নেতাগণ সেই চিত্রকেই অনেক স্থলে আদর্শ জ্ঞান করিয়া তদনুসারেই সমাজের ও ধর্ম্মের সংস্কার করিতে উদ্যত হইতেছেন। কাযে কাযেই তাঁহাদের এই উদ্যমকে দ্বিতীয় দলের নেতৃবৃন্দ কিছুতেই বিশ্বাসের সহিত অনুমোদন করিতে পারিতেছেন না, আবার এই প্রকার বিশ্বাস করাও যে সমীচীন তাহা কেহই বলিতে সাহস করে না। অন্যদিকে দ্বিতীয় দলের নেতৃবৃন্দ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সম্প্রদায় সংস্কৃত ভাষায়

অভিজ্ঞ হইলেও হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের প্রাচীন ইতিহাসের বাস্তবিকই কোন খবরই রাখেন না—বা রাখিবার জন্য চেষ্টাও করিতেছেন না—একথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয় এই কথা শুনিয়া আমার প্রতি অত্যন্তই কুপিত হইবেন কিন্তু সত্যের অনুরোধে পড়িয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে বাধ্য হইতে হইতেছে দেশের কয়জন গণ্যমান্য প্রাচীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ঋগ্বেদসংহিতা হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র বৈদিক গ্রন্থগুলি তাঁহাদের এই দীর্ঘকালব্যাপী জীবনের মধ্যে একবারমাত্র পাঠ করিতে সমর্থ হইয়াছেন? কয়জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বুকে হাত দিয়া বলিতে পারেন আমি সমগ্র মহাভারত, রামায়ণ এবং সকল পুরাণ ও ধর্ম্ম-সংহিতাগুলি (অবশ্য যাহা পাওয়া যায়) পাঠ করিতে পারিয়াছি? হিন্দুধর্ম্মের মূল হইল বেদ—সেই বেদার্থ জ্ঞানের একমাত্র উপায় পূর্ব্বমীমাংসাশাস্ত্র; জিজ্ঞাসা করি, এই বিশাল বঙ্গদেশে কয়জন ব্রাহ্মণপণ্ডিত সমগ্র শবরভাষ্য ও কুমারিলের বার্ত্তিক পড়িয়া মীমাংসাদর্শন বুঝিয়া বেদের কর্ম্মকাণ্ড বুঝিবার চেষ্টা আজ পর্য্যন্ত করিতে পারিয়াছেন? এই ত হইল আমাদের দেশের দ্বিতীয় দলের নেতৃবৃন্দের শাস্ত্রীয়গ্রন্থের অধ্যয়ন। এই জাতীয় নেতাগণ যদি বলেন আমি যাহা কর্ত্তব্য বলিব—তাহাই হিন্দুর কর্ত্তব্য আর আমি যাহা অকর্ত্তব্য বলিব তাহা করিলে হিন্দুর হিন্দুত্ব যাইবে, তাহা হইলে তাঁহাদের উপর নির্ভর করিয়া ঐহিক এবং পারত্রিক বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকা অজ্ঞ কৃষক বা মুটের কর্ত্তব্য হইতে পারে। যাহার একটুও আত্মজ্ঞান আছে—এমন হিন্দু সন্তান কি করিয়া তাঁহাকে হিন্দুসমাজের নেতার পদে বরণ করিবে—তাহা আমি কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি না।

অবশ্য ব্রাহ্মণপণ্ডিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও জনকয়েক প্রাচীন মহাত্মা স্বীয় চরিত্র এবং বিদ্যাবত্তার প্রভাবে আমাদের সমাজের শীর্ষস্থান অলঙ্কৃত করিয়া রহিয়াছেন—এখনও সমাজের বহুতর লোক তাঁহাদের আদেশ শ্রদ্ধার সহিত মস্তকে বহন করিতেছে কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহাদের গুরু-ভার বহন করিবার জন্য সমর্থ নূতন দল তাঁহাদের ন্যায় উৎসাহ, চরিত্র ও বিদ্যাবত্তার সহিত কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছেন না। এই কারণে দ্বিতীয় দল ক্রমেই সমাজে শক্তি-হীন হইতেছেন এবং সেই পরিমাণে প্রথম দল দিন দিন সমধিক পরিমাণে শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছেন। ইহার ফল যে কি হইবে তাহা ভাবিয়া দেশের আস্তিক সম্প্রদায়ের যেরূপ প্রতিবিধান কর্ত্তব্য তাহা হইয়া উঠি-তেছে না। ইহা স্বজাতিপ্রেমিক হিন্দুসন্তানের পক্ষে বড় কম ভাবিবার বিষয় নহে।

এই দুইটি দলের মধ্যে এইরূপ পরস্পর বিদ্বেষ ও অবিশ্বাস সমাজের পক্ষে কখনই শুভকর হইবে না। এই দুইটি দলই যাহাতে পরস্পর মিলিত হইয়া ঐকমত্য সহকারে সমাজের মঙ্গলের জন্য উপায়ের আবিষ্কার ও অনুষ্ঠান করিতে পারেন তাহার চেষ্টাই সর্ব্বাগ্রে আমাদের কর্ত্তব্য।

এই দুই দলেরই জানা উচিত যে আমাদের সমাজ বা আমাদের ধর্ম্ম জগতের অন্যান্য সভ্যজাতির সমাজ এবং ধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আত্মার অমরত্ব এবং পুনর্জ্জন্মের প্রতি

দৃঢ়বিশ্বাসই আমাদের ধর্ম্মের সুদৃঢ়ভিত্তি। যে জাতীয় জ্ঞান বা কর্ম্মের অবলম্বন করিলে এই দৃঢ়ভিত্তি শিথিল হইবার সম্ভাবনা আছে সেই জাতীয় জ্ঞান এবং কর্ম্মের প্রসার যাহাতে আমাদের সমাজে না হয় তাহার জন্ম আমাদিগকে সর্ব্বদাই প্রযত্নপর থাকিতে হইবে।

আরও একটি বিষয় আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে হিন্দুধর্ম্ম সঙ্কীর্ণতার ধর্ম্ম নহে—বিশ্বজনীন প্রেম, সর্ব্বভূতসমতা জ্ঞান, সকলের দুঃখ নিবারণ এবং অভ্যুদয়ের জন্ম ব্যক্তিগত স্বার্থের বলিদান এই সকল স্বর্গীয় ঔদার্য্যময় ভাবে মনুষ্যসমাজকে অনুপ্রাণিত করিয়া সংসারের সকলের দুঃখ মিটাইবার জন্মই জগতে হিন্দুধর্ম্মের উদয়! বিরাট পুরুষের ন্যায় বিশ্ব ব্যাপিয়া সকল জীবের সুখ ও শান্তির নিয়মন করাই হিন্দুধর্ম্মের একমাত্র উদ্দেশ্য। বিরাট পুরুষের ন্যায় ইহার প্রভাব অবিনশ্বর ও বিশ্বতোমুখ হওয়া উচিত। আবার বলি—হিন্দুধর্ম্ম গোঁড়ামীর প্রসারের জন্য জগতে বিকাশ পায় নাই। ইহা জ্ঞান ও জ্ঞানমূলক বিশ্বাসের ধর্ম্ম! বর্ত্তমানই ইহার সর্ব্বস্ব নহে। অসীম অতীত ও অনন্তভবিষ্যতের সহিত সুমহান্ বর্ত্তমানকে একত্র গ্রথিত করিয়া বিশ্বজনীন সুসভ্য সমাজব্যবস্থাপনই হিন্দুধর্ম্মের অপরিবর্ত্তনশীল লক্ষ্য। তাহার পর সেই চিন্ময় আনন্দময় ও সত্তাময় পরমাত্মার স্বভাবে যত কিছু দুঃখময় পরিচ্ছিন্ন ভাবকে বিলীন করিয়া বিশ্বজনীন একত্বার প্রতিষ্ঠার দ্বারা শান্তির আনন্দময় সাম্রাজ্য বিস্তার করিবার জন্য হিন্দুধর্ম্ম প্রকাশ পাইয়াছে—ইহা আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। সঙ্কীর্ণতা, অন্ধবিশ্বাস, ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং গোঁড়ামীর গাঢ় অন্ধকারকে আমরা যতদিন আমাদের সমাজ হইতে একেবারে বহিষ্কৃত করিতে না পারিব সে পর্য্যন্ত হিন্দুধর্ম্মের অমৃতময় ফলের আস্বাদন আমরা কিছুতেই করিতে পারিব না। এই সঙ্কীর্ণতা—এই অন্ধবিশ্বাস—এই ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং এই নিদারুণ গোঁড়ামীর সূচীভেদ্য অন্ধকার দূর করিবার একমাত্র উপায় হইতেছে হিন্দুধর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞান; এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে আমাদের কর্ত্তব্য হিন্দুধর্ম্মের ইতিহাস প্রণয়ন ও তাহার বহুলপ্রচার।

এই ইতিহাস প্রণয়ন ও প্রচারকার্য্য কিরূপে করিতে হইবে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমি আপনাদের সম্মুখে ভবিষ্যতে প্রকাশ করিবার আশা হৃদয়ে রাখিয়া অদ্য এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতে চাহি।

উপসংহারকালে বক্তব্য এই যে আমার এই প্রবন্ধে বর্ত্তমান সময়ের ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ সম্বন্ধে আমি যাহা কিছু বলিয়াছি তাহা শুনিয়া অনেকে হয় ত বিবেচনা করিতে পারেন যে আমি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের প্রতি সম্যক্ শ্রদ্ধাসম্পন্ন নহি, প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তাহা নহে। ব্রাহ্মণপণ্ডিত এই পবিত্র আখ্যার যোগ্যপাত্র বলিয়া সর্ব্বপ্রকারে নিজেকে বোধ করিতে সাহসী না হইলেও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি বলিয়া আমি সর্ব্বদা আমাকে গৌরবিত বোধ করিয়া থাকি। ভারতের ব্রাহ্মণপণ্ডিত হওয়া বড়ই সৌভাগ্যের কথা। আত্মত্যাগ, ধর্ম্মে বিশ্বাস, বিশ্বজনীন প্রেম ও বিদ্যাবত্তার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্তে জগৎকে মোহিত করিয়া আজ পর্য্যন্ত হিন্দুসভ্যতার উচ্চ আদর্শ খ্যাপন করিতেছেন বলিয়া যথার্থ ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ এখনও প্রত্যেক স্বদেশপ্রেমিকের হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা!

ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ যে পর্য্যন্ত নিজের দায়িত্ব ভাল করিয়া বুঝিয়া সমাজের নেতৃত্ব করিতে সমর্থ থাকিবেন সে পর্য্যন্ত হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু সমাজের অধঃপতনের কোন শঙ্কাই আসিতে পারে না, ব্রাহ্মণপণ্ডিতের নিন্দা বা অবনতির কথা শুনিলে এই অকিঞ্চনের হৃদয়ে যে ব্যথা লাগে—তাহা অন্য কোন ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সেই ব্যথা হইতে যে একটুও কম তাহা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না। সুতরাং আজ আপনাদের সমক্ষে ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের এই দোষ কথনের ছলে নিজ দোষই খ্যাপন করিয়াছি। কিরূপ অবস্থায় পড়িলে আত্মার উপর ধিক্কার আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা আপনাদের অবিদিত নহে। ভারতের বিশাল হিন্দুসমাজ যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকুলের হস্তে আপনার চতুর্ব্বর্গ রক্ষা করিবার ভার অর্পণ করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছিল, সে সমাজের অন্ধকার এ অবস্থা দেখিলে স্বদেশপ্রেমিক ব্রাহ্মণপণ্ডিতের হৃদয়ে যে দাবানল জলিয়া উঠে নিজের অকিঞ্চিৎকরত্ব এবং হীনত্বের অনুভবে প্রাণের মধ্যে যে পশ্চাত্তাপ-পর্ব্বতের গুরুভারে অন্তরাত্মাকে চাপিয়া ধরে এই প্রবন্ধটি তাহারই একটি যৎসামান্য বিবর্ত্ত ছাড়া আর কিছুই নহে! যাহারা জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সভ্যজাতির স্বভাবসিদ্ধ নেতা তাহারা আজ উদরান্নের বা তুচ্ছ বিলাসের জন্য মিথ্যাব্যবহার করিতেও কুণ্ঠিত হয় না অথচ আপনাকে ব্রাহ্মণপণ্ডিত বলিয়া পরিচয় দিতে সাহসও করে—ইহা অপেক্ষা অধঃপতন মানবের ইতিহাসে আছে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না। আমার শেষ বক্তব্য এই যে "আত্মজ্ঞান ছাড়া আত্মোদ্ধারের অন্য কোন পথ নাই", হিন্দুসমাজ সর্ব্বনাশের পথে দাঁড়াইয়া যদি এই মহান্ সত্যের দিকে না চাহে—অর্থাৎ কাহার নাম হিন্দুসমাজ? হিন্দুসমাজ ছিল? কি আছে? এবং ভবিষ্যতেই বা কি হইবে?—ইহা যথাযথভাবে বুঝিবার জন্য এখনও হিন্দুসমাজ যদি বদ্ধপরিকর না হয়—তাহা হইলে আমাদের সমাজের ভবিষ্যৎ যে এখনও ঘোর বিপত্তিময় সে বিষয়ে চিন্তাশীল কোন হিন্দুসন্তানের অণুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। ইহাই আমার অদ্যকার প্রবন্ধের মূলসূত্র।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।

কাব্য ও তত্ত্ব।

কাব্যে ও তত্ত্বে বিরোধের কথাই প্রচারিত আছে। কাব্য কাব্য, তত্ত্ব তত্ত্ব, দুয়ের মধ্যে মিল খুঁজিতে যাওয়ার আবশ্যকতা বড় কেহ দেখে না। তথাপি কাব্যে ও তত্ত্বে একটা জায়গায় মিল আছে—তাই বড় বড় কবির নিকটে আমরা তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া উপস্থিত হই, তাঁহাদের সমস্ত কাব্যের ভিতর দিয়া তাঁহারা কোন্ সত্যকে প্রকাশ করিয়াছেন তাহাই জানিবার জন্য ব্যগ্র হই।

কিন্তু সে মিল অনুসন্ধান করিতে গেলে

তত্ত্বের অভিব্যক্তির ধারাটা অনুসরণ করিতে হয়, তত্ত্বের সম্মুখে কি সমস্ত প্রশ্ন মীমাংসার জন্য উপনীত, তাহারই আলোচনা করিতে হয়।

তত্ত্বের বিষয় তিনটি, জগৎ, আত্মা ও ঈশ্বর। এই তিনটি বিষয় লইয়া মানুষের ধারণার অন্ত নাই। তত্ত্বের কাজ এই তিনের মধ্যে যোগের সম্বন্ধ স্থাপন করা, মানুষের বিক্ষিপ্ত ধারণাকে একটি মহা সত্যের মধ্যে এক করিয়া তোলা, যে সত্যের মধ্যে মানুষের সমস্ত জ্ঞান—সমস্ত ভাব পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারে। এ হিসাবে দেখিতে গেলে বিজ্ঞান প্রভৃতি সকল বিষয়ই তত্ত্বের অন্তর্গত।

গোড়াতেই যে তত্ত্বের চেষ্টা এই ঐক্য রচনার দিকে ছিল এমন কথা বলিতে পারি না। যখন প্রাকৃতিক দৃশ্যের রূপক কল্পনা করিয়া বিচ্ছিন্নভাবে ও অন্ধভাবে প্রাকৃত শক্তিকে মানুষ দেখিতেছিল তখন নিশ্চয়ই তাহার বুদ্ধি পীড়িত হইতেছিল এবং বিচ্ছিন্ন শক্তিপুঞ্জের মধ্যে নিয়মকে সন্ধান করিতেছিল। যে কারণে বৈদিক প্রকৃতি পূজার পরে উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান, সর্ব্ব বস্তুর মধ্যে একই আছেন এই ঘোষণা; সেই কারণেই গ্রীক্‌দেশে Mythological যুগের পরে Ionic philsophersদের উদ্ভব। তাহারা প্রকৃতির রূপক কল্পনা না করিয়া প্রাকৃতিক সকল দৃশ্যিষয় একটিমাত্র দৃশ্যিষয়েরই রূপান্তর ও সমস্ত সসীম বস্তুর মূলে এক অস্তিত্ব, এক Being বিদ্যমান এই তত্ত্ব চিন্তা করিয়াছিল। আমাদের কালে বিজ্ঞানের উন্নতির দরুণ আমরা এরূপ প্রমাণ নিরপেক্ষ (Apriori) যুক্তির দ্বারা তত্ত্ব নিরূপণ করা সঙ্গত বলি না, কারণ ইহার একটি প্রধান দোষ এই দাঁড়ায়, যে ইহা অনেককে গণনার ভিতরে না আনিয়া এককে প্রতিষ্ঠা করিতে বসে, অনেকের ভিতরে এককে প্রতিষ্ঠিত করে না। সে ভাবে প্রতিষ্ঠা দিতে গেলেই বিজ্ঞানের ঋজুকুটিল পন্থার ভিতর দিয়া গমন ছাড়া গত্যন্তর নাই। বিষয়ীর অন্তর্গত (Subjective) সত্য হইতে বিষয়াশ্রিত (objective) সত্যে উপনীত হইতেই হইবে—এবং বস্তুগত ভাবে সত্যকে অনুসন্ধান করিতে গেলেই বিশেষ হইতে সামান্যে (Particular হইতে Generalএ) যাইতে হইবে—কার্য্যকারণের নিয়ম বাহির করিতে হইবে—ক্রমেই ব্যাপক ও ব্যাপকতর নিয়ম বাহির করিয়া ক্ষুদ্র একের অংশকে বৃহতের মধ্যে দেখিতে হইবে—বিজ্ঞানের ইতিহাসে আমরা যাহা দেখিতে পাই।

Newtonএর Gravitationএর নিয়মে সৌরজগতের ঐক্য প্রথমে নির্দ্ধারিত হইল, পরে Herschel সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যেই ঐ একই নিয়ম কার্য্য করিতেছে দেখাইলেন। ক্রমে লাপ্লাসের Nebular theory আসিয়া উপস্থিত হইল—তিনি দেখাইলেন যে অসংহত বাষ্পের ঘূর্ণি হইতে কিরূপে সংহত ব্রহ্মাণ্ড সকলের উৎপত্তি হইয়াছে। অভিব্যক্তিবাদের এই কিন্তু প্রথম সোপান। প্ল্যানের ঐক্য পাইলেই উপাদানের ঐক্য আপনিই আবিষ্কৃত হইবে, এবং যে প্রণালীতে এই সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মিত হইয়াছে তাহাও অনায়াসেই বুঝা যাইবে। Spectroscopeএর আবিষ্কারে এবং Spectrum analysis দ্বারা উপাদানের ঐক্যও স্থিরীকৃত হইল। তখনই বস্তুটা কি এবং বস্তুর মধ্যে এক বস্তু কিছু আছে কিনা তাহা জানিবার জন্য মানুষের ব্যগ্রতা জন্মিল।

বস্তুকে তাহার গুণ দিয়া জানিবার যো নাই—বর্ণ প্রভৃতি তো কম্পনের জন্য হয়—কম্পন না হইলে বস্তুমাত্রেই বর্ণহীন। বস্তুর কোন অবস্থাদ্বারাও বস্তু পরিচয় সম্ভবে না। কাজেই বস্তু জিনিসটাকেই শেষে বস্তু না বলিয়া একটা অবস্থা বলা হইল। Conservation of forceএর theoryতে সেই কথাটা আমরা জানিলাম। এবং ক্রমেই বিজ্ঞানে বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা যে একই অবস্থার ভিন্ন বিকাশ মাত্র সেই কথা প্রমাণ করিতেছে। তার পরেই অভিব্যক্তিবাদ(Evolution theory)। অবস্থার ভিন্ন বিকাশ প্রকৃতির নিয়ম—যান্ত্রিকতা প্রকৃতির নিয়ম নহে—একথা হইতেই অভিব্যক্তিবাদে আসিয়া পড়া যায়। ডারবিনের অভিব্যক্তিবাদে জীবনবিজ্ঞান সম্পূর্ণ নূতন একটা পথ অবলম্বন করিল—দেহী বা অঙ্গীমাত্রেই যে একই জীবকোষ (Protoplasmic cell) হইতে উৎপন্ন, সেই একই কোষ যে জটিল জটিলতর হইয়া বিচিত্র দেহ উৎপন্ন হইয়াছে এই মহাতত্ত্ব ডারবিন আবিষ্কার করিয়া সমস্ত বিজ্ঞানকে এক ঐক্যপথে চালনা করিলেন।

কাজেই জ্ঞানের পথ বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ (analysis and synthesis) এই দুয়েরি পথ—একটিকে বাদ দিয়া অপরকে ধরা চলে না। গ্রীক্ দর্শন যাহা এক হিসাবে সমস্ত বিজ্ঞানের পন্থা জগতে প্রথম নির্দেশ করিয়াছিল, তাহারি মধ্যে আমরা ভেদ বুদ্ধির পরিচয় পাই। সামান্তের ভিতর দিয়া বিশেষের পরিচয় লাভ করিতে যাইয়া সামান্ত ও বিশেষে যে দ্বন্দ্ব গ্রীক দর্শনকারগণ উত্থাপন করিলেন, তাহাতে বিশেষের বিশিষ্টতা আর রহিল না এবং সামান্তের ধারণা এক অপূর্ব শুষ্ক তত্ত্বের আকার ধারণ করিতে বাধ্য হইল। মিডিয়্যাল যুগে Scholastic দার্শনিক মণ্ডলীর কাছে সেই দ্বন্দ্ব আরও স্পষ্টীকৃত হইয়া উঠিল, এবং তখন সামান্তের সঙ্গে বিশেষের সম্পূর্ণরূপেই ভেদ দাঁড়াইয়া গেল—সামান্ত যেন এক বস্তু এবং বিশেষ অপর বস্তু। তাহারি প্রতিক্রিয়া বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ের সঙ্গে আরম্ভ হইতে বাধ্য, বিজ্ঞান একেবারেই বিশেষকে খণ্ডকেই আশ্রয় করিয়া বসিল এবং বিশেষ হইতে সামান্তে দৃষ্টি সম্প্রসারণ করার প্রয়োজনকেই অস্বীকার করিল।

প্রমাণ নিরপেক্ষ জ্ঞান (Intuition) ও বহুদর্শিতাসম্ভব জ্ঞান (experience) এই উভয়ে বিরোধ স্বীকার করাটাই মুস্কিল। বিজ্ঞান বলিবে ভিতর হইতে সত্যের উপলব্ধি হওয়াটাই অসম্ভব, কারণ ভিতরের উপলব্ধ বস্তুই যে phenomenon এবং অন্য সমস্ত phenomenaর সঙ্গে কার্য্যকারণসূত্রে যুক্ত সুতরাং ভিতরের উপলব্ধিকেও নিয়মের অন্তর্গত করিতে হইবে—বাহিরের কার্য্য ও ঘটনাকে যে ভাবে করা হইতেছে। এ হিসাবে দেখিতে গেলে প্রমাণনিরপেক্ষ জ্ঞান অসম্ভব বলিয়াই প্রতীত হয়।

কিন্তু একথাটা সম্পূর্ণ সত্য নহে। যদিও একদল দার্শনিক প্রমাণনিরপেক্ষ জ্ঞানকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং তন্মধ্যে মিলের নামই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। কেন সত্য নয়—কারণ অন্তশ্চৈতন্তের (consciousness) প্রকাশটা কোথা হইতে আইল তাহা না বিচার করিলে অন্তশ্চৈতন্তের প্রতীতিকে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। হয়

বলিতে হয় যে প্রকৃতির মধ্যে তাহা ছিল এবং তাহাই ক্রমে অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে; নয় বোসো করিয়া জবাব দিতে হয় যে প্রয়োজন বশতই হইয়াছে (out of necessity) যেমন একদল দার্শনিক বলিবার চেষ্টাও করিয়াছেন। প্রকৃতির ভিতরে চৈতন্য বিদ্যমান একথা স্বীকার করিতে গেলে জড়-বিজ্ঞান উলোট্ পালোট্ হইয়া যায়। Matter অর্থাৎ বস্তুর দিক্ দিয়া যে ভাবে বিজ্ঞান laws of motion আবিষ্কার করিতে ব্যস্ত -সেদিক্ হইতে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাবর্তন করিয়া জগতকে মনোময় বলিতে হইবে। তবেই মানুষের মধ্যে মধ্যে সংবিতের ঐক্য উপলব্ধি করা যাইবে। এবং তবেই মানুষের সহজ প্রতীতিরও যে একটা সার্থকতা আছে তাহাও বুঝা যাইবে। আপনারা জগদীশ বাবুর অভিনব বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের কথা অবগত আছেন, সেই তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে কেবল বিজ্ঞানের নয়, দর্শনেরও এই দ্বন্দ্ব অবসান হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি। কিন্তু তাহা যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সম্পূর্ণ ভাবে হইতেছে ততক্ষণ দেখা যাক্ এই দ্বন্দ্বের কি মীমাংসা মানুষের মন স্থির করিতে পারিয়াছে। যুক্তির অবতারণা করিয়া দার্শনিকেরা এইটে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিলেন যে বিয়োগ করিতে গেলেই যোগের ব্যাপারটা ধরিয়া লওয়া হয়—এবং তখন ভিতরে ভিতরে খণ্ডের খণ্ডের সঙ্গে অংশের অংশের সঙ্গে যে যোগ চলিতে থাকে তাহার মূলে কে? আমি ভিন্ন আর কেহই নয়। কাজেই সমস্ত ঐক্য একটি ক্ষেত্রে আসিয়া কেন্দ্রীভূত হইতেছে—আমার চেতনার মধ্যে। কাজেই আমি যখন ভাগ করিতেছি তখন আমার এবং বাহিরের মূলে আর একটি গভীরতর যোগাত্মক ঐক্য রহিয়াছে যাহার কাছে এসমস্তই phenomena মাত্র এবং যাহাকে transcendental unity of self consciousness বলা যাইতে পারে। জর্ম্মাণ দর্শনের এইমত ক্রমে পরবর্ত্তী জর্ম্মাণ দর্শনকার বিশেষতঃ হিগেলে আসিয়া আরও পরিষ্কাররূপে এই তত্ত্বে ব্যক্ত হইল—যে বহির্জগত অন্তর্জগতের প্রকাশ (manifestation) বাহিরের ভিতর দিয়া প্রকাশের ভিতর দিয়াই সংবস্তু চৈতন্য আপনাকে উপলব্ধি করিতেছেন—ঐক্যটা মনের মধ্যেই আছে—বাহিরের বৈচিত্র্যের আঘাতে ভিতরের সেই ঐক্যের জ্ঞান আমরা লাভ করি। এমতে apriori ও aposteriori—সহজ জ্ঞানও বহুদর্শিতার জ্ঞান এ দুয়ে ভেদ থাকেনা—বাহিরে ও অন্তরে দ্বন্দ্বও থাকে না। Hegel এর মতে বিজ্ঞানের সাধনার ভিতর দিয়া না গেলে দর্শন সম্পূর্ণতা লাভ করিতেই পারে না। "It is because the Scientific manner of knowing does not satisfy the whole demand of intelligence, philosophy must suppliment it by another manner of knowing The history of the conscious being in his relation with the world is not a struggle between two independent forces but the evolution by antagonism of one spiritual principle." ইহার অর্থ এই যে বৈজ্ঞানিক ভাবে জানা সমস্ত জ্ঞানকে তৃপ্ত করে না বলিয়াই দর্শন অন্য প্রকারের জানার দ্বারা বিজ্ঞানকে পূরণ করিয়া লইতে চায়। চৈতন্যময়

আত্মার সঙ্গে জগতের সম্বন্ধ ছুই স্বতন্ত্র শক্তির দ্বন্দ নহে, কিন্তু ছুয়ের আঘাতে একই অধ্যাত্ম তত্ত্বের অভিব্যক্তি। যে বৃহৎ চৈতন্যে আমরা অহং ইদং এই ছুইকেই এক করিয়া দেখি, তাহাকেই দার্শনিকগণ universal consciousness অথবা বিশ্বচৈতন্য বলিয়াছেন এবং ইহার অস্তিত্বকে স্বীকার না করিলে মানুষের জ্ঞান প্রেম ও কর্ম্মের কোন ঐক্যই কখন সম্ভবপর হয় না। গোড়ায় ইহাই ছিল—ইহাই অভিব্যক্ত হইতেছে এবং ইহাই ইহার শেষ—ছুইদিকে ছুই অসীম এবং মধ্যে ক্ষণস্থায়ী বর্ত্তমান স্তব্ধের চাঞ্চল্যের মত মহাসমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় উত্থিত হইতেছে। যে মহা অন্ধকারের গর্ভ হইতে এই বিশাল সৃষ্টি সম্ভবপর হইল—বাষ্পসংঘাতের মধ্য হইতে সংহত ঘূর্ণায়মান গ্রহচক্র ভ্রাম্যমান হইল—তাহারি মধ্যে এই অনাদি চৈতন্যের সমস্তই বিদ্যমান ছিল—ক্রমে প্রাণের স্পন্দন, ক্রমে জীবলোক, সৃষ্টির নব নব অভিব্যক্তি, ক্রমে চৈতন্যময় জীবাত্মা প্রকাশিত হইল। জীবাত্মার সামান্য চৈতন্যের স্ফুরণে সেই মহাচৈতন্যের স্বপ্ন দেখি মাত্র। বিশ্বের সর্ব্বত্র জ্ঞানের ঐক্য—প্রেমের ঐক্য অনুসন্ধান করি, এবং যতই দেখি ততই বৃহৎ বৃহত্তর ঐক্যের মধ্যে নিজেকে অনুপ্রবিষ্ট দেখি,—এদিকেও অন্ত নাই, কোথায় শেষ জানিনা—কেবল এইটুকু জানি যে এক অসীম বৃহত্তের অংশ আমি এবং সেইবৃহত্তের মধ্যে আমার সমস্ত পরিপূর্ণতা, সর্ব্বশেষ। স্থান ও কালের অসীমতার অনুভব এই আত্ম-চৈতন্যের অনুভবের সম্বন্ধে এবং প্রতিঘাতে বুঝি এবং খণ্ড যতই দেখি একের ধারণা ততই পরিস্ফুট হইয়া উঠে—এক না থাকিলে খণ্ড করাও যেন সাধ্যায়ত্ত হইত না।

এইখানে কাব্যে আসিয়া পড়ি—কাব্যের ও যে এই সাধনা। কেবল একটি অনৈক্য আছে—তর্ক নাই, যুক্তিও নাই। তবে কি দার্শনিকের সহজ প্রত্যয়ের ন্যায় কবি প্রমাণ-নিরপেক্ষভাবে সত্যকে প্রকাশ করেন? তাহাও নহে। কাব্যকে আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাস (subjective feeling) মনে করা ভুল হইবে। বাস্তব লইয়া কাব্যের ব্যাপার—বাস্তবকে যথাযথ ভাবে, খুঁটিয়া নাটিয়া দেখান নহে—কিন্তু বাস্তবকে সত্য করিয়া দেখান। একটা সামান্য ঘটনা—তাহার মধ্যে কত গভীর কারণ কার্য্য করিতেছে, কতদিককার কত শক্তি তাহাকে বর্ত্তমানতার মধ্যে উপস্থিত করিতেছে, আমরা তাহাকে সর্ব্বতোভাবে সকলদিক্ হইতে মিলাইয়া দেখিতে জানি না। মহাভারত যদি আমাদের কালের ইতিহাস হইত—তবে সেই একটি ঘটনার ভিতর দিয়া কালের সমস্ত প্রতিকৃতিতে সমুদ্ভাসিত করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হইত না—তাহার ভিতরকার দর্শন, চিন্তা, সমস্ত ঘটনার ভিতরকার অনির্ব্বচনীয় সুগম্ভীর এবং ভয়ানক পরিণাম—বাস্তবের উপরে ছায়া ফেলিয়া নিজের নিদারুণ বৃহৎ-সত্যতার কালকে অতিক্রম করিয়া নিত্য সত্যের যে ঘোষণা আমরা তাহাকে ফুটাইতে পারিতাম না। আমাদের অধিকাংশের জীবন জোড়াতাড়া—আমরা আমাদেরই পরম সত্যের মধ্যে বিধৃত দেখিতে অক্ষম—আমাদের সুখ-দুঃখ, ভাব অভাব, ধর্ম্ম বিশ্বাস সমস্তই বিচ্ছিন্ন—কেবলি ভেদ কেবলি ভেদ—বিষয়ীর সঙ্গে বিষয়ের এবং উভয়ের সঙ্গে নিত্যের, জ্ঞানের

সঙ্গে ভাবের, ভাবের সঙ্গে কর্ম্মের, বুদ্ধির সঙ্গে ইচ্ছার, ইচ্ছার সঙ্গে মঙ্গলের, এবং মঙ্গলের সঙ্গে সৌন্দর্য্যের, কাজেই খণ্ডের মধ্যে বৃহৎকে ক্ষণিকের মধ্যে নিত্যকে দেখিতে পাওয়া এবং প্রতিষ্ঠিত করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। উপাধির দ্বারা আমাদের মন জড়িত—একেকে চিনিব কি উপায়ে?

এই কারণেই সকল কবির মধ্যেই সম্পূর্ণতার আদর্শ নাই, সকল কবিই তত্ত্বদর্শী নহেন। তাই তত্ত্বের মত এখানেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রবৃত্তির খেলা, আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাস, নিরর্থক আনন্দবেদনার প্রকাশ। আমরাও কাব্যকে এত ক্ষুদ্র স্থান হইতে দেখি বলিয়া মনে ভাবি যে তাহা কেবল অনুভূতিমাত্র (subjective feeling) স্বপ্নমাত্র, খেলামাত্র, কল্পনামাত্র—বস্তুগত সত্য (objective truth) নহে। কিন্তু বৃহৎ কবিরা যে সত্যকে প্রকাশ করেন, তাহা কেবল ক্ষণিক উচ্ছ্বাসমাত্র নহে। তাহার মধ্যে বিজ্ঞানের ন্যায় যথেষ্ট জিনিসের নিরাকরণ আছে—যথেষ্ট এক্সপেরিমেণ্ট আছে। প্রত্যেকটি অনুভাবকে পরিমাপ করিয়া দেখা আছে, অনেক ত্যাগ আছে, দুঃখ আছে, নৈরাশ্য আছে, অনেক রকমে নিজেকে বঞ্চিত করা আছে। গেটে যাহাকে বলিয়াছেন—renunciation in view of the eternal—ভূমার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আত্মবিলোপ। ভূমাকে জগৎচৈতন্যকে তত্ত্ব যেমন বহু আয়াসে লাভ করিতে পারে; আত্মপ্রত্যয় ও বাহিরের নিয়ম নির্ণয় এ দুয়ের কোনটাই যেমন যথেষ্ট নহে—কিন্তু বাহিরকে ভিতরের সম্পর্কে দেখিয়া ভিতরকে যেমন বাহিরে অভিব্যক্ত করা প্রয়োজন—কবির পক্ষেও তেমনি নিজের ক্ষুদ্র আমিত্বের স্থানে কেবলি বাহিরের স্বরূপ উপস্থিত করিয়া ক্রমে বাহিরে, অন্তরাত্মার শাশ্বত আনন্দময় স্বরূপ দর্শন করাই একমাত্র সাধনা।

আনন্দময় স্বরূপ বলিলাম এইজন্য—যে universal consciousness এক দিকে অন্তরাত্মার সঙ্গে বিশ্বাত্মার যোগে, অন্যদিকে বাহিরের রূপরসগন্ধস্পর্শের মধ্যে নিখিলরসাবৃত লীলায় প্রকাশিত হন—তত্ত্বদর্শী যোগের দিকটাকে দেখেন—জ্ঞানের যখন সংশয় থাকে না অন্তরাত্মার গভীর গভীরতম প্রদেশে যখন সূর্য্য চন্দ্র কিছুই প্রকাশ পায় না—কেবল চৈতন্য একাকী আপনাতে আপনি লীন হইয়া থাকেন, যোগীগণ কেবল সেই অবস্থাকেই কামনা করেন। কবি তাহারি সঙ্গে সীমাকে বিশিষ্টকে সৌন্দর্য্যের দৃষ্টির এক অপরূপ যোগে যুক্ত করিতে চাহেন। চৈতন্যকে রসরূপে, জড়রূপে, বস্তুরূপে দেখিবার অভিলাষ করেন। দ্বন্দ্ববুদ্ধি, ভেদবুদ্ধি লইয়া কাব্য পড়িতে গেলে বিকারপ্রাপ্ত হইতে হয়, কারণ আমরা সে রস সম্ভোগের অধিকারী নহি। ভাল মন্দ পাপপুণ্য সুন্দর অসুন্দরের দ্বন্দ্ব আমাদের মধ্যে ঘুচে নাই—তাই হিগেলের ভাষায় চলিতে গেলে আমাদের কাছে concrete universal, abstract universal রূপেই প্রকাশিত।

তত্ত্বের অভিব্যক্তির ন্যায় কাব্যের অভিব্যক্তির ধারাটা কি প্রকার দেখা যাক্। নহিলে আমার কথাটা দাঁড় করানো যাইবে না।

আপনারা সকলেই জানেন যে ইউরোপীয় মধ্যযুগে গ্রীকোরোমান সভ্যতার অবসানের পর ফিউডালতন্ত্রে ও পোপের শাসনে জ্ঞান

ও চিন্তা একেবারে লুপ্ত হইয়াছিল। ইন্দ্রিয়ের দাবীকে অগ্রাহ্য করিয়া ইন্দ্রিয়সম্পর্কবিবর্জ্জিত ধর্ম্মসাধনাকে দাঁড় করাইতে গিয়া সমস্ত সমাজের প্রাণকে জীবনীশক্তিকে বিনষ্ট করার উপক্রম হইয়াছিল। আলকেমি বা স্বর্ণপ্রসূবিদ্যা বিজ্ঞানের স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। জ্ঞান মাত্রেই যেখানে heresy বলিয়া দণ্ডিত হইত সেখানে অবস্থা কি ভয়ানক ভাবিয়া দেখাও শক্ত। ক্লাসিক পড়া তখন তো উঠিয়াই গিয়াছিল—রোমের প্রাচীন ঐশ্বর্য্য ও গৌরবময় কীর্ত্তি ধ্বংশপ্রায় অবস্থায় অবহেলাপ্রাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কুসংস্কার, ভূতপ্রেত, পাপের বোঝা, নরক—ইত্যাদি নানাপ্রকার অজ্ঞান-ঘটিত আবর্জ্জনায় লোকে জীবনের আনন্দ, প্রকৃতির সজীবতা ও সপ্রাণতার প্রতি লক্ষ্যকে নিবিষ্ট করিতেই পারে নাই। এমন সময় হঠাৎ গ্রীস হইতে জ্ঞানানুশীলনের একটা হাওয়া বহিল। প্রাচীনের ভাবে, চিন্তায় সাধনায় ইতালীবাসীরা মাতিয়া উঠিল। সমস্ত কাজকে ভাবকে জ্ঞানকে যেরূপ mystical অতিগুহ্য করিয়া রাখা হইয়াছিল এবং ঐশ্বরিক প্রেরণার কল্পনায় কল্পিত হইতেছিল তাহা হঠাৎ ভাঙ্গিয়া গিয়া গ্রীক্ আর্ট, গ্রীক্ দর্শন, গ্রীক্ সাহিত্য, গ্রীক্ পলিটিক্স ও রোমান আইন রোমান শাসনতন্ত্র, রোমান শিল্পকলায়, লোকে যেন নিজেরি বিলুপ্ত জ্ঞান ও চৈতন্যকে ফিরিয়া পাইল। ফ্লোরেন্সে, বোলোনায়, রোমে, সর্ব্বত্রই প্রাচীন শাস্ত্র উদ্ধারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা হইতে লাগিল, পুঁথি সংগ্রহ হইল, তর্জ্জমা হইল এবং এইরূপে ইতালী হইতে ক্রমে অন্যান্য দেশে প্রাচীন জ্ঞান একেবারে ছড়াইয়া পড়িল। বিজ্ঞানেরও সেই সময়েই উদ্ভব। কোপার নিকাস, গ্যালিলিও প্রভৃতি হঠাৎ পৃথিবী ও সৌরজগৎ সম্বন্ধে পুরাণী ধারণাকে দারুণ আঘাত দিলেন। কলম্বস আমেরিকা আবিষ্কার করিলেন—সমস্ত জগতের ভাবে মানুষের প্রাণ যেন পূর্ণ হইয়া উঠিল—স্বর্গের ছবিতে, স্বর্গের ভাবে, স্বর্গের আদর্শে, যে পৃথিবীকে মানুষ এতকাল নগণ্য করিয়াছিল, হঠাৎ যেন চারিদিক হইতে তাহারি সম্বন্ধে একটা নূতন বার্ত্তা আসিয়া পৌঁছিল। ফ্লোরেন্সের বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠাতা Cosimo dimedici বলিয়াছিলেন "You follow infinite objects, I follow the finite" তোমরা অসীমবস্তুর সন্ধান কর—আমি করি সসীমের।

কিন্তু কেবল প্রাচীনের প্রতি অন্ধ টানে নিজেদের স্বাধীন ক্ষমতার কোন বিকাশ সম্ভবপর হয় না। রেনেসাঁস রেফরমেশন কাউণ্টার রেফরমেশন—এ তিন আন্দোলনকেই পরস্পর বিপরীত মনে হইলেও এ তিনই বস্তুত ফরাসী-রাষ্ট্রবিপ্লবের পূর্ব্ব সূচনা। রেনেসাঁসে জ্ঞানকে মুক্ত করিল—কিন্তু কাল্‌চারের নেশায় ধর্ম্ম ভাবকে একেবারে ডুবাইয়া দিল—মানুষকে পাপের পঙ্কে টানিয়া লইল। বড় বড় লোকের মধ্যে নৈতিক অবনতি এত বেশী পরিমাণে ছিল যে তাহা স্মরণ করিলেও ভয় হয়। তাই একদিকে ধর্ম্মভাবের স্বাধীনতার জন্য protestantism ও অন্যদিকে ক্যাথলিক ধর্ম্ম বিশ্বাস—বহুকাল সঞ্চিত বিশ্বাস ও রীতিনীতিকে অন্ধভাবে বজায় রাখিবার চেষ্টা counter reformation বা catholicrevivalএ। সঙ্কোচ এবং প্রসার যেমন প্রকৃতির ও জীবনের একটা গোড়াকার নিয়ম—তেমনি রেনেসাঁস রেফরমেশন ও কাউণ্টাররেফরমেশন পরস্পর

বিপরীতশক্তি—কিন্তু ইহারা সকলে একত্রে কার্য্য করিয়াছিল বলিয়াই হঠাৎ জ্ঞানে ধর্ম্মে ও কর্ম্মে সর্ব্বত্র একটা বৃহৎ বিপ্লব উপস্থিত হওয়া সম্ভবপর হইল—পুরাণোকে জড়াইয়া জগৎ নূতন পথে পা বাড়াইল—ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের সময়।

ভলটেয়ার প্রভৃতি সেই সময়ে চর্চ্চ এবং ধর্ম্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া বিজ্ঞানের জয়পতাকা উড্ডীন করিতেছিলেন। ভলটেয়ারকে এক হিসাবে জড়বাদি (materialist) দের অগ্রগামী বলা যাইতে পারে, কারণ তিনিই খৃষ্টধর্ম্ম মানিবার প্রয়োজন যে কেন নাই তাহাই প্রথমে প্রমাণ করিতে বসেন। জগৎ যে একটা যন্ত্রের মত—সকলই কলের নিয়মে চলিতেছে—সুতরাং চক্ষু মুদিয়া ধ্যান করার বিশেষ কোন প্রয়োজন দেখা যায় না।

ভল্টেয়ারের পরে রুশো ফ্রান্সে আর এক নবভাবের স্রোত আনয়ন করিলেন। কেবল কল ও নিয়ম বলিলে জগৎকে একেবারে নীরস ও শুষ্ক করিয়া ফেলা হয়। কোথা হইতে এত প্রাণ, এত পুলক, এত আবেগের সঞ্চার হইল? তাই রুশো প্রকৃতিতে প্রত্যাবর্ত্তনের কথা উত্থাপন করিয়া সমস্ত মনুষ্যকৃত শাসন ও সমাজকে নগণ্য করিয়া দিতে চাহিলেন। প্রকৃতির মধ্যে সমস্তই ছিল—তাহার মধ্যে ধর্ম্মবুদ্ধির, কল্যাণের এবং স্বাধীনতার কোন অসদ্ভাব ছিল না, মানুষ কৃত্রিম সমাজের দ্বারা প্রকৃতিকে আপনার কাজ করিতে না দিয়া মহা অনিষ্ট সাধিত করিয়াছে। রুশো পণ্ডিত ছিলেন না, তাঁহার সমস্ত জীবন নানা রকম উচ্ছৃঙ্খলতার ভিতর দিয়া যাপিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার সর্ব্বপ্রকার চাঞ্চল্য ও অসংযমের মধ্যেও প্রকৃতির প্রতি এক সুগম্ভীর টানের পরিচয় পাওয়া যায়—প্যারির শূন্যগর্ভ বহির্ম্মুখ ধনবিলাসিতার মধ্যে যে মানুষের পরিপূর্ণতা নাই, শান্তি নাই, সুখ নাই—রুশো একথা ভালরূপেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। প্রকৃতির প্রতি মানুষের আদিম অনুরাগ, পরিবারের প্রতি মানুষের প্রথম বন্ধন এবং মানুষের আদিম সরলতা ও শান্তির প্রতি তাই ভাব-জটিল সভ্যতার দৃষ্টি তিনি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানজগতে ব্যক্তিতন্ত্র (Individualism) ও সমাজতন্ত্র (Socialism) লইয়া অনেক বাদানুবাদ হইয়া গেছে ও হইতেছে—কি উপায়ে ব্যক্তিকে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন করা যায় অথচ সাধারণের সঙ্গে মিলিত থাকিবার যে সকল সুবিধা তাহাও রক্ষা করা যায়, ইহাই একটা বৃহৎ সমস্যা। বলা বাহুল্য আধুনিক সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ যেরূপ বৈজ্ঞানিক ভাবে এই প্রশ্নের আলোচনা করেন, রুশো সেভাবে কিছুই করেন নাই এবং করা সে কালে সম্ভবপরও ছিল না। তিনি কেবল হৃদয়ের দিক্ দিয়া—ব্যক্তিগত অনুভূতির দিক দিয়া ইহার আলোচনা করিলেন এবং কৃত্রিমতার পাশে আবদ্ধ সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন।

ক্রমশ।

তালীবনের ভারতে।

১০

পণ্ডিচেরীর অভিমুখে।

মাদুরা ছাড়িয়া, উত্তরে পণ্ডিচেরীর অভিমুখে যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, তালীবনের আর্দ্র প্রদেশ ততই দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল; এখন শুধু স্থানে স্থানে সুচ্ছায় তালকুঞ্জ দেখিতে পাওয়া যায়; তৃণভূমি, বাগান-বাগিচা, ধানের ক্ষেত তালীবনের স্থান অধিকার করিয়াছে। বাতাসও ক্রমে ক্রমে লঘু হইয়া আসিতেছে, মাঠ-ময়দানের মধ্যে জলের বিরলতা, জমি যেন শুকাইয়া গিয়াছে।

তথাপি, এখানকার লোক-জীবনে গোপভূমি-সুলভ একটা শান্তির ভাব পরিলক্ষিত হয়। আমাদের য়ুরোপের ন্যায় এখানকার বসতি ঘননিবিড় নহে। নগ্নকায় রাখালেরা, লাল শাড়ী পরিহিতা রাখালিনীরা ছাগলের পাল, ককুদ্‌বান্ ক্ষুদ্রকায় গরুর পাল মাঠে চরাইতেছে। মাঠের ঘাস ইহারই মধ্যে হলদে হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও যথেষ্ট আছে।

গ্রামের ঘরগুলা চুণ ও পেটা মাটী দিয়া গঠিত। প্রত্যেক গ্রামে এক একটি দেবালয় আছে। দেবালয়ের দেবমূর্ত্তি গুলি পিরামিডের আকারে খাড়া হইয়া উঠিয়াছে, বিকট মূর্ত্তিগুলা দেয়ালের উপর বসিয়া আছে;—সমস্তই প্রখর সূর্য্যের উত্তাপে ও লাল ধূলার মধ্যে, ম্রিয়মাণ। দূর দূর ব্যবধানে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছের কুঞ্জ, তাহারই ছায়াতলে কতকগুলি দেবতা সিংহাসনে সমাসীন; কতকগুলি পাথরের ছাগল ও পাথরের গরু দেবতাদিগকে আগ্‌লাইতেছে, এবং বহু শতাব্দি হইতে তাহাদের দিকে মুখ করিয়া তাহাদের ধ্যানে মগ্ন রহিয়াছে।

লাল ধূলা! এই ধূলা ক্রমেই কষ্টকর হইয়া উঠিতেছে। শুষ্কতা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। ক্রমে সেই সকল স্থানে প্রবেশ করিলাম, যেখানে অস্বাভাবিক জলকষ্ট। আকাশের সেই একই ভাব, সেই একই স্বচ্ছতা, সেই একই নীলবর্ণ।

চাষারা চারিদিকে, সেকেলে পদ্ধতি অনুসারে সুকৌশলে জলসেচন করিতেছে। ধানের ক্ষেতের ধারে ধারে ছোট ছোট জলস্রোত চলিয়াছে তাহারই এক হাঁটু জলে দাঁড়াইয়া, দুই দুই-জন লোক একটা রজ্জুর প্রান্ত ধরিয়া আছে, সেই রজ্জু একটা ভেড়ার চামড়ার মসকে বাঁধা; উহারা ঐ মসকটাকে একপ্রকার যান্ত্রিক গতির দ্বারা তালে তালে দুলাইতেছে ও তাহার সঙ্গে গান করিতেছে; এবং উহাতে জল ভরিয়া, ধান-ক্ষেতের লাঙ্গল-কৃত খাতের মধ্যে ঢালিয়া দিতেছে।

গাছের তলায় যে সকল কূপ আছে তাহার প্রণালী স্বতন্ত্র, তাহার গানও স্বতন্ত্র। একটা দীর্ঘ দণ্ডের প্রান্তে একটা চামড়ার মসক আবদ্ধ, সেই দণ্ডটা একটা লাঙ্গল-কাঠের

মাথার উপর বিলম্বিত; সেই দণ্ডটার উপর, দুজন লোক "জিম্ন্যাষ্টের" সহজ-শোভন চটুলতা সহকারে পদচারণ করিতেছে, এক-দিকে তিন পা চলিলেই দণ্ডটা কূপের অভিমুখে নুইয়া পড়িতেছে এবং মসকটাও মজ্জিত হইতেছে; আবার উল্টা দিকে তিন পা চলিলেই দণ্ডটা এবং সেই সঙ্গে মসকটাও উঠিয়া পড়িতেছে, এইরূপ ক্রমান্বয়ে প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত, অবিরাম উহাদের গান চলিয়াছে।

যতই অগ্রসর হইতেছি, শুষ্কতা ততই কষ্টকর হইয়া উঠিতেছে। একটু পরেই দেখিলাম, কতকগুলা গাছ যেন আগুনে পুড়িয়া গিয়াছে, পাতাগুলা কুঁকড়িয়া গিয়াছে, এবং গাছের গায়ে লাল ধূলার যেন একটা পুরু পোঁচ পড়িয়াছে। দক্ষিণ প্রদেশে কেবল কীর্ত্তিমন্দিরগুলাই এই লাল ধূলায় রঞ্জিত হয়, কিন্তু এখানে গাছপালাও রঞ্জিত হইয়াছে। এখানে ভূমি যেরূপ তৃষাতুর, আকাশ যেরূপ নির্বৃষ্টি, তাহাতে মানুষের ক্ষুদ্র চেষ্টায় আর কি হইবে? মসকগুলা ক্রমেই কূপের গভীর দেশে তলাইতেছে, এবং শুষ্ক তলদেশে জল না পাইয়া উঠিয়া পড়িতেছে। আসন্ন ভীষণ দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বসূচনা ও বাস্তবতা ক্রমেই উপ-লব্ধি হইতেছে। ভারতে আসিবার পূর্ব্বে, এইরূপ উৎপাৎ প্রাগৈতিহাসিক বলিয়াই মনে করিতাম। আমাদের এই রেল-পথ ও বাষ্পীয় পোতের যুগে, খাদ্যের আমদানির অভাবে, লোকেরা অনাহারে মরিবে—ইহা দয়া-ধর্ম্মের বিচারে নিতান্তই অমার্জ্জনীয়।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রেখাক্ষর বর্ণমালা।

স্বরেশ্বর অ ॥

বাচ্ছারা সাঁচ্চা রতন! তাহাদের কাছে
অএ রএ ভেদ নাই! ভেদ কিন্তু আছে ॥
র যবে রাজত্ব করে আদি স্থানে বসি,
সে তো ⌒ ঝোলা তলোয়ার; অ যে ⌣ তোলা অসি ॥
অ) তোলা; আত্ত র ⌒ ঝোলা; কাহারে ঠ্যাকাই?
অন্ত্য-মধ্য র আবার / ⌒ দু-জনো অ্যাকাই ॥

লক্ষ যদি বাক্য বলি চেতিবে না মন।
ক্ষেত্রে কর নেত্রপাত ফুটিবে নয়ন॥

অরর ররর | অহরহ রহরহ | অত রত

অজ রজ | অনটন রটন | অসময় রসময়

ন্যাজা মুড়া মাজা॥

ন্যাজামুড়া কি বস্তু রসনা তাহা জানে।
ন্যাজা এই, মুড়া এই, মাজা মাঝখানে॥

নিম্নমুখী রেখাদের উপরেই মুড়া।
ঊর্দ্ধমুখীদের নীচে মস্তকের চূড়া॥

মুড়া ন্যাজা ন্যাজা মুড়া কনক

উচ্চশায়ীর

নিম্নমুখীর মুড়া মাজা ন্যাজা মুড়া মাজা ন্যাজা মুড়া মাজা ন্যাজা মুড়া মাজা ন্যাজা মুড়া মাজা ন্যাজা মুড়া মাজা

ন্যাজা মাজা মুড়া ন্যাজা মাজা মুড়া ন্যাজা মাজা মুড়া ন্যাজা মাজা মুড়া

নিম্নশায়ীর

মাজা মুড়া ন্যাজা মুড়া মাজা
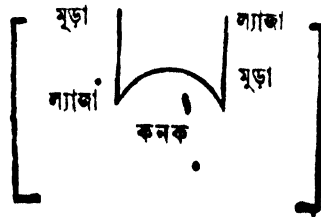
সম্মুখ পিট এবং পিছন পিট॥

রেখার আঁখর গুলা চতুরঙ্গ কীট।
চারি অঙ্গ—ন্যাজা, মুড়া, এপিট, ওপিট॥

মুখী পরবর্ণ তার যে-পিটে হেলান্,
সেই পিট সমুখ, পিছন পিট আন ॥

পিছন পিট
পিছন পিট
সমুখ পিট মুখী পরবর্ণ
সমুখ পিট
মুখী পরবর্ণ
সমুখ পিট
মুখী পরবর্ণ
পিছন পিট
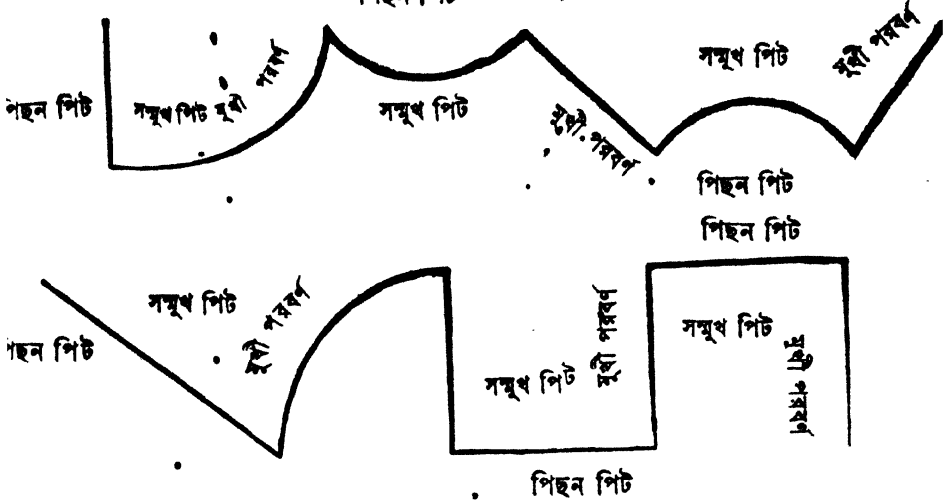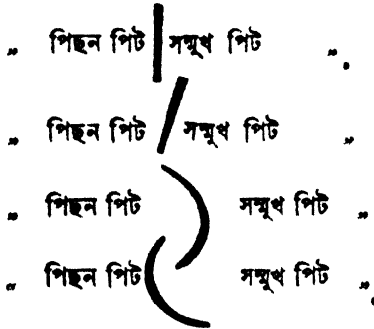
পিছন পিট
সমুখ পিট
পিছন পিট
মুখী পরবর্ণ
সমুখ পিট
মুখী পরবর্ণ
সমুখ পিট
মুখী পরবর্ণ
পিছন পিট

মুখী রেখার দু-পিট।

লিখিয়ে'র যে দুদিকে ডাহিন-বাঁ হাত,
মুখীর সেই দু-দিক্ সম্মুখ পশ্চাৎ ॥
বাঁ হাত ....ডা'ন হাত

„ পিছন পিট | সমুখ পিট „
„ পিছন পিট / সমুখ পিট „
„ পিছন পিট) সমুখ পিট „
„ পিছন পিট (সমুখ পিট „

শায়ী রেখার দুপিট।

ছত্রের যে-দুই দিক্ ভিতর বাহির,
সমুখ-পিছন, সেই দু-দিক্, শায়ীর ॥
শায়ীরের সমুখ পিছন, সেইজন্ত,
ভিতর বাহির পিট বলি হয় গণ্য ॥

উপরে বাহির পিট উচ্চশায়ীদের ;
নিম্নশায়ীদের, নীচে ; পেলে তা তো টের ?
জিজ্ঞাসা ক'রনা তবে আমায় আবার—
কোন্‌টা ভিতরপিট কোন্ শায়ীটা'র ?
"পূর্ব্ব এটা" বলে যবে অরুণ রক্তিম,
পুন' কি জিজ্ঞাসো তাঁ'রে কোন্‌টা পশ্চিম ?

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রাজতপস্বিনী।

[জীবনীপ্রসঙ্গ।]

২৩

মহারাণীর পোষ্য-পুত্র কুমার যতীন্দ্রনারায়ণের উপর বাবু সরকার মহাশয়ের অসাধারণ প্রভাব ছিল। কুমার তাঁহার বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্ব্ব হইতে ভাল মন্দ যাহা কিছু করিতেন, লোকে সুতরাং তাহা নির্ব্বিচারে সরকারজীর নামের সহিত সংযুক্ত করিত। অধিক কি স্বয়ং মহারাণী মাতাও শেষের দিকে তাহাই বিশ্বাস করিতেন এবং মাঝে মাঝে কোনও গুরুতর কাজের কথা উপস্থিত হইলে কুমারকে ব্যঙ্গ করিয়া স্মিতমুখে বলিতেন—"তোমার বাবু সরকার কি বলে ?"

সরকার মহাশয় যে রাজদরবার সুলভ কৈতববাদে অভ্যস্ত ছিলেন না তাহার কিছু কিছু পরিচয় ইহার পূর্ব্ব সংখ্যায় দিয়াছি। যতীন্দ্রনারায়ণ অন্যের কাছে "হুজুর, ধর্ম্মাবতার, কুমার মহাশয়" হইলেও সরকার জীর কাছে বরাবর "তুমি" ছিলেন এবং যৌবন সীমায় পদার্পণ করার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত লেখা পড়ায় অমনোযোগ জন্য যখন তখন তাঁহার কাছে ধমক খাইতেন। ইহার পর অবশ্য সে দিন আর রহিল না। উকীল মহেন্দ্রনাথ সান্যালের সঙ্গে এক দিনকার ঘটনায় তাহা বুঝা যাইবে। সান্যাল মহাশয় বি, এ পাস্ করিয়া পুটিয়া স্কুলের যখন প্রধান শিক্ষক হইয়া আসিয়াছিলেন, কুমার তখন সেখানকার নিম্ন শ্রেণীর ছাত্র। তাঁরপর কয় বৎসরের ভিতর মহেন্দ্রবাবু আইন পাস্ করিয়া রাজশাহীতে ওকালতী করিতে গেলেন

এবং পাঁচ আনির রাজবাটীর বেতনভোগী উকীল হইলেন। বছর দুই তিন পরে এক দিন কার্য্যোপলক্ষে তিনি পুটিয়ায় আসিলেন এবং মহারাণীর নিকট এত্তালা পাঠাইয়া উপরের বৈঠখানায় আদেশের অপেক্ষা করিতেছিলেন। এমন সময় কুমার সেখানে আসিলেন এবং ভূতপূর্ব্ব হেড্ মাষ্টারবাবুকে অভ্যাস মত জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন আছেন? সান্যাল মহাশয় আত্ম-বিস্মৃত হইয়া বলিয়া বসিলেন—"এ সব যাইতে দাও, পড়া শুনা কি করিতেছ তাই বল!" কুমার বিরক্ত হইয়া উত্তর করিলেন—"আপনি কি আমার পরীক্ষা লইতে আসিয়াছেন?" মহেন্দ্রবাবু নিজের মান নিজের কাছে ভাবিয়া গম্ভীর হইয়া বসিলেন এবং স্বয়ং কখন কাহারও কাছে এ গল্প করেন নাই। কিন্তু কুমার মহাশয়ের সঙ্গীদের মুখে মুখে কথাটা রাষ্ট্র হইয়া গেল।

সুশিক্ষিত না হইলেও সরকারজীর তাল জ্ঞান ছিল, এরূপ ভুল তাঁর বড় হইত না। শাস্ত্র বচন স্মরণ করিয়া তিনি কুমারকে অতঃপর নিজের প্রভাব অনুভব করিতে দিতেন না এবং মিত্রবৎ আচরণ করিয়া তাঁহার দোষ সংশোধনের চেষ্টা করিতেন। একদিনের কথা বলি। কুমার একটা ব্যাঘ্রশিশু পুষিয়াছিলেন। ক্রমে সে বড় হইয়া লোকভীতির কারণ হইল —কেন না কুমার বাহাদুর তাহাকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিতে দিতেন না। এদিকে তাহার ছোট খাট জীব হত্যা চলিতে লাগিল, একদিন একটা ভেড়া মারিয়া ফেলিল। কুমারকে সাহস করিয়া কে সে অত্যাচারের কথা জানায়? মহারাণী-মাতার গোচর করিতে কাহারও সাহস হয় না। বাবু সরকার কুমারের জর শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে গেলেন, এবং কথায় কথায় সেদিন ব্যাঘ্র-শাবকের দৌরাত্ম্যের গল্প করিয়া রহস্যের স্বরে বলিলেন —"সেই সময় বরকন্দাজদের প্রতি আক্রমণের উদ্যোগ করাতে তাহারা বাঘকে মারিয়াছে।" কুমার সরকার মহাশয়ের ইঙ্গিতটুকু বুঝিয়া বিরক্ত হইলেন। বলা বাহুল্য বাঘ মারিয়াছে এ কথায় বিশ্বাস করিলেন না। একটু পরে সরকারজীর সঙ্গে আমরা কৌতূহলী হইয়া ব্যাঘ্রশাবক দেখিতে গেলাম। ইহার মধ্যেই সে ভয়ানক হইয়াছিল। সেই সম্মোহত মেধটাকে সম্মুখে করিয়া বসিয়া আছে,— জনতা দেখিয়া মহা বিরক্ত হইয়া উঠিল এবং বিড়াল শিশুর মত ফোঁস্ ফোঁস্ করিতে লাগিল। তার পর কয়বার লাঠির খোঁচা খাইয়া প্রাপ্তযৌবন শার্দ্দূলবৎ গর্জ্জন করিয়া উঠিল। এমন সময় তাহার রক্ষক ও আহারদাতা রামসুন্দর খানসামা আসিল। বড় উত্যক্ত হইলেও বাঘটা তাহার পায়ে লুটাইয়া পড়িল এবং নানারূপে কৃতজ্ঞতা জানাইল।

কুমারের বিবাহের পর তাঁহার শ্বশুর মহাশয় কিছু দিন মধ্যে ষ্টেটের নূতন বন্দোবস্ত করাইবার জন্য জামাতাকে পরামর্শ দিতে লাগিলেন। মহারাণী নিজে কুমারের হাতে সব ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, বৈবাহিকের ক্ষমতা প্রতিপত্তি লাভের চেষ্টা সন্দেহের চক্ষে দেখিবার প্রবৃত্তি স্বতঃই তাঁহার ছিল না। কিন্তু সরকারজী কর্ত্তব্যবোধে নিজের হিতাহিত তুচ্ছ করিয়া ইহার বিপক্ষে দাঁড়াইলেন। প্রথম প্রথম চক্ষুলজ্জায় পড়িয়া কুমার শ্বশুরের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন, কিন্তু সরকারজীর প্রতিবাদে তাহার অবৈধতা বুঝিতে পারিলেন। তখন রায় মহাশয়ের

সহিত বাবুসরকারের অহিতকুল সম্বন্ধ দাঁড়াইল। পুটিয়ার রাজ-সংসারের শেষদিকটার কাহিনী ন্যূনাধিক পরিমাণে সেই দ্বন্দ্বেরই ইতিহাস মাত্র।

এই সময়ে বাবুসরকার মহাশয়কে বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইয়াছিল। এবং তিনি যেরূপ নিষ্ঠা ও দৃঢ়চিত্ততার সহিত রাজসংসারের কল্যাণ কামনায় সকল প্রকার স্বার্থের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহা উচ্চশ্রেণীর রাজমন্ত্রীর উপযুক্ত। নূতন ম্যানেজার দক্ষ ও সুশিক্ষিত ব্যক্তি হইলেও সকল বিষয়ে সরকার মহাশয়ের মত গ্রহণ করিয়া কাজ করিতেছেন, ইহা সাধারণে বুঝিতে পারিল। রায় মহাশয় সদলবলে এবং সরকারজীর অন্যান্য শত্রুরা ইহাতে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন। মহারাণীমাতা এই কর্ম্মচারীর অদম্য ব্যয় সঙ্কোচের চেষ্টায় মহাবিরক্ত হইয়াছেন বুঝিতে পারিয়া নিন্দুকেরা সুবিধা পাইল। বিশেষত দুই একটা বিষয়ে সরকার মহাশয় মাতার পরিণামে শুভোদ্দেশেই বোধহয় তাঁহার মানসিক ক্লেশের কারণ হইয়াছিলেন। একদিন আমায় বলিলেন—"দেখ, বাবুকে আগে বড় বিশ্বাস করিতাম, কিন্তু সেবার * * হইতে বিশ্বাস একেবারে গিয়াছে। রাজ সংসারের হিতকারী হইতে পারে, কিন্তু আমার অহিতকারী। খালিসার সেলামী তহবিল যে আমার হাত হইতে লওয়া হইল, উহার পরামর্শ ব্যতীত তাহা হইতে পারিত না।**"

মাতার এইরূপ বিরূপতা বুঝিতে পারিয়া সরকারজীর প্রতি অসূয়া পরবশ লোকেরা তাঁহার সমক্ষেই বিদ্রূপ করিত। বৃন্দাবন দত্ত মহারাণী মাতার পিতার আমলের কর্ম্মচারী এবং তাঁহাকে কোলে পিঠে করিয়াছিল। একদিন আমরা মার কাছে বসিয়া আছি, এমন সময় এই ব্যক্তি আসিয়া কি কথায় বলিল,—"ইহার মধ্যে কালেকটর সাহেব আছেন।" আমি কিছু বুঝিতে না পারিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি হাসিয়া বলিলেন—"উহারা বাবু সরকারের ঐ নাম রাখিয়াছে।" ইহাতে উপস্থিত কেহ বলিল যে কালেকটর সাহেবের যে সাদামুখ। দত্তজা বলিল—"মা সুধাইয়াছিলেন—ম্যানেজারের উপর কে?—ম্যানেজারের উপর কলেকটর।" ম্যানেজার বাবু ঐজীর সব কথা শোনেন, ইহাতেই এই রূপকের কল্পনা!

পুটিয়া ইংরেজী বিদ্যালয়ে ছাত্রেরা একটা দরওয়ানের ঔদ্ধত্যে বিরক্ত হইয়া তাহাকে প্রহার করিয়াছিল। হেড্‌মাষ্টার বাবু দরওয়ানের পক্ষাবলম্বন করেন। কমিটীতে ছেলেদের বিচার হইল। পরদিন আমি মহারাণীমাতাকে প্রণাম করিতে গিয়া তাঁহার কাছে বসিয়া আছি এমন সময় কুমার আসিলেন। কথায় কথায় আমায় স্কুল কমিটীর বিচারের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। কুমার ছেলেদের দিকে, কমিটীর বিচার তাহাদের বিরুদ্ধ হইয়াছিল—ইহাতে তিনি সন্তুষ্ট হন নাই। বলিলেন—"সরকারজী জয়কেতে, শুনিলাম বলিয়াছিল হেড্‌মাষ্টার বাবুর মতেই আমার মত। কেবল দেওয়ানজী আসল কথা বলিয়াছিলেন।" বাবুসরকার স্কুলের মেম্বর শুনিয়া মহারাণী মাতা হাসিলেন, বলিলেন "সে মেম্বর হইয়া কি করে?" কুমার চলিয়া গেলে মা বলিলেন—"কাল কোকাও বাবুসরকারের সঙ্গে আমার কাশী যাওয়ার কথা হইয়াছিল। বাবু বলিল

যে আপনি কাশীতে থাকিলে অনেক খরচ করিবেন। আমি বলিলাম, না, আমায় যে দিব্য করিতে বল, করিতেছি। তথাপি বলিল, বিশ্বাস নাই। নিজের স্বভাব দিয়া অন্যকে দেখে। নিজে যেমন অবিশ্বাসী!" এই সময় মাতা সম্বাদপত্র পড়িতেছিলেন, তাহাতে পুরীর রাজার দ্বীপান্তর বাসের বিবরণ ছিল। আমায় বলিলেন, পড়িয়া দেখিও।

বাম্নু সরকার মহাশয়ের মাসতুতো ভাই কৃষ্ণানন্দ মহারাণী মাতার জায়গীর সেরেস্তায় কাজ করিতেন, এই সময় তাঁহার দ্বারা বিস্তর তহবিল তছরূপাতের কথা জানা গেল। মা তখন বাম্নু সরকারের উপর বড় বিরক্ত—একদিন গোবিন্দ মজুমদার দেখা করিতে আসিলে আমার সমক্ষে তাঁহাকে বলাইলেন—"কেমন দেখিলেন ত চোরে চোরে মাসতুতো ভাই!" মজুমদার মহাশয় হাসিলেন, বলিলেন "না, বাম্নু আর চোর নয়!" মা তাহা বিলক্ষণ জানিতেন, তথাপি রহস্য করিবার জন্য পুনরায় বলাইলেন —"শুনিয়াছিলেন, দেখিলেন!"

অযোধ্যা প্রদেশে যাওয়ার আগে কুমার মহারাণীকে লুকাইয়া যে উইল করেন, তাহাতেই বাম্নু সরকার তাঁহার অত্যন্ত বিরাগভাজন হইয়াছিলেন, অন্য কেহ কুমারকে ইহাতে প্রবৃত্ত করাইতে পারিত না। কুমার যাত্রার আগে দেখা করিতে আসিলে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে বলিলেন—"এ সংসারে কেবল বাম্নু সরকারকেই চিনিয়াছিলে! কিন্তু শকুনি যেমন কুরুকুল নষ্ট করিয়াছিল, বাম্নু সরকার তেমনি রাজসংসার মাটী করিল। * * *"

ইহার পর আবার কাশী গমনের প্রস্তাব উঠিল। কয়দিন ধরিয়া ইহার আলোচনা চলিলে পর আমি মহারাণী মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"মা, কাশী যাওয়াই কি স্থির হইল?" * * তিনি বলিলেন—"তাহাই স্থির। সেদিন ম্যানেজারের সঙ্গে সেই কথা হইতেছিল। তিনি বলিলেন, সেখানে আপনি থাকিতে পারিবেন না, অনেক ব্যয় পড়িবে। মন্মোহন সান্ন্যালকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি জায়গীরের সকল টাকাই খরচ হইতেছে কিছুই বাঁচিতেছে না। এ অবস্থায় কাশী গিয়া চলিবে কিরূপে? আমি উত্তর করিলাম, মানুষের সকল দিন সমান যায় না। এখন টাকা আছে সেইরূপ খরচ করিতেছি! পরে যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইবে, তেমনি খরচ করিব। শ্রীনাথ ভাদুড়ীর কাছে জানিয়াছি, মাসে হাজার টাকা হইলেই হইবে।" মা বলিতে লাগিলেন— "অমনি বাম্নু সরকার বলিয়া উঠিল, তাহা হইলে আপনাকে শ্রীনাথ ভাদুড়ীর অধীনে থাকিতে হইবে, কিম্বা আজ কাশী হলো না, কাল বৃন্দাবন, এইরূপ করিতে হবে। তাচ্ছিল্যের স্বরে এই সব কথা বলিল। আমার কষ্টবোধ হইল, ভাল করিয়া শুনিলাম না। সেদিন ত্রৈলোক্যকে দিয়া বাম্নুকে বলাইয়াছিলাম—যে প্রথমে তুমি কি ছিলে? কারখানার মুহুরী! তার পর কি হও? কারখানার দারোগা! তার পর আজ কি হইয়াছ? কে এসব করিয়া দিল? বাম্নু সরকার বলিয়াছে আমি বলিলে এ সব হইতে কাস্ত হইতে পারে। * * *"

উইল করিয়া কুমার পশ্চিম চলিয়া গেলে নানালোকে মহারাণী মাতাকে নানারূপ পরামর্শ দিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই সম্বন্ধে মন্ত্রগুপ্তিটা বেশী মাত্রায় রক্ষিত হওয়ায় মাতার মন সন্দেহান্দোলিত হইয়া উঠিয়াছিল। "তিনি ২।১

কন বিজ্ঞ লোকের সঙ্গে এ বিষয়ে যুক্তি পরামর্শও না করিয়াছিলেন এমত নহে। কিন্তু সরকার মহাশয় ইহা পছন্দ করিতেছিলেন না। মার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া এত্তালা করিলেন—যে আজ তাঁর শরীর কিছু অসুস্থ, কয়টা কথা বলিতে চান। কথাগুলো একটু মোটা হইবে। মহারাণী উত্তর করেন, মোটা কথা শুনিতে তিনি চান না। তারপর সরকারজী বলিলেন, তিনি শুনিতেছেন যে নির্ব্বোধ লোকেরা তাঁহাকে পরামর্শ দিতেছে, তাহারা সাক্ষাতে বলিলে ভাল হয়, বাবুসরকার সকলের সঙ্গে তর্ক করিতে প্রস্তুত আছে। তর্কে পরাস্ত হইলে সে একশত জুতা খাইতে রাজি! মহারাণী উত্তরে বলিলেন—"সংসারে যত বুদ্ধিমান বাবুসরকার!" শেষে সরকারজী কহিলেন, "যদি কিছু অন্যায় হইয়া থাকে বুঝেন, আমাদিগকে বলিলেই হয়।" মহারাণী—"তার প্রয়োজন কি? যদি কিছু করিয়া থাক, মনে করিয়া দেখ।"

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

কন্‌গ্রেসের কথা।

কন্‌গ্রেস্ ভাঙিয়াছে, ঘটনার দিন দুই তিন মধ্যেই, বক্সার জেলে বসিয়া, এ সংবাদ শুনিতে পাই। কেন ভাঙিয়াছে, কি সূত্রে, কোন্ উপলক্ষে দুই দলে বিরোধের সূত্রপাত হয়, অনুমানখণ্ডে ইহাও একরূপ নির্দ্ধারণ করিতে পারিয়াছিলাম। পরে একজন বন্ধু সুরত হইতে কলিকাতায় ফিরিবার সময় আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যান। তাঁহার মুখে সকল ব্যাপারের পূর্ব্বাপর বিবরণ শুনিয়া আমার পূর্ব্ব সিদ্ধান্তই সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

কার দোষে কন্‌গ্রেস্ ভাঙিয়াছে, এখন এ কথা তোলা নিষ্প্রয়োজন। ইহাতে কেবল শুষ্ক ক্ষত আবার নতুন করিয়া দগ্‌দগে হইয়া উঠিবে। আর প্রশমিত উত্তেজনা পুনরায় উদ্বেলিত হইয়া, কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের ব্যাঘাত জন্মাইবে। কার দোষে কন্‌গ্রেস্ ভাঙিয়াছে, এ কথা ছাড়িয়া, কি উপায়ে ভাঙা কন্‌গ্রেস্ আবার জোড়া লাগিতে পারে, তারই আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

ফলত কন্‌গ্রেসের একটা অধিবেশনমাত্র হয় নাই, ইহাই সত্য। কন্‌গ্রেস্ নষ্ট হইয়াছে, একথা সত্য নহে। কন্‌গ্রেস্ বস্তুটা কি, ইহা একবার তলাইয়া দেখিলে, এরূপভাবে ইহার বিনাশ যে সম্ভব নহে, একথা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে।

কন্‌গ্রেস্ যে কারণে, যে সংকল্প লইয়া জন্মগ্রহণ করে, সে কারণ এখনো বর্ত্তমান, সে সংকল্প অল্প পরিমাণেও আজি পর্য্যন্ত সিদ্ধ হয় নাই। 'কারণ বিদ্যমানে কার্য্যের বিনাশ অসম্ভব। সংকল্প যত দিন আছে, ততদিন সংকল্পিত অনুষ্ঠানের বিলোপও অসম্ভব।

পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে দেশের লোকের মতামত অনুযায়ী রাষ্ট্রতন্ত্রকে সংযত ও সংগঠন করার অভাব যে পরিমাণে অনুভূত হইতেছিল,

আজ তাহা শতগুণে অধিক পরিমাণে অনুভূত হইতেছে। দেশের রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের সংস্কার ও সংশোধন পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে যতটা আবশ্যক ছিল, আজ তদপেক্ষা শতগুণে অধিক আবশ্যক হইয়াছে। আর পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে, রাষ্ট্রীয় আলোচনা ও আন্দোলনে দেশের লোকে যে পরিমাণে যোগদান করিতেন, আজ তদপেক্ষা শত, সহস্র গুণ অধিক যোগদান করিতেছেন। কন্‌গ্রেসের প্রয়োজন এবং কন্‌গ্রেস্ গঠনের সরঞ্জাম পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে যা ছিল, এখন তার চাইতে শতগুণে বেশী হইয়াছে। প্রয়োজন যত দিন আছে, আয়োজনও ততদিন স্বভাবের নিয়মেই বিদ্যমান থাকিবে। প্রয়োজন সাধনের উপযুক্ত উপকরণ যতদিন হাতের নিকটে পাওয়া যায়, ততদিন লোকে স্বভাবের নিয়মেই তাহার যথাযথ ব্যবহার করিতে চাহিবেই চাহিবে। দল বিশেষের দোষে দেশের এত বড় একটা অভাব নিবারণের আয়োজন একবারে নষ্ট হইবে, ইহা সম্ভব নহে।

কন্‌গ্রেস্ যে আবার বসিবে না, এ আশঙ্কা আমার নাই। এবারে, যেখানেই হউক, যাদের দ্বারাই হউক, আবার কন্‌গ্রেস্ বসিবে, এ বিশ্বাস আমার অটল। তবে এর জন্য একটু খাটা আবশ্যক।

কেহ কেহ পূর্ব্বকার মত দেশের সকল দলকে লইয়া কন্‌গ্রেস্ করিতে রাজি নহেন, এ কথা আমি জানি। কোনো কোনো লোকনায়কের কথাতে এভাব ইতিমধ্যে সুস্পষ্টরূপেই প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু ইহারা কন্‌গ্রেস্‌কে ভাঙিয়া দিতে পারিবেন বলিয়া বোধ হয় না।

প্রথমাবধিই কন্‌গ্রেস্ দেশের জনসাধারণের মুখপাত্ররূপে জগতের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। প্রথম প্রথম সাক্ষাৎভাবে জনসাধারণের সঙ্গে কন্‌গ্রেসের প্রতিনিধিগণের কোন বিশেষ যোগ স্থাপিত হয় নাই, তখন প্রকৃত পক্ষে কন্‌গ্রেস্ দেশের ইংরেজি নবিশদিগেরই সভা ছিল। কন্‌গ্রেসের, কথাবার্ত্তায়, ভাবস্বভাবে, আচার আদর্শে, এবং কার্য্যকলাপেও,—ইহা যে ইংরেজিনবিশদিগের অভাব অভিযোগ লইয়াই মুখ্যভাবে ব্যস্ত ছিল, তাহার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যাইত। সিবিল সার্ভিসের সংস্কার, শিক্ষিত লোকের রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইবার অবসর বৃদ্ধি, ইনকম্ ট্যাক্সের হারের ন্যূনকরণ, ইংরাজি উচ্চশিক্ষার বিস্তার, স্বেচ্ছা সেনাদল সংগঠন,—সে কালে এ সকলই কন্‌গ্রেসের প্রধান আধার ছিল। আর এগুলি প্রায় সকলই ইংরেজিনবিশদের অভাব ও অভিযোগের উপরে প্রতিষ্ঠিত। দেশের জনসাধারণের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে, এ সকলের তেমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল না। এক রাজধানী ভিন্ন, আর কোথাও, কন্‌গ্রেসের কথা অশিক্ষিত জনমণ্ডলীমধ্যে প্রচার করিবারও তেমন আয়োজন হয় নাই। দেশের লোকে তখন কন্‌গ্রেসের নাম শোনে নাই, কন্‌গ্রেসের মর্ম্মও বোঝে নাই। কিন্তু সে কালেও কন্‌গ্রেসের নেতৃবর্গ ইংরেজসরকার ও ইংরাজসমাজের সমক্ষে দেশের লোকের প্রতিনিধি স্বরূপই দাঁড়াইয়াছিলেন। দেশের জনসাধারণের মুখপাত্ররূপেই তাঁহারা বিদেশী রাষ্ট্রশক্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া, দেশের জনসাধারণের নামেই কখনো তাঁহাকে শাসাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, কখনো বা তাঁহার অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়া আপনার কার্য্যোদ্ধার করিতে চাহিয়াছেন।

দেশের জনসাধারণের প্রতিনিধিদের অভিমানেই কন্‌গ্রেসের যা কিছু মান মর্য্যাদা। দলের মুখপাত্র বলিয়াই কন্‌গ্রেস্ এতকাল আপনার পরিচয় দিয়া আসিয়াছে। এখানেই কন্‌গ্রেসের শক্তিসাধ্য প্রতিষ্ঠিত। কন্‌গ্রেস দেশের ও দশের জিনিষ।

এ কথাটা সকলের আগে বুঝিতে হইবে। যাঁরা একথাটা ভাল করিয়া বুঝিবেন, আর যাহাতে কন্‌গ্রেস্ দেশের ও দশের অভিমতের অধীনতা মানিয়া চলে, তার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন, তাঁদের দ্বারাই কন্‌গ্রেস্ আবার জোড়া লাগিবে। তাঁরাই এবারে কন্‌গ্রেস্‌কে আবার আগেকার মত বসাইতে পারিবেন।

কন্‌গ্রেস্ দেশের, দশের। কন্‌গ্রেস্ কোনো দলের নহে। চরমপন্থী, নরমপন্থী,—উভয় পন্থীরই প্রতিষ্ঠা দেশে, দেশ এ সকল দলকে অতিক্রম করিয়া আছে। ইহারা দেশের অংশ, দেশ ইহাদের অংশী। ইহারা দেশের অঙ্গ, দেশ ইহাদের অঙ্গী। অংশ অংশী অপেক্ষা ছোট, অংশীর চির অধীন। অঙ্গ অঙ্গী অপেক্ষা ক্ষুদ্র, চিরদিন অঙ্গীর বশীভূত। ইংরেজিতে বলে কুকুরই তার ল্যাজ নাড়ে, ল্যাজ কখনো কুকুরকে নাড়ে না। চরমপন্থী বা নরমপন্থী, যে কোনো পন্থী হউক না কেন, তাঁরা যদি দেশের কর্ত্তা হইয়া দশের ও দেশের উপরে হুকুম চালাইতে আরম্ভ করেন, তবে ল্যাজই কুকুরকে নাড়িবে, কুকুরের লাঙ্গুল সঞ্চালনের চিরাগত অধিকারের অস্তিত্ব আর থাকিবে না। যাঁরা আপনার মনমত কন্‌গ্রেস্‌কে গড়িতে চাহেন, আপনার পছন্দ সহি লোক লইয়া কন্‌গ্রেস্ করিতে ইচ্ছা করেন, বিরুদ্ধ মতের বা বিপক্ষদলের প্রবেশপথ কংগ্রেসের মন্দিরে একেবারে বন্ধ করিয়া দিবার জন্য উৎসুক, তাঁরা একথাটা যেন ভুলিয়া যাইতেছেন।

দেশের কাজ সম্বন্ধে, জাতির আদর্শ সম্বন্ধে, নানা লোকের নানামত থাকিবে, জানি। এরূপ মতবৈচিত্র স্বাস্থ্য ও জীবনেরই লক্ষণ, এ মতবৈচিত্রে কর্ত্তব্যকে জটিল করিয়া তুলিতে পারে, কিন্তু জীবনকে হীনবল করে না। কন্‌গ্রেস্‌কে আপন আপন মতানুযায়ী গঠন করিবার চেষ্টাও অসঙ্গত নহে। মতবৈচিত্র প্রকাশিত হইলেই বিভিন্ন মত আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টায় দশের মুখপাত্রস্বরূপ যে সকল অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান দেশের মধ্যে রহিয়াছে, সেগুলিকে আপনার করায়ত্ত করিতে সকল মতাবলম্বী লোকেই প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন। ইহা স্বাভাবিক। ইহাতে দোষের কথা কিছুই নাই। তবে এরূপভাবে এ সকল অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানকে করায়ত্ত করিবার একটা সৎপন্থা ও একটা অসৎপন্থা আছে। সৎপন্থা অবলম্বনে যাঁরা এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁদের চেষ্টা যে কেবল সফল হইবে, তাহা নহে; তদ্দ্বারা দেশের শক্তিবৃদ্ধি ও কল্যাণই সাধিত হইবে। অসৎপন্থা অবলম্বনে, বিপরীত ফল ফলিবে।

কন্‌গ্রেস দেশের ও দশের। তাঁরা যা বলেন কন্‌গ্রেস তাহাই বলিবে। তাঁরা যা করান, কন্‌গ্রেস তাহাই করিবে। সুতরাং কোনো দলবিশেষ যদি কন্‌গ্রেসকে আয়ত্ত করিতে চাহেন, কন্‌গ্রেসের মুখ দিয়া যদি আপনার দলের কথা বলাইতে চাহেন, তবে তাহাদিগকে আগে দেশ ও দশকে অধিকার করিতে হইবে। সকলের আগে দেশের লোককে আপনার মতে আনিতে হইবে।

দেশের লোক যখন তাঁদের মত গ্রহণ করিবে, তখন কন্‌গ্রেসও তাঁদের কথাই বলিবে। কন্‌গ্রেসে দলবিশেষের আত্মপ্রতিষ্ঠার এই একমাত্র উপায় আছে। চরমপন্থী ও নরমপন্থী সকলেই এই উপায় করিতে পারেন।

কিন্তু দেশের লোকে যতদিন না, স্পষ্টভাবে, আপনার প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া, সেই সকল প্রতিনিধির মুখে, কোনো মত বিশেষ বা আদর্শবিশেষকে প্রকাশ্যে পরিহার করিয়াছে, ততদিন অপর দল, অপর মত, বা অপর আদর্শের সেবক যাঁরা, তাঁদের কাহারো কন্‌গ্রেস হইতে আপনার বিপক্ষ দল বা বিরোধী মতকে তাড়াইয়া দিবার কোনো অধিকার নাই।

চরমপন্থীদের মতামত যতটা জানি, তাঁদের ভাব স্বভাব যতটা বুঝিয়াছি, তাহাতে একথা নিঃসঙ্কোচভাবে বলিতে পারি যে, তাঁরা কোনো দল, কোনো মত, দেশের কোনো আদর্শকে জোর করিয়া বা জেদ করিয়া কন্‌গ্রেসের বাহিরে রাখিতে চাহেন না। তাঁরা একথা জানেন যে আপনার মত, বা আদর্শ নিবন্ধন, একজন ব্যক্তিও যদি কন্‌গ্রেসের বাহিরে থাকেন, কন্‌গ্রেস যদি আপনার সঙ্গে দেশের সকল মত, সকল ভাব, ও সকল আদর্শের যথাযোগ্য সমাবেশ করিতে না পারে, তবে তাহা একটা দলেই সভা হইয়া দাঁড়াইবে, দেশের কন্‌গ্রেস আর থাকিবে না। দেশের লোকে যথানিয়মে যে কোনো ব্যক্তিকে আপনার প্রতিনিধিরূপে কন্‌গ্রেসে পাঠাইবেন, কন্‌গ্রেস যদি আপনার পূর্ব্ব পদ, গৌরব, ও অধিকার যদি অক্ষুন্ন রাখিতে চাহে, তবে তাঁহাকেই অবনত মস্তকে সভ্যরূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

নির্দ্দিষ্টসংখ্যক লোকের দ্বারা, নির্দ্ধারিত প্রণালীতে কোনো ব্যক্তি প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন কি না, কন্‌গ্রেস কেবল ইহাই দেখিবে। তাঁর মত কি, আদর্শ কি, পন্থা কি, তাঁহাকে যাঁরা নির্ব্বাচন করে, তাঁহারাই এ সকল কথার বিচার করিবে। এ বিচার করিবার অধিকার কন্‌গ্রেসের নাই। একটা বিশেষ সত্যপাঠ না লিখিয়া দিলে হলফ করিয়া কোনো মতবিশেষের আনুগত্য স্বীকার না করিলে কেহ কন্‌গ্রেসের সভ্য হইতে পারিবে না,—একথা এক কন্‌গ্রেসই কেবল বলিতে পারে, অপর কাহারো একথা বলিবার অধিকার নাই। কন্‌গ্রেসের অধিবেশনে, অধিকাংশের মতে যদি একথা গৃহীত হইত, তবে যতদিন তাহা কন্‌গ্রেসের দ্বারাই আবার রদ না হইয়াছে, ততদিন পর্য্যন্ত এরূপে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের স্বাধীনতা সংকুচিত থাকিতে পারে। কিন্তু কন্‌গ্রেস এখনো এমন কোনো নিয়ম প্রতিষ্টিত করেন নাই। কখনো কন্‌গ্রেস যে এতটা আত্ম বিস্মৃত হইবে, এ আশঙ্কাও আমার নাই। আজি পর্য্যন্ত কন্‌গ্রেস এরূপ আত্মঘাতী নীতি অবলম্বন করে নাই। এমন কি, যাঁরা কন্‌গ্রেসের প্রচারিত মত ও আদর্শের শত্রুতা করিয়াছেন, কন্‌গ্রেসের মূলে যাঁরা প্রকাশ্যে কুঠারাঘাৎ করিতে সংকুচিত হন নাই, কন্‌গ্রেস প্রথমাবধি তাঁহাদিগকেও আপনার বিশাল অঙ্কে স্থান দান করিতে কদাপি কুণ্ঠিত হয় নাই। কন্‌গ্রেস যখন তিন বৎসরের শিশু, তখনো আত্মরক্ষা অপেক্ষা সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সমধিক ব্যাকুল হইয়া, আপনার পরমশত্রু রাজা শিবপ্রসাদকেও তাঁহার মতামতের জন্য প্রতিনিধির অধিকার হইতে

বঞ্চিত করিতে চাহে নাই। কাশীর রাজা শিবপ্রসাদ সে সময়ে কন্‌গ্রেসের মূল আদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করেন। কিন্তু এই শিবপ্রসাদই যখন যথাবিধি প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া প্রয়াগের কংগ্রেসে উপস্থিত হন, কেহ তাঁহার এই অধিকার প্রতিরোধ করে নাই। আর আজ, প্রায় পঁচিশ বৎসর পরে, দেশের লোক কাহাকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিলে, দল বিশেষের মতের সঙ্গে তাঁহার মতের মিল নাই বলিয়া কি তিনি কংগ্রেসের সভ্য হইতে পারিবেন না? একথা যাঁরা সম্ভব বলিয়া ভাবেন, তাঁরা যে কন্‌গ্রেসের ইতিহাস, উদ্দেশ্য, আদর্শ ও প্রকৃতি, সকলই ভুলিয়া গিয়াছেন, এর কি আর কোনো সন্দেহ আছে?

কন্‌গ্রেস মরে নাই, কন্‌গ্রেসকে মরিতে দেওয়া হবে না। কন্‌গ্রেস দেশের, দেশের জন্য কন্‌গ্রেসকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। এ অবস্থায় কন্‌গ্রেসের বিলোপে দেশের অঙ্গহানি হইবে। দেশের মত, দেশের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার আর কোনো উপায় থাকিবে না। দেশের অবস্থার বিবর্ত্তনে কত দল গড়িবে, কত দল ভাঙ্গিবে। নদীতে যেমন ঢেউ উঠে, এসকল দলাদলি, সেইরূপ ক্ষুদ্র, ক্ষণস্থায়ী উর্ম্মিমালার মত। এসকলের আস্ফালন ক্ষণিক, কিন্তু স্রোতস্বিনীর স্রোত চিরপ্রবাহিত। ঢেউকে বাঁচাইবার জন্য কেহ স্রোত বন্ধ করে না। দলকে বাঁচাইবার জন্য কেহ সেইরূপ কন্‌গ্রেসকে বন্ধ করিতে পারেন না। মেহেতা দলপতি, দল রক্ষা তাঁর কর্ত্তব্য হইতে পারে। তিলক দলপতি, দলবৃদ্ধি করা তাঁর কর্ত্তব্য হইতে পারে। কিন্তু দেশ মেহেতা অপেক্ষা বড়, মেহেতার দল অপেক্ষাও বড়; তিলকের দল অপেক্ষাও অনেক বড়। নূতন দল, পুরাতন দল, চরমপন্থী নরমপন্থী, কেহই দেশের চাইতে বড় নহেন। দেশের জনসাধারণের মতামত, লোকমণ্ডলীর মনোগত ভাব ও আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা যে পরিমাণে যখন ইহারা অভিব্যক্ত করেন, তখন সেই পরিমাণে দেশে ইহাঁদের আধিপত্য ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে নূতন দলের নামও ত শোনা যায় নাই। তিন বৎসর, এমন কি, দুই বৎসর পূর্ব্বেও ত তিলকের প্রভাব এমন ভাবে কন্‌গ্রেসে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। আজ এঁরা এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে কেন? কোথা হইতে আজ তিলকের এই নেতৃত্ব, আর মেহেতার প্রতাপের এই হ্রাস হইল? দেশের লোকের মতিগতির পরিবর্ত্তন কি ইহার মূল ও প্রত্যক্ষ কারণ নহে? দুই বৎসর পূর্ব্বে মান্দ্রাজ একান্ত নরম ছিল, এবারে এতটা গরম হইয়া উঠিয়াছে কেন? একি কেবল একটা দুটো লোকের চক্রান্ত? আর তাই যদি হয়, যাঁরা অন্য মতাবলম্বী তাঁহাদিগকে অনুরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া, দেশের মতের উপরে, দেশের ভক্তি ও প্রীতির উপরে, আপনাদের মতামত ও নেতৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, তবেই তাঁরা সত্যভাবে, সঙ্গতরূপে, প্রতিদ্বন্দী মত ও প্রভাবকে ক্ষুদ্র করিতে পারিবেন। বিরোধী মতাবলম্বীদের সঙ্গে কাজ করিব না, কন্‌গ্রেস্ করিব না, এ কথা বলিলে কেবল ইঁহাদের দুর্ব্বলতা ও স্বেচ্ছাচারিতাই প্রমাণিত হইবে, শক্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে না। দেশের লোকে যাদের চাহে, তাহাদের লইয়াই কন্‌গ্রেস্ করিবে; —তাহাই সত্য কন্‌গ্রেস্ হইবে। দেশের

লোকের অধিকাংশের মতের বিরুদ্ধে যদি কেহ কন্‌গ্রেস্ হইতে সরিয়া পড়েন, তাহাতে কন্‌গ্রেসের কোনো অঙ্গহানি হইবে না।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

গৌড়কাহিনী।

স্বার্থ-সমন্বয়।

অনাদি কাল হইতে ভারতবর্ষের বিবিধ প্রদেশে যে জনশাসনপদ্ধতি ধীরে ধীরে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা সর্ব্বতোভাবে অনন্য সাধারণ বলিয়া উল্লিখিত হইবার যোগ্য। তাহাকে রাজশাসন বলিয়া অভিহিত করা যায় না। তাহাকে আত্মশাসন বলিলেও, তাহার প্রকৃত পরিচয় সম্যক্ ব্যক্ত হইতে পারে না। তাহা এক অনন্যসাধারণ সমাজতন্ত্র,—কেবল ভারতবর্ষেই তাহা পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল।

সত্যবটে প্রকৃতিপুঞ্জ কোন না কোন আকারের রাজশাসনের অধীনে বাস করিয়া কোন না কোন আকারের রাজকর প্রদান করিতে বাধ্য হইত। কিন্তু তাহারা সর্ব্বাংশে স্বাতন্ত্র্য সম্ভোগ করিয়াই সংসারযাত্রা নির্ব্বাহিত করিত। রাজা তাহাকে প্রকৃতিপুঞ্জের জন্মার্জ্জিত বিধিদত্ত অধিকার বলিয়া মানিয়া লইয়া, প্রকৃতিরঞ্জন করিয়াই রাজা-নাম সার্থযুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেন। রাজার রাজশ্রী বর্দ্ধিত করিবার জন্যই প্রকৃতিপুঞ্জ অবস্থিতি করিত না; বরং প্রকৃতিপুঞ্জের সংসারশ্রী রক্ষা করিবার জন্যই রাজা অবস্থিতি করিতেন। লোকে জানিত,—রাজা রক্ষক,—প্রতিপালক—নরদেবতা। তাঁহার প্রধান কার্য্য লোকরক্ষা, তজ্জন্যই তিনি রাজকর গ্রহণের অধিকারী। তাহা বেতন নহে;—তাহাও বিধিদত্ত অধিকার। রাজা প্রজা সকলেই বিধাতার নিকট হইতে আপন আপন অধিকার লাভ করিয়া শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে অধিকার পরিচালনার অধিকারী। সেই সীমার মধ্যেই রাজা রাজা,—প্রজা প্রজা।

"রক্ষার্থমস্য সর্ব্বস্য রাজানমসৃজৎ প্রভুঃ।"

বিধাতা লোকরক্ষার জন্যই রাজাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এই কথা কেবল ধর্ম্মশাস্ত্রের কথা নহে, লোকসমাজেও ইহা সুপরিচিত ছিল। রাজা রাজধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া, লোকরক্ষার পরিবর্ত্তে লোকসমাজের উদ্বেগকর অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইলে, লোকসমাজ বিধিদত্ত অধিকার রক্ষার্থ রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিত,—তাহা কদাচ "বিদ্রোহ" নামে কথিত হইত না!

এই অনন্যসাধারণ জনশাসনপদ্ধতি ব্যক্তিমাত্রের জন্মার্জ্জিত অক্ষুণ্ণ অধিকার বিঘোষিত করিয়া, ভারতবর্ষের সকল স্থানেই সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছিল। সমাজই সমাজকে শাসন করিত,—শাস্ত্র তাহার ব্যবস্থা স্থির করিয়া দিত,—রাজা বা রাজপুরুষগণ সেই ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত করিতেন। রাজার বিধিপালনের অধিকার থাকিলেও, বিধিপ্রণয়নের অধিকার ছিল না। অন্যান্য দেশের রাজা বিধিপ্রণয়ন করিয়া ভূস্বামী বলিয়া আত্মঘোষণা করিয়াছেন,—

প্রজাপুঞ্জ রাজকর প্রদান করিয়া ভূমি ব্যবহারের অধিকার ক্রয় করিয়া লইয়াছে! ভারতবর্ষের ভূমি ভারতবাসীর জন্মভূমি,—তাহা রাজার নহে, প্রজার,—দেশের লোকের জন্মার্জ্জিত বিধিদত্ত অধিকারের অন্তর্গত।

এত দীর্ঘকাল ধরিয়া এই সংস্কার বংশের পর বংশে সংক্রামিত হইয়া আসিতেছিল যে, শক হূণ প্রভৃতি,—যাহারা যখন রাজ্যশাসনের অধিকার কাড়িয়া লইতে সমর্থ হইয়াছে,—সকলেই প্রজা সাধারণের এই অক্ষুণ্ণ অধিকারের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াই ভারতশাসন করিতে বাধ্য হইয়াছে। রাষ্ট্রবিপ্লব কোনরূপ শাসন বিপ্লব সংস্থাপিত করিতে পারে নাই। ভারতবর্ষে আসিবার পর মুসলমানগণকেও ইহা স্বীকার করিয়া লইয়াই রাজ্যবিস্তারে ব্যাপৃত হইতে হইয়াছিল।

এই সকল কারণে গৌড়েশ্বর কখন কখন দিল্লীশ্বরের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেও, গৌড়ীয়গণ বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইত না। তাহারা দিল্লীশ্বরকে জানিত না,—তাহারা গৌড়েশ্বরকেও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জানিবার প্রয়োজন অনুভব করিত না। তাহারা গ্রামপতি, মণ্ডলপতি, বিষয়পতি প্রভৃতি সামন্তগণকেই জানিত;—তাঁহাদিগকেই রাজা বলিয়া মানিত। দিল্লীশ্বর যখন গৌড়েশ্বরকে পরাভূত করিয়া বিজয়োৎফুল্ল হৃদয়ে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন, তখন তাঁহাকে মৌখিক শিষ্টাচার অথবা যথাসম্ভব উপঢৌকন লইয়াই পরিতৃপ্ত হইতে হইত। তাহা রাজকর নহে,—উৎকোচ মাত্র। তাহার মাত্রা যত কেন বর্দ্ধিত হউক না, তাহা কদাচ প্রকৃতিপুঞ্জকে স্পর্শ করিতে পারিত না। বরং সময় এবং সুযোগ পাইবামাত্র হিন্দুমুসলমান সমভাবে দিল্লীশ্বরকে অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিতে ইতস্ততঃ করিত না! তাহারা ইহার জন্য অস্ত্রধারণ করিত,—মুণ্ডদান করিত,—বংশের পর বংশ স্বদেশের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ করিত। এই প্রবৃত্তি হিন্দুমুসলমানকে সমভাবে আকর্ষণ করায়, গৌড়ীয়গণের নিকট দিল্লীশ্বর দেশবৈরি বলিয়া পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। হিন্দুর ন্যায় মুসলমানেরাও তাঁহাকে শত্রু বলিয়া মনে করিতে শিক্ষা করিয়াছিল। এই কারণে গৌড়রাজ্যের সমরকলহে মুসলমান মুসলমানের রক্তপান করিতে কুণ্ঠিত হইত না। দেশগত স্বার্থের নিকট জাতিগত বা ধর্ম্মগত স্বার্থ মস্তক উত্তোলিত করিতে পারিত না। যাঁহারা দিল্লীশ্বরের প্রতিনিধি হইয়া—তাঁহার নিকট হইতে "সনন্দ" লাভ করিয়া,—তাঁহার নামে রাজ্যশাসন করিবার জন্য এদেশে উপনীত হইতেন, তাঁহারাও দেশের লোকের এইরূপ স্বাতন্ত্র্যলিপ্সার পরিচয় পাইবামাত্র, স্বাধীনতালাভের চেষ্টা করিতে বিরত হইতেন না। ইহার জন্যই দিল্লীশ্বরের পক্ষে গৌড়রাজ্য করতলগত রাখিবার সকল চেষ্টা বিফল হইয়া পড়িতে লাগিল!

গৌড় কাহিনীকে কাহারও দিগ্বিজয় কাহিনী বলিয়া বর্ণনা করিবার উপায় নাই। তাহা এক অনির্ব্বচনীয় স্বার্থসমন্বয়-কাহিনী! কখন হিন্দু-বৌদ্ধ-সমন্বয় কাহিনী,—কখন বা হিন্দুমুসলমান-সমন্বয় কাহিনী! দিল্লীশ্বর পুনঃ পুনঃ গৌড়রাজ্যে অধিকার বিস্তারের চেষ্টা করায়, এই স্বার্থসমন্বয় সহজে সংসাধিত হইয়াছিল।

গৌড়রাজ্য ভারতবর্ষের অন্তর্গত হইলেও, তাহা পুরাকাল হইতে একটি স্বতন্ত্র সাম্রাজ্য-রূপে আত্মমর্য্যাদা সংস্থাপিত করিয়া আসিয়াছে। সুদূর সমুদ্র পথে নানা দিগ্দেশের সহিত সুপরিচিত হইয়া, গৌড়রাজ্য সকল বিষয়েই স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছিল। সাহিত্যে, শিল্পে, বাণিজ্যে, সমাজতন্ত্রে এই স্বাতন্ত্র্য স্পৃহা সর্ব্বত্র পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে।

পুরাতন সংস্কার চিরস্থায়ী করিয়া রাখিবার আশায় আর্য্যাবর্ত্ত হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ সময়ে সময়ে এদেশে আসিয়া পুরাতন প্রথায় সমাজশাসনের চেষ্টা করিতে ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু তাঁহারাও অল্পকালের মধ্যে গৌড়ীয় স্বাতন্ত্র্যস্পৃহার অনুরক্ত হইয়া সর্ব্বতোভাবে "গৌড়ীয়া" হইয়া পড়িতেন। এদেশের জলবায়ু, এ দেশের শস্যশ্যামলা স্বর্ণভূমি এদেশকে প্রকৃতির লীলানিকেতন করিয়া রাখিয়াছিল। যাহারা এদেশে বাস করিতে আসিয়াছে, তাহারাই সমন্বয়ের প্রয়োজন অনুভব করিয়াছে। তজ্জন্য গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের সকল ব্যাপারেই স্বার্থ-সমন্বয়ের প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

দিল্লীশ্বর এদেশে আপন শাসন চিরস্থায়ী করিবার চেষ্টায় পুনঃপুন ব্যর্থ মনোরথ হইয়াও আশা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। নাসির-উদ্দীন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর আরসলান খাঁর পুত্র মহম্মদ তাতার খাঁ লক্ষ্মণাবতী রাজ্যে স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। নাসীর উদ্দীনের পর সুলতান ঘিয়াসউদ্দীন বলবন্ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনিও গৌড়রাজ্য করতলগত করিবার জন্য নানা আয়োজন করিয়াছিলেন। তাতার খাঁ একবার মৌখিক বশ্যতা স্বীকার করায়, দিল্লীশ্বর তাঁহাকে ওমরাহ মধ্যে আসন দান করিয়াছিলেন। তাঁতার খাঁর পর গৌড়-রাজ্য আবার নানা বিপ্লবে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে।

তাতার খাঁর পর সের খাঁ, সের খাঁর পর আমিন খাঁ দিল্লীশ্বরের সনন্দ লইয়া লক্ষ্মণাবতীর শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইঁহারা শাসনক্ষমতা পরিচালিত করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। অধ্যাপক ব্লকম্যান ইঁহাদিগকেও গৌড়াধিপতি বলিয়া গণনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু গোলাম হোসেনের রিয়াজ-উস্-সলাতিনে ইঁহাদের নাম পর্য্যন্তও উল্লিখিত হয় নাই। আমিন খাঁর অধীনে তুখরাল নামক জনৈক নাএব ছিলেন। তিনি আমিন খাঁকে পরাভূত করিয়া ১২৭৯ খৃষ্টাব্দের সমসময়ে সুলতান মখিসউদ্দীন নাম গ্রহণ করিয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। বলবন্ তাঁহাকে পরাভূত করিবার জন্য বঙ্গদেশে আগমন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

সুলতান মখিসউদ্দীন দুর্ব্বল হস্তে অসি ধারণ করিতেন না। সকল ইতিহাসেই তিনি সাহসী এবং সুচতুর বলিয়া সুপরিচিত। তিনি দিল্লীর শাসনপাশ ছিন্ন করিয়া আত্মশক্তি সুদৃঢ় করিবার আশায় কামরূপ, এবং উড়িষ্যার কিয়দংশ নিজ অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন। সুলতান বলবন্ এই উদ্ধত গৌড়েশ্বরকে পরাভূত করিবার আশায় অযোধ্যার শাসনকর্তা আমিন খাঁকে সেনাপতি করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। আমিন খাঁ পরাভূত হইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলে,

ক্রোধান্ধ বলবন তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করেন। মল্লিক তরমিনি নামক অন্য সেনাপতি গৌড়ে আসিয়া পরাভূত হইবার পর সম্রাটকে স্বয়ং সেনা চালনার ভার গ্রহণ করিতে হইল—

মখিসউদ্দীন পূর্ব্ববঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দিল্লীশ্বর লক্ষণাবতী অধিকার করিবার জন্য হাসামুদ্দীন নামক সেনাপতির উপর আদেশ করিয়া স্বয়ং পূর্ব্ববঙ্গে ধাবিত হইলেন। তৎকালে সুবর্ণগ্রাম হিন্দুরাজার অধীন ছিল। রিয়াজ-উস্-সলাতিন গ্রন্থে তিনি ভুজ রায় নামে উল্লিখিত। কিন্তু তারিখ-ই-ফিরোজসাহী গ্রন্থে তাঁহার নাম দনুজ রায় বলিয়া লিখিত আছে। রায় দিল্লীশ্বরের সহায়তা সাধন করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। মখিসউদ্দীন নিহত হইলে, সম্রাট লক্ষণাবতীতে উপনীত হইয়া নাগরিকগণকে নির্দ্দয়রূপে নিহত করিয়াছিলেন। এই হত্যাকাণ্ডে রমণী ও শিশুগণও নিষ্কৃতিলাভ করে নাই! *

ইহার পর সম্রাটের প্রিয়পুত্র বোখরা খাঁ সুলতান নাসির উদ্দীন নাম গ্রহণ করিয়া লক্ষণাবতী রাজ্যের শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন। শাসনশৃঙ্খলা সুসংস্থাপিত করিবার উদ্দেশ্যেই সম্রাট আপন পুত্রের উপর শাসনভার সমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি প্রকাশ্য দরবারে নাসিরউদ্দীনকে স্বাধীন সুলতানের ন্যায় ছত্রদণ্ড ব্যবহারের ক্ষমতা দান করিয়া জনসাধারণের মনস্তুষ্টিসাধনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে পিতা পুত্রকে যে সকল উপদেশ দান করেন রিয়াজ-রচয়িতা তাহার সারাংশ গ্রন্থনিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তারিখ-ই- ফিরোজসাহী গ্রন্থে তাহার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। প্রজাসাধারণের মনস্তুষ্টি সাধন করিতে না পারিলে লক্ষণাবতী রাজ্যে দিল্লীশ্বরের শাসন দীর্ঘস্থায়ী হইবার সম্ভাবনা নাই,—সম্রাট ইহা বুঝিতে পারিয়াই পুত্রকে যথাযোগ্য উপদেশ দান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। †

এই উপদেশ বাক্যের মধ্যে সেকালের

*The author of Tarikh-i-Firuz Shahi remarks that on both sides of the principal *bazaar* of Lakhnauti that was more than one *karoh* long, scaffolds were set up, and men women and children were hanged !

† In the levy of revenues from subjects, he should observe the middle course, that is, he should not levy such a low amount that they should become refractory and disloyal, nor such an excessive amount that they should be ground down and oppressed. And he should pay such an amount of salary to his officers, that it may suffice for them from year to year and that they may not be pinched in regard to their necessary expenses. In matters of administration, he should take counsel with wise people who are sincere and loyal, and in the enforcement of orders, he should abstain from self-indulgence and should not act unjustly from selfishness. In the care for the condition of the army, he should not be negligent, and he should consider it incumbent upon himself to show them considerateness and to win their hearts, and he should not allow negligence and indolence to intervene. And whoever tempts you away from this course, you should look upon him as your enemy, and you should not listen to his talk—*Riaz-us-Salateen,*

ঐতিহাসিক তথ্য প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। ইহা কেবল স্বার্থসমন্বয় সাধিত করিবার উপদেশ। সম্রাট বাহুবলে জয়লাভ করিয়া পাশবশক্তিতে নাগরিকগণকে নির্দ্দয়রূপে নিহত করিয়া, আপন প্রিয়পুত্রকে সিংহাসনে সংস্থাপিত করিবার পর বুঝিতে পারিয়াছিলেন —বাহুবলে গৌড়রাজ্য চিরপদানত রাখিবার সম্ভাবনা নাই। তজ্জন্য তিনি পুত্রকে উপদেশ দান করিতে গিয়া যে শাসননীতির অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বকালে প্রশংসালাভের যোগ্য। রাজকর যৎসামান্য হইলে রাজশক্তি সু-সংস্থাপিত হয় না; রাজকর প্রজার যথাসর্ব্বস্ব শোষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেও রাজশক্তি সুসংস্থাপিত হয় না। প্রজাসাধারণের মধ্যে যাহারা রাজভক্ত ও বিচক্ষণ তাহাদের পরামর্শ উপেক্ষা করিয়া রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইলে শুভফল সমুৎপন্ন হইতে পারে না। স্বার্থসমন্বয় ভিন্ন গৌড়রাজ্যে দিল্লীশ্বরের শাসনক্ষমতা দৃঢ়-সংস্থাপিত করিবার অন্য উপায় নাই বলিয়াই দিল্লীশ্বরকে এই পথ অবলম্বন করিতে হইয়াছিল।

এতদিন দিল্লীশ্বরগণ লক্ষ্মণাবতীররাজ্য করতলগত করিবার চেষ্টা করিয়া বিপ্লবের উপর বিপ্লবে দেশের লোককে ব্যতিব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে নূতন শাসন-নীতি প্রবর্ত্তিত করিয়া দিল্লীশ্বর গিয়াসুদ্দীন বলবন্ শান্তি সংস্থাপনের জন্যই ব্যাকুলতা প্রকাশিত করিলেন। স্বার্থসমন্বয় সাধিত না হইলে, প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না। সেকালের ভারতসম্রাট তাহার কথা চিন্তা করিবামাত্র স্বার্থসমন্বয়ের আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। গৌড়েশ্বর দিল্লীশ্বরের সমকক্ষ শাসন স্বাধীনতা লাভ করিতে না পারিলে অল্পকালের মধ্যেই স্বাতন্ত্র্যলাভের চেষ্টা করিবেন, ইহা বুঝিতে পারিয়াই বলবন্ গৌড়েশ্বরকে ছত্রদণ্ড ব্যবহারের অনুমতি দান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নূতন রাজনীতি সুসংস্থাপিত করিবার আশায় আপনার প্রিয়পুত্রকে সিংহাসন দান করিয়া বলবন্ দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর গৌড়রাজ্যে নূতন শাসননীতি প্রবর্ত্তিত হইল।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

মনীষা।

[মিশ্রকাব্য]

সে আবেগ-ভ্রান্ত কণ্ঠে মিলাল' যখন মম গীত
বিস্ফারি' নয়ন-পদ্ম নারী-দল কি কৈল ইঙ্গিত
রমুচ্ছে হাসিল সবে আর শুষ্ক অর্থহীন হাসি।
অমনি মনীষা কহে ঘৃণাহাস্তে আপনা প্রকাশি'

"এ বুলবুল কণ্ঠ শুনি গুলেস্তাঁর গোলাপ সুন্দরী
খুলিবে না ঘোমটা তাহার। এ কাক-স্বর-লহরী
শুনিয়া বায়সীকুল আদরিবে তোমারে রমণি!
অথবা ময়ূরী-দল বাখানিবে তব কণ্ঠধ্বনি।
ইহারে কি গীত বলে? মাত্র ইহা প্রেমের কবিতা।
এ সব শুনিলে মনে পড়ে মোর মিশর-বণিতা
দাসী হ'য়ে ছিল যবে—আদরিয়া তরে নরকুল
বাঁশী-স্বরে নিত লুটি' তাহাদের স্বাধীনতা ফুল।
আঁকিয়া নরকন্ধার স্বর্গসম মোহন বরণে
আপনি সাজিত ভৃত্য দাসীত্বের কঠোর জীবনে
নারীরে বাঁধিতে ছলে। মনে পড়ে ছিল সহচরী
কপট পতির লাগি কাঁদিত সে দিবস শর্ব্বরী।
বলিত সে—"কত গান গাহি' মোর হৃদয় বল্লভ
আদর করিত মোরে"। পুরুষের এই চাটু রব
সঙ্গীত রচিত সুধু ক্ষুদ্র স্বার্থ সাধিতে আপন।
সঙ্গীত কি এরি তরে? সাধিবারে মহৎ প্রয়োজন
সঙ্গীত জাগিল বিশ্বে। রচিয়াছি মোরাও যতনে
কত উত্তেজনা-গীতি, ছন্দে ছন্দে বিদ্যুৎ বচনে
নাচায়ে উৎসাহ আশা;—সঙ্গীতের তাই'ত' সৃজন,
তেজোমুক্ত উন্নতির পথে নিখিল মানব মন
লইবে টানিয়া;—তা' না হ'য়ে ধিক্ দিক্—অর্থহীন
করিব তাহারে হায়—প্রেম-ফাঁসে বেঁধি' অনুদিন
মহান্ উৎসার তা'র? প্রেম এরা এরে বলে হায়!
এ সব বাসর-রঙ্গ তার চেয়ে কিছু কাল পায়
যদি ধরাতলে লোপ—শীতে যথা বাদুড়ের কুল,
নিদ্রাভঙ্গে নরনারী ফিরিয়া হেরিবে সুবিপুল
নারীর মহিম-বৃক্ষ সমুন্নত উঠেছে জাগিয়া।
তখন তাহার তলে ফলভরা ছায়ার লাগিয়া
কাতর প্রার্থনাময় শুনা যাবে নর-কণ্ঠ-কল-
ধ্বনি, মোরা ভৃত্যসম রহিব না ভীরু অচপল,—
দুলিবনা শিশুসম আদরের দোলায় চড়িয়া,—
হইব জীবন্ত শক্তি—নব বিশ্ব তুলিব গড়িয়া,

আপনাতে পূর্ণ হ'ব,—ঋণী নাহি র'ব কা'র কাছে ;
যাক্—মাত্র আলাপনে আর কিবা আবশ্যক আছে ?
জান যদি কেহ তবে হেন গান গাহ না এখন
শিক্ষা ও আনন্দ যাহে হয়—গাহ বর্ণিয়া কেমন
তোমাদের দেশে নারীকুল চলিছে উন্নতি পথে !

৫

এত কহি' সমুৎসুক বিস্ফারিত নয়ন-আলোতে
উজ্জ্বল করিয়া মোর সারা হিয়াখানি, চেয়ে রয়
অন্য মনে হেমকান্তি শোভনা মনীষা মণিময়
ভুজঙ্গিনী বেণী দুলাইয়া। তখন আলোড়ি স্মৃতি
খুঁজিতেছি এমনি সঙ্গীত,—সহসা প্রণষ্ট-ধৃতি
উচ্ছ্বসিত-চাপল্য-আবেগে নিকুঞ্জ গাহিয়া উঠে
অসংযতভাষাবদ্ধ কদর্য্য সঙ্গীত,—দ্রুত ছুটে
কণ্ঠ তা'র উচ্ছৃঙ্খল কুরুচি ভঙ্গীতে না মানিয়া
নারীর সম্ভ্রম। পশ্চাৎ হইতে বসন টানিয়া
মন্মথ ইঙ্গিত কৈল থামাইতে গান,—আমি তা'র
করিনু ভ্রূকুটি।—বেলার নয়ন-পদ্ম লজ্জাভারে
মুকুলিয়া গেল। কহিলা মনীষা "ক্ষান্ত দেহ" ; ক্রোধে
আর প্রেমাবেগে আমিও গভীর ঘৃণালজ্জা বোধে
"থাম থাম বর্ব্বর !" কহিয়া মারিনু সুদৃঢ় মুঠি
বক্ষোপরে তা'র। চমকিয়া ত্রাসে দাঁড়াল সে উঠি',—
ভয়-রুদ্ধ রামাকুল-কণ্ঠ-স্বনে দিগন্ত ভরিল
দস্যু যথা আক্রমিলে রাজপুরী ; বেলা চীৎকারিল
"মৃত্যু—মৃত্যু—ঘেরিল চৌদিকে।" রাজ্ঞী কহিলা অমনি
"চল—চল—গৃহে যাই ;—আন্ আন্ ঘোটকী এখনি।"
অমনি ছুটিল ক্ষিপ্র শুভ্র-বক্ষ-স্নেহ-কপোতীকুল
সন্ধ্যাগমে হেরি যেন প্রায়াগত ঝটিকা তুমুল।
আমি দাঁড়াইয়া একা মন্মথের সনে সে শিবিরে
প্রিয়া শূন্য কাতর হৃদয় বহি'।—নিকুঞ্জের শিরে
বরষিনু লক্ষ অভিশাপ। সে আশা-প্রতিমা দূরে
বিদায়-দিগন্তে ধায় শুনিতেছি কানে,—অশ্বখুরে

উঠে ধ্বনি কঠিন নির্ম্মম,—আমার সমস্ত সাধ
বলিদান করি যেন কে বাজায় বাজনা-নির্ঘাত
স্রোতস্বিনী সেতু'পরে। সহসা উঠিল ধ্বনি—
"রাজ্ঞী—রাজ্ঞী—ডুবে যায়,—কি করিস্ তুহারা রমণী।"
ক্রোধান্ধ মনীষা হায়! সেতুভ্রষ্ট পড়িয়াছে নীরে।
আলোক হইতে আমি ক্ষিপ্রপদে ছুটিনু তিমিরে,
হেরিনু ধুতুরা-সম স্ফীতপ্রান্ত রাণী-বেশ তা'র
ঘুরিছে পতনমুখে। চাহিলাম মাত্র একবার।—
বিলম্বের নাহি কাল—ঝাঁপ দিনু জলে ; নারীবেশে
ছিনু আমি—জড়াইয়া ডুবিলাম নীরে ; বহু ক্লেশে
ধরিনু তাহারে এক হাতে ;—অন্য হাতে বাহি নীর
ব্যর্থ চেষ্টা করিলাম পঁহুছিতে তটিনীর তীর।
নারী-জগতের আজি একমাত্র আশা বক্ষোপরে
বহিয়া চলেছি! দীর্ঘশাখ তরু এক স্রোতোভরে
ভগ্ন মূল লুটায়ে পড়েছে মধ্যজলে,—জটাজাল
উদ্বেল তরঙ্গে ডুবাইয়া। সেই কৃষ্ণ সুবিশাল
আশ্রয় ধরিয়া আমি বহুক্লেশে উত্তরিনু তীরে।

সেথায় সঙ্গিনী দল তারকিত-প্রদোষ-তিমিরে
অস্পষ্ট দাঁড়ায়ে ছিল। আমি তথা উত্তরিতে
সহচরী একজন নামাইয়া লইল ত্বরিতে
হস্ত হ'তে সে লাবণ্য-ভার। পরীক্ষি' কহিল সবে
"আছেন বাঁচিয়া"। শিবিরে সকলে মিলি' ধীরে তবে
বহিয়া লইল মনীষারে। আমি কিন্তু লজ্জাভাবে
উন্মীলিত নেত্র-দীপ্তি ডরিয়া অস্তবে অন্ধকারে
পথ বাহি' অশ্বহারা পদব্রজে ফিরি মনে বনে
(মক্ষিকা যেমতি ফিরে মধু ল'য়ে মধুর গুঞ্জনে
দূর হ'তে মধুচক্র চিনি) উত্তরিনু সিংহদ্বারে—
শিল্প আর বিজ্ঞানের মর্ম্মর মূরতি দুই ধারে
শোভিতেছে তা'র—সারি সারি লৌহ-বৃতি দৃঢ় অতি
ঘনিষ্ঠ বিন্যাসে রহি' রোধিতেছে অবারিত গতি।

দুয়ারে খোদিত আছে কিরাত পশিয়া দুঃসাহসে
স্নান-রতা দিয়ানারে উলাঙ্গিনী নেহারি রহসে
উপবনে,—মৃগত্ব লভিয়া স্থির নেত্রে সুবিশাল
শৃঙ্গ তুলি' দাঁড়ায়ে রয়েছে।

যুগ্ম-শৃঙ্গ-অন্তরাল-
পথে ছিল স্থান, আমি তদুপরে স্থাপিয়া চরণ
বহু ক্লেশে করিলাম সেই দ্বার-শিরে আরোহণ.
নামিলাম ক্ষেত্র' পরে,—বহিয়া চলিনু পুষ্প সারি,
বহুবর্ণে চিন্তারাজি সমুদিল মানসে আমারি,—
ধরায় খদ্যোৎ জ্বলে—উর্দ্ধাকাশে জ্বলে তারা-দল,—
হেরি হেরি দুর্গ-পার্শ্বে ঘুরি ফিরি ভ্রমিনু চঞ্চল,
দীপ্ত কালপুরুষের অন্তরীক্ষে স্বচ্ছন্দ-ভ্রমণ
প্রায় শেষ হইয়া আসিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

রাজা ও রাণী।

অনেক দিন ভুলিয়া ছিনু—
　সে ছিল মোর কাছে!
সহসা যেন শুনিনু বাণী—
　"রাণী সে আসিয়াছে!"

মনের সনে খুলিনু দ্বার,
　পথের পানে চাই;
স্বপন-ছবি মতন সবি
　দেখি! সে আসে নাই!

আমি যে তারে ভুলিয়া গেছি—
　ঠিক কি ভুলিয়াছি?
ঠিকই, মোরে সে গেছে ভুলে'
　তাই ত বেঁচে' আছি!

আমারে সে যে ভুলিয়া যাবে
আমারি সেই সাধ!
তবু এ মনে এখনো জাগে,
—ক্ষম সে অপরাধ!

স্বপনে সে যে উঠিবে ফুটি'—
ছবির মত তাহা;
স্বপনে পায়ে পড়িব লুটি',
জাগিয়া কব "আহা"!

এমনি চির বাসনা রাশি
উঠিল গেল ভেসে'—
অদূরে চারু মুরতি হাসি'
ফুটিল এলোকেশে!

—"তুমি সে দেবী, সে দেবী রাণী,
হেরিনু ও তনু যা'?"—
মনের ভুলে করিনু মনো-
বনের ফুলে পূজা!

মুখর চিত' মুখ সে মূক,—
অপরিচিতা এ কি?
হেলায়ে গ্রীবা খেলা এ, কিবা
স্মরিল মোরে দেখি'?

হোক সে খেলা, হোক সে হেলা
হোক সে আর কিছু—
না চলে ফিরে', আঁচলে ঘিরে'
করিল ঘাড় নীচু।

চকিতে আজি প্রকৃত রাজা
প্রণয়-শাসনের,
ও কৃপা-কণা মানিনু সোনা
সিংহ-আসনের।

বঙ্গদর্শন।

রপ্তানি ও দুর্ভিক্ষ।

যখন অনাবৃষ্টিহেতু হরিত শস্যদল পীত হইতে থাকে, পীত শস্যদল অগ্নিতুল্য রৌদ্রে দগ্ধ হইতে থাকে, তখন নিরুপায় কৃষক, ভগবানের নিকট করযোড়ে প্রার্থনা করিয়া, তৃষিত চাতকের ন্যায় আকাশের দিকে চাহিয়া থাকে। তেমনি যখন হতভাগ্য ভারতবাসী দুর্ভিক্ষের অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া মরিতে থাকে, তখন আমরা, হতভাগ্য ভারতবাসী, দুঃখে যন্ত্রণায় অভিভূত হইয়া, আমাদিগের পার্থিব ভগবান গবর্ণমেণ্টের নিকট, করযোড়ে সাশ্রুনয়নে খাদ্য শস্যের রপ্তানি বন্ধ করিবার জন্য বিনীত সকরুণ নিবেদন করি। শতবার নিবেদন করিয়া হতাশ হইয়াছে, তবুও অবোধ মন বুঝে না। দুর্ভিক্ষ হইলেই অমনি গবর্ণমেণ্টের নিকট সেই মামুলি নিবেদন আবেদন। যে আমাদের ক্রন্দন শুনিবে না, যে আমাদের দুঃখ জানিয়াও তাহার উচিত প্রতীকার করিবে না, বা করিতে অসমর্থ, তাহারই নিকট কেবল আমরা পুনঃপুনঃ কাঁদি, নিজে প্রতীকারের কোন চেষ্টা করি না। গবর্ণমেণ্ট আমাদের ক্রন্দনে যে উত্তর দেন, তাহা কি ব্যঙ্গ, না তাহা স্বার্থান্ধ লোকের ভ্রান্তি, না তাহা ইংলণ্ডের ধনবিজ্ঞানের বিষময় ফল? যে অবাধ বাণিজ্যে ভারতের হৃদয়শোণিত গল্‌গল্‌ করিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে, যে অবাধ বাণিজ্যে প্রত্যেক সুবৎসরে ভারত হইতে কম বেশী ছয় কোটি মণ খাদ্য শস্য বাহির হইয়া যাইতেছে, অর্থাৎ এক কোটি ভারতবাসীর সম্বৎসরের আহার বিদেশীরা গ্রাস করিতেছে, যে অবাধ বাণিজ্য যতই দীর্ঘকাল ভারতে চলিতেছে, দুর্ভিক্ষ ততই শীঘ্র শীঘ্র ও অধিকতর বিস্তৃতভাবে ভারতে পরিব্যাপ্ত হওয়ায় উত্তরোত্তর অধিক লোক অনাহারে মরিতেছে বা নিদারুণ যন্ত্রনা ভোগ করিতেছে, সেই খাদ্যশস্য শোষণকারী অবাধ বাণিজ্য-মহিমা, দুর্ভিক্ষের হাহাকারের মধ্যে, ঘোষণা করিতে সরকার বাহাদুর কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেছেন না।

দেশের শস্য দেশে থাকিলে দেশের লোকে খাইতে পায়, এবং দেশের শস্য, দেশের বাহিরে গিয়া বিদেশীয়ের উদরে গেলে, দেশের লোকে তাহা খাইতে পায় না—এ কথা আমরা স্বতঃসিদ্ধ বিবেচনা করি। কিন্তু সরকার বাহাদুর তাহার বিপরীত সিদ্ধান্ত করেন। সরকার বাহাদুরের মতে এ দেশের শস্য এ দেশে থাকিলে এ দেশে আরও অধিক দুর্ভিক্ষ হইবে, এবং এদেশের খাদ্য শস্য অন্যদেশে গেলে এদেশে

কম দুর্ভিক্ষ হইবে। এ কথাটা এরূপ সহজভাবে বলিলে ক্ষিপ্তের উক্তি বলিয়া মনে হয়। সরকার বাহাদুর এরূপ অনাবৃতভাবে এ কথা বলেন নাই। যে দেশে খাদ্য শস্য অভাবে ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ হইতেছে, সে দেশের খাদ্য শস্যের রপ্তানি প্রথমেই বন্ধ করা কর্ত্তব্য—এই যে স্বতঃসিদ্ধ জাজ্বল্যমান সত্য কথা, সরকার বাহাদুর এমন জটিল কুতর্কজালে জড়িত করিয়াছেন, যে সহসা সরল পাঠকের তাহাতে ধোঁকা লাগিয়া যাইতে পারে। আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি, নানা বিদ্যায় পারদর্শী, ধনবিজ্ঞান-চর্চ্চায় বহুকাল হইতে অভ্যস্ত। আমাদের দেশের সংবাদপত্রে উগ্র ও অসংযত ভাষায় যে সকল যুক্তি ক্রমাগত প্রয়োগ করা হয়, গবর্ণমেণ্ট অনেক সময় তাহার কোন উত্তর দেন না। কিন্তু যখন উত্তর দেন, এমন প্রশান্তভাবে যুক্তি কৌশল ও তর্ক জাল বিস্তার করেন যে অনেক সময় অথবা সহসা তাহা খণ্ডন করিতে অসমর্থ হইয়া আমরা নিরুত্তর থাকি, অথবা ব্যঙ্গে কথা লিখিয়া, আসল কথাটা চাপা দেই অথবা যুক্তির অভাবে মনের বেদনায় গালি বর্ষণ করি। আমরা এই প্রবন্ধে ধীরভাবে গবর্ণমেণ্টের তর্কগুলি আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

গবর্ণমেণ্ট রপ্তানি বন্ধ করার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত যুক্তি মালা প্রদর্শন করেন--

১। রেল বিস্তার হওয়ায় দুর্ভিক্ষকষ্ট মোচন করা সুসাধ্য হইয়াছে। সুতরাং রপ্তানি বন্ধ করার আবশ্যক নাই।

২। রপ্তানি-হেতু খাদ্য শস্যের মূল্য অধিক হইয়াছে। তাহাতে কৃষকের অধিক লাভ হইতেছে। ভারতে কৃষকের সংখ্যা অধিক। যাহা অধিক লোকের মঙ্গলজনক, তাহাই প্রকৃতপক্ষে দেশের মঙ্গলকর। সুতরাং রপ্তানিতে ভারতের মঙ্গল হইতেছে।

৩। রপ্তানি নিবন্ধন ভারতের কৃষকগণ অধিক শস্য উৎপাদন ও সঞ্চয় করে। উক্ত উদ্বৃত্ত শস্য দুর্ভিক্ষের সময় ভারতবাসীর আহারের জন্য পাওয়া যায়।

৪। খাদ্যশস্যের রপ্তানি বন্ধ করিলে পাট প্রভৃতি খাদ্যেতর বস্তুর চাষ বাড়িবে এবং খাদ্য শস্যের চাষ কমিয়া যাইবে।

৫। ভারত হইতে রপ্তানি বন্ধ করিতে হইলে, ভারতের এক প্রদেশ বা জেলা হইতে অপর প্রদেশ বা জেলাতেও রপ্তানি বন্ধ করিতে হয়। তাহা অসঙ্গত।

৬। ভারতে যে শস্য উৎপন্ন হয় তৎতুলনায় রপ্তানি শস্য অতি কম।

৭। ভারতের খাদ্য শস্য দুর্ভিক্ষে দুর্ম্মূল্য হইলে অবাধ বাণিজ্যে তখন আপনা আপনি রপ্তানি খুব কমিয়া যায়।

৮। দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে যাহা কিছু দোষ তাহা আকাশের, রপ্তানির নহে।

৯। রপ্তানি বন্ধ করিয়া অবাধ বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করা ধনবিজ্ঞান বিরুদ্ধ।

এক্ষণে কে বলে এ গুলি ক্ষিপ্তের উক্তি? অথবা যদি ইহাকে ক্ষিপ্তের উক্তি বলিতে চাহেন তাহা হইলে, হ্যামলেটের ক্ষিপ্ততার ন্যায়, এই ক্ষিপ্ততাতে যে শৃঙ্খলা আছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে। যাহা হউক এক্ষণে উপহাস না করিয়া, ধীরভাবে এই তর্কগুলি আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

১। সরকার বাহাদুরের প্রথম যুক্তি। রেলপথ বিস্তৃত হওয়ায়, দুর্ভিক্ষ ক্লিষ্ট প্রদেশে

সহজে খাদ্য শস্য প্রেরণ করা যায়। সুতরাং রপ্তানি বন্ধ করিবার আবশ্যক নাই।

এই যুক্তিটী মূলতই ভুল। কারণ অবাধ বাণিজ্যের আনুকূল্যে ভারতে রেলপথের বিস্তার দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করিয়াছে। কেননা, যখন রেল ছিল না, ভারতের শস্য ভারতেই থাকিত, তখন যে যে বৎসরে ভাল শস্য হইত সেই সেই বৎসরের উদ্বৃত্ত শস্য এত অধিক পরিমাণে দেশে সঞ্চিত থাকিত, যে তাহার পরে দুই এক সন অনাবৃষ্টি হইলে, দেশে দুর্ভিক্ষ বা অন্নকষ্ট হইত না। ১৮৭০ সালে ভারতের গম মোটেই রপ্তানি হয় নাই। যেমন রেলের বিস্তার হইল, অমনি গমের রপ্তানি আরম্ভ হইল। ১৮৮৯ সাল হইতে ১৮৯০ সাল পর্য্যন্ত ৩০,০০০,০০০ বুশেল গম ভারত হইতে রপ্তানি হইয়াছিল।* আর এখন রেল বিস্তারে প্রত্যেক সুবৎসরে ১ কোটি বা ১৷৷০ কোটি মণ গম রপ্তানি হইতেছে।

অবাধ বাণিজ্য ও রেলবিস্তারগুণে চাউল এখন কম বেশী ৪৷৫ কোটি মণ প্রত্যেক সুবৎসরে ভারত হইতে রপ্তানি হইতেছে। রেলবিস্তার না হইলে, অবাধ বাণিজ্য চলিলেও, ভারতে এত দুর্ভিক্ষ হইত না। কারণ, পথের সুগমতার অভাবে রপ্তানি এত অধিক পরিমাণে চলিত না। সুতরাং দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে রেলপথের সুগমতা ও রপ্তানি বিবেচনা করিলে, সহজে বুঝা যায়, রেল দুর্ভিক্ষের নিবারক নহে, রেল দুর্ভিক্ষের প্রবর্ত্তক। সুতরাং রেল বিস্তার রপ্তানির অনুকূল যুক্তি নহে, রপ্তানির প্রতিকূল যুক্তি। রেল বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে খাদ্য শস্যের রপ্তানির বৃদ্ধি হইয়া, দুর্ভিক্ষ হইতেছে, এ কথা অনেক তীক্ষ্ণদর্শী উদার ইংরাজও স্বীকার করেন।

অবাধ বাণিজ্যে কেবল যে শস্যক্ষয় হইতেছে তাহা নহে, পাটের অধিক রপ্তানি হওয়ায় পাটের দর বৃদ্ধি হইয়াছে। তাহাতে পাটের চাষ বৃদ্ধি পাওয়ায় গমের ও চাউলের চাষ কমিয়া যাইতেছে। তাহাতেও খাদ্য শস্যের অভাব বাড়িতেছে।

ইউরোপে খাদ্যশস্যের মূল্য এত কমিয়া গিয়াছে যে সেখানকার ধনতত্ত্ববিৎগণ, ভারতের দুর্ভিক্ষ দুর্দ্দশা লক্ষ্য না করিয়া ভ্রান্ত হইয়া বলিয়া থাকেন যে বর্ত্তমান সময় জগতে লোকসংখ্যার অনুপাতে, প্রয়োজন অপেক্ষা শস্যের অধিক আয়োজন হইয়াছে—At the present time production is in advance of demand (Pearson's Principles of Economics VI. p. 120) ইউরোপে খাদ্য শস্যের প্রচুরতায় তাহার মূল্যের হ্রাস হওয়ায় ইউরোপবাসী দিগের সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইতেছে এ কথা স্বীকার করিতে ইংরাজ ধনতত্ত্ববিৎ অনিচ্ছুক নহেন। কিন্তু ভারতের খাদ্য শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইয়া দুর্ভিক্ষ হওয়া (অথবা দুর্ভিক্ষ হওয়ায় খাদ্য শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হওয়া) যে ভারতের ঘোর দুর্দ্দশা ও দারিদ্রের স্পষ্ট প্রমাণ, এ নিতান্ত সহজ কথা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কোন মতেই স্বীকার করিবেন না—যেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। মনুষ্য চিত্তের একটি দুর্ব্বলতা আছে। মানুষ যাহা নিজের স্বার্থহেতু করিয়া থাকে, তাহাতে অপরের ঘোর অমঙ্গল হইলেও

* Pearson's Principles of Economics

নিজেকে বুঝাইয়া তোলে যে সে অমঙ্গল, অমঙ্গল নহে; তখন মানুষ নানা কুতর্কে আপনার চিত্তকে ভ্রান্ত করিয়া, আপনার হৃদয়কে নানা মিছা প্রবোধ দিয়া অবশেষে বিশ্বাস করিয়া ফেলে যে লোভে পড়িয়া নিজের লাভের জন্য, সে অন্যের যে ক্ষতি করিয়াছে, তাহা ক্ষতি নহে, তাহা তাহার মঙ্গল; যে মনুষ্য প্রবল হইয়া নিজের লাভের জন্য অন্যের উপর অত্যাচার করে সেও অবশেষে বিশ্বাস করিয়া বসে যে অত্যাচারটা অত্যাচার নহে, সেটা অত্যাচার-পীড়িত ব্যক্তির পক্ষে একটা পরম শুভপ্রদ বিধান, কেবল বেচারা বুদ্ধি অভাবে না বুঝিয়া অনর্থক আর্ত্তনাদ করিতেছে। আমাদের দেশের বড় বড় সরকারী ইংরাজী আমলাদের মধ্যে সেইরূপ ভ্রম হইয়া থাকে।

কিন্তু ক্ষতিকারী ব্যক্তি এইরূপে ভ্রান্ত হইলেও, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি এবং নিঃস্বার্থ সমালোচক বা দর্শক তাহাতে ভ্রান্ত হন না। অন্নাভাবে যে ব্যক্তির দেহ কঙ্কালবৎ হইয়াছে তাহাকে প্রচুর খাদ্যে পুষ্ট-প্রফুল্ল, স্বাস্থ্যের নধর মূর্ত্তি বলিলে তাহাকে বিশ্বাস করিবে? দুর্ভিক্ষের হাহাকারকে উৎসবের আনন্দগীতি বা কৃষককুলের সৌভাগ্যের ও উন্নতির অকাট্য প্রমাণ বলিয়া ব্যবস্থাপক সভায় ঘোষণা করিলে, এমন বোকা ভারতবাসী কে আছে যে তাহা বিশ্বাস করিবে? রোগের হেতুকে রোগের ঔষধ বলিয়া ব্যাখ্যা করিলে রোগী কি সুস্থ হয়? যে রেলবিস্তার অবাধ বাণিজ্যের সহায় হইয়া, দেশের খাদ্য-শস্য দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করিতেছে, যে রেল বিদেশ-পণ্য আনিয়া ভারতীয় বিপণি হইতে স্বদেশী-বস্ত্রাদি পণ্য দূরীভূত করিয়া তন্তুবায় প্রভৃতি স্বদেশী শিল্পীদিগের জীবিকা নির্ব্বাহের পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে, এবং তাহাদিগের বুকের উপর স্থায়ী দুর্ভিক্ষ বা অন্নাভাবস্বরূপ পাষাণ চাপাইয়া দিয়াছে, সেই রেল বিস্তারকে দুর্ভিক্ষ মোচনোপায় বলিয়া বর্ণনা করিলে, ভারত হৃদয় বিষাদের অগাধ জলে ডুবিয়া যায় এবং মনে করে, এ কি কর্ত্তৃপক্ষের ব্যঙ্গ না ভ্রম প্রমাদ!

ফল কথা, যতদিন ক্ষুধার্ত্ত ভারত হইতে অন্ন অবাধে নিষ্ক্রান্ত হইবে, ততদিন লৌহ-বাষ্প যান ভারতের মিত্র নহে, পরমশত্রু— ততদিন তাহার অগ্রসরগতির সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভিক্ষ, মৃত্যু ও হাহাকার প্রসারিত হইবে। সরকারী ইংরেজ আমলা বলেন, যে "এক্ষণে রেল যেরূপ বিস্তৃত হইয়াছে তাহাতে দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট প্রদেশে অন্ন অনায়াসে প্রেরিত হইতেছে, সুতরাং অন্নের রপ্তানি বন্ধ করিবার প্রয়োজন নাই।" আমরা বলি, রেল অতিশয় বিস্তৃত হইয়াছে বলিয়াই রপ্তানি অচিরাৎ বন্ধ করা উচিত, নতুবা লৌহময়ী রেল-রাক্ষসী অহর্নিশি ভারতের অন্ন ও জীবন হরণ করিতে থাকিবে, এবং ভারতের চতুর্দ্দিকে দুর্ভিক্ষ ও মৃত্যু বিক্ষিপ্ত করিবে। আমাদের বোধ হয়, যতদিন রপ্তানি চলিতে থাকিবে, প্রত্যেক মালট্রেনের উপর যদি একটা নিশান তুলিয়া দেওয়া হয় আর সেই পতাকাতে "দুর্ভিক্ষ ও মৃত্যু" বড় বড় অক্ষরে লিখিত থাকে, তাহা হইলে যেখানেই রেল যাইবে সেখানেই তাহার বিষময় ফল স্বরূপত সূচিত হয়।

সরকারের দ্বিতীয় যুক্তি।

"রপ্তানিতে শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে। মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় শস্যোৎপাদক কৃষিজীবির অধিক লাভ হইতেছে। ভারতে কৃষিজীবি

লোক অধিক। অধিক লোকের যাহাতে অধিক লাভ হয় তাহা বন্ধ করা উচিত নহে।” —কথাটা কেমন উদার, মোলায়েম। দেখুন, দরিদ্র কৃষকগণের প্রতি গবর্ণমেণ্টের কত দয়া। দুঃখের বিষয় যখন খাসমহলে খাজনা বৃদ্ধি করায় কৃষকগণ নিঃসম্বল হয়, তখন এই উদারনীতির পরিচয় পাই না। যাহা হউক, ও কথা ছাড়িয়া দিয়া তর্কটার বিচার করিয়া দেখা যাউক। প্রথম কথা, শস্যের মূল্যবৃদ্ধি হইলে তাহার লাভ কৃষক ভোগ করিতে পায় কিনা। দ্বিতীয় কথা, যদি কৃষক তাহার লাভ ভোগ করিতে পায়ও তাহাতে দেশের অন্য কোন সম্প্রদায়ের এমন ক্ষতি হয় কি না যাহাতে কৃষকের লাভ নগণ্য ও উপেক্ষণীয় হইয়া উঠে।

(ক) যেখানে শস্যের মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খাজানা বৃদ্ধির আইন * বা প্রথা আছে অথবা যেখানে “র‍্যাক্‌রেণ্টিং” (rack-renting) আছে, অর্থাৎ খাজনা ডাকনিলামে বা প্রতিযোগিতা দ্বারা নিরূপিত হয়, সেখানে খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় খাজনা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। তাহাতে কৃষকের লাভ হয় না। যেখানে উৎপন্ন শস্যের অদ্ধেক বা অন্য কোন নির্দ্দিষ্ট অংশ রায়ত জমীদারকে খাজনা স্বরূপ দেয় (যেমন “ভাউলিয়া”) এবং অবশিষ্ট অংশ নিজে খায়, সেখানেও শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় কৃষকের কোন লাভ নাই। কারণ যে অংশ সে নিজে সপরিবারে খায় তাহার মূল্য কমই হউক আর বেশীই হউক তাহাতে ক্ষুধানিবৃত্তি সম্বন্ধে কোন তারতম্য হয় না।

(১) কি জমিদারী মহালে, কি গবর্ণমেণ্টের খাসমহালে, অধিকাংশ প্রজা, জমীদার অথবা মহাজন অথবা উভয়ের নিকট এত ঋণী থাকে, যে তাহাদিগের নিজের ভরণপোষণের অতিরিক্ত যে শস্য থাকে তাহার মূল্য জমিদারের ও মহাজনের ঘরে যায়। আর এক কথা, খাদ্যের মূল্য যদি স্থায়ী ভাবে বাড়ে তাহা হইলে কৃষক দৈনিক-মজুরকে যে মজুরি দেয় তাহাও বাড়িয়া যায় সুতরাং সেই অনুপাতে চাষের খরচ অধিক হয়! কেবল চাষের খরচ অধিক হয় তাহা নহে, এদেশে যে সকল বস্তু প্রস্তুত হয় তৎসমুদয়ের মূল্যও বাড়ে। সুতরাং শস্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষকের খরচও বাড়িয়া যায়। কেবল কৃষকের নহে জমিদারের ব্যবহার্য্য অনেক বস্তুর মূল্য বৃদ্ধি হয়। তিনি আমলাগণের ও ভৃত্যগণের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিতে বাধ্য হন। ইহাতে জমিদারগণেরও শেষে বিশেষ লাভ হয় না।

(২) কিন্তু প্রধান কথা এই, শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইলে অনেক সময়ে খরিদ্দার ব্যাপারীর লাভ হয়; কৃষকের বিশেষ লাভ হয় না। যখন ফসল হয়, তখন গবর্ণমেণ্ট জমীদারের নিকট সদর খাজনা চাহেন; জমীদার কৃষককে খাজনার জন্য পীড়ন করেন, কৃষক জমিদারের খাজনার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠে। সকল কৃষক, এক সময়েই মাল বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক হওয়ায় বাজারে এককালে অনেক মালের আমদানি হয়। এদিকে খরিদ্দারগণ কখন কখন এককাট্টা হইয়া কম দর দেন। কিন্তু কৃষক, দারিদ্র্য হেতু মাল ঘরে আটক রাখিয়া দর বাড়াইতে

* See Bengal Tenancy Act. Sec. 30.

পারে না। সুতরাং অল্প মূল্যে সে মাল ছাড়িতে বাধ্য হয়। ধনী খরিদ্দারগণ সেই মাল খরিদ করিয়া, কতক মাল ঘরে আটক রাখিয়া অনায়াসে মূল্য বাড়াইতে পারে, এবং বাড়াইয়াও থাকে। সুতরাং এই মূল্য বৃদ্ধিতে খরিদ্দার ব্যাপারীরই লাভ; কৃষকের লাভ হয় না।

আর একটা বিষম কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কোন কোন সওদাগর ইংরাজ কোম্পানি পূর্ব্বে টাকা দাদন দিয়া নির্দ্দিষ্ট কম মূল্যে ঐ কোম্পানির নিকট শস্য বিক্রয় করিবার চুক্তি পত্র কৃষকদিগের নিকট লেখাইয়া লন। এইরূপে ইংরেজ কোম্পানি অল্প মূল্যে শস্য ক্রয় করিয়া অধিক মূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকেন। এই তথ্য কোন কোন সংবাদপত্রে প্রকশিত হইয়াছিল।—যে দিক দিয়া দেখা যাউক, শস্যের মূল্যবৃদ্ধি হওয়াতে কৃষক বেচারার লাভ হয় না। এই সকল যুক্তির সহিত কৃষককুলের প্রত্যক্ষীভূত অবস্থাও মিলে। কেননা আমরা দেখিতে পাই যে শস্যমূল্য ক্রমশ বৃদ্ধি হইতেছে; তথাপি কৃষকের অবস্থা কিছুই উন্নত হইতেছে না। বরঞ্চ কৃষককুল দিন দিন নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছে। এক বৎসর অজন্মা হইলেই তাহারা জমিদারের খাজনা দিতে পারে না, মহাজনের ঋণের টাকা পরিশোধ করিতে পারে না, বাকী খাজনার দায়ে তাহাদের অনেকেরই জোত জমা নিলাম হইয়া যায়; তখন তাহাদের মধ্যে অনেকেই আধপেটা খায়, অথবা না খাইয়া মারা পড়ে। যদি শস্য রপ্তানি না হইত, তাহা হইলে জমীদার বা মহাজন, বা গবর্ণমেণ্ট যাহারই হস্তে যাউক দেশের শস্য দেশেই থাকিত এবং নানা পথ দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া শেষে দেশের লোকের মুখেই আসিয়া পড়িত। কেন না, কি জমীদার, কি মহাজন, কি গবর্ণমেণ্ট, কেহই পরিমিত খাদ্যের অধিক খাইতে পারেন না।

(খ) যদি এ কথা মানিয়া লওয়া যায় যে, রপ্তানিতে বস্তুতঃই কৃষকের উন্নতি হইতেছে, তাহা হইলেও কৃষকেতর ব্যবসায়ী-দিগের বিষয় চিন্তা করা উচিত। যদি এমন হয়, শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় কৃষকগণের লাভ হইতেছে কিন্তু রপ্তানিতে শস্য অধিক নিষ্ক্রান্ত হওয়ায়, দেশের কতক লোকের খাদ্যের অকুলান পড়িতেছে, এবং তাহারা না খাইয়া মরিতেছে, তাহা হইলে কৃষকের অতিরিক্ত লাভ উপেক্ষা করিয়া রপ্তানি বন্ধ করা উচিত। মনে করুন, কোন পরিবারে ছয় ভাই আছে। তাহার মধ্যে চারিজন কৃষিকার্য্য করে, আর দুই জন বৃদ্ধ পিতামাতার সেবা করে, বা সন্তানগণকে শিক্ষা দেয়। উক্ত চারি জন যদি কেবল নিজের আহারের উপযোগী শস্য রাখিয়া অবশিষ্ট সমুদয় শস্য বিক্রয় করিয়া নিজের অবস্থার উন্নতি করে আর দুই ভাইয়ের আহারের জন্য কিছুই খাদ্যশস্য না রাখে, এবং তাহাতে যদি ঐ দুই ভাইয়ের মৃত্যু সম্ভাবনা ঘটে, তাহা হইলে ঐ পরিবারের বৃদ্ধ কর্ত্তা কি করিবেন? তিনি উক্ত কৃষি-রত চারি ভ্রাতাকে কি বলিবেন না যে "যদি তোরা তোদের আর দুই ভাইকে খাইতে না দিয়া সমুদয় শস্য বিক্রয় করিয়া কেবল তোদের চারিজনের অবস্থার উন্নতি করিস, তাহা হইলে তাহা পাষণ্ডের কার্য্য হইবে। আমি যতদিন বাঁচিয়া থাকি, আমি

তাহা কখনও করিতে দিব না।" গবর্ণমেণ্টেরও ঐরূপ ধর্ম্মসঙ্গত, ন্যায়সঙ্গত, যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার করা উচিত—অর্থাৎ খাদ্যশস্য রপ্তানিতে কৃষককুলের উন্নতি হইতেছে যদি তর্কস্থলে ইহা অনুমান করা যায়, তথাপি দেশে কৃষকেতর লোকের অন্নাভাব ঘটিলে রপ্তানি বন্ধ করা উচিত। সুতরাং স্পষ্ট বুঝা গেল,—(১) রপ্তানিতে কৃষকের উন্নতি হইতেছে না। (২) রপ্তানিতে যদি কৃষককুলের যথার্থই উন্নতি হয় তাহা হইলেও ভারতের অকৃষকগণের দুর্ভিক্ষ মৃত্যু ও অন্নকষ্ট নিবারণের জন্য রপ্তানি বন্ধ করা উচিত।

৩। **সরকার বাহাদুরের তৃতীয় যুক্তি।**

"রপ্তানি হওয়ায় কৃষককুল পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক শস্য উৎপাদন করিতেছে এবং অধিক শস্য সঞ্চয় করিতেছে। এই অতিরিক্ত শস্য দুর্ভিক্ষকালে ভারতবাসীর আহারের জন্য পাওয়া যায়। রপ্তানি বন্ধ হইলে এই অতিরিক্ত শস্য আর উৎপাদিত হইবে না।"

—এই সরকারি যুক্তিটী কল্পনাবহির্ভূত মাত্র। কারণ শস্য পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক উৎপাদন করিতে হইলে (১) পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক জমি আবাদ করিতে হইবে (২) অথবা কোন উন্নত বা বৈজ্ঞানিক উপায়ে পূর্ব্বের আবাদী জমিতে অধিক ফসল উৎপাদন করা আবশ্যক। শস্য দুর্ম্মূল্য হওয়ায় এই দুইটী উপায়ের যে একটীও অবলম্বিত হইতেছে তাহা দেখা যায় না।

(১) কৃষকগণ যে কোন বৈজ্ঞানিক বা উন্নত উপায় অবলম্বন করিতেছে না তাহা সকলেই জানেন। সরকার বাহাদুরকেও তাহা স্বীকার করিতে হইবে। (২) সুতরাং বিবেচ্য থাকিতেছে এই যে, শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক জমি আবাদ হইতেছে কি না। অধিক শস্য উৎপাদন করিবার জন্য কৃষকগণ নূতন জমীর পাট্টা লইবার জন্য যে ভূস্বামীভবনে দলে দলে আসিতেছে আমরা ত তাহা দেখিতে পাই না। গবর্ণমেণ্টের রেজিষ্টারি আফিসে কি নূতন জমির পাট্টা কবুলিয়তের রেজিষ্টারি, অধিক পরিমাণে হইতেছে?

নদীয়া জেলাতে অনেক জমী পূর্ব্বে বেশ উর্ব্বরা ছিল। কৃষকগণ আগ্রহ করিয়া তখন তাহা লইত। পরে, সার না পাইয়া জমী পুনঃপুনঃ কর্ষিত হওয়ায় তাহা এমন অনুর্ব্বর হইয়া পড়িয়াছে, যে কৃষকগণ বাধ্য হইয়া তাহা ক্রমশ পরিত্যাগ করিতেছে। শস্যের মূল্য দিন দিন অধিক হইতেছে তথাপি সেই সকল পরিত্যক্ত জমির গ্রাহক পাওয়া কঠিন।

খুলনা জেলাতে পূর্ব্বে যে সকল বিল ছিল তাহা ক্রমশ ভরাট হইয়া উর্ব্বর জমিতে পরিণত হইতেছে সত্য। কিন্তু অপর দিকে পুরাতন উচ্চ আবাদী জমী ক্রমশ নিস্তেজ হইতেছে। ইহাতে মোটের উপর অধিক শস্য উৎপাদন হইতেছে না। নদীয়া ও খুলনা জেলাতে যেমন, বঙ্গের অন্যান্য অধিকাংশ জেলাতেও তেমনি। বেহারের ত কথাই নাই। সরকার বাহাদুর অনেক দিন হইতে বলিয়া আসিতেছেন যে বেহারে লোক সংখ্যার অনুপাতে আবাদী জমির পরিমাণ কম, অর্থাৎ সেখানে আর অধিক শস্য উৎপাদন সম্ভাবনা দেখা যায় না। যদি দেশেতে দেখা যায় কোন স্থানে নূতন জমি আবাদ হইতেছে, তাহা হইলে ইহাও দেখা যাইবে অন্যস্থানে পুরাতন জমী পরিত্যক্ত হইতেছে। ইহাতে শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ার হেতু অধিক শস্য উৎপাদনের কোন নিদর্শন দেখা যায় না।

আমি যাহা উপরে বলিলাম তাহার অর্থ এমন নহে যে ভারতবর্ষে আবাদযোগ্য পতিত জমি নাই। এখনও ভারতবর্ষে অকর্ষিত উর্ব্বর জমি অনেক পতিত আছে। Famine Commission এই কথা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কৃষকদিগের এমন অর্থ নাই যে জঙ্গল কাটিয়া বা বাঁধ বাঁধিয়া তাহা কর্ষণ-যোগ্য করিয়া লয়। জমীদার বা গবর্ণমেণ্ট, জঙ্গল কাটিয়া বা বাঁধ বাঁধিয়া প্রায়ই জমি আবাদযোগ্য করিয়া দেন না। পাত্রও আছে, পাত্রীও আছে। কিন্তু পাত্রীর বিবাহ দিতে হইলে যে ব্যয়ের আবশ্যক তাহা কেহই করিতে স্বীকৃত নহে। সুতরাং জঙ্গল-জমি কুমারী অবস্থাতে দীর্ঘকাল অজ্ঞাতবাস করিতেছে ; এমন কোন ধর্ম্মভীরু অভিভাবক দেখি না যিনি তাহার বিবাহ দিয়া কুলরক্ষা করেন।

গবর্ণমেণ্টের যুক্তির ভাবে বোধ হয় যেন পূর্ব্বে ভারতে যখন শস্যের মূল্য অতিশয় কম ছিল, তখন ভারতবাসী কৃষকগণ বড়ই কষ্টে থাকিত। আর অধুনা যেমন শস্যের মূল্য বাড়িতেছে, তৎসঙ্গে কৃষককুলের উন্নতি উথলিয়া পড়িতেছে। এই কথাটা কেমন প্রলাপ বাক্যের মত শুনায় না কি? যখন বঙ্গে চাউল টাকায় একমণ ছিল, তখন যে বঙ্গীয় কৃষক মুমূর্ষু বা নিরুৎসাহ ছিল বা না খাইয়া মরিত, এমন কথা ত ইতিহাসে কি কিংবদন্তীতেও পাওয়া যায় না। বরঞ্চ এই কথাই জানা যায় যে, তখন কৃষক ও জনসাধারণ প্রচুর খাদ্যলাভে হৃষ্টপুষ্ট, সুস্থ বলবান্, নধর প্রশান্ত ও প্রফুল্ল ছিল। তখন এক বৎসর অনাবৃষ্টি হইলে কৃষক না খাইয়া দুর্ভিক্ষে মরিত না। আর এখন চাউলের মণ ৮৲ বা ৭৲ বা ৬৲; কৃষকের ও জনসাধারণের সৌভাগ্য সুখ ও সন্তোষ, ক্রমশ বর্দ্ধমান দুর্ভিক্ষ দ্বারা ভীষণভাবে সূচিত হইতেছে! গবর্ণমেণ্টের বিকৃত যুক্তি অনুসরণ করিলে এই প্রতিপন্ন হয় যে, দেশে যতই অধিক দুর্ভিক্ষ হইবে, ততই খাদ্য শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইবে, যতই খাদ্য শস্যের মূল্য বাড়িবে ততই কৃষক কুলের উন্নতি হইবে। অর্থাৎ দেশে যতই অধিক দুর্ভিক্ষ হইবে, কৃষক কুলের ততই উন্নতি হইবে। সুতরাং গবর্ণমেণ্টের যুক্তি মানিলে এই প্রমাণ হয় যে দুর্ভিক্ষ একটা ঘোর অমঙ্গল নহে, উহা পরম মঙ্গল ও বাঞ্ছনীয় ঘটনা। জগতে ইহার ন্যায় ভীষণ ভ্রমসঙ্কুল বাক্য কখন শুনি নাই—যুক্তির এমন সান্নিপাতিক ভয়ানক বিকার আর কখন দেখি নাই।

৪। সরকারের চতুর্থ যুক্তি।

"খাদ্য শস্যের রপ্তানি বন্ধ করিলে, এদেশের বাজারে খাদ্য শস্যের টান কমিবে। তাহাতে খাদ্য শস্যের মূল্য কমিয়া যাইবে। তখন খাদ্য-শস্যের আবাদ করা অপেক্ষা পাট আবাদ করা অধিক লাভ জনক হইবে। চাউল গমের চাষ কমিবে, পাটের চাষ বাড়িবে। সুতরাং রপ্তানি বন্ধ করিলেও তখন খাদ্য শস্যের পরিমাণ বাড়িবে না।"

এই যুক্তির উত্তরে এক কথা বলা যাইতে পারে—(১) বিদেশে কোন কোন স্থানে এমন অধিক পাট হইতে আরম্ভ হইয়াছে যে বর্ত্তমানেই পাটের দর কোন কোন সনে খুব কমিয়া যায়। সুতরাং খাদ্য শস্যের রপ্তানি বন্ধ করিলে, খাদ্যশস্যের আবাদ কমিয়া পাটের আবাদ বাড়িবে এ আশঙ্কা সম্ভবত অমূলক (২) ভারতে অধিক পাট চাষ হইলে, পাটের

আমদানী অধিক হইয়া, পাটের দর আবার কমিবারই সম্ভাবনা। তাহাতে পাটের আবাদ আবার কমিবে। (৩) যদি খাদ্য শস্যের রপ্তানি বন্ধ করায় পাটের আবাদ বাড়িয়া খাদ্য শস্যের আবাদ কমিয়া যায়, তাহার উপায় অতি সহজ। কেননা যে কারণে খাদ্য শস্যের রপ্তানি বন্ধ করা যাইবে, সেই কারণে পাটের রপ্তানি বন্ধ বা শুল্ক দ্বারা কমান যাইতে পারে। সুতরাং পাটনির্ম্মিত যুক্তিটি কল্পিত বিভীষিকামাত্র।

৫। সরকারী পঞ্চম যুক্তি।

"ভারত হইতে শস্যের রপ্তানি বন্ধ করিতে হইলে, ভারতের ভিতরে এক প্রদেশ বা এক জেলা হইতে অপর প্রদেশ বা জেলাতেও রপ্তানি বন্ধ করিতে হয়। তাহা অসঙ্গত।"

(১) ভারত হইতে অপর দেশে খাদ্য শস্যের রপ্তানি বন্ধ করিতে হইলে, ভারতের এক প্রদেশ বা জেলা বা গ্রাম বা পল্লী হইতে অপর প্রদেশ বা জেলা বা গ্রাম বা পল্লীতে রপ্তানি বন্ধ করিবার কোন কারণ নাই। তাহা ভারতবাসী চাহে নাই। ভারতের মধ্যে এক স্থানের শস্য অন্য স্থানে রপ্তানি হওয়ায় কোন ভারতবাসী, ভারতের কোন প্রদেশের লোক, কি কখন আপত্তি করিয়াছে? বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যখন ভারত হইতে রপ্তানির সমগ্র উষ্ট্র গিলিতেছেন, তখন প্রাদেশিক রপ্তানির মশকটা কেন গিলিতে পারিবেন না? (২) যদি ভারত হইতে খাদ্য শস্যের রপ্তানি বন্ধ হয় এখনকার মত ভারতের এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে রপ্তানি করার আবশ্যক হইবে না। তখন প্রত্যেক প্রদেশ সুবৎসরে নিজের উদ্বৃত্ত শস্য, যাহা এক্ষণে রপ্তানিতে ভারত হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে, তাহা সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারিবে; এবং অজন্মা বৎসরে অনায়াসে তাহাই খাইয়া জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইবে। সংক্ষেপে, তখন দুর্ভিক্ষ বিরল হইবে। (৩) সে অবস্থায় যদি কখন কোন স্থানে দুর্ভিক্ষ হয়, ভারতের চতুর্দ্দিকে অন্যান্য স্থানে শস্য সঞ্চিত থাকায় অধিকাংশ স্থলে ব্যবসায়িগণ নিজের লাভার্থ দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট স্থানে শস্য বিক্রয় করিতে লইয়া যাইবে। অধিকাংশ স্থলেই এখনকার মত, দুর্ভিক্ষ লইয়া গবর্ণমেণ্টকে অধিক বিব্রত হইতে হইবে না। রপ্তানি দ্বারা এক দিকে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করিয়া সরকারি ভিক্ষা দ্বারা অন্যদিকে দুর্ভিক্ষ সংহার করিবার জন্য সমরে প্রবৃত্ত হইবার প্রয়োজন থাকিবে না। তখন কার্য্যফলে পরোক্ষভাবে ভীম-বহ্নি জ্বালাইয়া বা জ্বলিতে দিয়া (একই কথা) প্রত্যক্ষ ভাবে দমকল আনিয়া নির্ব্বাণ করিবার অদ্ভুত চেষ্টা করিতে হইবে না। তখন প্রজার অস্থি ভাঙ্গিয়া বা ভাঙ্গিতে দিয়া (একই কথা) ভাঙ্গা হাড় যোড়া লাগাইবার জন্য ইউরোপীয় সরজারির অপূর্ব্ব নিপুণতা প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন হইবে না। তখন চাষা ভাইরা যাকে বলে "ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরা" তাহা করিতে হইবে না।

৬। সরকারী ষষ্ঠ যুক্তি।

৬। "ভারতে যে খাদ্য শস্য হয় তাহার তুলনায় যে শস্যের রপ্তানি হয় তাহা নিতান্ত অল্প।"

এ কথা ঠিক মানিতে পারি নাই। এবং যদি সত্যও হয় তাহা হইলে ইহার ফল কম বিষময় নহে।—ব্যবস্থাপক সভার মাননীয় মিলার সাহেবের উক্তি অনুসারে, 'সুজন্মা' বৎসরে

ভারত হইতে ছয় কোটি মণ চাউল ও গম রপ্তানি হয়। যদি ছয় মণ চাউল বা গম এক জনের এক বৎসরের খোরাক হয়, তাহা হইলে প্রতি সুবৎসরে ১ কোটি লোকের এক বৎসরের আহার রপ্তানি করা হইয়া থাকে। ভারতে যে শস্য গড়ে প্রতি বৎসর উৎপন্ন হইতেছে যদি তাহাতে সমুদয় ভারতবাসীর আহারের ঠিক সঙ্কুলান হয় ধরিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে রপ্তানি হেতু ৩০ কোটী ভারতবাসীর মধ্যে প্রতি বৎসর ১ কোটী লোক অনাহারে থাকিবে বা মরিবে। কিন্তু যখন অন্নের অনটন হয়, তখন কতকগুলি লোক যে একবারে অনাহারে থাকে, আর অবশিষ্ট পূর্ণমাত্রায় আহার করিয়া থাকে এমন হয় না। যখন খাদ্য শস্যের অভাব হয় তখন অনেক লোক আধপেটা খায়। এইরূপে এককোটি লোকের এক বৎসরের আহার অর্থাৎ ছয়কোটী মণ শস্যের অনটন হইলেও, যদি এক কোটি লোক এক বেলা করিয়া আহার করিয়া তিন কোটি মণ চাউল আর গম খায় তাহা হইলে অবশিষ্ট ৩ কোটি মণ আর এক কোটি লোক খাইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে; এবং শীঘ্র অনাহারে কেহ মরে না। লোক সংখ্যা এবং খাদ্যের অনটনের পরিমাণ মজুত খাদ্য কি পরিমাণে কত লোকের মধ্যে বণ্টিত হইবে, অর্থাৎ কত জন আধপেটা খাইয়া থাকিবে, কত জন তাহার অপেক্ষাও কম খাইয়া জীবন ধারণ করিবার চেষ্টা করিবে, ইত্যাদি সমুদয় তথ্য না জানিতে পারিলে, কতজন অনাহারে মরিবে তাহা গণনা করা যায় না। মনুষ্যের প্রাণ কঠিন। প্রতিদিন একমুঠা মাত্র অন্ন পাইলেও কিছুকাল টিঁকিয়া থাকে। তবে যাহারা আধপেটা খায় বা খাদ্যের অভাবে অখাদ্য খায়, তাহারা রোগে মরিতে থাকে। এই মৃত্যু গুলি দুর্ভিক্ষজনিত মৃত্যু সংখ্যার মধ্যে প্রায়ই ধরা হয় না। আর এক কথা আছে। দুই এক মাস অনাহার হইলেই লোকে মরিয়া যায়। যদি বৎসরে কেবলমাত্র এক মাসে ১২ কোটি লোকের খাদ্যের অভাব হয় তাহা হইলে (প্রতি মাসে প্রত্যেকে আধমণ করিয়া শস্য খায় ধরিলে) ছয়কোটি মণ ধান্যের অভাব বুঝায়। সুতরাং যদি এক মাসের অনাহারে লোক মরিবার সম্ভাবনা থাকে তাহা হইলে ছয় কোটি মণ খাদ্য শস্যের অনটনে (যাহার রপ্তানি প্রতি বৎসর হইয়া থাকে) ১২ কোটি লোক মরিতে পারে। সুতরাং ৬ কোটি মণ খাদ্য শস্যের রপ্তানি একটা ভয়ঙ্কর কথা। তবে যে এত অধিক পরিমাণ লোক মরিতে দেখা যায় না, তাহার এক কারণ শস্যের অভাব হেতু অনেক লোক আধপেটা খায়, আর দুর্ভিক্ষের সময় গবর্ণমেণ্ট দেশে খাদ্যশস্যের আমদানি করেন। কিন্তু সেই আমদানি প্রচুর না হওয়ায়, তাহা যথাসময়ে বণ্টন না হওয়ায়, বণ্টন সুবিধার জন্য একস্থানে অনেক লোককে আশ্রয় বিহীন স্থানে একত্র করাইয়া কঠিন পরিশ্রম করিতে বাধ্য করায়, দুর্ভিক্ষ সময়ে গবর্ণমেণ্টের ভিক্ষাতে অনেক লোকের জীবন রক্ষা হয় না, অনেকেই গৃহ পরিত্যাগ করিয়া দূরে আসিয়া অচিরে নানাকষ্ট ভোগ করিয়া জীবনলীলা সংবরণ করে, এবং কখন কখন শৃগাল শকুনির ভক্ষ্য হয়। সুতরাং যদি একথা সত্য হয় সুজন্মা বৎসরে যে শস্য রপ্তানি হয়, তদভাব হেতু ভারতে দুর্ভিক্ষ হইয়া এক মাসে বার

কোটি লোক অনাহারে মরিতে পারে, তাহা হইলে এই ছয় কোটি মণ চাউল ও গমের রপ্তানিকে একটা তুচ্ছ ব্যাপার বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। ছয় কোটি মণ শস্য এক কোটি ভারতবাসীর এক বৎসরের আহার—নিত্য দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট ক্ষুধার্ত্ত ভারতবাসীর—এক কোটি লোকের এক বৎসরের আহার—প্রায় প্রতি সনেই বিদেশে প্রেরিত হইতেছে। কি ভয়ানক! ইহাতে শস্যের মূল্য বাড়িবে না ত কি, দুর্ভিক্ষ হইবে না ত কি, কোটি কোটি লোক অনাহারে মরিবে না ত কি?

(২) ধনবিজ্ঞানে এই কথাটি স্বীকৃত হইয়া থাকে যে এক বাজারে একপ্রকার দ্রব্যের একই বাজার দর হইয়া থাকে। প্রধানত রুসিয়া, মার্কিনদেশ ও ভারত হইতে ইউরোপের জন্য গম ও চাউলের রপ্তানি হয়। রুসিয়া ও মার্কিন দেশ হইতে যে দরে ইউরোপে খাদ্য-শস্য আমদানি করিতে পারা যায় সেই দরে বা তাহার কিছু কম দরে * ভারত হইতে শস্য রপ্তানি করিবার সুবিধা হইলে, ভারতে বিলাতী সওদাগরগণ অনায়াসে সেই দর দিতে সমর্থ হয়। ধরুণ, ভারতে চাউলের দর ৫৲ মণ আছে। কিন্তু ভারত হইতে ৮৲ মণ চাউল কিনিয়া ইউরোপে বিক্রয় করিলে তাহাতেও রুসিয়া বা মার্কিন চাউল ক্রয় করা অপেক্ষা অধিক লাভ থাকে। তাহা হইলে বিলাতি সওদাগর ভারতীয় বাজারে প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্য শস্য রপ্তানি জন্য চট্ করিয়া সংগ্রহ করিবার ইচ্ছায় ভারতীয় ব্যাপারিগণকে ৮৲ মণ দর দিতে পারে। যদি প্রকৃত পক্ষে এ দরে ভারত হইতে ৬ কোটী মণ শস্য ক্রয় করে তাহা হইলে ভারতের অবশিষ্ট খাদ্য শস্যের দর শীঘ্রই ক্রমশ ৫৲ মণ হইতে ৮৲ মণ দাঁড়াইবে বা দাঁড়াইবার চেষ্টা করিবে। কারণ এক বাজারে, (অর্থাৎ যে সকল বাজারের মধ্যে পথের সুগমতা থাকায় পূর্ণ প্রতিযোগিতা আছে এমন সকল বাজারে,) এক প্রকার বস্তুর মূল্য সমান হইয়া থাকে। সুতরাং ৬ কোটি মণ ৮৲ মণ দরে রপ্তানি হওয়ায় ভারতের কম বেশী অবশিষ্ট ১৭৪ কোটি মণ খাদ্য শস্যের দর বাড়িয়া ৮৲ টাকা হইবার সম্ভাবনা।

(৩) আর যদি ধরিয়া লওয়া যায়, ভারতে খাদ্যশস্য গড়ে মোট ১৮০ কোটি মণ প্রতি সন উৎপন্ন হয় এবং তাহাতে ঠিক ৩০ কোটি ভারতবাসীর খাদ্যের সঙ্কুলান হয় তাহা হইলে, ৬ কোটি রপ্তানি হওয়ায় ১ কোটি লোক খাইতে পাইবে না। কিন্তু যখন খাদ্য শস্যের এইরূপ অকুলান হয়, তখন ব্যাপারিগণ ক্রমেই দর চড়িবে এই ভাবিয়া লাভের আশায় অনেক মাল আটক করে। শীঘ্র বিক্রয় করে না। তজ্জন্য যে পরিমাণে বস্তুত খাদ্য শস্য অকুলান হয় তাহার অনুপাতের অপেক্ষা বাজারে অধিক দর চড়িয়া যায়। এবং তখন দেশে প্রকৃত পক্ষে যে পরিমাণে খাদ্য শস্যের অভাব হইয়াছে তদপেক্ষা অধিক অনুপাতে লোক মারা পড়ে। এই জন্য এই একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার বলিয়া কখন কখন বোধ হয় যখন দেশে দুর্ভিক্ষে লোক মরিতেছে, তখন দেশে খাদ্য শস্যের অভাব নাই, কেবল দর বাড়িয়াছে মাত্র। সুতরাং যে পরিমাণে

* দর দিবার সময় অবশ্য সওদাগর শস্য লইয়া যাইবার গাড়ি জাহাজ ভাড়া ইত্যাদি হিসাব করিয়া থাকে।

খাদ্য শস্যের অকুলান হয়, তাহা অল্প হইলেও, দর তুলনায় অতিশয় বৃদ্ধি হয় এবং তাহাতে অনেক গরিব লোক না খাইয়া মরে।

তবেই, দেখা গেল (১) ভারতবর্ষ হইতে যে পরিমাণে খাদ্য শস্য রপ্তানি হয়, তাহা অল্প নহে, সুবৎসরে কম বেশী ছয় কোটী মণ। (২) তাহা অল্প হইলে বিদেশীয় ধনী খাদকদিগের প্রতিযোগিতায় দরিদ্র ভারতবাসীর পক্ষে মূল্য অত্যধিক বাড়িয়া যাইতে পারে। (৩) অল্প পরিমাণ খাদ্য শস্যের অকুলান হইলেও, বাজারে দর প্রায়ই অত্যধিক বাড়িয়া যায়। সুতরাং রপ্তানি খাদ্য শস্যের পরিমাণ ভারতের সমুদয় উৎপন্ন খাদ্য শস্যের পরিমাণের সহিত তুলনায় অল্প, এই যুক্তির মূল্য কিছুই নাই।

৭। **সরকারী সপ্তম যুক্তি।**

"ভারতে দুর্ভিক্ষ হইলে রপ্তানি আপনিই কমিয়া যায়।"

ইহার উত্তর 'দুর্ভিক্ষ হইতে দিব কেন।' রপ্তানি বন্ধ হইলে দুর্ভিক্ষ আপনি কমিয়া যাইবে।

৮। **সরকারী অষ্টম যুক্তি।**

"ভারতের দুর্ভিক্ষের জন্য রপ্তানি দায়ী নহে; দায়ী আকাশ (বা ভগবান)।"

কিন্তু এই আকাশ ও ভগবান পূর্ব্বেও এইরূপ ছিল। তখন ত এরূপ ঘন ও বিস্তৃত দুর্ভিক্ষ হইত না। নিজের দায়িত্ব আকাশে বা ভগবানে প্রক্ষিপ্ত করার চেষ্টা বিফল।

৯। **সরকারী নবম যুক্তি।**

"রপ্তানি বন্ধ করা ধন বিজ্ঞান বিরুদ্ধ।"

এ কথার উত্তর, ধনবিজ্ঞানের এমন কোন সূত্রই নাই যাহা অবস্থা নির্ব্বিশেষে প্রযুক্ত হয়। যাহারা একথা স্বীকার করেন না তাহাদের জন্য দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখা আবশ্যক। এ প্রবন্ধে তাহার স্থান নাই।

আমি এই প্রবন্ধ গবর্ণমেণ্টকে বুঝাইবার জন্য লিখি নাই। কেননা আমাদের গভর্ণমেণ্ট অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি সুশিক্ষিত, তাঁহাদের যাহা স্বার্থ তাঁহারা তাহাই করিতেছেন। তাঁহাদের স্থানে অন্য কোন জাতি স্থাপিত হইলে ঐ রকম করিবে। এমন কি আমরা যদি অন্য কোন দেশ জয় করিতাম তাহা হইলে সম্ভবত আমরাও জিত দেশ হইতে আমাদের প্রয়োজন মত খাদ্য শস্য সংগ্রহ করিবার সময় পরাজিত জাতির অন্ন কষ্টের প্রতি দৃষ্টি রাখিতাম না। একদিন প্রাচীন রোমও ঐরূপ করিয়াছিল। আমি লিখিলাম আমাদের নিজের দেশের লোকের জন্য। সকলেই যাহা সহজ বুদ্ধিতে বুঝেন, তৎসম্বন্ধে উপরিউক্ত ইউরোপীয় যুক্তিতেই কাহারও ধোঁকা না লাগে সেই জন্য লিখিতেছি। এমন কি ৺মহারাজ যতীন্দ্র মোহন ঠাকুরের ন্যায় বুদ্ধিমান্ সুশিক্ষিত লোকও বিলাতী ধোঁকায় পড়িয়া অন্নরক্ষণী সভাকে বলিয়াছিলেন যে রপ্তানি বন্ধ করিতে গবর্ণমেণ্টকে কিরূপে অনুরোধ করি, উহাতে যে কৃষকগণের উপকার হইতেছে। তজ্জন্য ধর্ম্মতঃ লোকত, বিজ্ঞানত কোন মতেই রপ্তানির বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে পারি না।

গবর্ণমেণ্ট রপ্তানি বন্ধ করার বিরুদ্ধে যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন, এ প্রবন্ধে কেবল তাহারই আলোচনা করা গেল। রপ্তানি ও অন্নকষ্ট সম্বন্ধে অন্যবিধ রূপেও আলোচনা করা আবশ্যক। অনেকে ইউরোপীয় ধনবিজ্ঞান আলোচনা করেন নাই। তজ্জন্য তাঁহারা মনে

করেন যে তাঁহারা এই সকল বিষয় আলোচনা করিতে বা বুঝিতে অসমর্থ। সেটা ভুল। ভারতের অবস্থা ও ইউরোপের অবস্থার ভিতর এত অধিক প্রভেদ, যে অধিকাংশ স্থলে ইউরোপীয় ধনবিজ্ঞানসম্মত যুক্তি ভারতের পক্ষে প্রয়োগ করিলে নিরবচ্ছিন্ন ভ্রমপ্রমাদে পতিত হইতে হয়। কেয়ার হার্ডি একটা সার কথা বলিয়াছিলেন; কোন দেশের ধন সম্বন্ধীয় তত্ত্ব বুঝিতে হইলে, সেই দেশের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বিচার-শক্তি প্রয়োগ করিতে হয়। ইংলণ্ডের পক্ষপাতী ধনবিজ্ঞানে শ্রীযুক্ত কেয়ার হার্ডির মস্তিষ্ক বিকৃত হয় নাই বলিয়াই তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে খাদ্য শস্যের রপ্তানিই ভারতের দারিদ্র্য, অন্নকষ্ট ও দুর্ভিক্ষের নিদান।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

গোটা দুই তিন কঠিন কথা।*

১। সাকার ও নিরাকার।

"ব্রহ্ম" শব্দ মুখ্য অর্থে কহে ভগবান্;
চিদৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ, অনূর্দ্ধ সমান।
তাঁহার বিভূতি দেহ সব চিদাকার;
চিদ্বিভূতি আচ্ছাদিয়া, কহে নিরাকার।"

—চৈতন্য মহাপ্রভুর উক্তি—প্রকাশানন্দের সহিত বিচার। চৈঃ চঃ আঃ সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ঈশ্বর সাকার না নিরাকার,—বহুদিন হইতে এ দেশে এ বিচার চলিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমানেই যে কেবল এক দল নিরাকারবাদী, প্রচলিত সাকারোপাসনার প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা নহে। প্রাচীন কাল হইতেই, এ দেশে একদল নিরাকারোপাসক দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিবিধো হি বেদোক্ত ধর্ম্মঃ প্রবৃত্তি-লক্ষণো নিবৃত্তিলক্ষণশ্চ—(শঙ্কর-গীতাভাষ্য)—বেদোক্তধর্ম্ম দ্বিবিধ, এক প্রবৃত্তি লক্ষণ, অপর নিবৃত্তিলক্ষণ। এই নিবৃত্তিমার্গে নিরাকারের ধ্যান ধারণার চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। আধুনিক সাকারোপাসনাতে ও প্রাচীন বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডে, এ দুয়ের মধ্যে প্রভেদ অনেক; তাহার আলোচনা এস্থলে অনাবশ্যক। আধুনিক নিরাকারবাদে ও বেদান্তপ্রতিষ্ঠিত জ্ঞান-কাণ্ডেও পার্থক্য অনেক। শ্রুতি ব্রহ্মকে সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ, উভয়রূপেই প্রতিষ্ঠিত করিলেও, বেদান্তের ঝোঁক নির্ব্বিশেষেরই উপরে। কিন্তু বর্ত্তমানে নিরাকারবাদ যে আকার ধারণ করিয়াছে, বেদান্তের নিরাকারবাদ তাহা হইতে অনেক ভিন্ন। তত্ত্বমসি এই মহাবাক্যই বেদান্তের শেষ কথা। ব্রহ্ম আত্মস্বরূপ —আত্মসাক্ষাৎকারে, অপরোক্ষানুভূতিতে,—ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ হয়; আর সে অবস্থায়

---

* কারাবাসে লিখিত।

জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের ভেদজ্ঞান লুপ্ত হইয়া যায়। ব্রহ্ম বস্তুকে জ্ঞেয়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলেই জ্ঞাতার অধীন করা হয়, তাহার স্বাতন্ত্র্য আর থাকে না। সুতরাং বিষয়জ্ঞানে জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ের যে সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়, ব্রহ্মজ্ঞানে তাহা হইতে পারে না,—জ্ঞেয়রূপে নহে, জ্ঞাতারূপেই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে। ইহাই প্রাচীন বৈদান্তিক নিরাকারবাদ। এই নিরাকারবাদ অদ্বৈত-তত্ত্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত। নিরাকার-বাদ না বলিয়া ইহাকে নির্গুণ বা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদও বলা যাইতে পারে।

প্রাচীন নির্গুণ ব্রহ্মবাদ ও আধুনিক নিরাকার ব্রহ্মবাদ।

এই প্রাচীন নির্গুণব্রহ্মবাদ ও আধুনিক নিরাকার ব্রহ্মবাদের মধ্যে প্রভেদ বিস্তর। আমাদের নিরাকারবাদ ঠিক নির্গুণবাদ নহে। আমাদের নিরাকারবাদ অদ্বৈতবাদের নামান্তর নহে—ফলত আধুনিক নিরাকারবাদী আচার্য্যগণ প্রায় সকলেই অদ্বৈতব্রহ্মবাদকে বিষবৎ বর্জ্জন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ঈশ্বর নিরাকার, কিন্তু নির্গুণ নহেন। তিনি স্রষ্টা, পাতা, পরিত্রাতা। তিনি পিতা, তিনি মাতা, তিনি সখা, তিনি পরমাত্মীয়। তিনি পুণ্যের পুরস্কর্ত্তা ও পাপের দণ্ড দাতা। এই সকলই ভেদাত্মক, দ্বৈততত্ত্বেই এ সকলের প্রতিষ্ঠা। প্রাচীন নিরাকারবাদ অদ্বৈততত্ত্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল; আধুনিক নিরাকারবাদ দ্বৈত-তত্ত্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত। এ দুয়ের মধ্যে মূলত প্রভেদ এই। দ্বৈতাদ্বৈতের বিচার এ স্থলে অনাবশ্যক ও অপ্রাসঙ্গিক। দ্বৈতবাদই সত্য, না, অদ্বৈতবাদ সত্য,—এ প্রশ্ন এ স্থলে তোলা নিষ্প্রয়োজন। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে বিচার্য্য কেবল এইটুকু—দ্বৈততত্ত্বে প্রকৃত নিরাকারের প্রতিষ্ঠা হয় কি না?

আকারের অর্থ কি?

যার আকার নাই, আকার সম্ভব নহে, তাহাই নিরাকার। কিন্তু এই আকার বলিতে কি বুঝি? আকারের লক্ষণ কি? সীমাবদ্ধ করাই কি আকারের মূল ধর্ম্ম নহে? আকাশের আকার নাই—কিন্তু যখনই ঘটের বা পটের দ্বারা এই আকাশকে পরিচ্ছিন্ন ও সীমাবদ্ধ করি, তখনই ঘটাকাশ পটাকাশের উৎপত্তি হয়। ম্লেচ্ছভাষায় যাহাকে dimension কহে,—তাহাই আকারের মৌলিক লক্ষণ। পরিচ্ছিন্নতাই এই dimension-এর প্রাণ। যাহা পরিচ্ছিন্ন নহে, তাহার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বেধ নাই—থাকা অসম্ভব। সুতরাং যার আকার আছে, তাহাই পরিচ্ছিন্ন, তাহাই সীমাবদ্ধ। যাহা নিরাকার তাহাই অপরিচ্ছিন্ন ও অসীম। এখন প্রশ্ন এই—দ্বৈতবস্তু মাত্রেই পরিচ্ছিন্ন কিনা? আর তাই যদি হয়, তবে দ্বৈতবাদে পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম বা ঈশ্বরতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করে কিনা? এবং তাহা হইলে, দ্বৈতবাদীমাত্রেই, প্রকৃত পক্ষে, সাকারবাদী কিনা?

দ্বৈতবাদ ও সাকারবাদ।

দ্বৈতবাদ তিনটী পরস্পর পরিচ্ছিন্ন তত্ত্ব সর্ব্বথাই প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকে। ১ম ঈশ্বরতত্ত্ব, ২য় জীবতত্ত্ব, ৩য় জড়তত্ত্ব। ঈশ্বর, জীব ও জড় হইতে পৃথক্; জীব, ঈশ্বর ও জড় হইতে ভিন্ন; —ইহাই দ্বৈতবাদের সিদ্ধান্ত। ঈশ্বরের সঙ্গে জীব ও জড়ের সম্বন্ধ যেরূপেই নির্দ্দিষ্ট হউক না কেন,—যতক্ষণ জীব ও জড় হইতে তিনি পৃথক ও পরিচ্ছিন্ন,—ততক্ষণ জীব ও জড়ের দ্বারা তিনি সীমাবদ্ধ। আপাতত ইহাই দ্বৈত-

সিদ্ধান্তের অপরিহার্য্য পরিণাম বলিয়া সকলেরই মনে হইবে। কিন্তু ঈশ্বরতত্ত্বকে কোনোরূপে সীমাবদ্ধ করিলে, তাহার সত্য নষ্ট ও মর্য্যাদা-হানি হয়। সুতরাং দ্বৈতবাদী, ঈশ্বরতত্ত্বের অসীমত্ব ও সর্ব্বথাব্যাপকত্ব রক্ষা করিবার জন্য, বিশিষ্টাদ্বৈত এবং দ্বৈতাদ্বৈত প্রভৃতি সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কিন্তু এ সকল সিদ্ধান্ত প্রতিষ্টিত করিতে যাইয়া, জীব-ভগবানের পার্থক্য রক্ষা করিবার জন্য, তাঁহারা কোনো না কোনো আকারে সাকারবাদও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ঐতিহাসিক আলোচনায় দেখি যে, যেখানেই বিশুদ্ধ অদ্বৈত সিদ্ধান্ত পরিত্যক্ত হইয়াছে, সেখানেই, কোনো না কোনো আকারের সাকারবাদ অবলম্বিত হইয়াছে।

খৃষ্টীয়ান্ ও বৈষ্ণবতত্ত্ব।

পাদ্রিরা যাই বলুন না কেন,—তত্ত্বের অনুশীলন যাঁরা করেন, তাঁরা কৃষ্ণতত্ত্বের সঙ্গে, খৃষ্টতত্ত্বের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখিতে পান। বাহিরের সাদৃশ্যের—কৃষ্ণের জন্মলীলা ও খৃষ্টের জন্ম বিবরণের মধ্যে যে অদ্ভুত ঐক্য দেখা যায়,—কংশ ও হীরডের কাহিনী,—এ সকলের মূল কি, পণ্ডিতেরা তাহার কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছেন;—কিন্তু সে বিচার এ স্থলে অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু তত্ত্বের দিক্ দিয়াই বৈষ্ণব ধর্ম্মের সঙ্গে খৃষ্টিয়ান ধর্ম্মের বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। উভয়ই ভক্তি পন্থা, সুতরাং উভয়ই সমজাতীয় ধর্ম্ম, এ সাদৃশ্যের ইহা এক কারণ। আর ভক্তি পন্থা বলিয়া, উভয়ই শুদ্ধাদ্বৈততত্ত্বের বিরোধী, এবং দ্বৈতসিদ্ধান্তের পক্ষপাতী। এই জন্য খৃষ্টীয়ান ও বৈষ্ণব উভয়েই এক অর্থে সাকারবাদী।

খৃষ্টীয় সাকারবাদ।

বৈষ্ণবেরা ইহাতে লজ্জিত নহেন, জানি। কিন্তু খৃষ্টীয়ানেরা এ কথাতে নিরতিশয় ব্যথিত হইবেন। তাঁহাদিগকে ব্যথিত করা আমার ইচ্ছা নহে,—সাকারবাদ বলিতে, এখানে আমি কাষ্ঠ লোষ্ট্রের উপাসনা বা প্রচলিত প্রতিমা-পূজা নির্দ্দেশ করিতেছি না। খৃষ্টীয়ানেরা যে ঈশ্বরকে জড় আকার সম্পন্ন মনে করেন, এমন কথা আমি বলি না। আর খৃষ্টীয়ান বন্ধুগণ যদি বৈষ্ণবতত্ত্বের আলোচনা ভাল করিয়া, সংস্কার বর্জ্জিত হইয়া, করেন, তবে এও দেখিবেন যে বৈষ্ণবেরাও ঈশ্বরে কোনো প্রকারের জড়স্বভাব আরোপিত বা কল্পিত করেন না। বৈষ্ণব ঈশ্বরতত্ত্ব সাকার বটে, কিন্তু চিদাকার। খৃষ্টীয় ঈশ্বরতত্ত্বও কি তাহাই নহে?

বাইবেল কি বলে।

বাইবেলের ঈশ্বরতত্ত্ব, মোটামোটি দুইভাগে বিভক্ত হয়; এক পুরাতন ইহুদাধর্ম্মের ঈশ্বরতত্ত্ব, দ্বিতীয় যিশুখৃষ্ট ও তাঁহার প্রথম শিষ্যদিগের বা নিউটেষ্টেমেণ্টের ঈশ্বরতত্ত্ব। ইহুদার ঈশ্বরতত্ত্ব যে একান্ত নিরাকার নহে, পণ্ডিতেরা এখন প্রায় একবাক্যে-একথা স্বীকার করেন। পুরাতন পুস্তকে-বা ওল্ড্‌টেষ্টেমেণ্টে ঈশ্বরের কোনো আকার নির্দ্দেশ করে না, সত্য; কিন্তু নানা-ভাবে, নানাদিক্ দিয়া, তাঁহাতে মানবধর্ম্ম আরোপিত করে, এ কথা অস্বীকার করা অসম্ভব। সুতরাং ইহুদার ঈশ্বরতত্ত্ব নিতান্ত নিরাকার এমন সিদ্ধান্ত হয় না। খৃষ্টীয় ঈশ্বরতত্ত্ব তদপেক্ষা সূক্ষ্মতর সন্দেহ নাই;—কিন্তু ইহাও একান্ত নিরাকার নহে।

খৃষ্টীয় ঐশ্বর্য্যবুদ্ধি।

খৃষ্টপন্থা ভক্তিপন্থা; সুতরাং এখানে ভগবদৈশ্বর্য্যের অনুশীলন স্বাভাবিক। ইহুদার ধর্ম্মশাস্ত্রে ভগবদৈশ্বর্য্যের বিস্তর বর্ণনা আছে,—দাউদের গীতে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু সে সকল বর্ণনা সহজ ও স্বাভাবিক। আমাদের শ্রুতিতেও এই শ্রেণীর ঐশ্বর্য্যজ্ঞান অতি পরিস্ফুট দেখিতে পাই। কিন্তু খৃষ্টীয় ভগবদৈশ্বর্য্যের অনুশীলন, বৈদিক নহে; পৌরাণিক।

ঈশ্বরের সিংহাসন।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, জোহনলিখিত Book of Revelation—বর্ত্তমান খৃষ্টীয়ধর্ম্মগ্রন্থের শেষ পুস্তকের উল্লেখ করা যাইতে পারে। জোহন অধ্যাত্ম-দৃষ্টিতে ঈশ্বরের দরবারের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়া, এই পুস্তকের চতুর্থ অধ্যায়ে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি অধ্যাত্মশক্তিলাভ করিয়া দেখিলেন—

A throne was set in heaven, and one sat on the throne.—

স্বর্গে (আকাশে?) একটা সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং "একজন" ঐ সিংহাসনে উপবেশন করিয়া আছেন। এই "একজনের" কোনো বিশেষ আকারের বর্ণনা নাই, কিন্তু তাঁহার আভার বর্ণনা আছে,—

—And he that sat was to look upon like a jasper and a sardine stone, and there was a rainbow round about the throne, in sight like unto an emerald.—

"আর যিনি বসিয়াছিলেন তাঁহাকে "জ্যাস্পাপার" বা "সার্ডিন" মণির মত দেখাইতেছিল ঐ সিংহাসনের চারিদিকে মরকতের ন্যায় আভাযুক্ত ইন্দ্রধনু শোভা পাইতেছিল।"

And out of the throne proceeded lightnings and thunderings and voices, and there were seven lamps of fire burning before the throne, which are the seven Spirits of God.

আর এই সিংহাসন হইতে বিদ্যুৎ, বজ্রনিনাদ ও বিবিধ বাণী প্রসৃত হইতেছিল, এবং এই সিংহাসনের সম্মুখে সাতটী দীপ জ্বলিতেছিল। এই সপ্ত দীপ ঈশ্বরের সপ্তপ্রাণ বা আত্মা।

জোহনের ঈশ্বর সাকার না নিরাকার?

জোহন যদিও ঈশ্বরের আকার অনির্দ্দিষ্ট রাখিয়াছেন, তথাপি এই ঈশ্বর যে একান্ত নিরাকার নহেন, এই বর্ণনায় ইহা অতি পরিষ্কার ভাবেই প্রমাণিত হয়।

প্রথমত সিংহাসনে বসিতে পাইয়াই তিনি দেশে আবদ্ধ হইয়াছেন। দ্বিতীয়ত তাঁহার সপ্তস্পিরিটের উল্লেখ হইয়াছে। যিশুখ্রীষ্ট ঈশ্বরকে এই স্পিরিটরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন—God is spirit and ye shall worship God in spirit and in truth.—ঈশ্বর স্পিরিট, তোমরা স্পিরিটে ও সত্যভাবে তাঁহার ভজনা করিবে। এই স্পিরিট বস্তু যে কি, নির্দ্ধারণ করা কঠিন। স্পিরিট বলিতে প্রাণ বুঝায়, আত্মা বুঝায়, শৌর্য্য বুঝায়, শক্তি বুঝায়, অন্তরের ভাবও বুঝায়। আমাদের আত্মা শব্দ যেমন বহু অর্থ ব্যঞ্জক, ইংরাজি স্পিরিটও সেইরূপ। মোটের উপরে God is Spirit ঈশ্বর প্রাণ স্বরূপ, এই বলিলেই, বোধ হয়, ইহার মর্ম্ম প্রকাশিত হয়। তোমরা প্রাণের সঙ্গে সত্য-

ভাবে, তাঁহার ভজনা করিবে। অন্তত যিশু এই স্পিরিট শব্দ দ্বারা ঈশ্বর নিরাকার এমন অর্থ ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন মনে হয় না। কারণ এরূপ বলার কোনো প্রয়োজন ছিল না, তিনি ইহুদীদিগকে উপদেশ দিতেছিলেন। আর যিশুর সময়ে ইহুদীর কোনোপ্রকারের সাকারোপাসনা প্রচলিত ছিল না। ইহুদাধর্ম্ম সে সময়ে বাহ্য ক্রিয়া কলাপে আবদ্ধ হইয়া প্রাণশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার অন্তর্মুখীনতা লোপ পাইয়াছিল। যিশু সর্ব্বতোভাবে ইহুদার এই বহির্মুখীনতারই বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করেন। সুতরাং—God is Spirit ইত্যাদি উপদেশ সাকারোপাসনার প্রতিবাদরূপে গ্রহণ করা সঙ্গত নহে। সে যাই হউক, এখানে জোহন ঈশ্বরের সপ্ত স্পিরিট বা সপ্তপ্রাণের উল্লেখ করিয়াছেন। এই সপ্তপ্রাণ, seven spirits of god, সপ্ত প্রদীপ হইয়া এই সিংহাসনের সম্মুখে জ্বলিতেছিল। ঈশ্বরে অসিকাম্বিক বর্ণনা আছে,—As look upon like a jasper or sardine stone—কেবল অঙ্গের বর্ণনাই নাই। কিন্তু অঙ্গ না থাকিলেও ঈশ্বর স্বরূপের যে আভাস এখানে দেওয়া হইয়াছে, তাহা চাক্ষুষভাবে, নিতান্ত স্থূল অর্থে, সাকার না হইলেও, একান্ত নিরাকার, এমনই কি বলা যায়? ফলত জোহন যখন বলিতেছেন যে—

I saw in the right hand of him that sat on the throne a book—

যিনি সিংহাসনে বসিয়াছিলেন, তাঁহার দক্ষিণ দিকে আমি একখানা পুস্তক দেখিয়াছিলাম—তখন তাঁহার আকার প্রতিষ্ঠারই বা বড় বেশী বাকি রাখিয়াছেন কৈ? অন্তত বাম দক্ষিণ নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহাকে পরিচ্ছিন্নভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, ইহা মানিতেই হইবে। অবশ্য "আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার" কথা স্বতন্ত্র, সে ব্যাখ্যা সকল পৌরাণিক কাহিনীতেই প্রযুক্ত হইতে পারে।

খৃষ্টের মূর্ত্তি।

কিন্তু জোহন ঈশ্বরের কোনো আকারের উল্লেখ না করিলেও খৃষ্টকে নিতান্ত সাকাররূপেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। খৃষ্টের ইহলোকে মানুষী দেহ ছিল। সে দেহ স্বর্গে দেখা গেল না। জোহনের উক্তিপাঠে মনে হয় যে খৃষ্টের মানুষী দেহ, তাঁহার স্বরূপ দেহ নহে। যদিও ঐ রূপেতেই তিনি স্বর্গারোহণের পরেও শিষ্য মণ্ডলী সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছিলেন, সে কেবল তাঁহাদের প্রতীতির জন্য। স্বর্গে, ঈশ্বরের সিংহাসনে,—তিনি স্বরূপত বিরাজ করিতেছিলেন। এই স্বরূপ তাঁর মেষরূপী, সপ্তশৃঙ্গযুক্ত ও সপ্তচক্ষুষ্মান।

And I beheld, and lo! in the midst of the throne * * * stood a Lamb as it had been slain, having seven horns and seven eyes, which are the seven Spirits of God sent forth into all the earth.

চিৎ-আকার।

কিন্তু স্থূল দৃষ্টিতে যদিও এ সকল আপাতত স্থূল বলিয়াই বোধ হয়, ফলত জোহনের এই বর্ণনাতে কোনো তত্ত্বজ্ঞ খৃষ্টীয়ানই চাক্ষুষরূপ কল্পনা করেন না। ঈশ্বর নিরাকার—"স্পিরিট"—; যিশুও ঈশ্বরেরই অঙ্গ, ঈশ্বরের সঙ্গে নিত্যযুক্ত, ঈশ্বর হইতে আকারে (hypostatisএ) ভিন্ন কিন্তু স্বরূপত একাত্ম ও

একইরূপ; সুতরাং যিশুও নিরাকার —"স্পিরিট"; কিন্তু এ নিরাকারে চিদাকার অস্বীকৃত হয় না। খৃষ্টীয় ঈশ্বরতত্ত্ব, খাঁটি নিরাকার নহে, কিন্তু চিদাকার সম্পন্ন। বৈষ্ণব-তত্ত্বও তাহাই।

নিরাকার-অতীন্দ্রিয়।

মোট কথা, দেখিতে পাই এই যে দ্বৈতবাদে যে ঈশ্বরতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করে, তাহা প্রকৃত অর্থে একান্ত নিরাকার না হইলেও, অর্থাৎ জীবের ও জড়ের পক্ষে তাহার ঐকান্তিক বিভিন্নতা নিবন্ধন, এই তত্ত্ব স্বল্পবিস্তর সীমাবদ্ধ হইলেও, নিরাকার বলিতে খৃষ্টীয়ান প্রভৃতি দ্বৈতবাদিগণ কেবল অতীন্দ্রিয়ই বুঝিয়া থাকেন। আর, তাই যদি হয়, তবে যাঁহাদিগকে সাকারবাদী বলা হয়, তাঁদের সকলের সঙ্গে না হউক অন্তত অনেকেরই সঙ্গে এই সকল নিরাকারবাদীদের বিবাদের মূল নষ্ট হইয়া যায়। কারণ বৈষ্ণব-প্রভৃতি হিন্দু সাকারবাদীগণ কেহই ঈশ্বরে প্রাকৃত-আকার আরোপ করেন না।

দ্বৈতবাদে ঈশ্বরতত্ত্ব।

বিশেষত সকল দ্বৈতবাদীই প্রতিমাতে উপাসনা করেন না। কিন্তু সকল দ্বৈতবাদেই অলক্ষিতেই হউক অথবা জ্ঞাতসারেই হউক, ঈশ্বরে নির্দ্দিষ্ট বা অনির্দ্দিষ্ট কোনো না কোনো আকার আরোপিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা অতি সত্য যে যে ঈশ্বরতত্ত্ব সাকারবাদের যত তীব্র প্রতিবাদ করে, তাহাই স্বয়ং সে পরিমাণে ঘোরতর সাকার।

ফলত যে সকল ধর্ম্মে প্রতিমাপূজাকে পাপ বলিয়া বর্জ্জন করিতে বলে, তৎসমুদায়েরই ঈশ্বরতত্ত্ব কোনো না কোনো আকারে সাকার। বাইবেলের পুরাতন পুস্তকে, ঈশ্বরের কোনো প্রতিমূর্ত্তি রচনা করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই নিষেধ ইহুদাধর্ম্মের। মোহম্মদীয় ঈশ্বরতত্ত্ব বহুল পরিমাণে ইহুদীয় ঈশ্বরতত্ত্বের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং ইস্‌লামেও প্রতিমূর্ত্তি রচনা নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু এই নিষেধের মূল কি?

ইহুদীয় দশাজ্ঞা।

ইহুদীয় গ্রন্থ হইতে খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মগ্রন্থের "দশাজ্ঞা" সংগৃহীত। বাইবেলে বলে,—

And God spake all these words saying,

I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage.

Thou shalt have no other gods before me.

Thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth:

Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them; for I the Lord thy God am a jealous God.

খৃষ্টীয়ানেরা এই "আজ্ঞার" বলেই সাকারোপাসনাকে পাপ বলিয়া গণনা করেন। কিন্তু ইহুদা ধর্ম্মকে প্রকৃতপক্ষে একেশ্বরবাদ বলা যায় কিনা, পণ্ডিতেরা এখন এই প্রশ্নই তুলিয়াছেন। ফলতঃ পুরাতন বাইবেল পাঠে, ইহুদার ঐকান্তিক একেশ্বরবাদের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইহুদা ধর্ম্ম, জাতিগত ধর্ম্ম,—ইংরেজিতে ইহাকে এথ্‌নিক রিলিজিওন—Ethnic religion কহে। এই সকল

এথ্নিক বা জাতীয় বা ন্যাশন্যাল ধর্ম্মের লক্ষণই এই যে, এ সকলে অপরাপর জাতির বা নেশনের ধর্ম্মের বা দেবতাদির সত্য বা অস্তিত্ব অস্বীকার করে না। ইহুদার ঈশ্বর ইহুদার,— মিশরের ঈশ্বর মিশরের, ইহুদার পক্ষে মিশরের ঈশ্বরের ভজনা পাপ, বিজাতীয় দেবতার উপাসনা একান্ত নিষিদ্ধ। ইহাই প্রাচীন ইহুদার "একেশ্বরবাদের" অর্থ। বর্ত্তমান সময়ে পণ্ডিতেরা, এই জন্য ইহুদার ধর্ম্মকে একেশ্বরবাদী ধর্ম্ম, বা মনোথিজ্ম্ Monotheism বলিতে কুণ্ঠিত হন। তাঁহারা ইহাকে এখন একদেবোপাসনা বা মনোল্যাট্রি monolatry বলিয়া থাকেন।

একদেবোপাসনা।

এই একদেবোপাসনায় অন্য দেবতার অস্তিত্ব অস্বীকৃত হয় না, অপর দেবতার আরাধনামাত্র নিষিদ্ধ হয়। প্রাচীন ইহুদাধর্ম্মে অপর দেবতার অস্তিত্ব পরিষ্কাররূপে মানিয়াছে। প্রথম প্রথম ইহুদার দেবতা যে এই সকল অপর দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এমন সিদ্ধান্ত-প্রতিষ্ঠার পর্য্যন্ত কোনো চেষ্টা দেখা যায় না। ক্রমে ইহুদার দেবতাকে অপর সকল দেবতার উপরে স্থাপন করিবার চেষ্টা ফুটিয়া উঠে। দাউদের গীতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

In the council of the gods sits God: he judgeth among the gods

দেবতাদের সভায় ঈশ্বর উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের বিচার করিতেছেন, আর বলিতেছেন

How long will ye judge unjustly—

আর কত কাল তোমরা অন্যায়রূপে লোকের বিচার করিবে। এবং শেষে দেবতাদিগকে শাসাইয়া ভয় দেখাইতেছেন তাঁরা যদি অন্যায় পথ বর্জ্জন না করেন তবে—

I have said, ye are gods, and all of you are children of the Most High: But ye shall die like men, and fall like one of the princes.—

যদিও আমি বলিয়াছি যে তোমরা অমর, এবং সত্যই তোমরা সকলে সর্ব্বোত্তম পুরুষের সন্তান, কিন্তু তথাপি তোমরা মনুষ্যের ন্যায় মরিবে, এবং এই সংসারের রাজাদের ন্যায় তোমাদের অধঃপতন হইবে।

এস্থলে একরূপ বহুদেববাদেরই আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা বহুদেববাদ নহে। দেবতার অস্তিত্ব মানিলেই বহুদেববাদী বা polytheist হয় না। একেশ্বরবাদের সঙ্গে যেমন মানবের অস্তিত্বের কোনো বিরোধ নাই, মানবের চাইতে শ্রেষ্ঠতর ও উন্নততর যদি কোনো লোক থাকে, তারই বা বিরোধ হইবে কেন? হিন্দুদের যাঁরা বহুদেববাদী কহেন, তাঁরা দাউদের এই গীতকে প্রামাণ্য খৃষ্টীয় শাস্ত্র বলিয়া যদি স্বীকার করেন, তবে খৃষ্টিয়ানদিগকেও বহুদেববাদী বলিতে বাধ্য হইবেন। ফলতঃ খৃষ্টীয়ান ও হিন্দু, দুএর কেহই বহুদেববাদী বা পলিথিষ্ট নহেন।

কিন্তু এখানে (৮২ দাউদের গীত) যদিও ইহুদার ঈশ্বরের একছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই, বাইবেলের পুরাতন পুস্তকের আদিভাগে তাহাও দেখা যায় না। সেখানে ইহুদার ঈশ্বর ইহুদারই ঈশ্বর, ইহুদারই পূজ্য, ইহুদীদিগের সঙ্গেই তাঁর বিশেষ সম্পর্ক, এই মাত্রই দেখি। অপর জাতির অন্য দেবতা আছেন, থাকুন; যতদিন সে সকল জাতি ইহু-

দার সঙ্গে বিরোধ করিতে না আসে ও ইহুদার উন্নতি পথে সে দাঁড়ায়, ততদিন ইহুদার ঈশ্বরও সে সকল জাতির দেবতাদের সঙ্গে কোনো প্রকারের প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হন না।

এথ্নিক বা সামাজিকধর্ম্ম।

বস্তুত এথ্নিক ধর্ম্মমাত্রেই সামাজিক বন্ধন রক্ষা করিবার প্রাণপণ চেষ্টা দৃষ্ট হয়, সমাজ বন্ধনের উপরেই এথ্নিক ধর্ম্ম সকল প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং সমাজের ঘননির্বিষ্টতা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য এথ্নিক ধর্ম্ম সর্ব্বদাই সচকিত থাকে। অন্য সমাজের সঙ্গে আপন সমাজের লোক যাহাতে না মিলিয়া মিশিয়া যাইতে পারে, এই জন্য এথ্নিক ধর্ম্মে নানাবিধ বিধি নিষেধ প্রতিষ্ঠিত থাকে। ইহুদার দশ আজ্ঞায় সাকারোপাসনার বিরুদ্ধে যে আদেশ দেখিতে পাই, তাহার প্রকৃত মর্ম্ম অপরদেবোপাসনার নিবারণ করা, সাকারবাদ পরিহার করা নহে। কারণ, যে জিহোবা এই আজ্ঞা প্রচার করেন, তিনি স্বয়ংই জড় আকারবিশিষ্ট হউন বা না হউন, অন্তত পরিচ্ছিন্নস্বভাবসম্পন্ন এবং সেই অর্থে—যে অবশ্যম্ভাবিরূপেই সাকার, ইহা অস্বীকার করা অসম্ভব। কেবল তাহাই নহে, মুসাই এই দশাজ্ঞা প্রাপ্ত হন। জিহোভা যে মুসার অন্তরে এই সকল বিধি প্রকাশ-করেন, তাহা নহে। মুসা আমাদের ঋষিদের ন্যায় মন্ত্র "দর্শন" করেন নাই। জিহোবা দুই খণ্ড প্রস্তর ফলকে এই দশটী আজ্ঞা আপনার অঙ্গুলীদ্বারা খোদিত করিয়া মুসার হস্তে প্রদান করেন।

And he gave unto Moses, when he had made an end of communing with him upon mount Sinai, two tables of testimony, tables of stone, *written with the finger of God.*

ইহুদার ঈশ্বর যে নিতান্তই "সাকার" ছিলেন, এর চাইতে আর দৃঢ়তর প্রমাণ আর কি দেওয়া যাইতে পারে? হিন্দু সাকারবাদও এর চাইতে বেশী "সাকার" একথা বলা যায় কি না সন্দেহ। জিহোভার সাকারত্বের আরো অনেক প্রমাণ আছে, ইহুদার ঈশ্বরতত্ত্বের অনুশীলনের অবসর পাইলে সে সকল বিষয় আলোচনা করা যাইতে পারে।

ক্রমশঃ

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

মনীষা।

[মিশ্রকাব্য]

ক্ষণে মৃদু পদধ্বনি
পশিলে শ্রবণে হেরি দীর্ঘাকার-মূরতি রমণী
অস্পষ্ট আঁধার ভেদি আসে, ভাবিনু হবে কি প্রিয়া?—
কাছে এলে বুঝিনু, মন্মথ। "চুপ্ শুন নীরবিয়া

মোদের প'ড়েছে খোঁজ" কহিল সে—'বিদেশী কজনে
বন্দী ক'রে লয়ে এস'—এই আজ্ঞা ধ্বনিছে সঘনে।
এতক্ষণ বাহিরে ভ্রমণ বিধি নয়। কি করিয়া
এলে তুমি হেথা ?" তারে কহিনু সকল বিস্তারিয়া।
কহিল সে "অপরাধ-কুষ্ঠ-গ্রস্ত আমার সহিত
ঘৃণাভরে কেহ না কহিল কথা। মরমপীড়িত
ছত্র ভঙ্গ নারীদলে মিশি তাই ফিরিয়া ভবনে
ভৈরবী মূর্ত্তির আড়ে লুকাইয়া উদ্বিগ্ন-নয়নে
উঁকি দিয়া হেরিলাম যতেক যুবতী সেথা ছিল,
মনীষা করাল-নেত্রে সর্ব্ব হ'তে তথ্যটি যাচিল
বিচার-আসনে বসি'। একে একে কহিল সকলে
মোদের জানেনা কেহ।—এল শেষে বেলা ; অশ্রুজলে
রুদ্ধকণ্ঠ রহিল নিৰ্ব্বাক্—জিজ্ঞাসায় বারম্বার
(হেরি' সে করুণ মুখ দ্রবি' গেল হৃদয় আমার)
অস্বীকার করিলনা ; 'চন্দ্রা কিম্বা সহোদরা তার
জানে কি না এই তথ্য'—এই প্রশ্ন হইলে আবার
'হাঁ' 'না' কিছু কহিল না বেলা। তাহে সেই মনস্বিনী
(জানা ছিল তাঁর বেলার হৃদয়) বুঝিলা দোষিনী
দু'জনেই। পাঠাইলা আনিতে চন্দ্রারে,—মিলিল না
তাহারে কোথাও। তখন কহিলা "কোথা আছে কণা
তা'রে ল'য়ে যাব্ আছাড়িয়া। সুলোচনা কোথা আছে
নিয়ে আয়—পাপিষ্ঠারে শাসাইব সর্ব্বজন মাঝে।"
অমনি বাহিরি এনু অতি সঙ্গোপনে। চন্দ্রা কোথা—
কোথা বা নিকুঞ্জ গেল ?—যদি দোঁহে করিয়া একতা
পলাইয়া থাকে—তবে ঘটিয়াছে কলঙ্ক অপার।
ভাল ছিল না আসা হেথায়। কিম্ভুত প্রকৃতি তা'র
ভাবি' ভয় গণি। কি আছে কে জানে অদৃষ্ট আঁধারে !"

আমি তা'রে কহিলাম—"নির্দ্দয় সে মুষ্টির প্রহারে
যত না করেছি ক্ষতি তাহা হ'তে তুমি কৈলে তা'র
ততোধিক, মানি ইহা প্রণয়ের অযোগ্য আচার।

পুরুষ হইয়া বটে নিশিদিন আছে নারী বেশে
শাড়ী চুড়ি নানাবিধ অলঙ্কার কাঁচলী ও কেশে।
তবুও নির্ব্বোধ হায়! যে সরলা তাহারে বিশ্বাসে
তাহারি করিল ক্ষতি। বলে তা'রে ভালবাসে,—
তবু কেন দিল তা'রে লাজ! নিশীথে গাহিল গান
অসভ্য ইতর সম মহিলার না রক্ষি' সম্মান,—
ক্ষমাযোগ্য নহে জানি—কিন্তু শুন এই ব্যবহার
চাপল্য-বুদ্বুদ-মাত্র, নহে ইহা প্রকৃতি তাহার।
চিত্ত তা'র প্রতিষ্ঠিত দৃঢ় ভিত্তি'পরে, যেই মত
বায়ুর হিল্লোলে দোলে পঙ্কজিনী জলে ইতস্ততঃ—
পঙ্কতলে নালবদ্ধ তবু।—তেমনিই সে প্রকৃতি।"

শেষ না হইতে কথা পুষ্প-ঝোপ হইতে ঝটিতি
কার্য্যাধ্যক্ষ দুই নারী দ্রুত আসি মোদের ধরিল—
কহিল—"গ্রেপ্তার হ'লে",—সে কবলে মন্মথ পড়িল;
আমি পলাইনু ছুটি' মৃগনাভি-গন্ধি ঝোপঝাড়
বিপুল অশ্বত্থ-কাণ্ড-অন্তরালে ফিরি বহুবার
ঘুরিনু নির্ঝর রাজি। ক্ষিপ্র মোর দেহ-সংঘর্ষণে
গোলাপ পাপ্‌ড়ী ছিঁড়ি ভূমিতলে ঝরিল সঘনে,—
আক্রমণ-কারিণীরা পিছনে উদ্ধত আছে ছুটি',
পাপিয়ার রৌপ্যকণ্ঠ ছুটে তীক্ষ্ণ বায়ুবক্ষ টুটি
উদাসীন আমার বিপদে। আজি বন্ধনের ভয়ে
ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতেছি এ অরণ্যে রাজপুত্র হ'য়ে,—
এ লজ্জায় চিত্তে হাস্য জাগিল আমার। শেষে হায়!
সহকার-লগ্ন-লতা জড়াইয়া পড়িনু ধরায়
অধোমুখে,—ধরিয়া তাহারা মোরে চিনিল তখনি।

উচ্চ সেই সভাগৃহে ল'য়ে গেল মোদেরে অমনি
স্বর্ণ সিংহাসনাসীনা মনীষা যথায়। শিরোপরে
ঝুলিছে স্ফটিক-ঝাড়, বিম্বে বিম্বে হীরাপ্রভা ক্ষরে,
সে প্রভা-দ্যোতিত তা'র মুকুটের পদ্মরাগ মণি
জ্বলিতেছে ধ্বক্ ধ্বক্—ধূমকেতু গগনে যেমনি

উদ্বোধি' প্রলয়-বার্ত্তা। যুগ্ম পার্শ্বে যুগ্ম সহচরী
আর্দ্রদীর্ঘ কৃষ্ণকেশ সযতনে দিতেছে আঁচড়ি।
আশে-পাশে দাঁড়াইয়া দীর্ঘাকৃতি অষ্ট কৃষী-সুতা
ঝড়-বৃষ্টি-রৌদ্রেগড়া পুরুষ হইতে শক্তি-যুতা
স্বাস্থ্যভরা তাম্রমূর্ত্তি,—অদ্রিকূটরাজি সিন্ধু-তটে
শকুন্তবেষ্টিত যথা দগ্ধ রুক্ষ মূরতি প্রকটে।

নারীসঙ্ঘ ভিন্ন হ'য়ে পথ দিল ; সভয় অন্তরে
মোরা রাজ্ঞী সন্নিকটে উত্তরিতে হেরি ভূমি'পরে
অর্দ্ধ-নগ্ন কণা রয়েছে পড়িয়া, পদ্মকান্তিভার
লুটাইছে তাক্ত অযতনে। হেরি বাম দিকে তা'র
অপরাধ-কুণ্ঠিত-শরীরা অশ্রুমুখী যুক্ত-করে
নতজানু বসিয়াছে বেলা,—আবেগ-নিশ্বাসভরে
সুগোল চম্পক অংশ থর থর কাঁপিছে সঘনে।
দীপ্ত সুলোচনা স্থির দাঁড়াইয়া উদ্দীপ্ত নয়নে
ভাষিতে লাগিল সভা ওজোদর্পে করি' সচকিত।—

"হে রাজনন্দিনি! পূর্ব্বে নাহি ছিল হেন বিপরীত,
তখন আমার মন্দ্র কর্ণে তব বাঞ্ছিত মধুর,—
মোর পরামর্শ বিনা করিতে না কাজ। সর্ব্বসুর
আমি দিনু তব চিত্তবীণায় বাঁধিয়া,—শিল্পশোভা
সব চিনাইনু আমি,—বিদ্যা দিয় বিশ্বমনোলোভা
কত না সন্দেহ যত্নে। আমি যে তোমারে প্রাণপ্রিয়
গণিতাম— হেথা। এই নতজানু যেমতি মদীয়
সহোদরা—গণিতে জ্যেষ্ঠার মত তুমিও আমারে।—
সে এক গিয়াছে দিন—অধিকার করিল তোমারে
তার পরে নূতন সঙ্গিনী জিনি' মৃদুচিত্ত তব ;
ক্রমশঃ বিমুখ তোমা' হেরি' মোর'পরে, নিত্যনব
বেদনায় আক্ষেপিনু গোপনে গোপনে ; খল তা'র
চিত্তখানি সরল মানিয়া, সরলতা আপনার
নিঃশেষিয়া তারি'পরে করিলে বর্ষণ, স্নেহহীন
শুষ্ক চিত্ত ল'য়ে শুধু মোর প্রতি হ'লে উদাসীন।

এত যে করিনু' তা'র এই পুরস্কার! তবু মনে
ভাবিতাম—কাটিল অনেক দিন পড়েছি বন্ধনে—
ফিরাইয়া ল'ব তোমা' বাঁধিব আবার স্নেহ ডোরে;—
তুমি কর্ত্রী প্রভু মোর কখনো বা চিন্তিয়া অন্তরে—
কখনো ভাবিয়া—হেথা আছে মোর পূর্ণ অধিকার,—
অথবা যে মহাকার্য্যে বিশ্বে হ'ল জনম তোমার
সহায় হইব তাহে—কাল যদি অনুকূল হয়।
এমনিই দুইজনে যেই কর্ম্ম বীজ মধুময়
সখা মাঝে বপন করিনু—শাখা কাণ্ডে বিকশিত
হেরি তা'রে মহানন্দে বিকশিয়া উঠিবে এ চিত।
জন্ম নিল এ কল্পনা উত্তপ্ত আমার চিত্তরসে
ক্ষণিক উচ্ছ্বাস মাত্রে জাগিল তা' চন্দ্রার মানসে
ইন্দ্রজাল-গুণে যথা তরু উঠে বিকশি' পলকে
ফুলে-ফলে। একত্রে আসিনু হেথা প্রতিভা-আলোকে
হত-জ্যোতি করিলে আমারে তুমি,—আসিত যে কোনো
ছাত্রী,—পাঠ লইতে চন্দ্রার নিকটে,—আমারে কখনো
সম্মানিত কর নাই রাণি! বয়োজ্যেষ্ঠা স্বদেশিনী
শুভার্থিনী বন্ধু আমি তব,—হায় রাজেন্দ্র-নন্দিনি!
সুদিনে দুর্দ্দিনে-সম, নিয়ত সঙ্গিনী, সে কি মোর
বিন্দুগুণ ধরে? বিদেশিনী অহংজ্ঞানে-ভোর—
চিত্ত, বয়সে নবীন দূর-দৃষ্টি নাহি মাত্র কিছু,
সর্ব্ব বিষয়েই নব—তবু দেখি তার পিছু পিছু
ঘুরিছে অগণ্য ছাত্রী, কেহ নাই মোর আয়তনে।
আশা ছিল একদিন শূন্যতা তাহার সর্ব্বজনে
দেখিয়া হাসিবে,—অতঃপর পুরুষ রাক্ষসদ্বয়
পশিল হেথায়। জানিয়াও তাহাদের বিন্দুভয়
নাহি প্রাণে; সঙ্গোপনে কালি প্রাতে বহুক্ষণ
একত্রে রহিল; পুরুষ উহারা—অম্লান বদন
তাহাও বলিয়াছিল—এরা দিবা শুনে এল কানে।—
বিন্দুমাত্র মোরেও কহেনি,—আমি বিনিদ্র নয়ানে
সকলি এসেছি দেখে অভিলষি' সমগ্র মঙ্গল;—
যেমনিই বুঝিলাম উহারা পুরুষ,—সচঞ্চল

ছুটিলাম কক্ষে তব দিতে সে বারতা। কিন্তু মনে
ভাবিনু আবার বল যদি তুমি—"চন্দ্রার বদনে
শুনা যাবে সে সব বারতা"—পশিতে তাহার বাসে
অন্যথা কহিত চন্দ্রা মার্জ্জনা মাগিয়া তব পাশে
এই বিলম্বের লাগি'—রহিত উহারা নারীকুঞ্জে
অজ্ঞাত-প্রকৃতি হয়ে। অতি শুষ্ক লঘু শাখা-পুঞ্জে
সারহীন কাণ্ডে করি ভর—যেই বৃক্ষে আছে সার
অনাদরে হয়ত' বা মূল তুমি ছেদিতে তাহার।
প্রথমে বলিনি কিছু স্বধু চক্ষু রাখিনু গোপনে,
দেখিনু স্বতন্ত্র রহে—ক্ষতি নাহি বুঝিলাম মনে।
তবু আজি তব পাশে বসিতে আসিনু তাহা, জানি'
তুমি হতাদর করিবে আমারে। গিয়াছিলে রাণি!
শৈল বিহারের তরে। স্থির বুঝেছিনু মনে, কথা
চন্দ্রা কহিবে আমূল—কিন্তু সে কি কহিল বারতা?
আমি ছাড়া তবে আর সে কাহিনী কে কহিবে কহ?
শুনিলাম প্রেতচয় নবোচিত বর্ব্বরতা সহ
নিজ মূর্ত্তি করেছে প্রকাশ।—তাহা আমারি কৌশল;
লজ্জা ও ধিক্কারে তাই চন্দ্রা তূর্ণ ত্যজিয়া এস্থল
পলাতকা আজি। লজ্জা কিছু আছে মানি তা'র মনে।
অবশেষে আমি তব রোষাগুনে দহিতে এক্ষণে
রহিলাম শুধু। হায় রাণি! ঢালি সমস্ত পরাণ
আমি যে তোমার কর্ম্ম সাধিলাম সঁপি ধনমান
স্বাস্থ্য আর সর্ব্ব বুদ্ধিবল,—পদচ্যুত কর মোরে
ধিক্ ধিক্ কি কহিব আর! কিন্তু জ্বলন্ত অক্ষরে
লিখে রাখ বচন আমার—আমা' ভ্রষ্ট অকস্মাৎ
সমস্ত কল্পনা তব চূর্ণ হ'য়ে হবে ধূলিসাৎ,—
প্রত্যেক ঘটনান্দোলে তৃণ সম উড়িবে ঘুরিয়া,
তখন পুরুষকণ্ঠ উদ্ঘোষিবে উচ্চে চিৎকারিয়া—
"সত্যেরে পায়নি ওরা—আলেয়ার আলোক নেহারি'
ঘুরিয়াছে মূঢ় ভ্রান্ত এতদিন পাছে পাছে তারি।"

ক্রমশ

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

রাজয় বিজয়।

১

কলেজের পড়া শেষ করিয়া দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছি। সহরঘাটি পর্য্যন্ত গ্রাণ্ড-ট্রঙ্ক রোড়ে নানাযানে অতিক্রম করিলাম। শুনিলাম পালামৌ জেলা সেখান হইতে অদূরবর্ত্তী—পূরা একদিনেরও পথ নহে। ব্যবসাবাণিজ্যের দিকে আমার বরাবর ঝোঁক। পালামৌ অঞ্চলে কয়লা খনির চেষ্টায় যাইব স্থির করিয়া সহরঘাটির ডাক বাঙ্গলোর আশ্রয় লইলাম। বলা বাহুল্য তখনও বারুণ ডাল্টনগঞ্জ রেলওয়ে পথ সম্পূর্ণ হয় নাই।

মাস খানেক পালকী এবং পুসপুসে ক্রমাগত আরোহণ করিয়া মনুষ্যবাহিত যানের উপর আমার কেমন একটা বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল। কথায় বলে খোদার উপর খোদকারী চলে না। মানুষ পশুর মত কেবল ভারবাহী স্বরূপ ব্যবহৃত হইবে ইহা কখন বিধাতৃবিহিত হইতে পারে না। আর স্বজাতিকে অর্থবলে সেরূপ নীচ বৃত্তিতে নিয়োগ করা নিশ্চয়ই অধর্ম্ম। ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস সম্প্রতি পড়িয়াছিলাম—এই সকল চিন্তা সহজেই আমার চিত্তকে অধিকৃত করিতেছিল। এমন সময়ে একখানা সুদর্শন এক্কা পাওয়া গেল। এক্কোয়ান সওয়ার পৌছাইয়া হাজারিবাগ অঞ্চল হইতে ফিরিতেছে। সে সাসেরামবাসী মুসলমান—আদব কায়দায় লক্ষ্ণৌ কি দিল্লীবাসীর মতই দুরন্ত। তাহার খাস্ উর্দ্দূ বুলি এবং রকমসই সেলামে মোহিত হইয়া পাঁচ টাকায় ডাল্টনগঞ্জ পর্য্যন্ত এক্কার ভাড়া স্বীকার করিলাম।

পরদিন প্রত্যূষে চা পান করিয়া এবং হ্যাট্‌কোট আঁটিয়া এক্কারোহণ করিলাম। পথ ভাল নহে। একে কাঁচা রাস্তা, তাহার উপর গ্রীষ্মের প্রারম্ভে গোযানের চলাচল বশতঃ ধূলি রাশিতে সমাচ্ছন্ন। এক্কার অশ্বরাজ তাহার উপর দিয়া নির্ম্মমভাবে ছুটিয়া চলিতেছিল।—আরোহীর অস্থিমাংসতন্ত্রীয় দেহে সংযুক্ত না থাকিলে যে ভাড়া আদায় করা দুষ্কর এ চিন্তা তাহার একেবারে না হওয়ার কথা। কিন্তু তাহার মনিবেরও সেইরূপ ভাব লক্ষ্য করিয়া আমি ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দুস্থানীতে বলিতে বাধ্য হইলাম, এত জোরে হাঁকাইবার দরকার কি? না হয় একটু দেরিতেই পৌঁছিব। ইহাতে এক্কোয়ানজী কিঞ্চিৎ আনন্দ অনুভব করিলেন বোধ হইল। "বাবু সাহেব, কখন বুঝি এক্কায় 'তস্‌রিফ্' লইয়া যান নাই? তবু আমার এ এক্কা মামুলি এক্কার চেয়ে অনেক বেশ আরামের জিনিস।" আমি কোন উত্তর করিলাম না দেখিয়া এক্কোয়ান সুধাইল—হুজুরকা দৌলৎখানা কোথায়? "দৌলৎখানা" যে নবাবী সভ্যতার ভাষায় বাড়ী বুঝায় তখনও সে জ্ঞান আমার ছিল না, কাজেই প্রশ্নের উত্তর না দিয়া বিস্মিতের মত কেবল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। সারথীবর ইহাতে কি ভাবিলেন বলিতে পারি না, কিন্তু আপনা হইতে তিনি বলিয়া গেলেন যে তাঁহার "গরিবখানা" কোতলপুর নামক গ্রামে, সেখানকার এক বাঁদী নাকি

সেরসাহের বাল্যকালে তাঁহাকে স্তন্য দিয়াছিল!

এই "দৌলৎখানা" এবং "গরিবখানা" পরে আমি নোট করিয়া লইয়াছিলাম। বঙ্কিম চন্দ্র ইদানীং বলিতেন যে ইংরেজী ভাষাটা ভারি অসরল, কিন্তু এইরূপ কপট বিনয়ের হৃদয়হীন আদান প্রদান সেক্সপীয়র এবং বেকনের মাতৃভাষায় নিশ্চয়ই সুলভ নহে।

সে যাহা হউক, ক্রমে আমরা বনপথে উপস্থিত হইলাম। দুই ধারে ক্ষুদ্র বৃহৎ জঙ্গল, মধ্যে অসমতল পথ বিসর্পিত হইয়া দূরের গণ্ডশৈল সমূহে মিশিয়া গিয়াছে। বৈশাখের প্রথমে নবোদ্গত কিশলয়ের তরুণ হরিতাভায় সমস্ত বনানী স্বপ্ন রাজ্যবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। দূরে দূরে অরুণ পুষ্পিত ঘন হরিৎ পত্রস্তবকে পলাশবন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রায় চারিক্রোশ পথ নিকটের এই বর্ণবৈচিত্র্য এবং দূর শৈলরাজির সেই উজ্জ্বল নীল সুষমা দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল। তখন একোয়ান গাছের ছায়ায় দণ্ড দুইয়েকের জন্য ঘোড়াটাকে খুলিয়া তাহাকে ঘাস ও দানা দিল। পরে চামড়ার ব্যাগ্ বাহির করিয়া বালতিতে জল ঢালিল এবং নিজে হাত মুখ ধুইয়া অশ্ববরকে জল পান করাইল।

২

এক্কা নূতন উদ্যমে আবার ছুটিয়া চলিল। কিন্তু পাহাড় জঙ্গল অতিক্রম করিয়া যে দুস্তর প্রান্তরে ক্রমে আমরা উপনীত হইলাম, তাহাতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মোহাবরণ ছিল না। তৃণ-গুল্ম শূন্য কঙ্করময় ভূমি— দৃষ্টি রেখা যেন মরুভূমির প্রত্যন্ত দেশে প্রহত হইতেছিল। আর এই স্থানের রাজপথ এরূপ জটিল ও অসমতল, যে এক একবার মনে হইতেছিল একাটা আমাদের লইয়া রসাতলে আত্মবিসর্জ্জন করিতে চলিয়াছে! আমায় অন্যমনস্ক দেখিয়া একোয়ান বলিল—"বাবু সাহব এই রাজয় বিজয়ের মাঠ! অনেক কাল হইল, এখানে পাহাড়িয়া জাতিদের সঙ্গে হিন্দু রাজার ঘোর যুদ্ধ হইয়াছিল। অতি ভয়ানক স্থান। ছয় ক্রোশের ভিতর আজকাল কোথাও জলবিন্দু নাই। আমরা অত্যন্ত অসময়ে—ক্ষুধা তৃষ্ণার সময় এখানে আসিয়া পড়িলাম!"

এই দারুণ গ্রীষ্মের দিনে ছয় ক্রোশের ভিতর জলবিন্দু নাই! লোকটা বলে কি? আমার বিশ্বাস হইতেছিল না। পিপাসা পূর্ব্বেই অনুভব করিতেছিলাম, জল কষ্টের কথায় কণ্ঠ তালু যেন সহসা শুকাইয়া উঠিল। একোয়ানটাকে অনুরোধ করিলাম, পানার্থ এক গ্লাস জল তাহার সেই চামড়ার ব্যাগ্ হইতে আমায় দিতে হইবে।

এক্কা চালক বিস্ময়ে আমার মুখের দিকে চাহিল। তাহার আননচ্ছবিতে আতঙ্কমিশ্রিত বিস্ময়ের যে রেখাপাত তখন দেখিয়াছিলাম, তেমন কোথাও আর কখন দেখিয়াছি মনে হয় না। ফলত আমার বড় ভয় হইল। একটু পরে আত্ম-সম্বরণ করিয়া একোয়ান বলিল— "বাবুজি, করিয়াছেন কি? জলবিন্দু সঙ্গে লন নাই? আমি ভাবিয়াছিলাম আপনার ঐ বাক্সের ভিতর সাহেবদের মত সোডা কি মিঠা পানি অবশ্য আছে। সাহেবদের মত টোপি পরিলেই হয় না বাবু সাহাব, তাদের মত হুঁসিয়ারি চাই। এ যে মৃত্যু নিশ্চয়। আমার ব্যাগে দুই এক বদনা ময়লা জল থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা আমি নিজের জন্য রাখিয়াছি—

দিতে পারিব না। আমি পিপাসায় মরিলে কে আমার লেড়কা বালার খবর লইবে বাবুজি ?"

নিজে আমি তখনও অবিবাহিত। ছেলে পুলের ভাবনায় মানুষ এতটা স্বার্থপর হইতে পারে তাহা তখন পর্য্যন্ত আমার ধারণায় আসিত না। কাতর কণ্ঠে বলিলাম "বাপু, ভগবান তোমার লেড়কা বালার ভাবনা নিশ্চয় ভাবিবেন। সেই ময়লাজলের এক গ্রাস আমায় দাও—দশ টাকা দিতেছি!" একোয়ান গাড়ী থামাইল। আমার একটু আশা ভরসা হইতেছিল। জলের ব্যাগ বাহির করিয়া সে আপনার বদ্‌না পূর্ণ করিতেছিল—পূরিল না। আমি—পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ, আমি জল দেখিয়া উঠিয়া বসিলাম। দেখিয়া নিষ্ঠুর একোয়ান তাড়াতাড়ি সেই এক বদ্‌না জল গলাধঃকরণ করিল। পরে আমার দিকে ফিরিয়া বলিল— "টাকার লোভ বড় লোভ হুজুর! কি জানি আপনি বেশী টাকা দিতে চাহিলে যদি আমার মতলব বিগ্‌ড়াইয়া যায়, তাই আগে ভাগে তৃষ্ণা নিবৃত্তি করিলাম। বাবুসাহাব, আল্লার নাম করুন! যতশীঘ্র পারি এই মরুভূমি পার হইয়া যাইতেছি!"

এই লোকটার মুখে ভগবানের নাম শুনিতে আমার গা জ্বালা করিতেছিল। নীরবে চক্ষু মুদিয়া সেই দ্রুতগামী এক্কার উপর অর্দ্ধশয়ানাবস্থায় আমি জগৎকারণকে তন্ময়চিত্তে ডাকিতে লাগিলাম। অন্তঃকরণের ভিতর যে অন্তঃকরণ, যেখানে কোন আবরণ নাই, কোনরূপ আত্মপ্রতারণার স্থান যেখানে নাই, সেই নিভৃত পরম পবিত্র হৃদয়মন্দিরে আদি কারণের আপাপবিদ্ধ চিরোজ্জ্বল রূপ কল্পনা করিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম। প্রভাতের সেই শীতল বায়ু এখন অগ্নিময় হইয়া ঝড়ের মত বহিতেছিল,—সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যেন চিতানলে ঝাঁপ দিবার জন্য প্রস্তুত!

৩

কতক্ষণ এ ভাবে কাটিল ঠিক্ বলিতে পারি না। কিন্তু ইহজীবনে নিদারুণ পিপাসার যন্ত্রনার ভিতর, অবশ্যম্ভাবী আসন্ন মৃত্যুর করাল ছায়া দেহ মনকে যখন আচ্ছন্ন করিতেছে, তখনও জগদীশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরের ভাব সেই একদিন মাত্র আমি উপলব্ধি করিয়াছিলাম। তার পর যে অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল, তাহা যে সেই আধ্যাত্মিক একাগ্রতার ফল, ইহা আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি।

ইহার ভিতর একবার বায়ুবেগ কথঞ্চিৎ কমিয়া আসিয়াছিল। চক্ষু মেলিতে আমার সাহস কি প্রবৃত্তি হইতেছিল না। কিন্তু সহসা নারীকণ্ঠের মধুররব কর্ণে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। বড় আশার কথা শুনিলাম। কে যেন সুধাইতেছে—"জল চাই ?"

একোয়ান আমার সঙ্কটাবস্থা বুঝিয়া প্রাণপণ বেগে ঘোড়া চালাইতেছিল, সে আহ্বান তাহার কর্ণগোচর হয় নাই। কিন্তু আবার সেই স্নিগ্ধ মধুর স্ত্রী-জনোচিতকণ্ঠে কে জিজ্ঞাসা করিল—"জল চাই বাবু?" সহসা বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চক্ষুরুন্মীলন করিয়া আমি উঠিয়া বসিলাম। অদূরে ক্ষুদ্র আম্র বাটিকা,—রাজপথ তাহা বেষ্টন করিয়া চলিয়া গিয়াছে। চারিদিকে মরুভূমি তুল্য তপ্ত তাম্রাভ অসীম প্রান্তর, তাহাতে মরীচিকার ঊর্ম্মিমালা নাচিয়া বেড়াইতেছে—তিনটি আমগাছ আর দুইটি খেজুরগাছ মাত্র সেখানে একটু ছায়া রচনা করিয়াছে।

স্ত্রীলোকটি সেইখান হইতে অপেক্ষাকৃত উচ্চ-কণ্ঠে আবার বলিল—"এক্কা রাখ একোয়ান ! তোমাদের কি জলের দরকার আছে ?"

আর সন্দেহ রহিল না। একোয়ান কোন দ্বিধা না করিয়া এক্কা শুদ্ধ আমায় সেই বৃক্ষ বাটিকায় লইয়া গেল। তথায় এক পূর্ণ কুম্ভ ও একটী লোটা সম্মুখে দীর্ঘাঙ্গী গৌরাঙ্গিনী অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। আমি এক্কা হইতে লাফাইয়া পড়িলাম, কিন্তু কথা কহিতে পারিতেছিলাম না। আমার অবস্থা বুঝিয়া মহিলাটি লোটায় জলপূর্ণ করিয়া আমায় পান করিতে দিলেন।

ধীরে ধীরে তিন চারি লোটা জল খাইয়া এবং মাথায় ও মুখে সেচন করিয়া তবে আমি সুস্থ হইলাম। তখন সত্য সত্যই আমার মনে হইল মধ্যবয়স্কা সেই কুললনার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া মাতা ভগবতী আমার জীবন রক্ষা করিতে আসিয়াছেন। তখন আমি ভক্তিভরে ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম।

আমায় সেভাবে প্রণাম করিতে দেখিয়া স্ত্রীলোকটি কিছু সঙ্কুচিত হইলেন। বুঝিয়া আমি বলিলাম—"কেন মা এরূপ সঙ্কোচবোধ করিতেছ ? তুমি আমার মাতার বয়সী এবং মাতৃ তুল্যা ! আর দেখিলেই মনে হয় ভদ্র-বংশীয়া।" উত্তরে তিনি কহিলেন, "বাবা আমি রাজপুতের মেয়ে, এখান হইতে পাঁচক্রোশ দূরে আমার ঘর। আমার স্বামী সিপাহী—পশ্চিমে সরকারী ফৌজে কাজ করেন, কিন্তু শূলের বেদনায় বর্ষকাল তিনি পীড়িত। কতপূজা স্বস্ত্যয়ন করিলাম, কিছুতে কিছু হয় না। অবশেষে আজিকার শেষ রাত্রে বাবা মহাদেও স্বপ্ন দিয়াছেন, এই রাজয় বিজয়ের মাঠে নিজে বহিয়া আনিয়া যেন জলদানের ব্রত করি। এক জনেরও তৃষ্ণা যদি নিবারণ করিতে পারি, প্রভু আমার আরোগ্যলাভ করিবেন। তাঁহার পীড়ার সে যে কষ্ট,—সে আর কি বলিব বাবা ? চক্ষে তাহা আর দেখিতে পারি না। নাজানি গতজন্মে কত পাপ করিয়াছিলাম।"—বলিতে বলিতে সাধ্বী অশ্রুমোচন করিলেন। পুনশ্চ আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন—"আজ ব্রতের প্রথম দিনেই তোমায় জলপান করাইয়া ভরসা হইতেছে, দেবাদিদেব মুখ তুলে চাইবেন। বাবা, আমি বড় দুঃখিনী !"

আমার পকেটে নোটের তাড়া ছিল। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য একখানি একশত টাকার নোট বাহির করিয়া বলিলাম—"মা, তোমার কি উপকার আমি করিতে পারি ? এই সামান্য সাহায্য লও, তোমার স্বামীর সেবা শুশ্রূষায় খরচ করিও।"

রাজপুত্‌মহিলা সতীসুলভ দার্ঢ্যের সহিত অথচ সহজ সরল মধুরভাবে আমার সেই দান প্রত্যাখ্যান করিলেন। মুখ নত করিয়া আমায় জানাইলেন যে অর্থের তাঁর বিশেষ অভাব নাই ! আর তিনি ঠাকুরের আদেশ পালন করিতে আসিয়াছেন মাত্র। আমি যেন আশীর্ব্বাদ করি তাঁর স্বামী রোগ মুক্ত হউন।

লজ্জিত হইয়া আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম এবং কায়মনোবাক্যে দেবাদিদেবের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করিলাম সেই মহিলার স্বামী যেন অচিরে আরোগ্যলাভ করেন। পাছে না বুঝিয়া সেই কুলকামিনীর হৃদয়ে কোন বেদনা দিয়া থাকি, এই আশঙ্কায় সন্তানের মতই আব্‌দার করিয়া আবার খানিকটা জল তাঁহার কাছ হইতে চাহিয়া লইলাম। মাথায়

মুখে, চোখে বিশ্ব-বিধাতার আশীর্ব্বাদ তুল্য সেই শীতল পানীয় সেচন করিয়া আবার সেই মাতৃরূপার সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইলাম।

একোয়ান্‌ও জল লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিল। আল্লা আকবর ও সেই মাইজীকে ধন্যবাদ দিয়া সে পুনরায় একা ছাড়িয়া দিল।

পথে বারম্বার স্বপ্নস্মৃতিবৎ এই আশ্চর্য্য ঘটনা মনে প্রতিবিম্বিত হইতেছিল। কৃতজ্ঞতায়, ভক্তিতে দেহ মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল এবং আপন মনে বারম্বার গাহিতেছিলাম—

তুমি যে আছ তাহে সংশয় কিবা আর ?
পিতারূপে মাতারূপে, ভাই ভগিনীরূপে,
সুহৃদ সন্তানরূপে, তুমি যে সবার সার।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

গৌড়কাহিনী।

স্বাধীনতা-লিপ্সা।

গৌড়রাজ্যের স্বাধীনতা লিপ্সা শাসন কৌশলে চরিতার্থ করিবার আশায় দিল্লীশ্বর খিয়াসুদ্দীন বলবন্‌ আপন প্রিয় পুত্র নাসিরুদ্দীনকে গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের স্বাধীন সুলতানের ন্যায় ছত্রদণ্ড ব্যবহারের অনুমতি দান করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে না করিতে ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমায় মোগলপাঠানের মধ্যে সাম্রাজ্যকলহ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। মধ্য এসিয়ার মোগলগণ ভারতবর্ষ অধিকার করিবার আশায় পঞ্চনদ প্রদেশ আক্রমণ করিবার আয়োজন করিতেছিলেন। দিল্লীশ্বর তাহার গতিরোধ করিবার জন্য আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহজাদা মহম্মদকে পঞ্চনদপ্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। শাহজাদা সাহসী এবং সুচতুর বলিয়া লোক সমাজে সুপরিচিত ছিলেন। বৃদ্ধ সম্রাট এইরূপে এক পুত্রকে পশ্চিম সীমায় এবং অপর পুত্রকে পূর্ব্বসীমায় রাজ্য রক্ষায় নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং নিরুদ্বেগে জীবন সন্ধ্যা অতিবাহিত করিবার কল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার শেষ জীবন ক্রমেই তমসাচ্ছন্ন হইয়া আসিতে লাগিল। মোগল দলকে বাধাপ্রদান করিতে গিয়া শাহজাদা মহম্মদ কালকবলে পতিত হইলেন। দিল্লীশ্বরের শোকের অবধি রহিল না। তিনি নাসিরুদ্দীনকে লক্ষণাবতী হইতে দিল্লীতে আনয়ন করিয়া তাঁহাকেই দিল্লীর সিংহাসন দান করিবেন বলিয়া অভিমত প্রচারিত করিলেন। নাসিরুদ্দীন কিছুদিন দিল্লীতে অবস্থান করিবার পর একদিন মৃগয়া ব্যপদেশে রাজধানী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, লক্ষণাবতী অভিমুখে পলায়ন করিলেন। ইহাতে বৃদ্ধ সম্রাট রোগে শোকে মনস্তাপে অল্পকালের মধ্যেই কালকবলে নিপতিত হইলেন। দিল্লীতে অরাজকতা উপস্থিত হইল। কুচক্রী মন্ত্রিদল সময় পাইয়া নাসিরুদ্দীনের সপ্তদশবর্ষ বয়স্ক কাইকোবাদ নামক অযোগ্য পুত্রকে দিল্লীর সিংহাসনে বসাইয়া দিয়া

ইচ্ছামত রাজ্যশাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কাইকোবাদ কুক্রিয়াসক্ত তরুণ যুবক ;—তাঁহার নামে যাঁহারা রাজ্য শাসন করিতে প্রবৃত্ত, তাঁহারাও কুক্রিয়াসক্ত স্বার্থপরায়ণ রাজকর্ম্মচারী। এরূপ অবস্থায় বলবন্‌ বংশের আধিপত্য বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা উপস্থিত হইতেছে দেখিয়া গৌড়েশ্বর নাসিরুদ্দীন স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি গৌড়ীয় সেনাদল সুসজ্জিত করিয়া পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিবার জন্য দিল্লী যাত্রা করিলেন। তৎকালে দিল্লী এবং লক্ষ্মণাবতী রাজ্যের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র নদীমাত্র ব্যবধান ছিল, তাহা বিহার প্রদেশের শেষ সীমা বলিয়া সুপরিচিত ছিল, কুচক্রী মন্ত্রিদল এই অভিযানের সমাচার প্রাপ্ত হইয়া কাইকোবাদকে পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণার জন্য উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন। কাইকোবাদ সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। পিতাপুত্র এইরূপে আপন সাম্রাজ্যের শেষ সীমায় আসিয়া নদীতীরে শিবির সন্নিবেশ করিয়া সমরকলহের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। যুদ্ধ হইল না,—নাসিরুদ্দীন পুত্রের শিবিরে উপনীত হইবামাত্র, পুত্র সিংহাসন হইতে অবরোহণ করিয়া পিতার পদচুম্বন করায়, অশ্রুধারায় যুদ্ধকলহ ভাসিয়া গেল, —পিতাপুত্রে সন্ধিসংস্থাপিত হইল!

নাসিরুদ্দীন লক্ষ্মণাবতীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর দিল্লীতে আবার অরাজকতা প্রবল হইয়া উঠিল। তাহাতে সম্রাট কাইকোবাদ নিহত হইলেন; বলবন্‌ বংশের আধিপত্য বিলুপ্ত হইয়া গেল; সুলতান জালালুদ্দীন নাম গ্রহণ করিয়া খিলিজিবংশীয় একব্যক্তি দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এই সকল ভাগ্যবিপর্য্যয়ের মধ্যে নাসিরুদ্দীন ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিলেন। লক্ষ্মণাবতীরাজ্যে যে স্বাধীনতা লিপ্সা চিরদিন লোকচিত্ত অধিকার করিয়া তাহাকে স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছিল, তাহা সময় পাইয়া সমধিক প্রবল হইয়া উঠিল।

জালালুদ্দীনের পর সুলতান আলাউদ্দীন আবার রাজ-প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া লক্ষ্মণাবতীরাজ্য দিল্লীর অধীন করিয়া রাখিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তিনি বাহাদুর খাঁ নামক এক ব্যক্তিকে রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আলাউদ্দীনের পরলোক গমনের পর বাহাদুর খাঁ লক্ষ্মণাবতীরাজ্যে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া সুলতান বাহাদুরশাহ নাম গ্রহণ করিলেন। বাহাদুর সুবর্ণগ্রামে বাস করিতেন। তিনি নাসিরুদ্দীনের পরলোকগমনের পর সুবর্ণগ্রাম হইতে বাহুবলে লক্ষ্মণাবতী অধিকার করিয়াছিলেন। দিল্লীশ্বর তাঁহাকেই রাজপ্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এইরূপে নাসিরুদ্দীনের পৌত্র লক্ষ্মণাবতীরাজ্য হইতে তাড়িত হইয়া অগৌরবে কালযাপন করিতেছিলেন। আলাউদ্দীনের পর খিয়াসুদ্দীন তোগলক দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিলে, নাসিরুদ্দীনের পৌত্র তাহার শরণাপন্ন হইলেন। এই যুবকের নামও নাসিরুদ্দীন ছিল।* তোগলক ইহাকে হাতে পাইয়া গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিলেন। সুবর্ণ-

* রিয়াজ-উস্‌-সলাতিনের এই অংশের বিবরণ অস্পষ্ট এবং ভ্রমপ্রমাদ পূর্ণ। দ্বিতীয় নাসিরুদ্দীনকে প্রথম নাসিরুদ্দীনের পৌত্র তাহার উল্লেখ না করায়, গোলাম হোসেনের ইতিহাসের এই অংশ দুর্ব্বোধ হইয়া রহিয়াছে।

গ্রাম অধিকৃত হইল; বাহাদুর শাহ্ বন্দী হইলেন; সম্রাটের আদেশে সমগ্র বঙ্গভূমি বিলায়েত লক্ষ্মণাবতী-বিলায়েত সুবর্ণগ্রাম এবং বিলায়েত সপ্তগ্রাম নামক তিনভাগে বিভক্ত হইল। নাসিরুদ্দীন এই ত্রিধাবিভক্ত গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন। সুবর্ণগ্রামেই রাজধানী প্রতিষ্ঠিত থাকিবার কথা ইতিহাসে লিখিত আছে। এই নবরাজ্য দীর্ঘকাল শান্তিসুখ উপভোগ করিতে পারিল না। নাসিরুদ্দীনের মৃত্যু হইল,—আবার অরাজকতা প্রবল হইয়া উঠিল।

এই সকল বিপ্লবের মধ্যে কাদির খাঁ কিছুদিনের জন্য দিল্লীশ্বরের রাজপ্রতিনিধিরূপে শাসন সংস্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিণামে সকল চেষ্টাই বিফল হইয়া গেল,—সুলতান ফকরউদ্দীন স্বাধীনভাবে গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

বক্তিয়ার খিলিজির সময় হইতে কাদির খাঁর সময় পর্য্যন্ত—প্রায় দেড়শত বৎসর বঙ্গভূমি বহুবিপ্লবে বিপর্য্যস্ত হইয়াও, স্বাধীনতা লিপ্সা পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। প্রথমে বক্তিয়ারকে এই স্বাধীনতা লিপ্সার পরাজয় সাধনের জন্য চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। সে চেষ্টা সফল হয় নাই। উত্তরবঙ্গের অল্পসংখ্যক পরগণামাত্র তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। বক্তিয়ার খিলিজির পরলোকগমনের পর অর্দ্ধশতাব্দীর অধিককাল পর্য্যন্ত পূর্ব্ববঙ্গ অক্ষুণ্ণ প্রতাপে স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তাহার পর স্বার্থসমন্বয় সাধিত হইয়া হিন্দুমুসলমানকে এক জাতিতে—বাঙ্গালী জাতিতে—পরিণত করিতে চেষ্টা করে। সে চেষ্টা যত সফল হইতে লাগিল, ততই বাঙ্গালী হিন্দুমুসলমান দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করিয়া একটি স্বাধীন সাম্রাজ্য গঠনের অতৃপ্ত পিপাসার পরিচয় প্রদান করিতেছিল। এতদিনের পর তাহা সফল হইল। গৌড়কাহিনী সেই স্বাধীন রাজ্যের অভ্যুদয় কাহিনী। প্রথম দেড়শত বৎসরের ইতিহাস তাহারই উপক্রমণিকামাত্র।

এই দেড়শত বৎসরের ইতিহাস কলহ কোলাহলের ইতিহাস,—কখন তাহা হিন্দু মুসলমানের কলহ,—কখন বা মুসলমান মুসলমানের কলহ। কিন্তু সকল কলহের মূল—স্বাধীনতা লিপ্সা। এই কলহকোলাহল যতদিন প্রবল ছিল, ততদিন মুসলমান কেবল রাজ্যজয় এবং রাজ্যরক্ষায় ব্যাপৃত ছিলেন; তাঁহাদের পক্ষে সুপ্রণালীতে রাজ্যশাসনের ব্যবস্থা করিবার অবসর উপস্থিত হয় নাই। মুসলমানগণ এদেশে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে বাস করিতে আরম্ভ করায়, বাঙ্গালী হিন্দুর ন্যায় বাঙ্গালী মুসলমানের পক্ষেও সুশাসন সংস্থাপনার জন্য আগ্রহ উপস্থিত হইয়াছিল। স্বাতন্ত্র্য ভিন্ন—দিল্লীর অধীন থাকিয়া এদেশে প্রকৃত সুশাসন সংস্থাপিত হইতে পারে না বলিয়াই বাঙ্গালী হিন্দুমুসলমান পুনঃ পুনঃ স্বাধীনতা ঘোষণার চেষ্টা করিয়া থাকিবে। ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরার আলোচনা করিলে স্বীকার করিতে হয়,—এরূপ আকাঙ্ক্ষা তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক বলিয়া উল্লিখিত হইবার যোগ্য। তাহার কারণপরম্পরার অভাব ছিল না।

দিল্লীশ্বরের রাজ্য একটি স্বতন্ত্র রাজ্য—তাহা স্বতন্ত্ররূপে সংস্থাপিত হইয়াছিল। গৌড়ীয় মুসলমান সাম্রাজ্যও সেইরূপ একটি স্বতন্ত্র রাজ্য—তাহাও স্বতন্ত্ররূপে সংস্থাপিত হইয়াছিল। দিল্লীরাজ্য অপেক্ষা গৌড়ীয়

রাজ্য সর্ব্বতোভাবে সমৃদ্ধ বলিয়া পরিচিত ছিল। দিল্লীরাজ্য নিয়ত শত্রুবেষ্টিত,—তাহার আয়তন অধিক ছিল না। গৌড়ীয় রাজ্য আসমুদ্রবিস্তৃত—শিল্পবাণিজ্যে সমুন্নত—স্থলপথে ও জলপথে নানা দিগ্দেশের সঙ্গে বাণিজ্যসূত্রে আবদ্ধ। এই রাজ্য ধনধান্য পূর্ণ। ইহার অধিবাসীগণ সাহসী সুচতুর। এরূপ রাজ্য লাভ করিয়া মুসলমানগণ ইহাকে তাঁহাদের আবাসভূমিতে পরিণত করিয়াছিলেন। এই-রূপে হিন্দুমুসলমানের স্বার্থ এক হইয়া উঠিয়াছিল। দেড়শত বৎসরের মধ্যে এই বিচিত্র পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল বলিয়া, গৌড়ীয় সাম্রাজ্য স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া উত্তরোত্তর ভুবনবিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। এখন যে সকল ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে—তাহার বিচিত্র স্বপ্নমোহে দর্শকচিত্ত অভিভূত হইয়া পড়ে। সে সমস্তই গৌড়ীয় স্বাধীন সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ। এই স্বাধীন সাম্রাজ্যের ইতিহাস বিবিধ অভ্যুদয় লাভের ইতিহাস। তাহা-স্বার্থসমন্বয়ের ইতিহাস,—তাহা হিন্দুমুসলমানের ইতিহাস,—তাহা স্বাধীনতালিপ্সার ইতিহাস,—বিচিত্র বিজয় গৌরবে অদ্যাপি তাহা বাঙ্গালীর নাম ভুবন-বিখ্যাত করিয়া রাখিয়াছে। *

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

অস্তে।
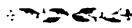
তোমারে সবার চেয়ে বেসেছিনু ভাল
তাই তোমাহীন আজো তব মুখ আলো
এ বিশ্বেরে করিছে সুন্দর নেত্রে মম ;
অস্তগত তপনের স্বর্ণরাগ সম
সন্ধ্যার আকাশে, সুকুমার কান্তি যার
রাখে পরাভব করি মহা অন্ধকার !

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

* রিয়াজের মুসলমান অনুবাদক মহাশয় এই স্বাধীন সাম্রাজ্যের উল্লেখ করিতে গিয়া লিখিয়াছিলেন :—
"Bengal attained great prosperity during the rule of these independent Mussulman Kings. Forts and public buildings were erected, Mosques, Colleges, Students Hostels, travellers' guest houses were established in all parts of the kingdom, tanks excavated and roads laid down. * * * Great theistic movements, having for their object the conciliation of the the two races, sprang up. Kabir and Chaitannya, the great spiritual leaders, who preached catholic doctrines, flourished in this period."

পথ ও পাথেয়। ভাদ্রপ্রকাশ

জেলে প্রতিদিন জাল ফেলে তাহার জালে মাছ ওঠে। একদিন জাল ফেলিতেই হঠাৎ একটা ঘড়া উঠিল, এবং ঘড়ার মুখ যেমন খুলিল অমনি তাহার ভিতর হইতে পুঞ্জ পুঞ্জ ধোঁয়ার আকার ধরিয়া একটা দৈত্য বাহির হইয়া পড়িল, আরব্য উপন্যাসে এমনি একটা গল্প আছে।

আমাদের খবরের কাগজ প্রতিদিন খবর টানিয়া আনে; কিন্তু তাহার জালে যে সেদিন এমন একটা ঘড়া ঠেকিবে, এবং ঘড়ার মধ্য হইতে এত বড় একটা ত্রাসজনক ব্যাপার বাহির হইয়া পড়িবে তাহা আমরা কোনো দিন প্রত্যাশাও করিতে পারি নাই।

নিতান্তই ঘরের দ্বারের কাছ হইতে এমন একটা রহস্য হঠাৎ চক্ষের নিমিষে উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িলে সমস্ত দেশের লোকের মনে যে আন্দোলন উপস্থিত হয় সেই সুদূরব্যাপী চাঞ্চল্যের সময় কথার এবং আচরণের সত্যতা রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠে। জলে যখন ঢেউ উঠিতে থাকে তখন ছায়াটা আপনি বিকৃত হইয়া যায়, সে জন্য কাহাকেও দোষ দিতে পারিনা। অত্যন্ত ভয় এবং ভাবনার সময় আমাদের চিন্তা ও বাক্যের মধ্যে সহজেই বিকলতা ঘটে অথচ ঠিক এইরূপ সময়েই অবিচলিত এবং নির্বিকার সত্যের প্রয়োজন সকলের চেয়ে বেশি। প্রতিদিন অসত্য ও অর্দ্ধসত্য আমাদের তত গুরুতর অনিষ্ট করেনা কিন্তু সঙ্কটের দিনে তাহার মত শত্রু আর কেহ নাই।

অতএব ঈশ্বর করুন, আজ যেন আমরা ভয়ে, ক্রোধে, আকস্মিক বিপদে, দুর্ব্বল চিত্তের অতিমাত্র আক্ষেপে আত্মবিস্মৃত হইয়া নিজেকে বা অন্যকে ভুলাইবার জন্য কেবল কতকগুলা ব্যর্থ বাক্যের ধূলা উড়াইয়া আমাদের চারিদিকের আবিল আকাশকে আরো অস্বচ্ছ করিয়া না তুলি। তীব্র বাক্যের দ্বারা চাঞ্চল্যকে বাড়াইয়া তোলা হয়, ভয়ের দ্বারা সত্যকে কোন প্রকারে চাপা দিবার প্রবৃত্তি জন্মে—অতএব অন্যকার দিনে হৃদয়াবেগ প্রকাশের উত্তেজনা সম্বরণ করিয়া যথাসম্ভব শান্তভাবে যদি বর্ত্তমান ঘটনাকে বিচার না করি, সত্যকে আবিষ্কার ও প্রচার না করি তবে আমাদের আলোচনা কেবল যে ব্যর্থ হইবে তাহা নহে, তাহাতে অনিষ্ট ঘটিবে।

আমাদের হীনাবস্থা বলিয়াই উপস্থিত বিভ্রাটের সময় কিছু অতিরিক্ত ব্যগ্রতার সহিত তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে ইচ্ছা করে, "আমি ইহার মধ্যে নাই; এ কেবল অমুক দলের কীর্ত্তি; এ কেবল অমুক লোকের অন্যায়; আমি পূর্ব্ব হইতেই বলিয়া আসিতেছি এসব ভাল হইতেছে না; আমিত জানিতাম এমনি একটা ব্যাপার ঘটিবে।"

কোনো আতঙ্কজনক দুর্ঘটনার পর এই

প্রকার অশোভন উৎকণ্ঠার সহিত পরের প্রতি অভিযোগ বা নিজের সুবুদ্ধি লইয়া অভিমান আমার কাছে দুর্ব্বলতার পরিচয় সুতরাং লজ্জার বিষয় বলিয়া মনে হয়। বিশেষতঃ আমরা প্রবলের শাসনাধীনে আছি এই জন্য রাজপুরুষদের বিরাগের দিনে অন্যকে গালি দিয়া নিজেকে ভালমানুষের দলে দাঁড় করাইতে গেলে তাহার মধ্যে কেমন একটা হীনতা আসিয়া পড়েই—অতএব দুর্ব্বল পক্ষের এইরূপ ব্যাপারে অতিরিক্ত উৎসাহ প্রকাশ করিতে না যাওয়াই ভাল।

তাহার পরে, যাহারা অপরাধ করিয়াছে, ধরা পড়িয়াছে, নির্ম্মম রাজদণ্ড যাহাদের 'পরে উদ্যত হইয়া উঠিয়াছে, আর কিছু বিচার না করিয়া কেবল মাত্র বিপদ ঘটাইয়াছে বলিয়াই তাহাদের প্রতি তীব্রতা প্রকাশ করাও কাপুরুষতা। তাহাদের বিচারের ভার এমন হাতে আছে যে, অনুগ্রহ বা মমত্ব সেই হাতকে লেশমাত্র দণ্ডলাঘবতার দিকে বিচলিত করিবে না। অতএব ইহার উপরেও আমরা যেটুকু অগ্রসর হইয়া যোগ করিতে যাইব তাহাতে ভীরু স্বভাবের নির্দ্দয়তা প্রকাশ পাইবে। ব্যাপারটাকে আমরা যেমনি দোষাবহ বলিয়া মনে করিনা কেন, সে সম্বন্ধে মত প্রকাশের আগ্রহে আমরা আত্মসম্ভ্রমের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিব কেন? সমস্ত দেশের মাথার উপরকার আকাশে যখন একটা রুদ্ররোষ রক্তবর্ণ হইয়া স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে তখন সেই বজ্রধরের সম্মুখে আমাদের দায়িত্ববিহীন চাপল্য কেবল যে অনাবশ্যক তাহা নহে তাহা কেমন একপ্রকার অসঙ্গত।

যিনি নিজেকে যতই দূরদর্শী বলিয়া মনে করুন না একথা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, ঘটনা যে এতদূর আসিয়া পৌঁছিতে পারে তাহা দেশের অধিকাংশ লোক কল্পনা করে নাই। বুদ্ধি আমাদের সকলেরই ন্যূনাধিক পরিমাণে আছে কিন্তু চোর পালাইলে সেই বুদ্ধির যতটা বিকাশ হয় পূর্ব্বে ততটা প্রত্যাশা করা যায় না।

অবশ্য, ঘটনা যখন ঘটিয়াছে তখন একথা বলা সহজ যে, ঘটনার সম্ভাবনা ছিল বলিয়াই ঘটিয়াছে। এবং অমনি এই সুযোগে আমাদের মধ্যে যাঁহারা স্বভাবত কিছু অধিক উত্তেজনাশীল তাঁহাদিগকেও ভর্ৎসনা করিয়া বলা সহজ যে তোমরা যদি এতটা দূর বাড়াবাড়ি না করিতে তবে ভাল হইত।

আমরা হিন্দু, বিশেষত বাঙালী, বাক্যে যতই উত্তেজনা প্রকাশ করি কোনো দুঃসাহসিক কাজে কদাচ প্রবৃত্ত হইতে পারিনা এই লজ্জার কথা দেশে বিদেশে রাষ্ট্র হইতে বাকি নাই। ইহা লইয়া বাবুসম্প্রদায় বিশেষ ভাবে ইংরেজের কাছে অহরহ দুঃসহ ভাষায় খোঁটা খাইয়া আসিয়াছে। সর্ব্বপ্রকার উত্তেজনাবাক্য অন্তত বাংলা দেশে যে সম্পূর্ণ নিরাপদ এ সম্বন্ধে আমাদের শত্রু মিত্র কাহারো কোনো সন্দেহ মাত্র ছিলনা! তাই এপর্য্যন্ত কথায় বার্ত্তায় ভাবে ভঙ্গিতে আমরা যতই বাড়াবাড়ি প্রকাশ করিয়াছি তাহা দেখিয়া কখনো বা পর কখনো বা আত্মীয় বিরক্ত হইয়াছে, রাগ করিয়াছে, আমাদের অসংযমকে প্রহসন বলিয়া উপহাস করিতেও ক্ষান্ত হয় নাই। বস্তুত বাংলা কাগজে অথবা কোনো বাঙালী বক্তার মুখে যখন অপরিমিত স্পর্দ্ধাবাক্য বাহির হইত তখন এই বলিয়াই বিশেষ ভাবে স্বজাতির

জন্য লজ্জা অনুভব করিয়াছি যে যাহারা দুঃসাহসিক কাজ করিবার জন্য বিখ্যাত নহে তাহাদের বাক্যের তেজ দীনতাকে আরো উজ্জ্বল করিয়া প্রকাশ করে মাত্র। বস্তুত বহুদিন হইতে বাঙালীজাতি ভীরু অপবাদের দুঃসহ ভার বহন করিয়া নতশির হইয়াছে বলিয়াই বর্ত্তমান ঘটনাসম্বন্ধে ন্যায় অন্যায় ইষ্ট অনিষ্ট বিচার অতিক্রম করিয়াও অপমানমোচনের উপলক্ষ্যে বাঙালীর মনে একটা আনন্দ না জন্মিয়া থাকিতে পারে নাই।

অতএব এ কথাটা সত্য যে, বাংলা দেশের মনের জ্বালা দেখিতে দেখিতে ক্রমশই যে প্রকার অগ্নিমূর্ত্তি ধরিয়া প্রকাশ পাইয়া উঠিয়াছে ইহাকে আমাদের দেশের বা অন্য দেশের কোনো জ্ঞানী পুরুষ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া কোনো দিন অনুমান করেন নাই। অতএব আজ আমাদের এই অকস্মাৎ বুদ্ধিবিকাশের দিনে, যাহাকে আমার ভাল লাগেনা তাহাকে ধরিয়া অসাবধানতার জন্য দায়ী করিতে বসা সুবিচারসঙ্গত নহে। আমিও এই গোলমালের দিনে কোনো পক্ষের বিরুদ্ধে নালিশ উত্থাপন করিতে চাইনা। কিন্তু কেমন করিয়া কি ঘটিল এবং তাহার ফলাফলটা কি, সেটা নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া আমাদের পথ ঠিক করিয়া লইতেই হইবে; সেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়া যদি একজনের বা অনেকের সঙ্গে আমার মতের অনৈক্য প্রকাশ হয়, তবে দয়া করিয়া একথা নিশ্চয় মনে রাখিবেন, যে, আমার বুদ্ধির ক্ষীণতা থাকিতে পারে, আমার দৃষ্টিশক্তির দুর্ব্বলতা থাকা সম্ভব, কিন্তু স্বদেশের হিতের প্রতি ঔদাসীন্য বা হিতৈষীদের প্রতি কিছুমাত্র বিরুদ্ধ ভাববশত যে আমি বিচারে ভুল করিতেছি ইহা কদাচ সত্য নহে। অতএব আমার কথাগুলি যদিবা গ্রাহ্য নাও করেন আমার অভিপ্রায়ের প্রতি ধৈর্য্য ও শ্রদ্ধা রক্ষা করিবেন।

বাংলা দেশে কিছুকাল হইতে যাহা ঘটিয়া উঠিতেছে তাহার সংঘটনে আমাদের কোন্ বাঙালীর কতটা অংশ আছে তাহার সূক্ষ্ম বিচার না করিয়া একথা নিশ্চয় বলা যায় যে, কায় বা মন বা বাক্যে ইহাকে আমরা প্রত্যেকেই কোনো না কোনো প্রকারে খাদ্য জোগাইয়াছি। অতএব যে চিত্তদাহ কেবল পরিমিত স্থান লইয়া বদ্ধ থাকে নাই, প্রকৃতিভেদে যাহার উত্তেজনা আমরা প্রত্যেকে নানাপ্রকারে অনুভব ও প্রকাশ করিয়াছি, তাহারই একটা কেন্দ্রক্ষিপ্ত পরিণাম যদি এই প্রকার গুপ্ত বিপ্লবের অদ্ভুত আয়োজন হয় তবে ইহার দায় এবং দুঃখ বাঙালীমাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে। জ্বর যখন সমস্ত শরীরকে অধিকার করিয়াই হইয়াছিল তখন হাতের তেলো কপালের চেয়ে ঠাণ্ডা ছিল বলিয়াই মৃত্যুকালে নিজেকে সাধু ও কপালটাকেই যত নষ্টের গোড়া বলিয়া নিষ্কৃতি পাইবে না। আমরা কি করিব কি করিতে চাই সে কথা স্পষ্ট করিয়া ভাবি নাই; এই জানি আমাদের মনে আগুন জ্বলিয়াছিল; সেই আগুন স্বভাবধর্ম্মবশত ছড়াইয়া পড়িতেই ভিজা কাঠ ধোঁয়াইতে থাকিল, শুকনা কাঠ জ্বলিতে লাগিল এবং ঘরের কোণে কোন্‌খানে কেরোসিন্ ছিল সে আপনাকে ধারণ করিতে না পারিয়া টিনের শাসন বিদীর্ণ করিয়া একটা বিভীষিকা করিয়া তুলিল।

তা যাই হোক্, কার্য্যকারণের পরম্পরের

যোগে পরস্পরের ব্যাপ্তি যেমন করিয়াই ঘটুক না কেন, তাই বলিয়া অগ্নি যখন অগ্নিকাণ্ড করিয়া তুলে তখন সব তর্ক ছাড়িয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিতে হইবে এ সম্বন্ধে মতভেদ হইলে চলিবে না।

বিশেষত কারণটা দেশ হইতে দূর হয় নাই; লোকের চিত্ত উত্তেজিত হইয়া আছে। উত্তেজনা এতই তীব্র যে, যে সকল সাংঘাতিক ব্যাপার আমাদের দেশে অসম্ভব বলিয়া মনে করা যাইত তাহাও সম্ভবপর হইয়াছে। বিরোধ-বুদ্ধি এতই গভীর এবং সুদূরবিস্তৃতভাবে ব্যাপ্ত যে কর্তৃপক্ষ ইহাকে বলপূর্ব্বক কেবল স্থানে স্থানে উৎপাটিত করিতে চেষ্টা করিয়া কখনই নিঃশেষ করিতে পারিবেন না, বরঞ্চ ইহাকে আরো প্রবল ও প্রকাণ্ড করিয়া তুলিবেন।

বর্ত্তমান সঙ্কটে রাজপুরুষদের কি করা কর্ত্তব্য তাহা আলোচনা করিতে গেলে তাঁহারা শ্রদ্ধা করিয়া শুনিবেন বলিয়া ভরসা হয় না। আমরা তাঁহাদের দণ্ডশালার দ্বারে বসিয়া তাঁহাদিগকে পোলিটিকাল প্রাজ্ঞতা শিক্ষা দিবার দুরাশা রাখি না। আমাদের বলিবার কথাও অতিপুরাতন এবং শুনিলে মনে হইবে ভয়ে বলিতেছি। তবু সত্য পুরাতন হইলেও সত্য এবং তাহাকে ভুল বুঝিলেও তাহা সত্য। কথাটি এই—শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা—কথা আরো একটু আছে, ক্ষমা শুধু শক্তের ভূষণ নহে সময় বিশেষে শক্তের রক্ষাস্ত্রও ক্ষমা। কিন্তু আমরা যখন শক্তের দলে নহি তখন এই সাত্ত্বিক উপদেশটি লইয়া অধিক আলোচনা আমাদের পক্ষে শোভা পায় না।

ব্যাপারটা দুই পক্ষকে লইয়া—অথচ দুই পক্ষের মধ্যে আপসে বোঝাপড়ার সম্বন্ধ অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে; একদিকে প্রজার বেদনাকে উপেক্ষা করিয়া বল একান্ত প্রবল মূর্ত্তি ধরিতেছে, অন্য দিকে দুর্ব্বলের নিরাশ মনোরথ সফলতার কোনোপথ না পাইয়া প্রতিদিন মরিয়া হইয়া উঠিতেছে;—এ অবস্থায় সমস্যাটি ছোট নহে। কারণ, আমরা এই দুই পক্ষের ব্যাপারে কেবল এক পক্ষকে লইয়া যেটুকু চেষ্টা করিতে পারি তাহাই আমাদের একমাত্র সম্বল। ঝড়ের দিনে হালের মাঝি নিজের খেয়ালে চলিতেছে; আমরা দাঁড় দিয়া যেটুকু রক্ষা করিতে পারি অগত্যা তাহাই করিতে হইবে;—মাঝি সহায় যদি হয় তবে ভালই, যদি নাও হয় তবু দুঃসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে; কারণ, যখন ডুবিতে বসিব তখন অন্যকে গালি পাড়িয়া কোন সান্ত্বনা পাইব না।

এইরূপ দুঃসময়ে সত্যকে চাপাচুপি দিতে যাওয়া প্রলয়ক্ষেত্রে বসিয়া ছেলেখেলা করা মাত্র। আমরা গবর্মেণ্টকে বলিবার চেষ্টা করিতেছি এ সমস্ত কিছুই নয় এ কেবল দুই পাঁচ জন ছেলেমানুষের চিত্তবিকারের পরিচয়। আমি ত এ প্রকার শূন্যগর্ভ সান্ত্বনাবাক্যের কোনোই সার্থকতা দেখি না। প্রথমত এরূপ ফুৎকার-বায়ুমাত্রে আমরা গবর্মেণ্টের পলিসির পালকে এক ইঞ্চিও ফিরাইতে পারিব না। দ্বিতীয়ত দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় কোথায় কি হইতেছে তাহা নিশ্চয় জানি বলিলে যে মিথ্যা বলা হয় তাহার সম্পূর্ণ প্রমাণ হইয়া গেছে। অতএব বিপদের সম্ভাবনা স্বীকার করিয়াই আমাদিগকে কাজ করিতে হইবে। দায়িত্ব-বোধবিহীন লঘু বাক্যের দ্বারা কোনো সত্যকার সঙ্কটকে ঠেকানো যায় না—এখন কেবল সত্যের প্রয়োজন।

এখন আমাদের দেশের লোককে অকপট হিতৈষণা হইতে এই কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইবে গবর্মেণ্টের শাসননীতি যে পন্থাই অবলম্বন করুক্ এবং ভারতবর্ষীয় ইংরেজের ব্যক্তিগত ব্যবহার আমাদের চিত্তকে যেমনি মথিত করিতে থাক্ আমাদের পক্ষে আত্মবিস্মৃত হইয়া আত্মহত্যা করা তাহার প্রতিকার নহে।

যে কাল পড়িয়াছে এখন ধর্ম্মের দোহাই দেওয়া মিথ্যা। কারণ, রাষ্ট্রনীতিতে ধর্ম্মনীতির স্থান আছে এ কথা যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ বিশ্বাসে প্রকাশ করে লোকে তাহাকে হয় কাণ্ডজ্ঞানহীন নয় নীতিবায়ুগ্রস্ত বলিয়া অবজ্ঞা করে। প্রয়োজনের সময় প্রবল পক্ষ ধর্ম্মকে মান্য করা কার্য্যহন্তারক দীনতা বলিয়া মনে করে, পশ্চিম মহাদেশের ইতিহাসে তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে; তৎসত্ত্বেও প্রয়োজনসাধনের উপলক্ষে যদি দুর্ব্বলকে ধর্ম্ম মানিতে উপদেশ দিই তবে উত্তেজনার অবস্থায় তাহারা উত্তর দেয় এ ত ধর্ম্ম মানা নয় এ ভয়কে মানা।

অল্প দিন হইল যে বোয়ার যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে জয়লক্ষ্মী যে ধর্ম্মবুদ্ধির পিছন পিছন চলেন নাই সে কথা কোনো কোনো ধর্ম্মভীরু ইংরেজের মুখ হইতেই শুনা গিয়াছে। যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের মনে ভয় উদ্রেক করিয়া দিবার জন্য তাহাদের গ্রামপল্লী উৎসাদিত করিয়া, ঘর দুয়ার জ্বালাইয়া, খাদ্যদ্রব্য লুটপাট করিয়া নির্ব্বিচারে বহুতর নিরপরাধ নরনারীকে নিরাশ্রয় করিয়া দেওয়া যুদ্ধব্যাপারের একটা অঙ্গ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। "মার্শাল ল" শব্দের অর্থই প্রয়োজনকালে ন্যায়বিচারের বুদ্ধিকে একটা পরম বিঘ্ন বলিয়া নির্ব্বাসিত করিয়া দিবার বিধি এবং তদুপলক্ষ্যে প্রতিহিংসাপরায়ণ মানবপ্রকৃতির বাধামুক্ত পাশবিকতাকেই প্রয়োজনসাধনের সর্ব্বপ্রধান সহায় বলিয়া ঘোষণা করা। প্যুনিটিভ পুলিসের দ্বারা সমস্ত নিরুপায় গ্রামের লোককে বলপূর্ব্বক ভারাক্রান্ত করিবার নির্বিবেক বর্ব্বরতাও এই জাতীয়। এই সকল বিধির দ্বারা প্রচার করা হয় যে, রাষ্ট্রকার্য্যে বিশুদ্ধ ন্যায়ধর্ম্ম প্রয়োজনসাধনের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে।

য়ুরোপের এই অবিশ্বাসী রাষ্ট্রনীতি আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ধর্ম্মবুদ্ধিকে বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছে। এমন অবস্থায় যখন বিশেষ ঘটনায় বিশেষ কারণে কোন অধীন জাতি / সা নিজেদের অধীনতার ঐকান্তিক মূর্ত্তি দেখিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে পীড়িত হইয়া উঠে, অথচ নিজেদের সর্ব্বপ্রকার নিরুপায়তার অপমানে উত্তপ্ত হইতে থাকে, তখন তাহাদের মধ্যে একদল অধীর অসহিষ্ণু ব্যক্তি যখন গোপন পন্থা অবলম্বন করিয়া কেবল ধর্ম্মবুদ্ধিকে নহে কর্ম্মবুদ্ধিকেও বিসর্জ্জন দেয় তখন দেশের আন্দোলনকারী বক্তাদিগকেই এই জন্য দায়ী করা বলদর্পেঅন্ধ গায়ের জোরের মূঢ়তা মাত্র।

অতএব দেশের যে সকল লোক গুপ্ত পন্থাকেই রাষ্ট্রহিতসাধনের একমাত্র পন্থা বলিয়া স্থির করিয়াছে তাহাদিগকে গালি দিয়াও কোন ফল হইবে না এবং তাহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিতে গেলেও তাহারা হাসিয়া উড়াইয়া দিবে। আমরা যে যুগে বর্ত্তমান, এ যুগে ধর্ম্ম যখন রাষ্ট্রীয় স্বার্থের নিকট প্রকাশ্যভাবে কুণ্ঠিত, তখন এরূপ ধর্ম্মভ্রংশতার যে দুঃখ তাহা সমস্ত মানুষকেই নানা আকারে বহন করিতেই হইবে; রাজা ও প্রজা, প্রবল ও দুর্ব্বল, ধনী ও শ্রমী কেহ তাহা হইতে নিষ্কৃতি

পাইবে না। রাজাও প্রয়োজনের জন্য প্রজাকে দুর্নীতির দ্বারা আঘাত করিবে এবং প্রজাও প্রয়োজনের জন্য রাজাকেও দুর্নীতির দ্বারাই আঘাত করিতে চেষ্টা করিবে এবং যে সকল তৃতীয় পক্ষের লোক এই সমস্ত ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে লিপ্ত নহে তাহাদিগকেও এই অধর্ম্মসংঘর্ষের অগ্নিদাহ সহ্য করিতে হইবে। বস্তুত সঙ্কটে পড়িয়া মানুষ যেদিন সুস্পষ্ট বুঝিতে পারে যে, অধর্ম্মকে বেতন দিতে গেলে সে যে কেবল এক পক্ষেরই বাঁধা গোলামী করে তাহা নহে। সে দুই পক্ষেরই নিমক খাইয়া যখন সকল পক্ষেই সমান ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে তখন তাহার সহায়তাকে অবিশ্বাস করিয়া তাহাকে একযোগে নির্ব্বাসিত করিয়া দিবার জন্য বিপন্ন সমাজে পরস্পরের মধ্যে রফা চলিতে থাকে। এমনি করিয়াই ধর্ম্মরাজ নিদারুণ সংঘাতের মধ্য হইতেই ধর্ম্মকে জয়ী করিয়া উদ্ধার করিয়া লইতেছেন। যতদিন তাহা সম্পূর্ণ না হয় ততদিন সন্দেহের সঙ্গে সন্দেহের, বিদ্বেষের সঙ্গে বিদ্বেষের এবং কপটনীতির সহিত কপটনীতির সংগ্রামে সমস্ত মানবসমাজ উত্তপ্ত হইতে থাকিবে।

অতএব বর্ত্তমান অবস্থায় যদি উত্তেজিত দেশের লোককে কোনো কথা বলিতে হয় তবে তাহা প্রয়োজনের দিক্ হইতেই বলিতে হইবে। তাহাদিগকে এই কথা ভাল করিয়া বুঝাইতে হইবে যে, প্রয়োজন অত্যন্ত গুরুতর হইলেও প্রশস্ত পথ দিয়াই তাহা মিটাইতে হয়—কোনো সঙ্কীর্ণ রাস্তা ধরিয়া কাজ সংক্ষেপ করিতে গেলে এক দিন দিক্ হারাইয়া শেষে পথও পাইবনা কাজও নষ্ট হইবে। আমার মনের তাগিদ অত্যন্ত বেশি বলিয়া জগতে কোনো দিন রাস্তাও নিজেকে ছাঁটিয়া দেয় না, সময়ও নিজেকে খাটো করে না।

দেশের হিতানুষ্ঠান জিনিষটা যে কতই বড় এবং কত দিকেই যে তাহার অগণ্য শাখা প্রশাখা প্রসারিত সে কথা আমরা যেন কোনো সাময়িক আক্ষেপে ভুলিয়া না যাই। ভারতবর্ষের মত নানা বৈচিত্র্য ও বিরোধগ্রস্ত দেশে তাহার সমস্যা নিতান্তই দুরূহ। ঈশ্বর আমাদের উপর এমন একটি সুমহৎ কর্ম্মের ভার দিয়াছেন, আমরা মানবসমাজের এত বড় একটা প্রকাণ্ড জটিল জালের শতসহস্র গ্রন্থিচ্ছেদনের আদেশ লইয়া আসিয়াছি যে তাহার মাহাত্ম্য যেন এক মুহূর্ত্তও বিস্মৃত হইয়া আমরা কোন প্রকার চাপল্য প্রকাশ না করি। আদিকাল হইতে জগতে যতগুলি বড় বড় শক্তির প্রবাহ জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে তাহাদের সকলগুলিরই কোনো না কোনো বৃহৎ ধারা এই ভারতবর্ষে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক স্মৃতির অতীতকালে কোন্ নিগূঢ় প্রয়োজনের দুর্নিবার তাড়নায় যে দিন আর্য্যজাতি গিরিগুহামুক্ত স্রোতস্বিনীর মত অকস্মাৎ সচল হইয়া বিশ্বপথে বাহির হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহাদেরই এক শাখা বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ভারতবর্ষের অরণ্যচ্ছায়ায় যজ্ঞের অগ্নি প্রজ্বলিত করিলেন সেই দিন ভারতবর্ষের আর্য্যঅনার্য্যসম্মিলনক্ষেত্রে যে বিপুল ইতিহাসের উপক্রমণিকা গান আরম্ভ হইয়াছিল আজ কি তাহা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই ক্ষান্ত হইয়া গিয়াছে? বিধাতা কি তাহা শিশুর ধূলাঘর নির্ম্মাণের মতই আজ হঠাৎ অনাদরে ভাঙিয়া ফেলিয়াছেন? তাহার পরে এই ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের মিলনমন্ত্র করুণাজলভার-

গম্ভীর মেঘমন্দ্রের মত ধ্বনিত হইয়া এসিয়ার পূর্ব্বসাগরতীরবাসী সমস্ত মঙ্গোলিয় জাতিদিগকে জাগ্রত করিয়া দিল এবং ব্রহ্মদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া অতিদূর জাপান পর্য্যন্ত ভিন্নভাষী অনাত্মীয়দিগকে ধর্ম্মসম্বন্ধে ভারতবর্ষের সঙ্গে একাত্ম করিয়া দিয়াছে, ভারতক্ষেত্রে সেই মহৎ শক্তির অভ্যুদয় কি কেবল ভারতের ভাগ্যেই পরিণামহীন পণ্ডতাতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে? তাহার পরে এসিয়ার পশ্চিমতমপ্রান্তে দৈববলের প্রেরণায় মানবের আর এক মহাশক্তি সুপ্তি হইতে জাগ্রত হইয়া ঐক্যমন্ত্র বহন করিয়া দারুণবেগে পৃথিবী প্লাবিত করিতে বাহির হইল, সেই শক্তিস্রোতকে বিধাতা যে কেবল ভারতবর্ষে আহ্বান করিয়াছেন তাহা নহে, এইখানেই তিনি তাহাকে চিরদিনের জন্য আশ্রয় দিয়াছেন। আমাদের ইতিহাসে এই ব্যাপার কি কোন একটা আকস্মিক উৎপাত মাত্র? ইহার মধ্যে নিত্যসত্যের কোন চিরপরিচয় নাই? তাহার পরে য়ুরোপের মহাক্ষেত্রে মানবশক্তি প্রাণের প্রাবল্যে, বিজ্ঞানের কৌতূহলে, পণ্যসংগ্রহের আকাঙ্ক্ষায় যখন বিশ্বাভিমুখী হইয়া বাহির হইল তখন তাহারও একটা বৃহৎ প্রবল ধারা এই ভারতবর্ষে আসিয়াই বিধাতার আহ্বান বহন করিয়া আমাদিগকে আঘাতের দ্বারা জাগ্রত করিয়া তুলিতেছে। এই ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের প্লাবন অপসারিত হইয়া গেলে পর যখন খণ্ড খণ্ড দেশের খণ্ড খণ্ড ধর্ম্ম সম্প্রদায় বিরোধ বিচ্ছিন্নতায় চতুর্দ্দিককে কণ্টকিত করিয়া তুলিয়াছিল তখন শঙ্করাচার্য্য সেই সমস্ত খণ্ডতা ও ক্ষুদ্রতাকে একমাত্র অখণ্ড বৃহত্বের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করিবার চেষ্টায় ভারতবর্ষের প্রতিভারই পরিচয় দিয়াছিলেন। অবশেষে দার্শনিক জ্ঞানপ্রধান সাধনা যখন ভারতবর্ষে জ্ঞানী অজ্ঞানী অধিকারী অনধিকারীকে বিচ্ছিন্ন করিতে লাগিল—তখন চৈতন্য, নানক, দাদূ, কবীর ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে জাতির অনৈক্য শাস্ত্রের অনৈক্যকে ভক্তির পরম ঐক্যে এক করিবার অমৃত বর্ষণ করিয়াছিলেন। কেবলমাত্র ভারতবর্ষের প্রাদেশিক ধর্ম্মগুলির বিচ্ছেদক্ষত প্রেমের দ্বারা মিলাইয়া দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহা নহে—তাঁহারাই ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান প্রকৃতির মাঝখানে ধর্ম্মসেতু নির্ম্মাণ করিতেছিলেন। ভারতবর্ষ এখনি যে নিশ্চেষ্ট হইয়া আছে তাহা নহে—রামমোহন রায়, স্বামী দয়ানন্দ, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিবেকানন্দ, শিবনারায়ণ স্বামী ইঁহারাও অনৈক্যের মধ্যে এককে, ক্ষুদ্রতার মধ্যে ভূমাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য জীবনের সাধনাকে ভারতবর্ষের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। অতীতকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের এই এক একটি অধ্যায় ইতিহাসের বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত প্রলাপ মাত্র নহে,—ইহারা পরস্পর গ্রথিত,—ইহারা কেহই একেবারে স্বপ্নের মত অন্তর্দ্ধান করে নাই,—ইহারা সকলেই রহিয়াছে; ইহারা সন্ধিতেই হউক সংগ্রামেই হউক ঘাতপ্রতিঘাতে বিধাতার অভিপ্রায়কে অপূর্ব্ব বিচিত্ররূপে সংরচিত করিয়া তুলিতেছে। পৃথিবীর মধ্যে আর কোনো দেশেই এত বড় বৃহৎ রচনার আয়োজন হয় নাই,—এত জাতি এত ধর্ম্ম এত শক্তি কোন তীর্থ স্থলেই একত্র হয় নাই,—একান্ত বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে প্রকাণ্ড সমন্বয়ে বাঁধিয়া তুলিয়া বিরোধের মধ্যেই মিলনের আদর্শকে

পৃথিবীর মধ্যে জয়ী করিবার এমন সুস্পষ্ট আদেশ জগতের আর কোথাও ধ্বনিত হয় নাই। আর সর্ব্বত্র মানুষ রাজ্য বিস্তার করুক, পণ্য বিস্তার করুক প্রতাপ বিস্তার করুক—ভারতবর্ষের মানুষ দুঃসহ তপস্যা দ্বারা এককে, ব্রহ্মকে, জ্ঞানে, প্রেমে ও কর্ম্মে সমস্ত অনৈক্য ও সমস্ত বিরোধের মধ্যে স্বীকার করিয়া মানুষের কর্ম্মশালার কঠোর সঙ্কীর্ণতার মধ্যে মুক্তির উদার নির্ম্মল জ্যোতিকে বিকীর্ণ করিয়া দিক্—ভারত ইতিহাসের আরম্ভ হইতেই আমাদের প্রতি এই অনুশাসন প্রচারিত হইয়াছে। শ্বেত ও কৃষ্ণ, মুসলমান ও খৃষ্টান, পূর্ব্ব ও পশ্চিম কেহ আমাদের বিরুদ্ধ নহে,—ভারতের পুণ্যক্ষেত্রেই সকল বিরোধ এক হইবার জন্য শত শত শতাব্দী ধরিয়া অতি কঠোর সাধনা করিবে বলিয়াই অতি সুদূরকালে এখানকার তপোবনে একের তত্ত্ব উপনিষদ এমন আশ্চর্য্য সরল জ্ঞানের সহিত প্রচার করিয়াছিলেন যে, ইতিহাস তাহাকে নানাদিক দিয়া ব্যাখ্যা করিতে করিতে আজও অন্ত পায় নাই।

তাই আমি অনুরোধ করিতেছিলাম অন্যান্য দেশে মনুষ্যত্বের আংশিক বিকাশের দৃষ্টান্তে ভারতবর্ষের ইতিহাসকে সঙ্কীর্ণ করিয়া দেখিবেন না—ইহার মধ্যে যে বহুতর আপাত-বিরোধ লক্ষিত হইতেছে তাহা দেখিয়া হতাশ হইয়া কোনো ক্ষুদ্র চেষ্টায় নিজেকে অন্ধভাবে নিযুক্ত করিবেন না—করিলেও কোনো মতেই কৃতকার্য্য হইবেন না এ কথা নিশ্চয় জানিবেন। বিধাতার ইচ্ছার সহিত নিজের ইচ্ছাকে সম্মিলিত করাই সফলতার একমাত্র উপায়—তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে গেলেই ক্ষণিক কার্য্যসিদ্ধি আমাদিগকে ভুলাইয়া লইয়া ভয়ঙ্কর ব্যর্থতার মধ্যে ডুবাইয়া মারিবে।

যে ভারতবর্ষ মানবের সমস্ত মহৎশক্তিপুঞ্জ-দ্বারা ধীরে ধীরে এইরূপে বিরাট্‌মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উঠিতেছে—সমস্ত আঘাত অপমান সমস্ত বেদনা যাহাকে এই পরম প্রকাশের অভিমুখে অগ্রসর করিতেছে, সেই মহাভারত-বর্ষের সেবা আমাদের মধ্যে সজ্ঞানে সচেতন-ভাবে কে করিবেন, কে একান্ত অবিচলিত ভক্তির সহিত সমস্ত ক্ষোভ অধৈর্য্য অহঙ্কারকে এই মহাসাধনায় বিলীন করিয়া দিয়া ভারত-বিধাতার পদতলে নিজের নির্ম্মল জীবনকে পূজার অর্ঘ্যের ন্যায় নিবেদন করিয়া দিবেন? ভারতের মহাজাতীয় উদ্বোধনের সেই আমাদের পুরোহিতবৃন্দ কোথায়? তাঁহারা যেখানেই থাকুন্ এ কথা আপনারা ধ্রুব সত্য বলিয়া জানিবেন তাঁহারা চঞ্চল নহেন, তাঁহারা উন্মত্ত নহেন, তাঁহারা কর্ম্মনির্দ্দেশশূন্য স্পর্দ্ধা-বাক্যের দ্বারা দেশের লোকের হৃদয়াবেগকে উত্তরোত্তর সংক্রামক বায়ুরোগে পরিণত করিতেছেন না—নিশ্চয় জানিবেন, তাঁহাদের মধ্যে বুদ্ধি, হৃদয় এবং কর্ম্মনিষ্ঠার অতি অসামান্য সমাবেশ ঘটিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে জ্ঞানের সুগভীর শান্তি ও ধৈর্য্য এবং ইচ্ছা-শক্তির অপরাজিত বেগ ও অধ্যবসায় এই উভয়ের সুমহৎ সামঞ্জস্য আছে।

কিন্তু যখন দেখা যায় কোন একটা বিশেষ-ঘটনামূলক উত্তেজনার তাড়নায়, একটা সাময়িক বিরোধের ক্রুদ্ধতায় দেশের অনেক লোক সহসা দেশের হিত করিতে হইবে বলিয়া একমুহূর্ত্তে ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবিত হয় নিশ্চয় বুঝিতে

হইবে হৃদয়াবেগকেই একমাত্র সম্বল করিয়া তাহারা দুর্গম পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা দেশের সুদূর ও সুবিস্তীর্ণ মঙ্গলকে শান্তভাবে সত্যভাবে বিচার করিতে অবস্থা-গতিকেই অক্ষম। তাহারা তাহাদের উপস্থিত বেদনাকেই এত তীব্রভাবে অনুভব করে এবং তাহারই প্রতিকারচেষ্টাকে এত উগ্রভাবে মনে রাখে যে আত্মসম্বরণে অক্ষম হইয়া দেশের সমগ্র হিতকে আঘাত করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হয় না।

ইতিবৃত্তের শিক্ষাকে ঠিকমত বিচার করিয়া-লওয়া বড় কঠিন। সকল দেশের ইতিহাসেই কোন বৃহৎ ঘটনা যখন মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া দেখা দেয় তখন তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই আমরা একটা প্রবল আঘাত ও আন্দোলন দেখিতে পাই। রাষ্ট্র বা সমাজে অসামঞ্জস্যের বোঝা অনেকদিন হইতে নিঃশব্দে পুঞ্জিভূত হইতে হইতে একদিন একটা আঘাতে হঠাৎ তাহা বিপ্লবে ভাঙিয়া পড়ে। সেই সময় দেশের মধ্যে যদি অনুকূল উপকরণ প্রস্তত থাকে, পূর্ব্ব হইতেই যদি তাহার ভাণ্ডারে নিগূঢ়ভাবে জ্ঞান ও শক্তির সম্বল সঞ্চিত থাকে তবেই সেই বিপ্লবের দারুণ আঘাতকে কাটাইয়া সে দেশ আপনার নূতন জীবনকে নবীন সামঞ্জস্য দান করিয়া গড়িয়া তোলে। দেশের সেই আভ্যন্তরিক প্রাণসম্বল যাহা অন্তঃপুরের ভাণ্ডারে প্রচ্ছন্নভাবে উপচিত হয় তাহা আমরা দেখিতে পাইনা বলিয়া আমরা মনে করি বুঝি বিপ্লবের দ্বারাতেই দেশ সার্থকতা লাভ করিল; বিপ্লবই যেন মঙ্গলের মূলকারণ এবং উপায়।

ইতিহাসকে এইরূপে বাহ্যভাবে দেখিয়া একথা ভুলিলে চলিবেনা যে, যে দেশের মর্ম্ম-স্থানে সৃষ্টি করিবার শক্তি ক্ষীণ হইয়াছে প্রলয়ের আঘাতকে সে কথনই কাটাইয়া উঠিতে পারে না। গড়িয়া তুলিবার বাঁধিয়া তুলিবার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যাহাদের মধ্যে সজীব-ভাবে বিদ্যমান, ভাঙনের আঘাত তাহাদের সেই জীবনধর্ম্মকেই তাহাদের সৃজনীশক্তিকেই সচেষ্ট সচেতন করিয়া তোলে। এইরূপে সৃষ্টিকেই নূতন বলে উত্তেজিত করে বলিয়াই প্রলয়ের গৌরব। নতুবা শুদ্ধমাত্র ভাঙন, নির্ব্বিচার বিপ্লব, কোনমতেই কল্যাণকর হইতে পারে না।

পালে খুব দমকা হাওয়া লাগিতেই যে জাহাজ জড়ত্ব দূর করিয়া হুহু করিয়া চলিয়া গেল নিশ্চয় বুঝিতে হইবে আর কিছু না হউক যে জাহাজের খোলের তক্তাগুলার মধ্যে ফাঁক ছিল না; যদি বা পূর্ব্বে ছিল এমন হয় তবে নিশ্চয়ই কোনো এক সময়ে জাহাজের মিস্ত্রি খোলের অন্ধকারে অলক্ষ্যে বসিয়া সে গুলা সারিয়া দিয়াছিল। কিন্তু যে জীর্ণ জাহাজকে একটু নাড়া দিলেই তাহার একটা আল্গা তক্তার উপরে আর একটা আল্গা তক্তা ঠকঠক করিয়া আঘাত করিতে থাকে ঐ দমকা হাওয়া কি তাহার পালের পক্ষে সর্ব্বনেশে জিনিষ নয়? আমাদের দেশেও একটুমাত্র নাড়া পাইলেই হিন্দুতে মুসলমানে, উচ্চবর্ণে নিম্নবর্ণে সংঘাত বাধিয়া যায় না কি? ভিতরে যখন এমন সব ফাঁক তখন ঝড় কাটাইয়া ঢেউ বাঁচাইয়া স্বরাজের বন্দরে পৌঁছিবার জন্য কি কেবল উত্তেজনাকে উন্মাদনায় পরিণত করাই পরিত্রাণের প্রশস্ত উপায়?

বাহির হইতে দেশ যখন অপমান লাভ

করে, যখন আমাদের অধিকারকে বিস্তীর্ণ করিবার ইচ্ছা করিলেই কর্তৃপক্ষদের নিকট হইতে অযোগ্যতার অপবাদ প্রাপ্ত হইতে থাকি তখন আমাদের দেশের কোন দুর্ব্বলতা কোন ত্রুটি স্বীকার করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠে। তখন যে আমরা কেবল পরের কাছে মুখরক্ষা করিবার জন্যই গরিমা প্রকাশ করি তাহা নহে, আহত অভিমানে নিজের অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের বুদ্ধিও অন্ধ হইয়া যায়; আমরা যে অবজ্ঞার যোগ্য নহি তাহা চক্ষের পলকেই প্রমাণ করিয়া দিবার জন্য আমরা একান্ত ব্যগ্র হইয়া উঠি। আমরা সবই পারি, আমাদের সমস্তই প্রস্তুত, শুদ্ধ মাত্র বাহিরের বাধাতেই আমাদিগকে অক্ষম করিয়া রাখিয়াছে এই কথাই যে কেবল অস্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠে বলিবার চেষ্টা হয় তাহা নহে এইরূপ বিশ্বাসে কাজে প্রবৃত্ত হইবার জন্য আমাদের লাঞ্ছিত হৃদয় উদ্দাম হইয়া উঠে। এই প্রকারে অত্যন্ত চিত্তক্ষোভের সময়েই ইতিহাসকে আমরা ভুল করিয়া পড়ি। মনে স্থির করি, যে সকল অধীন দেশ স্বাধীন হইয়াছে তাহারা বিপ্লব করিয়াছে বলিয়াই স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে; এই স্বাধীনতাকে হাতে পাওয়া এবং হাতে রাখার জন্য আর কোন গুণ থাকা আবশ্যক কি না তাহা আমরা স্পষ্ট করিয়া ভাবিতেই চাহি না, অথবা তাড়াতাড়ি করিয়া মনে করি সে সমস্ত গুণ আমাদের আছে কিম্বা উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে সেগুলি আপনিই কোনোরকম করিয়া জোগাইয়া যাইবে।

এইরূপে মানুষের চিত্ত যখন অপমানে আহত হইয়া নিজের গৌরব সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছে, সমস্ত কঠিন বাধাকে উন্মত্তের মত একেবারে অস্বীকার করিয়া অসাধ্য চেষ্টায় আত্মহত্যা করিবার উদ্যোগ করিতেছে তখন তাহার মত মর্ম্মান্তিক করুণাবহ ব্যাপার জগতে আর কি আছে! এই প্রকার দুশ্চেষ্টা অনিবার্য্য ব্যর্থতার মধ্যে লইয়া যাইবেই, তথাপি ইহাকে আমরা পরিহাস করিতে পারিব না। ইহার মধ্যে মানবপ্রকৃতির যে পরম দুঃখকর অধ্যবসায় আছে তাহা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই সর্ব্বকালেই নানা উপলক্ষ্যে নানা অসম্ভব প্রত্যাশায় অসাধ্য সাধনে বারম্বার দগ্ধপক্ষ পতঙ্গের ন্যায় নিশ্চিত পরাভবের বহ্নিশিখায় অন্ধভাবে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেছে।

যাইহোক, যেমন করিয়াই হোক্‌, শক্তির অভিমান আঘাত পাইয়া জাগিয়া উঠিলে সেটা জাতির পক্ষে যে অনিষ্টকর, তাহা বলা যায় না। তবে কিনা বিরোধের ক্রুদ্ধ আবেগের দ্বারা আমাদের এই উদ্যম হঠাৎ আবির্ভূত হইয়াছে বলিয়াই আমাদের মধ্যে কেহ কেহ দেশের শক্তিকে বিরোধের মূর্ত্তিতেই প্রকাশ করিবার দুর্বুদ্ধি অন্তরে পোষণ করিতেছেন কিন্তু যাহারা সহজ অবস্থায় কোন দিন স্বাভাবিক অনুরাগের দ্বারা দেশের হিতানুষ্ঠানে ক্রমাগতে অভ্যস্ত হয় নাই, যাহারা উচ্চ সংকল্পকে বহুদিনের ধৈর্য্যে নানা উপকরণে নানা বাধা বিঘ্নের ভিতর দিয়া গড়িয়া তুলিবার কাজে নিজের প্রকৃতিকে প্রস্তুত করে নাই, অনেকদিন ধরিয়া রাষ্ট্র-চালনার বৃহৎ কার্য্যক্ষেত্র হইতে দুর্ভাগ্যক্রমে বঞ্চিত হইয়া যাহারা ক্ষুদ্র স্বার্থের অনুসরণে সঙ্কীর্ণভাবে জীবনের কাজ করিয়া আসিয়াছে তাহারা হঠাৎ বিষম রাগ করিয়া এক নিমেষে দেশের একটা মস্ত হিত করিয়া ফেলিবে ইহা কোন মতেই সম্ভবপর হইতে পারে না।

ঠাণ্ডার দিনে নৌকার কাছেও ঘেঁসিলাম না, তুফানের দিনে তাড়াতাড়ি হাল ধরিয়া অসামান্ত মাঝি বলিয়া দেশে বিদেশে বাহবা লইব এইরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার স্বপ্নে ঘটাই সম্ভব। অতএব আমাদিগকেও কাজ একেবারে সেই গোড়ার দিক হইতেই সুরু করিতে হইবে। তাহাতে বিলম্ব হইতে পারে—বিপরীত উপায়ে আরো অনেক বেশি বিলম্ব হইবে।

মানুষ বিস্তীর্ণ মঙ্গলকে সৃষ্টি করে তপস্যা-দ্বারা। ক্রোধে বা কামে সেই তপস্যা ভঙ্গ করে, এবং তপস্যার ফলকে এক মুহূর্ত্তে নষ্ট করিয়া দেয়। নিশ্চয়ই আমাদের দেশেও কল্যাণময় চেষ্টা নিভৃতে তপস্যা করিতেছে; দ্রুত ফল-লাভের লোভ তাহার নাই, সাময়িক আশা-ভঙ্গের ক্রোধকে সে সংযত করিয়াছে; এমন সময় আজ অকস্মাৎ ধৈর্য্যহীন উন্মত্ততা যজ্ঞ-ক্ষেত্রে রক্তবৃষ্টি করিয়া তাহার বহুদুঃখসঞ্চিত তপস্যার ফলকে কলুষিত করিয়া নষ্ট করিবার উপক্রম করিতেছে।

ক্রোধের আবেগ তপস্যাকে বিশ্বাসই করে না; তাহাকে নিশ্চেষ্টতা বলিয়া মনে করে, তাহাকে নিজের আশু উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রধান অন্তরায় বলিয়া ঘৃণা করে; উৎপাতের দ্বারা সেই তপঃসাধনাকে চঞ্চল সুতরাং নিষ্ফল করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া প্রবৃত্ত হয়। ফলকে পাকিতে দেওয়াকেই সে ঔদাসীন্য বলিয়া জ্ঞান করে, টান দিয়া ফলকে ছিঁড়িয়া লওয়াকেই সে একমাত্র পৌরুষ বলিয়া জানে; সে মনে করে যে মালী প্রতিদিন গাছের তলায় জল সেচন করিতেছে গাছের ডালে উঠিবার সাহস নাই বলিয়াই তাহার এই দীনতা। এ অবস্থায় মালীর উপর তাহা রাগ হয়, জল দেওয়াকে সে ছোট কাজ মনে করে। উত্তেজিত অবস্থায় মানুষ উত্তেজনাকেই জগতের মধ্যে সকলের চেয়ে বড় সত্য বলিয়া জানে, যেখানে তাহার অভাব দেখে সেখানে সে কোন সার্থকতাই দেখিতে পায় না।

কিন্তু স্ফুলিঙ্গের সঙ্গে শিখার যে প্রভেদ উত্তেজনার সঙ্গে শক্তির সেই প্রভেদ। চকমকি ঠুকিয়া যে স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে থাকে তাহাতে ঘরের অন্ধকার দূর হয় না। তাহার আয়োজন স্বল্প তেমনি তাহার প্রয়োজনও সামান্য। প্রদীপের আয়োজন অনেক, তাহার আধার গড়িতে হয়, শলিতা পাকাইতে হয়, তাহার তেল জোগাইতে হয়। যখন যথাযথ মূল্য দিয়া সমস্ত কেনা হইয়াছে এবং পরিশ্রম করিয়া সমস্ত প্রস্তুত হইয়াছে, তখনই প্রয়োজন হইলে স্ফুলিঙ্গ আপনাকে স্থায়ী শিখায় পরিণত করিয়া ঘরকে আলোকিত করিয়া তুলিতে পারে। যখন উপযুক্ত চেষ্টার দ্বারা সেই প্রদীপরচনার আয়োজন করিবার উদ্যম জাগিতেছে না, যখন শুদ্ধমাত্র ঘন ঘন চকমকি ঠোকার চাঞ্চল্যমাত্রেই সকলে আনন্দে অভিভূত হইয়া উঠিতেছি তখন সত্যের অনুরোধে স্বীকার করিতেই হইবে এমন করিয়া কখনই ঘরে আলো জ্বলিবে না কিন্তু ঘরে আগুন লাগা অসম্ভব নহে।

কিন্তু শক্তিকে সুলভ করিয়া তুলিবার চেষ্টায় মানুষ উত্তেজনার আশ্রয় অবলম্বন করে। একথা ভুলিয়া যায় যে এই অস্বাভাবিক সুলভতা একদিকে মূল্য কমাইয়া আর একদিক দিয়া এমন করিয়া কসিয়া মূল্য আদায় করিয়া লয়, যে গোড়াতেই তাহার দুর্মূল্যতা স্বীকার করিয়া লইলে তাহাকে অপেক্ষাকৃত সস্তায় পাওয়া যাইতে পারে।

আমাদের দেশেও যখন দেশের হিতসাধন-বুদ্ধি নামক দুর্লভ মহামূল্য পদার্থ একটি আকস্মিক উত্তেজনায় আবালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে অভাবনীয় প্রচুররূপে দেখা দিল তখন আমাদের মত দরিদ্র জাতিকে পরমানন্দে উৎফুল্ল করিয়া তুলিল। তখন এ কথা আমাদের মনে করিতেও প্রবৃত্তি হয় নাই যে, ভাল জিনিষের এত সুলভতা স্বাভাবিক নহে। এই ব্যাপক পদার্থকে কাজের শাসনের মধ্যে বাঁধিয়া সংযত সংহত করিতে না পারিলে ইহার প্রকৃত সার্থকতাই থাকে না। রাস্তাঘাটের লোক যুদ্ধ করিব বলিয়া মাতিয়া উঠিলেই তাহাদিগকে সৈন্যজ্ঞান করিয়া যদি সুলভে কাজ সারিবার আশ্বাসে উল্লাস করিতে থাকি তবে সত্যকার লড়াইয়ের বেলায় সমস্ত ধন প্রাণ দিয়াও এই হঠাৎ-শস্তার সাংঘাতিক দায় হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না।

আসল কথা, মাতাল যেমন নিজের এবং মণ্ডলীর মধ্যে নেশাকে কেবলি বাড়াইয়া চলিতেই চায় তেমনি উত্তেজনার মাদকতা আমরা সম্প্রতি যখন অনুভব করিলাম তখন কেবলি সেটাকে বাড়াইয়া তুলিবার জন্য আমাদের প্রবৃত্তি অসংযত হইয়া উঠিল। অথচ এটা যে একটা নেশার তাড়না সে কথা স্বীকার না করিয়া আমরা বলিতে লাগিলাম, গোড়ায় ভাবের উত্তেজনারই দরকার বেশি; সেটা রীতিমত পাকিয়া উঠিলে আপনিই তাহা কাজের দিকে ধাবিত হয়—অতএব দিনরাত যাহারা কাজ.কাজ করিয়া বিরক্ত করিতেছে তাহারা ছোট নজরের লোক—তাহারা ভাবুক নহে—আমরা কেবলি ভাবে দেশ মাতাইব। সমস্ত দেশ জুড়িয়া আমরা ভাবের ভৈরবীচক্র বসাইয়া দিলাম; মন্ত্র এই হইল—

পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পুনঃ পততি ভূতলে
উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জন্মো ন বিদ্যতে ।

চেষ্টা নহে, কর্ম্ম নহে, কিছুই গড়িয়া তোলা নহে, কেবল ভাবোচ্ছাসই সাধনা, মত্ততাই মুক্তি।

অনেককেই আহ্বান করিলাম, অনেককেই সমবেত করিলাম, জনতার বিস্তার দেখিয়া আনন্দিত হইলাম কিন্তু এমন করিয়া কোন কাজের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিলাম না যাহাতে উদ্বোধিত শক্তিকে সকলে সার্থক করিতে পারে। কেবল উৎসাহই দিতে লাগিলাম কাজ দিলাম না। মানুষের মনের পক্ষে এমন অস্বাস্থ্যকর ব্যাপার আর কিছুই নাই। মনে করিলাম উৎসাহে মানুষকে নির্ভীক করে এবং নির্ভীক হইলে মানুষ কর্ম্মের বাধা-বিপত্তিকে লঙ্ঘন করিতে কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু এইরূপ লঙ্ঘন করিবার উত্তেজনাইত কর্ম্মসাধনের সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ নহে—স্থিরবুদ্ধি লইয়া বিচারের শক্তি, সংযত হইয়া গড়িয়া তুলিবার শক্তি, যে তাহার চেয়ে বড়। এই জন্যই মাতাল হইয়া মানুষ খুন করিতে পারে কিন্তু মাতাল হইয়া কেহ যুদ্ধ করিতে পারেনা। যুদ্ধের মধ্যে কিছু পরিমাণ মত্ততা নাই তাহা নহে কিন্তু অপ্রমত্ততাই প্রভু হইয়া তাহাকে চালিত করে। সেই স্থিরবুদ্ধি দূরদর্শী কর্ম্মোৎসাহী প্রভুকেই বর্ত্তমান উত্তেজনার দিনে দেশ খুঁজিয়াছে, আহ্বান করিয়াছে, ভাগ্যহীন দেশের দৈন্যবশত তাঁহারত সাড়া পাওয়া যায় না। আমরা যাহারা ছুটিয়া আসি কেবল মদের পাত্রে মদই ঢালি। এঞ্জিনে ষ্টিমের দমই বাড়াইতে থাকি। যখন প্রশ্ন ওঠে, পথ সমান করিয়া রেল বসাইবার

আয়োজন কে করিবে তখন আমরা উত্তর করি এ সমস্ত নিতান্ত খুচরা কাজের হিসাব লইয়া মাথা বকাইবার প্রয়োজন নাই সময় কালে আপনিই সমস্ত হইয়া যাইবে—মজুরদের কাজ মজুররাই করিবে কিন্তু আমরা যখন চালক তখন আমরা কেবল এঞ্জিনে দমই চড়াইতে থাকিব।

এ পর্য্যন্ত যাঁহারা সহিষ্ণুতা রক্ষা করিতে পারিয়াছেন তাঁহারা হয় ত আমাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন, তবে কি বাংলাদেশের সর্ব্বসাধারণের মধ্যে যে উত্তেজনার উদ্রেক হইয়াছে তাহা হইতে কোনো শুভফল প্রত্যাশা করিবার নাই?

নাই এমন কথা আমি কখনই মনে করিনা। অসাড় শক্তিকে সচেষ্ট সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য এই উত্তেজনার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সচেতন করিয়া তুলিয়া তাহার পরে কি করিতে হইবে? কাজ করাইতে হইবে, না মাতাল করিতেই হইবে? যে পরিমাণ মদে ক্ষণ প্রাণকে কাজের উপযোগী করিয়া তোলে তাহার চেয়ে বেশি মদে পুনশ্চ তাহার কাজের উপযোগিতা নষ্ট করিয়াই দেয়; যে সকল সত্যকর্ম্মে ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায়ের প্রয়োজন সে কাজে মাতালের শক্তি এবং অভিরুচি বিমুখ হইয়া উঠে। ক্রমে উত্তেজনাই তাহার লক্ষ্য হয় এবং সে দায়ে পড়িয়া কাজের নামে এমন সকল অকাজের সৃষ্টি করিতে থাকে যাহা তাহার মত্ততারই আনুকূল্য করিতে পারে। এই সকল উৎপাত-ব্যাপারকে বস্তুত তাহারা মাদকস্বরূপেই ব্যবহার করে অথচ তাহাকে স্বদেশহিত নাম দিয়া উত্তেজনাকে উচ্চসুরেই বাঁধিয়া রাখে। হৃদয়াবেগ জিনিষটা উপযুক্ত কাজের দ্বারা বহির্মুখ না হইয়া যখন কেবলি অন্তরে সঞ্চিত ও বর্দ্ধিত হইতে থাকে তখন তাহা বিষের মত কাজ করে—তাহার অপ্রয়োজনীয় উদ্যম আমাদের স্নায়ুমণ্ডলকে বিকৃত করিয়া কর্ম্মসভাকে নৃত্যসভা করিয়া তোলে।

ঘুম হইতে জাগিয়া নিজের সচল শক্তিকে সত্য বলিয়া জানিবার জন্য প্রথম যে একটা উত্তেজনার আঘাত আবশ্যক তাহাতে আমাদের প্রয়োজন ছিল। মনে নিশ্চয় স্থির করিয়াছিলাম ইংরেজ জন্মান্তরের সুকৃতি এবং জন্মকালের শুভগ্রহস্বরূপ আমাদের কর্ম্মহীন জোড়করপুটে আমাদের সমস্ত মঙ্গল আপনি তুলিয়া দিবে। বিধাতানির্দ্দিষ্ট আমাদের সেই বিনাচেষ্টার সৌভাগ্যকে কখনো বা বন্দনা করিতাম কখনো বা তাহার সঙ্গে কলহ করিয়া কাল কাটাইতাম। এই করিতে করিতে মধ্যাহ্নকালে যখন সমস্ত জগৎ আপিস করিতেছে তখন আমাদের সুখনিদ্রা প্রগাঢ় হইতেছিল।

এমন সময় কোথা হইতে একটা আঘাত লাগিল, ঘুমের ঘোরও কাটিল, আগেকার মত পুনশ্চ সুখস্বপ্ন দেখিবার জন্য নয়ন মুদিবার ইচ্ছাও রহিল না, কিন্তু আশ্চর্য্য এই আমাদের সেই স্বপ্নের সঙ্গে জাগরণের একটা বিষয়ে মিল রহিয়াই গেল।

তখন আমরা নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাম, যে, চেষ্টা না করিয়াই আমরা চেষ্টার ফল পাইতে থাকিব, এখনো ভাবিতেছি ফল পাইবার জন্য প্রচলিত পথে চেষ্টাকে খাটাইবার প্রয়োজন; আমরা যেন যথেষ্ট সংক্ষিপ্ত করিয়া লইতে পারি। স্বপ্নাবস্থাতেও অসম্ভবকে আঁকড়িয়া পড়িয়াছিলাম, জাগ্রত অবস্থাতেও সেই অসম্ভবকে ছাড়িতে পারিলাম না। শক্তির উত্তেজনা

আমাদের মধ্যে অত্যন্ত বেশি হওয়াতে অত্যাবশ্যক বিলম্বকে অনাবশ্যক বোধ হইতে লাগিল। বাহিরে সেই চিরপুরাতন দৈন্য রহিয়া গিয়াছে, অথচ অন্তরে নবজাগ্রত শক্তির অভিমান মাথা তুলিয়াছে, উভয়ের সামঞ্জস্য করিব কি করিয়া? ধীরে ধীরে? ক্রমে ক্রমে? মাঝখানের প্রকাণ্ড গহ্বরটাকে পাথরের সেতু দিয়া বাঁধিয়া? কিন্তু অভিমান দেরি সহিতে পারেনা, মত্ততা বলে আমার সিঁড়ির দরকার নাই আমি উড়িব। সময় লইয়া সুসাধ্য সাধন ত সকলেই পারে; অসাধ্য সাধনে আমরা এখনি জগৎকে চমক লাগাইয়া দিব এই কল্পনা আমাদের উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার কারণ, প্রেম যখন জাগে তখন সে গোড়া হইতে সকল কাজ করিতেই চায়, সে ছোট হইতে বড় কিছুকেই অবজ্ঞা করেনা, কোনো কর্ত্তব্য পাছে অসমাপ্ত থাকে এই আশঙ্কা তাহার ঘুচেনা। প্রেম নিজেকে সার্থক করিতেই চায় সে নিজেকে প্রমাণ করিবার জন্য ব্যস্ত নহে। কিন্তু অপমানের তাড়নায় কেবল আত্মাভিমানমাত্র যখন জাগিয়া উঠে তখন সে বুক ফুলাইয়া বলে আমি হাঁটিয়া চলিবনা আমি ডিঙাইয়া চলিব। অর্থাৎ পৃথিবীর অন্য সকলের পক্ষে যাহা খাটে তার পক্ষে তাহার কোনো প্রয়োজন নাই, ধৈর্য্যের প্রয়োজন নাই, অধ্যবসায়ের প্রয়োজন নাই, সুদূর উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করিয়া সুদীর্ঘ উপায় অবলম্বন করা অনাবশ্যক। ফলে দেখিতেছি পরের শক্তির প্রতি গতকল্য অন্ধভাবে প্রত্যাশা করিয়া বসিয়া ছিলাম, নিজের শক্তির কাছে আজ তেমনি অন্ধ প্রত্যাশা লইয়া আস্ফালন করিতেছি। তখনো যথাবিহিত কর্ম্মকে ফাঁকি দিবার চেষ্টা ছিল এখনো সেই চেষ্টাই বর্ত্তমান। কথামালার কৃষকের নিশ্চেষ্ট ছেলেরা যতদিন বাপ বাঁচিয়া ছিল ক্ষেতের ধারেও যায় নাই, বাপ চাষ করিত তাহারা দিব্য খাইত—বাপ যখন মরিল তখন ক্ষেতে নামিতে বাধ্য হইল কিন্তু চাষ করিবার জন্য নহে—তাহারা স্থির করিল মাটি খুঁড়িয়া একেবারেই দৈবধন পাইবে। বস্তুত চাষের ফসলই যে প্রকৃত দৈবধন এ কথা শিখিতে তাহাদিগকে অনেক বৃথা সময় নষ্ট করিতে হইয়াছিল। আমরাও যদি এ কথা সহজে না শিখি যে দৈবধন কোনো অদ্ভুত উপায়ে গোপনে পাওয়া যায় না, পৃথিবীসুদ্ধ লোক সে ধন যেমন করিয়া লাভ করিতেছে ও ভোগ করিতেছে আমাদিগকেও ঠিক তেমনি করিয়াই করিতে হইবে—তবে আঘাত এবং দুঃখ কেবল বাড়িয়াই চলিতে থাকিবে এবং বিপথে যতই অগ্রসর হইব ফিরিবার পথও ততই দীর্ঘ ও দুর্গম হইয়া উঠিবে।

অধৈর্য্য বা অজ্ঞানবশতঃ স্বাভাবিক পন্থাকে অবিশ্বাস করিয়া অসামান্য কিছু একটাকে ঘটাইয়া তুলিবার ইচ্ছা অত্যন্ত বেশি প্রবল হইয়া উঠিলে মানুষের ধর্ম্মবুদ্ধি নষ্ট হয়;—তখন সকল উপকরণকেই উপকরণ, সকল উপায়কেই উপায় বলিয়া মনে হয়—তখন ছোট ছোট বালকদিগকেও এই উন্মত্ত ইচ্ছার নিকট নির্ম্মমভাবে বলি দিতে মনে কোনো দ্বিধা উপস্থিত হয় না। আমরা মহাভারতের সোমক রাজার ন্যায় অসামান্য উপায়ে সিদ্ধিলাভের প্রলোভনে আমাদের অতি সুকুমার ছোট ছেলেটিকেই যজ্ঞের অগ্নিতে সমর্পণ করিয়া বসিয়াছি—এই নির্বিচার নিষ্ঠুরতার পাপ চিত্রগুপ্তের দৃষ্টি এড়ায় নাই—তাহার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছে, বালকদের জন্য বেদনায় সমস্ত দেশের হৃদয়

বিদীর্ণ হইতেছে—দুঃখ আরো কত সহ্য করিতে হইবে জানিনা।

দুঃখ সহ্য করা তত কঠিন নহে কিন্তু দুর্ম্মতিকে সম্বরণ করা অত্যন্ত দুরূহ। অন্যায়কে অত্যাচারকে একবার যদি কর্ম্মসাধনের সহায় বলিয়া গণ্য করি তবে অন্তঃকরণকে বিকৃতি হইতে রক্ষা করিবার সমস্ত স্বাভাবিক শক্তি চলিয়া যায়;—ন্যায়ধর্ম্মের ধ্রুব কেন্দ্রকে একবার ছাড়িলেই বুদ্ধির নষ্টতা ঘটে, কর্ম্মের স্থিরতা থাকেনা—তখন বিশ্বব্যাপী ধর্ম্মব্যবস্থার সঙ্গে আবার আমাদের ভ্রষ্ট জীবনের সামঞ্জস্য ঘটাইবার জন্য প্রচণ্ড সংঘাত অনিবার্য্য হইয়া উঠে।

সেই প্রক্রিয়া কিছুদিন হইতে আমাদের দেশে চলিতেছে একথা নম্র হৃদয়ে দুঃখের সহিত আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। এই আলোচনা আমাদের পক্ষে একান্ত অপ্রিয়, তাই বলিয়া নীরবে ইহাকে গোপন করিয়া অথবা অত্যুক্তিদ্বারা ইহাকে ঢাকা দিয়া অনিষ্টকে সাংঘাতিক হইয়া উঠিতে দেওয়া আমাদের কাহারো পক্ষে কর্ত্তব্য নহে।

আমরা সাধ্যমত বিলাতী পণ্যদ্রব্য ব্যবহার না করিয়া দেশীয় শিল্পের রক্ষা ও উন্নতি সাধনে প্রাণপণে চেষ্টা করিব ইহার বিরুদ্ধে আমি কিছু বলিব এমন আশঙ্কা করিবেন না। বহুদিন পূর্ব্বে আমি যখন লিখিয়াছিলাম—

নিজহস্তে শাক অন্ন তুলে দাও পাতে,
তাই যেন রুচে,—
মোটাবস্ত্র বুনে দাও যদি নিজ হাতে,
তাহে লজ্জা ঘুচে;—

তখন লর্ড কর্জ্জনের উপর আমাদের রাগ করিবার কোনো কারণই ঘটে নাই এবং বহুকাল পূর্ব্বে যখন স্বদেশী ভাণ্ডার স্থাপন করিয়া দেশীপণ্য প্রচলিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম তখন সময়ের প্রতিকূলতার বিরুদ্ধেই আমাদিগকে দাঁড়াইতে হইয়াছিল।

তথাপি, দেশে বিদেশী পণ্যের পরিবর্ত্তে স্বদেশী পণ্য প্রচার যত বড় কাজই হউক্ লেশমাত্র অন্যায়ের দ্বারা তাহার সমর্থন করিতে হইবে একথা আমি কোনো মতেই স্বীকার করিতে পারি না। বিলম্ব ভাল, প্রতিকূলতা ভাল, তাহাতে ভিত্তিকে পাকা, কর্ম্মকে পরিণত করিয়া তুলে; কিন্তু এমন কোনো ইন্দ্রজাল ভাল নহে যাহা একরাত্রে কোঠা বানাইয়া দেয় এবং আশ্বাস দিয়া বলে আমাকে উচিত মূল্য নগদ তহবিল হইতে দিবার কোনো প্রয়োজন নাই। কিন্তু হায়, মনে না কি ভয় আছে যে একমুহূর্ত্তের মধ্যে ম্যাঞ্চেষ্টরের কল যদি বন্ধ করিয়া দিতে না পারি তবে দীর্ঘকাল ধরিয়া এই দুঃসাধ্য উদ্দেশ্য, অটল নিষ্ঠার সহিত বহন করিবার শক্তি আমাদের নাই; সেইজন্য এবং কোনোমতে হাতে হাতে পার্টিশনের প্রতিশোধ লইবার তাড়নায় আমরা পথ বিপথ বিচার করিতেই চাই নাই। এইরূপে চারিদিক হইতে সাময়িক ত্যাগিদের বধিরকর কলকলায় বিভ্রান্ত হইয়া নিজের প্রতি বিশ্বাসবিহীন দুর্ব্বলতা স্বভাবকে অশ্রদ্ধা করিয়া, শুভ-বুদ্ধিকে অমান্য করিয়া অতি সত্বর লাভ চুকাইয়া লইতে চায় এবং পরে অতি দীর্ঘকাল ধরিয়া ক্ষতির নিকাশ করিতে থাকে; মঙ্গলকে পীড়িত করিয়া মঙ্গল পাইব, স্বাধীনতার মূলে আঘাত করিয়া স্বাধীনতালাভ করিব ইহা কখনো হইতেই পারেনা একথা মনে আনিতেও তাহার ইচ্ছা হয় না।

আমরা অনেকে সম্পূর্ণ জানিনা এবং

অনেকে স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক যে, বয়কট্‌ ব্যাপারটা অনেকস্থলে দেশের লোকের প্রতি দেশের লোকের অত্যাচারের দ্বারা সাধিত হইয়াছে। আমি যেটাকে ভালো বুঝি দৃষ্টান্ত এবং উপদেশের দ্বারা অন্য সকলকে তাহা বুঝাইবার বিলম্ব যদি না সহে, পরের ন্যায্য অধিকারে বলপূর্ব্বক হস্তক্ষেপ করাকে অন্যায় মনে করিবার অভ্যাস যদি দেশ হইতে চলিয়া যাইতে থাকে তবে অসংযমকে কোনো সীমার মধ্যে আর ঠেকাইয়া রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে। কর্ত্তব্যের নামে যখন অকর্ত্তব্য প্রবল হয় তখন দেখিতে দেখিতে সমস্ত দেশ অপ্রকৃতিস্থ হইয়া উঠে। সেই জন্যই স্বাধীনতালাভের দোহাই দিয়া আমরা যথার্থ স্বাধীনতাধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছি;—দেশে মতের অনৈক্য ও ইচ্ছার বিরোধকে দণ্ড উত্তোলন করিয়া বলপূর্ব্বক একাকার করিয়া দিতে হইবে এইরূপ দুর্ম্মতির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। আমি যাহা করিব সকলকেই তাহা করিতেই হইবে, আমি যাহা বলিব সকলকেই তাহা বলিতেই হইবে এইরূপ বলপ্রয়োগে দেশের সমস্ত মত, ইচ্ছা ও আচরণবৈচিত্র্যের অপঘাত মৃত্যুর দ্বারা পঞ্চত্বলাভকেই আমরা জাতীয় ঐক্য বলিয়া স্থির করিয়া বসিয়াছি। মতান্তরকে আমরা সমাজে পীড়ন করিতেছি, কাগজে অতি কুৎসিত ভাবে গালি দিতেছি, এমন কি, শারীরিক আঘাতের দ্বারাও বিরুদ্ধ মতকে শাসন করিব বলিয়া ভয় দেখাইতেছি। আপনারা নিশ্চয় জানেন এবং আমি ততোধিক নিশ্চয়তররূপে জানি, এরূপ বেনামী শাসনপত্র সময় বিশেষে আমাদের দেশের অনেক লেকেই পাইয়া থাকেন এবং দেশের প্রবীন ব্যক্তিরাও অপমান হইতে রক্ষা পাইতেছেন না। জগতে অনেক মহাপুরুষ বিরুদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে মত প্রচারের জন্য নিজের প্রাণও বিসর্জ্জন করিয়াছেন, আমরা ও মত প্রচার করিতে চাই কিন্তু আর সকলের দৃষ্টান্ত পরিহার করিয়া একমাত্র কালাপাহাড়কেই গুরু বলিয়া বরণ করিয়াছি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যাহার ভিতরে গড়নের শক্তি নাই ভাঙন তাহার পক্ষে মৃত্যু। জিজ্ঞাসা করি আমাদের দেশে সেই গঠনতত্ত্বটি কোথায় প্রকাশ পাইতেছে? কোন্ সৃজনশক্তি আমাদের মধ্যে ভিতর হইতে কাজ করিয়া আমাদিগকে বাঁধিয়া এক করিয়া তুলিতেছে? ভেদের লক্ষণই ত চারিদিকে! নিজের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাই যখন প্রবল তখন কোনো মতেই আমরা নিজের কর্ত্তৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি না। তাহা যখন পারি না তখন অন্যে আমাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবেই—কিছুতেই ঠেকাইতে পারিব না। অনেকে ভাবেন এদেশের পরাধীনতা মাথাধরার মত ভিতরের ব্যাধি নহে, তাহা মাথার বোঝার মত ইংরেজ গবর্মেণ্টরূপে বাহিরে আমাদের উপরে চাপিয়া আছে--ঐটেকেই যে কোনোপ্রকারে হোক্ টান মারিয়া ফেলিলেই পরমুহূর্ত্তে আমরা হাল্কা হইব। এত সহজ নহে! ইংরেজগবর্মেণ্ট্‌ আমাদের পরাধীনতা নয় তাহা আমাদের গভীরতর পরাধীনতার প্রমাণমাত্র।

কিন্তু গভীরতর কারণগুলির কথাকে আমল দিবার মত অবকাশ ও মনের ভাব আজকাল আমাদের নাই। ভারতবর্ষে এত জাতিবিভাগসত্ত্বেও কেমন করিয়া এক মহাজাতি হইয়া স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করিব এই প্রশ্ন যখন

উঠে তখন আমাদের মধ্যে যাঁহারা বিশেষ ত্বরান্বিত তাঁহারা এই বলিয়া কথাটা সংক্ষেপে উড়াইয়া দেন যে, সুইজরল্যাণ্ডেও ত একাধিক জাতির সমাবেশ হইয়াছে কিন্তু সেখানে কি তাহাতে স্বরাজের বাধা ঘটিয়াছে ?

এমনতর নজির দেখাইয়া আমরা নিজেদের ভুলাইতে পারি কিন্তু বিধাতার চোখে ধূলা দিতে পারিব না ; বস্তুত জাতির বৈচিত্র্য থাকিলেও স্বরাজ চলিতে পারে কিনা সেটা আসল তর্ক নহে। বৈচিত্র্য ত নানাপ্রকারে থাকে—যে পরিবারে দশজন মানুষ আছে সেখানে ত দশটা বৈচিত্র্য। কিন্তু আসল কথা সেই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের তত্ত্ব কাজ করিতেছে কিনা। সুইজর্লণ্ড যদি নানা-জাতিকে লইয়াই এক হইয়া থাকে তবে ইহাই বুঝিতে হইবে সেখানে নানাত্বকে অতিক্রম করিয়াও একত্ব কর্ত্তা হইয়া উঠিতে পারিয়াছে। সেখানকার সমাজে এমন একটি ঐক্যধর্ম্ম আছে। আমাদের দেশে বৈচিত্র্যই আছে কিন্তু ঐক্যধর্ম্মের অভাবে বিশ্লিষ্টতাই ভাষা, জাতি, ধর্ম্ম, সমাজে ও লোকাচারে নানাবিধ আকার ধারণ করিয়া এই বৃহৎ দেশকে ছোট বড় বহুতর ভাগে বিভাগে শতধাবিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

অতএব নজির পাড়িয়া ত নিশ্চিন্ত হইবার কিছু দেখিনা। চক্ষু বুজিয়া একথা বলিলে ধর্ম্ম শুনিবেনা যে আমাদের আর সমস্তই ঠিক হইয়া গিয়াছে এখন কেবল ইংরেজকে কোনো মতে বাদ দিতে পারিলেই বাঙালীতে পাঞ্জাবীতে মারাঠিতে মাদ্রাজিতে হিন্দুতে মুসলমানে মিলিয়া একমনে একপ্রাণে একস্বার্থে স্বাধীন হইয়া উঠিব।

বস্তুত আজ ভারতবর্ষে যেটুকু ঐক্য দেখিয়া আমরা সিদ্ধিলাভকে আসন্ন জ্ঞান করিতেছি তাহা যান্ত্রিক তাহা জৈবিক নহে। ভারতবর্ষের ভিন্ন জাতির মধ্যে সেই ঐক্য জীবনধর্ম্মবশত ঘটে নাই—পরজাতির এক-শাসনই আমাদিগকে বাহিরের বন্ধনে একত্র জোড়া দিয়া রাখিয়াছে।

সজীব পদার্থ অনেক সময় যান্ত্রিকভাবে একত্র থাকিতে থাকিতে জৈবিকভাবে মিলিয়া যায়। এমনি করিয়া ভিন্ন শ্রেণীর ডালে ডালে জুড়িয়া বাঁধিয়া কলম লাগাইতে হয়। কিন্তু যতদিন না কালক্রমে সেই সজীব জোড়টি লাগিয়া যায় ততদিন ত বাহিরের শক্ত বাঁধনটা খুলিলে চলে না! অবশ্য, দড়ার বাঁধনটা না কি গাছের অঙ্গ নহে এইজন্য যেমনভাবেই থাক্, যত উপকারই করুক, সে ত গাছকে পীড়া দিবেই কিন্তু বিভিন্নতাকে যখন ঐক্য দিয়া কলেবরবদ্ধ করিতে হইবে তখনি ঐ দড়া-টাকে স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। যতটুকু প্রয়োজন তাহার চেয়ে সে বেশি বাঁধিয়াছে এ কথা সত্য হইতে পারে কিন্তু তাহার একমাত্র প্রতিকার—নিজের আভ্যন্তরিক সমস্ত শক্তি দিয়া ঐ জোড়ের মুখে রসে রস মিলাইয়া, প্রাণে প্রাণে যোগ করিয়া জোড়টিকে একান্ত চেষ্টায় সম্পূর্ণ করিয়া ফেলা। এ কথা নিশ্চয় বলা যায় জোড় বাঁধিয়া গেলেই যিনি আমাদের মালী আছেন তিনি আমাদের দড়িদড়া সব কাটিয়া দিবেন। ইংরেজশাসন নামক বাহিরের বন্ধনটাকে স্বীকার করিয়া অথচ তাহার পরেই জড়ভাবে নির্ভর না করিয়া সেবার দ্বারা, প্রীতির দ্বারা, সমস্ত কৃত্রিম ব্যবধান নিরস্ত করার দ্বারা বিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষকে নাড়ির বন্ধনে

এক করিয়া লইতে হইবে। একত্রসংঘটনমূলক সহস্রবিধ সৃজনের কাজে ভৌগোলিক ভূখণ্ডকে স্বদেশরূপে স্বহস্তে গড়িতে হইবে ও বিযুক্ত জনসমূহকে স্বজাতিরূপে স্বচেষ্টায় রচনা করিয়া লইতে হইবে।

শুনিয়াছি এমন কথাও কেহ কেহ বলেন, যে, ইংরেজের প্রতি দেশের সর্ব্বসাধারণের বিদ্বেষই আমাদিগকে ঐক্যদান করিবে। প্রাচ্য পরজাতীয়ের প্রতি স্বাভাবিক নির্ম্মমতায় ইংরেজ ঔদাসীন্যে ও ঔদ্ধত্যে ভারতবর্ষের ছোট বড় সকলকেই ব্যথিত করিয়া তুলিতেছে। যত দিন যাইতেছে এই বেদনার তপ্ত শেল গভীর ও গভীরতররূপে আমাদের প্রকৃতির মধ্যে অনুবিদ্ধ হইয়া চলিয়াছে। এই নিত্য-বিস্তারপ্রাপ্ত বেদনার ঐক্যেই ভারতের নানা জাতি মিলিবার উপক্রম করিতেছে। অতএব এই বিদ্বেষকেই আমাদের প্রধান আশ্রয়রূপে অবলম্বন করিতে হইবে।

একথা যদি সত্যই হয় তবে বিদ্বেষের কারণটি যখন চলিয়া যাইবে, ইংরেজ যখনি এ দেশ ত্যাগ করিবে, তখনি কৃত্রিম ঐক্যসূত্রটি ত এক মুহূর্ত্তে ছিন্ন হইয়া যাইবে। তখন দ্বিতীয় বিদ্বেষের বিষয় আমরা কোথায় খুঁজিয়া পাইব? তখন আর দূরে খুঁজিতে হইবে না, বাহিরে যাইতে হইবে না, রক্তপিপাসু বিদ্বেষবুদ্ধির দ্বারা আমরা পরস্পরকে ক্ষতবিক্ষত করিতে থাকিব।

"ততদিনে যেমন করিয়াই হোক্ একটা কিছু সুযোগ ঘটিয়া যাইবেই, আপাতত এই ভাবেই চলুক" এমন কথা যিনি বলেন তিনি এ কথা ভুলিয়া যান যে, দেশ তাঁহার একলার সম্পত্তি নহে; ব্যক্তিগত রাগ দ্বেষ ও ইচ্ছা অনিচ্ছা লইয়া তিনি চলিয়া গেলেও এ দেশ রহিয়া যাইবে। ট্রষ্টি যেমন সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত উপায় ব্যতীত ন্যস্ত ধনকে নিজের ইচ্ছামত যেমন তেমন করিয়া খাটাইতে পারেন না তেমনি দেশ যখন বহু লোকের এবং বহু কালের, তাহার মঙ্গলকে কোনো সাময়িক ক্ষোভের বেগে অদূরদর্শী আপাতবুদ্ধির সংশয়াপন্ন ব্যবস্থার হাতে চক্ষু বুজিয়া সমর্পণ করিবার অধিকার আমাদের কাহারো নাই। স্বদেশের ভবিষ্যৎ যাহাতে দায়গ্রস্ত হইয়া উঠিতেও পারে এমনতর নিতান্ত ঢিলা বিবেচনার কাজ বর্ত্তমানের প্ররোচনায় করিয়া ফেলা কোনো লোকের পক্ষে কখনই কর্ত্তব্য হইতে পারে না। কর্ম্মের ফল যে আমার একলার নহে। দুঃখ যে অনেকের।

তাই বারম্বার বলিয়াছি এবং বারম্বার বলিব—শত্রুতাবুদ্ধিকে অহোরাত্র কেবলি বাহিরের দিকে উদ্যত করিয়া রাখিবার জন্য উত্তেজনার অগ্নিতে নিজের সমস্ত সঞ্চিত সম্বলকে আহুতি দিবার চেষ্টা না করিয়া ঐ পরের দিক হইতে ভ্রূকুটিকুটিল মুখটাকে ফিরাও, আষাঢ়ের দিনে আকাশের মেঘ যেমন করিয়া প্রচুর ধারাবর্ষণে তাপশুষ্ক তৃষ্ণাতুর মাটির উপরে নামিয়া আসে তেমনি করিয়া দেশের সকল জাতির সকল লোকের দেশের সকলের মাঝখানে নামিয়া এস, নানাদিগভিমুখী মঙ্গল চেষ্টার বৃহৎ জালে স্বদেশকে সর্ব্বপ্রকারে বাঁধিয়া ফেল; কর্ম্মক্ষেত্রকে সর্ব্বত্র বিস্তৃত কর—এমন উদার করিয়া এত দূর বিস্তৃত কর যে, দেশের উচ্চ ও নীচ, হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টান সকলকেই যেখানে সমবেত হইয়া হৃদয়ের সহিত হৃদয়, চেষ্টার সহিত চেষ্টা

সম্মিলিত করিতে পারে। আমাদের প্রতি রাজার সন্দেহ ও প্রতিকূলতা আমাদিগকে ক্ষণে ক্ষণে প্রতিহত করিবার চেষ্টা করিবে কিন্তু কখনই আমাদিগকে নিরস্ত করিতে পারিবে না,—আমরা জয়ী হইবই,—বাধার উপরে উন্মাদের মত নিজের মাথা ঠুকিয়া নহে অটল অধ্যবসায়ে তাহাকে শনৈঃ শনৈঃ অতিক্রম করিয়া কেবল যে জয়ী হইব তাহা নহে কার্য্যসিদ্ধির সত্য সাধনাকে দেশের মধ্যে চিরদিনের মত সঞ্চিত করিয়া তুলিব—আমাদের উত্তরপুরুষদের জন্য শক্তি চালনার সমস্ত পথ একটি একটি করিয়া উদ্ঘাটিত করিয়া দিব।

আজ ঐ যে বন্দীশালায় লৌহশৃঙ্খলের কঠোর ঝঙ্কার শুনা যাইতেছে—দণ্ডধারী পুরুষদের পদশব্দে কম্পমান রাজপথ মুখরিত হইয়া উঠিতেছে ইহাকেই অত্যন্ত বড় করিয়া জানিয়ো না। যদি কান পাতিয়া শোন তবে কালের মহাসঙ্গীতের মধ্যে ইহা কোথায় বিলুপ্ত হইয়া যায়! কত যুগ হইতে কত বিপ্লবের আবর্ত্ত, কত উৎপীড়নের মন্থন, এ দেশের সিংহদ্বারে কত বড় বড় রাজপ্রতাপের প্রবেশ ও প্রস্থানের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষের পরিপূর্ণতা অভিব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে, অল্পকার ক্ষুদ্রদিন তাহার যে ক্ষুদ্র ইতিহাসটুকু ইহার সহিত মিলিত করিতেছে আর কিছুকাল পরে সমগ্রের মধ্যে তাহা কি কোথাও দৃষ্টিগোচর হইবে! ভয় করিব না, ক্ষুব্ধ হইব না, ভারতবর্ষের যে পরম মহিমা সমস্ত কঠোর দুঃখসংঘাতের মধ্যে বিশ্বকবির সৃজনানন্দকে বহন করিয়া ব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে—ভক্ত সাধকের প্রশান্ত ধ্যাননেত্রে তাহার অখণ্ড মূর্ত্তি উপলব্ধি করিব। চারিদিকের কোলাহল ও চিত্তবিক্ষেপের মধ্যে সাধনাকে মহৎলক্ষ্যের দিকে অবিচলিত রাখিব। নিশ্চয় জানিব এই ভারতবর্ষে যুগযুগান্তরীয় মানবচিত্তের সমস্ত আকাঙ্ক্ষাবেগ মিলিত হইয়াছে—এইখানেই জ্ঞানের সহিত জ্ঞানের মন্থন হইবে, জাতির সহিত জাতির মিলন ঘটিবে। বৈচিত্র্য এখানে অত্যন্ত জটিল, বিচ্ছেদ এখানে অত্যন্ত প্রবল, বিপরীতের সমাবেশ এখানে অত্যন্ত বিরোধসঙ্কুল—এত বহুত্ব, এত বেদনা, এত সংঘাত কোনোদেশেই এত দীর্ঘকাল বহন করিয়া বাঁচিতে পারিত না—কিন্তু একটি অতি বৃহৎ অতি মহৎ সমন্বয়ের পরম অভিপ্রায়ই এই সমস্ত একান্ত বিরুদ্ধতাকে ধারণ করিয়া আছে, পরস্পরের আঘাতে কাহাকেও উৎসাদিত হইতে দেয় নাই। এই যে সমস্ত নানা বিচিত্র উপকরণ কালকালান্তর ও দেশদেশান্তর হইতে এখানে আহরিত হইয়াছে আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিদ্বারা তাহাকে আঘাত করিতে গেলে আমরা নিজেই আহত হইব, তাহার কিছুই করিতে পারিব না। জানি, বাহির হইতে অন্যায় এবং অপমান আমাদের এমন প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করিতেছে, যাহা আঘাত করিতেই জানে, যাহা ধৈর্য্য মানে না, যাহা বিনাশ স্বীকার করিয়াও নিজের চরিতার্থতাকেই সার্থকতা বলিয়া জ্ঞান করে। কিন্তু সেই আত্মাভিমানের প্রমত্ততাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যে সুগম্ভীর আত্মগৌরব সঞ্চার করিবার—অন্তরতর শক্তি কি ভারতবর্ষ আমাদিগকে দান করিবেন না? যাহারা নিকটে আসিয়া—আমাদের পরিচয় গ্রহণ করিতে ঘৃণা করে যাহারা দূর হইতে আমাদের প্রতি বিদ্বেষ উদ্গার করে সেই সকল ক্ষণকালীন বায়ুবারা—

স্ফীত সংবাদ পত্রের মর্ম্মরধ্বনি—সেই বিলাতের টাইমস্ অথবা এ দেশের টাইমস্ অব ইণ্ডিয়ার বিদ্বেষ তীক্ষ্ণ বাণীই কি অঙ্কুশাঘাতের মত আমাদিগকে বিরোধের পথে অন্ধবেগে চালনা করিবে? আর ইহা অপেক্ষা সত্যতর নিত্যতর বাণী আমাদের পিতামহদের পবিত্র মুখ দিয়া কি এ দেশে উচ্চারিত হয় নাই? যে বাণী দূরকে নিকট করিতে বলে, পরকে আত্মীয় করিতে আহ্বান করে? সেই সকল শান্তি-গম্ভীর সনাতন কল্যাণবাক্যই আজ পরাস্ত হইবে? ভারতবর্ষে আমরা মিলিব এবং মিলাইব, আমরা সেই দুঃসাধ্য সাধনা করিব, যাহাতে শত্রু মিত্র ভেদ লুপ্ত হইয়া যায়; যাহা সকলের চেয়ে উচ্চ সত্য, যাহা পবিত্রতার তেজে ক্ষমার বীর্য্যে, প্রেমের অপরাজিত শক্তিতে পূর্ণ, আমরা তাহাকে কখনই অসাধ্য বলিয়া জানিব না, তাহাকে নিশ্চিত মঙ্গল জানিয়া শিরোধার্য্য করিয়া লইব। দুঃখ বেদনার একান্ত পীড়নের মধ্য দিয়াই যাত্রা করিয়া আজ উদার আনন্দে মন হইতে সমস্ত বিদ্রোহ ভাব দূর করিয়া দিব, জানিয়া এবং না জানিয়া বিশ্বের মানব এই ভারতক্ষেত্রে মনুষ্যত্বের যে পরমাশ্চর্য্য মন্দির নানা ধর্ম্ম, নানা শাস্ত্র, নানা জাতির সম্মিলনে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে সেই সাধনাতেই যোগ দান করিব, নিজের অন্তরের সমস্ত শক্তিকে একমাত্র সৃষ্টি শক্তিতে পরিণত করিয়া এই রচনা কার্য্যে তাহাকে প্রবৃত্ত করিব। তাহা যদি করিতে পারি যদি জ্ঞানে প্রেমে ও কর্ম্মে ভারতবর্ষের এই অভিপ্রায়ের মধ্যে সমস্ত প্রাণ দিয়া নিযুক্ত হইতে পারি তবেই মোহমুক্ত পবিত্র দৃষ্টিতে স্বদেশের ইতিহাসের মধ্যে সেই এক সত্য সেই নিত্য সত্যকে দেখিতে পাইব, ঋষিরা যাঁহাকে বলিয়াছেন,—

স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানাম্—

তিনিই সমস্ত লোকের বিধৃতি, তিনিই সমস্ত বিচ্ছেদের সেতু এবং তাঁহাকেই বলা হইয়াছে—

তস্য হবা এতস্য ব্রহ্মণোনাম সত্যম্—

সেই যে ব্রহ্ম, নিখিলের সমস্ত প্রভেদের মধ্যে ঐক্য রক্ষায় যিনি সেতু ইহারই নাম সত্য।*

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তালীবনের ভারতে।

১১

পণ্ডিচেরীতে।

আমাদের পুরাতন ক্ষুদ্র ম্রিয়মান উপনিবেশ নগর পণ্ডিচেরীর যতই নিকটবর্ত্তী হইতেছি ততই নারিকেল তালবৃক্ষাদি আবার দেখা দিতেছে। ইহার চতুর্দ্দিকস্থ প্রদেশ এখনও সর্ব্বগ্রাসী শুষ্কতার কবলে পতিত হয় নাই; এই প্রদেশটি যেন একপ্রকার মরুকানন বলিয়া মনে হয়; এখনও ইহা নদীর জলে—বৃষ্টির জলে পরিষিক্ত; এখনও দক্ষিণ প্রদেশের সুন্দর হরিৎক্ষেত্র মনে করাইয়া দেয়।

পণ্ডিচেরী!...আমাদের পুরাতন যে সকল

---

* চৈতন্য লাইব্রেরির বিশেষ অধিবেশনে ১২ই জ্যৈষ্ঠ (১৩১৫) লেখক মহাশয়কর্তৃক পঠিত।

উপনিবেশের নাম আমার শৈশবকালের কল্পনাকে মুগ্ধ করিত তন্মধ্যে পণ্ডিচেরী ও গোয়ের নাম, আমার মনে সুদূর বিদেশের একপ্রকার অনির্ব্বচনীয় স্বপ্ন জাগাইয়া তুলিত। আমার যখন বয়স প্রায় দশ বৎসর, আমার একটি অতিবৃদ্ধা পিতামহী একদিন সন্ধ্যাকালে, পণ্ডিচেরী নিবাসী তাঁহার একটি মহিলা-বন্ধুর কথা আমাকে বলিয়াছিলেন এবং তাঁহার পত্র হইতে একটি অংশ আমাকে পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন, সেই পত্রের বৎসর সেই সময়েই এক-অর্দ্ধ শতাব্দি পিছাইয়া ছিল; সেই পত্রে তিনি তাল-কুঞ্জের কথা, 'প্যাগোড়া'র (দেবালয়) কথা বলিয়াছিলেন...

সেই সুদূরবর্ত্তী পুরাতন রমণীয় নগর, যেখানকার ফাটাফুটো প্রকারাবলীর মধ্যে সমস্ত ফরাসী-অতীতটা যেন নিদ্রামগ্ন, সেই নগরে আসিয়া, ওঃ!—আমার মনে কি একটা তীব্র বিষাদের ভাব উপস্থিত হইল! আমাদের নিস্তব্ধ মফস্বলের অভ্যন্তর-প্রদেশে যেরূপ ছোট ছোট রাস্তা, এখানেও কতকটা সেইরূপ; ছোট ছোট রাস্তাগুলি খুব সোজা, রাস্তার বাড়ীগুলা নীচু, শতবৎসরের পুরাতন, চুনকাম-করা সাদা, লাল মাটির উপর দণ্ডায়মান; উদ্যানের প্রাচীরের উপর হইতে কল্‌মি ফুলের মালা কিংবা অন্যান্য গ্রীষ্ম প্রধান দেশের পুষ্পমালা গড়াইয়া পড়িয়াছে; গরাদে-ওয়ালা জান্‌লার পশ্চাতে কতকগুলি ফিরিঙ্গিরমণী কিংবা মেটে-ফিরিঙ্গি রমণীর মুখ দেখা যাইতেছে। সুন্দর মুখ এবং চোখে ভারতীয় গূঢ়রহস্য বিদ্যমান। 'রু রইয়াল্', 'রু ডুপ্লে' (অর্থাৎ রয়্যাল রোড, ডুপ্লেরোড)। এই নাম অষ্টাদশ শতাব্দির অক্ষরে, পাথরের উপর সেকেলে ধরণে খোদিত। যে নগরটি আমার জন্মস্থান, সেই নগরের কোণে, কতকগুলি পুরাতন বাড়ীর উপর এইরূপ ধরণে নাম এখনও খোদিত আছে বলিয়া আমার স্মরণ হয়। "রু স্যাঁলুই" এবং "quay (কে) ডেলা ভিল্ ব্ল্যাঁশ্"; এই quayর বানানে i র বদলে সেকেলে y...

পণ্ডিচেরীর মধ্যস্থলে, একটা বৃহৎ চত্বর, ময়দানের মত প্রসারিত, সর্ব্বদাই জনশূন্য, তৃণাক্রান্ত, এবং তাহার মাঝখানে একপ্রকার আলঙ্কারিক ফোয়ারা; বোধ হয় ইহা একশ বৎসরেরও পুরাতন নহে, কিন্তু সর্ব্বধ্বংসী সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে জরাজীর্ণ বার্দ্ধক্যের ভাব ধারণ করিয়াছে; উহাকে দেখিলে, কে জানে কেন, মনে একপ্রকার বিষাদের ভাব উপস্থিত হয়।

"গোরা সহরের" পরেই দেশী সহর। এই দেশী সহর খুব বড়, জীবন উদ্যমে পূর্ণ, তাছাড়া খুব হিন্দুভাবাপন্ন;—বাজার আছে, তালকুঞ্জ আছে, দেবালয় আছে।

এখানকার ভারতবাসীরা ফরাসী, আমাদের ফ্রান্সের লোক,—অন্তত এই কথা আবৃত্তি করিতে উহারা ভালবাসে। এখানকার একটি ক্লব—নিছক্ ভারতবাসীদের ক্লব—আমাকে যেরূপ আগ্রহের সহিত আদর অভ্যর্থনা করিয়াছিল তাহা আমি বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করিতে পারি না—উহা বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। উহারা নিজের চেষ্টা ও যত্নে এই ক্লবটি স্থাপন করে। যাহাতে আমাদের মাসিক-পত্রিকা, আমাদের পুস্তকাদি পাঠ করিবার সুবিধা হয় এই উদ্দেশেই ক্লবটি স্থাপিত।

আমাদের ভাষাকে আরও দেশব্যাপ্ত করিবার জন্য, উহারা এই ক্লবের সঙ্গে একটা বিদ্যালয়ও জুড়িয়া দিয়াছে। যে সকল ছোট ছোট ছাত্রগুলিকে উহারা আমার সমক্ষে আনিল, উহারা কি সৌম্য সুন্দর! ৮ বৎসরের বালক, সুশ্রাবয়ব শ্যামল মুখমণ্ডল, কেমন ভদ্র, কেমন শিষ্ট, ছোট ছোট ক্ষুদে রাজার মত, উহাদের জরির পাড়ওয়ালা মখমলের পরিচ্ছদ। উহারা বিবিধ সমস্যা ও ফরাসীদের কর্ত্তব্য সকল যেরূপ স্পষ্ট করিয়া বিবৃত করিল তাহা আমাদের নিম্ন পাঠশালার অধিকাংশ ছাত্রের পক্ষে দুরূহ।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বঙ্গদর্শন।

জাতীয় বন্ধন।
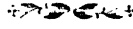
২

জাতীয় বন্ধনে সাহিত্যের উল্লেখ সকলের শেষে হইল বটে, কিন্তু ইহা সকলপ্রকার জাতীয় বন্ধন হইতে শ্রেষ্ঠ এবং দৃঢ়তম। এক কালিদাসের নামে সমস্তভারত গৌরবান্বিত, এক মধুসূদনের যশে সমস্ত বঙ্গ উৎফুল্ল। সাহিত্যের আসরে আমরা জাতিধর্ম্ম ভুলিয়া যাই, হিন্দু হউক মুসলমান হউক, যে আমার আশৈশব পরিচিত মাতৃভাষায় আমার প্রাণের কথা বলিতে পারে, তাহাকেই পরম আত্মীয় বলিয়া প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে ভাব-গদ্‌গদ সম্ভাষণে আলিঙ্গন করি। যে কখনও অপরিচিত বিদেশে বহুদিন বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ স্বদেশীর মুখে মাতৃভাষা শুনিতে পাইয়াছে, কেবল সেই বুঝিতে পারিয়াছে এই ভাষা কেমন মধুর, কেমন প্রাণস্পর্শী, কেমন আত্মীয়তা সম্পাদক।

মাতৃভাষা জাতীয় চিন্তার ভাণ্ডার, জাতীয় প্রতিভার নন্দন কানন। মহাকবি মধুসূদন যে দিন বিদেশীয় ভাষার সেবা ছাড়িয়া মাতৃভাষার সিংহাসনের ছায়ায় উপবেশন করিলেন, মাতৃপূজার জন্য কুসুমাঞ্জলি হাতে তুলিয়া লইলেন, সেইদিনই অমর লোকে তাঁহার নাম বিঘোষিত হইল, সেই দিনই নর-লোকে তাঁহার যশের ভেরী বাজিয়া উঠিল। আহা! পর-ভাষায় প্রতিভা বিকাশের বিফল প্রয়াস কতজনকে যে ব্যর্থ মনোরথ করিয়াছে, কতজনের হৃদয়ে যে নৈরাশ্যের অগ্নি জ্বালিয়াছে, তাহা গণনা করা যায় না। সে চিন্তা বড়ই শোকাবহ।

জাতীয় সুখ-দুঃখ, সম্পদ্ বিপদ, আশা নৈরাশ্য, হাস্য-ক্রন্দন, সমস্তেরই স্মৃতি এই মাতৃভাষায়—জাতীয় সাহিত্যে নিহিত। জাতীয় মনস্বী মহাপুরুষগণ যখন যে অবস্থায় পড়েন, যখন যে পথে চলেন, যখন যে বিষয় ভাবেন, তাহার অবিকল চিত্র জাতীয় সাহিত্যে রাখিয়া যান। তাঁহাদের প্রেম, তাঁহাদের পবিত্রতা, তাঁহাদের স্বদেশ-প্রীতি, তাঁহাদের সজীবকতা জাতীয় সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিয়া রাখে; তাঁহাদের সাহস-উৎসাহ, তাঁহাদের যুক্তি-তর্ক, তাঁহাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান, তাঁহাদের ভাব সৌন্দর্য্য, জাতীয় অস্তিত্বে নবজীবন আনিয়া দেয়। অতীত যুগের মহাপুরুষেরা জ্ঞান বিজ্ঞান বা ভাব সৌন্দর্য্যের

সমুদ্র মন্থন করিয়া জাতীয় সাহিত্যের ভাণ্ডারে যে সকল অমূল্য রত্ন রাখিয়া যান, পরবর্ত্তী যুগের প্রাসাদবাসী রাজা হইতে কুটিরবাসী দরিদ্র পর্য্যন্ত সকলে সমান ভাবে তাহার উত্তরাধিকারী হয়। পার্থিব ধনে উত্তরাধিকারীর সংখ্যা যত বেশী হয়, ধনের পরিমাণ ততই কমিয়া যায়; কিন্তু সাহিত্যের অপার্থিব ধনে প্রত্যেকেরই সম্পূর্ণ অধিকার, যত্নশীল ব্যক্তিমাত্রেরই সমগ্র লাভ। এক একটি উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা এক একটি জাতীয় সঙ্গীত, এক এক খানি উৎকৃষ্ট কাব্য, এক এক খানি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ জাতীয় একতার এক একটি বন্ধন-রজ্জু। মহাপুরুষের গ্রন্থ পড়িলেই মহাপুরুষ হয়, এ কথা স্বীকার না করিতে পারি; কিন্তু মহাপুরুষদিগের চিন্তা-প্রবাহ হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া প্রত্যেকেরই যে সতেজতা, সবলতা ও উন্নতা বিধান করে, এবং সকলের চিন্তা ও ভাব-প্রবাহকে একখাতে একস্রোতে প্রবাহিত করিয়া যে জাতীয় জীবনে একটা একপ্রাণতা আনিয়া দেয়, ইহার তুলনা, ইহার উপাদেয়তা, ইহার মূল্য বিশ্বসংসারে দুর্লভ। এই অমূল্য রত্নের মূল্য যাহারা বুঝে, আদর যাহারা করে, তাহারাই ধন্য, তাহারাই জগতের জাতি সমূহের মধ্যে অগ্রগণ্য, আর যাহারা ইহার প্রতি অনুরক্ত হয় না, ইহার আদর করিতে শিখে না, তাহারা চিরদিন দুর্ব্বল, হেয়, পর-বল-দলিত, পর-দাসত্ব-লাঞ্ছিত। একত্র বাস করিলেই জাতি হয় না। ভেড়ার পাল একত্রই থাকে, কয়েদীরা এক ফাটকেই দিন কাটায়, সৈনিকেরা চিরদিন এক সেনা-নিবাসেই বাস করে; কিন্তু তাহারা কখনও জাতি হয় কি? জাতিত্বের মূল পরস্পর প্রাণের বন্ধন, আর জাতীয় সাহিত্য সেই বন্ধনের রজ্জু।

মাতৃভাষা এবং মাতৃভাষার সাহিত্য বা জাতীয় সাহিত্য ঠিক এক নহে। ছেলে মাতার মুখে যে ভাষা শুনিয়া শিখে, তাহাই প্রকৃত মাতৃভাষা। এ ভাষা সর্ব্বত্র এক নহে; ইহার সঙ্গে যথেষ্ট প্রাদেশিকতা মিশ্রিত থাকে। এই প্রাদেশিকতার জন্য প্রত্যেক জেলায় মাতৃভাষার পার্থক্য অনুভূত হয়। জেলা বা প্রদেশের পরস্পর দূরতানুসারে এই পার্থক্য ক্রমেই বাড়িয়া যায়, অবশেষে এমন হয় যে, দেশের একাংশের মাতৃভাষা অন্যাংশের লোকের বুঝিয়া উঠা কঠিন হয়। শুনিয়াছি, ইংলণ্ডে কর্ণওয়ালের ভাষা ইয়র্কসায়ারের লোকে বুঝে না।

ইংলণ্ডের তুলনায় বাঙ্গালা বহুবিস্তীর্ণ দেশ, ইহার এক সীমার মাতৃভাষা সীমান্তরের লোকের বোধগম্য নহে। যাঁহারা বঙ্গদেশের কোন প্রান্তজেলায় কখনও গিয়াছেন, তাঁহারা ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ঐ সকল জেলায় ইতর লোকে যখন পরস্পরের সঙ্গে কথা বলে তখন কিছুই বুঝা যায় না; কিন্তু তাহারাই যখন আবার অপরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলে, তখন সুন্দর বুঝা যায়। যাহা বুঝা যায় না, তাহাই তত্তৎ প্রদেশের মাতৃভাষা আর যাহা বুঝা যায়, তাহাই মাতৃভাষার সাহিত্যের, অর্থাৎ সমস্ত বাঙ্গালীর জাতীয় সাহিত্যের ভাষা।

কথিতভাষা, অর্থাৎ মাতৃভাষা সংযমবিহীন; তাহা শিশুর ন্যায় কোন নিয়মের ধার ধারে না। অবশ্য শিক্ষা-বিস্তার এবং সাহিত্য-চর্চ্চার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই ভাষা যত

মার্জ্জিত হয়, ক্রমশ সাহিত্যিক ভাষার যত নিকটবর্ত্তী হয় ততই ভাল; আর সাহিত্য-চর্চ্চার বাহুল্য বশতঃ কথিত ভাষা এবং সাহিত্যিক ভাষার দূরত্ব যে কালে বিলুপ্ত হইতে পারে, তাহাও বিশ্বাস করি; কিন্তু এ পার্থক্য ঘুচিয়া না গেলেও বিশেষ ক্ষতির কারণ নাই।

সাহিত্যের ভাষা সংযত, নিয়মাধীন; ইহা একটা শৃঙ্খলা বাঁধিয়া একটা নির্দ্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত হয়, নিজের ব্যাকরণ নিজে সৃষ্টি করিয়া তাহারই বন্ধন, তাহারই অধীনতা স্বীকার করে। ইহাই সাহিত্যের শৈশবাবস্থা। ইহার পরে দেশের মনিষীদিগের সানুরাগ দৃষ্টি যখন তাহার উপরে পতিত হয়, যখন অনুরক্ত ভক্তের ন্যায় তাঁহারা অক্লান্ত পরিশ্রমে মাতৃ-সেবার ন্যায় পবিত্র মনে করিয়া জাতীয় সাহিত্যের সেবা করিতে থাকেন, তখন তাঁহাদের যত্নে জাতীয় সাহিত্য নানা অলঙ্কারে, নানা সম্পদে, নানা সৌন্দর্য্যে সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। এইরূপে সাহিত্যের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, সৌন্দর্য্য-সম্পদ্ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় বটে, কিন্তু তাহার ব্যক্তিত্বের, তাহার দেহাবয়বের, তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। সে শৈশবে যাহা ছিল যৌবনেও তাহাই থাকিয়া যায়।

যাহার জন্ম-বৃদ্ধি আছে, তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য; সাহিত্যেরও শৈশব-যৌবন যখন আছে, তখন তাহার মৃত্যুও সম্ভব বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। সকল দেশেই দেখা যাইতেছে, অতীত সভ্যতার ভাষাগুলি মৃতাবস্থায় রহিয়াছে; এক সময়ে যে সকল জাতি ঐ সমস্ত ভাষা মায়ের কাছে শিখিয়া অনায়াসে বুঝিত, এখন তাহাদের বংশধরেরা ঐ সকল ভাষা মায়ের কাছে শিখিতে পায় না, কাযেই আর তাহা বুঝে না—বুঝিতে হইলে শিক্ষকের সাহায্যে আবার তাহা নূতন করিয়া শিখিতে হয়। সংস্কৃত, পালি, গ্রীক্, লাটিন প্রভৃতি এই শ্রেণীর মৃত ভাষা—এখন কুত্রাপি ঐ সকল ভাষা মাতৃভাষারূপে ব্যবহৃত হয় না।

ভাষার মৃত্যু আছে বটে, কিন্তু উহা মাতৃগণের হাতে; যত দিন মাতৃগণ উহার ব্যবহার করেন, যতদিন কোন ভাষা কোনজাতির মাতৃভাষারূপে ব্যবহৃত হয়, ততদিন তাহার মৃত্যু হইতে পারে না। যে ভাষা ঘরে মায় কাছে স্থান না পায়, তাহা বাহিরে সমাজের কাছেও অনাদৃত হইতে থাকে, অবশেষে অনাদরে, অবজ্ঞায়, অনাহারে, পুষ্টির অভাবে মরিয়া যায়। সুতরাং ভাষাকে দীর্ঘকাল জীবিত রাখিতে হইলে—চিরজীবী করিতে হইলে—এমন সতর্ক হইতে হইবে, এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে তাহার শক্তি, সম্পদ্ ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পায়, যাহাতে গৃহে গৃহে মাতৃদেবীরা চিরদিন সাদরে ও সাগ্রহে তাহার ব্যবহার করেন, আর যাহাতে মাতৃভক্ত মনীষিগণ ভক্তি ও আগ্রহের সহিত—অবয়বের পরিবর্ত্তনও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিকৃতি না ঘটাইয়া—জাতীয় সাহিত্যের সেবা করিতে থাকেন। এরূপ করিতে পারিলে ভাষা নাও মরিতে পারে, যতদিন জাতি জীবিত থাকে, ততদিন জাতীয় সাহিত্যও মাতৃভাষার জীবন সহচর হইয়া থাকিতে পারে।

মাতৃভাষার ভার যেমন মাতৃগণের হাতে, জাতীয় সাহিত্যের ভার তেমনই জন-সাধারণের হাতে। দেশের দুই চারিজন বা দুই চারি শত জন যতই বিদ্বান্, যতই ধনবান্,

যতই সাহিত্যানুরাগী হউন না কেন, সমগ্র জন-সাধারণের সানুরাগ সাহচর্য্য ব্যতীত কেবল তাঁহাদের যত্নে জাতীয় সাহিত্য উন্নত হইতে বা জীবিত থাকিতে পারে না। একদিকে যেমন জাতীয় সাহিত্যকে সুমার্জ্জিত সুসজ্জিত করিবেন, অন্যদিকে সেইরূপ জাতীয় সার্ব্বজনীন আগ্রহ ও অনুরাগ তাহার উপযুক্ত আদর, অভ্যর্থনা ও অর্চ্চনা করিবেন, তবেই জাতীয় সাহিত্য সুস্থিত এবং উন্নত হইবে, তবেই জাতীয় সাহিত্য প্রকৃত বন্ধন-রজ্জুরূপে জাতীয় হৃদয়কে দৃঢ়ভাবে বাঁধিতে পারিবে। যেমন মাতৃভূমি সকলের সেইরূপ মাতৃভাষা এবং মাতৃভাষার সাহিত্যও সকলের, অতএব এ উভয়ের সেবায় সকলেরই যত্ন চাই। স্বদেশের কার্য্যে, জাতীয় রাজা মহারাজার হাজারী ভিক্ষা অপেক্ষা কুটীর-বাসীর মুষ্টিভিক্ষারই অধিক ফল, অধিক আদর।

বাঙ্গালার লেখক মহাশয়দিগের নিকট অতি ভয়ে-ভয়ে, অতি সন্তর্পণে এ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া প্রবন্ধের শেষ করিতে চাই। তাঁহারা সকলেই যশস্বী, মহিমান্বিত, উচ্চাসন স্থিত; তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আমার কথায় বিরক্ত হইতে পারেন জানি; তথাপি বঙ্গভাষা যখন আমারও মাতৃভাষা, তখন আমারও এবিষয়ে কথা বলিবার অধিকার আছে মনে করিয়াই বলিলাম।

সাধারণ লোকের ন্যায় কোন কোন লেখকের মনেও যেন কিছু কিছু কুসংস্কার আছে বলিয়া বোধ হয়। কলিকাতার কোন কোন শ্রদ্ধেয় মহারথী আপনার লেখাকে সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য এতই ব্যস্ত যে, কেবল প্রাদেশিকতার আশ্রয় লইয়া তাঁহারা পরিতৃপ্ত নহেন, তাঁহাদের লেখাতে গ্রাম্যতাকে প্রশ্রয় দিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত নহেন। বোধ হয় তাঁহারা ভাবেন, কলিকাতার * গ্রাম্যতাও মফস্বলের লোকের নিকট দেব-দুর্লভ উপাদেয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। অনেক ভাল কথা থাকিলেও যে সকল লেখা এইরূপ দোষে দুষ্ট, মফস্বলের লোকে সে সকল লেখা, পড়া কতকটা সময় নষ্ট করাই মনে করে। এ রোগের ঔষধ, অভিধানকে অতিক্রম না করা, অথবা অভিধানেও পার না পাইলে বর্ণনা দ্বারা ভাব-প্রকাশে যত্ন করা। "নতী" বলিলে দুই আনা লোকে বুঝে। "পলতা" বলিলে চারি আনা লোকে বুঝে, কিন্তু "পটোলপত্র" বলিলে ষোল আনা বাঙ্গালীত বুঝেই, অধিকন্তু ভারতের অনেকেই বুঝিবে; অথচ ইহার ব্যবহারে যে ভাষার কিছু গৌরব-হানি হয়, এমনও নহে। একবার নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষায় কোন কেন্দ্রে শরীর পালনের একটা প্রশ্ন ছিল, "পলতার ডালনা, অর্থ কি?" আশ্চর্য্যের বিষয়, শতাবধি বালকের মধ্যে একজনও ইহার উত্তর করিতে পারিল না, অথচ এই সকল কথা মুখস্থ করিয়া প্রতিবৎসর বঙ্গের নানা স্থানের অসংখ্য বালক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে। বালকদিগের এই আশ্চর্য্য অকৃতকার্য্যতায় বুঝা যাইতেছে, তাহাদের শিক্ষকেরা পর্য্যন্ত কথাটার অর্থ বুঝেন নাই

* কলিকাতার ভাষাকে ঠিক প্রাদেশিক বলা যাইতে পারে না। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাইবে। বঃ সঃ

(সুতরাং বুঝান্ নাই)। ছেলে পড়া শুনা করে, পরীক্ষায়ও পাস হয়, অথচ কিছুই বুঝে সুঝে না, বুদ্ধির স্থূলতা দূর হয় না কেন, এই প্রশ্নের উত্তর কি এখানেই পাওয়া যাইতেছে না?

কাহারও রোগ, উচ্চারণ অনুসারে শব্দের বর্ণ-বিন্যাস করা। এক শব্দের সর্ব্বত্র একরূপ উচ্চারণ নহে। দেও, দাও, দ্যাও; ছিল, ছিলো; প্রয়োজন, প্রিয়োজন, প্রেয়জন; প্রভৃতি, প্রভিতি, প্রভিতি; প্রসাদ, প্রেসাদ, পর্সাদ, পেস্বাদ; ইত্যাদি কত নাম করিব? এখন দেখুন, প্রত্যেক অঞ্চলের লেখকেরা যদি স্ব স্ব উচ্চারণ অনুসারে শব্দের বর্ণ-বিন্যাস করিতে থাকেন, তাহা হইলে অল্পদিনেই সুন্দর সমৃদ্ধ বঙ্গ-সাহিত্য কিরূপ বর্ব্বর-সাহিত্য হইয়া উঠিতে পারে! কিন্তু মফস্বলের লেখকেরা প্রায়ই এ অপরাধে অপরাধী নহেন, তবে ক্বচিৎ কেহ উচ্চাসনের দুরাশায় কলিকাতার অনুকরণ করিতে পারেন, এই যা। দশ বৎসর পূর্ব্বে ঙ "হাম বড়া" হন নাই, তখন তিনি পঙ্গুর ন্যায় অন্যের স্কন্ধে ভর দিয়াই চলিতেন; কিন্তু এই স্বাধীনতার যুগে পরাধীনতা আর সহ্য হয় কি? ঙ এখন জ্যেষ্ঠ চারি সহোদরের মধ্যে দ্বিতীয়ের সংস্রব একেবারেই পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। তবে অন্য তিনজনের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিবেন, তাহা এখনও জানা যায় নাই। যাঁহারা নিজেই চিরদিন "বাঙ্গালী" "কাঙ্গাল" "রাঙ্গা" লিখিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারাই হঠাৎ কি একটা বাতাস পাইয়া ("বাবু" ছাড়িয়া "শ্রীযুক্ত" গ্রহণের ন্যায়) "বাঙালী" "কাঙাল" "রাঙা" * লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু ছোট লোকের বড় পায়া সহ্য হয় কি? যে চিরদিন পরাধীন তাহাকে স্বাধীন হইবার উদ্যম করিতে দেখিলে কেবল ইংরাজের চক্ষুই টাটায় না, আমাদেরও শিরঃশূল উপস্থিত হয়; তাই কোন কোন স্বদেশ-হিতৈষী লেখক 'ঙ'কে একেবারে সমূলে বিনষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে "বাংগালী" "সংকেত" অমংগল" "লংঘন" লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন! আসল কথা কি, জাতীয় জীবন-মরণের কাঠি হাতে লইয়া এমনভাবে ছেলে খেলা করাটা শোভা পায় না। বাঙ্গালী লেখক মাত্রেই ইংরাজী অল্প বিস্তর জানেন। ইংরাজী এক একটী শব্দের বহুরূপ উচ্চারণ আছে; অভিধান সেই সকল উচ্চারণ দেখাইয়া দেয় বটে, কিন্তু সাহিত্য উচ্চারণের অনুরোধে বর্ণ-বিন্যাসে হস্তক্ষেপ করে না। আমেরিকায় সময়ে সময়ে এ ব্যাপার লইয়া কলরব উঠে বটে, কিন্তু উচ্চারণের অনুগত বর্ণবিন্যাস প্রবর্ত্তিত করিলে সাহিত্য-জগতে যে মহাবিপ্লব ও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহারই ভয়ে কেহ অগ্রসর হইতে সাহস পান না। যাহা যুক্তি ও দৃষ্টান্ত উভয়েরই বিরোধী, তাহার জন্য কন্ন-কণ্ডূয়ন কেন? ইংরাজী অতি সঙ্কীর্ণ ভাষা; সকল উচ্চারণ প্রকাশ করিবার বর্ণ তাহার বর্ণমালায় নাই, তথাপি ইংরাজী লিখিবার সময়ে উচ্চারণের দিকে দৃক্পাত না করিয়া বর্ণেরই অনুগমন করে;

* পাঠকবর্গ জানেন আমরা এরূপ স্থলে "ঙ"র পক্ষপাতী। কেন এরূপ করা হইয়া থাকে তাহা ইতিপূর্ব্বে সংক্ষেপে প্রবন্ধান্তরে উল্লেখ করা হইয়াছিল। সময়ান্তরে সে আলোচনা বিস্তারিত ভাবে করিবার ইচ্ছা রহিল। লেখক মহাশয় "ঙ"র প্রতি বিরূপ বলিয়া আমরা এ প্রবন্ধে তাঁহার বানানই ঠিক রাখিলাম। বঃ সঃ।

আর আমাদের ভাষা বর্ণ-সমৃদ্ধির জন্য প্রসিদ্ধ—প্রায় সকল উচ্চারণই আমাদের বর্ণমালা প্রকাশ করিতে সমর্থ, তথাপি আমরা সাহিত্যে সুপরিচিত লব্ধাসন বর্ণবিন্যাসের নিষ্প্রয়োজন পরিবর্ত্তন করিতে যাই!

কাহারও আর একটি দোষ আছে, তাহাকে দুর্ব্বলতা বলিব কি ধৃষ্টতা বলিব বুঝিতে পারি না। ইঁহারা রসিকতা দ্বারা উপহাস উত্তেজিত করিবার জন্য নাটকাদিতে স্থান বিশেষের শব্দগত প্রাদেশিকতার প্রয়োগ করিয়াই ক্ষান্ত হন না, কিন্তু স্বরগত প্রাদেশিকতাটুকু পর্য্যন্ত উদ্ধার করিয়া ছাড়েন। ইহার দুইটি প্রত্যক্ষ ফল; প্রথম এরূপ লেখা সর্ব্বত্র আদরের প্রত্যাশা করিতে পারে না; দ্বিতীয়, এরূপ সাহিত্যে জাতীয় বন্ধন দৃঢ় না হইয়া শিথিল হয়।

যাহা বলা হইল, তাহার ফল অন্য কিছু না হউক, অনেকে লেখককে অকৃপার চক্ষে দেখিতে পারেন। এ সকল দোষ যে সকল লেখকেরই আছে, তাহা নহে; কিন্তু যাহা দোষ, যাহাতে জাতীয় ক্ষতির সম্ভাবনা, তাহা দুই এক জনেরই বা থাকিবে কেন? বাঙ্গালা সাহিত্যের এখনও এমন অবস্থা নহে যে, সে দীর্ঘনিশ্বাসটি না ফেলিয়া দুই এক জন লেখকের বিরহ সহ্য করিতে পারে।

যাঁহারা বাঙ্গালার অনেকগুলি অনাবশ্যক বর্ণ পরিত্যাগ করিয়া, অনাবশ্যক নাসা-কর্ণের উচ্চাবচত্ব চাঁচিয়া ফেলিয়া মুখ খানি সুন্দর গোল পানা করিতে চাহিতেছেন, এবং বাঙ্গালার অভিনব ব্যাকরণের সৃষ্টি করিয়া পাণিনির যশকে মলিন করিবার চেষ্টায় আছেন, তাঁহাদের উল্লেখ করিলাম না, কারণ তাহাদের প্রয়াস শীঘ্রই সিদ্ধ হইবে।

ভাব, রুচি এবং আদর্শ সম্বন্ধে কিছুই বলা হইল না; কারণ সে সব কথা বলিতে হইলে গ্রন্থ হইতে দৃষ্টান্ত চাই, গ্রন্থকারের নাম চাই; কিন্তু জাতীয় সাহিত্যের মহাধর্ম্মদ্ধির বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ যাহাতে সাহস পান নাই, পাঠক মহোদয় আমার মত ক্ষুদ্র লেখকে সে সাহসের প্রত্যাশা অবশ্যই করিবেন না।

শ্রীশরৎচন্দ্র চৌধুরী।

ঐশ্বর্য্য।

ভারতবাসী মাত্রেই এখন ভারতবর্ষের মুক্তির জন্য ব্যাকুল হোয়েছেন কিন্তু ভারতবর্ষ কি জিনিষ, ভারতবর্ষের বিশেষত্ব কি এবং কোথায় ও কিসে সেই বিশেষত্ব প্রতিষ্ঠিত সেটা সবাই পরিষ্কার জানেন না। ভারতবর্ষের বিশেষত্ব আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত, ভগবানে প্রতিষ্ঠিত, অখণ্ড ঐক্যে প্রতিষ্ঠিত, মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত। যার নাম মনুষ্যত্ব বা মানুষের বিশেষত্ব তারই নাম আত্মার বিশেষত্ব। যার নাম আত্মার বিশেষত্ব তারই নাম ঐক্য বা যোগের

বিশেষত্ব। যার নাম অখণ্ড ঐক্য বা পূর্ণযোগ তারই নাম এক সত্য বা ভগবান। এই অখণ্ড এক সত্য ভগবানই ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠা ভূমি এবং সেই ভূমিতে মনুষ্যত্বের চরম বিকাশেই ভারতবর্ষের কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত। যার নাম মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ তারই নাম মনুষ্যেতে এক সত্য বা ভগবানের পূর্ণ প্রকাশ।

মনুষ্য জীবন কেবল আপনার মধ্যে সম্পূর্ণ নয় মনুষ্য ভগবান যোগে সম্পূর্ণ। অচেতন ভাবে স্থাবর জঙ্গম, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, জীব জন্তু সকলেই ভগবানেতে যুক্ত, মনুষ্য সচেতনভাবে এই যোগ উপলব্ধি করবে এইটিই মনুষ্য জীবনের তাৎপর্য্য। এই যোগ অনুভব কেবল ভাবগত হলে সম্পূর্ণ হয় না শক্তিগত হওয়া চাই। শক্তির গতি পরিবর্ত্তিত না হলে ব্যবহারের গতি পরিবর্ত্তিত হয় না, ব্যবহারেতে যোগ অনুভব না চলে যোগ প্রত্যক্ষবৎ সত্য হয় না।

এই যোগ অনুভবেই মানুষের মুক্তি বা আত্মার উদ্ধার। যাতে মানুষের মুক্তি তাতেই ভারতবর্ষের মুক্তি, যাতে আত্মার উদ্ধার তাতেই ভারতবর্ষের উদ্ধার। আমাদের আত্মাকে ত্যাগ ক'রে আমরা কি? এবং আমাদিগকে ত্যাগ ক'রে ভারতবর্ষ কি? ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও আমাদের আত্মার স্বাধীনতা দুই নয়, এক। আমাদের আত্মা উদ্ধার হলেই ভারতবর্ষ উদ্ধার হবে—শুধু ভারতবর্ষ নয় ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ ইতিহাসও উদ্ধার হবে। যার নাম ভারতবর্ষের ইতিহাস তারই নাম জগতের ইতিহাস, যার নাম জগতের ইতিহাস তারই নাম আত্মা বা মনুষ্যত্বের ইতিহাস। আমাদের আত্মা স্বাধীন মুক্ত বা পূর্ণভাবে পরিস্ফুট হলেই আমরা দেখ্‌ব—ভারতবর্ষের সমগ্র ইতিহাস, জগতের আদি অন্ত মধ্য বা ভূত ভবিষ্যত বর্ত্তমান বা সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের সমগ্র ইতিহাস জ্ঞান প্রেম কর্ম্ম একত্র সমন্বয়ের অর্থাৎ মনুষ্যত্বের সমগ্র ইতিহাস তাইতে দেদীপ্যমান।

আত্মার উদ্ধারই ভারতবর্ষের মুখ্য কথা। আত্মাকে লাভ করাই ভারতবর্ষের একমাত্র বিশেষত্ব। এই অসামান্য বিশেষত্বটী ভারতবর্ষের মূলে অর্থাৎ ভারতবাসীর প্রকৃতিতে গভীর ভাবে প্রবিষ্ট থাকা বশতঃই সেই প্রাচীন ভারতবর্ষ আজও লুপ্ত হয় নাই, এত নির্য্যাতনে, এত হীনাবস্থায়, এত দুঃখেও ভারতবাসীর প্রকৃতি এই বিশেষত্বের ভাবটী হারায় নাই। যে মুহূর্ত্তে শিশুর ন্যায় সরলভাবে ভগবানে আত্মসমর্পণের দ্বারা সমস্ত কর্ম্মবন্ধন থেকে মুক্তি লাভ ক'রে, সমগ্র ভারতবাসী কোটী কোটী যুগের পাপ ক্ষয়েতে আপনাদের চিরপুরাতন পরম প্রতিষ্ঠাকে পুনরায় নূতন ভাবে আবিষ্কার করবে সেই মুহূর্ত্তে তারা স্বাধীন হ'বে এবং স্বাধীন হ'বামাত্র দেখবে তাদের কর্ম্ম শক্তির আশ্রয়রূপিনী মঙ্গল শক্তি বা অব্যর্থ তপস্যার বল, লোক চক্ষুর অগোচরে, গোপনে, তাদের জন্য, পূর্ব্বেই ভারতবর্ষে সঞ্চয় হতে আরম্ভ হয়েছে।

শক্তিই সত্য বা বস্তু বা অস্তি, অশক্তিই মিথ্যা অবস্তু বা নাস্তি। শক্তির পূরণেই আত্মার প্রকাশ, শক্তি অভাবেই আত্মা অপ্রকাশ। যাঁর নাম আত্মা বা বস্তু বা সত্য তাঁরই প্রকাশ শক্তি বা শক্তিতেই তাঁর প্রকাশ। যার নাম স্বার্থপরতা তারই নাম শক্তিহীনতা, যার নাম

নিঃস্বার্থতা তারই নাম শক্তির পূর্ণতা। শক্তিহীন দয়ার কার্য্যে অসমর্থ, শক্তিহীন ভক্তিতেও অসমর্থ। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ত্যাগেই প্রেম ভক্তির প্রকাশ। যার নাম প্রেম তারই নাম ভক্তি, তারই নাম ত্যাগ, তারই নাম শক্তির পূর্ণাবস্থা। মনুষ্যের এই অবস্থাতেই আত্মা বা ব্রহ্ম বা সত্য মনুষ্যেতে মুক্ত বা স্বাধীন ভাবে প্রকাশমান। এই মুক্ত বা স্বাধীন আত্মার শক্তিরই নাম মঙ্গল শক্তি। মঙ্গল শক্তিই ভারতবর্ষের একমাত্র ঐশ্বর্য্য। মঙ্গলশক্তি লাভ করেই এক সময়ে ভারতবর্ষ, এই প্রকাশমান সৃষ্টির বা সৃষ্টিনামীয় এই প্রকাশ সমষ্টির অমরত্ব ঘোষণা করেছিল। অমরত্বই কি জগতের বা মনুষ্যের পরম ঐশ্বর্য্য নয়? অমরত্ব ভোগই কি ঐশ্বর্য্যের চরম ভোগ নয়? অমরত্ব বা মঙ্গলশক্তি বা আত্মা বা ভগবানকে লাভ করবার জন্য একান্ত ভাবে যত্নবান হওয়া আমাদের সকলেরই এখন বিশেষ কর্ত্তব্য, এ ছাড়া ভারতবর্ষ বা ভারতবাসীর উদ্ধারের আর দ্বিতীয় উপায় নাই।

কোন্ শুভক্ষণে ভারতবর্ষ বা ভারতবাসী সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে—মনুষ্যমাত্রকেই স্বাধীনতার অধিকারী করে জগতে অক্ষয়কীর্ত্তি ও মনুষ্যে অতুল আনন্দ প্রতিষ্ঠিত করবে? এক সত্যের অপূর্ব্ব মহিমা মানুষের কাছে প্রত্যক্ষ প্রকাশ হবে? মানুষ দেখবে যিনি অন্তরে প্রকাশমান তিনিই বাহিরে প্রকাশমান যিনি বাহিরে প্রকাশমান তিনিই অন্তরে প্রকাশমান। যিনি বা যাহা বাহিরে সৌন্দর্য্য তিনি বা তাহাই অন্তরে প্রীতি, যিনি বা যাহা বাহিরে মঙ্গল, তিনি বা তাহাই অন্তরে আনন্দ, যিনি বা যাহা বাহিরে স্থিতি, তিনি বা তাহাই অন্তরে শান্তি, যিনি বা যাহা বাহিরে ভৌতিক বীর্য্য বা অগ্নি, তিনি বা তাহাই অন্তরে আধ্যাত্মিক বীর্য্য বা মঙ্গলশক্তি, যিনি বা যাহা বাহিরে ভৌতিক প্রকাশ বা আলোক, তিনি বা তাহাই অন্তরে আধ্যাত্মিক প্রকাশ বা জ্ঞান। অন্তর বাহির সমষ্টিকে নিয়ে একই সত্য নিত্যকাল যাহা তাহাই প্রকাশ পাচ্ছেন বা বিরাজ করছেন।

ভগবানকে আমরা স্মরণ করি ভগবানকে আমরা আরাধনা করি ভগবানকে আমরা ধ্যান করি, আমাদের অন্তর বাহ্য এক কোরে তিনি পূর্ণরূপে প্রকাশিত হোন্, ক্ষুদ্র বৃহতে একই সত্য আমাদের নিকটে অখণ্ডরূপে ভাসমান হোক্। যে চেতনায় এটী উপলব্ধ যে জাগরণে এটী দীপ্ত সেই উৎকৃষ্ট চেতনায় ভগবান আমাদিগকে চেতন করুন, সেই মহা জাগরণে ভগবান আমাদিগকে জাগ্রত করুন, ইহলোকের শ্রেষ্ঠগতি ও পরলোকের শ্রেষ্ঠগতি একই যোগে লাভ ক'রে আমাদের মনুষ্য জন্ম সার্থক হোক্।

ওঁ শান্তি।

শ্রীমতী হেমলতা দেবী।

অঙ্কের প্রতিমূর্ত্তি বা লিখনপ্রণালী।

জগন্মণ্ডলের যাবতীয় কার্য্য গণিতের জ্ঞান সাহায্য ব্যতীত সুসম্পন্ন হইতে দেখা যায় না। মূর্খ ব্যক্তিকেও অন্তত শত সংখ্যা জানিতে হয়। স্ত্রী লোকের পক্ষেও কয় কুড়ী কয় বুড়ী জানা আছে, অথবা নাই, ইহা রহস্য স্থলেও জিজ্ঞাসা করার রীতি আছে। যেখানে প্রথম সভ্যতার সৃষ্টি বা আরম্ভ হইয়াছে তথায় অঙ্ক দ্বারা গণনা আরম্ভের কথা শুনা যায়। ভারতবর্ষীয় ঋষিবর্গ করতল মধ্যে ত্রিকালের গণনা করিতেন। তাঁহারাই জগতের আদিম সভ্য। অঙ্গুলী সঙ্কেত দ্বারা প্রথমে অঙ্কের সমাধান হইলেও উহার অবয়ব সংস্থানে হস্তের সহায়তা নিতান্তই আবশ্যক। উহার প্রক্রিয়া তাঁহারই আবিষ্কার করেন। তদনুসারে গণনা ও অঙ্ক পদ্ধতির প্রতিমূর্ত্তি বা আকার প্রকার অর্থাৎ অবয়ব সংস্থান কার্য্য যাহাকে আমরা সচরাচর সাঙ্কেতিক চিহ্ন কহিয়া থাকি তাহা হস্তের অঙ্গুলী দ্বারাই হইয়াছিল, ইহা নিঃসংশয়ে কহিতে পারা যায়। যথা—

মৈত্রেয়স্য প্রশ্নঃ।

কুহিমেকবনজতথাং সঙ্কেতকং কথং করৈঃ।
গতিস্তস্য চ রূপঞ্চ যথাধর্ম্মং যথাক্রমং। ১

ব্যাসস্যোত্তরং।

সুমানবংশ নরনৈঃ প্রদর্শয়তি চীম্বিতং।
করয়োরঙ্গুলীভিশ্চ মূকবোধায় কেবলং। ২

একত্বে তর্জ্জনীং বিদ্ধি দ্বিত্বং মধ্যময়া সহ।
ত্রিত্বমনামিকাভ্যাঞ্চ চতুষ্কত্বং কনিষ্ঠকৈঃ। ৩
(কনিষ্ঠাভ্যাং চতুষ্টয়ঃ) পাঠান্তরং
পঞ্চাঙ্গুলীভিঃ পঞ্চত্বং সব্যোঃষষ্ঠাদিকস্তথা।
তত্রমধ্যময়া সপ্তাষ্টমমনাময়াপি চ। ৪
কনিষ্ঠাভির্নবকঞ্চ সব্যাঙ্গুষ্ঠৈর্দশত্বকম।
প্রদর্শ্যন্তেচ * চিহ্নানি তথা নামানি বেত্তসৈঃ। ৫
শিশোর্বোধ সৌকর্য্যার্থমেকত্বাদিকসংজ্ঞকাঃ।
প্রত্যক্ষবস্তুভিঃ সার্দ্ধং নামানি চ তথৈবতু। ৬
প্রদর্শ্যন্তে চ মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভি যথাযথং। ৬
একত্বে চন্দ্রমাজ্ঞেয়ো দ্বিত্বেপক্ষযুগাদয়ৌ।
ত্রিত্বে নির্দ্দিশ্যতে নেত্রং বেদাশ্চতুষ্টয়েঽপিচ।
ঋতবোহিপুত্রাঃষট্কে বাণাঃ পঞ্চসুনিশ্চয়ং।
সপ্তসুচার্ণবাজ্ঞেয়া দশস্বেপি দিশস্তথা।
এবং সঙ্কেতকং জ্ঞেয়ং তিথিবারাদিকৈঃ সহ।

ভাস্করাচার্য্য।

এক এই অঙ্ক অথবা একত্ব জ্ঞাপক পদার্থের সঙ্কেত-স্থলে আমরা তর্জনী দ্বারা একত্ব নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। যথা—

। (একদাঁড়ি) অর্থাৎ একটী সরল রেখা, উহাকে এক কহা যায়। ঐ সরল রেখাকে একটু হেলাইয়া ধরিলে বাঙ্গালা ভাষার একপণ (/) হয়। ঐ সরল রেখার পরিবর্ত্তে এক খণ্ড বেত উভয় পার্শ্বে বক্রভাবে রাখিলে বাঙ্গালা ভাষার এক (১) এই অখণ্ড অঙ্ক হইয়া থাকে।

তর্জ্জনী ও মধ্যমাকে একত্র করিলে দুই (২) হয়। তখন উহাকে সরলভাবে গ্রহণ করিলে দুই দাঁড়ীর আকারে (॥) দুই এই

* (প্রদর্শয়তি) (প্রপঞ্চস্তিচ) ইতিচ পাঠদ্বয়ং কচিৎ দৃশ্যতে।

অঙ্ক নির্দ্দেশ করা যায়। উহারই উর্দ্ধাধভাবে দুই সরল রেখায় কোণ উৎপাদন করিলে দুই এই অখণ্ড অঙ্কের প্রতিকৃতি উৎপন্ন হইতে আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না; তবে একটু মাত্রা দিতে হয়। ১ এক এই বক্রবেতের নিয়ে এক-খানি—সরলবেত রাখ, যোগে দুই হইবে।

তিন এই অঙ্ক যে সঙ্কেত বা চিহ্ন দ্বারা হইয়া থাকে উহা তর্জ্জনী মধ্যমা ও অনামিকা যোগে সমুৎপন্ন হয়। উহা তিন দাঁড়ী বা তিন সরল রেখায় অর্থাৎ উর্দ্ধাধভাবে দুইটী ত্রিভুজে দুইটি কোণ সংস্থাপন করিলে, তখন তিন এই অঙ্ক হয়। পূর্ব্বকালে তিন (ও) এই আকার ছিল। এখন কণিশ (শীষ অর্থাৎ শুঁয়া) ছাড়িয়া গিয়া (৩) এইরূপ হইয়াছে।

⧗ ৪ চারি এই অঙ্ক অথবা উহার প্রতিকৃতি তর্জ্জনী মধ্যমা অনামিকা ও কনিষ্ঠার সংযোগে সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। মহাজনীর ব্যবহারে চারিটী সরল রেখাতেই দেদীপ্যমান হইয়া অবস্থিতি করে। দুই সরলরেখা উর্দ্ধাধভাবে সংস্থাপন কর ঐ দুই সরলরেখার কোণাকুণী প্রান্তে বিপরীত ভাবে অর্থাৎ ডমরুর আকারে সংস্থাপন কর বাঙ্গালা চারি দেখিতে পাইবে।

এক হাতের পাঁচটী অঙ্গুলী দ্বারাই পাঁচ এই অঙ্কের উৎপত্তি হয়। মহাজনেরা চারি দাঁড়ীর উপরে কোণাকুণীভাবে আর একটা ঋজুরেখা সংস্থাপন করিয়া পঞ্চুড়ীর অঙ্ক দেয়। বাঙলা ভাষায় পাঁচের অঙ্ক দেবনাগরের সহিত সামান্য ইতর বিশেষ মাত্র। সূক্ষ্মদৃষ্টিতে অবলোকন করিলে উহার মধ্যে পাঁচটী রেখা দৃষ্ট হইবে। চারিটি সরল রেখা ও একটী বক্র-রেখা। চিহ্ন পাঁচের মধ্যে ৫ পাঁচ এই অঙ্কের পাঁচটী রেখা আছে। তন্মধ্যে দুই সরলরেখায় দক্ষিণাবর্ত্তে একটী বহিঃকোণ ছিল। পরে বামাবর্ত্তে ও দক্ষিণাবর্ত্তে উভয়দিকে বেতসের আকারে বক্র হইয়াছে। ছয় এই অঙ্কের সমান করিবার সময় এক হস্তের পঞ্চাঙ্গুলীর সহিত অপর হস্তের একটি অঙ্গুলীযোগ করিলেই হয়। এইখানে মহাজনেরা দ্বিতীয় পঞ্চুড়ী আরম্ভ করিয়া থাকে।

সপ্তম অষ্টমাদি অঙ্কের উদ্ভাবন কার্য্য সব্য হস্তের অঙ্গুলীর সাহায্যেই সমাধা হয়। মহাজনীর ব্যাপারে দ্বিতীয় পঞ্চুড়ীর অঙ্ক পৃথক্ হইলেও পরে এক পঞ্চুড়ীতেই অপর কোণে সরলরেখা দেয়। তাহাতেই দুই পঞ্চুড়ীর অর্থাৎ দ্বিগুণ পঞ্চের (দশ অঙ্কের) বিশেষ জ্ঞান হইয়া থাকে। এখন নিম্নে সঙ্কেতগুলি বিবৃত হইল।

এক	দুই	তিন	চারি
I	II	III	IIII
তর্জ্জনী ১	(১) তর্জ্জনী ও মধ্যমা (২)	তর্জ্জনী ১ মধ্যমা ২ অনামিকা ৩	তর্জ্জনী ১ মধ্যমা ২ অনামিকা ৩ কনিষ্ঠা ৪

পাঁচ

ছয়
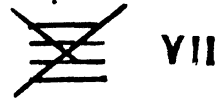
VI

সাত

VII

তর্জ্জনী মধ্যমা অনামিকা কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ।

সব্য হস্তের তর্জ্জনী যোগে

সব্য হস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমা যোগে।

আট

নয়

IX

দশ
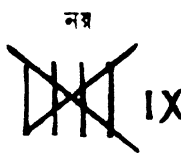
সব্য হস্তের তর্জ্জনী মধ্যমা ও অনামিকা যোগে

সব্য হস্তের তর্জ্জনী মধ্যমা অনামিকা ও কনিষ্ঠার যোগে।

এইখানে দ্বিপঞ্জুড়ী করে।

এখন এই সকল সরল রেখা হইতে সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে অঙ্কের যে যে আকার প্রকার দাঁড়াইয়াছে মূল নির্দ্দেশ করিতে গেলে এই প্রকার হয় যথা :—

(।) অথবা (১) সরল বেত খণ্ডকে বক্রভাবে ধর ঠিক ঐরূপ বঙ্গীয় একের আকার হইবে।

(॥) দুই দাঁড়ী অথবা (২) এখন একের নিয়ে সরল বেত্রখণ্ডকে যোগ কর, দুই এই অঙ্কের প্রতিকৃতির ব্যাঘাৎ জন্মিবে না।

(।।।) তিন অথবা (৩) পূর্ব্বকালের (তিন) তিনটী বক্র রেখা দ্বারা উৎপন্ন। এখন তিন সরল রেখা একত্র যোগে গোল হইয়া =(৩)

।।।। আকার দেখ চারি সরল রেখা যোগে এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যথা X = বক্রভাবে (৪)

পঞ্চ, পাঁচ বা পঞ্জুড়ী হস্ত প্রসারণ করিলে ঐ এই সকলরূপ হইবে। অথবা তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলের প্রসারণে পঞ্জুড়ী হয়। এখন বাঙ্গালা পাঁচের অঙ্কেও ঠিক পাঁচটী সরল রেখা দেখাইবে। যথা (৫)=K উপরের দুই ঋজুরেখার বর্দ্ধিতাংশ উভয় পার্শ্বেই ছিন্ন হইয়াছে। বামভাগের মধ্যাংশে সরল রেখাটী বক্রভাবে পতিত হইয়াছে। দক্ষিণ ভাগের আকৃতিতে একটী বহিঃকোণ দেখা যাইতেছে। সুতরাং উহা দুই সরল রেখার যোগ কহিতে

হইবে। পাঁচটী রেখার সম্পাত দেদীপ্যমান ভাবেই পাঁচ এই অঙ্কের উৎপত্তি বলা যাইতে পারে।

(৬) ছয় এই অঙ্কের উৎপত্তি বিষয়ে নিম্নলিখিত ক্রম দেখা যায়। তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের সহিত সব্যহস্তের তর্জনীর যোগ সব্য হস্তের তর্জনীর সন্নিবেশে ছয় হইল। বাঙলা (৬) এই অঙ্কের ভাবগতিক
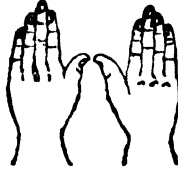
পর্য্যালোচনাকর দেখিতে পাইবে। ছয়টী সরল রেখা ক্রমে বক্র আকৃতি ধারণ করিয়াছে। ছয়=(৬)

৭। সাত এই অঙ্ক পঞ্জুড়ি ও সব্যহস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমার যোগে উৎপন্ন। যথা এখন বাঙলা সাতের অবয়বে সাতটী রেখা গণিয়া লও। সপ্ত ঋজুরেখার সংক্রমে বক্রভাবে পরিবর্ত্তনে এখনকার বর্ত্তমান (৭)

আট (৮) এই অঙ্কের প্রতিরূপে এক পঞ্জুড়ী এবং তর্জ্জনী মধ্যমা ও অনামিকার যোগে। যথা বর্ত্তমান আটের অবয়বে যদিও এখন তৎসংখ্যক রেখা গণিতে গেলে দেখা যায় না কিন্তু তাহা ছিল যথা ৮= আটটী সরল রেখার সম্পাতে আটের বর্ত্তমান আকৃতি আট (৮)

(৯) নয় এই অঙ্ক যে পঞ্জুড়ীর সঙ্গে সব্যহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠকে বাদ দিয়া ধরিলেই নয় এই অঙ্কের উৎপত্তি হয়। যথা এখন বাঙলা (৯) এই অঙ্কের লক্ষণ দেখ। অবশ্যই নয়টি সরল রেখার সমষ্টি দেখা যাইবে। যথা -

নয় = ৯

ছয় সাত আট নয়ের পুরণাঙ্কে সর্ব্ব দেশীয় সভ্যেরাই তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠকে রাখিয়া অন্যাঙ্গুলীকে মুষ্টিতে বদ্ধ করিয়াছেন; সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করিলে দশের অঙ্কেও দশটী সরল রেখা দেখিতে পাইবে। যথা দুই পঞ্জুড়ী। দক্ষিণ ও বাম হস্তের সমুদায় অঙ্গুলীর যোগে। কিন্তু উহা উত্তানভাবে বজ্রাকৃতির অনুরূপ। বজ্রাকৃতি করিবার সময় করতল পৃষ্ঠদ্বয়কে উপর্য্যধোভাবে বজ্রাকৃতিতে যোগ করিতে হয়; সুতরাং করতলদ্বয়ের অঙ্গুলিবন্ধনে এইরূপ হইয়া থাকে এখন দেখা যাইতেছে বজ্রাকৃতি রাখিয়া অপরাংশগুলি বাদ পড়িয়াছে।

পাশ্চাত্য গণিতের অঙ্কে এই সমুদায়েরই অবয়ব কোন অংশে কিয়ৎ পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে মাত্র। কিন্তু পূরণবাচক শত সংখ্যাকে হস্তের ও অঙ্গুলীর আকৃতিতেই

সমুদায় সুসম্পন্ন হইয়াছে বলিতে হইবে। ইহা কেহ অপহ্নব করিতে পারেন না।

এখন দেখা যাউক খণ্ডাংশে অঙ্গুলী সঙ্কেত দ্বারা ক্রিয়া সাধন হইয়া থাকে অথবা প্রকারান্তরে সাধ্য হয়। দেখা গেল যে খণ্ডাংশেও পূর্ব্ব প্রণালীর নিয়মের বিশেষ ব্যতিক্রম হয় নাই। খণ্ডাংশের নাম ভগ্নাংশ।

ষোড়শভাগের একাংশকে এক আনা (/০) তাহার প্রতিকৃতি অগ্রেই বলা হইয়াছে।

ঐরূপে দ্ব্যংশকে দুই আনা (৵০) নির্দ্দেশ করা যায়। তদনুসারে এক আনার বামভাগে একটী ক্ষুদ্র বক্ররেখা একপণে সংযোগ করিলে দুই পণ বা দুই আনা হয় (৵০)

তিন পণের অঙ্কে অখণ্ড তিনটী সরল রেখা বিদ্যমান আছে। যথা ৶=॰ তবে প্রথম রেখাটির শুঁয়া আছে, তাহার বক্রতায় (৶০) এইরূপ লেখা যায়।

চারি পণে এক চোখ বা একের পাদাংশ। "চোখ" এই শব্দের "ে" স্থানে "খ" হইয়াছে। তাহাতেই এক চোখে একদাঁড়ী কিম্বা উর্দ্ধাধোভাবে সরল একদাঁড়ী ও একটী বিন্দু ঐ দাঁড়ির দক্ষিণাংশে অবস্থান করে। একচোখ=(।০)

(।/০) (।৵০) (।৶০) পাঁচ প্রভৃতি পরবর্ত্তী অঙ্কের পাদাংশের সহিত দক্ষিণদিকে একআনা, দুই আনা, ও তিন আনার সঙ্কেত যথাক্রমে যোগ করিলে পাঁচ ছয় ও সাত পণ বা আনার আকার ধারণ করে।

আটপণে এক এই অখণ্ড অঙ্কের অর্দ্ধ মাত্রা। সুতরাং দুই চোখের উপর এক শূন্য (বিন্দুর) যোগ দিতে হয়।

(॥/০) (॥৵০) (॥৶০), নয়, দশ, এগার পণের অঙ্ক পূর্ব্বানুসারে দুই চোকের পরবর্ত্তী হইয়া বার পণে তিন পাদ বা তিন পোয়া হয়। উহার প্রতিরূপ N দুই উর্দ্ধ ঋজু রেখার মধ্যাংশে কোণ উৎপাদক ঋজু রেখার সংযোগ=৸০ ৸/০ ৸৵০ ৸৶০ পণের কথা বোধ হয় পাঠকবর্গকে বুঝাইতে হইবে না।

এখন দেখা যাইতেছে ছটাক কাঠা ও সের প্রভৃতির অঙ্ক লিখিবার সময় অখণ্ডাংশের পাঁচমাত্রায় এক দাঁড়ী অর্দ্ধাংশে দুই দাঁড়ী ত্রিপাদ পরিমাণ স্থানে তিন চোখ। সংপূর্ণতায় এক এই অখণ্ড অঙ্কেরপ্রতিকৃতি লেখার রীতি আছে। যথা চারি ছটাকে এক পোয়া। পাঁচ কাঠায় এক পোয়া। দশ সেরে এক পোয়া হয়। সুতরাং ভগ্নাংশ সকল; পণের অঙ্কেও সমাধান হয়। ইত্যাদি ইত্যাদি।

এখন তিন এই অঙ্কের বিবরণ লিখিতে গিয়া স্থির হইল যে পুরাকালে "ও" এইরূপে তিন লেখা হইত। ঐ 'ও" দর্শনে কোন সময়ে কোন এক বিদ্যাদিগ্‌গজ পণ্ডিত, বৈদ্য-রাজের প্রদত্ত ঔষধের ফর্দ্দ লইয়া ঔষধ বিক্রয়-কারী গন্ধ বণিকের দোকানে যান। তথায় তৎকালে প্রচীণ দোকানদার উপস্থিত ছিল না। অর্ব্বাচীন বালক দোকানদারকে ঐ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কহিলেন অরে আও তোলার অমুক মশলা দে। "ও" তোলার মৃগমদ (কস্তুরি) "ও" তোলার ধাত্রী "ও" তোলার অভয়া "ও" তোলার বিভীতকী "ও" তোলার নাগর ইত্যাদি ইত্যাদি,। আমরা "ও"এই অক্ষরের উচ্চারণ সৌকর্য্যার্থে ইহার পূর্ব্বস্থানে

আকার যোগ করিয়াছি, পাঠকগণ দোষ মার্জ্জনা করিবেন। অর্ব্বাচীন বালকদোকান দ্বার ঐ প্রকার পরিমাণ জ্ঞাপক বাটকারা খুঁজিয়া পাইল না। সুতরাং হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া থাকিল। পরে যখন বিপণি স্বামী উপস্থিত হইল তখন সে তাহার পুত্রকে কহিল ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বসাইয়া রাখিয়া অনর্থক বেচা কেনা বন্ধ রাখিয়াছিস কেন। সে বলিল আমি বেচা কেনা বন্ধ করিয়া খেলা করিতেছি না। শঙ্খ, জোংড়া, পাতর; ও ঘণ্টার নাদ দেখিলাম রতি, ধান, মাসা, প্রভৃতির বাটখারা তাহার মধ্যে আছে কিন্তু "ণ্ড" এই মাপের কোন বাটকারা পাইলাম না ইহা শুনিয়া কর্ত্তা কহিল কৈ ফর্দ্দ দেখি। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তখন "বৈদ্যরাজের ফর্দ্দটী এই" বলিলে বিপণি স্বামী দেখিয়াই কহিল, মহাশয় এত আ(ণ্ড) নয় এ যে তিনের অঙ্ক(৩)। কবিরাজ সহজে বুঝিবার নিমিত্ত উহার পরে তোলা শব্দ স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিয়াছেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় অবাক হইলেন, এবং কহিলেন আমি এখন ঔষধ লইব না। তুমি আমায় জ্ঞান দিলে। আমি রামকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় খুড়ার বাটীতে চণ্ডী পাঠে ভুল করিয়াছি। তথায় যাইতে হইবে, নতুবা উভয় পক্ষের অমঙ্গল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় চণ্ডী পাঠের কল্পিত ভ্রান্তি নিরাস জন্য বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন এবং নিজকৃত কল্পিত দোষ খণ্ডন মানসে গৃহস্বামীর ভগিনীকে কহিলেন, পিসি মাতা শীঘ্র পুনরায় চণ্ডী পূজার আয়োজন কর। আমি পুনর্ব্বার চণ্ডী পাঠ করিব। পিসী কহিলেন বাবা আবার কেন? একবার ত পাঠ করিয়াছ।

ভট্টাচার্য্য বলিলেন তাহাতে দুই একটী স্থানে অশুদ্ধ হইয়াছে। এবারে শুদ্ধ করিয়া পাঠ করিতে হইবে। নতুবা উভয় পক্ষের অকল্যাণ ঘটিবার সম্ভব। পিসী কহিলেন বাবা তুমি পা ধোও। চৌকীতে বৈশ। আমি এখনি পূজার উদ্যোগ করিতেছি। পূজার উদ্যোগ হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় যথাবিধি সংকল্পকরণান্তে,

"অকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরায় নারায়ণায় নমঃ।"

ইত্যাদি নমস্কার মন্ত্রের পাঠটী অগ্রে দোকানদারের উপদেশানুসারে সংশোধন করিয়া পাঠ করিলেন। যথা

অকা'ণ্ড' স্থলে অকা তিন(৩) ব্রহ্মা'ণ্ড' স্থলে ব্রহ্মা তিন (৩) ভাণ্ডোদর স্থলে ভা তিন (৩) পাঠ করিলেন। পরে যখন "চণ্ড মুণ্ড বধে দেবী" পাঠ দেখিলেন যখন চণ্ড স্থলে চ×৩, মুণ্ড স্থলে মু×৩ এইরূপ সমুদয় "ণ্ড" স্থলে (৩) এই প্রকার পাঠ পরিবর্ত্তন করিয়া কল্পিত ভ্রম সংশোধন করিলেন। এবং পিসী মাকে শুনাইবার জন্য অকা(৩) ব্রহ্ম(৩) ভা(৩) চ(৩) মু(৩) এইরূপ, সুস্বরে তিনবার পাঠ করিয়া চণ্ডীর দক্ষিণা করিলেন। কিন্তু ও কথায় প্রয়োজন আর দেখা যায় না। তিন এই অঙ্কের পরিবর্ত্তন যে "ণ্ড" হইয়াছে তাহাই দেখান প্রধান উদ্দেশ্য।

ইংরাজী অঙ্ক ও রেখা মাত্র যথা। 1, 2, 3, 4 5 6 7(1) হইতে (5) ১ হইতে ৫ পর্য্যন্ত অঙ্কের রেখা গুলি সহজ সরল রেখা। ছয় ও সাত এই দুই অঙ্কে ছয় ও সাতটী রেখা যথাক্রমে ছিল এখন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে আটের অঙ্কে পূর্ব্বে আটটি রেখা দৃষ্ট হইত এখন গোল হইয়াছে। Nine বা নয় এই অঙ্কে নয়টী

সরল রেখা ছিল এখন পরিবর্ত্তনের দাঁড়াইয়াছে ৭।

অঙ্গুলী সংকেতে একম্বাদি চিহ্ন প্রদর্শিত হইয়া থাকে। এবং উহাতেই অঙ্কের রূপ নির্দ্দেশ সুসমাহিত হইয়াছে।

গ্রীক্‌ও রোমকগণ যে ভারতবর্ষীয়দিগের নিকট গণিতের সাহায্য লইয়াছিল তাহার প্রধান প্রমাণ এই।

তাহাদিগের নিকট হইতে ও অন্যান্য জাতিরা লইয়াছে। তাহাতে কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। যাহা পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহাও ভারতীয়দিগের অঙ্গুলী সংকেতের রূপান্তর মাত্র। যথা।—

৫ = V পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে।

১০ = X পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে।

X আমাদের বজ্রাকৃতি। তাঁহারা ৫০ সংখ্যা লিখিবার সময় L (এল্) লেখেন এলের প্রকৃতি দেখ পঞ্চচূড়ীরই রূপান্তর মাত্র। ইহাতে পাঁচটী রেখাও গণিয়া পাইবে L আমাদের পঞ্চচূড়ীর বিপরীত ভাব।

৫০০ = D ডির অবয়বে দক্ষিণাবর্ত্ত কোনটী D ধনুরাকারে জ্যা সংযোগে ৫০০ অঙ্কের সংখ্যা নির্দ্দেশ হইয়াছে।

১০০সংখ্যাকে C রোম্যানদিগের অক্ষর; যদ্বারা তালব্য শ উচ্চারণ হইয়া যায় উহাই শত সংখ্যক রাশির সংকেত। রোম্যান ভাষায় Cent কহে। সুতরাং C শতের সাংকেতিক চিহ্ন। সেণ্টের আদ্যক্ষর।

M = ১০০০ সহস্র সংখ্যার পরিমাণ স্থলে রোমানের M (এম্) লেখেন। এমের প্রকৃতি দেখ M এম এই অক্ষরে দশটী রেখার সংযোগ আছে সুতরাং সহস্রকে আর বাধা হইল না। M অঞ্জলির বিপরীত ভাব মাত্র।

শ্রীলালমোহন বিদ্যানিধি।

রাজতপস্বিনী।

[জীবনী-প্রসঙ্গ।]

২৪

এই ক্ষুদ্র লেখকের প্রতি মহারাণীমাতার অপত্যনির্ব্বিশেষ স্নেহ এবং বিশ্বাস ছিল বলিয়া তাঁহার হিতকামনায় সময়ে সময়ে ছুটিয়া দরবারের রাজনীতিতে যোগদান আমার পক্ষে অনিবার্য্য হইয়া উঠিত। জীবনের সেই পূর্ব্বাহ্ণে সচরাচর আমি সাহিত্যালোচনা এবং স্বদেশের

এক আধটু কাজ লইয়া থাকিতাম—জমীদারীর চাণক্যনীতিকে পদ্মার আবর্ত্ত তুল্য দূর হইতে পরিহার করাই শ্রেয়স্কর মনে করিতাম। কিন্তু কুমার মহাশয়ের বিবাহের পর তাঁহার শ্বশুর কুলের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে যে নূতন শক্তি প্রাথমিক বর্ষার গৈরিক প্রবাহতুল্য রাজ-সংসারকে আন্দোলিত করিয়া তুলিল, তাহাতে কাহারও শান্তি ছিল না। পিতৃদেব মহাশয় পেন্‌সন গ্রহণ করিলেন—স্বয়ং মহারাণী একে একে সমস্ত ক্ষমতা কুমারের হস্তে ছাড়িয়া দিয়া কাশীবাসের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। এ অবস্থায় যেরূপ ঘটিয়া থাকে, অধিকাংশ লোক মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও কর্ত্তব্য ভুলিয়া নিজের নিজের পথ দেখিতে লাগিল। সুতরাং তাঁহার হিতাকাঙ্ক্ষীদের পক্ষে নীরবে দূর হইতে তরঙ্গ গণনা আর সমীচীন বোধ হইল না। এই সময়ে এক এক দিন নানা প্রতিকূলাবস্থায় তাঁহার চিত্ত বিক্ষোভ লক্ষ্য করিয়া আমার মনে হইত—

হিমানীর দেশে রাজে সেই বিহঙ্গিনী,
কে গ্রীষ্মে আনিয়া তারে পূরেছে পিঞ্জরে!

কুমারের শ্বশুর ভুবন রায় মহাশয় জামাতৃ গৃহে প্রবেশ করিয়াই রাজসংসারের সংস্কার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বিবাহে অনেকগুলি টাকা ঋণ হইয়াছিল। তাহা শোধের জন্য মহারাণী মাতাও তাঁহার কর্ম্মচারী বৃন্দ চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু রায় মহাশয়ের ধারণা হইয়াছিল, ঢাকা অঞ্চল হইতে নূতন ম্যানেজার কেহ না আসিলে সুশৃঙ্খলা হইবে না। কুমারকে সেই পরামর্শ তিনি দিতে লাগিলেন। দুই চারিবার শুনিয়া শুনিয়া তিনি ইহার প্রতিবাদ করিলেন এবং শ্বশুরকে স্পষ্টই বলিলেন যে এতদিন অত বড় ষ্টেট কি করিয়া সুখ্যাতির সহিত পরিচালিত হইয়াছে? আর রাজশাহীতে কি লোক নাই যে ঢাকার শরণাপন্ন হইতে হইবে! উত্তরটা অবশ্য ক্ষমতা-প্রিয় হিতাকাঙ্ক্ষী শ্বশুরের কটু শুনাইল। তিনি বুঝিলেন কুমার উপলক্ষ্যমাত্র, বামু সরকারই সদলে তাঁহার অভীপ্সিত সংস্কারে বাধা জন্মাইতেছে। উভয় দলে মনোমালিন্যের সেই সূত্রপাত। রায় মহাশয় কুমারকে জেদ করিয়া ধরিলেন যে তাঁর পরামর্শ মত কাজ করিতেই হইবে। ইহার ফলে শ্বশুর জামাইয়ে উত্তরোত্তর তারি একটা অসদ্ভাব বাড়িয়া চলিল।

এখানে বলা আবশ্যক যে ভুবন রায় মহাশয় এই প্রসঙ্গের নগণ্য লেখককে প্রথম হইতে স্নেহের চক্ষে দেখিয়াছিলেন। সেই প্রীতি সূত্রে অনেকবার আমি বিভিন্ন দলের মধ্যে মিলন চেষ্টা পাইয়াছিলাম। কিন্তু এই চিত্র আঁকিতে বসিয়া সেই সব ব্যক্তিগত বাধা বাধকতাকে আমি প্রাধান্য দিতে অসমর্থ ইহা বলা বাহুল্য। যাহা প্রকৃত, জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে তাহাই বলিতে বসিয়াছি। নিজের মতামত অথবা পক্ষপাত কিম্বা বিদ্বেষভাবের স্থান এখানে নাই।

রায় মহাশয় প্রথমেই যে ভুল করিয়া বসিলেন, কুমারের জীবন কালে তাহার আর অপনোদন হইল না। ভুবনবাবু নিজে প্রবীণ হইলেও তাঁহার এক সম্পর্কীয় যুবক অবনী ভট্টাচার্য্যের পরামর্শে চলিতেন। এই যুবা কুমার মহাশয়ের সহিত বিবাহ সম্বন্ধে গোড়া হইতে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন, কাজেই বিবাহের পর লোকচক্ষে তাঁহার একটা প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। গরিব ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণের

ছেলে সেটা অনুভব করিয়া কিছু অহঙ্কৃত হইয়া উঠিলে এবং কিছু দিন পূর্ব্বে যাঁহাদের সহিত আলাপ করিতে পাইলে কৃতার্থ হইত তাঁহাদের সহিত উদ্ধত ব্যবহার করিতেও আর কুণ্ঠিত . হইত না। এরূপ পরামর্শদাতার মন্ত্রিত্বে রায় মহাশয়কে প্রথম হইতে লোকের অত্যন্ত বিরাগভাজন হইতে হইয়াছিল।

জামাতাকে যখন বুঝাইতে হইত যে বিষয় আশয় ভালরূপ পরিচালিত হইতেছে না, এবং সে জন্য তাঁর নিজের সুপরিচিত কোন লোককে তিনি ঢাকা হইতে আনাইতে চান, তখন অবশ্য মহারাণীর কিছু কিছু অপ্রশংসা না করিলে ভুবনবাবুর চলে নাই। কিন্তু কুমার ইহাতে ভারি বিরক্ত হইয়া উঠিলেন এবং শ্বশুরের সহিত দেখা শুনা পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিলেন। বেগতিক দেখিয়া রায় মহাশয়কে উপায়ান্তর দেখিতে হইল।

ইতিপূর্ব্বে অন্যান্য প্রসঙ্গে সে কথার কতক পরিচয় দিয়াছি। বাবু সরকার মহাশয় এক দিন রাজসংসারের তদানীন্তন অবস্থার কথা তুলিয়া আমায় বুঝাইতেছিলেন যে পিতৃদেব মহাশয় পেন্‌সেন গ্রহণের পর তাঁহারা যে সকল অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহাতে স্থায়ী উপকারের সম্ভাবনা। আর কুমারের শ্বশুর যে তাঁহার উপর চটিয়াছেন, তাহার একমাত্র কারণ নিজ স্বার্থের ব্যাঘাত। রায় মহাশয় এই সময়ে মাঝে মাঝে আমায় নিমন্ত্রণ করিতেন এবং মহারাণী একটু শক্ত না হইলে যে কুমারের বুঝিবার ভুলে শীঘ্র সমস্ত নষ্ট হইবে ইহার আলোচনায় আমার মতামত লইতেন। আমি বুঝিতে পারিলাম যে জামাতার কাছে ব্যর্থমনোরথ হইয়া তিনি এক্ষণে মহারাণীর সহায়তায় কার্য্যোদ্ধার করিতে ইচ্ছুক। একদিন প্রাতে আমি রাজ-বাটী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি, এমন সময়ে অবনী ভট্টাচার্য্য দেখা করিতে আসিলেন এবং বলিলেন রায় মহাশয় তাঁহাকে আমার কাছে পাঠাইয়াছেন, একবার যাইতে হইবে। সাক্ষাতে ভুবন বাবু আমায় অনুরোধ করিলেন, আমি যেন মহারাণীকে তাঁহার তরফ হইতে বুঝাইয়া দিই যে নূতন যে সকল বন্দোবস্তের কথা উঠিতেছে, তাহাতে তিনি কদাপি সম্মত না হন। বর্ত্তমান ম্যানেজারের সঙ্গে তাঁহার যে সকল সর্ত্ত ছিল, ইহা তাহার বিপরীত কথা, অতএব মহারাণী তাহাতে বাধ্য নহেন। তাঁহার উচিত স্বয়ং পুনরায় সকল ভার গ্রহণ করিয়া কাজ করেন, আর সেজন্য উপযুক্ত লোক কাহাকেও মন্ত্রী করার দরকার।

মহারাণী মাতার সহিত সাক্ষাৎ হইলে জানিতে পারিলাম যে কুমার তাঁহার মন্ত্রিগণের পরামর্শে মাতাকে অবিলম্বে শ্রীবৃন্দাবন পাঠাইতে চান। মা তাঁহাতে ইচ্ছুক নহেন, কিন্তু গত রাত্রে কুমার তাঁহার হাতে পায়ে ধরিয়া তাঁহাকে সম্মত করিয়াছেন। মহারাণী বলিলেন, না গিয়া তিনি কি করিবেন, কুমারের সহিত কলহ তাহা হইলে অনিবার্য্য। এই সব কথা হইতেছে এমন সময়ে কুমার স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত। কিন্তু তখন তিনি ঠিক্ প্রকৃতিস্থ ছিলেন না। এরূপ ভাবে তাঁহাকে আর কখন মাতৃসমীপে দেখি নাই—বড় কষ্ট বোধ করিলাম। মা কুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সঙ্গে কে কে যাইবে? দুর্গা কেরাণী (রাজার আমলের লোক) যদি মদ না ছাড়িয়া থাকে,

তাহাকে লইয়া যাওয়া হইবে না।” কুমার চুপ করিয়া রহিলেন।

নূতন বন্দোবস্তে কতকগুলি লোকের অন্ন উঠিত, সুতরাং মহারাণী মাতার তরফ হইতে ঘোর আপত্তি উঠিবে বুঝিয়াই কুমারের দল অকস্মাৎ তাঁহাকে শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছিল। কিন্তু ইহা কার্য্যে পরিণত হইল না। কালাকালের কথা লইয়া গিরি সিদ্ধান্ত প্রমুখ পণ্ডিতের দল ঘোর আপত্তি উপস্থিত করিলেন।

ইহার পর রায় মহাশয় মহারাণী মাতার কাছে কোন দরবার করিতে হইলে আমাকেই পাইয়া বসিতেন। আমি কিন্তু তাঁহাকে স্পষ্টত বলিয়া রাখিলাম যে অনুরোধ ন্যায়সঙ্গত ও মাতার হিতগর্ভ না হইলে আমার দ্বারা প্রতিপালিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকিবে না।

ভুবন বাবু একখণ্ড কাগজে কয়টী প্রস্তাব করিয়া মহারাণী মাতার নিকট পেস্ করিবার জন্য আমায় দিলেন। বারম্বার বলিলেন উহা তিনি ফিরাইয়া চান, নহিলে অন্যে দেখিলে তাঁহার সমূহ বিপদের সম্ভাবনা।

দেখিয়া মাতা বলিলেন, “তুমি যা বলিয়াছিলে সত্য, সার কথা আছে বটে, বিশেষ কয়টীতে আমার নিজের মঙ্গলের কথা আছে। কিন্তু আমি কি করিব? আর উহাতে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা নাই।” পর দিন পুনরায় বলিয়াছিলেন—“* * রায় মহাশয় পূর্ব্বে ঠিক্ বিপরীত চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কুমার ত আগে জমিদারী কাজকর্ম্মে বড় একটা আসিত না। কেবল কুশিক্ষায় এখন সকল শিখিয়াছে। * *”

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

মন্বন্তরের সূচনা।

[বাঙলায় যমের ডঙ্কা বাজিয়াছে। শত সহস্র অনশন ক্লিষ্টের আর্ত্তনাদ আজ বাঙালীকে একান্ত ব্যথিত ও ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে। সমবেদনা তাই আজ সেই “ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের” কাহিনী স্মৃতিপথে আনয়ন করিয়াছে বলিয়া এই প্রবন্ধ লিখিত হইল।]

The general turn of the English individuals in India, seems to be a thorough contempt for the Indians (as a national body). It is taken to be no better than a dead stock, that may be worked upon without much consideration, and at pleasure.

Nota Manus.

স্বর্ণপ্রসবিনী বঙ্গভূমি একদিন এমন ছিল যখন তাঁহার কনকবৃক্ষে হীরক ফলিত। সেই হীরকের লোভে ইংরাজ এদেশে আসিয়াছিল। আসিয়া মনে করিয়াছিল, এই বিশাল সাম্রাজ্যের বিপুল কর্ম্মভূমি শুধু তাহাদিগেরই জন্য—তাহারই এদেশের ধূলি মুষ্টি পর্য্যন্ত লইয়া যাইবে। তখনও তাহারা একথা জানিত যে এদেশে বহুলক্ষ লোক বাস করে—তাহারা বঙ্গবাসী। যদিও বাঙলার জলে, বাঙলার ফলে ও বাঙলার মাটিতেই সেই বহুলক্ষ বঙ্গবাসীর অস্থি, মেদ, মাংস—তবুও ইংরাজ মনে করিল যে ইহারা এদেশের কেহ নহে, কোন্ বন্যার যেন ভাসিতে ভাসিতে অকস্মাৎ বাঙলার চরণতলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—কোন্ ঝঞ্ঝা যেন এই শক্তিহীন তৃণদলকে উড়াইয়া আনিয়া শেষে বাঙলার পুষ্পবাটিকায় এক মহা আবর্জ্জনার সৃষ্টি করিয়াছে—বাঙালী যে বাঙলায় বাস করে, ইহা একটা নিতান্ত আকস্মিক ব্যাপার ("accidental circumstance") *—তাই সিয়ালিওনি বা নেটালের আদিম অসভ্য অধিবাসীবৃন্দের উপর সেকালের ইংরাজের যতটুকু টান ছিল, বাঙলায় বঙ্গবাসীর উপর তাহাও ছিল না।

বাণিজ্য-ব্যপদেশে বাঙলায় আসিয়াই ইংরাজ একটী কামধেনু সম্মুখে পাইয়াছিল, নির্ব্বিবাদে দোহন-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু কাশেম আলি খাঁ তাহার পূর্ব্বেই বাঙলা হইতে বিদূরিত হইল,—জাফর আলির পুত্র বাঙলায় এবং রাজা সিতাব রায় পাটনায় প্রতিষ্ঠিত হইলেন। বাঙলার শাসনকর্ত্তাদিগের অধীনে যে সকল সৈন্য-সামন্ত ছিল তাহারা অবসর প্রাপ্ত হইল। তখন কেবল কতকগুলি তেলিঙ্গা বরকন্দাজ অধীন কর্ম্মচারীদ্বয়ের নেতৃত্বে থাকিয়া বঙ্গরক্ষার জন্য দুইবেলা ডাল রুটীর শ্রাদ্ধ করিতে লাগিল। ইংরাজ বণিক তখন কতকগুলি পণ্য লইয়া কেবল নিজেরাই ক্রয়-বিক্রয় আরম্ভ করিলেন—বঙ্গবাসী সে অধিকার পাইল না † তখন হইতেই বাঙলার শিল্প ও বাণিজ্যের ধ্বংস আরম্ভ হইয়াছিল।

বাঙলার রামধন ও মবারকনন্ত তখনও একরকম ছিল ভাল। তাহাদিগের মরাই পূর্ণ ধান্য। গোশালায় গো এবং গো-বৎস, ক্ষেত্রপূর্ণ শস্য ও স্বচ্ছসলিলা কালীদীঘি ছিল—রায় জমীদার তাহাদিগের গ্রামে উহা খনন করাইয়াছিলেন বলিয়া ওলাউঠা নিবৃত্ত হইয়াছিল, ম্যালেরিয়াও অনেক কমিয়াছিল। সেই দীঘির কালো জল তখনও বেশ সুমিষ্ট ছিল। দীঘির বাঁধা ঘাটে বসিয়া রামধনের পদ্মমুখী এবং মবারকের অছিমন্ বিবি ক্ষার সংযোগে বস্ত্র ধৌত করিত—"আমলা" দিয়া মাথা ঘষিত এবং গ্রামের কিনু তাঁতির মোটা রঙিন গামছা দিয়া গা মাজ্জিত।

বাঙলা তখন কোম্পানীর মুলুক—ইংরাজ তখন দেশের রাজস্ব গ্রহণ করেন। ১৭৬৭ পর্য্যন্ত রামধন ও মবারক সে রাজকর যোগাইল। পরের বৎসর ফসল তেমন ভাল হইল না বটে, কিন্তু ইংরাজ কোম্পানী সে কথা

---

* Annals of Rural Bengal W. W. Hunter.

† Chahaf Gulzar Shuja's Elliot.

মানিলেন না। রামধন ও মবারক পুত্র এবং কন্যা বিক্রয় না করিয়াও সেবার খাজানা দিল!

কোম্পানী বাহাদুরের সহিত তখন বাঙলার কেবল রাজস্বেরই সম্বন্ধ ছিল—বাঙালীর সুখ-দুঃখের কোন সম্বন্ধ ছিল না। তাই দেশের অবস্থা দর্শনে বিভাগীয় রাজকর্ম্মচারীগণ শঙ্কিত হইয়াছিলেন—বুঝি বা কোম্পানীর এবার কত না ক্ষতিই হইবে। এইরূপ শঙ্কা সত্বেও ইংরাজ-রেসিডেণ্ট মতিঝিল হইতে লিখিয়া পাঠাইলেন—'এবারকার মত এত রাজস্ব আর কখনই আদায় হয় নাই।' * বেহার দরবারের রেসিডেণ্ট রাম্‌বোল্ড সাহেব জানাইলেন—'মহম্মদ রেজাখাঁর সহিত মিলিত হইয়া অশ্রান্ত পরিশ্রমে এবং অল্লাধিক (!) কঠোরতা অবলম্বনে বেহারের প্রায় সমুদয় প্রাপ্যই আদায় করিয়াছি......আমার নিজ জ্ঞানে আমি স্থির নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে আমিলদিগের যাহা কিছু ছিল, বন্দোবস্তি দেনা এবং সরকারের প্রাপ্য পরিশোধ করিতেই সে সমস্ত ফুরাইয়া গিয়াছে;...যদি আমরা জুলুম করিতাম তাহা হইলে এবারও পূর্ব্বের ন্যায় অর্থই এদেশ হইতে শোষণ করিতে পারিতাম...।' † চারিবৎসর পর হেষ্টিংস সাহেব মহানন্দে বিলাতে জানাইয়া বাহাদুরী লইয়াছিলেন যে ১৭৬৮ সালে যে পরিমাণ রাজস্ব আদায় করা হইয়াছিল তাহাই আদর্শ হইলেও তিনি তাহারও অধিক আদায় করিয়াছেন! ‡ বিশপ হিবার তাই ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়া বলিয়াছিলেন—আমরা প্রজাদিগের নিকট যে পরিমাণ কর আদায় করি, কোন এদেশীয় নৃপতিই তাহা করেন না। § ভারতের জাতীয় মহাসমিতির মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন—"The elastic modes (of collection) of the Moghul and the Maharatta have given place to cast iron system worked by a host of highly paid and promotion-by-result settlement officers." ‖

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় রাজমহলের রাজস্ব ভাল আদায় হইতেছিল না বলিয়া রাজমহলের সুপারভাইজর মহাশয় ফৌজদারের উপর বড়ই বিরূপ হইয়াছিলেন এবং কোম্পানীর কর্ত্তাকে জানাইয়াছিলেন—রাজস্বের অবস্থা দেখিয়াই মনে হয় যে ফৌজদারের মূর্খতা অথবা কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনে অনভিজ্ঞতার জন্যই

---

* Letter from Mr. Richard Becker, the Resident at the Darbar, Mootejill, the 7th Feb. 1769.

† Added to unwearied application and some *rigour* enabled me, in conjunction with Mahomed Reza to secure payment of *very near what the province was rated at*... and I can assure you from my own knowledge that their (of the Aumils) small fortunes went to make good the agreements they had entered into and answer the demands of the Govt.......we might have drawn from the country by *force* the same sum as was before collected.—Letter from J. Rumbold, Resident in Behar, Feb., 1769.

‡ Bengal Letter, Dated 3rd Novr., 1772, para 6.

§ No native Prince demands the rent which we do.—Bishop Heber in 1826.

‖ Sreejut Lall Mohon Ghosh, President, 19th Indian National Congress.

তাহার কর্ম্ম এত অসন্তোষ জনক হইয়াছে। * শ্রীযুক্ত লালমোহনের উক্তির সমর্থন করিতে এই একটী প্রমাণই যথেষ্ট বলিয়া মনে হয়।

রামধন ও মবারক কত যে রোদন করিল কে তাহা নির্ণয় করে। কোম্পানীর কর্ত্তারা তাহা দেখিলেন না, কর্ম্মচারীগণও তাহা দেখিল না। বাঙলার কৃষকের সহিষ্ণুতা অসীম—ধৈর্য্য অসীম। তাহারা মরিল না। পুনরায় হল লইয়া মাঠে গেল, আবার নূতন উৎসাহে, নবীন উদ্যমে ক্ষেত্রকর্ষণে মনোনিবেশ করিল। এদিকে কলিকাতায় বসিয়া কোম্পানী বাহাদুর সংবাদ পাইলেন যে মান্দ্রাজে ঘোর অনাবৃষ্টি হওয়ায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে; বেহার হইতেও জলকষ্টের সংবাদ আসিল। কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণ নানা স্থান হইতে সংবাদ দিতে লাগিলেন যে জলের অভাবে বাঙলায় মহা অনর্থ ঘটিতে যাইতেছে। যদি এইরূপ চলে তবে কোম্পানীর রাজস্ব আদায় করা নিতান্ত দুরূহ হইবে! কেহ বা প্রজার দুঃখে দুঃখিত হইয়া লিখিলেন—"এবার কতক ভূমিকর মাপ দেওয়া হউক," কেহ বা প্রস্তাব করিলেন—'অর্থ দিয়া হউক, শস্য দিয়া হউক—যাহার যেরূপে সুবিধা সে সেইরূপেই রাজস্ব প্রদান করুক।" কোম্পানী বাহাদুর রাজস্বের জন্য চিন্তিত হইলেন।

রামধন ও মবারক এত কষ্টে আর কখনও পড়ে নাই। যতদিনের কথা তাহাদিগের স্মরণ হয়, মবারকের স্থবিরা 'দাদি' যতদিনের কথা মনে করিয়া বলিতে পারে ততদিন এ 'সোনার বাংলায়' কিছুরই অভাব ছিল না; ধনে ধান্যে, পুষ্পে পত্রে, ফলে জলে জননী বঙ্গভূমি ভারতবর্ষের কোহিনুর ছিলেন। মীরকাশেমের আমল—সেত অধিক দিনের কথা নহে—তখনও কলিকাতার বাজারে একটাকায় ১৫ সের চাউল, অর্দ্ধমণ তৈল এবং ৮ সের ঘৃত মিলিত। তাই একদিন নিতান্ত হতাশ হইয়া মবারক তাহার দাদিকে কহিল—'দাদি' জান্ ত আর বাঁচে না, মাটি শুকাইয়া পাথর হইয়াছে।' বৃদ্ধার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। সে কেবল দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া কাতর কণ্ঠে বলিল—"আল্লা একটু পানি দে!"

মবারকের গৃহে যেমন তপ্ত দীর্ঘশ্বাস বহিতেছিল, মবারক যেমন মহা সর্ব্বনাশের মুখে পতিত হইয়া কাতর কণ্ঠে পরমেশ্বরকে ডাকিতেছিল, বাঙলার প্রতি মবারকের গৃহেই সেই ধ্বনি বাজিতেছিল। তখন বাঙলার প্রতি ক্ষেত্রে নবীন শস্য পবন হিল্লোলে দুলিতেছিল। সেই শ্যামল শস্য ক্ষেত্রের দিকে তখন মবারক চাহিয়াছিলেন, রামধন চাহিয়াছিল আর চাহিয়াছিলেন কোম্পানীর সুপারভাইজরগণ। কিছু দিন গেল—বৃষ্টি হইল না। বাঙলার কৃষক তখন 'দোনা' দিয়া নিকটবর্ত্তী খালের জল তুলিয়া শস্যক্ষেত্র সিক্ত করিতে লাগিল। রামধন হরির লুট দিল, বুড়া শিবের রৌদ্রতপ্ত শিরে দুগ্ধ ঢালিল আর মবারক পাঁচ পীরের সিন্নি মানিয়া শ্মশানকালীর মুক্ত 'থানে' চিনি দিয়া আসিল। তবুও বৃষ্টি হইল না—পরমেশ্বর তাঁহার রুদ্র তেজ সম্বরণ করিলেন না।

* Letter from D. Harwood Esq: Supervisor, Rajmehal, Dated the 1st Oct., 1770.

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল—শ্যাম শস্য আর শ্যামল রহিল না। খাল বিল কূপ, পুষ্করিণী তখন শুকাইয়া গেল—অগাধ তরঙ্গিনী পর্য্যন্ত তখন শীর্ণ শরীরা, মৃতকল্পা, গোষ্পদ-তুল্যা হইয়াছিল! বাঙলার কৃষক বাঁচিবে কিসে? কোম্পানী বাহাদুর ভাবিলেন—রাজস্ব আদায় হইবে কিরূপে? দারুণ তৃষ্ণায় কণ্ঠ শুকাইয়াছে, বুকের ছাতি পর্য্যন্ত ফাটিয়া যাই-তেছে—মবারক কি করিবে? গ্রামপ্রান্তে যে দীঘি ছিল—যে দীঘির বাঁধাঘাটে একাকিনী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অছিমন বিবি এক এক দিন আপনার প্রতিবিম্ব দেখিয়া হাসিত—সেই অতলস্পর্শ কালীদীঘির শীতল সলিল যেন কোথায় উড়িয়া গিয়াছে! মবারক কি করিবে? সেই শুষ্ক দীঘির তলদেশে নামিয়া তপ্ত পঙ্কিল বিষতুল্য বারি অঞ্জলি অঞ্জলি পান করিল এবং সেই মুহূর্ত্তেই তথায় পঙ্ক মধ্যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল!*

কোম্পানী বাহাদুর কি এ সংবাদ পাইতে-ছিলেন না? প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে অনর্থপাতের সংবাদ আসিতেছিল। কিন্তু ইংরাজ বাহাদুর মুখ তুলিয়া চাহিলেন না—একটি কূপ বা পুষ্করিণীও খনন করাইলেন না—এক বিন্দু বারি দান করিয়াও তৃষ্ণার্ত্তের শুষ্ক কণ্ঠ শীতল করিলেন না। কোম্পানী বাহাদুর কেবল লইতে আসিয়াছিলেন, দিতে আসেন নাই। তাঁহারা ভাবিলেন—তাইত! এমন হইলে রাজস্ব আদায় হইবে কিরূপে?

বর্দ্ধমানের রাজা আবেদন জানাইলেন—শস্য নিতান্ত দুর্ম্মূল্য হইয়াছে, চারিদিকে জলকষ্ট এবং অনাবৃষ্টি। ধান্য একেবারে পুড়িয়া গিয়াছে। সেই দগ্ধ শস্য পশ্বাদির আহারের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। পুষ্করিণীগুলি শুকা-ইয়া উঠিয়াছে।...কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া প্রজাগণ দলে দলে পলায়ন করিতেছে!†

বর্দ্ধমান দরবারে রেসিডেণ্ট সাহেব অনেক-দিন পর্য্যন্ত নীরব ছিলেন। দেশের প্রকৃত অবস্থা জানাইলে পাছে একটা আতঙ্কের সঞ্চার হয়, তিনি সেই ভয়ে সকল সংবাদ গোপন রাখিয়াছিলেন! শেষে কর্ত্তব্যবোধ ও মনুষ্যত্ব তাঁহাকে এতই পীড়িত করিয়া তুলিল যে তিনি কলিকাতায় লিখিলেন—তটিনী শুষ্ক, তড়াগ বিশোষিত, প্রজারা কার্পাস, তুত, কলাই, যব, তামাক, ভুট্টা প্রভৃতি কিছুই বপন করিতে পারিতেছে না—তাই, দিনমজুরী করিয়া কোন-রূপে জীবিকা অর্জ্জনের জন্য তাহারা স্থানান্তরে পলায়ন করিতেছে। যদি কোনো সদুপায় উদ্ভাবিত না হয় তাহা হইলে রাজস্বের ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী!‡

কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ মাসেই "সুজলাং

---

* The distress of the inhabitants at present does not only proceed from scarcity of provinces, and want of rain to cultivate their lands, but in many parts they are without water to drink; most of the tanks in the country being entirely dried up.—Letter from Richard Becker Esq: to the President & Council of the Select Committee; 30th Sept., 1770.

† Consultation of the 20th Novr, 1769.

‡ Letter from J. Graham Esq: Resident. Dated 19th Nov., 1769.

সুফলাং” বঙ্গভূমির এই নিদারুণ অবস্থা ঘটিয়াছিল। কোম্পানী বাহাদুর তখন বাঙলার মসনদে অধিষ্ঠিত। গ্রাম ছাড়িয়া, গৃহত্যাগ করিয়া, ‘গরু জরু লাঙ্গল’ ফেলিয়া অবারু আকন্দ ও হারাধন তখন ক্ষিপ্তের মত পলায়ন করিতেছিল! কোম্পানী বাহাদুর সরকারী কাগজপত্রে তখনও বলিতে পারেন নাই যে বাঙলায় দুর্ভিক্ষ হইয়াছে!

দেখিতে দেখিতে বাঙলায় ইংরাজের বড়দিন আসিল। নাচে ভোজে খানায়—শীকারে সফরে ক্রীড়ায় ইংরাজগণ মাতিয়া উঠিলেন। যাহারা সে সমুদয়ের ব্যয়ভার বহন করিতেছিল, কোম্পানী বাহাদুর তাহাদিগের দিকে চাহিলেন না। রাজস্ব যেমন আদায় হইতেছিল তেমনি হইতে লাগিল! বিচারে বিতর্কে পত্রে, রিপোর্টে মিনিটে প্রোসিডিং এ, শীত কাটিয়া গেল—বসন্ত আসিল। বসন্তে কোকিল গাহিল—ইংরাজের পুষ্পবাটিকার কুসুম ফুটিল—পবন বহিল—লতা নাচিল—কিন্তু রামধনের নয়নের বারি শুকাইল না।

বাঙলার কৃষক যাঁহাদিগের প্রজা, রাজস্বের ভয়ে তাঁহাদিগের কণ্ঠ ও তালু শুষ্ক হইয়া উঠিল। রামধনের গোশালায় যত গরু ছিল—খাদ্যের অভাবে সব মরিয়া গিয়া চারিটিমাত্র অবশিষ্ট রহিল। সে চারিটিও সে হাটে লইয়া গেল। তখন বাঙলায় অনল ছুটিতেছিল। বৈশাখের নিদারুণ মার্ত্তণ্ড তখন বঙ্গভূমির ‘মাঠ কাঠ’ ফাটাইয়া, শস্য দগ্ধ করিয়া, খাল-বিলের অবশিষ্ট পঙ্কিল সলিল শুষিয়া দিক্ হইতে দিগন্তে ছুটিয়া যাইতেছিল। সে অনলে পুড়িয়া মরিল না কেবল রামধন ও মবারকনস্য! যদি মরিয়া যাইত তাহা হইলে তাহারাও বাঁচিত—কোম্পানীরও ইতিহাসও কলঙ্ক-মলিন হইত না।

কিন্তু তাহারা যদি এত শীঘ্রই মরিবে তবে কোম্পানীবাহাদুর রাজত্ব করিবেন কি লইয়া? তবে মহম্মদ রেজা খাঁ রাজস্ব বিভাগের কর্ত্তা স্বরূপ রিপোর্ট লিখিবেন কাহার সম্বন্ধে—তবে ডুকারেল, বেকার, রামবোল্ড প্রভৃতি থাকিবেন কি লইয়া—তবে ফৌজদার মহম্মদ আলি খাঁ পূর্ণিয়ায়, * বিষ্ণুপুরের নবকিশোর, † ভাগলপুরের ফৌজদার সদর-উল্-হক্ খাঁ ‡ প্রভৃতি দেশের সকল অবস্থা উপেক্ষা করিয়াও—দুস্থ প্রজাদিগের দুঃখে বিগলিত-হৃদয় হইয়াও শুধু কর্ত্তব্যের প্ররোচনায় কোম্পানী বাহাদুরের রাজস্ব আদায় করিবেন কাহার নিকট হইতে! তাই রামধন ও মবারক মরিল না।

গ্রামে, গ্রামপ্রান্তে যে খাল-খন্দ ছিল, পূর্ব্বে

---

* Often when I contemplate the prevailing misery, my compassion and pity are excited, *yet over-ruled by my regard for the welfare of the Government, appearing blind to their distress and deaf to their lamentations. I neglect not the interest of the Sircar.*

† *I am not negligent in the management of the business committed to my care* by the Government, but it is impossible to provide against the calamities inflicted by Heaven.

‡ *In the collection and remittance of the revenues I have exerted myself to the utmost limits of my ability.*

Extracts from the Records in the India office. Vol. I.

বর্ষাগমে সে সমুদয় জলপূর্ণ হইয়া যাইত—এবার নূতন জল সঞ্চিত হইল না; যে টুকু জল ছিল শ্রাবণ মাসেই ধান্ত ক্ষেত্র উহা টানিয়া লইল বটে তবুও ক্ষেত্রগুলি শুষ্ক ও নীরস হইয়াই রহিল। ভাদ্রমাসেও বারিপাত হইল না। শুষ্ক ক্ষেত্র প্রস্তরের ন্যায় কঠিন হইয়া উঠিল; সে সকল দগ্ধভূমি ফাটিয়া-চিড়িয়া কৃষকের হল চলিল না। বৃষ্টির অপেক্ষায় থাকিতে থাকিতেই কাল ফুরাইয়া গেল—রবি শস্য বপন করা আর ঘটিল না।*

অবশেষে রামধন তাহার 'হালের বলদ' দুইটিও বিক্রয় করিবার জন্য পুনরায় একদিন হাটে গেল; মবারক তখন তাহার মৃত্যুশয্যা-শায়িনী বৃদ্ধা দাদির কণ্ঠে কালীদীঘির অগ্নিতুল্য তপ্ত পঙ্কিল বারি ধীরে ধীরে ঢালিয়া দিতে ছিল। এমন সময় সহস্র চকিত ভীত কাতর কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া উঠিল 'আগুন! আগুন! মবারক মুহূর্তের জন্য তাহার কুটীরের বাহিরে আসিয়া দেখিল, গ্রামে ও গ্রামপ্রান্তে, যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূর দাবানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে—অদূরে রামধনের সর্ব্বস্ব দগ্ধ হইতেছে! মবারক তখন কাতরকণ্ঠে ডাকিল—আল্লা! হায়! আল্লা!

সে অনল নির্ব্বাপিত হইবার উপায় ছিল না। গ্রামের পর গাম জ্বলিতে লাগিল, আর সেই সঙ্গে কত মবারকের কত রামধনের যথা সর্ব্বস্ব পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। সে অনলে যে শুধু ঘর-দ্বার পুড়িয়া গেল তাহা নহে। তখনও গঞ্জে যে সামান্য ধান্য ছিল মরাইয়ে যে সামান্য তণ্ডুল ছিল, শুধু যে দরিদ্রের সেই শেষ আশা ভস্মসার হইয়া গেল, তাহা নহে—সে অনলে যে শুধু জবান আকন্দের 'হালের বলদ', হারাধনের দুগ্ধবতী গাভী দগ্ধ হইল তাহাও নহে; সেই সর্ব্বধ্বংসকারী অনল দুই একখানি গ্রাম দগ্ধ করিয়াই ক্ষান্ত হইল না। কত গ্রাম —কত নগর সে অনলে দগ্ধ হইয়া গেল, কত শত প্রাণ বিনষ্ট হইল—কত গৃহস্থ পরিবার কোনরূপে জীবন রক্ষা করিয়া বৃক্ষতলে আশ্রয় লইল!†

রাত্রি দ্বিপ্রহর! রামধন হাট হইতে গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। প্রথমে সে মনে করিল বুঝি পথভ্রান্ত হইয়া কোন শ্মশান ভূমিতে আসিয়াছে। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার সে ভ্রম ভাঙ্গিল। মবারক আসিয়া তাহার বাহু চাপিয়া ধরিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে ডাকিল—'দাদা'—

কম্পিত কলেবরে রামধন কহিল—মবু এ কি—"

মবারক কাঁদিয়া ফেলিল "সব আগুনে পেয়েছে—"

"আমার কালু যে বাড়ীতে ছিল, আমার পদ্মমুখী—"

"তাহাদিগকেও খুঁজিয়া পাই নাই।"

---

* Letter from Ujaggar Mull Aumil of Jessore

† The tanks and springs are dried up and water grows daily more difficult to be procured. Added to these calamities frequent and dreadful fires have happened throughout the country, impoverished whole families and destroyed thousands of lives. The small stores of grain which yet remained at Kajgunj, Dewangunj and other places within the Districts of Dinajpur and Poorneah have been consumed by fire.

Letter from Mahomed Reza Khan, 15th May, 1770.

রামধন আর কথা কহিতে পারিল না। সেই দাবদগ্ধ ভূমিপৃষ্ঠে, সেই তাহার সুখ-দুঃখের চিতাভস্মের উপর সংজ্ঞাহীন রামধন আছাড় খাইয়া পড়িল! তখনও দূর হইতে ক্ষীণ রোদনের রোল মবারক নস্তের কর্ণে আসিয়া পৌঁছিতেছিল—পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার রাশি ভেদ করিয়া বিদগ্ধ পতিত গৃহ গুলির গর্ভস্থ অর্দ্ধস্তিমিত অগ্নি তখনও জ্বলিয়া জ্বলিয়া নিবিতেছিল, নিবিতে নিবিতে আবার জ্বলিয়া উঠিতেছিল। আকাশ তখন নির্ম্মল—মেঘকলঙ্কবিরহিত—নক্ষত্রমালা পরিশোভিত। সংজ্ঞাহীন রামধনের শিয়রে দাঁড়াইয়া মবারক সেই নির্ম্মল আকাশের দিকে চাহিয়া যুক্ত করে ডাকিল—আল্লা! হায়, আল্লা!

সে কালে হিন্দুর জন্য মুসলমান কাঁদিত—মুসলমানের জন্য হিন্দুর প্রাণও কাঁদিয়া উঠিত।

শ্রী—

মনীষা।

[মিশ্রকাব্য]

নীরবিলা সুলোচনা—মনীষা কহিল "ভাল,—পণ
ভাঙিয়াছ, তাই তোমা' কর্ম্মচ্যুত করিনু এখন।
দূর হও"; (কণা'পরে তাকাইয়া কহে) বালিকারে
রাখিব নিকটে—স্নেহবিন্দু মম অন্তরে সঞ্চারে।"

তখন বীভৎস হাস্যে হংসগ্রীবা প্রসারিয়া নারী
বক্র-ওষ্ঠে কহে তীব্র—নহে কি এ কল্পনা আমারি?
আমি র'চেছিনু নীড় কোকিলারে শিখাইতে গান,—
ওঠ্ ওঠ্ দ্রুত ওরে"—এত বলি দিল ক্ষিপ্র টান
বেলার কোমল হস্ত ধরি। চাহিয়া জ্যেষ্ঠার'পরে
ফিরা'ল সজল দৃষ্টি আর বার কাতর অন্তরে
মনীষার পানে বেলা কাতর প্রার্থনা জানাইয়া।
সে মূরতি হেরি' দ্রব হ'য়ে গেল মন্মথের হিয়া,
হেরিল কল্পনা তা'র, শকুন্তলা দুঃসহ ব্যথায়
যাচিছে ইন্দ্রের বজ্র এড়াইতে কলঙ্কের দায়!
চেয়ে আছি তা'র পানে,—সহসা আঘাত বাজে দ্বারে,
অমনি সে কক্ষ মাঝে অসংযত এলোকেশ ভারে

সন্ত্রস্ত দূতিকা এক সচকিত-উড্ডীন-বসনে
উপনীত হ'য়ে যথা মনীষা বসিয়া সিংহাসনে
লিপি যুগ্ম দিলা তাঁর করে। সিংহীদর্পে খুলি
আবরণ পড়িতে লাগিলা রাজ্ঞী সন্দেহে আকুলি'।
দাঁড়ায়ে রয়েছি মোরা চাহি,—করিতে করিতে পাঠ
দুর্দ্ধর্ষ ভ্রুভঙ্গ ফুটি' আকুঞ্চিয়া তুলিল ললাট
দৃপ্ত তরঙ্গিত ক্রোধে,—যুগ্ম গণ্ডে জাগে বহ্নিজ্বালা,
কম্প্রশ্বাসে পীনবক্ষে দুলিল সঘনে মণিমালা,—
ঝটিকার ছন্দে যেন আলোড়িল প্রলয়-আঁধার,—
বিদ্যুৎ-পিঙ্গল-চক্ষু খুলিয়া হেরিল বার বার।
কম্পিত হইল হস্ত, নীরব সে সভাগৃহতলে
সে পত্র-কম্পন-শব্দ কর্ণে এল ;—উচ্চকণ্ঠ রোলে
সহসা কাঁদিল কণা—শুনি সেই রোদনের ধ্বনি
দ্বিগুণ উদ্ধত ক্রোধে কৈল রাণী ভ্রুভঙ্গ ; অমনি
মুষ্টিতে চাপিয়া পত্র মুখে তীব্র চাহিয়া আমার
দিলেন সে লিপিদ্বয়,—পিতৃলিপি একখানি তাঁর।—

"কল্যাণিনি! তোমার প্রদেশে আমি রাজপুত্রে যবে
পাঠাইনু—জানি নাই নির্ম্মম নিয়ম তব তবে।
এখন জেনেছি সব—জানি' ভাল মেজাজ তোমার
দ্রুত আসিয়াছি হেথা বারণ করিতে অত্যাচার।
কিন্তু পড়িয়াছি তাঁর জনকের হাতে এ নিশীথে
আঁধারে আঁধারে তিনি তব সৌধ ঘেরি' আচম্বিতে
আটক রাখিলা মোরে পুত্রের নিষ্কৃতি হয় যাহে।"

দ্বিতীয় পত্রিকা খানি আমার পিতার ;—লিখা তাহে
"তব হস্তে পড়েছে তনয়—না স্পর্শি' কেশাগ্র তাঁর
বিমুক্ত করিয়া সুমঙ্গলে, পাণি দিবে আপনার।—
বাক্‌দত্তা আছ মনে রেখো—যদিও জেনেছি আমি
'রমণীই শ্রেষ্ঠতরা পুরুষ হইতে'—দিনযামি'
এ ধারণা জাগে তব মনে।—উন্মত্ত প্রলাপ এযে!
এ ভাব হইলে ব্যাপ্ত সর্ব্ববিশ্বে নারী দৃপ্ত তেজে

পতিদ্রুহা হইবে দুর্ব্বার ; এবে কর্ত্তব্য আমার,—
ব্যাপ্ত না হইতে ইহা—এ প্রাসাদ ভাঙিয়া তোমার
রেণু সাথে মিশাই এখনি,—রহিল মনে এ পণ,
এ মুহূর্ত্তে পুত্রে যদি নিরাপদে না কর প্রেরণ।"

এ অবধি করি পাঠ দাঁড়াইয়া কহিনু উচ্ছ্বাসে
"আমি যে তস্কর সম পশিয়াছি তব গুপ্ত বাসে
নহে তাহা কৌতুহল দেখিতে তোমার গুপ্তলীলা।
হৃদয়ে বহিল নদী আশাময়ী সুবর্ণ সলিলা,—
নৃপতি-সম্বন্ধ-কথা বায়ু সম উঠিল যে তা'য়,
তাই ত নিষেধ-গণ্ডি অতিক্রমি আসিনু হেথায়।
নারীরে করিনি হেলা—অর্ঘ্য তা'রে দিছি আজীবন
একান্ত সম্ভ্রম ভরে। ঘৃণা তুমি করি'ছ পোষণ
সমস্ত পুরুষ'পরে—কিন্তু শুন বিদ্যাবতি অয়ি!
পুরুষ বলিয়া আমি মনুষ্যত্ব-বিবর্জ্জিত নই।
তাই তব মহাকার্য্যে আছে শুভ আশীর্ব্বাদ মোর,—
তোমার মঙ্গল কর্ম্মে বাঁধিয়াছি আমি ঐক্য-ডোর
সমস্ত অন্তর দিয়া। ধাত্রী মুখে শুনি তব কথা
ধ্যান জ্ঞান মানিতাম তোমা'। চন্দ্রালোক হেরি যথা
উচ্চে হাত প্রসারে বালক—তেমনি শৈশবে মম
নিখিল-সৌন্দর্য্যময়ী প্রেমময়ী নিত্য নিরুপম
দক্ষিণ পবনময়ী তুমি এলে নবোল্লাসে ভরি'।
উষায় প্রদোষে কানে বন ভবি' বাজিত বাঁশরী
'মনীষা' 'মনীষা' স্বনি'—পাপিয়ার উচ্চ মধু তান
চন্দ্রালোক-প্লাবিত গগনে বুঝি সুধু তব গান
ছড়াইত অতৃপ্ত অন্তরে! চন্দ্র-কণা-মালা পরি'
আকুল কল্লোলে যেন "মনীষা" "মনীষা" ধ্বনি করি'
পুষ্পিত-কানন-প্রান্ত চুমিত তটিনী। এ হৃদয়ে
প্রতিজ্ঞা জাগিয়াছিল—রহ যদি ত্রিদিব-নিলয়ে
চিত্রাসম মহিম-খচিত,—মানব-অগম্য দেশে
কিম্বা মর্ত্ত্য-তিলোত্তমা সম,—তবুও সহস্র ক্লেশে

উত্তরিব তব পাশে,—হের তাই ঝঞ্ঝা শিরে ধরি
পুরুষ হয়েও তোমা' হেরিতে এসেছি আঁখি ভরি'।
তোমারে হেরিয়া আজ কত কথা গুমরিছে বুকে
পূর্ণ এ সভার মাঝে প্রকাশিতে পারিনা তা'মুখে।
সুধু এই মাত্র বলি কীর্ত্তিমন্ত নর নারী কত
সাক্ষাতে দেখিয়া আমি নৈরাশ্যে হয়েছি উপহত;
দূর হ'তে যে মহিমা, কিছু তা'র পাই নাই কাছে,
হয় ত' বিশেষগুণ মহনীয় কারো কারো আছে,
কিন্তু অয়ি মহীয়সি! সেই মম শৈশব স্বপন
পূর্ণতা লভিল আজি নেহারিয়া ও তব বদন।
কি প্রেম-তরঙ্গে আজি ডুবিয়াছি—মেনেছি আপনা
পরাভূত! এমনিই ডুবে থাকি একান্ত বাসনা
নিশিদিন। কি কুসুম-শৃঙ্খলে বাঁধিলে মোর প্রাণ!
তাই ত' তোমার পদে সঁপি' আজি সমস্ত সম্মান
সমস্ত সাধনা আশা—লগ্ন হ'তে চাহে মোর হিয়া।
চক্ষুঃ শ্রবা যেই মত সঙ্গীতের পাছে পাছে ধায়
তেমনি এ অন্ধ হিয়া আজি অনুসরিছে তোমায়।
একাগ্রে কিশোর যথা পরিপূর্ণ চাহে পুরুষতা—
মৃত্যুনীল ওষ্ঠ যাচে অপূর্ণ কর্ম্মের মাঝে যথা
প্রাণময় অমৃত পরশ—চাহে দরিদ্রে যেমতি
রত্নমণি—রুগ্ন যথা নব স্বাস্থ্য—অয়ি জ্যোতিষ্মতি!
তেমনি তোমারে করি আশা। তোমা বিনা দিনযামি'
অপূর্ণ আকাঙ্খা মোর গুমরিছে প্রাণে—অর্দ্ধ আমি
অর্দ্ধ তুমি—দোঁহে মিলে পূর্ণ হব ভবে। দীপসম
অন্ধকারে আছি তব আগমন চাহি, নিরুপম
শিখা হবে তুমি। আমি বংশী বসে আছি শূন্যময়—
তুমি হয়ে কৌশল ফুৎকার মিশাইয়া তান লয়
অপরূপ ধ্বনিবে সঙ্গীত। হৃদয় দুয়ার যদি
রুদ্ধ করে রাখ তুমি সহস্র চেষ্টায়, নিরবধি
নিরাশারে পরিহরি আশা-ভরা সহস্র আঘাতে
বারে বারে হানা দিব তথা। বৈফল্যের ঝঞ্ঝাবাতে

সহস্র বিপত্তি সাথে প্রাণপণে যুঝি' লক্ষ্য ধরি
যে জন চলিতে পারে তা'রেই মানুষ গণ্য করি।
তব্ অনুমতি বিনা হেথায় করিনি আগমন
তব পিতৃ-করাঙ্কিত পত্র হের তা'র নিদর্শন।

জানুতে করিয়া ভর পত্রখানি দিনু তাঁর করে—
উন্মুক্ত না করি তাহা নিক্ষেপিলা রাজ্ঞী ভূমি'পরে।
তীব্র ওষ্ঠাধর-রুদ্ধ স্তম্ভিত ক্রোধের মহাস্রোত
আসন্ন প্লাবনে অপেক্ষিছে, বদ্ধ নদী ওতপ্রোত
যেই মত নিথর হইয়া রহে সফেন প্লাবনে
বাঁধ ভাঙি' ভাসাইতে ধরা। এমনিই সে বদনে
ছুটিত কথার স্রোত—সহসা ভরিল সভাতল
বহু-নারী-কণ্ঠ-কলধ্বনি-মিশ্রিত সমুচ্চ-রোল।
আলোকিত সভাগৃহ—জ্যোতির্ম্ময় সারি তারি মাঝে
মেঘ-শিশু-বৃন্দ সম অংশে অংশে মিশিয়া বিরাজে।—
ইন্দ্রধনু-বিচিত্র-রঞ্জিত-বেশা—চক্ষু জ্যোতির্ম্ময়,—
ঝলমল মণি অঙ্গে। কৃষ্ণ কেশ বেণীবদ্ধ রয়—
দীপ্ত মুক্তামালা জড়িত তাহাতে। সবে ইতস্তত
অতি ব্যস্ত সন্ত্রাসে করিছে আনাগোনা, যেইমত
ঝঞ্ঝামাঝে ফুলদল,—কেহ রক্ত, কেহ শুভ্র, কেহ
চম্পকাঙ্গী, অতসীসুম্লান কারো কমনীয় দেহ।
পাংশু মুখে ত্রাস-দীর্ণ ওষ্ঠাধরে আলোকের পানে
চেয়ে আছে—কেহ কহে "সৈন্য এক এসেছে সেস্থানে"—
কেহ কহে "কিবা ক্ষতি তায়?"—শেষে বহুনারী মাঝে
বাধিল বিষম কোলাহল—ঊর্দ্ধে প্রসন্ন বিরাজে
দীপ্ত কলামূর্ত্তি-রাজি—শান্তি যেন ইচ্ছিয়া অন্তরে।

ক্রমশ

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

গৌড়কাহিনী।

স্বাধীনতা লাভ।

বাঙলার ইতিহাসে ১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত—দুই শত বৎসর—স্বাধীন পাঠানশাসন-কাল বলিয়া উল্লিখিত হইয়া আসিয়াছে। এই দুই শত বৎসর যে প্রকৃত পক্ষে স্বাধীন শাসনকাল, তদ্বিষয়ে মত-ভেদ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু ইহা সর্ব্বাংশে পাঠানশাসনকাল বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে কিনা, তদ্বিষয়ে মতভেদের অভাব নাই।

যাঁহারা এই দুই শত বৎসর বাঙলা দেশের শাসনদণ্ড পরিচালিত করিয়া গিয়া-ছেন, তাঁহারা সকলেই পাঠান ছিলেন না;—এমন কি—সকলেই মুসলমান ছিলেন না। সুতরাং ইহাকে বাঙলার স্বাধীন শাসনকাল বলিলেই সুসঙ্গত হয়।

বাঙালী হিন্দু মুসলমানের মধ্যে স্বার্থসমন্বয় সংস্থাপিত হইবার পর,—হিন্দু মুসলমানের সমবেত বাহুবলে—এই স্বাধীনশাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং হিন্দু মুসলমানের সম্মিলিত প্রতিভাবলেই বঙ্গভূমির সুখসমৃদ্ধি উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল।

বাঙালী হিন্দু মুসলমান কিরূপে দিল্লীর শাসনপাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতালাভে কৃত-কার্য্য হইয়াছিল, তাহার অনেক কথাই বিস্মৃতিগর্ভে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এতকাল পরে তাহা সংকলিত হইবার সম্ভাবনা নাই। তথাপি এই দুই শত বৎসরের ইতিহাস বিশেষ-ভাবে আলোচিত হইবার যোগ্য হইয়া রহিয়াছে।

বাঙালাদেশের ভৌগলিক সংস্থানই ইহার অধিবাসিবর্গের স্বাধীনতালিপ্সা প্রবুদ্ধ করিয়া দিয়া বঙ্গভূমিকে স্মরণাতীত পুরাকাল হইতে একটি স্বতন্ত্র প্রাচ্য রাজ্য বলিয়া সুপরিচিত করিয়া রাখিয়াছিল। সে রাজ্য বাহুবলে এবং শিল্প বাণিজ্য কৌশলে, নানাদিগ্দেশের সহিত পরিচিত হইয়া সর্ব্বত্র খ্যাতিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তজ্জন্য বঙ্গদেশ কখনও দীর্ঘকালের জন্য আর্য্যাবর্ত্তের প্রবল পুরুষগণের পদানত থাকিতে স্বীকৃত হয় নাই। কখনও কোন দিগ্বিজয়ী ভারতসম্রাট কিছু-কালের জন্য বঙ্গভূমিকে তাঁহার বর্দ্ধমান বিজয়রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিবামাত্র, তাহা আবার আপন স্বাতন্ত্র্য লাভ করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে বাঙালীরাই চিরদিন বঙ্গভূমির অধীশ্বর বলিয়া স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিত। তাহারা যখন আর্য্যাবর্ত্তের জ্ঞান ও ধর্ম্ম স্বীকার করিয়া আপনাদিগকে হিন্দু বা বৌদ্ধ নামে অভিহিত করিত, তখনও তাহা-দের স্বাভাবিক স্বাতন্ত্র্যলিপ্সা তাহাদিগকে একটি পৃথক্ জাতিতে পরিণত করিয়া তাহা-দের সম্মুখে এক পৃথক্ কর্ম্মক্ষেত্র উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছিল। তাহারা আর্য্যাবর্ত্তের

অধিবাসিবর্গের ন্যায় স্বদেশের ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে গৃহকোটরে আবদ্ধ হইয়া থাকিত না। তাহারা পোত চালনা করিত ;—সুদূর সমুদ্র-পথে গমনাগমন করিয়া দ্বীপে উপদ্বীপে বাণিজ্য করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিত ;—অকুতোভয়তা এবং অধ্যবসায়মাত্র সম্বল করিয়া নানা দূরদেশে উপনিবেশ সংস্থাপিত করিত ;—জ্ঞান ও ধর্ম্মপ্রচারের উৎসাহে বিদেশে জীবন বিসর্জ্জন করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। এক সময়ে সমগ্র প্রাচ্যসাগরসৈকতে বাঙালীর আধিপত্য এরূপ দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যে আজিও বহুসংখ্যক পুরাতন বাণিজ্য-বন্দরে তাহার বিবিধ নিদর্শন সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইতে পারে নাই।

বক্তিয়ার খিলিজি এই দেশের প্রাকৃতিক সংস্থান এবং অভ্যুদয় লাভের অনুকূল অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই ইহাকে মুসলমানদিগের আশ্রয় স্থানে পরিণত করিবার আশায় বঙ্গভূমির দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি মুসলমানদিগকে জায়গীর দান করিয়া বঙ্গ-ভূমির সহিত তাহাদিগের চিরসম্বন্ধ সংস্থাপিত করিবার আয়োজন করিয়াছিলেন। এইরূপে যাহারা এদেশে বাস করিতে আরম্ভ করে, তাহারা অল্পকালের মধ্যেই বঙ্গবাসী হিন্দুদিগের ন্যায় বঙ্গভূমির স্বাতন্ত্র্যরক্ষার প্রয়োজন অনুভব করিতে আরম্ভ করে। ইহাতেই হিন্দুমুসলমানের মধ্যে স্বার্থ-সমন্বয় প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল।

প্রথম দেড়শত বৎসর ধরিয়া হিন্দুমুসল-মানেরা কখন কলহ করিয়াছে, কখন বা সম্মিলিত বাহুবলে দিল্লীর মুসলমান সেনার আক্রমণবেগ প্রতিহত করিতে গিয়া অকাতরে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছে। এই সকল যুদ্ধ কলহের অনেক কথাই ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু কিরূপে বঙ্গবাসী হিন্দু মুসলমানদিগের মধ্যে স্বার্থ-সমন্বয় ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল, তাহার অনেক কথাই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে!

দিল্লীশ্বরের অসঙ্গত সাম্রাজ্যলালসা বর্ত্তমান না থাকিলে, বঙ্গদেশে মুসলমানরাজ্য প্রতিষ্ঠা-লাভ করিতে পারিত কিনা তদ্বিষয়ে সংশয়ের অভাব নাই। করিলেও, তাহা হিন্দুমুসল-মানকে স্বার্থ-সমন্বয়ে একত্রিত করিতে সমর্থ হইত না। দিল্লীশ্বরের সেনাবলের সহায়তা গ্রহণ করিয়াই তদীয় রাজপ্রতিনিধিগণ রাজ্য বিস্তার ও রাজ্যরক্ষায় ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। নচেৎ অল্পসংখ্যক খিলিজি বীরদিগের পক্ষে দেশজয় বা রাজ্যরক্ষা করা সহজ হইত না। দিল্লীশ্বর এই সকল কারণে বঙ্গরাজ্য দিল্লী-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিবামাত্র, বঙ্গবাসী হিন্দুমুসলমান তাহাতে বাধা প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছিল। দিল্লীর অভিযানই বাঙালী হিন্দুমুসলমানকে জাতিধর্ম্মের পার্থক্য ভুলাইয়া স্বার্থসমন্বয়ে বাঙালী করিয়া তুলিয়াছিল। বঙ্গভূমি কাহার হইবে, তাহার মীমাংসার জন্য দিল্লীশ্বর যখনই বাদশাহী সেনা লইয়া যুদ্ধযাত্রা করিয়াছেন, তখনই বাঙালী হিন্দুমুসলমান একবাক্যে বলিয়া উঠিয়াছে,—বঙ্গভূমি বাঙালীমাত্রের জন্মভূমি—স্বতন্ত্র, স্বাধীন। ইহার জন্যই বঙ্গভূমির বুকের উপর দাঁড়াইয়া মুসলমান মুসলমানের শোণিতপাত করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই ; ইহার জন্যই স্বধর্ম্ম অপেক্ষা স্বদেশ বাঙালী মুসলমানগণকে অধিকমাত্রায় অনু-

প্রাণিত করিয়া তুলিয়াছিল। তাহারা গৌড়ীয় সাম্রাজ্যকে সর্ব্বাংশে দিল্লীর সমকক্ষ করিয়া তুলিবার জন্যই প্রাণপণ করিয়াছিল। গৌড়ীয় ধ্বংসাবশেষের মধ্যে—বিজনবনের অন্তরালে—এখনও যে সকল পুরাকীর্ত্তির নিদর্শন পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার সর্ব্বাঙ্গে এই স্বাতন্ত্র-লিপ্সা প্রকটিত হইয়া রহিয়াছে!

গোলাম হোসেন তাঁহার সুবিখ্যাত "রিয়াজ-উস্-সলাতিন" গ্রন্থে ফকর উদ্দীনকেই এই বিজয় রাজ্যের সর্ব্বপ্রথম স্বাধীন সুলতান বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন,—"দিল্লীশ্বর মহম্মদ শাহ তোগলকের শাসন সময়ে তদীয় রাজপ্রতিনিধি কাদির খাঁর অধীনে ফকর উদ্দীন সিলাদারের কার্য্যে নিযুক্ত থাকায় অস্ত্র শস্ত্র তাঁহার হস্তেই ন্যস্ত ছিল। তিনি সুযোগ পাইবামাত্র, প্রভুহত্যা করিয়া, সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন।"

গোলাম হোসেন যেরূপভাবে এই স্বাধীনতালাভের কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহার সহিত বদৌনীর ভ্রমণ-বৃত্তান্তের সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায় না। বদৌনী বলেন,—"ফকর উদ্দীন আদৌ গৌড়ে ছিলেন না। তিনি সুবর্ণগ্রামের অধিপতি বহরম খাঁর সিলাদার ছিলেন। হিজরী ৭৩৯ সালে বহরম খাঁর মৃত্যু হইলে, ফকর উদ্দীন সুবর্ণগ্রামের শাসনভার গ্রহণ করেন। তৎকালে সুবর্ণগ্রাম একটি স্বতন্ত্র রাজ্যরূপে আত্মঘোষণা করিত;—দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করা দূরে থাকুক, গৌড়ের অধীনতা স্বীকার করিত না! কাদির খাঁ তৎকালে লক্ষণাবতী রাজ্যে দিল্লীশ্বরের রাজপ্রতিনিধি-রূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ফকর উদ্দীনকে বশ্যতা স্বীকার করাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রথম যুদ্ধে ফকর উদ্দীনের পরাজয় হইয়াছিল; কিন্তু দ্বিতীয় যুদ্ধে কাদির খাঁর বিদ্রোহী সেনাদল তাঁহাকে নিহত করায়, ফকর উদ্দীন সহজেই জয় লাভ করিয়াছিলেন। সুবর্ণগ্রামে ফকর উদ্দীনের স্বাধীন শাসন প্রতিষ্ঠিত হইলেও, লক্ষণাবতী রাজ্য হইতে দিল্লীশ্বরের অধীনতা বিদূরিত হইল না। কাদির খাঁ নিহত হইবামাত্র, তাঁহার সেনাপতি আলি মোবারক লক্ষণাবর্তী অধিকার করিয়া রহিলেন। এইরূপে বঙ্গদেশে দুইটি মুসলমান রাজ্যের অভ্যুদয় হইল। একটি সুবর্ণগ্রামে—স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন। একটি লক্ষণাবতীতে—দিল্লীর অনুগত এবং অধীন। ফকর উদ্দীন সমগ্র বঙ্গদেশকে দিল্লীর শাসনপাশ হইতে মুক্ত করিবার জন্য লক্ষণাবতীরাজ্য আক্রমণ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। কিন্তু স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা না করিয়া, মুখালিশ খাঁ নামক সেনাপতিকে প্রেরণ করিলেন। তিনি জয়লাভ করিতে পারিলেন না,—আলি মোবারক কর্তৃক পরাভূত এবং নিহত হইলেন! শত্রুসেনার আক্রমণ বেগ প্রতিহত করিয়া, আলি মোবারক সুবর্ণগ্রাম আক্রমণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তাহার জন্য তিনি বাদশাহী ফৌজের সহায়তা প্রার্থনা করিয়া দিল্লীশ্বরের শরণাগত হইলেন। দিল্লীশ্বর মালিক ইউসক নামক সেনাপতিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু পথিমধ্যে তাঁহার মৃত্যু হইল বলিয়া, সে অভিযান ব্যর্থ হইয়া গেল। এই সময়ে দিল্লীশ্বর স্বরাজ্যের নানা কার্য্যে বিশেষ ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। সুতরাং আপাততঃ লক্ষণাবতীরাজ্য রক্ষা করিয়া,

সুবর্ণগ্রাম রাজ্যের স্বাধীনতা ঘোষণাকে উপেক্ষা করিতে হইল। লক্ষ্মণাবতীরাজ্য রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে দিল্লীশ্বর অগত্যা আলি মোবারককেই রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইলেন। আলি মোবারক সনন্দলাভ করিবামাত্র আপনাকে সুলতান আলাউদ্দীন নামে প্রচারিত করিয়া দিলেন। প্রকৃত পক্ষে সমগ্র বঙ্গভূমিই দিল্লীশ্বরের হস্তচ্যুত হইয়া গেল। তথাপি তিনি সুবর্ণগ্রাম রাজ্যের স্বাধীনতা হরণ করিবার জন্যই বিশেষ লালায়িত হইয়া উঠিলেন। সুবর্ণগ্রাম রাজ্যও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণপণ করিতে ত্রুটি করিল না। উভয় পক্ষের শত সহস্র রণতরণী পদ্মাবক্ষ আলোড়িত করিয়া তুলিল,—অবশেষে দিল্লীশ্বরের জয় হইল,—ফকর উদ্দীন পরাভূত হইয়া লক্ষ্মণাবতী নগরে আনীত হইলেন। এবং তথায় নির্দ্দয়রূপে নিহত হইলেন। সুবর্ণগ্রামরাজ্য লক্ষ্মণাবতীরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া, দিল্লীশ্বর স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে না করিতে, বঙ্গভূমি সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনতা লাভ করিল। পাত্রমিত্র এবং সমস্ত নগরপালগণ রাজপ্রতিনিধি আলাউদ্দীনকে নিহত করিয়া, সামসুদ্দীন ইলিয়াসকে গৌড়ের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিলেন।" প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাকেই প্রথম স্বাধীন সুলতান বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে।

কিরূপে এই মহাপরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল, তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রাপ্ত হইবার আশা নাই। দিল্লীর পক্ষে তাহা পরাজয় কাহিনী। তজ্জন্যই দিল্লীর ইতিহাসলেখকগণ তাহার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। মালদহ অঞ্চলে অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহার অনেক জনশ্রুতি প্রচলিত ছিল। গোলাম হোসেন নানা হস্তলিখিত পুস্তকে তাহার উল্লেখ দেখিয়া স্বরচিত গ্রন্থে কিছু কিছু লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। গোলাম হোসেন কোন্ গ্রন্থ হইতে কোন্ কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন, দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার কিছুমাত্র উল্লেখ করিয়া যান নাই। তাঁহার দপ্তর ছিল, তাহাতে পুরাতন হস্তলিখিত গ্রন্থাদি ছিল, এখন তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে! গোলাম হোসেনের দপ্তর আবদুল করিমের হস্তে পতিত হইয়াছিল, তাহার পর তাহা ইলাহিবক্স রক্ষা করিতেন। ইলাহিবক্সের উত্তরাধিকারীগণ তাহা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন! এরূপ অবস্থায় গোলাম হোসেনের গ্রন্থ হইতে যাহা কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই প্রধান অবলম্বন হইয়া রহিয়াছে। তাহার সহিত এখনও জনশ্রুতির সংস্রব দেখিতে পাওয়া যায়।

গোলাম হোসেন বলেন—"আলি মোবারক প্রথমে মালিক ফিরোজ রজব নামক এক অমাত্যের বিশ্বাসী ভৃত্য ছিলেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যাইত। ফিরোজ রজব দিল্লীশ্বর খিয়াসুদ্দীনের ভ্রাতষ্পুত্র ছিলেন। মহম্মদ শাহ তোগলক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তাঁহাকেই প্রধান অমাত্য করিয়াছিলেন। আলি মোবারকের পিতার হাজি ইলিয়াস নামক এক পালিত পুত্র কোনও দুষ্কার্য্য করিয়া দিল্লী হইতে পলায়ন করায়, সেই অপরাধে মোবারক পদচ্যুত ও নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। তিনি এইরূপে বঙ্গদেশে আগমন করেন। আসিবার সময়ে পথিমধ্যে আলি মোবারক এক স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন,—

যেন হজরত শাহ মকৃদুম জালালুদ্দীন তবরিজি বলিতেছেন—"তোমাকে বঙ্গরাজ্য দান করিলাম, তুমি আমার জন্য একটি ভজনালয় নির্ম্মাণ করিয়া দিও!" আলি মোবারক কোথায় ভজনালয় নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন তাহার কথা জিজ্ঞাসা করায়, মকৃদুম সাহেব বলিয়াছিলেন—"পাণ্ডুয়ায়।" মোবারক বঙ্গদেশে আসিয়া কাদির খাঁর সেনাপতি হইয়াছিলেন। পরে কাদির খাঁ নিহত হইবার পর, আপনাকে লক্ষ্মণাবতীর সুলতান বলিয়া ঘোষিত করিয়াছিলেন। হাজি ইলিয়াস্ এই সময়ে পাণ্ডুয়ায় উপনীত হইলে, মোবারক তাঁহাকে বন্দী করিয়াছিলেন; পরে মাতার অনুরোধে মুক্তিদান করেন। মুক্তিলাভের পর হাজি ইলিয়াস সেনাদলের সহায়তা লাভ করিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন।"

এই জনশ্রুতিমূলক উপাখ্যানের মধ্যে কত ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত রূপান্তরিত হইয়া রহিয়াছে, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। তবে পাণ্ডুয়া নগরেই যে স্বাধীন রাজধানী সংস্থাপিত হইয়াছিল, সে কথা সকল ইতিহাসেই লিখিত আছে এবং আলি মোবারক যে মকৃদুম সাহেবের নামে একটি ভজনালয় নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহারও প্রমাণ পরম্পরা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই। এই সকল আনুসঙ্গিক প্রমাণ এবং জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিলে বলিতে হয়,—আলি মোবারক দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করিয়া নির্ব্বাসনও হইতে অব্যাহতি লাভের চেষ্টা করিতে গিয়া সেনাদলকর্তৃক নিহত হইয়া থাকিবেন। মূল কথা, দেড় শত বৎসরের নানা বিপ্লবের পর বঙ্গভূমির এই স্বাধীনতাকে একটি আকস্মিক ব্যাপার বলিয়া স্বীকার করিতে সাহস হয় না। ইহা কেবল দেড় শত বৎসরের বিবিধ চেষ্টার পরিপুষ্ট পরিণাম বলিয়াই উল্লিখিত হইতে পারে।

পুরাকালে সকল দেশেই সেনাদলের আধিপত্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ছিল। তজ্জন্য সেনাপতিগণ ইচ্ছামত সিংহাসন অধিকার করিতে পারিতেন;—ইচ্ছা করিলে, একজনের পরিবর্ত্তে আর একজনকে সিংহাসন দান করিতে পারিতেন। হাজি ইলিয়াস এই কারণেই সিংহাসন লাভে কৃতকার্য্য হইয়া থাকিবেন। তিনি সাহসী এবং সুচতুর বলিয়া সুপরিচিত ছিলেন। তাঁহার পক্ষে দিল্লীশ্বরের অনুকম্পা লাভের আশা ছিল না। সুতরাং গৌড়ীয় সেনাদলের স্বাভাবিক স্বাধীনতা-লিপ্সা তাঁহার পক্ষে সর্ব্বাংশে অনুকূল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা মনের মত নায়ক পাইলে স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিত,—সে কথা কাহারও অবিদিত ছিল না। এত দিন মনের মত নায়ক না পাইয়া, তাহারা মৌখিক রাজভক্তি প্রকাশ করিত। হাজি ইলিয়াসকে প্রাপ্ত হইবামাত্র তাহাদের চির সংকল্পিত ব্রত সফল হইয়া গেল।

হাজি ইলিয়াস এইরূপে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া সুলতান সামসুদ্দীন নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সেই নামেই ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়া আসিতেছেন। কিন্তু তিনি অতিমাত্রায় ভাঙ খাইতেন বলিয়া সমসাময়িক লোকসমাজে "ভাঙড়" নামই সমধিক সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে নাম এখনও মালদহ অঞ্চল হইতে একেবারে অন্তর্হিত হয় নাই। তজ্জন্য গোলাম হোসে-

নের গ্রন্থে সুলতান সামসুদ্দীন "ভাঙড়" বলিয়াই উল্লিখিত। *

স্বাধীনতা লাভ করা সহজ; স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন। সিংহাসনে আরোহণ করিবামাত্র সামসুদ্দীন তাহার নানা প্রমাণ প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। আলি মোবারক পরাভূত হইলেও, তাঁহার পুত্র এক্তিয়ার উদ্দীন সুবর্ণগ্রামে অধিকার সংস্থাপিত করিয়া সুলতান সামসুদ্দীনের শাসনক্ষমতা অস্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সুতরাং সামসুদ্দীনকে আবার যুদ্ধ কলহে লিপ্ত হইতে হইল। সামসুদ্দীনের বীরবিক্রম সর্ব্বত্র বিজয় লাভ করিতে লাগিল;—সুবর্ণগ্রাম পরাভূত হইল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গ সামসুদ্দীনের করতলগত হইল। পশ্চিমবঙ্গেও সামসুদ্দীন বিজয়লাভ করিলেন। ক্রমে তাঁহার রাজ্যসীমা বারাণসী পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিল। এই আকস্মিক রাজ্যবিস্তারের একটি নিদর্শন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। বারাণসিপ্রদেশে হাজিপুর নামক যে নগর দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সুলতান সামসুদ্দীনকর্ত্তৃক দিগ্বিজয়ের নিদর্শনরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। হাজিপুরের নামকরণে সুলতান সামসুদ্দীনের পূর্ব্ব নাম চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। †

এইরূপে লক্ষণাবতীর ক্ষুদ্র রাজ্য একটি বৃহৎ সাম্রাজ্যে পরিণত হইতে লাগিল। তাহার রাজধানী কোথায় প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহার কথা উত্থাপিত হইবামাত্র সামসুদ্দীন পাণ্ডুয়া নগরকেই রাজধানীর যোগ্যস্থান বলিয়া মনোনীত করিয়াছিলেন। পাণ্ডুয়া পুরাতন রাজনগর, তাহার সহিত বহুশতাব্দীর পুরাকাহিনী জড়িত হইয়া রহিয়াছে। মুসলমানদিগের প্রথম রাজধানী দেবকোট এবং দ্বিতীয় রাজধানী গৌড়ের ন্যায় পাণ্ডুয়া অদ্যাপি পর্য্যটকগণের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া আসিতেছে। "সাতাইশঘরা" নামে যে স্থান অদ্যাপি পরিচিত আছে, তথায় একটি পুরাতন দীর্ঘিকাতীরে এক রাজভবনের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। দুর্গপ্রাচীর বা পরিখার চিহ্ন কালক্রমে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। দীর্ঘিকাটি উত্তর-দক্ষিণ লম্বা,—হিন্দুকীর্ত্তি বলিয়াই প্রতিভাত। তাহার তীরে যে রাজভবন বর্ত্তমান ছিল, তাহার স্নানাগারের কিয়দংশমাত্রই কালপরাজয় করিয়া অদ্যাপি আত্মরক্ষা করিতেছে। ইহাই সুলতান সামসুদ্দীনে "ভাঙড়ের" রাজভবন বলিয়া অনুমিত হইয়া আসিতেছে! এখানে একদিন কি ছিল, এখন কি হইয়াছে;—এখন কেবল বিজন বনের অন্তরালে শ্বাপদসমূহের অশান্ত আস্ফালন!

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

---

* As he took much *Bhang*, he was called Shamshuddin Bhangarah.—*Riaz-us-Salateen.*

† He extended his western boundaries as far as Beneras, and founded Hajipur.—*Ibid.*

তালীবনের ভারতে।

বাই-নাচ।

১২

দীর্ঘায়াত নেত্র বিশিষ্ট, রং-করা একটি তরুণ মুখ,—ইন্দ্রিয়াসক্তি-পরিব্যঞ্জক মুখ,—তিমির-রাজ্যের মুখ—খুব লঘুভাবে, তাড়াতাড়ি একবার এগিয়া আসিতেছে, আবার পিছিয়া যাইতেছে। চোখের দুইটি তারা, মিনা-র সাদা জমির উপর বসানো কৃষ্ণমণির (onyx) মত কালো দুইটি তারা আমার চোখের উপর নিবদ্ধ। এই যে হৃদয়-দুর্গ অধিকার করিবার জন্য একবার আমাকে আক্রমণ করিতেছে, আবার পলায়ন করিয়া ছায়ান্ধকারের মধ্যে মিশিয়া যাইতেছে, একবার এগিয়া আসিতেছে, আবার পিছাইয়া যাইতেছে,—এই সমস্ত ক্ষণ উহার চোখের দুইটি কালো তারা আমার চখের উপর সমানভাবে নিবদ্ধ। এই শ্যামল তরুণ মুখখানি মনিরত্নে বিভূষিত; হীরক-খচিত একটা সোণার সিঁথি ললাট বেষ্টন করিয়া, চুল ঢাকিয়া রগের দিকে নামিয়া আসিয়াছে; কাণে ও নাকে আরও কতকগুলি হীরার টুক্‌রা ঝিক্ মিক্ করিতেছে।

আলোক-উজ্জ্বল রাত্রি। জনতার মধ্যে, এই রমণীকে ছাড়া আমি আর কাহাকেও দেখিতেছি না, উহার ঐ সিথি-বিভূষিত মস্তক ছাড়া আর কিছুই দেখিতেছি না। উহার উজ্জ্বলতা যেন আমাকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। দর্শক-বৃন্দের জনতাও আছে—উহারাও সম্মুখে ঠেলিয়া আসিয়া রমণীকে একদৃষ্টে দেখিতেছে; এতটা ঠেলিয়া আসিয়াছে যে রমণী অতি কষ্টে ঘোরাফেরা করিতেছে—উহারা রমণীর জন্য কেবল একটি সরু পথের মত স্থান রাখিয়া দিয়াছে; সেই স্থান টুকুর মধ্য দিয়া, নর্ত্তকী একবার আমার নিকটে আসিতেছে, আবার আমার নিকট হইতে পলায়ন করিতেছে; কিন্তু আমার চক্ষে জনতার যেন অস্তিত্বমাত্র নাই; বস্তুত সেই রমণীকে ছাড়া,—সেই রমণীর শিরোভূষণটি ছাড়া, তাহার সেই চোখের কালো তারা ও কালো ভুরুর খেলা ছাড়া, আমি যেন আর কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না—কিছুই দেখিতে পাইতেছি না··· বেশ মোটা সোটা ও মাংসল হইলেও, উহার দেহযষ্টি ভুজঙ্গের ন্যায় সুনম্য; বিধাতা যেন মনোহরণ ও আলিঙ্গনের জন্যই উহার বাহু দুটি গড়িয়াছেন; রমণী, হীরক মাণিক্য-খচিত বলয় কেউরাদি ভূষণে আবদ্ধ-বিভূষিত বাহুযুগল ভুজঙ্গ-গতির অনুকরণে কত রকম করিয়া বাঁকাইতেছে...কিন্তু না, সর্ব্বাগ্রে উহার চোখের দৃষ্টি আমার চোখের অন্তস্তল পর্য্যন্ত এমন ভাবে ভেদ করিতেছে যে আমার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিতেছে; ঐ চোখে নানাপ্রকার ভাব খেলিতেছে—কখন পরিহাসের ভাব, কখন স্নিগ্ধ কোমল প্রেমের ভাব...উহার মনিরত্নখচিত শিরোভূষণের, ও কর্ণ-নাসিকার

অলঙ্কারের এরূপ উজ্জ্বলতা এবং ঐ উজ্জ্বল সোণার সিঁথিটি এমন পরিপাটিরূপে উহার মুখটি বেড়িয়া আছে, যে তাহাতে ঐ সুন্দর শ্যামল মুখখানিতে কি জানি কি একটা অস্পষ্ট দূরত্বের ভাব আসিয়া পড়িয়াছে—আমাকে স্পর্শ করিলেও যেন সে দূরত্ব ঘুচিবার নহে।

সে যাইতেছে, আবার আসিতেছে; নর্ত্তকী বিশেষ করিয়া আমার জন্যই নাচিতেছে। উহার নৃত্যে লেশমাত্র শব্দ নাই। গালিচার উপর কেবল উহার পাঁয়ের মৃদুমধুর নূপুর-শিঞ্জন শুনা যাইতেছে। উহার ছোট ছোট পা দুখানির আঙ্গুলগুলি ছড়ানো, আংটীর দ্বারা ভারাক্রান্ত; গালিচার উপরে পা দুখানি তালে তালে ফেলিতেছে; এবং পায়ের আঙ্গুলগুলাও হাতের মত কেমন সহজভাবে নাড়িতেছে।

ফুলের গন্ধে এখানকার বাতাস এমন পরিষিক্ত যে নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া যায়। এখানকার হিন্দুরা, হিন্দু ফরাসীরা—আমার জন্য এই উৎসবের আয়োজন করিয়াছে, এবং উহাঁদের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা ধনবান্, আমি নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহারই বাড়ীতে আসিয়াছি। আমি আসিবামাত্র গৃহস্বামী আমার গলায় কয়েক ছড়া জুঁই ফুলের মালা পরাইয়া দিলেন; সৌরভে ঘর ভরিয়া গেল—আমার যেন একটু নেশার ঘোর লাগিল; লম্বা-গলা-বিশিষ্ট একটা রূপার গোলাবদান হইতে খানিকটা গোলাপ জলও আমার উপর ছিটাইয়া দেওয়া হইল। গরমে হাঁপাইয়া উঠিতেছি। যে সকল নিমন্ত্রিত লোক বসিয়া আছে—(অধিকাংশই জরির পাড়ওয়ালা-পাগড়ী-পরা শ্যামবর্ণ লোক) দণ্ডায়মান নগ্নকায় ভৃত্যেরা তাহাদের মাথার উপর, রং-চঙে বড় বড় তালপাতার পাখা ব্যজন করিতেছে; যেখানে লোকেরা বেশ-ভূষায় বিভূষিত—এমন কি পুরুষেরা পর্য্যন্ত কানে হীরা পরিয়াছে—কোমরবন্দে হীরা পরিয়াছে—সেই জনতার মধ্যে ভৃত্যদের এইরূপ নগ্নতা কেমন বিসদৃশ বলিয়া মনে হয়।

নর্ত্তকীকে উহারা বলিয়াছে,—আমারই জন্য এই উৎসবের আয়োজন; তাই, চতুর অভিনেত্রী এবং বংশপরম্পরাক্রমে পেষাদার এই নর্ত্তকী, আমার উপরেই তাহার সমস্ত চাতুরী প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

আজিকার রাত্রির জন্য, উহাকে বহুদূর হইতে আনা হইয়াছে—এই প্রসিদ্ধ নর্ত্তকী, দাক্ষিণ প্রদেশের কোন এক বৃহৎ দেবালয়ে মহাদেবের সেবায় নিযুক্ত। উহাকে আনিতে অনেক অর্থব্যয় হইয়াছে।

নর্ত্তকী সম্মুখ দিকে ঝুঁকিতেছে কিংবা ধনুকের মত বাঁকিয়া পড়িতেছে, হাতের আঙ্গুল বাঁকাইয়া, পায়ের আঙ্গুল ঘুরাইয়া কত রকম ভঙ্গী করিতেছে। শৈশবাবধি অভ্যাসের দ্বারা উহার পায়ের আঙ্গুলগুলা বেশ সুনম্য হইয়াছে; পায়ের বুড়া আঙ্গুলটি সর্ব্বদাই অন্য আঙ্গুল হইতে বিচ্ছিন্ন এবং সিধা ভাবে উপর-পানে তোলা। সোনালী গাজের শাড়ীতে নিতম্বদেশ আচ্ছাদিত এবং বক্ষদেশ আঁট সাঁট কাঁচুলীতে আবদ্ধ—তাহাতে শ্যামল গাত্র ও মাংশপেশীযুক্ত মাংসল শরীরের একটু আভাস পাওয়া যাইতেছে, বক্ষের নিম্ন অংশের নড়াচড়া দেখা যাইতেছে।

উহার নৃত্যে কেবলই কতকগুলি অঙ্গভঙ্গী ও হাব্‌ভাব; যে নাট্যাভিনয়ে কথোপকথন নাই, কেবল একজন মাত্র অভিনয় করে,

সেইরূপ নাট্যের যেন ইহা মূক অভিনয়; আর আমার চোখের উপর চোখ নিবদ্ধ করিয়া, সেই জনতা-বিরচিত সরু পথের মধ্য দিয়া, একবার আমার নিকটে এগিয়া আসিতেছে, আবার সহসা আলোকিত নৃত্যশালার শেষপ্রান্তে পিছিয়া যাইতেছে।

এইবার নর্ত্তকী, মনোহরণ ও ভৎ‍সনার একটা দৃশ্য অভিনয় করিতেছে। ঐ ওদিকে উহার পশ্চাতে কতকগুলি বাদক গান গাহিয়া এই দৃশ্যটির ভাব ব্যক্ত করিতেছে এবং গানের সঙ্গে বাঁয়া-তব্‌লা ও বাঁশী বাজাইতেছে। নর্ত্তকীও মূক-অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে মৃদুস্বরে যেন স্বগত গাইতেছে; সে গান আর কাহাকে শুনানো যেন তাহার উদ্দেশ্য নয়—কেবল অভিনয়ের অংশগুলা পর-পর যাহাতে তাহার স্মরণে আইসে এইজন্যই যেন আপনার মনে গাইতেছে।

এই নর্ত্তকী নৃত্যশালার এক প্রান্তে কিছুক্ষণ অন্ধকারের মধ্যে ছিল,—সহসা আবার আসিয়া উপস্থিত;—উহার দেহ আপাদ-মস্তক সোনা ও জহরতে আচ্ছন্ন, উহার চোখ দিয়া যেন আগুন ছুটিতেছে; কুপিতা নায়িকার ন্যায় আমার উপর রোষকষায়িত-নেত্রবাণ বর্ষণ করিতেছে; আমি যেন উহার নিকট কি একটা অপরাধ করিয়াছি—এইভাবে যেন সে স্বর্গমর্ত্তকে সাক্ষী রাখিয়া, আমাকে ভৎ‍সনা করিতেছে...

তার পর, নর্ত্তকী হঠাৎ উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল, সে হাসি ঠাট্টার হাসি, ঘৃণার হাসি; জনতার নিকট আমাকে হাস্যাস্পদ করিবার জন্য আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া হাসিতে লাগিল। জানা কথা, উহার ভৎ‍সনাও যেমন কৃত্রিম, এই উপহাসও সেইরূপ কৃত্রিম। কৃত্রিম হউক, কিন্তু আসলের ঠিক্ নকল;—চমৎকার নকল।

নর্ত্তকী কণ্ঠ একটু উত্তোলন করিয়া, একটু গম্ভীর স্বরে, তীব্র হাসি হাসিতেছে। তাহার হাসি—মুখ দিয়া, ভুরু দিয়া, উদর দিয়া, কম্পবান বক্ষ দিয়া, যেন ফাটিয়া বাহির হইতেছে। হাসির আবেশে উহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল এবং এইরূপ হাসিতে হাসিতে দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল। সে হাসি দুর্দ্দমনীয়, সে হাসি শুনিলে অন্যকেও হাসিতে হয়।

আর যেন আমার মুখদর্শন করিবে না, এইভাবে অত্যন্ত অবজ্ঞা সহকারে, মুখ ফিরাইয়া, নর্ত্তকী দ্রুতপদক্ষেপে পিছাইতে পিছাইতে চলিয়া গেল। আবার ফিরিয়া আসিল—কিন্তু এবার ধীরপদক্ষেপে ও গম্ভীরভাবে। আমার উপর তাহার প্রবল ভালবাসা পড়িয়াছে; সে সর্ব্বজয়ী মদনের নিকট পরাভূত হইয়া, আমার দিকে বাহুপ্রসারিত করিয়া করযোড়ে মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছে; আমাকে তাহার সর্ব্বস্ব দান করিবে বলিয়া অনুনয় করিতেছে, ইহাই তাহার শেষ প্রার্থনা। এবার যখন চলিয়া গেল, তখন তাহার দেহ একটু হেলিয়া পড়িয়াছে, ওষ্ঠদ্বয় একটু ফাঁক হইয়া, তাহার মধ্য হইতে শুভ্র দন্তরাজি প্রকাশ পাইতেছে; তাহার নাসিকায় হীরকের টুক্‌রাগুলি ঝিক্‌মিক্ করিতেছে; সে চায়—সে নিতান্তই চায়, আমি তাহার অনুসরণ করি; সে তাহার বাহুর দ্বারা, তাহার বক্ষের দ্বারা, তাহার অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রের দ্বারা আমাকে ডাকিতে লাগিল; সে চুম্বকমণির মত, সর্ব্বান্তঃকরণে আমাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল; আমিও মন্ত্রমুগ্ধ

অবস্থায়, ক্ষণেকের জন্য তাহাকে অনুসরণ করিলাম ; কেন না, সে আমাকে সত্যই মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু আসলে তাহার এই প্রেমের আহ্বানটা সর্ব্বৈব মিথ্যা ; হাসির মত এই প্রেমের প্রকাশও তাহার অভিনয়ের একটা অংশ মাত্র ; এ কথা সবাই জানে, তবু তাহাতে আকর্ষণের কিছুই লাঘব হয় না ; প্রত্যুত, এই আহ্বান মিথ্যা বলিয়া জানি বলিয়াই যেন উহার এই দুষ্ট আকর্ষণের মাত্রাটা আরও বৃদ্ধি হয়...

যতক্ষণ সে অভিনয় করিতেছিল,—বাদকদলের দুই গায়কের সহিত সে যেন একপ্রকার চুম্বক আকর্ষণে সংযুক্ত কিংবা একটা অদৃশ্য বন্ধনে আবদ্ধ ছিল।

তাহারা তাহার তিন চারি পা পশ্চাতে থাকিয়া, তাহারই সঙ্গে সঙ্গে এগিয়া আসিতেছে—পিছাইয়া যাইতেছে। সে যখন এগিয়া আসে, তাহার পিছনে পিছনে তাহারাও এগিয়া আসে,—এবং পিছাইবার সময় হইলে তাহারাই আগে পিছাইতে আরম্ভ করে। তাহারা কখনই তাহাকে নজর-ছাড়া করে না ; উহাদের চোখ্ যেন জ্বলিতেছে, ওষ্ঠ অনেকটা উদ্ঘাটিত রহিয়াছে, আর উচ্চৈঃস্বরে গান করিতেছে ; মস্তক সম্মুখে এগিয়া আসিয়াছে, ঝুঁকিয়া রহিয়াছে ; উহারা মাথায় উঁচু, নর্ত্তকী ক্ষুদ্রকায় ; উহারাই যেন নর্ত্তকীর প্রভু ; উহাদেরই প্রভাবে যেন উহার ভাবস্ফুর্ত্তি হইতেছে, উহারাই উহার মনকে অধিকার করিয়া রহিয়াছে ; উহারাই যেন একটা উজ্জ্বল লঘুকায় প্রজাপতির উপর ফুঁ দিয়া নিজের খেয়াল-অনুসারে উহাকে যেখানে সেখানে চালাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে। উহার মধ্যে, কি জানি কেমন একটা বিকৃতভাব—কেমন একটা কুটিল ভাবও পরিলক্ষিত হয়।

বাদকদলের পাশে, আরও দুই তিনটি নর্ত্তকী রহিয়াছে,—উহারই মত বেশভূষায় সুসজ্জিত। উহারা প্রথমেই নাচিয়াছে। উহার মধ্যে একজনকে আমার ভারী অদ্ভুত বলিয়া ঠেকিয়াছিল ; যেন একপ্রকার বিষাক্ত সুন্দর ফুল, পাত্‌লা ও লম্বা ; মুখটা সরু ; একেই ত বড় বড় টানা চোখ্, তাতে আবার সুর্মা দেওয়ায় আরও বেপরিমাণ দীর্ঘ হইয়াছে, চুল খুব কালো, দুই গালের উপর দিয়া, খুব 'পেটে-পাড়ানো' ভাবে ফিতার মত নামিয়াছে ; শুধু কালো পরিচ্ছদ, কালো শাড়ী, সরু জরির পাড়-ওয়ালা একটা কালো ওড়না ; অলঙ্কারের মধ্যে শুধু মাণিকের অলঙ্কার ; হাতে মাণিক, বাহুতে মাণিক ; এবং একগুচ্ছ মাণিক নাসিকা হইতে লম্বিত হইয়া ওষ্ঠের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে, মনে হইতেছে যেন রক্তপায়ী রাক্ষসীর মুখে এখনও রক্তের দাগ লাগিয়া রহিয়াছে।

কিন্তু যখন আবার সেই স্বর্ণভূষণা নর্ত্তকী—সেই নর্ত্তকীবৃন্দের রাণী, নর্ত্তকীবৃন্দের উজ্জ্বল তারা,—বাদকদলে পরিবেষ্টিত হইয়া আবার সহসা আবির্ভূত হইল, তখন উহাদের স্মৃতি, আমার মন হইতে একেবারেই অন্তর্হিত হইল। শেষ নৃত্যের জন্য উহাকেই রাখা হইয়াছিল।

এই নর্ত্তকী অনেকক্ষণ ধরিয়া নৃত্য করিল ; যদিও এই নৃত্যে আমার ক্লান্তিবোধ হইতে ছিল, তবুও সেই সঙ্গে ভয়ও হইতেছিল, কোন্ মুহূর্ত্তে না জানি তাহার নৃত্যের

অবসান হইবে, আমি তাহাকে আর দেখিতে পাইব না।

আবার সেই ভৎ্সনা, সেই দুর্দ্দমনীয় হাসি, নেত্রভঙ্গীতে সেই বিদ্রূপের ভাব, আবার সেই নিরঙ্কুশ প্রেমের আহ্বান…

যাই হোক্, নর্ত্তকী এইবার থামিল। সব শেষ হইয়া গেল; আমার চমক ভাঙ্গিল; যে সব লোক সেখানে ছিল তাহাদিগকে আবার আমি দেখিতে পাইলাম। আমার অভ্যর্থনার জন্যই এই মজলিসের আয়োজন হইয়াছিল; আবার আমি মজলিসের বাস্তব ভূমিতে পদার্পণ করিলাম।

এইবার প্রস্থানের সময় হইয়াছে। প্রস্থানের পূর্ব্বে, নর্ত্তকীকে আমি অভিনন্দন করিতে গেলাম। দেখিলাম, নর্ত্তকী একটা মিহি রুমাল দিয়া মুখ মুছিতেছে; উহার বড় গরম বোধ হইতেছে, মুক্তাফলের ন্যায় স্বেদ-বিন্দু উহার ললাটে, উহার শ্যামল মসৃণ গাত্রে দেখা দিয়াছে। এখন সে আদব্-কায়দা-দুরস্ত, পাষাণ-শীতল, সুবিনীত, উদাসীন, হৃদয়-হীন অভিনেত্রী মাত্র; সে কৃত্রিম লজ্জার সহিত, আমার প্রশংসা গ্রহণ করিল, আমাকে সেলাম করিল; প্রত্যেকবারেই, অঙ্গুরী-বিভূষিত-সর্ব্বাঙ্গুলি —হস্তযুগলের—দ্বারা আপনার মুখ ঢাকিতে লাগিল…

শত সহস্র বৎসর হইতে বংশানুক্রমে যাহার ব্যবসায় চলিয়া আসিতেছে সেই পুরাতন নর্ত্তকীর বংশে ইহার জন্ম, ইহার হৃদয়ে মোহ-বিভ্রম ও ভোগবিলাস ছাড়া আর কি থাকিতে পারে?…

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নিরাশ্রয়।

হে আমার ক্রীড়াশীল চঞ্চল সুন্দর,
জীবনের একমাত্র আনন্দ নির্ঝর,
পার্শ্বে তব আছিলাম বিছাইয়া প্রাণ
নিদাঘের তাপশীর্ণ তৃণের সমান;
তোমারি অমৃতস্পর্শ স্নেহের শীকরে
শুষ্ক মূল উঠেছিল জীবনেতে ভরে,
মাতা বসুমতী তাই স্নিগ্ধ বক্ষে তাঁর
গাঁথিয়াছিলেন ধীরে জীবন আমার;
তুমি গেছ, সে জীবন নিয়েছ হরিয়া
শুষ্ক শীর্ণ আছি পুন ধূলিতে পড়িয়া
চঞ্চল উদাস বায়ু নির্ব্বিচার ভরে
যেথায় উড়ায়ে ফেলে সেথা থাকি পড়ে।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

সমস্যা।

আমি "পথ ও পাথেয়" নামক প্রবন্ধে আমাদের কর্ত্তব্য এবং তাহার সাধনপ্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। উক্ত প্রবন্ধটিকে সকলে যে অনুকূলভাবে গ্রহণ করিবেন এমন আমি আশা করি নাই।

কোন্‌টা শ্রেয় এবং তাহা লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়টি কি তাহা লইয়াত কোনো দেশেই আজও তর্কের অবসান হয় নাই। মানুষের ইতিহাসে এই তর্ক কত রক্তপাতে পরিণত হইয়াছে এবং একদিক হইতে তাহা বিলুপ্ত হইয়া আর এক দিক্‌ দিয়া বার বার অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছে।

আমাদের দেশে দেশহিত সম্বন্ধে মতভেদ এতকাল কেবল মুখে মুখে এবং কাগজে কাগজে, কেবল ছাপাখানায় এবং সভাক্ষেত্রে কথার লড়াইরূপেই সঞ্চরণ করিয়াছে। তাহা কেবল ধোঁয়ার মত ছড়াইয়াছে। আগুনের মত জ্বলে নাই।

কিন্তু আজ নাকি সকলেই পরস্পরের মতামতকে দেশের হিতাহিতের সঙ্গে আসন্ন ভাবে জড়িত মনে করিতেছেন, তাহাকে কাব্যালঙ্কারের ঝঙ্কার মাত্র বলিয়া গণ্য করিতেছেন না, সেইজন্য যাঁহাদের সহিত আমার মতের অনৈক্য ঘটিয়াছে তাঁহাদের প্রতিবাদবাক্যে যদি কখনো পরুষতা প্রকাশ পায় তাহাকে আমি অসঙ্গত বলিয়া ক্ষোভ করিতে পারি না। এ সময়ে কোনো কথা বলিয়া কেহ অল্পের উপর দিয়া নিষ্কৃতি পাইয়া যান না ইহা সময়ের একটা শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই।

তবু তর্কের উত্তেজনা যতই প্রবল হোক্‌ যাঁহাদের সঙ্গে আমাদের কোনো কোনো জায়গায় মতের অনৈক্য ঘটিতেছে দেশের হিতসাধনে তাঁহাদেরও আন্তরিক নিষ্ঠা আছে এই শ্রদ্ধা যখন নষ্ট হইবার কোনো কারণ দেখিনা, তখন আমরা পরস্পর কি কথা বলিতেছি কি ইচ্ছা করিতেছি তাহা সুস্পষ্ট করিয়া বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। গোড়াতেই রাগ করিয়া বসিলে অথবা বিরুদ্ধ পক্ষের প্রতি সন্দেহ করিলে নিজের বুদ্ধিকে হয় ত প্রতারিত করা হইবে। বুদ্ধির তারতম্যেই যে মতের অনৈক্য ঘটে একথা সকল সময়ে খাটে না। অধিকাংশ স্থলে প্রকৃতিভেদেই মতভেদ ঘটে অতএব মতের ভিন্নতার প্রতি সম্মান রক্ষা করিলে যে নিজের বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি অসম্মান করা হয় তাহা কদাচই সত্য নহে।

এইটুকুমাত্র ভূমিকা করিয়া "পথ ও পাথেয়" প্রবন্ধে যে আলোচনা উত্থাপিত করিয়াছিলাম তাহারই অনুবৃত্তি করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

সংসারে বাস্তবের সঙ্গে আমাদিগকে কখনো আপস করিয়া কখনো বা লড়াই করিয়া চলিতে হয়। অন্ধতা বা চাতুরীর জোরে বাস্তবকে লঙ্ঘন করিয়া আমরা অতি ছোট কাজটুকুও করিতে পারি না।

অতএব দেশহিতের সংকল্প সম্বন্ধে যখন আমরা তর্ক করি তখন সেই তর্কের একটি

প্রধান কথা এই যে, সংকল্পটি যতই বড় হোক্ এবং যতই ভাল হোক্ বাস্তবের সঙ্গে তাহার সামঞ্জস্য আছে কিনা? কোন্ ব্যক্তির চেক্-বহির পাতায় কতগুলা অঙ্ক পড়িয়াছে তাহা লইয়াই তাড়াতাড়ি উৎসাহ করিবার কারণ নাই, কোন্ ব্যক্তির চেক্ ব্যাঙ্কে চলে তাহাই দেখিবার বিষয়।

সঙ্কটের সময় যখন কাহাকেও পরামর্শ দিতে হইবে তখন এমন পরামর্শ দিলে চলে না যাহা অত্যন্ত সাধারণ। কেহ যখন রিক্তপাত্র লইয়া মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে থাকে কেমন করিয়া তাহার পেট ভরিবে তখন তাহাকে এই কথাটি বলিলে তাহার প্রতি হিতৈষিতা প্রকাশ করা হয় না যে ভাল করিয়া অন্নপান করিলেই ক্ষুধানিবৃত্তি হইয়া থাকে। এই উপদেশের জন্যই সে এতক্ষণ কপালে হাত দিয়া অপেক্ষা করিয়া বসিয়া ছিল না। সত্যকার চিন্তার বিষয় যেটা, সেটাকে লঙ্ঘন করিয়া যত বড় কথাই বলি না কেন তাহা একেবারেই বাজে কথা।

ভারতবর্ষের সম্বন্ধেও প্রধান প্রয়োজনটা কি সে কথা আলোচনা উপলক্ষ্যে আমরা যদি তাহার বর্ত্তমান বাস্তব অভাব ও বাস্তব অবস্থাকে একেবারেই চাপা দিয়া একটা খুব মস্ত নীতিকথা বলিয়া বসি তবে শূন্য তহবিলের চেকের মত সে কথার কোনো মূল্য নাই; তাহা উপস্থিত মত ঋণের দাবী শান্ত করিবার একটা কৌশলমাত্র হইতে পারে কিন্তু পরিণামে তাহা দেনদার বা পাওনাদার কাহারও পক্ষে কিছুমাত্র কল্যাণকর হইতে পারে না।

"পথ ও পাথেয়" প্রবন্ধে আমি যদি সেইরূপ ফাঁকি চালাইবার চেষ্টা করিয়া থাকি তবে বিচার আদালতে ক্ষমা প্রত্যাশা করিতে পারিব না। আমি যদি বাস্তবকে গোপন বা অস্বীকার করিয়া কেবল একটা ভাবের ভুয়া দলিল গড়িয়া থাকি তবে সেটাকে সর্ব্বসমক্ষে খণ্ড বিখণ্ড করাই কর্ত্তব্য। কারণ, ভাব যখন বাস্তবের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া দেখা দেয় তখন গাঁজা বা মদের মত তাহা মানুষকে অকর্ম্মণ্য এবং উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তোলে।

কিন্তু বিশেষ অবস্থায় কোন্‌টা যে প্রকৃত বাস্তব তাহা নির্ণয় করা সোজা নহে। সেই জন্যই অনেক সময় মানুষ মনে করে যেটাকে চোখে দেখা যায় সেটাই সকলের চেয়ে বড় বাস্তব; যেটা মানব-প্রকৃতির নীচের তলায় পড়িয়া থাকে সেটাই আসল সত্য। কোনো ইংরাজ সাহিত্য-সমালোচক রামায়ণের অপেক্ষা ইলিয়ডের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করিবার কালে বলিয়াছেন, ইলিয়ড কাব্য অধিকতর human, অর্থাৎ মানব চরিত্রের বাস্তবকে বেশী করিয়া স্বীকার করিয়াছে;—কারণ উক্ত কাব্যে একিলিস নিহত শত্রুর মৃতদেহকে রথে বাঁধিয়া ট্রয়ের পথের ধূলায় লুটাইয়া বেড়াইয়াছেন আর রামায়ণে রাম পরাজিত শত্রুকে ক্ষমা করিয়াছেন। ক্ষমা অপেক্ষা প্রতিহিংসা মানব-চরিত্রের পক্ষে অধিকতর বাস্তব একথার অর্থ যদি এই হয় যে তাহা পরিমাণে বেশি তবে তাহা স্বীকার করা যাইতে পারে। কিন্তু স্থূল পরিমাণই বাস্তবতা পরিমাপের একমাত্র বাটখারা একথা মানুষ কোনো দিনই স্বীকার করিতে পারে না; এইজন্যই মানুষ ঘরভরা অন্ধকারের চেয়ে ঘরের কোণের একটি ক্ষুদ্র শিখাকেই বেশি মান্য করিয়া থাকে।

যাহাই হোক্, একথা সত্য যে মানব-

ইতিহাসের বহুতর উপকরণের মধ্যে কোন্‌টা প্রধান কোন্‌টা অপ্রধান, কোন্‌টা বর্ত্তমানের পক্ষে একান্ত বাস্তব এবং কোন্‌টা নহে, তাহা একবার কেবল চোখে দেখিয়াই মীমাংসা করা যায় না। অবশ্য একথা স্বীকার করিতে পারি, উত্তেজনার সময় উত্তেজনাটাকেই সকলের চেয়ে বড় সত্য বলিয়া মনে হয়। রাগের সময় এমন কোনো কথাকেই বাস্তবমূলক বলিয়া মনে হয় না যাহা রাগকে নিবৃত্তি করিবার জন্য দণ্ডায়মান হয়। এরূপ সময় মানুষ সহজেই বলিয়া উঠে, "রেখে দাও তোমার ধর্ম্ম কথা!" বলে যে, তাহার কারণ এ নয় যে, ধর্ম্ম কথাটাই বাস্তব প্রয়োজনের পক্ষে অযোগ্য এবং রুষ্ট বুদ্ধিই তদপেক্ষা উপযোগী কিন্তু তাহার কারণ এই যে, বাস্তব উপযোগিতার প্রতি আমি দৃক্‌পাত করিতে চাই না, বাস্তব প্রবৃত্তি-চরিতার্থতাকেই আমি মান্য করিতে চাই।

কিন্তু প্রবৃত্তি-চরিতার্থতাতে বাস্তবের হিসাব অল্পই করিতে হয়, উপযোগিতায় তাহার চেয়ে অনেক বেশি করা আবশ্যক। মুাটিনির পর যে ইংরেজেরা ভারতবর্ষকে নির্দ্দয়ভাবে দলন করিতে পরামর্শ দিয়াছিল তাহারা মানবচরিত্রের বাস্তবের হিসাবটাকে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ করিয়াই প্রস্তুত করিয়াছিল; রাগের সময় এই প্রকার সঙ্কীর্ণ হিসাব করাই যে স্বাভাবিক অর্থাৎ মাথাগন্তিতে অধিকাংশ লোকই করিয়া থাকে তাহা ঠিক কিন্তু লর্ড ক্যানিং ক্ষমার দিক্‌ দিয়া যে বাস্তবের হিসাব করিয়াছিলেন তাহা প্রতিহিংসার হিসাব অপেক্ষা বাস্তবকে অনেক বৃহৎ পরিমাণে অনেক গভীর এবং দূরবিস্তৃতভাবেই গণনা করিয়াছিল।

কিন্তু যাহারা ক্রুদ্ধ তাহারা ক্যানিঙের ক্ষমানীতিকে সেণ্টিমেণ্টালিজম্‌ অর্থাৎ বাস্তববর্জ্জিত ভাববাতিকতা বলিতে নিশ্চয়ই কুণ্ঠিত হয় নাই। চিরদিনই এইরূপ হইয়া আসিয়াছে। যে পক্ষ অক্ষৌহিনী সেনাকেই গণনাগৌরবে বড় সত্য বলিয়া মনে করে তাহারা নারায়ণকেই অবজ্ঞাপূর্ব্বক নিজের পক্ষে না লইয়া নিশ্চিন্ত থাকে। কিন্তু জয়লাভকেই যদি বাস্তবতার শেষ প্রমাণ বলিয়া জানি তবে নারায়ণ যতই একলা হোন্‌ এবং যতই ক্ষুদ্রমূর্ত্তি ধরিয়া আসুন তিনিই জিতাইয়া দিবেন।

আমার এত কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে যথার্থ বাস্তব যে কোন্‌ পক্ষে আছে তাহা সাময়িক উত্তেজনার প্রাবল্য বা লোকগণনার প্রাচুর্য্য হইতে স্থির করা যায় না। কোনো একটা কথা শাস্তরসাশ্রিত বলিয়াই যে তাহা বাস্তবিকতায় খর্ব্ব, এবং যাহা মানুষকে এত বেগে তাড়না করে যে পথ দেখিবার কোনো অবসর দেয়না তাহাই যে বাস্তবকে অধিক মান্য করিয়া থাকে একথা আমরা স্বীকার করিব না।

পথ ও পাথেয় প্রবন্ধে আমি দুইটি কথার আলোচনা করিয়াছি। প্রথমতঃ ভারতবর্ষের পক্ষে দেশহিতব্যাপারটা কি? অর্থাৎ তাহা দেশী কাপড় পরা বা ইংরেজতাড়ানো, বা আর কিছু? দ্বিতীয়ত সেই হিতসাধন করিতে হইবে কেমন করিয়া?

ভারতবর্ষের পক্ষে চরম হিত যে কি তাহা বুঝিবার বাধা যে কেবল আমরা নিজেরা উপস্থিত করিতেছি তাহা নহে বস্তুত তাহার সর্ব্বপ্রধান বাধা আমাদের প্রতি ইংরেজের ব্যব-

হায়। ইংরেজ কোনো মতেই আমাদের প্রকৃতিকে মানবপ্রকৃতি বলিয়া গণ্য করিতেই চায় না। তাহারা মনে করে তাহারা যখন রাজা তখন জবাবদিহি কেবলমাত্র আমাদেরই, তাহাদের একেবারেই নাই। বাংলাদেশের একজন ভূতপূর্ব্ব হর্ত্তাকর্ত্তা ভারতবর্ষের চাঞ্চল্য সম্বন্ধে যত কিছু উষ্মা প্রকাশ করিয়াছেন সমস্তই ভারতবাসীর প্রতি। তাঁহার মত এই যে কাগজগুলাকে উচ্ছেদ কর; সুরেন্দ্রবাড়ুযো, বিপিনপালকে দমন করিয়া দাও। দেশকে ঠাণ্ডা করিবার এই একমাত্র উপায় যাহারা অনায়াসে কল্পনা ও নিঃসঙ্কোচে প্রচার করিতে পারে তাহাদের মত ব্যক্তি যে আমাদের শাসনকর্ত্তার পদে প্রতিষ্ঠিত ছিল ইহাই কি দেশের রক্তগরম করিয়া তুলিবার পক্ষে অন্তত একটা প্রধান কারণ নহে? ইংরেজের গায়ে জোর আছে বলিয়াই মানবপ্রকৃতিকে মানিয়া চলা কি তাহার পক্ষে একেবারেই অনাবশ্যক? ভারতবর্ষের চাঞ্চল্য নিবারণের পক্ষে ভারতের পেন্সনভোগী এলিয়টের কি তাঁহার জাতভাইকে একটি কথাও বলিবার নাই? যাহাদের হাতে ক্ষমতা অজস্র তাহাদিগকেই আত্মসম্বরণ করিতে হইবেনা আর যাহারা স্বভাবতই অক্ষম শম দম নিয়ম সংযমের সমস্ত ব্যবস্থা কেবল তাহাদেরই জন্য! তিনি লিখিয়াছেন ভারতবর্ষে ইংরেজের গায়ে যাহারা হাত তোলে তাহারা যাহাতে কোনোমতেই নিষ্কৃতি না পায় সে জন্য সতর্ক হইতে হইবে। আর যে সকল ইংরেজ ভারতবর্ষীয়কে হত্যা করিয়া কেবলি দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইয়া ব্রিটিশ বিচার সম্বন্ধে চিরস্থায়ী কলঙ্কের রেখা আগুন দিয়া ভারতবর্ষের চিত্তে দাগিয়া দাগিয়া দিতেছে তাহাদের সম্বন্ধেই সতর্ক হইবার কোনো প্রয়োজন নাই? বলদর্পে অন্ধ ধর্ম্মবুদ্ধিহীন এইরূপ স্পর্দ্ধাই কি ভারতবর্ষে ইংরেজশাসনকে এবং ইংরেজের প্রজাকে উভয়কেই ভ্রষ্ট করিতেছে না? অক্ষম যখন অস্থিমজ্জায় জলিয়া জলিয়া মরে, যখন হাতে হাতে অপমানের প্রতিশোধ লওয়ার কাছে মানবধর্ম্মের আর কোনো উচ্চতর দাবী তাহার কাছে কোনো মতেই রুচিতে চাহেনা তখন কেবল ইংরেজের রক্তচক্ষু পিনালকোড়ই ভারতবর্ষে শান্তিবর্ষণ করিতে পারে এত শক্তি ভগবান ইংরেজের হাতে দেন নাই। ইংরেজ জেলে দিতে পারে ফাঁসি দিতে পারে কিন্তু স্বহস্তে অগ্নিকাণ্ড করিয়া তুলিয়া তার পরে পদাঘাতের দ্বারা তাহা নিবাইয়া দিতে পারে না—যেখানে জলের দরকার সেখানে রাজা হইলেও তাহাকে জল ঢালিতে হইবে। তাহা যদি না করে, নিজের রাজদণ্ডকে যদি বিশ্ববিধানের চেয়ে বড় বলিয়া জ্ঞান করে, তবে সেই ভয়ঙ্কর অন্ধতাবশতই দেশে পাপের বোঝা স্তূপাকৃত হইয়া একদিন সেই ঘোরতর অসামঞ্জস্য একটা নিদারুণ বিপ্লবে পরিণত না হইয়া থাকিতেই পারে না। প্রতিদিন দেশের অন্তরে অন্তরে যে চিত্তবেদনা সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে তাহাকে কৃত্রিম বলিয়া আত্মপ্রসাদস্ফীত ইংরেজ উড়াইয়া দিতে পার— মর্লি তাহাকে না মানাই রাষ্ট্রনীতিক সুবুদ্ধিতা বলিয়া মনে করিতে পার এবং এলিয়ট তাহাকে পরাধীন জাতির স্পর্দ্ধামাত্র মনে করিয়া বৃদ্ধ বয়সেও দন্তের উপর দন্তঘর্ষণের অসঙ্গত চেষ্টা করিতে পার কিন্তু তাই বলিয়া অক্ষমেরও এই বেদনার হিসাব কি কেহই রাখিতেছে না মনে কর? বলিষ্ঠ যখন মনে করে যে, নিজের

অন্যায় করিবার অবাধ অধিকারকে সে সংযত করিবেনা, কিন্তু ঈশ্বরের বিধানে সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে অনিবার্য্য প্রতিকার চেষ্টা মানব-হৃদয়ে ক্রমশই ধোঁয়াইয়া ধোঁয়াইয়া জ্বলিয়া উঠিতে থাকে তাহাকেই একমাত্র অপরাধী করিয়া দলিত করিয়া দিয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকিবে তখনই বলের দ্বারাই প্রবল আপনার বলের মূলে আঘাত করে;—কারণ তখন সে অশক্তকে আঘাত করে না—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূলে যে শক্তি আছে সেই বজ্রশক্তির বিরুদ্ধে নিজের বদ্ধমুষ্টি চালনা করে। যদি এমন কথা তোমরা বল ভারতবর্ষে আজ যে ক্ষোভ নিরস্ত্রকেও নিদারুণ করিয়া তুলিতেছে, যাহা অক্ষমের ধৈর্য্যকেও অভিভূত করিয়া তাহাকে নিশ্চিত আত্মঘাতের অভিমুখে তাড়না করিতেছে তাহাতে তোমাদের কোনো হাতই নাই—তোমরা ন্যায়কে কোথাও পীড়িত করিতেছ না, তোমরা স্বভাবসিদ্ধ অবজ্ঞা ও ঔদ্ধত্যের দ্বারা প্রতিদিন তোমাদের উপকারকে উপকৃতের নিকট নিতান্তই অরুচিকর করিয়া তুলিতেছ না, যদি কেবল আমাদেরই দিকে তাকাইয়া এই কথাই বল যে, অকৃতার্থের অসন্তোষ ভারতের পক্ষে অকারণ অপরাধ এবং অপমানের দুঃখদাহ ভারতের পক্ষে নিরবচ্ছিন্ন অকৃতজ্ঞতা, তবে সেই মিথ্যাবাক্যকে রাজতক্তে বসিয়া বলিলেও তাহা ব্যর্থ হইবে এবং তোমাদের টাইম্‌সের পত্রলেখক, ডেলি-মেলের সংবাদ-রচয়িতা এবং পায়োনিয়ার ইংলিশম্যানের সম্পাদকে মিলিয়া তাহাকে ব্রিটিশ পশুরাজের ভীমগর্জ্জনে পরিণত করিলেও সেই অসত্যের দ্বারা তোমরা কোনো শুভফল পাইবে না। তোমার গায়ে জোর আছে বটে তবু সত্যের বিরুদ্ধেও তুমি চক্ষু রক্তবর্ণ করিবে এত জোর নাই। নূতন আইনের দ্বারা নূতন লোহার শিকল গড়িয়া তুমি বিধাতার হাত বাঁধিতে পারিবে না।

অতএব মানবপ্রকৃতির সংঘাতে বিশ্বের নিয়মে যে আবর্ত্ত পাক খাইয়া উঠিতেছে তাহার ভীষণত্ব স্মরণ করিয়া আমার প্রবন্ধ-টুকুর দ্বারা তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিব এমন দুরাশা আমার নাই। দুর্ব্বুদ্ধি যখন জাগ্রত হইয়া উঠে তখন একথা মনে রাখিতে হইবে সেই দুর্ব্বুদ্ধির মূলে বহুদিনের বহুতর কারণ সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল; একথা মনে রাখিতে হইতে হইবে, যেখানে এক পক্ষকে সর্ব্বপ্রকারে অক্ষম ও অনুপায় করা হইয়াছে সেখানে ক্রমশই অপর পক্ষের বুদ্ধি-ভ্রংশ ও ধর্ম্মহানি ঘটা একেবারেই অনিবার্য্য;—যাহাকে নিয়তই অশ্রদ্ধা অসম্মান করি তাহার সহিত ব্যবহার করিয়া মানুষ কদাচই আত্মসম্মানকে উজ্জ্বল রাখিতে পারে না—দুর্ব্বলের সংস্রবে সবল হিংস্র হইয়া উঠে এবং অধীনের সংস্রবে স্বাধীন অসংযত হইতে থাকে;—স্বভাবের এই নিয়মকে কে ঠেকাইতে পারে? অবশেষে জমিয়া উঠিতে উঠিতে ইহার কি কোথাও কোনোই পরিণাম নাই? বাধাহীন কর্ত্তৃত্বে চরিত্রের অসংযম যখন বুদ্ধির অন্ধতাকে আনয়ন করে তখন কি কেবল তাহা দরিদ্রেরই ক্ষতি এবং দুর্ব্বলেরই দুঃখের কারণ হয়?

এইরূপে বাহিরের আঘাতে বহুদিন হইতে দেশের মধ্যে একটা উত্তেজনা ক্রমশই উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিতেছে এই অত্যন্ত প্রত্যক্ষ সত্যটুকুকে কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেনা। এবং

ইংরেজ সমস্ত শাসন ও সতর্কতা কেবল একটা দিকে কেবল দুর্ব্বলের দিকে চাপান দিয়া যে একটা অসমতার সৃষ্টি করিতেছে তাহাতে ভারতবাসীর সমস্ত বুদ্ধিকে, সমস্ত কল্পনাকে, সমস্ত বেদনাবোধকে অহরহ অতিরিক্ত পরিমাণে এই বাহিরের দিকেই, এই একটা নৈমিত্তিক উৎপাতের দিকেই উদ্রিক্ত করিয়া রাখিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

অতএব, এমন অবস্থায় দেশের কোন্ কথাটা সকলের চেয়ে বড় কথা তাহা যদি একেবারেই ভুলিয়া যাই তবে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। কিন্তু যাহা প্রাকৃতিক তাহা দুর্ণিবার হইলেও তাহা সকল সময়ে শ্রেয়স্কর হয় না। হৃদয়াবেগের তীব্রতাকেই পৃথিবীর সকল বাস্তবের চেয়ে বড় বাস্তব বলিয়া মনে করিয়া আমরা যে অনেক সময়েই ভয়ঙ্কর ভ্রমে পড়িয়া থাকি—সংসারে এবং, নিজের ব্যক্তিগত জীবনে পদে পদে তাহার পরিচয় পাইয়া আসিয়াছি। জাতির ইতিহাসেও যে এ কথা আরো অনেক বেশি খাটে তাহা স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

"আচ্ছা, ভাল কথা, তুমি কোনটাকে দেশের সকলের চেয়ে গুরুতর প্রয়োজন বলিয়া মনে কর" এই প্রশ্নটাই অনেকে বিশেষ বিরক্তির সহিত আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন ইহা আমি অনুভব করিতেছি। এই বিরক্তিকে স্বীকার করিয়া লইয়াও আমাকে উত্তর দিতে প্রস্তুত হইতে হইবে।

ভারতবর্ষের সম্মুখে বিধাতা যে সমস্যাটি স্থাপিত করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত দুরূহ হইতে পারে কিন্তু সেই সমস্যাটি যে কি তাহা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন নহে। তাহা নিতান্তই আমাদের সম্মুখে পড়িয়া আছে; অন্য দূর দেশের ইতিহাসের নজিরের মধ্যে তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইলে তাহার সন্ধান পাওয়া যাইবে না।

ভারতবর্ষের পর্ব্বতপ্রান্ত হইতে সমুদ্রসীমা পর্য্যন্ত যে জিনিষটি সকলের চেয়ে সুস্পষ্ট হইয়া চোখে পড়িতেছে সেটি কি? সেটি এই যে, এত ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন আচার জগতে আর কোনো একটিমাত্র দেশে নাই।

পশ্চিম দেশের যে সকল ইতিহাস ইস্কুলে পড়িয়াছি তাহার কোথাও আমরা এরূপ সমস্যার পরিচয় পাই নাই। য়ুরোপে যে সকল প্রভেদের মধ্যে সংঘাত বাধিয়াছিল সে প্রভেদগুলি একান্ত ছিল না;—তাহাদের মধ্যে মিলনের এমন একটি সহজ তত্ত্ব ছিল যে যখন তাহারা মিলিয়া গেল তখন তাহাদের মিলনের মুখে জোড়ের চিহ্নটুকু পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন হইল। প্রাচীন য়ুরোপে গ্রীক্ রোমক গথ প্রভৃতি জাতির মধ্যে বাহিরে শিক্ষাদীক্ষার পার্থক্য যতই থাক্ তাহারা প্রকৃতই একজাতি ছিল। তাহারা পরস্পরের ভাষা, বিদ্যা, রক্ত মিলাইয়া এক হইয়া উঠিবার জন্য স্বতই প্রবণ ছিল। বিরোধের উত্তাপে তাহারা গলিয়া যখনি মিলিয়া গেছে তখনি বুঝা গিয়াছে তাহারা এক ধাতুতেই গঠিত। ইংলণ্ডে একদিন স্যাক্সন্ নর্ম্মান ও কেল্টিক জাতির একত্র সংঘাত ঘটিয়াছিল কিন্তু ইহাদের মধ্যে এমন একটি স্বাভাবিক ঐক্যতত্ত্ব ছিল যে জেতাজাতি জেতারূপে স্বতন্ত্র হইয়া থাকিতে পারিল না; বিরোধ করিতে করিতেই কখন যে এক হইয়া গেল তাহা জানাও গেল না।

অতএব য়ুরোপীয় সভ্যতায় মানুষের সঙ্গে মানুষকে যে ঐক্যে সঙ্গত করিয়াছে তাহা

সহজ ঐক্য। য়ুরোপ এখনও এই সহজ ঐক্যকেই মানে—নিজের সমাজের মধ্যে কোনো গুরুতর প্রভেদকে স্থান দিতেই চায় না, হয় তাহাকে মারিয়া ফেলে নয় তাড়াইয়া দেয়। য়ুরোপের যে-কোনো জাতি হোক না কেন সকলেরই কাছে ইংরেজের উপনিবেশ প্রবেশদ্বার উদ্‌ঘাটিত রাখিয়াছে আর এসিয়াবাসীমাত্রই যাহাতে কাছে ঘেঁষিতে না পারে সে জন্য তাহাদের সতর্কতা সাপের মত ফোঁস্ করিয়া ফণা মেলিয়া উঠিতেছে।

য়ুরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের এইখানেই গোড়া হইতেই অনৈক্য দেখা যাইতেছে। ভারতবর্ষের ইতিহাস যখনি সুরু হইল সেই মুহূর্ত্তেই বর্ণের সঙ্গে বর্ণের, আর্য্যের সঙ্গে অনার্য্যের বিরোধ ঘটিল। তখন হইতে এই বিরোধের দুঃসাধ্য সমন্বয়ের চেষ্টায় ভারতবর্ষের চিত্ত ব্যাপৃত রহিয়াছে। আর্য্যসমাজে যিনি অবতার বলিয়া গণ্য সেই রামচন্দ্র দাক্ষিণাত্যে আর্য্য উপনিবেশকে অগ্রসর করিয়া দিবার উপলক্ষ্যে যেদিন গুহক চণ্ডালরাজের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিয়াছিলেন, যেদিন কিষ্কিন্ধ্যার অনার্য্যগণকে উচ্ছিন্ন না করিয়া সহায়তায় দীক্ষিত করিয়াছিলেন, এবং লঙ্কার পরাস্ত রাক্ষসরাজাকে নির্ম্মূল করিবার চেষ্টা না করিয়া বিভীষণের সহিত বন্ধুতার যোগে শত্রুপক্ষের শত্রুতা নিরস্ত করিয়াছিলেন, সেইদিন ভারতবর্ষের অভিপ্রায় এই মহাপুরুষকে অবলম্বন করিয়া নিজেকে ব্যক্ত করিয়াছিল। তাহার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত এদেশে মানুষের যে সমাবেশ ঘটিয়াছে তাহার মধ্যে বৈচিত্র্যের আর অন্ত রহিল না। যে উপকরণগুলি কোনোমতেই মিলিতে চায় না, তাহাদিগকে একত্রে থাকিতে হইল। এমনভাবে কেবল বোঝা তৈরি হয় কিন্তু কিছুতেই দেহ বাঁধিয়া উঠিতে চায় না। তাই এই বোঝা ঘাড়ে করিয়াই ভারতবর্ষকে শত শত বৎসর ধরিয়া কেবলি চেষ্টা করিতে হইয়াছে, যাহারা বিচ্ছিন্ন কি উপায়ে সমাজের মধ্যে তাহারা সহযোগীরূপে থাকিতে পারে; যাহারা বিরুদ্ধ কি উপায়ে তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্যরক্ষা করা সম্ভব হয়; যাহাদের ভিতরকার প্রভেদ মানবপ্রকৃতি কোনোমতেই অস্বীকার করিতে পারে না কিরূপ ব্যবস্থা করিলে সেই প্রভেদ যথাসম্ভব পরস্পরকে পীড়িত না করে;—অর্থাৎ কি করিলে স্বাভাবিক ভেদকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াও সামাজিক ঐক্যকে যথাসম্ভব মান্য করা যাইতে পারে।

নানা বিভিন্ন লোক যেখানে একত্রে আছে সেখানকার প্রতিমুহূর্ত্তের সমস্যাই এই যে, এই পার্থক্যের পীড়া এই বিভেদের দুর্ব্বলতাকে কেমন করিয়া দূর করা যাইতে পারে। একত্রে থাকিতেই হইবে অথচ কোনোমতেই এক হইতে পারিব না মানুষের পক্ষে এতবড় অমঙ্গল আর কিছুই হইতে পারে না। এমন অবস্থায় প্রথম চেষ্টা হয় প্রভেদকে সুনির্দ্দিষ্ট গণ্ডীদ্বারা স্বতন্ত্র করিয়া দেওয়া;—পরস্পর পরস্পরকে আঘাত না করে সেইটি সামলাইয়া যাওয়া: পরস্পরের চিহ্নিত অধিকারের সীমা কেহ কোনোদিক্ হইতে লঙ্ঘন না করে সেইরূপ ব্যবস্থা করা।

কিন্তু এই নিষেধের গণ্ডিগুলি যাহা প্রথম অবস্থায় বহুবিচিত্রকে একত্রে অবস্থানে সহায়তা করে তাহাই কালক্রমে নানাকে এক হইয়া উঠিতে বাধা দিতে থাকে। তাহা আঘাতকেও

বাঁচায় তেমনি মিলনকেও ঠেকায়। অশান্তিকে দূরে খেদাইয়া রাখাই যে শান্তিকে প্রতিষ্ঠা করা তাহা নহে। বস্তুত তাহাতে অশান্তিকে চিরদিনই কোনো একটা জায়গায় জিয়াইয়া রাখা হয়; বিরোধকে কোনোমতে দূরে রাখিলেও তবু তাহাকে রাখা হয়—ছাড়া পাইলেই তাহার প্রলয় মূর্ত্তি হঠাৎ আসিয়া দেখা দেয়।

শুধু তাই নয়। ব্যবস্থাবদ্ধভাবে একত্রে অবস্থানমাত্র মিলনের নেতিবাচক অবস্থা, ইতিবাচক নহে। তাহাতে মানুষ আরাম পাইতে পারে কিন্তু শক্তি পাইতে পারে না। শৃঙ্খলার দ্বারা কাজ চলে মাত্র, ঐক্যের দ্বারা প্রাণ জাগে।

ভারতবর্ষও এতকাল তাহার বহুতর অনৈক্য ও বিরুদ্ধতাকে একটি ব্যবস্থার মধ্যে টানিয়া প্রত্যেককে এক একটি প্রকোষ্ঠে বদ্ধ করিবার চেষ্টাতেই নিযুক্ত ছিল। অন্য কোনোদেশেই এমন সত্যকার প্রভেদ একত্রে আসিয়া দাঁড়ায় নাই, সুতরাং অন্য কোনো দেশেরই এমন দুঃসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইবার কোনো প্রয়োজনই হয় নাই।

নানা বিশৃঙ্খল বিচ্ছিন্ন সত্য যখন স্তূপাকার হইয়া জ্ঞানের পথরোধ করিবার উপক্রম করে তখন বিজ্ঞানের প্রথম কাজ হয় তাহাদিগকে গুণকর্ম্ম অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া ফেলা। কিন্তু কি বিজ্ঞানে কি সমাজে শ্রেণীবদ্ধ করা আরম্ভের কাজ, কলেবরবদ্ধ করাই চূড়ান্ত ব্যাপার। ইঁট কাঠ চূণ সুরকি পাছে বিমিশ্রিত হইয়া পরস্পরকে নষ্ট করে এই জন্য তাহাদিগকে ভাগ ভাগ করিয়া সাজাইয়া রাখাই যে ইমারত নির্ম্মাণ করা তাহা নহে।

আমাদের দেশেও শ্রেণীবিভাগ হইয়া আছে কিন্তু রচনাকার্য্য হয় আরম্ভ হয় নাই নয় অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। একই বেদনার অনুভূতির দ্বারা আদ্যোপান্ত আবিষ্ট, প্রাণময়, রসরক্তময় স্নায়ুপেশীমাংসের দ্বারা অস্থিরাশি যেমন করিয়া ঢাকা পড়ে তেমনি করিয়াই বিধিনিষেধের শুষ্ক কঠিন ব্যবস্থাকে একেবারে আচ্ছন্ন এবং অন্তরাল করিয়া দিয়া যখন একই সরস অনুভূতির নাড়িজাল সমগ্রের মধ্যে প্রাণের চৈতন্যকে ব্যাপ্ত করিয়া দিবে তখনই জানিব মহাজাতি দেহধারণ করিয়াছে।

আমরা যে সকল দেশের ইতিহাস পড়িয়াছি তাহারা বিশেষ বিশেষ পথ দিয়া নিজের সিদ্ধির সাধনা করিয়াছে। যে বিশেষ অমঙ্গল তাহাদের পরিপূর্ণ বিকাশের অন্তরায়, তাহারই সঙ্গে তাহাদিগকে লড়িতে হইয়াছে। একদিন আমেরিকার একটি সমস্যা এই ছিল যে, ঔপনিবেশিক দল একজায়গায়, আর তাহাদের চালকশক্তি সমুদ্রপারে,—ঠিক যেন মাথার সঙ্গে ধড়ের বিচ্ছেদ—এরূপ অসামঞ্জস্য কোনো জাতির পক্ষে বহন করা অসম্ভব। ভূমিষ্ঠ শিশু যেমন মাতৃগর্ভের সঙ্গে কোনো বন্ধনে বাঁধা থাকিতে পারে না—নাড়ি ছেদন করিয়া দিতে হয়—তেমনি আমেরিকার সম্মুখে যেদিন ওই নাড়ি ছেদনের প্রয়োজন উপস্থিত হইল সেদিন সে ছুরি লইয়া তাহা কাটিল। একদিন ফ্রান্সের সম্মুখে একটি সমস্যা এই ছিল যে, সেখানে শাসয়িতার দল ও শাসিতের দল যদিচ একই জাতিভুক্ত তথাপি তাহাদের পরস্পরের জীবনযাত্রা ও স্বার্থ এতই সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল যে সেই অসামঞ্জস্যের

পীড়ন মানুষের পক্ষে দুর্ব্বহ হইয়াছিল। এই কারণে এই আত্মবিচ্ছেদকে দূর করিবার জন্ম ফ্রান্সকে রক্তপাত করিতে হইয়াছিল।

বস্তুত দেখিতে গেলে, সেই আমেরিকা ও ফ্রান্সের সমস্যার সঙ্গে ভারতবর্ষের মিল আছে। ভারতবর্ষেও শাসয়িতা ও শাসিত পরস্পর অসংলগ্ন। তাঁহাদের পরস্পর সম-অবস্থা ও সমবেদনার কোনো যোগই নাই। এমন স্থলে শাসনপ্রণালীর মধ্যে সুব্যবস্থার অভাব না ঘটিতে পারে;—কিন্তু কেবলমাত্র ব্যবস্থার অপেক্ষা মানুষের প্রয়োজন অনেক বেশি। যে আনন্দে মানুষ বাঁচে এবং মানুষ বিকাশ লাভ করে, তাহা কেবল আইন আদালত সুপ্রতিষ্ঠিত ও ধনপ্রাণ সুরক্ষিত হওয়া নহে। ফল কথা, মানুষ আধ্যাত্মিক জীব—তাহার শরীর আছে, মন আছে, হৃদয় আছে—তাহাকে তৃপ্ত করিতে গেলে তাহার সমস্তকেই তৃপ্ত করিতে হয়—যে কোনো পদার্থে সজীব সার্ব্বাঙ্গীনতার অভাব আছে তাহাতে সে পীড়িত হইবেই;—তাহাকে কোন্ জিনিষ দেওয়া গেল সেই হিসাবটাই তাহার পক্ষে একমাত্র হিসাব নহে, তাহাকে কেমন করিয়া দেওয়া হইল সেই হিসাবটা আরও বড় হিসাব। উপকার তাহার পক্ষে বোঝা হইয়া উঠে যদি সেই উপকারের সঙ্গে সঙ্গে আত্মশক্তির উপলব্ধি না থাকে। সে অত্যন্ত কঠিন শাসনও নীরবে সহ্য করিতে পারে, এমন কি, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে বরণ করিতে পারে যদি তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতার আনন্দ থাকে। তাই বলিতেছিলাম, কেবলমাত্র সুব্যবস্থা মানুষকে পূর্ণ করিয়া রাখিতে পারে না।

অথচ যেখানে শাসয়িতা ও শাসিত পরস্পর দূরবর্ত্তী হইয়া থাকে, উভয়ের মাঝখানে প্রয়োজনের অপেক্ষা উচ্চতর আত্মীয়তর কোনো সম্পর্ক স্থাপিত হইতে বাধা পায়, সেখানে রাষ্ট্রব্যাপার যদি অত্যন্ত ভালও হয় তবে তাহা বিশুদ্ধ আপিস আদালত এবং নিতান্তই আইন কানুন ছাড়া আর কিছু হইতেই পারে না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মানুষ কেন যে কেবলি কৃশ হইতে থাকে, তাহার অন্তর বাহির কেন যে আনন্দহীন হইয়া উঠে তাহা কর্ত্তা কিছুতেই বুঝিতে চান না, কেবলি রাগ করেন—এমন কি, ভোক্তাও ভাল করিয়া নিজেই বুঝিতে পারে না। অতএব শাসয়িতা ও শাসিত পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকাতে যে জীবনহীন শুষ্ক শাসনপ্রণালী ঘটা একেবারেই অনিবার্য্য ভারতের ভাগ্যে তাহা ঘটিয়াছে সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না।

তাহার পরে অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সের সঙ্গে বর্ত্তমান ভারতের একটা মিল আছে সে কথাও মানিতে হইবে। আমাদের শাসনকর্ত্তাদের জীবনযাত্রা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি ব্যয় সাধ্য। তাঁহাদের খাওয়া পরা বিলাস বিহার, তাঁহাদের সমুদ্রের এপার ওপার দুই পারের রসদ জোগানো, তাঁহাদের এখানকার কর্ম্মাবসানে বিলাতী অবকাশের আরামের আয়োজন এ সমস্তই আমাদিগকে করিতে হইতেছে। দেখিতে দেখিতে তাঁহাদের বিলাসের মাত্রা কেবলি অত্যন্ত বাড়িয়া চলিয়াছে তাহা সকলেই অবগত আছেন। এই সমস্ত বিলাসের খরচা জোগাইবার ভার এমন ভারতবর্ষের, যাহার দুইবেলার অন্ন পূরা পরিমাণে জোটে না। এমন অবস্থায় যাহারা বিলাসী প্রবলপক্ষ, তাহাদের অন্তঃকরণ নির্ম্মম হইয়া

উঠিতে বাধ্য। যদি তাহাদিগকে কেহ বলে ঐ দেখ এই হতভাগাগুলা খাইতে পায় না, তাহারা প্রমাণ করিতে ব্যস্ত হয় যে ইহাদের পক্ষে এইরূপ খাওয়াই স্বাভাবিক এবং ইহাই যথেষ্ট। যে সব কেরাণী ১৫।২০ টাকায় ভূতের খাটুনি খাটিয়া মরিতেছে মোটা মাহিনার বড় সাহেব ইলেকৃট্রীক পাখার নীচে বসিয়া একবার চিন্তা করিতেও চেষ্টা করে না যে কেমন করিয়া পরিবারের ভার লইয়া ইহাদের দিন চলিতেছে। তাহারা মনকে শান্ত সুস্থির রাখিতে চায় নতুবা তাহাদের পরিপাকের ব্যাঘাত এবং যকৃতের বিকৃতি ঘটে। এ কথা যখন নিশ্চিত যে অন্নে তাহাদের চলে না, এবং ভারতবর্ষের উপরেই তাহাদের নির্ভর তখন তাহাদের তুলনায় তাহাদের চারিদিকের লোকে কি খায় পরে কেমন করিয়া দিন কাটায় তাহা নিঃস্বার্থভাবে তাহারা বিচার কখনই করিতে পারে না। বিশেষত এক আধজন লোক ত নয়—কেবল ত একটি রাজা নয় একজন সম্রাট নয়—একেবারে একটি সমগ্র জাতির বাবুয়ানার সম্বল এই ভারতবর্ষকে জোগাইতে হইবে। যাহারা বহুদূরে থাকিয়া রাজার হালে বাঁচিয়া থাকিতে চায় তাহাদের জন্য আত্মীয়তা-সম্পর্কশূন্য অপরজাতিকে অন্নবস্ত্র সমস্ত সঙ্কীর্ণ করিয়া আনিতে হইতেছে এই যে নিষ্ঠুর অসামঞ্জস্য ইহা যে প্রতিদিন বাড়িয়াই চলিল তাহা কেবল তাঁহারাই অস্বীকার করিতেছেন যাঁহাদের পক্ষে আরাম অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

অতএব, এক পক্ষে বড় বড় বেতন, মোটা পেন্সন এবং লম্বা চাল, অন্যপক্ষে নিতান্ত ক্লেশে আধপেটা আহারে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ;—অবস্থার এই অসঙ্গতি একেবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন। শুধু অন্নবস্ত্রের হীনতা নহে, আমাদের তরফে সম্মানের লাঘবতা এত অত্যন্ত অধিক, পরস্পরের মূল্যের তারতম্য এত অতিমাত্র, যে, আইনের পক্ষেও পক্ষপাত বাঁচাইয়া চলা অসাধ্য; এমন স্থলে যতদিন যাইতেছে ভারতবর্ষের বক্ষের উপর বিদেশীর ভার ততই গুরুতর হইতেছে, উভয়পক্ষের মধ্যেকার অসাম্য নিরতিশয় অপরিমিত হইয়া উঠিতেছে ইহা আজ আর কাহারো বুঝিতে বাকি নাই। ইহাতে একদিকে বেদনা যতই দুঃসহ হইতেছে আর একদিকে অসাড়তা ও অবজ্ঞা ততই গভীরতা লাভ করিতেছে। এইরূপ অবস্থাই যদি টিকিয়া যায় তবে ইহাতে একদিন না একদিন ঝড় আনিয়া উপস্থিত করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

এইরূপ কতকটা ঐক্য থাকা সত্ত্বেও তথাপি আমাদিগকে বলিতে হইবে বিপ্লবের পূর্ব্বে আমেরিকা ও ফ্রান্সের সম্মুখে যে একমাত্র সমস্যা বর্ত্তমান ছিল—অর্থাৎ যে সমস্যাটির মীমাংসার উপরেই তাহাদের মুক্তি সম্পূর্ণ নির্ভর করিত আমাদের সম্মুখে সেই সমস্যাটি নাই। অর্থাৎ আমরা যদি দরখাস্তের জোরে বা গায়ের জোরে ইংরেজকে ভারতবর্ষ হইতে বিদায় লইতে রাজি করিতে পারি তাহা হইলেও আমাদের সমস্যার কোনো মীমাংসাই হয় না;—তাহা হইলে হয় ইংরেজ আবার ফিরিয়া আসিবে, নয়, এমন কেহ আসিবে যাহার মুখের গ্রাস এবং পেটের পরিধি ইংরেজের চেয়ে হয় ত ছোট না হইতে পারে।

একথা বলাই বাহুল্য, যে দেশে একটি মহাজাতি বাঁধিয়া ওঠে নাই সেদেশে স্বাধীনতা

হইতেই পারে না। কারণ স্বাধীনতার “স্ব” জিনিষটা কোথায়? স্বাধীনতা কাহার স্বাধীনতা? ভারতবর্ষে বাঙালী যদি স্বাধীন হয় তবে দাক্ষিণাত্যের নায়র জাতি নিজেকে স্বাধীন বলিয়া গণ্য করিবে না এবং পশ্চিমের জাঠ যদি স্বাধীনতা লাভ করে তবে পূর্ব্বপ্রান্তের আসামী তাহার সঙ্গে একই ফল পাইল বলিয়া গৌরব করিবে না। এক বাংলাদেশেই হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান যে নিজের ভাগ্য মিলাইবার জন্য প্রস্তুত এমন কোনো লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। তবে স্বাধীন হইবে কে? হাতের সঙ্গে পা, পায়ের সঙ্গে মাথা যখন একেবারে পৃথক্ হইয়া হিসাব মিলাইতে থাকে তখন লাভ বলিয়া জিনিষটা কাহার?

এমন তর্কও শুনা যায় যে, যতদিন আমরা পরের কড়া শাসনের অধীন হইয়া থাকিব ততদিন আমরা জাত বাঁধিয়া তুলিতেই পারিব না—পদে পদে বাধা পাইব এবং একত্র মিলিয়া যে সকল বড় বড় কাজ করিতে করিতে পরস্পরে মিল হইয়া যায় সেই সকল কাজের অবসরই পাইব না। একথা যদি সত্য হয় তবে এ সমস্যার কোনো মীমাংসাই নাই। কারণ, বিচ্ছিন্ন কোনো দিনই মিলিতের সঙ্গে বিরোধ করিয়া জয়লাভ করিতে পারে না। বিচ্ছিন্নের মধ্যে সামর্থ্যের ছিন্নতা, উদ্দেশ্যের ছিন্নতা, অধ্যবসায়ের ছিন্নতা। বিচ্ছিন্ন জিনিষ জড়ের মত পড়িয়া থাকিলে তবু টিঁকিয়া থাকে কিন্তু কোনো উপায়ে কোনো বায়ুবেগে তাহাকে চালনা করিতে গেলেই সে ছড়াইয়া পড়ে, সে ভাঙিয়া যায়, তাহার এক অংশ অপর অংশকে আঘাত করিতে থাকে; তাহার অভ্যন্তরের সমস্ত দুর্ব্বলতা নানা মূর্ত্তিতে জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হয়। নিজেরা এক না হইতে পারিলে আমরা এমন কোনো এককে স্থানচ্যুত করিতে পারিব না যাহা কৃত্রিমভাবেও সেই ঐক্যের স্থান পূরণ করিয়া আছে।

শুধু পারিব না তাহা নহে কোনো নিতান্ত আকস্মিক কারণে পারিলেও যে একটি মাত্র বাহুবন্ধনে আমরা বিধৃত হইয়া আছি তাহাও ছিন্ন হইয়া পড়িবে। তখন আমাদের নিজের মধ্যে বিরোধ বাধিলে, আমরা কোনো এক প্রকার করিয়া, কিছুকাল মারামারি কাটাকাটির পর তাহার একটা কিছু মীমাংসা করিয়া লইব ইহাও সম্ভব হইবে না। আমাদিগকে সেই সময়টুকুও কেহ দিবে না। কারণ, আমরাই যেন আমাদের সুযোগের সুবিধাটুকু লইবার জন্য প্রস্তুত না থাকিতে পারি, কিন্তু জগতে যে সকল প্রবলজাতি সময়ে অসময়ে সর্ব্বদাই প্রস্তুত হইয়া আছে তাহারা আমাদের ঘরাও যুদ্ধকাণ্ড, অভিনয়ের দর্শকদের মত, দূরে বসিয়া দেখিবে না। ভারতবর্ষ এমন স্থান নহে, লুব্ধের চক্ষু যাহার উপর হইতে কোনোদিনই অপসারিত হইবে।

অতএব যে দেশে বহু বিচ্ছিন্ন জাতিকে লইয়া এক মহাজাতি তৈরি হইয়া উঠে নাই সে দেশে ইংরেজের কর্ত্তৃত্ব থাকিবে কি না থাকিবে সেটা আলোচনার বিষয় নহে; সেই মহাজাতিকে গড়িয়া তোলাই সেখানে এমন একটি উদ্দেশ্য অন্য সমস্ত উদ্দেশ্যই যাহার কাছে মাথা অবনত করিবে—এমন

কি, ইংরেজ রাজত্ব যদি এই উদ্দেশ্যসাধনের সহায়তা করে তবে ইংরেজরাজত্বকেও আমাদের ভারতবর্ষেরই সামগ্রী করিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। তাহা অন্তরের সহিত প্রীতির সহিত স্বীকার করিবার অনেক বাধা আছে। সেই বাধাগুলিকে দূর করিয়া ইংরেজ রাজত্ব কি করিলে আমাদের আত্মসম্মানকে পীড়িত না করে, কি করিলে তাহার সহিত আমাদের গৌরবকর আত্মীয় সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে এই অতি কঠিন প্রশ্নের মীমাংসাভারও আমাদিগকে লইতে হইবে। রাগ করিয়া যদি বলি "না আমরা চাই না" তবু আমাদিগকে চাহিতেই হইবে কারণ যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা এক হইয়া মহাজাতি বাঁধিয়া উঠিতে না পারি ততক্ষণ পর্য্যন্ত ইংরেজরাজত্বের যে প্রয়োজন তাহা কখনই সম্পূর্ণ হইবে না।

আমাদের দেশের সকলের চেয়ে বড় সমস্যা যে কি, অল্পদিন হইল বিধাতা তাহার প্রতি আমাদের সমস্ত চেতনাকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। আমরা সেদিন মনে করিয়াছিলাম, পার্টিশন ব্যাপারে আমরা যে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছি ইহাই ইংরেজকে দেখাইব, আমরা বিলাতী নিমকের সম্বন্ধ কাটিব এবং দেশের বিলাতী বস্ত্রহরণ না করিয়া জলগ্রহণ করিব না। পরের সঙ্গে যুদ্ধঘোষণা যেমনি করিয়াছি অমনি ঘরের মধ্যে এমন একটা গোল বাধিল যে, এমনতর আর কখনো দেখা যায় নাই। হিন্দুতে মুসলমানে বিরোধ হঠাৎ অত্যন্ত মর্ম্মান্তিকরূপে বীভৎস হইয়া উঠিল।

এই ব্যাপার আমাদের পক্ষে যতই একান্ত কষ্টকর হোক কিন্তু আমাদের এই শিক্ষার প্রয়োজন ছিল। এ কথা আমাদের সম্পূর্ণ নিশ্চিতরূপেই জানা আবশ্যক ছিল, আজও আমাদের দেশে হিন্দু ও মুসলমান যে পৃথক এই বাস্তবটিকে বিস্মৃত হইয়া আমরা যে কাজ করিতেই যাই না কেন এই বাস্তবটি আমাদিগকে কখনই বিস্মৃত হইবে না। একথা বলিয়া নিজেকে ভুলাইলে চলিবে না যে, হিন্দুমুসলমানের সম্বন্ধের মধ্যে কোনো পাপই ছিল না, ইংরেজই মুসলমানকে আমাদের বিরুদ্ধ করিয়াছে।

ইংরেজ যদি মুসলমানকে আমাদের বিরুদ্ধে সত্যই দাঁড় করাইয়া থাকে তবে ইংরেজ আমাদের একটি পরম উপকার করিয়াছে - দেশের যে একটি প্রকাণ্ড বাস্তব সত্যকে আমরা মূঢ়ের মত না বিচার করিয়াই দেশের বড় বড় কাজের আয়োজনের হিসাব করিতেছিলাম, একেবারে আরম্ভেই তাহার প্রতি ইংরেজ আমাদের দৃষ্টি ফিরাইয়াছে। ইহা হইতে কোনো শিক্ষাই না লইয়া আমরা যদি ইংরেজের উপরেই সমস্ত রাগের মাত্রা চড়াইতে থাকি তবে আমাদের মূঢ়তা দূর করিবার জন্য পুনর্ব্বার আমাদিগকে আঘাত সহিতে হইবে ;—যাহা প্রকৃত যেমন করিয়াই হৌক্ তাহাকে আমাদের বুঝিতেই হইবে ;—কোনোমতেই তাহাকে এড়াইয়া চলিবার কোনো পন্থাই নাই।

এই সঙ্গে একটা কথা বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে যে, হিন্দু ও মুসলমান, অথবা হিন্দুদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ বা উচ্চ ও নীচবর্ণের মধ্যে মিলন না হইলে আমাদের কাজের ব্যাঘাত হইতেছে অতএব

কোনোমতে মিলনসাধন করিয়া আমরা বললাভ করিব এই কথাটাই সকলের চেয়ে বড় কথা নয়, সুতরাং ইহাই সকলের চে'য় সত্য কথা নহে।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কেবলমাত্র প্রয়োজনসাধনের সুযোগ, কেবলমাত্র সুব্যবস্থার চেয়ে অনেক বেশি নহিলে মানুষের প্রাণ বাঁচে না। যিশু বলিয়া গিয়াছেন মানুষ কেবলমাত্র রুটির দ্বারা জীবনধারণ করে না; তাহার কারণ, মানুষের কেবল শারীর জীবন নহে। সেই বৃহৎ জীবনের খাদ্যাভাব ঘটিতেছে বলিয়া ইংরেজরাজত্ব সকলপ্রকার সুশাসনসত্ত্বেও আমাদের আনন্দ শোষণ করিয়া লইতেছে।

কিন্তু এই যে খাদ্যাভাব এ যদি কেবল বাহির হইতেই ইংরেজ শাসন হইতেই ঘটিত তাহা হইলে কোনো প্রকারে বাহিরের সংশোধন করিতে পারিলেই আমাদের কার্য্য সমাধা হইয়া যাইত। আমাদের নিজের অন্তঃপুরের ব্যবস্থাতেও দীর্ঘকাল হইতেই এই উপবাসের ব্যাপার চলিয়া আসিতেছে। আমরা হিন্দু ও মুসলমান, আমরা ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশীয় হিন্দুজাতি এক জায়গায় বাস করিতেছি বটে কিন্তু মানুষ মানুষকে রুটির চেয়ে যে উচ্চতর খাদ্য জোগাইয়া প্রাণে শক্তিতে আনন্দে পরিপুষ্ট করিয়া তোলে আমরা পরস্পরকে সেই খাদ্য হইতেই বঞ্চিত করিয়া আসিয়াছি। আমাদের সমস্ত হৃদয়বৃত্তি সমস্ত হিতচেষ্টা, পরিবার ও বংশের মধ্যে, এবং এক-একটি সঙ্কীর্ণ সমাজের মধ্যে এতই অতিশয় পরিমাণে নিবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে যে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সাধারণ আত্মীয়তার যে বৃহৎ সম্বন্ধ তাহাকে স্বীকার করিবার সম্বল আমরা কিছুই উদ্বৃত্ত রাখি নাই। সেই কারণে আমরা দ্বীপপুঞ্জের মতই খণ্ড খণ্ড হইয়া আছি, মহাদেশের মত ব্যাপ্ত বিস্তৃত ও এক হইয়া উঠিতে পারি নাই।

প্রত্যেক ক্ষুদ্র মানুষটি বৃহৎ মানুষের সঙ্গে নিজের ঐক্য নানা মঙ্গলের দ্বারা নানা আকারে উপলব্ধি করিতে থাকিবে। এই উপলব্ধি তাহার কোনো বিশেষ কার্য্যসিদ্ধির উপায় বলিয়াই গৌরবের নহে, ইহা তাহার প্রাণ, ইহাই তাহার মনুষ্যত্ব অর্থাৎ তাহার ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম হইতে সে যে পরিমাণেই বঞ্চিত হয় সেই পরিমাণেই সে শুষ্ক হয়। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে বহুদিন হইতেই ভারতবর্ষে আমরা এই শুষ্কতাকে প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছি। আমাদের জ্ঞান, কর্ম্ম, আচার ব্যবহারের, আমাদের সর্ব্বপ্রকার আদানপ্রদানের বড় বড় রাজপথ এক একটা ছোট ছোট মণ্ডলীর সম্মুখে আসিয়া খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে, আমাদের হৃদয় ও চেষ্টা প্রধানত আমাদের নিজের ঘর নিজের গ্রামের মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, তাহা বিশ্বমানবের অভিমুখে নিজেকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিবার অবসর পায় নাই। এই কারণে আমরা পারিবারিক আরাম পাইয়াছি, ক্ষুদ্র সমাজের সহায়তা পাইয়াছি কিন্তু বৃহৎ মানুষের শক্তি ও সম্পূর্ণতা হইতে আমরা অনেক দিন হইতে বঞ্চিত হইয়া দীনহীনের মত বাস করিতেছি।

সেই প্রকাণ্ড অভাব পূরণ করিবার উপায় আমরা নিজের মধ্যে হইতেই যদি বাঁধিয়া তুলিতে না পারি তবে বাহির হইতে তাহা পাইব কেমন করিয়া? ইংরেজ চলিয়া গেলেই আমাদের এই ছিদ্র পূরণ হইবে আমরা এ কল্পনা কেন করিতেছি? আমরা যে পরস্পরকে শ্রদ্ধা করি নাই, সহায়তা করি নাই, আমরা যে পরস্পরকে চিনিবার মাত্রও চেষ্টা করি নাই, আমরা যে এতকাল "ঘর হইতে আঙিনা বিদেশ" করিয়া বসিয়া আছি;—পরস্পর সম্বন্ধে আমাদের সেই ঔদাসীন্য, অবজ্ঞা, সেই বিরোধ আমাদিগকে যে একান্তই ঘুচাইতে হইবে সে কি কেবলমাত্র বিলাতী কাপড় ত্যাগ করিবার সুবিধা হইবে বলিয়া, সে কি কেবলমাত্র ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট নিজের শক্তি প্রচার করিবার উদ্দেশে? এ নহিলে আমাদের ধর্ম্ম পীড়িত হইতেছে, আমাদের মনুষ্যত্ব সঙ্কুচিত হইতেছে; এ নহিলে আমাদের বুদ্ধি সঙ্কীর্ণ হইবে, আমাদের জ্ঞানের বিকাশ হইবে না—আমাদের দুর্ব্বল চিত্ত শত শত অন্ধসংস্কারের দ্বারা জড়িত হইয়া থাকিবে—আমরা আমাদের অন্তর-বাহিরের সমস্ত অধীনতার বন্ধন ছেদন করিয়া

নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে বিশ্বসমাজের মধ্যে মাথা তুলিতে পারিব না। সেই নির্ভীক নির্বাধ বিপুল মনুষ্যত্বের অধিকারী হইবার জন্যই আমাদিগকে পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরকে ধর্ম্মের বন্ধনে বাঁধিতে হইবে। ইহা ছাড়া মানুষ কোনোমতেই বড় হইতে পারে না, কোনোমতেই সত্য হইতে পারে না। ভারতবর্ষে যে কেহ আছে যে, কেহ আসিয়াছে, সকলকে লইয়াই আমরা সম্পূর্ণ হইব—ভারতবর্ষে বিশ্বমানবের একটি প্রকাণ্ড সমস্যার মীমাংসা হইবে। সে সমস্যা এই যে, পৃথিবীতে মানুষ বর্ণে ভাষায় স্বভাবে আচরণে ধর্ম্মে বিচিত্র—নরদেবতা এই বিচিত্রকে লইয়াই বিরাট্—সেই বিচিত্রকে আমরা এই ভারতবর্ষের মন্দিরে একাঙ্গ করিয়া দেখিব। পার্থক্যকে নির্ব্বাসিত বা বিলুপ্ত করিয়া নহে কিন্তু সর্ব্বত্র ব্রহ্মের উদার উপলব্ধি দ্বারা; মানবের প্রতি সর্ব্বসহিষ্ণু পরম প্রেমের দ্বারা; উচ্চনীচ, আত্মীয়পর, সকলের সেবাতেই ভগবানের সেবা স্বীকার করিয়া। আর কিছু নহে শুভচেষ্টার দ্বারা দেশকে জয় করিয়া লও—যাহারা তোমাকে সন্দেহ করে তাহাদের সন্দেহকে জয় কর, যাহারা তোমার প্রতি বিদ্বেষ করে তাহাদের বিদ্বেষকে পরাস্ত কর। রুদ্ধ দ্বারে আঘাত কর, বারম্বার আঘাত কর—কোনো নৈরাশ্য, কোনো আত্মাভিমানের ক্ষুণ্ণতায় ফিরিয়া যাইয়ো না; মানুষের হৃদয় মানুষের হৃদয়কে চিরদিন কখনই প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না।

ভারতবর্ষের আহ্বান আমাদের অন্তঃকরণকে স্পর্শ করিয়াছে। সেই আহ্বান যে সংবাদপত্রের ক্রুদ্ধ গর্জ্জনের মধ্যেই ধ্বনিত হইয়াছে বা হিংস্র উত্তেজনার মুখরতার মধ্যেই তাহার যথার্থ প্রকাশ একথা আমরা স্বীকার করিব না কিন্তু সেই আহ্বান যে আমাদের অন্তরাত্মাকে উদ্বোধিত করিতেছে তাহা তখনই বুঝিতে পারি যখন দেখি আমরা জাতি বর্ণ নির্ব্বিচারে দুর্ভিক্ষকাতরের দ্বারে অন্নপাত্র বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছি, যখন দেখি ভদ্রাভদ্র বিচার না করিয়া প্রবাসে সমাগত যাত্রীদের সহায়তার জন্য আমরা বদ্ধপরিকর হইয়াছি, যখন দেখি রাজপুরুষদের নির্ম্মম সন্দেহ ও প্রতিকূলতার মুখেও অত্যাচার-প্রতিরোধের প্রয়োজনকালে আমাদের যুবকদিগকে কোনো বিপদের সম্ভাবনা বাধা দিতেছে না। সেবায় আমাদের সঙ্কোচ নাই, কর্ত্তব্যে আমাদের ভয় ঘুচিয়া গিয়াছে, পরের সহায়তায় আমরা উচ্চনীচের বিচার বিস্মৃত হইয়াছি, এই যে সুলক্ষণ দেখা দিয়াছে ইহা হইতে বুঝিয়াছি এবার আমাদের উপরে যে আহ্বান আসিয়াছে তাহাতে সমস্ত সঙ্কীর্ণতার অন্তরাল হইতে আমাদিগকে বাহিরে আনিবে—ভারতবর্ষে এবার মানুষের দিকে মানুষের টান পড়িয়াছে। এবারে, যেখানে যাহার কোনো অভাব আছে তাহা পূরণ করিবার জন্য আমাদিগকে যাইতে হইবে;—অন্ন স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিতরণের জন্য আমাদিগকে নিভৃত পল্লীর প্রান্তে নিজের জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে; আমাদিগকে আর কেহই নিজের স্বার্থ ও স্বচ্ছন্দতার মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না। বহুদিনের শুষ্কতা ও অনাবৃষ্টির পর বর্ষা যখন আসে তখন সে ঝড় লইয়াই আসে—কিন্তু নববর্ষার সেই আরম্ভকালীন ঝড়টাই এই নূতন আবির্ভাবের সকলের চেয়ে বড় অঙ্গ নহে, তাহা স্থায়ীও হয় না। বিদ্যুতের চাঞ্চল্য বজ্রের গর্জ্জন এবং বায়ুর উন্মত্ততা আপনি শান্ত হইয়া আসিবে,—তখন মেঘে মেঘে জোড়া লাগিয়া আকাশের পূর্ব্বপশ্চিম স্নিগ্ধতায় আবৃত হইয়া যাইবে—চারিদিকে ধারা বর্ষণ হইয়া তৃষিতের পাত্রে জল ভরিয়া উঠিবে এবং ক্ষুধিতের ক্ষেত্রে অন্নের আশা অঙ্কুরিত হইয়া দুই চক্ষু জুড়াইয়া দিবে। মঙ্গলে পরিপূর্ণ সেই বিচিত্র সফলতার দিন বহুকাল প্রতীক্ষার পরে আজ ভারতবর্ষে দেখা দিয়াছে এই কথা নিশ্চয় জানিয়া আমরা যেন আনন্দে প্রস্তুত হই। কিসের জন্য? ঘর ছাড়িয়া মাঠের মধ্যে নামিবার জন্য, মাটি চষিবার জন্য, বীজ বুনিবার জন্য—তাহার পরে সোনার ফসলে যখন লক্ষ্মীর আবির্ভাব হইবে তখন সেই লক্ষ্মীকে ঘরে আনিয়া নিত্যোৎসবের প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বঙ্গদর্শন।

ইজ্জৎ।

আর সে দিন নাই। সকল দেশেই রাজা প্রজার মধ্যে কি এক বিচিত্র বিরোধ মুখরিত হইয়া উঠিতেছে। বিশ্বাসের মধ্যে অবিশ্বাস,—নির্ভয়ের মধ্যে সংশয়,—শান্তির মধ্যে উপদ্রব আসিয়া রাজা প্রজাকে সমানভাবে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে!

কারণ যাহাই হউক,—যেমন ছিল, তেমন নাই,—ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে। তাই সকল দেশেই পুরাতন শাসনতন্ত্রের সংস্কার সাধনের সময় আসিয়া পড়িয়াছে। ইহা ইহসর্ব্বস্ব আধুনিক সভ্যতার অবশ্যম্ভাবি পরিণাম কি না, তদ্বিষয়ে তর্ক বিতর্কের সম্ভাবনা থাকিলেও থাকিতে পারে। কিন্তু ইহাই যে আধুনিক যুগের অসন্দিগ্ধ ঐতিহাসিক সত্য, তাহাতে সংশয় প্রকাশের সম্ভাবনা নাই।

সকল দেশেই এক কথা। উভয় পক্ষই ভাবিতেছে—ইজ্জৎ যায়। অথচ ইজ্জতের ভয়ে উভয় পক্ষই সে কথা দন্তস্ফুট করিতে অসম্মত! তথাপি ইজ্জতের কথাই আসল কথা। তাহাকে কথা দিয়া চাপা দিবার চেষ্টা করা অসঙ্গত।

প্রজার নিকট অকৃত্রিম ভক্তিলাভ করা দুর্লভ হইয়া উঠিলে, রাজার পক্ষে ইজ্জৎ রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে। কৃত্রিম শাসন-কৌশলে ফল হয় না। বরং ভক্তি আকর্ষণের কৃত্রিম চেষ্টায় অকৃত্রিম রাজভক্তি আরও দুর্লভ হইয়া দাঁড়ায়।

রাজার নিকট অকৃত্রিম সুশাসন লাভ করা দুর্লভ হইয়া উঠিলে, প্রজার পক্ষেও ইজ্জৎ রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে। কৃত্রিম আন্দোলন-কৌশলে ফল হয় না। বরং সুশাসন আদায় করিয়া লইবার কৃত্রিম চেষ্টায় অকৃত্রিম সুশাসন আরও দুর্লভ হইয়া দাঁড়ায়!

সকল প্রকার শাসনতন্ত্রই মানুষ লইয়া গঠিত। সুতরাং তাহার মধ্যে মানুষের ভুল-ভ্রান্তি,—মানুষের স্বার্থপরতার আবিলতা কিয়ৎপরিমাণে বর্ত্তমান থাকা অনিবার্য্য। এরূপ ক্ষেত্রে রাজা প্রজার মধ্যে মতপার্থক্য উপস্থিত হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু মাত্রা চড়িয়া উঠিলে, মতপার্থক্য হইতেই অশান্তি উপস্থিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষেও এই ঐতিহাসিক সত্য ধীরে ধীরে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে।

"তরবারি-বলে ভারত-জয় সুসম্পন্ন করিয়াছি,—তরবারিবলেই ভারতশাসন সুসম্পন্ন করিব।" এক শ্রেণীর রাজপুরুষদিগের এই ধারণা এত প্রবল যে, তাঁহারা ইহাকেই রাজার

একমাত্র ইজ্জৎ বলিয়া ধরিয়া রাখিয়াছেন। ইঁহাদিগের বিশ্বাস,—ভারতবর্ষে তরবারি কোষ-বদ্ধ করিবামাত্র রাজার ইজ্জৎ ছাড়িয়া যাইবে।

কথাটা সত্য হইলেও, তাহা লইয়া প্রজার পক্ষ হইতে তর্ক করিবার সম্ভাবনা তিরোহিত হইত না। কিন্তু ইহা কি সত্য সত্যই সত্য কথা? ভারতবর্ষ অনেকবার পরাজিত হইয়াছে,—তাহা সত্য কথা। কিন্তু একবারও কেবল তরবারিবলে পরাজিত হইয়াছে কি না, তদ্বিষয়ে ইতিহাস চিরদিনই সংশয় প্রকাশ করিয়া আসিতেছে!

সংশয় একেবারে ভিত্তিহীন বলিয়া বোধ হয় না। এত বড় দেশ—আর এত কোটি লোক—কেবল তরবারিবলে পরাজিত হইতে পারে কি না, তাহাতে সহজেই সংশয় উপস্থিত হয়। কিন্তু কিরূপে ভারতজয় সুসম্পন্ন হইয়াছিল, সে পুরাতন তর্ক বিতর্ক রাখিয়া দিয়া, কিরূপে ভারতশাসন সুসম্পন্ন হইতে পারে, তাহার কথা চিন্তা করিলেই উভয়পক্ষের ইজ্জৎ রক্ষা হইতে পারে।

তাহার প্রবল অন্তরায়—লাঠি! রাজা লাঠি ধরিলেও যে ফল, প্রজা লাঠি ধরিলেও সেই ফল। এক পক্ষের লাঠি আর এক পক্ষের লাঠি টানিয়া বাহির করিয়া, পরস্পরের ইজ্জতের উপর আঘাত করিতে আরম্ভ করে। তখন আর কোন কথাই ধীরভাবে আলোচনা করিবার সময় থাকে না।

অনেক রাজপুরুষ এ কথা মানিয়া লইতে অসম্মত। তাঁহাদিগের অধিক অপরাধ নাই। তাঁহারা বিভীষিকাগ্রস্ত ভীরু স্বভাবের লোক। তাঁহাদের ভয়ের কারণেরও অভাব নাই। এত বড় দেশ—আর এত কোটী লোক—ইহাই ত যথেষ্ট! সুতরাং তাঁহারা এক দণ্ডও লাঠির কথা বিস্মৃত হইতে পারেন না!

সত্য সত্যই ভারতবর্ষ এরূপ আশঙ্কাজনক দেশ হইলেও, লাঠি লইয়া ফল হইত না। কিন্তু ভারতবর্ষকে এ পর্য্যন্ত কেহই এরূপ প্রচণ্ড দেশ বলিয়া বর্ণনা করিতে পারেন নাই। লোকে না খাইয়া মরিয়া যায়,—রোগে জরাজীর্ণ হইয়া মরিয়া যায়,—কখন বা অকস্মাৎ প্লীহা ফাটিয়াও মরিয়া যায়! কিন্তু সকল প্রকার মৃত্যুর পক্ষে একই মীমাংসা—অদৃষ্ট! এমন দেশেও রাজা প্রজার মধ্যে মনোমালিন্য ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে কেন?

কেহ কেহ বলিতেছেন,—ইংরাজ আসিয়া নবশিক্ষার অবতারণা না করিলে, হয় ত এমন হইত না;—ভারতবর্ষ তাহার চিরাভ্যস্ত অদৃষ্টবাদ লইয়া, দুদিনের পৃথিবীর দুদিনের সুখদুঃখকে চিরদিনই সমানভাবে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাইতে পারিত! ইংরাজই তাহার সম্মুখে প্রলোভন বিস্তার করিয়া,—তাহাকে সভ্য করিয়া তুলিতে গিয়া,—ইহ-সর্ব্বস্ব সাংসারিক নীতির আপাতমধুর কাম্য-ফলের আশায় সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন। তাই ভারতবর্ষ তাহার চিরপুরাতন বাস্তুভিটার আবর্জ্জনা ঝাড়িয়া তাহার উপর এক বিচিত্র স্বপ্নমন্দির গড়িয়া তুলিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে।

কেহ কেহ বলিতেছেন—ইংরাজের কিছু-মাত্র অপরাধ নাই,—"যত দোষ নন্দ ঘোষ।" জনকতক আন্দোলনকারী তাহাদের বক্তৃতা এবং লেখার জোরে ভারতবর্ষকে এক অলীক

আশার কথায় নাচাইয়া তুলিয়াছে! যাপান তাহাতে ধুনার গন্ধ মিশাইয়া দিয়াছে। যাপান না জাগিলে, এসিয়ার কোন দেশই জাগিয়া উঠিবার জন্য পাগল হইত না!

আসল কথা—প্রজার চোক্ ফুটিয়াছে। কি কারণে তাহার চোক্ ফুটিয়া গেল, তাহা লইয়া বিবাদ করিয়া লাভ নাই। সে বুঝিয়াছে,—প্রকৃত সুশাসন লাভ করিতে না পারিলে, ইজ্জৎ থাকিতে পারে না। সে রাজভক্তি দান করিতে অসম্মত হয় নাই;—কিন্তু তাহার প্রতিদান লাভ করিবার দাবি ত্যাগ করিতেই অসম্মত।

এতদিন এক তরফা ইজ্জতের ধূমপুঞ্জে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। এখন তাহার মধ্যে প্রজার ইজ্জৎ বিদ্যুদ্দামের মত ঝলসিয়া উঠিতেছে! তাহারাও মানুষ,—তাহারও মানুষের মত সুশাসন লাভ করিতে চায়।

ইহাকে আকস্মিক চিত্তবিকার বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিবার উপায় নাই;—ক্রোধান্ধ হইয়া লাঠির আঘাতে চূর্ণ করিবারও সম্ভাবনা নাই। কারণ, ইহা বহুদিনে—ধীরে ধীরে—স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায়—একটি মহাশক্তিরূপে বিকাশিত হইয়া উঠিতেছে।

ভারতবর্ষ যে বৃটিশ সাম্রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থার অন্তর্গত, সে শাসন ব্যবস্থায় প্রজার মতামতের মূল্য আছে। এমন কি, তাহাকে এক শ্রেণীর প্রজাতন্ত্র বলিলেও অসঙ্গত হয় না। কেবল ভারতবর্ষেই সেই শাসন ব্যবস্থা ভিন্নমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইবে কেন? ইহা এত সুস্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে যে, ভারতবর্ষ অল্পদিনের মধ্যেই তাহা দেখিয়া ফেলিয়াছে!

দেখিল দেখিল;—কিন্তু তাহা লইয়া আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া গ্রামে নগরে আন্দোলন করিতে বসিল কেন? এরূপভাবে তিরস্কার করিয়া ফল নাই। তথাপি দুর্ভাগ্যক্রমে তিরস্কারের মাত্রাই ক্রমাগত চড়িয়া উঠিতেছে। অগত্যা উভয়পক্ষ হইতে একই কথা ধ্বনিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে—ইজ্জৎ যায়!

প্রজার ইজ্জৎ গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহার আর কি আছে? রাজপুরুষগণ তাহার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা সরলভাবে পূর্ণ করিবার চেষ্টা না করিয়া, কৃত্রিম শাসনকৌশলে আকাঙ্ক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করিতে গিয়া প্রজার ইজ্জৎ প্রকারান্তরে অস্বীকার করিয়া বসিয়াছেন। তাঁহারা স্পষ্ট করিয়া শুনাইয়া দিয়াছেন—"এখন কেন,—সুদূর ভবিষ্যতেও—যতদূর দেখা যায় ততদূর,—সম্মুখে কেবল সূচীভেদ্য অন্ধকার!"

তথাপি প্রজা সমুচিত সম্ভ্রমরক্ষা করিয়াই কথা কহিয়া আসিতেছিল। এখনও তাহাতে সম্পূর্ণ অনাস্থা উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। কারণ সে এখনও সভা করিয়া কাঁদিতেছে,—সংবাদপত্র লিখিয়া কাঁদিতেছে,—আবেদন পত্র হস্তে রাজদ্বারে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে!

এরূপ ক্ষেত্রে সকলের হৃদয় একরূপ চিন্তায় পরিচালিত হইতে পারে না। কাহারও হৃদয় ক্ষোভে, কাহারও বা বিদ্বেষে ভরিয়া উঠাই স্বাভাবিক। ক্ষোভ আত্মসংবরণ করিতে পারে;—বিদ্বেষ সকল অবস্থায় সকল সময়ে আত্ম সংবরণ করিতে পারে না। তাই সে আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে। ইহাই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ব্যাপার।

অক্ষমের বিদ্বেষ চিরদিন যে গোপনপথে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে, সেই চিরপরিচিত পুরাতন পথেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে! তাহাকে নিন্দা করিতে চাহিলে, নিন্দা করিতে পারা যায়। কারণ, তাহার নিন্দা সর্ব্ববাদী সম্মত। কিন্তু তাহাকে অস্বাভাবিক বলিয়া তর্ক করিতে পারা যায় না।

কেহ বলিতেছেন,—ইহা ভারতবর্ষের চিরপরিচিতপ্রশান্ত প্রকৃতির স্বভাব-বিরুদ্ধ আকস্মিক চিত্তবিক্ষেপ;—আর্য্য সভ্যতার অপরিজ্ঞাত অধর্ম্ম পথ।

কেহ বলিতেছেন,—ইহা পাশ্চাত্য দৃষ্টান্তের অনুকরণ মাত্র; পাশ্চাত্যশিক্ষার অপরিহার্য্য অশান্ত পরিণাম!

কথায় কথায় কথা বাড়িয়া উঠিতেছে;—উভয় দলের অসংযত তর্ক প্রকৃত সত্যকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। ইহাই যে মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক চিত্তবিক্ষেপ, সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যে সকল কারণে ইহা অভিব্যক্ত হইয়া পড়ে, সেই সকল কারণ যখনই যে দেশে ঘনীভূত হইতে থাকে, সেই দেশে তখনই ইহা স্বাধীনভাবে আত্ম-প্রকাশ করে। যাঁহারা লোকচরিত্র অধ্যয়ন করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ইহা মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিতেছেন।

আশায় অনেক দিন কাটিয়া গিয়াছে। হয়ত আরও কত দিন কাটিয়া যাইতে পারিত। কিন্তু পুনঃ পুনঃ বিড়ম্বিত হইয়া, যাহারা বিদ্বেষ সঞ্চয় করিত, তাহারা একদিন না একদিন এইরূপেই আত্মপ্রকাশ করিত। এত শীঘ্র করিয়াছে বলিয়া তাহারা—ভ্রান্ত হইলেও—সময় থাকিতে সতর্ক করিয়া দিয়াছে,—মুক্ত-কণ্ঠে বিদ্বেষের কথা ব্যক্ত করিয়া সকল বিষয়ের সন্ধান প্রদান করিয়াছে।

ভারতবর্ষের পক্ষে এইরূপ গোপন পথে পদার্পণ করিবার সম্ভাবনা নানা কারণে উদ্ভূত হইয়া থাকিতে পারে। পাশ্চাত্য দৃষ্টান্ত তাহাকে কিয়ৎপরিমাণে পথ প্রদর্শন করিয়া থাকিতে পারে,—এসিয়ার নবজাগরণের প্রথম পুলক তাহাকে কিয়ৎপরিমাণে তাহাকে উৎসাহ দান করিয়া থাকিতে পারে। তর্ক স্থলে এ সকল কথা মানিয়া লইলেও বলিতে হইবে—ইহাই যথেষ্ট বলিয়া স্বীকার করা যায় না। শাসন-ব্যস্থার মধ্যে উত্তেজনার কারণ না থাকিলে, কেবল বাহিরের দৃষ্টান্তে,—বাহিরের প্রলোভনে,—সহসা এরূপ চিত্ত-বিকার উপস্থিত হইতে পারে না।

যে দেশের জনসাধারণের পক্ষে অস্ত্র ব্যবহারের স্বাধীনতা শাসন ব্যবস্থায় অপহৃত হইয়াছে, সে দেশে অনুদার শাসন-ব্যবস্থা ক্রমে লোকচিত্তে বিদ্বেষ সঞ্চার করিতে আরম্ভ করিলে, তাহা এইরূপ ভাবে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করাই স্বাভাবিক। গোপন পথ অক্ষমের পথ। দেশের লোককে যত অক্ষম করা হইবে, গোপন পথকে ততই প্রশস্ত করা হইবে। একথা রাজপুরুষগণ বুঝিতে না পারিয়া ভারতশাসনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকিলে ভ্রমসংশোধনের চেষ্টা করাই সুসঙ্গত। ভারত-বর্ষে বহুজাতি, বহুধর্ম্ম, বহু ভাষা জনসমাজকে বহুদলে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছে। তাহা জনসমাজের পক্ষে একতালাভের অন্তরায় হইলেও, গোপনপথ অবলম্বন করাইবার পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল। এরূপ দেশে দলাদলি বাড়াইয়া দিবার প্রত্যেক চেষ্টা স্বাভাবিক

প্রক্রিয়ায় গুপ্তদলের সৃষ্টি করিবার পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল। সে কথা ভাল করিয়া বিচার না করিয়া, যাঁহারা শাসন-ব্যবস্থার ভিতর দিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে দলাদলি বাড়াইয়া তুলিতেছিলেন, তাঁহারাই প্রকারান্তরে—অজ্ঞাতসারে অনিচ্ছাকৃত গুপ্তদল সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন!•

এখন ইজ্জৎ বাঁচাইবার উপায় কি? রাজপুরুষগণ তাঁহাদিগের ইজ্জৎ বাঁচাইবার আশায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া, বাক্যজঞ্জালে প্রকৃত সত্য সিদ্ধান্ত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবার আড়ম্বর করিলে, রোগের মূল দূর হইবে না। একথা ভারতবর্ষের লোকনায়কগণ অনেকবার মুক্তকণ্ঠে নিবেদন করিয়া রাজপুরুষগণকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন।

বৃটীশ-শাসন সর্ব্বাংশে সুশাসন বলিয়া আত্মঘোষণা করিতে পারে নাই। তাহা এত কাল কেবল "সময়োচিত সুশাসন" বিতরণ করিয়াই আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে, সাহস ভিন্ন প্রকৃত সুশাসন সংস্থাপিত হইতে পারে না। কিন্তু বৃটিশ-শাসন এতদিনেও সাহস করিয়া ভারতবর্ষকে বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারে নাই।

সকল বিধি-ব্যবস্থার ভিতর দিয়াই কি যেন এক অব্যক্ত ভীরুতা ব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে! নির্য্যাতন—নীতি তাহারই সাক্ষ্যদান করিতেছে। সে যেন কায়ক্লেশে সিংহাসন রক্ষা করিয়াই গলদঘর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছে! আমরা না থাকিলে, কি হইত" ইহাই তাহার প্রধান স্পর্দ্ধার কথা হইয়া উঠিয়াছে।

"আমরা আছি বলিয়া কি হইতে পারে,'—ইহা এখনও তাহার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা বলিয়া সমাদর লাভ করিতে পারে নাই। পারিলে, ইজ্জৎ রক্ষার জন্য এত ব্যতিব্যস্ত হইতে হইত না। কেবল সাহসের অভাবেই এরূপ বিড়ম্বনা উপস্থিত হইয়াছে!

বৃটীশ-শাসন একবার সাহস করিয়া বলিয়া উঠিয়াছিল,—"ভারতবর্ষের কল্যাণ সাধনের জন্যই ভারতশাসন সুসম্পন্ন করিব।" সে অনেক দিনের কথা। তখনও ভারতবর্ষের সকল স্থানে বৃটিশশাসন ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে নাই;—যেখানে যৎকিঞ্চিৎ ব্যাপ্ত হইয়াছিল, সেখানেও তাহা কেবল বণিক্-সমিতির বাণিজ্যনীতির উপরেই একান্ত নির্ভর করিয়া চলিতে বাধ্য হইত।

তাহার পর ধীরে ধীরে বৃটিশ-শাসন ভারত ব্যাপ্ত হইয়া উঠিলে, বৃটীশ-শাসন বলিয়া উঠিয়াছিল,—"ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষের যুগপৎ কল্যাণসাধনের জন্যই ভারতশাসন সুসম্পন্ন করিব।" তাহাও অনেক দিনের কথা। তখনও সমগ্র ভারতবর্ষে বৃটীশ-শাসন ভাল করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করে নাই।

প্রতিষ্ঠালাভ করিবার পর, যে সকল শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে, তাহা যেন ভারতবর্ষের কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে! এখন ইংলণ্ডের ইজ্জৎ রক্ষাই প্রধান কথা হইয়া পড়িয়াছে। সমগ্র শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে তাহা এত সুস্পষ্ট হইয়া রহিয়াছে যে, তাহার উল্লেখ করা বাহুল্য হইয়া পড়ে।

এরূপ শাসননীতি ভারতবর্ষের কল্যাণ সাধন করিতে পারে না;—ইহা ইংলণ্ডের এবং ভারতবর্ষের যুগপৎ কল্যাণসাধনের পক্ষেও অনুকূল বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

সুতরাং ইহার সংস্কার-সাধনের আশায় ভারতবর্ষের লোকনায়কগণ আন্দোলন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদের পথ সরল পথ। বৃটীশ-শাসনের চিরপরিচিত উদারনীতির উপরে একান্ত নির্ভর করিয়াই তাঁহারা এতকাল প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা কায়মনোবাক্যে নিয়ত কল্যাণকামনা করেন,—ভারতবর্ষকে উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোতে টানিয়া আনিয়া, তাহাকে ডুবাইয়া মারিতে ইচ্ছা করেন না!

সমুচিত সাহসের অভাবে তাহাদিগের প্রার্থনা পূর্ণ হয় নাই। পূর্ণ করিতে হইলে, বিশ্বাস করিতে হয়। ভারতবর্ষকে বিশ্বাস করিতে ইতস্তত করিয়াই বৃটীশ-শাসন অবিশ্বাস সঞ্চারিত করিয়া তুলিয়াছে।

এখনও বুঝিবার সময় তিরোহিত হয় নাই। কিন্তু বুঝিবার পক্ষে যে সকল প্রবল অন্তরায় বর্ত্তমান, তাহাতে এক অলীক মোহ রাজপুরুষগণকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে। তাহাকে মোহ না বলিয়া, বিভীষিকা বলিলেই সুসঙ্গত হয়।

"এখনও সময় হয় নাই"—এই এক কাল্পনিক বিভীষিকা শাসন সংস্কারের অন্তরায় হইয়া রহিয়াছে! "ভারতবর্ষ প্রাচ্যদেশ,"—এই আর এক কাল্পনিক বিভীষিকা পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে! "বহুজাতি, বহুভাষা বহুধর্ম্ম, বহুস্বার্থ, বহু কলহ,"—এই আরও এক "অকাট্য যুক্তি" সকল তর্কের একমাত্র উত্তর হইয়া দাঁড়াইয়াছে!

বিচ্ছিন্নভাবে ভারতবর্ষের ইতিহাস অধ্যয়ন করিতে বসিয়া, রাজপুরুষগণ যে সকল ঐতিহাসিক অপসিদ্ধান্তের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই এই সকল বিভীষিকা এতদূর প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। শাসন-সংস্কারের সময় হয় নাই,—ভ্রম সংশোধনের সময় হয় নাই,—এরূপ হাস্যাস্পদ তর্ক কেহ কখনও অন্য কোনও সভ্যসমাজে দন্তস্ফুট করিতে সাহস করিত না। যাহারা স্মরণাতীত পুরাকাল হইতে আত্মশাসন প্রথার উদ্ভাবনা করিয়া মানব সমাজের যাত্রাপথে বিজয় পতাকা প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের পক্ষে আত্মশাসন লাভ করিবার সময় উপস্থিত হয় নাই বলিলে, সত্যের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে। যাহাদের মধ্যে আত্মত্যাগ এবং পরহিতকামনা ইহলোকের কল্যাণ এবং পরলোকের সদ্গতির নিদান বলিয়া পুরুষানুক্রমে জনসমাজের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা লাভ করিয়া আসিয়াছে, তাহাদিগের হস্তে আত্মশাসন কলঙ্কিত হইবার আশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে না। বৃটীশ শাসন ভারতবর্ষকে যতটুকু পরিমিত মাত্রায় আত্মশাসন প্রদান করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহার কিছুমাত্র অপব্যবহার হইয়াছে বলিয়া প্রমাণ উপস্থিত করিবার উপায় নাই। তথাপি "সময় হয় নাই" বলিয়া বিজ্ঞতা-বিজ্ঞাপক ঔদাস্য প্রকাশ করিবার অর্থ কি?

"প্রাচ্য প্রাচ্য, প্রতীচ্য প্রতীচ্য,"—এই এক অনন্বয়ালঙ্কারের অবতারণা করিয়া, এক ইংরাজলেখক কবি বলিয়া সমাদর লাভ করিয়া উঠিয়াছেন। শাসন ব্যবস্থার অভ্যন্তরেও তাহার প্রতিধ্বনি ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে। ইহা ভৌগলিক সত্য, তাহাতে কাহারও সংশয় উপস্থিত হইবার আশঙ্কা নাই। কিন্তু ইহাই কি ঐতিহাসিক সত্য? যাহা প্রতীচ্য বলিয়া সুপরিচিত, তাহা কি প্রাচ্যের অনুকরণেই

গঠিত হইয়া উঠে নাই? যে সকল মহাসত্য মানবসমাজকে পথ প্রদর্শন করিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহাই প্রাচ্যপ্রতীচ্যের ভৌগলিক পার্থক্য অতিক্রম করিয়া, সমগ্র সভ্যসমাজকে এক পথে আকর্ষণ করিতেছে। যাঁহারা প্রাচ্য বলিয়া নাসিকাকুঞ্চনের জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়েন, তাঁহারাই বলিয়া থাকেন—"প্রাচ্য অনুকরণপ্রিয়।" প্রাচ্যের কোনরূপ ভৌগলিক অন্তরায় বর্ত্তমান থাকা সত্য হইলেও, তাহার এই অনুকরণপ্রবণতাই অল্পকালের মধ্যে তাহাকে প্রতীচ্যের ন্যায় গুণশালী করিয়া তুলিবে। যাপানকে ইহার মধ্যেই প্রতীচ্যের সমকক্ষ করিয়া তুলিয়াছে। তাহা স্বীকার করিয়াও, যাঁহারা ভারতবর্ষকে "প্রাচ্য" বলিয়া স্বরাজলাভের অযোগ্য জ্ঞান করেন, তাঁহাদিগের এরূপ ধারণার কারণ কি?

"বহু জাতি, বহু ভাষা, বহু স্বার্থ, বহু কলহ,"—এই সকল কথা আপাততঃ যেরূপ বিভীষিকার সঞ্চার করিয়া দেয়, ভারতবর্ষের ইতিহাস ধরিয়া তথ্যনির্ণয়ে অগ্রসর হইলে, তাহা দূর হইয়া যায়। রাজনৈতিক অধিকারের সঙ্গে জাতি ধর্ম্ম এবং ভাষার সংস্রব রাখিতে গিয়া যাঁহারা ভারতবর্ষের বৃটীশশাসনকে প্রচণ্ড শাসন করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহারা রাজ্য-সংস্থাপনের সময়ে ইহাকে অন্তরায় জ্ঞান করিয়া ভারতবাসীর সহায়তা গ্রহণ করিতে ইতস্তত করেন নাই;—রাজ্যরক্ষার্থ এখনও কোন জাতির সহায়তা গ্রহণ করিতে ইতস্তত করিতেছেন না। যাহারা বৃটীশ-শাসনের অধীনে থাকিয়া, বেতন গ্রহণ করিয়া, জাতি-ধর্ম্মের পার্থক্য থাকিতেও, আপন আপন কর্ত্তব্যপালনে কিছুমাত্র স্খলিত হইয়া পড়িতেছে না, তাহাদের সেই বৃটীশশাসনের অধীনে থাকিয়াই, আত্মশাসনের বিধিব্যবস্থা প্রতিপালন করিবার সময়ে কর্ত্তব্যচ্যুত হইবার সম্ভাবনা নাই। জাতিধর্ম্মের পার্থক্য ভারত-বর্ষে যেরূপ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সকল সম্প্রদায়কে একমন্ত্রে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতেছে, রাজপুরুষগণ তাহাতে বাধা প্রদান না করিলে, এতদিনে ভারতবর্ষে যুগান্তর উপস্থিত হইতে পারিত। যাঁহারা বাক্যে পার্থক্য-বিরোধী, তাঁহারাই আবার কার্য্যে পার্থক্যপ্রয়াসী হইবার কারণ কি?

ভারতশাসন ব্যবস্থার মধ্যে আন্তরিকতার অভাব,—সৎসাহসের অভাব,—বিশ্বাসের অভাব—একমাত্র প্রকৃত কারণ বলিয়া অভিব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। ইজ্জতের ভয়ে সে কথা স্বীকার করিতে না পারিয়া, রাজপুরুষ-গণ যে সকল কাল্পনিক বিভীষিকার উল্লেখ করিয়া থাকেন, তাহার একটিও বিচারসহ বলিয়া মর্য্যাদা লাভ করিতে পারে না!

রাজপুরুষগণের এই সকল কাল্পনিক বিভীষিকা যেন তারস্বরে বলিয়া উঠিতেছে,—"বৃটীশ-শাসন ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে, তাহা এত দিনেও ভারতবাসীকে মানুষ করিয়া তুলিতে পারে নাই!" যাহা ইতিহাসের নিকট বৃটীশ-শাসনের প্রধান জয়মাল্য বলিয়া পূজা লাভ করিবার যোগ্য, তাহা এইরূপে রাজপুরুষগণের নির্ম্মম চরণ পীড়নে নিয়ত বিদলিত হইতেছে!

বৃটীশ-শাসন ব্যর্থ হয় নাই। তাহা চিরপুরাতন ভারতবর্ষকে নবানুরাগে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছে। অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া, বৃটীশ-শাসন ভারতবর্ষে যে নবযুগের প্রবর্ত্তন করিয়া দিয়াছে, তাহার ভবিষ্যৎ ইতিহাস

লেখক বৃটীশ-শাসনের ত্রুটী প্রদর্শনের সময়েও তাহাকে সমুচিত সাধুবাদ করিতে বাধ্য হইবেন।

ইংরাজ-বণিক্ ভারতবর্ষে আসিয়া "বাণিজ্য-সনন্দ" ভিক্ষা করিবার সময়ে ভারতবর্ষের বিবিধবিভাগে হিন্দুমুসলমানগণ যথাশক্তি শাসনক্ষমতা পরিচালিত করিত;—তাহার জন্য বাহুবলে দেশরক্ষা করিত; শাসনকৌশলে প্রজাপালন করিত; অকুতোভয়ে শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি সাধন করিত। ইরাজ-বণিক্ ভারতবর্ষে রাজ্যস্থাপন করিবার সময়েও তাহাদের এই সকল শক্তি একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়ে নাই;—তখনও তাহারা বাহুবলে এবং শাসনকৌশলে নিজ নিজ অধিকারে ক্ষমতাশালী বলিয়াই প্রশংসা লাভ করিত। ইংরাজ-বণিক্ ভারতবর্ষে একাধিপত্য লাভ করিবার পরেও ভারতবর্ষের যে প্রদেশে যতটুকু স্বাধীনভাবে শাসনক্ষমতা পরিচালনার অধিকার অপহৃত হয় নাই, সেই প্রদেশে হিন্দুমুসলমান যথাসাধ্য সুশাসন রক্ষা করিয়া ইংরাজ রাজপুরুষদিগের নিকটেও সাধুবাদ লাভ করিয়া আসিতেছে। এই সকল ঐতিহাসিক সত্যের কেহই অপলাপ সাধন করিতে পারিবেন না। এক শক্তির অভাবে এই সকল শাসনশক্তি ছত্রভঙ্গ হইয়া ভারতবর্ষে বিপ্লব আনয়ন করিয়াছিল। অখণ্ড ভারতবর্ষকে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের অধিবাসী তাহাদের "স্বদেশ" বলিয়া বুঝিতে পারিত না। তাই এক প্রদেশ অন্য প্রদেশ লুণ্ঠন করিত। তাহাকে প্রাদেশিক রাজশক্তির অসঙ্গত কলহপ্রবণতা বলিলে বলিতে পারা যায়। কিন্তু তখনও এক ধর্ম্মের লোক বা একজাতির লোক অন্য ধর্ম্মের লোকের বা অন্য জাতির লোকের রক্ত পানের জন্য লালায়িত হইত না। মুসলমান মোগল-শাসনকর্ত্তার জন্য হিন্দু বীরপুরুষেরা মরাঠার হিন্দু-রাজ্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিত; হিন্দু মরাঠা-শাসনকর্ত্তার জন্য মুসলমান বীরপুরুষেরাও মোগলের মুসলমানরাজ্যের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিত। ইরাজ-শাসন এখন অখণ্ড ভারত-ভূমিকে সমগ্র ভারতবাসীর অখণ্ড জন্মভূমি বলিয়া বুঝাইয়া দিয়া, অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া দিয়াছে। এখন আর পুরাকালের ন্যায় এক প্রদেশের সহিত অন্য প্রদেশের স্বার্থকলহ সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা মাত্রও বর্ত্তমান নাই। এরূপ অবস্থায় বৃটীশশাসনের ছায়াতলে বসিয়া ভারতবর্ষের লোকে ভারতবর্ষের মধ্যে "স্বরাজ" লাভ করিবার অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ধর্ম্ম, ভিন্ন ভাষা, যদি কখনও আবার ভিন্ন স্বার্থ জাগাইয়া তুলিয়া কলহ উৎপাদন করিতে পারিত, বৃটিশ-শাসন তাহার সকল আশঙ্কা দূর করিয়া দিয়াছে। এখন ভারতবর্ষ এক নবযুগে পদার্পণ করিয়াছে।

এখন আর পুরাকাহিনী ধরিয়া ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ আচরণের বিচার চলিতে পারে না। এখন তাহার সম্মুখে ভবিষ্যতের তরুণ অরুণ-কিরণ উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। বহুযুগের বহুবিড়ম্বনার ভিতর দিয়া ভারতবর্ষ তাহার শক্তির মূল এবং শক্তিহীনতার মূল পৃথক করিয়া বাছিয়া লইতে শিখিয়াছে। ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ধর্ম্ম, ভিন্ন ভাষা প্রকৃতপক্ষে শক্তি-হীনতার মূল নহে;—ভিন্ন স্বার্থ ই শক্তিহীনতার মূল। অখণ্ড ভারতবর্ষকে "স্বদেশ" বলিয়া ভালবাসিতে শিখিয়া, নব্যভারতের অধিবাসিগণ

ভিন্ন স্বার্থ বিস্মৃত হইতে বাধ্য হইয়াছে। এখন সমগ্র দেশের মধ্যে একভাব একপ্রাণের এক স্পন্দনের মত স্পন্দিত হইয়া উঠিতেছে। ইহাই ত প্রকৃত সুসময়।

এখনও সময় হয় নাই বলিয়া স্রোতের মুখে বাধাদান করিলে, সে কৃত্রিম বাধা অধিকদিন গতিরোধ করিতে পারিবে না। যত দিন পারিবে, ততদিনও প্রতিনিয়ত গোপনপথে নিরুদ্ধ শক্তিস্রোত ফুটিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিতে বিরত হইবার সম্ভাবনা নাই!

এখন আর "সময়োচিত সুশাসন" নামক স্বেচ্ছাচার রাজাপ্রজার ইজ্জৎ রক্ষা করিতে পাবে না। প্রজার মতামত উপেক্ষা করিয়া, তাহাদের কাতর ক্রন্দন উপেক্ষা করিয়া, তাহাদের সম্মিলিত আকাঙ্ক্ষা পদবিদলিত করিয়া, তাহাদের আন্তরিক প্রতিবাদের আকুল আর্ত্তনাদ অস্বীকার করিয়া ভারতশাসনে প্রশংসালাভ করিবার সম্ভাবনা নাই। এখনই যথার্থ শাসনবীরের ন্যায় সাহস দেখাইবার সময় আসিয়াছে;—সাহস করিয়া বিশ্বাস করিবার—বিশ্বাস করিয়া অধিকার দান করিবার—অধিকার দান করিয়া স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষার সমুচিত পরিপূরণে প্রকৃত রাজভক্তি আকর্ষণ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

ইহা কেবল ভারতবর্ষের পক্ষেই যুগসন্ধিকাল নহে;—ইংলণ্ডের পক্ষেও যুগসন্ধিকাল। এতদিন ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষের মধ্যে শাসননীতির পার্থক্যপ্রসূত যে প্রবল পার্থক্য উভয় দেশকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে, এখন তাহার সংস্কার সাধনের প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। তাহার উপরেই উভয় দেশের প্রকৃত ইজ্জৎ নির্ভর করিয়া রহিয়াছে!

শ্রী—

গোটা দুই তিন কঠিন কথা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

খৃষ্টীয় ঈশ্বরতত্ত্ব।

খৃষ্টীয়ধর্ম্ম ইহুদীয় ধর্ম্মের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। ইহুদীয় জিহোভাকেই খৃষ্টীয়ানেরাও ঈশ্বর বলিয়া মানেন; এবং এই দশাজ্ঞা ও পুরাতন বাইবেলের সকল কথাই তাঁরা প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করেন। নূতন পুস্তকের বা নিউ-টেষ্টেমেণ্টের, বিশেষত্ব, বিস্তর অবতারতত্ত্ব। ইহুদীয় ধর্ম্মে অবতারবাদের নাম গন্ধ নাই। ফলত ঈশ্বর যতদিন কোনো না কোনোভাবে চাক্ষুষ থাকেন, সাক্ষাৎভাবে যখন তাঁহার দর্শন লাভ ও উপদেশ শ্রবণ সম্ভব হয়, ততদিন অবতারের প্রয়োজনই হয় না। দেবতা যখন একান্ত অতীন্দ্রিয় হইয়া পড়েন, তখনই তাঁহার সঙ্গে মানুষের যোগ স্থাপন ও রক্ষা করিবার জন্য নবীন বা প্রফেট্, পয়গম্বর ও অবতারাদির

প্রয়োজন হয়। ইহুদীর ঈশ্বর প্রথমে ইহুদী-সমাজের নেতৃবর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ ভাবেই কথাবার্ত্তা কহিতেন। এমন কি কখনো বা তাঁহাদের সঙ্গে হাতাহাতি কুস্তিকসরৎও করিতে আসিতেন। সে অবস্থায়, কাজেই পয়গম্বর বা অবতারের আবশ্যক হয় নাই। ইহুদার ঈশ্বর যখন লোকচক্ষুর একান্ত অতীত হইয়া গেলেন, তখন হইতে ইহুদা সমাজে নবী বা প্রফেটদিগের আবির্ভাব আরম্ভ হইল। ঈশ্বরের "বাণী" আসিয়া ইহাদিগকে অবলম্বন করিয়া ইহুদাসমাজে তাঁহার আদেশ প্রচার করিতে লাগিল। তখন হইতে এই সকল নবী বা প্রফেট বা প্রবক্তাই ইহুদাধর্ম্মের লৌকিক অবলম্বন হইলেন। কিন্তু এই নবীদিগের সময় হইতেই, কালক্রমে ইহুদার উদ্ধার সাধনের জন্য জিহোভার নিকট হইতে একজন সিসায়া বা মসী, বা বিশেষ দূত, আবির্ভূত হইবেন, এ ভাব ইহুদা সমাজে অল্পে অল্পে জাগিতে আরম্ভ করে। তাঁহার আদি ইহুদীশিষ্যগণ যিশুকে এই মসী বা সিসায়ারূপেই গ্রহণ করেন। তাঁহাদের নিকটে যিশু "ঈশ্বরের সন্তান" রূপেই প্রকাশিত হন। বাইবেলের পুরাতন পুস্তকে দেবদূতদিগকে বারম্বারই ঈশ্বরপুত্র আখ্যা দিয়াছে। ইহুদী ভাষায় ইহাদিগকে "বেনে ইলোহিম্"—বলিত। যিশু স্বয়ং এই উপাধি গ্রহণ করেন—আপনাকে ঈশ্বরপুত্র বা সন্ অব্ গড্ Son of God বলিয়া প্রচার করেন। তাঁহার ইহুদীশিষ্যেরা ঈশ্বরপুত্র বলিতে প্রবক্তাগণ কথিত মসী বা সিসায়া বলিয়াই বুঝিয়াছিলেন। খৃষ্টধর্ম্ম এই ঈশ্বর পুত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা যিশুর ইহুদাশিষ্যগণের ব্যাখ্যা বলিয়া মনে হয় না। জোহনলিখিত ধর্ম্মপুস্তকেই সর্ব্বপ্রথমে ও প্রকাশ্যভাবে যিশুর ঈশ্বরত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা দৃষ্ট হয়। In the begining was the word and the word was with god, and the word was God.—

আদিতে "বাক্য" ছিল, এই "বাক্য" ঈশ্বরের সঙ্গে ছিল, এবং এই "বাক্য"ই ঈশ্বর ছিল। এবং এই "বাক্য"ই যিশুরূপে অবতীর্ণ হয়। গ্রীসীয় ভাষায় লগস্ logos শব্দের ইংরাজী অনুবাদ word; পাদ্রিরা বাংলাতে ইহাকেই "বাক্য" বলিয়াছেন। এই লগস কথা গ্রীসীয় দর্শনের কথা। লগসবাদ গ্রীক তত্ত্ববিচারের একটী প্রধান অঙ্গ। ইহার আলোচনা এ স্থলে সম্ভব নহে। এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে পণ্ডিতেরা এখন প্রায় একবাক্যে একথা স্বীকার করেন, যে খৃষ্টীয় লগসবাদ, যাহার উপরে যিশুর দেবত্ব ও অবতারত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, জোহেন কিম্বা যেই খৃষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রন্থের এই চতুর্থ পুস্তক রচনা করুন না কেন ইহা গ্রীক্ সাধনা হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহুদার প্রাচীন তত্ত্ববিচারে ইহার কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না। গ্রীকেরা নিতান্তই সাকারোপাসক ছিলেন। গ্রীকের তত্ত্বজ্ঞানীরা বিবিধভাবে এই সাকারোপাসনার গ্রীসের দেবদেবীর ব্যাখ্যা করিয়া, উচ্চতর তত্ত্বের সঙ্গে তাহার সামঞ্জস্য করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু ইহুদারও পরে ইস্লামে যে ভাবে সাকারবাদ একান্তরূপে বর্জ্জনের চেষ্টা দেখা যায়, গ্রীসে তাহা কখনো দেখা যায় নাই। এ বিষয়ে গ্রীসের ও ভারতবর্ষের আর্য্যগণের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। এই

গ্রীসেরই তত্ত্বজ্ঞানের আশ্রয়ে খৃষ্টীয় ঈশ্বরতত্ত্ব ফুটিয়া উঠে,—সুতরাং ইহা যে নিতান্ত নিরাকার নহে, এ আর বিচিত্র কি ?

খৃষ্টীয় ঈশ্বরতত্ত্ব, সাকার-নিরাকার।

ফলত তত্ত্ববস্তু, যাহা দ্বারা তত্ত্বজ্ঞেরা এই জটিল বিশ্ব-সমস্যার মীমাংসা করিতে চেষ্টা করেন, তাহা শুদ্ধ নিরাকারও নহে, শুদ্ধ সাকারও নহে; তাহা সাকারে নিরাকার ও নিরাকারে সাকার। আমাদের দেশের দার্শনিক পরিভাষাতে এই তত্ত্বকে ব্যক্ত করিতে গেলে এই বলিতে হয় স্বরূপত তত্ত্ববস্তু নিরাকার, তটস্থলক্ষণায় সাকার। অর্থাৎ বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া যদি দুই তত্ত্বকে ধরিতে যাই, তাহা হইলে, তাহাকে নিরাকাররূপেই ধরিতে হয়; কিন্তু এ নিরাকার অর্থ তখন বস্তুত নির্গুণ হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু বশ্বের পরিণাম ও বিবর্ত্তনের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া, বিশ্বের কারণ, বিশ্বের নিয়ন্তা, বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও গতিরূপে যখনই এই পরমতত্ত্বকে ধরিতে যাই, তখনই তাহাকে সগুণ অর্থাৎ সাকারভাবে ধরিতে হয় এখানেও এক অর্থে এই তত্ত্ব নিরাকার বটে; সে অর্থ এই যে ইহা কোনো আকার বিশেষে আবদ্ধ নহে। অথচ সকল আকারেই বর্ত্তমান। স্বর্ণের যেমন নিজস্ব কোনো আকার নাই;—স্বর্ণ গোল কি চতুষ্কোণ কি ত্রিকোণ, এ কথা বলা যায় না; অথচ কঙ্কণ, বলয়, হার, কুণ্ডলাদি সকল আকারেই স্বর্ণের আকার, আমাদের দেশের দার্শনিকেরা তত্ত্ববস্তুকেও সেইরূপ সাকার-নিরাকাররূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। খৃষ্টীয় ঈশ্বরতত্ত্ব যে এভাবে সাকার ও নিরাকার, এমন বলা যায় না। কিন্তু অন্যভাবে ইহা যে নিতান্ত নিরাকার নহে, ইহাও অস্বীকার করা অসম্ভব।

খৃষ্টীয়ান ত্রিত্ববাদ বা ট্রিনিটি।

খৃষ্টীয়ান ঈশ্বরতত্ত্ব খৃষ্টীয় ত্রিত্ববাদে বা ট্রিনিটিতেই বিশদরূপে ধরিতে পারা যায়। পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মা,—এই তিনে মিলিয়া খৃষ্টীয় ঈশ্বরতত্ত্ব পূর্ণ হয়। কিন্তু ত্রিত্ববাদ বা ট্রিনিটি, ত্রিঈশ্বরবাদ বা ট্রাইথিজ্‌ম নহে; পিতা পুত্র, পবিত্রাত্মা, এ তিন একান্ত পৃথক্ ও স্বতন্ত্র তত্ত্ব নহে, একই তত্ত্বের বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। স্বরূপত এ তিনে এক, প্রকাশে পৃথক্। On in *ousia*, different in *hypostatis*, *ousia* ও *hypostatis*, উষিয়া ও হাইপোষ্টেটিস্,– এই দুইটী গ্রীক্ শব্দের দ্বারা খৃষ্টীয়ান তত্ত্বজ্ঞানিগণ খৃষ্টীয় ত্রিত্ববাদের মর্ম্ম ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। Ousia-উষিয়া-শব্দের ইংরাজি অনুবাদ Gessence, আমরা যাহাকে স্বরূপ বলিতে পারি; Hypostatis হাইপোষ্টেটিস্ শব্দের ইংরাজি Apperrance, আমরা যাহাকে প্রকাশ বলিতে পারি। অতএব পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মা,—ইহারা স্বরূপত এক, কিন্তু প্রকাশে ভিন্ন। পুত্রকে পিতারূপে গ্রহণ করা, খৃষ্টীয় সাধনার অতি গুরুতর অপরাধ, অথচ পুত্রের ঈশ্বরত্ব অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করিয়া কেহ খৃষ্টীয়ান থাকিতে পারে না। ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে প্রকাশের দিক দিয়া পিতাপুত্রের মধ্যে যে বিভিন্নতা, ইহাও নিত্য। নির্গুণ ব্রহ্মবাদে প্রকাশ মাত্রকেই মায়িক বলিয়া, তাহার পারমার্থিক সত্য অস্বীকার করে। খৃষ্টীয় ঈশ্বরতত্ত্বে পিতা ও পুত্রের মধ্যে যে বিভিন্নতা,

তাহাকে এইরূপ মায়িক বলে না। তাহা পারমার্থিক। মায়িক সৃষ্টিতেই বস্তু ও তাহার প্রকাশের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা অস্থায়ী ও আকস্মিক; এখানেই স্বরূপে ও রূপে প্রভেদ আছে। মায়াতীত যে পরমতত্ত্ব, তাহাতে এই সম্বন্ধ নিত্য ও সত্য, সেখানে যাহা রূপ তাহাই স্বরূপ। ইহাই আমাদের বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত। খৃষ্টীয় সিদ্ধান্তও কতকটা এইরূপই Hypostatis ও Ousia দুই নিত্য স্থায়ী। অনাদিকাল হইতে, ঈশ্বর পিতারূপে, যিশু পুত্ররূপে ও পবিত্রাত্মা তাঁহাদের উভয়ের অঙ্গরূপে, এক ও পৃথক্ হইয়া বাস করিতেছেন। জোহনের লিখিত সুসমাচারের প্রথমেই এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে:—In the begining was the word, the word was with god, the word was God.

এই ত্রিত্ববাদের আলোচনাতেই আমরা দেখিতে পাই যে খৃষ্টীয় ঈশ্বর তত্ত্বও ঐকান্তিকভাবে নিরাকার নহে। কারণ এখানে "স্বরূপত" এক হইয়াও, যখন ঈশ্বর ও যিশু ও পবিত্রাত্মা, "রূপত" বা Hypostatisএ নিত্যকালেই পরস্পর হইতে পৃথক্ হইয়া আছেন, তখন "রূপত" অন্তত এই তিন তত্ত্ব যে পরস্পর হইতে পরিচ্ছিন্ন, ইহা অস্বীকার করা অসম্ভব। এবং আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে পরিচ্ছিন্ন তত্ত্ব মাত্রেই প্রকৃতপক্ষে সাকার। তবে জড় আকার সম্পন্ন এই অর্থে এস্থলে, সাকার শব্দ ব্যবহৃত হয় না। সাকার বলিতে চিদাকারও বোঝায়। আর আমাদের দেশের শাস্ত্রেতেও সাকার বলিতে, প্রকৃত পক্ষে, চিদাকারই ব্যক্ত হয়, জড়াকার নহে। এবং এই চিদাকার অর্থে, খৃষ্টীয় ঈশ্বরতত্ত্বও সাকার, অথবা নিরাকারে-সাকার বা সাকারে-নিরাকার।

খৃষ্টীয় সাধনায় সাকারবাদ।

আর তত্ত্বেতে যদিও যিশু চিদাকার সম্পন্ন বলিয়াই প্রতিষ্ঠিত হন, খৃষ্টীয় সাধনাতে, ফলত তাঁহাকে মানবাকারেই প্রতিষ্ঠিত করে। আমরা এদেশে, সাধন-ভজন বলিতে যাহা বুঝি, খৃষ্টীয় সম্প্রদায় মধ্যে, ক্যাথলিক মণ্ডলীতেই কেবল তাহা ভাল করিয়া দেখিতে পাই। প্রোটেষ্টেণ্ট্ মণ্ডলী মধ্যে বাইবেল পাঠ এবং প্রার্থনাই প্রধান, এমন কি একমাত্র সাধন ভজন বলিয়া পরিগণিত হয়। ইংলণ্ডে, আংলিকান্ দলের মধ্যে, এর চাইতে একটু বেশী ভজননিষ্ঠা দেখা যায় বটে, আমাদের এদেশে যে সকল প্রোটেষ্টেণ্ট্ খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারক আছেন, তন্মধ্যে অক্সফোর্ড মিশনের সাহেবেরা এই আংলিকান্ দলভুক্ত। ইঁহাদের মধ্যে অনেকটা আচার নিয়মাদি দেখিতে পাওয়া যায়। আর ইহারা অনেকটা রোমান্ ক্যাথলিক্দিগেরই মত, রোমান্ ক্যাথলিক্ খৃষ্টীয়মণ্ডলীতে যিশুখৃষ্টের বিশেষ ভজনা হয়। এবং ইঁহারা খৃষ্টমূর্ত্তি ধ্যান করেন ও আপনাদের উপাসনালয়ে যিশুখৃষ্টেরও এমন কি যিশু-মাতা মরিয়েমের মূর্ত্তিও প্রতিষ্ঠিত করিতে কোনো কুণ্ঠা বোধ করেন না। সুতরাং ইহাদের খৃষ্টোপাসনা যে সাকার, ইহা অস্বীকার করা যায় না।

আর প্রোটেষ্টেণ্টগণ যদিও খৃষ্টমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার ভজনা করেন না, কিন্তু ক্রশকাষ্ঠে আত্মবলিদান করিয়া পুণ্যচরিত্র যিশু জগতের পাপের যে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া-

ছেন, তাহার ধ্যান করিয়া থাকেন। Passion and Christ ও যিশুর এই আত্মবলিদান সতত চিন্তা করিয়া যিশুর শোণিতে আপনাকে শুদ্ধ করিবে,—প্রোটেষ্ট্যান্ট খৃষ্টমণ্ডলী সকলেরও গভীরতম ধর্ম্মপদেশ ইহাই! আর এই ভাবটী আয়ত্ত করিতে গেলেই যিশুর মূর্ত্তি ধ্যান করা আবশ্যক হইয়া উঠে। অতএব কোনো না কোনো আকারে খৃষ্টীয় সাধনাও যে সাকারভাবাপন্ন ইহা মানিতেই হয়। তবে যে সকল খৃষ্টীয়ান সাধনজ্ঞানের ধার ধারেন না, কেবল চরিত্রশোধনেই যাদের সমুদায় ধর্ম্মচেষ্টা পর্য্যবসিত হয়, যাঁরা ধর্ম্মকে ভাবোদ্ভাসিত মরালিটিতে—মাথ্ আর্নল্ড্ যাকে ধর্ম্ম বলিয়াছেন—সেই morality lit up by emotion অধ্যাত্ম সম্পদ জ্ঞানে তাহারই অনুশীলন করেন, তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহাদিগকে খৃষ্টীয়ান সাধক বলিয়া ধরিলেও চলে।

ক্রমশ

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

তালীবনের ভারতে।

পণ্ডিচেরী ছাড়িয়া।

১৩

কাল পণ্ডিচেরী ছাড়িয়া, নিজামের রাজ্যের ভিতর দিয়া, ভারতের দুর্ভিক্ষ-পীড়িতপ্রদেশ রাজপুতদের রাজ্যে যাত্রা করিব।

আমাদের পুরাতন উপনিবেশে আমি বড় ১০ দিন মাত্র রহিয়াছি, আশ্চর্য্য, ইহারই মধ্যে এই স্থান ছাড়িয়া যাইতে আমার হৃদয়ে কেমন একটু কষ্টবোধ হইতেছে। এতদিন ত আমি ভারতের একস্থান হইতে স্থানান্তরে লঘুহৃদয়ে প্রস্থান করিয়াছি! কেহ মনে করিতে পারে, আমি যেন পণ্ডিচেরীতে দ্বিতীয়বার আসিয়াছি, যেন আমার মনে পণ্ডিচেরীর পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিয়াছে। আমার প্রথম যৌবনে, সেনেগ্যালের সেই নির্ব্বাপিত পুরাতন নগর Saint-Louisতে একবৎসর বাস করিয়া, প্রস্থানের সময় আমার মনে যেরূপ ভাব হইয়াছিল, এখান হইতে যাইবার সময়েও কতকটা সেইরূপ ভাব উপস্থিত হইয়াছে।

আমি এখানে আসিয়া একটা হোটেলে ছিলাম। পণ্ডিচেরীতে দুইটা হোটেল আছে; কিন্তু পর্য্যটক আগন্তুকের অভাবে, দুইটা হোটেলই কোনপ্রকারে কষ্টেসৃষ্টে চলে। যে হোটেলটা সমুদ্রের ধারে অবস্থিত আমি সেই হোটেলটা বাছিয়া লইয়াছিলাম। হোটেলের বাড়ীটা একটু সেকেলে রাজ-রাজড়ার বাড়ীর মত, নগরের গোড়াপত্তন হইতে উহার নির্ম্মাণকাল ধরা যাইতে পারে; উহার জরাজীর্ণতা চুনকামে ঢাকা পড়িয়াছে। উহার

ভগ্নদশা দেখিয়া, পোড়োভাব দেখিয়া, আমি একটু ভয়ে ভয়ে প্রবেশ করিয়াছিলাম। তখন কে বলিতে পারিত, যদৃচ্ছালব্ধ এই প্রবাস গৃহটির উপর আমার আসক্তি জন্মিবে? আমি একটা বড় কাম্‌রা অধিকার করিয়াছিলাম, বয়ঃপ্রভাবে কাম্‌রাটা একটু বাঁকিয়া গিয়াছে, চুনকামে ধব্‌ধব্‌ করিতেছে এবং ভিতরটা প্রায় খালি। আফ্রিকার উপকূলে যে বাড়ীটিতে আমি অনেকদিন বাস করিয়াছিলাম, তাহার সহিত উহার কি যেন একটা অনির্দ্দেশ্য ও ঘনিষ্ঠতর সাদৃশ্য আছে। সবুজ খড়খড়িওয়ালা জান্‌লা হইতে ভারতের অসীম সমুদ্র দেখা যায়; দিনের যে সময়টা অত্যন্ত কষ্টজনক সেই সময়ে বহিঃসমুদ্রের স্নিগ্ধ বায়ু আদর্শ-শৈত্য বহন করিয়া আনে। ফিরিঙ্গিদের ঘরে যেরূপ থাকে,—সেইরূপ আমার ঘরে, শতবর্ষের পুরাতন কতকগুলা কাঠের আরাম-কেদারা ছিল; কেদারার কিনারায় খোদাই-কাজ। ষোড়শলুইর আমলের একটা দেয়াল-ঘেঁসা টেবিলের উপর সেই সময়কার একটা ঘড়ি ছিল। তাহার টিক্‌ টিক্‌ শব্দে জানা যায় তাহার জরাগ্রস্ত ক্ষুদ্রপ্রাণটা এখনও একটু ধুক্‌ধুক্‌ করিতেছে। সমস্ত আস্‌বাবই শুষ্ক-জীর্ণ, পোকা-খাওয়া, ভগ্নপ্রায়; কেদারায় খুব চাপিয়া বসিতে কিংবা খাটের উপর ধড়াস্‌ করিয়া শুইয়া পড়িতে সাহস হয় না! কিন্তু দিনগুলি বড়ই রমণীয় ও উপভোগ্য; বায়ু নিস্তব্ধ, সমুদ্রের দিগন্ত সুনীল, চতুর্দ্দিকের সামুদ্রিক শান্তি অতীব মধুর।

জান্‌লার উপর হাতের কুনুই রাখিয়া ঝুঁকিয়া দেখিলে আরও অনেকটা সমুদ্র ও সমুদ্রের বেলাভূমি, নিকটস্থ অনেক পুরাতন বাড়ীর বারাণ্ডা, ও আরব-ধরণের ছাদ দেখা যায়,—ছাদ্‌গুলা সূর্য্যোত্তাপে ফাটিয়া গিয়াছে এই সমস্ত দেখিয়াও আমার আফ্রিকা মনে পড়ে। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত, একদল নগ্নকায় মজুর, পার্শ্ববর্ত্তী একটা অঙ্গনে, জাহাজ বোঝাই করিবার জন্য, শস্যের দানা ও বিবিধ মস্‌লা চটাই-থলের মধ্যে ভরিতেছে, আর একপ্রকার ঘুমন্ত সুরে গান করিতেছে।

কি দিন, কি রাত্রি,—আমি দরজা জান্‌লা কখনই বন্ধ করিতাম না, পাখীরা আপনার ঘরের মত স্বচ্ছন্দে আমার ঘরে আসিত; চড়াইরা আমার ঘরের মেজের মাদুরের উপর নির্ভয়ে বিচরণ করিত; ছোট ছোট কাঠবিড়ালীরাও, চারিদিকটা এক নজরে একবার দেখিয়া লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিত, আমার সমস্ত আস্‌বাবের উপর চলিয়া বেড়াইত; একদিন প্রাতে দেখিলাম, দুইটা দাঁড়কাক আমার মশারীর কোণে বসিয়া আছে।

আমার বাড়ীর চতুর্দ্দিকে, ছোট ছোট নিস্তব্ধ রাস্তাগুলা (রাস্তার নামগুলা সেকেলে ধরণের) প্রখর সূর্য্যোত্তাপে যখন প্রপীড়িত হইতেছে—সেই মধ্যাহ্ন সময়ে—ওঃ! কি বিষাদময় নিস্তব্ধতা! আমার কাম্‌রার মধ্যে কিংবা কাম্‌রার চারিদিকে আধুনিক কালের কোন চিহ্নই নাই; এই সকল বিজন বারণ্ডার কিংবা অদূরের ঐ অসীম নীল মরুক্ষেত্রের কালনির্ণয় করিবার কোন নিদর্শন নাই। যাহারা শস্যের বস্তা প্রস্তুত করিতে ব্যাপৃত রহিয়াছে তাহাদের শান্তিময় ভাব,—পূর্ব্বকালের উপনিবেশ-জীবনের একটা দৃশ্য মনে করিয়া দেয়। তখনকার কালে, এরূপ উন্মত্ত ব্যস্তভাব ছিল

না, কার্য্যের কঠোরতা ছিল না, দ্রুতগতি বাষ্পপোত ছিল না; তখন খামখেয়ালী পালের জাহাজ, আফ্রিকা ঘুরিয়া কত বিলম্বে এখানে আসিত...

যাইবার সময় আমার যে কষ্ট হইয়াছিল তাহা অবশ্য গভীর নহে; কালই আমি সমস্ত কষ্ট ভুলিয়া যাইব, আমার সম্মুখে আবার কতকগুলা নূতন দৃশ্য আবির্ভূত হইয়া এই কষ্টের ভাবকে মন হইতে বিদূরিত করিবে। কিন্তু, পুরাতন ফ্রান্সের যে ক্ষুদ্র একটি কোণ, পথ হারাইয়া বঙ্গোপসাগরের তীরে আসিয়া পড়িয়াছে, উহা যেমন আমার মনকে আট্‌কাইয়াছে—এই পরমাশ্চর্য্য ভারতে যাহা কিছু এ পর্য্যন্ত আমি দেখিয়াছি, কিংবা পরে আরও যাহা দেখিব, তাহার কিছুই এরূপ করিয়া আমাকে আট্‌কাইতে পারে নাই কিংবা পারিবে না।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

সরল কৃত্তিবাস।—সম্প্রতি মাইকেল মধুসূদনের জীবনচরিত প্রণেতা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র নাথ বসু বি, এ, মহাশয় কৃত্তিবাসী রামায়ণের একখানি নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালী মাত্রেরই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। বঙ্গীয় রামায়ণের এইরূপ একখানি সংস্করণের অভাব আমরা প্রকৃতই ঘরে ঘরে অনুভব করিতেছিলাম। বটতলার রামায়ণের বর্ণাশুদ্ধি এত বেশী যে ছেলেরা পাছে বানান ভুলিয়া যায়, এই আশঙ্কায় তাহাদের হাতে তাহা দিতে সাহস হয় না। প্রাচীন কবিগণের বর্ণনায় মাঝে মাঝে এরূপ রসিকতা আছে, যাহা ছেলেদের না পড়াই ভাল। অথচ কৃত্তিবাসের রামায়ণ হইতে সেইরূপ অতি সামান্য অংশ বাদ দিলে ইহা তাহাদের পড়ার পক্ষে এতটা উপযোগী হয় যে বাঙ্গালা অতি অল্প সংখ্যক পুস্তকই এ বিষয়ে ইহার সমকক্ষ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। ইহার উন্নত নৈতিক আদর্শ ও গার্হস্থ্য প্রীতি কোমল হৃদয়ে অতি সহজেই অঙ্কিত হইয়া যায়; এবং বালক বালিকাগণ ইহার রচনার হৃদয়গ্রাহী প্রসাদগুণে সহজে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। বটতলার পুঁথি যে সকল কারণে তাহাদের পক্ষে অনুপযোগী তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বাঙ্গালী গৃহস্থের বালকবালিকা ও মহিলাগণের হাতে দিবার যোগ্য আজ অভিনব সংস্করণটি পাইয়া আমরা প্রকৃতই বিশেষ প্রীত হইয়াছি।

এই সংস্করণটিতে কৃত্তিবাসী রামায়ণের অশ্লীলাংশ বর্জ্জিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা এত সামান্য যে তাহাতে পুস্তকের আকার খর্ব্ব হয় নাই। আজকাল মূল্য সুলভকরার উদ্দেশ্যে বটতলার রামায়ণের অনেক উৎকৃষ্ট অংশ বর্জ্জিত হইয়া থাকে। বটতলার কৃত্তিবাসী রামায়ণ ক্রমেই সংক্ষিপ্ত হইতেছে। বর্ত্তমান সংস্করণ পূর্ণ সংস্করণ; ইহা আকার ও শ্লোক সংখ্যার

বটতলার রামায়ণ হইতে শ্রেষ্ঠ। বটতলার জীর্ণশীর্ণ অশুদ্ধ রামায়ণের সঙ্গে এই সংস্করণের তুলনাই হয় না। ইহা নির্ভুল, বিচিত্র চিত্র-রাজি-শোভিত ও উৎকৃষ্ট কাগজে মুদ্রিত। বাঁধাইটিও বেশ জাঁকালো! চিত্রগুলির অধি-কাংশ সুপ্রসিদ্ধ জাপানী চিত্রকর ক্যাটসুটা অঙ্কিত রামায়ণের চিত্রাবলীর প্রতিলিপি। কোনটিতে রাম পথ-পরিশ্রান্তা নিদ্রিতা জানকীর মুখমণ্ডলের প্রতি স্নেহ করুণ নেত্রে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, নৈশ প্রকৃতির শোভা সম্বর্দ্ধন করিয়া ধনুর্দ্ধর লক্ষ্মণ কুটির পার্শ্বে প্রহরী। কোনটিতে আকাশ পথে পুষ্পকরথে রাম ফিরিয়া আসিতেছেন, ভরত প্রমুখ নন্দীগ্রামের অসংখ্য নরনারী রামকে অভিনন্দিত করিবার জন্য সমবেত হইয়াছেন; পুষ্পকের দিকে সকলের সতৃষ্ণ দৃষ্টি বদ্ধ। একটি চিত্রে যুক্ত করে সীতা প্রজ্জলিত হুতাশনের সম্মুখীন। অপর একটী চিত্রে তিনি অশোক তরুমূলে দুঃসহ দুঃখ-ভারাক্রান্তা মলিন-সম্বিতা। ক্যাটসুটা জাপানী চিত্রকর হইয়াও হিন্দুর কাব্য কিরূপ বুঝিয়াছেন, এই সকল চিত্রে তাহার নিদর্শন সুস্পষ্ট। জাপানী চিত্রকরাঙ্কিত ছবিগুলি ছাড়া আরও কয়েকখানি ছবি এই পুস্তক পরিশোভিত করিয়াছে। তন্মধ্যে কৃত্তিবাসের নিবাস-ভূমি ফুলিয়া গ্রামে কবির দোল-মঞ্চের চিহ্ন এবং বাড়ীর ভিটার চিত্র দেখিলে মন করুণারসে আর্দ্র ও অধীর হইয়া উঠে। যেখানে কবি জীবনের লীলা করিয়া গিয়াছেন আজ সেই স্থান পরিত্যক্ত বন সংকুল!

এই সকল ছাড়াও রামায়ণের এই সংস্করণ-টির দুইটি আকর্ষণ আছে, তাহার একটি রবীন্দ্র বাবুর কৃত ভূমিকা এবং অপরটি যোগীন্দ্র বাবুর লিখিত কৃত্তিবাস কথা। ১৪৩২ খৃষ্টাব্দে কৃত্তিবাস জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই সিদ্ধান্ত জ্যোতিষিক গণনা দ্বারা স্থির হইয়া গিয়াছে। যোগীন্দ্র বাবু কৃত্তিবাস-প্রসঙ্গে কবির আত্ম পরিচয়ের কবিতাগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন। উহাতে কৃত্তিবাসের আত্ম পরিবার সম্বন্ধে সমস্ত কথা বিবৃত হইয়াছে। কবি কৌলিন্য অপেক্ষা ব্রাহ্মণ্য মর্য্যাদারই বেশী গর্ব্ব করিয়া-ছেন। গৌড়ের রাজা তাঁহাকে অর্থ সাহায্য করিতে চাহিলে তাহা তিনি ব্রাহ্মণোচিত দৃঢ়তার সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন—
"কারেও কিছু নাহি লই করি পরিহার।
যথা যাই তথায় গৌরব মাত্র সার!"

প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের কোন্ অংশ তাঁহার রচনা এবং কোন অংশ পরবর্ত্তী প্রক্ষেপ, এবং যে রচনা কৃত্তিবাসের নাম চলিয়াছে অথবা শেষে মার্জ্জিত হইয়াছে এই সকল গূঢ় প্রত্নতত্ত্বীয় কথা যোগীন্দ্রবাবু উত্থাপন করেন নাই। সেই সকল বিচার করিয়া সংস্করণ প্রস্তুত করিতে হইলে যোগীন্দ্রবাবুকে বহুকাল অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইত এবং খাঁটি কৃত্তিবাসকে উদ্ধার করা হইলে একালের লোক তাঁহাকে চিনিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। সুতরাং যোগীন্দ্রবাবু সে সকল কূট-সন্ধানে না যাইয়া ভালই করিয়া-ছেন, তাহা করিতে হইলে তরণী সেনের পালা, বীরবাহুর পালা, অঙ্গদ রায়বার, রামচন্দ্রের দুর্গা পূজা এসকলই ছাটিয়া ফেলিতে হইত, রাক্ষসগণ যে রামকে যথায় তথায় স্তব স্তুতি করি-য়াছে সে অংশগুলিও বাদ দিতে হইত, এবং গ্রন্থের পয়ার ছন্দটিও চতুর্দ্দশ অক্ষরে সীমাবদ্ধ থাকিয়া এইরূপ মার্জ্জিত শব্দ পরম্পরায় শ্রুতি বিনোদন হইত না। এক কথায় তত্ত্বান্বেষীকে যেরূপ

দুর্গম অরণ্যের পথে প্রবেশ করিতে হয়, যোগীন্দ্রবাবুকেও সেইরূপ সহিষ্ণুভাবে প্রত্নতত্ত্বের অরণ্যে পর্য্যটন করিতে হইত। আজ দশবৎসর তদ্রূপ চেষ্টা করিয়া শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সেই নিবিড় অরণ্যের অন্ত দেখিতে পান নাই, তিনি পথ হারাইয়া ফেলিয়াছেন। তৎসম্পাদিত খাঁটি কৃত্তিবাস আর পরিষৎ হইতে নিক্রান্ত হইতে পারিল না। ইত্যবসরে যোগীন্দ্রবাবু এই সহজ-সাধ্য উপাদেয়, বহুচিত্ররাজিত, বিশদ ভূমিকালঙ্কৃত সংস্করণটি প্রকাশ করিয়া প্রত্যেক বাঙ্গালী গৃহস্থেরই ধন্যবাদার্হ হইলেন!

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

ধনবিজ্ঞান।—Political Economy—শ্রীগিরীন্দ্রকুমার সেন প্রণীত।

আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আহ্লাদিত হইলাম। বাঙ্গালা সাহিত্যে বড় একটা অভাব ছিল। গিরীন্দ্রবাবু সেই অভাব অনেকটা পূরণ করিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে ধনতত্ত্ব সম্বন্ধে দুই একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু গিরীন্দ্রবাবুর গ্রন্থখানি পূর্ব্ব-প্রকাশিত পুস্তক অপেক্ষা ভাল। গিরীন্দ্রবাবু অতি সহজ ভাষায় ইউরোপের চলিত ধন-বিজ্ঞানের সূত্রগুলি বর্ণনা করিয়াছেন এবং পুস্তকের মধ্যে মধ্যে ঐ সূত্রের কোন্‌টি কিরূপে এদেশে প্রয়োগ করা যাইতে পারে, তাহাও দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহাতে কতক পরিমাণে তাঁহার চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। আজিকালি আমাদিগের কালেজের অধ্যাপকদিগের মধ্যে অনেক স্থলে পাণ্ডিত্য ও চিন্তাশীলতার অভাব দেখা যায় এ কথাটা Pioneer সংবাদ পত্র কিছু দিন হইল প্রকাশ করিয়াছিল। পাইয়োনীয়ারে উল্লিখিত হইয়াছে যে native professors are generally ignorant. ভারত-বিদ্বেষী পাইয়োনীয়ার এ কথাটি লিখিয়াছে বলিয়া যে ইহা মিথ্যা তাহা নহে। ইহা গোপন না করিয়া ইহার প্রতিকার করার চেষ্টা করাই স্বদেশপ্রেমিকতা। একটি ঘটনা বলি, দুইটি ভদ্রলোক একটি ট্রেণে যাইতেছিলেন তাঁহারা দুই জনেই বাঙ্গালী। সুতরাং পরিচয় আলাপ হইল। তাহার মধ্যে একজন ধনতত্ত্বের অধ্যাপক। ধনতত্ত্ব বিষয় এদেশে আজিকাল কাহারও কাহারও জানিবার কৌতূহল হইতেছে। তাই অপর ব্যক্তি অধ্যাপককে জিজ্ঞাসা করিলেন মহাশয় আপনি Professor Marshall প্রণীত Principles of Economics পড়িয়াছেন কি?

উত্তর। না।

প্রশ্ন। Piersonএর লিখিত Principles of Economics পড়িয়াছেন কি?

উত্তর। না।

প্রশ্ন। Adam Smith লিখিত Wealth of Nations পড়িয়াছেন?

উত্তর। না।

প্রশ্ন। Mill?

উত্তর। না।

প্রশ্ন। নূতন Encyclopœdia Britannicaতে ধনতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সুন্দর প্রব-

হটি লিখিত হইয়াছে তাহা অবশ্য পড়িয়াছেন ?

উত্তর। না।

অধ্যাপক ভাবিলেন, এ যাত্রীটা ত বড় জ্বালাতন করিয়া তুলিল। এদিকে উক্ত যাত্রীটী মনে করিলেন, এমন অজ্ঞ ব্যক্তিকে কর্ত্তৃপক্ষ কেমন করিয়া ধনবিজ্ঞানের অধ্যাপক করিয়াছেন। আমাদিগের দেশে শিক্ষা বিভাগে তাঁহার মত আরও অনেক অজ্ঞ ব্যক্তি আছেন। সুখের বিষয় গিরীন্দ্রবাবু সে শ্রেণীর লোক নহেন।

গিরীন্দ্রবাবুর পুস্তকের গুণ—

(১) কঠিন বিষয় বেশ সহজ ভাষায় লিখিয়াছেন।

(২) চলিতগ্রন্থে যাহা পাওয়া যায় তাহার উপরে অন্য অন্য স্থানেও অনুসন্ধান করিয়াছেন।

(৩) কেবল সঙ্কলন করেন নাই নিজেও কিছু কিছু চিন্তা করিয়াছেন।

(৪) প্রাচীন হিন্দু সমাজ যে ধনবিজ্ঞানের গভীর তত্ত্বের উপর স্থাপিত ছিল, গিরীন্দ্র বাবু তাহা অন্তত কিছু কিছু অনুভব করিয়াছেন।

গিরীন্দ্রবাবুর পুস্তকের দোষ—

(১) তিনি বিলাতের প্রাচীন প্রচলিত মতগুলি প্রায়ই অভ্রান্ত ও অসংশয়িতভাবে গ্রহণ করিয়াছেন।

(২) ধনতত্ত্বের প্রাচীন ও নবীন মতের মধ্যে যে সংগ্রাম চলিতেছে, এবং ধনতত্ত্বের মধ্যে ঘোরবিপ্লব হইয়া, একটা নূতন ধনতন্ত্র স্থাপিত হইতে পারে, তাহার আভাস গিরীন্দ্র বাবুর পুস্তকে পাওয়া যায় না।

(৩) ধনতত্ত্ব বিকাশের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হওয়া উচিত ছিল।

(৪) "ধনবিজ্ঞান" বা "অর্থনীতি" সমাজ তত্ত্বের বা সমাজনীতির অন্তর্গত। এবং অতি সূক্ষ্মভাবে দেখিলে উচ্চ ও বিশুদ্ধ অর্থনীতি ধর্ম্মনীতির অন্তর্গত এই কথা যেমন অধিকাংশ বিলাতি ধনবিজ্ঞান ব্যবসায়ী ব্যক্তিগণ অদ্যাপি বুঝেন নাই—তেমনি গিরীন্দ্রবাবুও যেন তাহা বুঝেন নাই।

যাহা হউক আমরা ভরসা করি, শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু যেমন স্বাধীন অনুসন্ধান ও বিচার শক্তির দ্বারা জড়বিজ্ঞান জগতে নূতন আলোক আনিয়াছেন, শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রকুমার সেন ও তাঁহার চিন্তাশীলতা ও গবেষণা দ্বারা ধনতত্ত্বের গাঢ়তিমিরাচ্ছন্ন রাজ্যে উষার অরুণছটা আনয়ন করিবেন।

প্রচলিত রসতত্ত্বে অনেক কথা আমরা বিশুদ্ধ বলিয়া মনে করি না। পাশ্চাত্য সভ্যতাটা যেমন আজিও চাকচিক্যশালী বিশাল একটা বর্ব্বরতা মনে করি, তেমনি আমাদিগের মনে হয়, যে প্রচলিত তথা কথিত ধনবিজ্ঞান ঘনীভূত ভ্রম প্রমাদ পরম্পরা বা "বর্ব্বরতা বিজ্ঞান"। প্রাচীন ভারতবর্ষ ব্যতীত আর প্রায় সকল দেশেই সম্পত্তিশালী ব্যক্তিগণ আইন কানন করিয়াছেন, তাই, আইন কানুন অধিকাংশ স্থলে ধনীগণের অনুকূল গরিবদিগের প্রতিকূল। তেমনি বিলাতের "ধনবিজ্ঞান" ধনীরাই লিখিয়াছে অথবা ধনীদিগের কারপরদাজগণ লিখিয়াছে। তাহা একতরফা মোকদ্দমায় ফয়সালা।

এক তরফা মোকদ্দমায় প্রায়ই যেরূপ

সুবিচার হইয়া থাকে, ইউরোপীয় প্রচলিত প্রাচীন ধনবিজ্ঞানে সেই রকম সুবিচার হইয়াছে। ইদানীং গরিব শ্রমিগণ শিক্ষা পাইয়া মাথা তুলিতেছে, এবং কোন কোনও নিঃস্বার্থ ধনী মহাত্মাও, ভগবানের প্রেরণায় ধনতত্ত্বের আদালতে, গরীবদিগের পক্ষে উকীল হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহাদিগের তীক্ষ্ণযুক্তি ও অদম্য বাগ্মিতা "যেন আগ্নেয় গিরির নিঃসৃত আভার" ন্যায় উত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। তাঁহাদিগের মানবপ্রেমের পবিত্র প্রবাহে অর্থনীতি ভূমি সিক্ত হইবে এবং তাহাতে ধর্ম্মনীতির সুবর্ণ শস্য জন্মিবে।

গিরীন্দ্র বাবু প্রচলিত "ধনবিজ্ঞানের" পথিক। সুতরাং অনেক বিষয়ে গিরীন্দ্রবাবুর সহিত আমাদিগের মতভেদ হইবে। এবং আমাদিগের মতের দিক দিয়া, গিরীন্দ্র বাবুর পুস্তকখানি বিস্তৃতভাবে সমালোচনা করিতে হইলে, অন্ততঃ অত বড় (আর একখানি গ্রন্থ) লিখিত হয়। সুতরাং এ স্থলে তাহা সম্ভব নহে। তবে পরে আমরা সংক্ষিপ্তভাবে তাঁহার গ্রন্থের আর একটু সমালোচনা করিবার চেষ্টা করিব। তাঁহার পুস্তকে আমাদের মতে যাহা গ্রহণীয় আছে, তৎপ্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব এবং আমাদের বিবেচনায় প্রাচীন মতের মধ্যে যে গুলি আপাতত সমালোচনা করা উচিত, তাহার অবতারণা করিবার প্রয়াস পাইব।

আমরা ভরসা করি গিরীন্দ্রবাবুর ন্যায় সুশিক্ষিত লোক অধুনা ভারতবর্ষে যে সকল ধনতত্ত্বমূলক সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে তাহা মাসিক পত্রে স্বাধীন ও দক্ষ লেখনীতে আলোচনা করিয়া, ধনবিজ্ঞান চর্চ্চার অভিরুচি বঙ্গ সাহিত্যে সঞ্চার করিবেন।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

মনীষা।

[মিশ্রকাব্য।]

তীব্র অশান্তির রেখা মনীষার নয়নে অধরে
কিন্তু ফুটে থরে থরে। দাঁড়াইল ত্যজিয়া আসন
নিবিড় কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশজাল চুমিল চরণ,
মুক্ত বাতায়নে গিয়া দেখা দিলা বিদ্যুৎ-বরণী,
আলোকস্তম্ভের শিরে রক্তচক্ষু চাহিয়া যেমনি
তরঙ্গের বহু উর্দ্ধে দেখা দেয় সঙ্কেত-বর্ত্তিকা
সর্ব্বনাশ করিয়া প্রচার—হেরি দীপ্ত যা'র শিখা

উদ্‌ভ্রান্ত পতত্রীকুল ত্রস্ত আসি' আছাড়িয়া মরে।—
দু'বাহু প্রসারি দিল সাড়া—থামিল সে কণ্ঠস্বরে
অমনি সে সংক্ষুব্ধ কল্লোল।—
"আরে আরে ফেরুদল
কা'র ভয়ে তুলেছিস্ সচকিত এই কোলাহল ?
আমি না তোদের প্রভু ? প্রথম আমারি শিরোপরে
ভাঙিবে প্রবল ঝঞ্ঝা - ভয় নাই এ মোর অন্তরে,—
হেরি এই সমুদ্যত নর-বজ্র যত, তবে বল্
কেন তুলেছিস্ আজি ত্রাসপাংশু মুখে কোলাহল ?
তোদের কি ভয় ? শান্ত হও—প্রতিশোধ নিতে অরি
ঘেরিয়াছে আজিকে মোদের। যদি নাহি হয় - ধরি'
রমণীর-অধিকার-নূতন-কেতন শূন্যে খুলি'
বর্ম্ম পরি যুদ্ধক্ষেত্রে সচকিত বীরত্ব আকুলি'
পড়িব প্রথম বলি রমণীর লাগি'। নিন্দিবনা
তোমাদের এ ভীরুতা লাগি'। লুপ্ত সকল চেতনা
দু'সহস্র বৎসরের ভীরুতার চাপে। তাহা হ'তে
উদ্ধারিয়া তোমাদের আনিব নূতন মুক্তিপথে।
কিন্তু যা'রা তুলিয়াছে এই বিভীষিকা—তুমি আর
তুমি,—বেশ আমি চিনিতেছি মুখ এই জনতার
মাঝে—তোমাদের নাহিক নিস্তার। কালি প্রাতে হ'বে
মহাসভা—তা'র মাঝে শিখাইব সাধিয়াছ সবে
কার সনে বাদ। চিনিয়াছে আপন কর্ত্তব্য হ'তে
প্রভুত্বেরে বড় বলি' ? বিশ্বনেত্র-অন্তরাল পথে
তাঁদের জননী সম অজ্ঞান-আঁধারে চিরদিন
থাকিবে তাহারা—আজীবন কীর্ত্তিগন্ধ-লেশহীন
গৃহকূপ-মণ্ডুকের মত পরম্পর খ্যাতি নাশি'
হলাহলে চিত্তভরা পাচিকার পটুত্ব প্রকাশি'
কালের বিদ্রূপভাণ্ড গৃহকাজ-সাধন তৎপরা
নিদ্রা-আর-দাসীত্বে-নিপুণ,—বাহিরে বিশাল ধরা
বিন্দু না জানিয়া তা'র গৃহ কোণে জড় বসি' রয়।"

এত কহি' সঞ্চালিলা পাণি,—তাহে জন-সঙ্ঘময়
উঠে পুনঃ তীব্র কোলাহল। অমনি ভাঙিল সভা

তুষারের স্তূপ যথা দ্রবীভূত লভি সূর্য্যপ্রভা
ধীরে ধীরে। তখন মনীষা অট্ট হাসিল নিষ্ঠুর,—
শোভিল সে হাসি যেন রুক্ষ গিরি শৃঙ্গ'পরে ক্রূর
সূর্য্য করাঘাত সম— বজ্রোদগারী বৃষ্টিধারে যবে
শ্যামাইয়া তুলে সর্ব্ব অদ্রিভূমি। নিরখিয়া তবে
আমাদের পরে, কহিলেন—"করিয়াছ আচরণ
রাজপুত্রযোগ্য আর শিষ্টাচার সম্মত কেমন!
ধন্য মানি তোমাদের! দেখাইছ মরি কি শোভন
নারীবেশে! রক্ষা করিয়াছ তুমি আমার জীবন!
কি তিক্ত কৃতজ্ঞতায় ভরিয়াছ মোরে! ইহা হ'তে
শ্বাসরুদ্ধ জলমৃত্যু বহুশ্রেয় ছিল মোর মতে।
পুরুষেরা বলিবে—হা ধিক্! এবে প্রতিহিংসানল
জ্বালায়ে দহিতে তোমা'কে মোরে বারণ করে বল?
হায় যদি পিতা মোর—আমাদের মধুচক্রে—ধিক্
পামর তোমরা এলে কোথাকার বোল্‌তা পথিক
বিনষ্ট করিতে তারে। উঠিত উজলি যে মহিমা
ভল্লুবৃত্ত বর্ব্বর তোমরাই তাহে আঁধার কালিমা
মিশাইলি চিরতরে হায়! লভিতাম যদি হাতে
একদণ্ড রাজদণ্ড তাঁর! সীমা অতিক্রমি' রাতে
দস্যুসম পশিয়া আমার বিদ্যালয়ে ভৃত্যদের
কৈলে যে লাঞ্ছনা—উদ্ভাবিয়া শত মিথ্যা ফের
ব্যর্থতায় জড়াইতে চেয়েছে যে মোরে—মোর পাণি
অর্পিব তোমারে! বাক্‌দত্তা আছি হ'ব তব রাণী—
তব ক্রীতদাসী চিরতরে! অন্তহীন রত্নাকরে
যত রত্ন আছে সব-দিয়ে-গড়া যদি শোভা ধরে
ও শিরে মুকুট—তবু না হইব তব দাসী। যদি
নিখিল বিশ্বের লোক রাজকর দেয় নিরবধি
তোমার চরণে—তবু নহে। যুবরাজ! তুমি আর
মিথ্যা তব জঘন্য ঘৃণিত—তাই প্রস্তাবে তোমার
আর তোমা'পরে আমি পদাঘাত করিতেছি আজি
দূর হও—দেখাওনা কলঙ্কিত হেয় মুখরাজি।
কে আছিস্—দূর কর্ এ তিন পামরে।"

রোষভরে-
সভ্রুকুটি-দীপ্ত নেত্র-রশ্মিবিদ্ধ স্তব্ধ-সভা'পরে
হুঙ্কারিল রাণী। সেই দীর্ঘ অষ্ট কৃষক তনয়া
আমাদের তাড়াইতে এল। কহিলাম "কর দয়া"
ব্যর্থ দুইবার। নিয়তির পদচাপ দুর্নিবার
যেমতি বিষম— তথা স্কন্ধে মোর—কর্কশ দুর্ব্বার
হস্ত পড়িল চাপিয়া। এমনিই প্রকাশিয়া বল
হটাইয়া ক্রমশ পশ্চাতে—সিঁড়ি বাহি সুচপল
বেগে—অট্টহাস্য সহ খেদাইয়া দিল সিংহদ্বারে।

উত্তরিনু বহুদূর মৃত্তিকার স্তূপে পথ-পারে
সেথা হ'তে হেরিলাম দীপ্ত দীপমালা দূরে জ্বলে
শুনিনু রমণী কণ্ঠ সচকিত তীব্র কলকলে।
ফিরিতেছি—ছায়াময় সহসা হইল যেন মনে
রাজ কন্যা আর তা'র বল দৃপ্ত প্রহরিণীগণে
সাধু চেষ্টা যেন মিশি বিদ্রুপের সনে করে কাজ।
সে জলপ্রপাত—গণ্ডগোল আর সমবেত রাজ—
দ্বয়—সবি যেন ছায়ায় রচিত। কুহেলিয়া ময়
সেই কৃষ্ণ রাত্রি যেন সত্য হয়ে তবু সত্য নয়।

খেয়াল কাটিয়া গেল এসেছিল যেমন করিয়া,
বিষাদের লঘু মেঘে চিত্ত মোর উঠিল ভরিয়া—
উৎসারিনু সবলে তাহারে অল্পক্ষণে। মম মন
এত যে নিরাশা আর ছায়া ভূতে কাণ্ড যে এমন—
কিছুতেই হয় নাই বিন্দু বিচলিত,-- দৃঢ় চিত্ত যথা
বিপদের মেঘ ভেদি আশা রবি নেহারে সর্ব্বথা।
অতঃপর ত্যজিলাম সকলে মেলিয়া সেই স্থান।

গান।

ঘোর রোলে ভেরী বাজে
ঠন ঠন ঝন্ বাজে ঘোর রণ
তোমার মধুর কণ্ঠস্বন
শুনা যায় তারি মাঝে।

ঐ বাজে রণ ঝনন্ ঝনন্
ওই প্রিয় তব দাঁড়ায়ে কেমন
নূতন মহিমা সাজে,
তব প্রেম মুখ তা'র বীর বুক
ভরি দিল বল উৎসাহ সুখ
জনম ভূমির কাজে।
ক্রুর রবে শিঙা বাজে।
বারেক ফিরিয়া তোমারে ঘেরিয়া
শিশুগণ তার র'য়েছে হেরিয়া
ঝাঁপ দিল রণ মাঝে
অতুল সাহসে মাতি বীর রসে
অগ্নির মত ভীষণ দরশে
পশিল বিজয় কাজে।
নিমেষে অরিরে করিয়া নিধন
তব মঙ্গল করিয়া সাধন
ওই প্রিয় তব রাজে।

উদ্দাম উচ্ছ্বাসে শান্তা এমনিই গাহিল এ গান
মোরা ভাবিলাম তা'রে কিসে যেন বসেছে পাইয়া।
স্পষ্টতঃ বুঝিনু এই আখ্যায়িকা তা'র নারী-হিয়া
করিয়াছে বিদ্রূপে জর্জ্জর। কহিল সে মহোল্লাসে
করতালি দিয়া তাই দীপ্ত মুখে উৎসাহিত ভাষে—
"যুদ্ধই হউক তবে ; বিনাযুদ্ধে না দিক্ রমণী
পুরুষে সূচ্যগ্র অধিকার। কিম্বা তুলি শৃঙ্গধ্বনি
আসুক নিষ্ঠুর মৃত্যু নারী নাম নিশ্চিহ্ন মুছিতে
ধরণীর ইতিহাস হতে।" ঠাকুর্দ্দা প্রসন্ন চিতে
গল্প-সূত্র গ্রহণাগ্রে বলিলেন "শুনহ নাতিনি
শিবাজি বীরেন্দ্রে তুমি সাজায়েছ ইন্দ্রধনু জিনি'
উজ্জ্বল রেশমী বস্ত্রে সূচি-শ্রম সংযোজি' নিপুণ।
যদি সেনাপতি হ'য়ে আজিকার এ যুদ্ধ আগুণ
আমি জ্বালাইতে পারি—কি দিবে আমারে পুরস্কার ?"
অমনি উৎসাহ ভরে কঙ্কণ খুলিয়া আপনার
গড়ায়ে ছুঁড়িল শান্তা, কহিল "যুদ্ধই আমি চাই।
মহীয়সী করহ নারীরে মোর কামনা তাহাই"

তখন ঠাকুর্দ্দা এক জরীর পাগড়ী পরি' শিরে
জানু পাতি' ছুলিয়া ছুলিয়া গল্প আরম্ভে গম্ভীরে।

ক্রমশ।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

ভাগ্যহীন।

ললাটে ছিলনা মঙ্গল সিঁদুর
কাঁকণ বাহুটি ঘিরে,
কণ্ঠ মালিকা বিরহ বিধুর
খুলে পড়েছিল ছিঁড়ে!

আছিল জীবনে তব স্মৃতি খানি
বেদনা পরাণ ভরি'
তাই এত দিন ছিনু মহারাণী
রতন আসন 'পরি!

শুখায়ে আসিছে নয়নের জল,
স্মৃতি হয়ে আসে ক্ষীণ,
আজিকে শরণ মলিন ভূতল
এতদিনে ভাগ্যহীন।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলন।

প্রথম অধিবেশন।

(রঙ্গপুর,—আষাঢ়, ১৩১৫।)

এক সময় নানা কারণে উত্তরবঙ্গ সাহিত্যলোচনার অনুকূল ক্ষেত্র বলিয়া সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। যাঁহার সুললিত পদবিন্যাসকৌশলে রামায়ণের রমণীয় কাহিনী বঙ্গবাসী নরনারীর পক্ষে অনায়াসলভ্য হইয়া রহিয়াছে, সেই মহাকবি বিদ্যাশিক্ষার্থ উত্তরবঙ্গে আসিয়া, উত্তরবঙ্গে বসিয়াই, রাজাদেশে গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ভক্তকবি নরোত্তম দাসের অপূর্ব্ব আত্মত্যাগে উৎসাহ লাভ করিয়া, বৈষ্ণবরচনা বঙ্গসাহিত্যে এক অনির্ব্বচনীয় শক্তিসঞ্চার করিয়া দিয়া, উত্তরবঙ্গকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছিল। অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে, বঙ্গসাহিত্য যে ভাবস্রোতে সরস ও শক্তিশালী হইয়া উঠিবার উত্তেজনা লাভ করিয়াছে, সেই স্বদেশপ্রীতি আরাধনা করিয়া আনিবার জন্য, ভগীরথের ন্যায় অবিচলিত অধ্যবসায়ে রামমোহন এই উত্তরবঙ্গে—এই রঙ্গপুর নগরেই—সুদীর্ঘ সাধনায় ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। বঙ্গসাহিত্যকে বিশেষভাবে অবলম্বন করিয়া যে অভিনব শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইতেছে, তাহাও এই উত্তরবঙ্গে—এই রঙ্গপুর নগরেই,—প্রথমে আত্মপ্রকাশ করিয়া, ক্রমে সকল স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে।

আমাদের দেশের মত,—আমাদের দেশের অসংখ্য নরনারীর মত,—বিবিধ সুখ দুঃখের ভিতর দিয়াই বঙ্গসাহিত্য ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া উঠিতেছিল। আমাদের দেশের মত,—আমাদের দেশের অসংখ্য নরনারীর মত,—বঙ্গসাহিত্যের সম্মুখেও অকস্মাৎ এক অভিনব যুগসন্ধিকাল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের দেশের মত,—আমাদের দেশের অসংখ্য নরনারীর মত,—আমাদের সাহিত্য এখন যে পথে দাঁড়াইয়া যেরূপ গতিলাভের চেষ্টা করিবে, তাহাই দীর্ঘকাল তাহার আত্মবিকাশের অনুকূল বা প্রতিকূল সহচর হইয়া থাকিবে।

এরূপ ক্ষেত্রে—এরূপ সময়ে—উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের পক্ষে যেরূপ সুযোগ্য কর্ণধারের প্রয়োজন, তাঁহার অনিবার্য্য অনুপস্থিতি নিবন্ধন, আমাকে আহ্বান করিয়া আনিবার জন্য কাহাকেও সাধুবাদ করিতে পারিব না। কেহ ইহাতে শিষ্টাচারের অভাব লক্ষ্য করিলে, দয়া করিয়া তাহাকে মার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়াই গণ্য করিবেন।

অন্যান্য সম্মিলনের ন্যায় সাহিত্যসম্মিলনও রাজপুরুষদিগের মনে নানা সংশয়ের অবতারণা করিয়া, তাঁহাদিগকে অতিমাত্রায় সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে। এই বিদ্বৎ-সম্মিলনে চৌরোদ্ধরণিকগণ নিঃশব্দপদসঞ্চারে প্রবেশলাভ করিয়া,

পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে আসন গ্রহণ করিবামাত্র, তাহা সকলের নিকটেই সুব্যক্ত করিয়া তুলিয়াছেন! এরূপ সংশয়ের কারণ-পরম্পরার অভাব নাই। সত্য সত্যই বিদেশাগত সম্মিলন-কাতর রাজপুরুষদিগের নিকট ভারতবর্ষ এখনও এক রহস্যময় যবনিকার অন্তরালে অপরিজ্ঞেয় অন্ধকারে আবৃত হইয়া রহিয়াছে! এখনও তাঁহারা সে যবনিকা অপসারিত করিবার যথাযোগ্য আয়োজন না করিয়া, বাহিরে বসিয়া অনুমানবলে রহস্যনির্ণয়ের চেষ্টা করিতে গিয়াই, উত্তরোত্তর বিবিধ বিভীষিকায় বিচলিত হইয়া উঠিতেছেন।

সাহিত্য-সম্মিলনের প্রয়োজন এবং উদ্দেশ্য কি? এই প্রশ্ন উপস্থিত হইবামাত্র, কেহ কেহ মনে করিতেছেন,—ইহার আবার প্রয়োজন কি? একবার এরূপ চিন্তা উদিত হইবামাত্র, পরক্ষণেই মনে হইতে পারে,—যখন প্রয়োজন নাই, তখন অবশ্যই ইহার অভ্যন্তরেও কোন না কোন নিগূঢ় উদ্দেশ্য সযত্নে আত্মগোপন করিবার চেষ্টা করিতেছে। সেই উদ্দেশ্য টানিয়া বাহির করিবার উদ্দেশ্যেই, চৌরোদ্ধরণিকগণকে অনভ্যস্ত আয়াসস্বীকারে প্রতিনিয়ত গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হইতেছে! এরূপ অবস্থায় প্রথমেই প্রয়োজন এবং উদ্দেশ্যের কথার প্রকাশ্যভাবে আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

সাহিত্য-সম্মিলনের প্রয়োজন এবং উদ্দেশ্যের মধ্যে কিছুমাত্র পার্থক্য নাই;—যাহা প্রয়োজন, তাহাই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য গুপ্ত নহে;—তাহা সকলের নিকটেই সুব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে।

সংস্কৃত-সাহিত্যের মহারণ্যে আত্মহারা হইয়া, বঙ্গ-সাহিত্য ভাল করিয়া আত্মবিকাশ করিতে পারে নাই;—পারসিক-সাহিত্যের পার্শ্বচর হইয়াও, রাজসভায় প্রবেশলাভ করিতে না পারিয়া, বঙ্গসাহিত্য কেবল বাঙালীর নিভৃত নিকেতনেই কাল কাটাইয়া আসিয়াছে;—ইংরাজি-সাহিত্যের নিকট আত্মোন্নতির জন্য উত্তেজনা লাভের সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াও, বঙ্গসাহিত্য নানা কারণে কেবল কাব্যামোদেই অধিকাংশ শক্তিক্ষয় করিতে বাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। ইহাই কি বঙ্গসাহিত্যের পক্ষে আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার যথেষ্ট কথা?

দেশের সাহিত্য জ্ঞান বিস্তারের যেরূপ সহজ ও সরল পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতে পারে, অন্য সাহিত্যের পক্ষে সেরূপ শক্তিলাভ করিবার সম্ভাবনা নাই; সুতরাং বঙ্গসাহিত্যের সম্মুখে এই এক চিরপুরাতন কর্ত্তব্যপথ চিরদিন উন্মুক্ত হইয়া রহিয়াছে। ক্রীড়াকৌতুকের দিন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে,—যৌবনসুলভ চিত্তচাঞ্চল্য এবং বিনোদন-ব্যাপারও আর বঙ্গসাহিত্যকে তৃপ্তিদান করিতে পারে না। এখন বঙ্গসাহিত্য বিধাতৃ-বিহিত লোকশিক্ষার পুণ্য ব্রত গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করিলে, তাহার উচ্ছৃঙ্খল আস্ফালন তাহাকে অল্পদিনের মধ্যেই উপহাসাস্পদ করিয়া তুলিবে! তাহার সম্মুখে যে কার্য্যক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা বহুবিস্তৃত,—দুরতিক্রমণীয়,—নতোন্নত বন্ধুর পথে আগুল্ফ সংকটাকীর্ণ এবং সুদুর্গম! তাহার পার্শ্বদেশে দাঁড়াইয়া, আত্মজিজ্ঞাসা করা বঙ্গসাহিত্যের পক্ষে স্বাভাবিক কথা। সেই আত্মজিজ্ঞাসাই বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনের একমাত্র প্রয়োজন,—তাহাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। সে প্রয়োজন এবং সে উদ্দেশ্য প্রতি বর্ষেই উত্তরোত্তর অধিক পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে;—

বিভিন্ন সভ্যসমাজের সাহিত্য-সম্মিলনের দৃষ্টান্ত তাহাকে পথপ্রদর্শন করিয়া, আত্মোন্নতি লাভের জন্য নিয়ত আহ্বান করিয়া আসিতেছে।

আর অনবরত রচনাজঞ্জালের সৃষ্টি করিয়া শক্তিক্ষয় করিব না;—আর জাতীয় জীবন গঠনে সাহিত্যের অমোঘ শক্তি অস্বীকার করিয়া, তাহাকে ক্রীড়াকৌতুকে নিযুক্ত করিয়া রাখিব না;—আর উষার আলোকে বাতায়নপথ অবরুদ্ধ করিয়া দীর্ঘ নিদ্রাকে সুদীর্ঘ করিয়া তুলিব না। কিছুদিন হইতে বঙ্গসাহিত্যের ভিতর দিয়া এই এক শুভ সংকল্প শঙ্খনিনাদে আত্মঘোষণা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কবে কাহার হস্তের মঙ্গল শঙ্খ এই শুভ সংকল্প ঘোষণায় প্রথমে বাজিয়া উঠিয়াছিল, তাহার তথ্য নির্ণয় করিবার জন্য সময়ক্ষয় করিবার প্রয়োজন নাই।

বঙ্গসাহিত্য এইরূপে জাগিয়া উঠিয়াও, তাহার এতকালের রচনাচেষ্টার নিষ্ফলতা লক্ষ্য করিয়া, আবার অবসন্ন হইয়া পড়িতে পারে;—সুলিখিত গ্রন্থের অভাব তাহার অক্ষমতার পরিচয়ে জনসমাজকে তাহার প্রতি আস্থাশূন্য করিয়া তুলিতে পারে;—যে সকল কারণে সাহিত্যের ক্রমোন্নতির বাধা প্রাপ্ত হয়, সেই সকল স্বাভাবিক কারণেই, বঙ্গসাহিত্য আবার নিষ্ফল হইয়া পড়িতে পারে। রচনা এখনও প্রয়োজনানুরূপসংযম প্রণালী অবলম্বন করিতে সমর্থ হয় নাই। স্বল্পাক্ষরনিবদ্ধ অসন্দিগ্ধ বাক্যে বক্তব্য প্রকাশ করাই যে সাহিত্যকে শক্তিশালী করিয়া তুলিবার অমোঘ উপায়, তাহা এখনও সকলের নিকট ভাল করিয়া প্রতিভাত হয় নাই। ইহাতে রচনা যে কেবল প্রগল্‌ভ হইয়া উঠিতেছে তাহা নহে;—ইহাতেই রচনা তত্ত্বালোচনার অনুপযোগী হইয়া রহিয়াছে। কথার জন্য কথা—উদ্দেশ্যহীন উচ্ছৃঙ্খলতায়—লেখকের মনের ভাব পাঠকের নিকট দুর্বোধ করিয়া তুলিতেছে। তাহার সংস্কারসাধনে অগ্রসর না হইলে, লোকশিক্ষার দায়িত্বগ্রহণ করিতে সাহস হয় না। কে শিখাইবে—কি শিখাইবে,—প্রচলিত পুস্তক ধরিয়া তাহার বিচার করিতে বসিলে মনে হয়,—ইহা শিখাইয়া কি হইবে? আমরা অনেক করিয়াছি বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার স্বাভাবিক প্রলোভন অতিক্রম করিতে পারিলে, সত্যানুরোধে স্বীকার করিতে হইবে,—আমরা অনেক করিতে পারিতাম, বিশেষ কিছুই করিয়া উঠিতে পারি নাই!

এক সময়ে সমগ্র সংস্কৃতসাহিত্য বৈদিক এবং লৌকিক নামক ভাগদ্বয়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল;—যাহা লৌকিক তাহাই "ভাষা সাহিত্য" নামে পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। তখন বৈদিকশিক্ষা শ্রেণীবিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিয়া, লৌকিকসাহিত্যকে লোকশিক্ষার অধিকার দান করিয়াছিল। লৌকিকসাহিত্য পুরাতন বৈদিকসাহিত্য হইতে সার সংগ্রহ করিয়া, এবং বিবিধ অভিনব তত্ত্ব অধিকার করিয়া লইয়া, তাহাকে নানাভাবে লোকসমাজে প্রচারিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কালক্রমে এই সাহিত্য আবার জনসমাজকে ছাড়িয়া কেবল বিদ্বন্মণ্ডলীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হইবামাত্র, ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই "অভিনব ভাষাসাহিত্য" জন্মগ্রহণ করে। তাহার প্রধান এবং প্রবল প্রয়োজন,—তাহার উদ্ভব এবং বিনিয়োগের উদ্দেশ্য,—

লোকশিক্ষা। অন্যান্য ভাষা-সাহিত্যের ন্যায় বঙ্গসাহিত্যও সেই বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট প্রচারব্রত গ্রহণ করিয়াই জন্মলাভ করিয়াছিল। কিন্তু সে প্রচারব্রত প্রতিপালিত হইতেছে কিনা, তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। আমাদের সাহিত্য, আমাদের সাহিত্যসভা, আমাদের সাহিত্যসম্মিলন, জনসাধারণকে দূরে রাখিয়া, কেবল বিদ্বন্মণ্ডলীকেই আপ্যায়ন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে!

দেশের প্রাচীন সাহিত্যকে রক্ষা করা,—বিলুপ্তপ্রায় পুরাতন গ্রন্থের উদ্ধারসাধন করা—প্রধান লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছে। এক আধ-স্থান ব্যতীত,—সকলস্থানেই তাহার কথা প্রধান কথা,—কোন কোন স্থানে তাহার কথাই একমাত্র কথা। ইহা যে সর্ব্বতোভাবে আমাদের কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হওয়া কর্ত্তব্য, তাহাতে সংশয় নাই। কিন্তু কেন? পুরাকালে বঙ্গসাহিত্য কিরূপে লোকশিক্ষা সুসম্পন্ন করিত, তাহারই প্রমাণ সংগ্রহ ভিন্ন,—বঙ্গদেশের এবং বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসের উপাদান সংকলন করা ভিন্ন, ভাষার ক্রম-বিকাশের পরিচয় রক্ষা করা ভিন্ন,—বর্ত্তমানে তাহার দ্বারা অন্যবিধ লোকশিক্ষার ব্যবস্থা করিবার উপায় নাই। সে পুরাতন ভাব আর জনসমাজকে তেমন মাতাইয়া তুলিবে না,—সে পুরাতন ভাষা আর তেমন করিয়া জনসমাজের মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ লাভ করিবে না,—তাহা ক্রমে ক্রমে কেবল বিদ্বন্মণ্ডলীর তর্কবিতর্কের ব্যাপারেই পর্য্যবসিত হইয়া পড়িবে। তাহারই রক্ষাকার্য্যে অবসর শূন্য হইয়া, আমরা লোকশিক্ষার কথা,—ভাব প্রচারের কথা,—বঙ্গসাহিত্যের জন্মলাভের বিশেষ উদ্দেশ্যের কথা বিস্মৃত হইতে আরম্ভ করিয়াছি! আমাদের সম্মুখে যে বর্ত্তমান ও অনাগত ভবিষ্যৎ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তাহার জন্য বঙ্গসাহিত্যকে কতদূর উপযোগী করিয়া তুলিতেছি, তাহার কথা চিন্তা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। অভিনব যুগের সভ্যসমাজ এক অভিনব কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশলাভ করিয়া, অভিনব শিক্ষায় জনসমাজকে তাহার উপযোগী করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। বঙ্গসাহিত্য বাঙালীকে তাহার উপযোগী করিয়া তুলিবার জন্য এখনও যথাযোগ্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করে নাই। আমাদের সাহিত্যকে সর্ব্বতোভাবে আমাদের করিয়া তুলিতে না পারিলে, তাহা লোকশিক্ষার সহায় হইতে পারিবে না। তাহা বাহিরে জন্মগ্রহণ করিয়া, বাহিরে বাহিরেই পড়িয়া থাকিবে;—বিপুল জনসমাজকে প্রাণের স্পন্দনে স্পন্দিত করিয়া তুলিতে পারিবে না। আমাদের দেশে যে সকল অগণ্য বিচিত্র বিরোধ আমাদের উন্নতিলাভের অন্তরায় হইয়া রহিয়াছে, আমাদের সাহিত্য ভিন্ন তাহার মধ্যে আর কিছুতেই সামঞ্জস্য সংস্থাপিত হইবে না।

জ্ঞান পুরাকালে "বেদ"নামে অভিহিত ও পূজিত হইত। যবনাচার্য্যদিগের নিকট হইতেও জ্ঞান আহরণ করিবার বাধা ছিল না। বস্তুতস্ত, জ্ঞান কোনও দেশবিশেষ বা জাতিবিশেষের বিশেষ সম্পৎ বলিয়া স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিতে পারে না;—তাহা মানবজাতির সাধারণ সম্পৎ। অন্যান্য সভ্য দেশের সাহিত্য সেই সাধারণ সম্পৎ অধিকার করিবার আশায়, সকল দেশের, সকল যুগের, সাহিত্য হইতেই জ্ঞানাহরণ করিয়া আসিতেছে। একমাত্র

সংস্কৃত সাহিত্য অবলম্বন করিয়া অন্যান্য দেশের সাহিত্য যত গ্রন্থ রচনা করিতেছে, তাহার তুলনায় বঙ্গসাহিত্য কত অকিঞ্চিৎকর! সংকলনকার্য্য সকল সাহিত্যের পক্ষেই পুষ্টি-লাভের সুপরিচিত পথ। সে পথে বঙ্গসাহিত্য এখনও অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। স্বদেশকে জানিবার জন্য সকল সাহিত্যেই এক স্বাভাবিক ব্যাকুলতা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাও বঙ্গসাহিত্যে ভাল করিয়া পরিস্ফুট হইয়া উঠে নাই।

এই সকল অভাব এবং অভিযোগের মূলে একটিমাত্র প্রবল কারণ বর্ত্তমান। বঙ্গসাহিত্য লোকশিক্ষাব্রত গ্রহণ না করিয়া, চিত্তবিনোদনের জন্যই অধিক আয়াস স্বীকার করিয়াছে। তাহারও কারণপরম্পরার অভাব নাই। দেশের লোকে লোকশিক্ষাব্যাপারেও পরাধীনতা স্বীকার করিয়া লইয়া, তাহার ভার রাজপুরুষগণের উপর বিন্যস্ত করিয়াই, নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছিল। তাহাতে যে শ্রেণীর লোক-শিক্ষা প্রচলিত হইয়াছে, তাহার সহিত বঙ্গ-সাহিত্যের সংস্রব বড় অধিক নাই। সে শিক্ষা বাঙালীকে সকলবিষয়েই পরমুখাপেক্ষী করিয়া তুলিয়াছে;—সে শিক্ষা বাঙালীকে অন্তঃসারশূন্য করিয়া তুলিয়া, তাহাকে অধম-জাতি বলিয়া ধিক্কার করিতেও আরম্ভ করিয়াছে;—সে শিক্ষা বাঙালীর আত্মচেষ্টার পথে সযত্নে কণ্টক রোপণ করিয়া রাখিয়াছে। তাহার প্রভাবে বাঙালী তাহার স্বদেশ সম্বন্ধেও এত মিথ্যা কথা কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছে যে, তাহা বিস্মৃত হইতেও কালক্ষয় করিতে হইবে! এই সকল প্রতিকূল অবস্থায় পতিত হইয়াই, বঙ্গসাহিত্য এ পর্য্যন্ত সমুচিত বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই। আরও একটি কথা আছে,—তাহা আধুনিক জীববিজ্ঞানের সর্ব্ববাদিসম্মত কথা। জনসমাজের অধিকাংশ লোকের শিক্ষার অনুপাতে প্রতিভা বিকশিত হইয়া থাকে। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত বলিয়াই, আমাদের সাহিত্য এ পর্য্যন্ত প্রতিভাবিকাশের সমুচিত সহায়তা সাধন করিতে পারে নাই। লোকে যাহা চাহিতে সাহস করে নাই, অথবা যাহার প্রয়োজন লোকসমাজে আদৌ অনুভূত হয় নাই, তাহা অনাদরে অলিখিত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে!

এখন সময় ফিরিয়াছে। এখন এক অভিনব যুগ-সন্ধিকাল উপস্থিত হইয়াছে। এখন রাজা প্রজা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন,—যাহা ছিল, তাহা নাই;—কঙ্কালের মধ্যেও প্রাণবায়ু স্পন্দিত হইয়া উঠিতেছে;—বাঙালী নবজীবন লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। ইহাতে বিচলিত হইলে চলিবে না;—ইহাকে অসঙ্গত বা উচ্ছৃঙ্খল অনধিকারচর্চ্চা বলিয়া ভর্ৎসনা করিলে চলিবে না;—ইহার সংস্পর্শ ছাড়িয়া, দূরে বসিয়া, বিজ্ঞতাবিজ্ঞাপক ঔদাস্য প্রকাশ করিলেও চলিবে না। ইহাকে স্বীকার করিয়া লইয়াই সুশিক্ষার ব্যবস্থায়, বাঙালীকে সৎপথে আকর্ষণ করিতে হইবে।

বাঙালীকে সুশিক্ষিত করাই যে তাহাকে সৎপথে আকর্ষণ করিবার একমাত্র উপায়, সহৃদয় রাজপুরুষগণও তাহা স্বীকার করিতেছেন। জাতীয় শিক্ষাই যে প্রকৃত সুশিক্ষা বিস্তারের একমাত্র উপায়, সকল দেশের ইতিহাসই তাহার সাক্ষ্যদান করিতেছে।

জাতীয় সাহিত্যই যে জাতীয়শিক্ষার প্রধান সহায়, তাহা লইয়াও তর্ক করিবার সময় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং জাতীয় সাহিত্যের উন্নতিকল্পে কি কি আয়োজন করা কর্ত্তব্য, তাহার কথাই প্রধান কথা। সেই কথা বিশেষভাবে নিবেদন করিবার অবসর লাভ করিব বলিয়াই, আপনাদের নিমন্ত্রণ রক্ষার প্রলোভন অতিক্রম করিতে পারি নাই।

"সহিত"-শব্দ হইতে "সাহিত্য"-শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে ;—তাহার মূলার্থ "মেলন" ;—তাহা হইতেই ক্রমে প্রচলিত অর্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাকে সংকীর্ণভাবে গ্রহণ করিয়া, কেহ কেহ কাব্যশাস্ত্রকেই "সাহিত্য" নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। সাহিত্যকে এরূপ সংকীর্ণ অর্থে সীমাবদ্ধ না করিয়া, ইহাকে "মানব-সমাজের সর্ব্বপ্রকার আত্মোন্নতিলাভের শক্তি সঞ্চারক জ্ঞান-ভাণ্ডার" বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। সেই অর্থেই "সাহিত্য"-শব্দ বর্ত্তমান যুগে সর্ব্বত্র মর্য্যাদালাভ করিয়াছে। এইরূপে সাহিত্য কাব্য,ইতিহাস, এবং বিজ্ঞান, নামক তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। ইহকাল পরকালের বিষয়—মানব এবং ব্রহ্মের বিষয়ও এইরূপে—সাহিত্যের অন্তর্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে ; এবং তাহার প্রভাবেই মানবসমাজ তাহার বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারে।

সভ্য সমাজের সাহিত্য এইরূপে মানবসমাজকে উত্তরোত্তর অভ্যুদয়লাভে সমুন্নত করিবার চেষ্টায় বিবিধ জ্ঞান সংকলনে ব্যাপৃত হইয়াছে। পুরাকাল হইতে এ পর্য্যন্ত মানবসমাজ যে দেশে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছে, তাহার সার সংকলন, এবং অনধিগত অভিনব জ্ঞানের আবিষ্কার ও প্রচার সাহিত্যের প্রধান লক্ষ্য। এই জ্ঞান দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণীর জ্ঞান "বিশ্বজনীন" ও অপর শ্রেণীর জ্ঞান "ব্যক্তিগত" বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। কতকগুলি বিষয়ের জ্ঞানলাভ করা সকলের পক্ষেই সমান প্রয়োজন ; কতকগুলি বিষয়ের জ্ঞান লাভ করা ব্যক্তিবিশেষ বা দেশ বিশেষের পক্ষেই একান্ত প্রয়োজন। আমরা বাঙ্গালী—আমাদের পক্ষেও এই সাধারণ এবং বিশেষ জ্ঞানলাভ করা প্রয়োজন। আমাদের সাহিত্য ভিন্ন অন্য কোনও সাহিত্য আমাদিগকে বিশেষ জ্ঞান দান করিতে পারে না। যাহা সাধারণ জ্ঞান, তাহাও আমাদের সাহিত্যই প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের জনসমাজের মধ্যে প্রচার করিতে পারে। সুতরাং বঙ্গসাহিত্য এই উভয়শ্রেণীর জ্ঞানপ্রচারের উপযুক্ত না হইলে, বাঙ্গালী প্রকৃত অভ্যুদয় লাভ করিতে পারিবে না।

যাহা কেবল কাব্যশাস্ত্রের অন্তর্গত, তাহাও সভ্যসমাজে বিবিধ জ্ঞানপ্রচারে নিযুক্ত হইয়াছে। তাহা এখন আর কেবল রসবিস্তার করিয়া,—অথবা কেবল দেশপ্রচলিত ধর্ম্ম বা নীতি প্রচার করিয়া,—তৃপ্তিলাভ করিতেছে না। জনসমাজের অধিকার ঘোষণায়,—শারীরিক শ্রমের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে,—সামাজিক দুর্নীতি দূরীকরণের উপায় উদ্ভাবনে,—ব্যক্তিগত স্বার্থ সুসংযত করিয়া জাতিগত স্বার্থের প্রাধান্য সংকীর্ত্তনে—সভ্যসমাজের কাব্য, নাটক, উপাখ্যান সাহিত্য জগতে এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। তাহার তুলনায় আমরা কোথায় পড়িয়া রহিয়াছি ?

বিজ্ঞান বিবিধ বিভাগের তত্ত্বালোচনায় নিযুক্ত হইয়া, নূতন নূতন সত্যাবিষ্কারে জনসমাজকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতেছে; সেই জ্ঞান যাহাতে জনসমাজের মধ্যেও ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতে পারে, তাহার জন্য শিক্ষাগার, শিল্পাগার, যন্ত্রশালা, প্রদর্শনীগৃহ সংস্থাপিত করিয়া, জনসাধারণের বোধগম্য সরলভাষায় গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাহার তুলনায় আমরা কোথায় পড়িয়া রহিয়াছি?

ইতিহাস তাহার পুরাতন পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া, তাহাকে মানব সমাজের অভ্যুদয়সাধক জীববিজ্ঞানের অন্তর্গত করিয়া তুলিতেছে। আমরা তাহার তুলনায় কোথায় পড়িয়া রহিয়াছি?

আমরা কি করিব? আমাদিগকে সাধনশীল হইতে হইবে,—সাধনশীল হইবার জন্য কর্ম্মশীল হইতে হইবে,—কর্ম্মশীল হইবার জন্য সংকলন কার্য্যে এবং সত্যাবিষ্কার কার্য্যে নিয়ত উৎসাহশীল হইতে হইবে। কি করিয়াছি, তাহার কথা রাখিয়া দিয়া, কি করিতে পারি, তাহার কথাই চিন্তা করিতে হইবে। যাহা সংগ্রহ করিব, তাহা কিরূপে প্রচার করিব, তাহারও উপায় উদ্ভাবিত করিতে হইবে।

আমরা কি করিতে পারি? আমরাও আমাদের কাব্য নাটক উপাখ্যানের ভিতর দিয়া জাতীয় আত্মানুভূতি জাগাইয়া তুলিয়া লোকশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারি। আমরাও জনসাধারণের বোধগম্য সরল ভাষায় বিবিধ বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপদেশ দান করিয়া, জনসাধারণকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে পারি। আমরাও ইতিহাসের আলোচনায় আমাদের পুরাকাহিনীকে আমাদের অভ্যুদয়লাভের সহায় করিয়া তুলিতে পারি। কিন্তু পারি বলিয়াই, চিত্তপ্রসাদ লাভ করিবার উপায় নাই। যে সকল অন্তরায় আমাদের সাহিত্যশক্তিকে অবসন্ন করিয়া রাখিয়াছে, তাহা দূর করিতে না পারিলে, আমরা কিছুই করিয়া উঠিতে পারি না।

স্বাভাবিক কৌতূহল এবং অভাববোধ মানব সমাজকে জ্ঞানোপার্জ্জনের জন্য তাড়না করিয়া, তাহার সাহিত্যশক্তি বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে। আমাদের স্বাভাবিক কৌতূহল এবং অভাববোধ নানা কারণে ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। আমরা যে দেশে বাস করি এবং আমরা যেরূপভাবে বাস করি, তাহাতে আমাদের মধ্যে জ্ঞানোপার্জ্জনের জন্য এখনও তাড়না উপস্থিত না হইলে, আমাদের আত্মোন্নতি লাভের সম্ভাবনা নাই। আমরা পুরাতন সাহিত্যের উদ্ধার সাধনের জন্য যে সামান্য চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহাও আমাদিগকে আন্তরিকতায় প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিতে পারে নাই। তাহা এখনও কেবল একশ্রেণীর পুরাতন সাহিত্য লইয়াই, নিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। পুরাকালে কেবল একশ্রেণীর সাহিত্য লইয়াই জনসমাজ লোকশিক্ষা সুসম্পন্ন করিতে পারিত না। যে সকল পুরাতন জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া পড়িতেছে, তাহার উদ্ধারসাধনের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যে সকল নূতন জ্ঞান মানবসমাজকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতেছে, তাহার সংকলনকার্য্যে হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। সকলশ্রেণীর জ্ঞানই যাহাতে কেবল বিদ্বৎসমাজে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আলোচিত ও জনসাধারণের বোধগম্য সরলভাষায় প্রচারিত হয়, তাহারও ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

বঙ্গ-সাহিত্য এখন মহিলাসমাজেও সমাদর লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহা একটি সুলক্ষণ হইলেও, বঙ্গ-সাহিত্য নারীশিক্ষার জন্য এখনও বিশেষভাবে আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হয় নাই। নরশিক্ষার ন্যায় নারী-শিক্ষাও যে জনসমাজকে সমুন্নত করিবার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন, সে কথা স্বীকৃত হইলেও, বৈজ্ঞানিক প্রণালীর শিক্ষাবিস্তারের শৈথিল্যে, আমাদের সাহিত্য নরনারীর পক্ষে তুল্যশিক্ষার ব্যবস্থা করিতেছে বলিয়াই বোধ হয়। মানবশক্তির যথাযোগ্য পূর্ণবিকাশ সাধিত করাই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষা বিস্তার করিবার প্রধান লক্ষ্য। তাহা কদাচ নরনারীর পক্ষে তুল্যভাবের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারে না। জননী হইয়াই রমণীজীবন পূর্ণবিকাশ লাভ করে, জননী হইয়াই রমণীজীবন লোকপ্রবাহ রক্ষা করে, জননী হইয়াই রমণীজীবন মানবহৃদয়ে অমৃতধারা প্রবাহিত করিয়া দেয়। নারীশিক্ষা কিরূপে সুসম্পন্ন করিতে হইবে, তাহার জন্য অন্যান্য সভ্যদেশের সাহিত্য-সমাজ কত আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাহার তুলনায় আমাদের সাহিত্য এখনও কোথায় পড়িয়া রহিয়াছে! যাহার যাহাতে প্রয়োজন নাই, তাহাকে তাহা না শিখাইয়া, যাহার যাহাতে প্রয়োজন আছে, তাহাকে তাহাবই শিক্ষাদানের নাম বৈজ্ঞানিক প্রণালীর শিক্ষাদান। বঙ্গ সাহিত্য এখনও তাহার জন্য সমুচিত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে বলিয়া স্বীকার করিতে সাহস হয় না। বিদেশাগত সাম্যবাদ আমাদের সাহিত্যে এক কৃত্রিমতার আস্ফালন আনিয়া, তাহাকে ধীরভাবে সকল কথা বিচার করিয়া দেখিবার অবসর দান করিতেছে না!

লোকশিক্ষার যথাযোগ্য সুব্যবস্থা করাই সাহিত্যের প্রধান লক্ষ্য। তাহা কেবল বৈজ্ঞানিকপ্রণালীতেই সুসিদ্ধ হইতে পারে। বৃটীশ এসোসিয়েসন সভার শিক্ষাবিজ্ঞান-বিভাগের মাননীয় সভাপতি স্যর ফিলিপ্ ম্যাগ্‌নস্ মহোদয় এ বিষয়ে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যেক কথা আমাদের দেশের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তিনি বলিয়াছিলেন,—"পুরাকালের জনসমাজ যে সাধারণত অশিক্ষিত ছিল, এরূপ মনে করিও না। না, তাহারা একেবারে অশিক্ষিত ছিল না। কিন্তু সে কথা বুঝিতে হইলে, শিক্ষাশব্দের অর্থকে অধিক ব্যাপ্তিদান করিতে হইবে;—তাহারা পুস্তক স্পর্শ না করিয়াও, নানা বিষয়ে যে সকল জ্ঞান উপার্জ্জন করিত, তাহাও শিক্ষার অন্তর্গত। তাহার সহিত বর্ত্তমান বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালীর তুলনা করিয়া দেখ। আমরা বালকগণের জন্য যে শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছি, তাহাতে তাহারা কেবল "কেরাণী" হইবারই যোগ্যতালাভ করিতেছে;—বালিকাগণের শিক্ষা তাহাদিগকে বিলাসিনী করিলেও, রমণী করিয়া তুলিতে পারিতেছে না।"*

* Let it not be supposed that in the days not so far distant, yet streching back into the remote past, the people as a whole were uneducated. This was not so. But we have to widen the meaning of education to include the special training which the people then received,—an education that was acquired without even the use of books. * * * * We have provided an education for our boys which might have been suitable for clerks, and what is worse, we have gone some way, although we have happily cried a halt, to make our girls into "ladies," and we have run some risk of failing to produce women.—Nature, August 22,1907.

বিদ্যালয়ের শিক্ষা এইরূপে আমাদের দেশও শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া ফেলিতেছে! এরূপ ক্ষেত্রে বঙ্গসাহিত্যই বাঙালীর একমাত্র ভরসাস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহা বিদ্যালয় শিখাইতে পারে না, বঙ্গসাহিত্য তাহাকে জনসমাজের মধ্যে নানাভাবে প্রচারিত করিয়া দিয়া, লোকশিক্ষার অভাব দূর করিতে পারে। তাহার জন্য বঙ্গসাহিত্যকে প্রস্তুত হইতে হইলে, কেবল উচ্চশিক্ষা লইয়া সন্তুষ্ট হইলেই চলিবে না;—জনসাধারণের বোধগম্য ভাষায় বিবিধ মনোজ্ঞ গ্রন্থের প্রচার করিতে হইবে। কাব্য হউক, নাটক হউক, উপাখ্যান হউক, ইতিহাস হউক, আর বিজ্ঞান হউক, সকল গ্রন্থই জনসাধারণের বোধগম্য ভাষায় রচিত হইতে পারে। যে পড়িতে পারে না, সে তাহা শ্রবণ করিয়াও জ্ঞান লাভ করিতে পারে। বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিসাধনের প্রস্তাব উপস্থিত হইবামাত্র, আমরা এক সুদীর্ঘ নির্ঘণ্ট আনিয়া উপস্থিত করি। তাহা আমাদের পাণ্ডিত্যের পরিচয়ে সভামণ্ডপকে বিস্মিত করিতে পারে,—আমাদের সম্মুখে কোনও সরল পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয় না! কার্য্যারম্ভে অল্প লইয়া সন্তুষ্ট হইতে না শিখিলে, ফললাভ করিবার আশা নাই। আমাদিগকে অল্প লইয়াই কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে। লোকশিক্ষার জন্য যে সকল গ্রন্থ প্রথমে রচিত হওয়া কর্ত্তব্য, তাহাতেই আপাততঃ হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। এ বিষয়েও স্যর ফিলিপ্ ম্যাগ্‌নস্ মহোদয় একটি বহুমূল্য সদুপদেশ বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। কি শিখাইব? তিনি বলিয়াছেন,—"আমাদিগের চারিদিকে যে জগৎ চিরবিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে, তাহার কথাই প্রথমে শিখাইব। যে ধরিত্রী আমাদিগকে বহন করিতেছেন, যে অনন্তবিস্তৃত বায়ুমণ্ডল আমাদিগকে নিঃশ্বসিত করিয়া রাখিয়াছে, যে জলরাশি আমাদিগের তৃষ্ণা দূর করিতেছে, যে ফলশস্য আমাদিগকে খাদ্য দান করিতেছে, যে বসন ধারণ করিয়া আমাদের আদিম নগ্নতা সংবৃত করিতে পারিয়াছি, যে শিল্প—যে ব্যবসায়,—অবলম্বন করিয়া আমরা উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছি, তাহারই কথা শিখাইব"।* ইহাই যদি লক্ষ্য হয়, তবে বঙ্গসাহিত্য ধরিয়া ইহার কোনবিষয়েই লোকশিক্ষার ব্যবস্থা করিবার উপায় নাই!

এই সকল চেষ্টা বাহির হইতে আসিতে পারে না,—ইহাই প্রকৃত পক্ষে আত্মচেষ্টা। ইহাতে আমাদিগকেই হস্তক্ষেপ করিতে হইবে;—হয়ত অনেক প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়াই ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইবে। তাহার জন্য সমুচিত অধ্যবসায় এবং আত্মত্যাগ আবশ্যক।

আমাদের মধ্যে শক্তিশালী লেখকের অভাব উপস্থিত হইয়াছে;—সেকালের ন্যায় একালে সাহিত্য-প্রতিভা আর তেমন করিয়া বিকশিত হইতেছে না;—যাহা গিয়াছে, তাহার স্থান পূরণের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত তিরোহিত হইয়া গিয়াছে;—এ সকল কথা বক্তৃতার

* "Some knowledge of the things that immediately surround us,—the earth we walk on, the air we breathe, the water we drink, the food we eat, the clothes we wear, the trades we practise."

কথা ;—বলিতে এবং শুনিতে নিরানন্দের মধ্যেও আনন্দ উপস্থিত হয়। কারণ, ইহা আমাদের অপরাধের কথা ভুলাইয়া দিয়া, আমাদের অক্ষমতার একটি মুখরোচক কারণ নির্দ্দেশ করিয়া, আমাদিগকে আত্মগ্লানি হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু ইহা ক আদৌ সত্য কথা বলিয়া স্বীকার করিতে সাহস হয় না। আমাদের চারিদিকেই দিন দিন শক্তিশালী এবং প্রকৃত প্রতিভাশালী লেখকের অভ্যুদয় হইতেছে ;—দিন দিন অধিক লোকে বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিসাধনের জন্য কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছেন। তথাপি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াই, আমরা আশানুরূপ উন্নতিলাভ করিতে পারিতেছি না।

ইহা আমাদের পক্ষে অদৃষ্টের কি নিদারুণ পরিহাসরূপেই প্রতিভাত হইতেছে! আমরা যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাহাই মানব সাহিত্যের সর্ব্বপ্রথম জন্মভূমি, তাহার পুরাতন সাহিত্যনিহিত জ্ঞানভাণ্ডারে সভ্যসমাজের সকল লোকেই প্রবেশলাভ করিয়া জ্ঞানাহরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে,—আমরাই কেবল নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া রহিয়াছি! মানব হৃদয়ের সমগ্র সমুচ্চ বৃত্তি যাহার অনুশীলনে পূর্ণবিকাশ লাভ করিয়া মানবকে দেবত্বদান করিতে পারে, তাহা আমাদের পুরাতন সাহিত্যেই চিরসঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। তাহাকে লাভ করিবার জন্য যথাযোগ্য অর্থব্যয় এবং সময় ক্ষয় করিতে পরাঙ্মুখ হইয়া, আমরা ইহসর্ব্বস্ব আধুনিক সভ্যতাকেই আদর্শসভ্যতা বলিয়া আত্মসম্মান বিসর্জ্জন দিয়া, তাহারই পশ্চাতে ছুটিয়া চলিয়াছি। আমরা কি করিতে পারি? আমরা আমাদের চিরসঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া আমাদের দৈন্যদূর করিয়া, বিশ্ববাসিকেও অকাতরে মহারত্ন বিতরণ করিতে পারি,—তাহার বিনিময়ে নানাস্থান হইতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আহরণ করিয়া, আমাদের জনসমাজকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে পারি। ইহার জন্য যে অর্থব্যয়, তাহাই প্রকৃত সদ্ব্যয় ;—ইহার জন্য যে আত্মত্যাগ, তাহাই প্রকৃত আত্মত্যাগ ;—ইহার জন্য যে অধ্যবসায়, তাহাই প্রকৃত অধ্যবসায়। আমাদিগকে সেই পথে পদার্পণ করিতে হইলে কি করিতে হইবে? জ্ঞান (১) সংকলন করিতে হইবে, (২) আবিষ্কার করিতে হইবে, (৩) বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে জনসমাজের মধ্যে প্রচার করিতে হইবে, (৪) নরনারীর যথাযোগ্য আত্মবিকাশের জন্য আয়োজন করিতে হইবে, (৫) পুরাতনের সঙ্গে নূতন মিশাইয়া, রক্ষাকার্য্যে এবং সংগ্রহ কার্য্যে সাহিত্যকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইবে, (৬) এক সময়ে যেমন বৈদিক ও লৌকিক সাহিত্যের যুগপৎ অভ্যুদয়ে বিদ্বন্মণ্ডলী এবং জনসাধারণ যথাযোগ্য অভ্যুদয় লাভ করিত, এখনও সেইরূপই উচ্চশিক্ষায় এবং সাধারণ শিক্ষায় সকল শ্রেণীর নরনারীর মঙ্গল কামনায় বঙ্গসাহিত্যকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে হইবে। কিন্তু হায়! আমরা এপর্য্যন্ত ইহার কোন্ কার্য্যে আন্তরিকতার সঙ্গে হস্তক্ষেপ করিয়াছি? আমাদের উদ্ভ্রান্ত চেষ্টা আমাদের শোচনীয় চিত্তবিক্ষেপকে আরও শোচনীয় করিয়া তুলিয়াছে! ভারতবর্ষ পুরাতন মানবসমাজের যাত্রাপথে এক বিচিত্র তোরণ নির্ম্মাণ করিয়া লিখিয়া রাখিয়াছিল,—"অথাতো অধিকারঃ"। আমরা অধিকার লাভের জন্য তপস্যা না করিয়াই,

উপভোগলাভের জন্য লালায়িত হইয়া উঠিয়াছি!

অনেক নিরাশার কথা বলিলাম। এখন অনেক আশার কথাও বলিব। প্রধান আশার কথা বাঙালীর নবজীবনলাভ। বাঙালী আর আত্মোন্নতির কথা বিস্মৃত হইয়া, জীবন ক্ষয় করিতে সম্মত হইতেছে না। সে পৃথিবীর উন্নতিশীল অন্যান্য সভ্যসমাজের পার্শ্বে আপনার জন্য যথাযোগ্য স্থান করিয়া লইতে লালায়িত হইয়া উঠিয়াছে। যে পরিমাণে এই আকাঙ্ক্ষা, উচ্ছৃঙ্খলতা ত্যাগ করিয়া, কর্ত্তব্যনিষ্ঠার সাক্ষ্যদান করিতে পারিবে, সেই পরিমাণে ইহাতেই বঙ্গসাহিত্য ধীরে ধীরে শক্তিশালী হইয়া উঠিবে।

উত্তরবঙ্গের মধ্যে রঙ্গপুরেই এই আকাঙ্ক্ষা প্রথমে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এখানকার শাখা সাহিত্য পরিষৎ এবং সাহিত্য সম্মিলনের এই বিপুল আয়োজন তাহারই সাক্ষ্যদান করিতেছে। যাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই পুণ্যব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে সমুচিত সাধুবাদ করিবার ভাষা বঙ্গসাহিত্যে এখনও সুলভ হইতে পারে নাই। এখনও অনেক অসার আত্মাভিমান দেশের লোককে অপরের সাধুবাদকীর্ত্তনে পরাঙ্মুখ করিয়া রাখিয়াছে। তথাপি রঙ্গপুরের এই সাধু দৃষ্টান্ত সমগ্র উত্তরবঙ্গকেই গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছে।

উত্তরবঙ্গের নিভৃত নিকেতনে অনেক অতীত শতাব্দীর চিতাভস্মাচ্ছন্ন লোকশিক্ষার উপাদান লোকলোচনের অন্তর্হিত হইয়া রহিয়াছে। কারণ, এক সময়ে, সমগ্র বঙ্গদেশের প্রাণ এই উত্তরবঙ্গের বারেন্দ্রপ্রদেশেই বিশেষভাবে স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছিল। কি হিন্দু, কি বৌদ্ধ, কি মুসলমান, এখানে আসিয়া সকলেই এক অনির্ব্বচনীয় স্বাতন্ত্র্য-লিপ্সার অনুপ্রাণিত হইয়া বাঙালীর নাম ভারতবিখ্যাত করিয়া তুলিয়াছিলেন। এখানে প্রকৃতি যেমন অযত্নসম্ভূত শস্যসম্ভারে গৃহস্থের অন্নকষ্ট নিবারণ করিয়া তাহাকে নিবিষ্ট মনে সাহিত্যানুশীলনের অবসর দান করিয়াছে, রাজশক্তিও সেইরূপ মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিয়া জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের উৎসাহ দান করিয়াছে। এখানে রাজা, রাজপুত্র, রাজপুরুষগণ রাজকার্য্যের মধ্যেও সাহিত্যানুশীলনের অবসর লাভ করিতেন; ধর্ম্মাধিকরণ অলঙ্কৃত করিয়া মহাধর্ম্মাধিকার অবসর সময়ে মন্ত্রার্থব্যাখ্যায় জনসমাজকে সসীম হইতে অসীমে—ক্ষুদ্র হইতে ভূমায়—আত্মরতি লাভের উপদেশ দান করিতেন;—এখানেই আবার অধ্যবসায়শীল অকুতোভয় নাবিক এবং বণিকগণ পোতারোহণে তরঙ্গসঙ্কুল সাগরপথ অতিক্রমণে বিবিধ দ্বীপোপদ্বীপে গমনাগমন করিয়া বাঙালীর নাম জগদ্বিখ্যাত করিয়া তুলিতেন। এখানে এখনও প্রকৃতি অনুকূল,—এখনও জনসমাজ সরলস্বভাব,—এখনও ধনাঢ্যগণ মুক্তহস্ত,—এখনও যুবকগণ উৎসাহশীল,—অন্তঃপুরবাসিনী পুররমণীগণ এখনও পুরাতন আত্মত্যাগ মাহাত্ম্যে জনসমাজকে সরস ও সবল করিয়া রাখিয়াছেন। পুরাকালের ন্যায় বর্ত্তমানে, এখানে বসিয়াই বাঙালী তাহার কর্ত্তব্যপালনের বল এবং উৎসাহ লাভ করিতে পারে। এই সকল কারণে, রাজধানীর কর্ম্মকোলাহলময় লোকালয় অপেক্ষা এই নিভৃত নিকেতনেই বঙ্গসাহিত্যের নীরবে নিবিষ্টচিত্তে আত্মোন্নতি লাভ করিবার সম্ভাবনা অধিক।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

মন্বন্তর।

STILL fresh in memory's eye the scene I view,
The shrivelled limbs, sunk eyes, and lifeless hue
Still hear the mother's shricks and infants' moans,
Cries of despair and agonizing moans.
In wild confusion dead and dying lie ;—
Hark to the jackal's yell and vultures' cry,
The dog's fell howl, as midst the glase of day
They riot unmolested on their prey ;
Dire scenes of horror, which no pen can trace,
Nor rolling years from memory's page efface.

—*Sir Jhon Shore.*

শ্মশান! নন্দনকানন মহাশ্মশান হইয়া গেল—সপ্তকোটী কণ্ঠের কলকল করাল নিনাদ নীরব হইল! একি স্বপ্ন, না সত্য কাহিনী! স্বপ্ন নহে, কল্পনা নহে, মিথ্যা বিভীষিকা ভরা বৃথা বর্ণনা চাতুর্য্য নহে;— ইহা সত্য,—বিধাতার অভিসম্পাতের মত নিষ্ঠুর সত্য, যে বঙ্গভূমি শ্মশানের অধিক হইয়াছিল। শ্মশানেও শৃগাল কুক্কুর ক্ষুধায় ক্রন্দন করে— একখণ্ড গলিত মাংস পিণ্ডের জন্য শকুনী গৃধিনী কলহ করে, চীৎকার করে, পরস্পর পরস্পরকে নখাঘাতে ও চঞ্চু তাড়নে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে—কিন্তু বাঙালায় তখন শৃগাল কুক্কুরেরও অরুচি হইয়াছিল!

বাঙালীর সেই অতি দুর্দ্দিনের কাহিনী, বাঙালীর তিতিক্ষার কাহিনী এতকাল পর আজ যথাযথ লিপিবদ্ধ করা একান্ত অসম্ভব না হইলেও নিতান্ত দুরূহ। ইংরাজ ও মুসলমান যে জাতির ঐতিহাসিক, সে জাতির জাতীয় দুঃখের কথা মুতাক্ষরীণ এবং রিয়াজ-উস্-সালাতিন্, মিল এবং থরনটন প্রভৃতির অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় পরিসমাপ্ত হইয়াছে।

বাঙ্গলায় কোম্পানী বাহাদুরের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ যে কত কথাই লিখিয়াছেন তাহার সীমা নাই; কিন্তু বাঙালার সেই দুর্দ্দিনের দুঃখ কাহিনী যাহার সহিত কামান বন্দুক বা সঙ্গীনের সম্বন্ধ ছিল না—যাহার সহিত বক্তৃতা বা পার্লামেণ্ট মহাসভার সম্বন্ধ ছিল না—যে কাহিনী বাঙালীর নিতান্তই নিজস্ব তাহা লিখিতে যাইয়া আধুনিক ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ প্রসঙ্গক্রমে মন্বন্তরের উল্লেখমাত্র করিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন। ঐতিহাসিক মিল্ অতি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার বিপুল গ্রন্থের একটী নহে, দুইটী নহে, দীর্ঘ পাঁচটী পংক্তি নষ্ট করিয়াছেন।*

ইংরাজ নির্ব্বাচিত "ফেমিনকমিশন" পর্য্যন্ত অক্ষমতা জানাইয়া কহিয়াছিলেন যে সে মন্বন্তরের আনুপূর্ব্ব কাহিনী সঙ্কলন করিতে

* Vol. III. page 586.

তাঁহারা অসমর্থ, * অথচ সেই মন্বন্তরের অশ্রু সিক্ত ইতিহাসের সহিত কোম্পানী বাহাদুরের চল্লিশ বৎসরের শাসন ও রাজস্বের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়।

সমসাময়িক সরকারী দপ্তর খুলিয়া বসিলে দেখা যাইবে যে কোম্পানী বাহাদুরের সঙ্কলিত গ্রন্থে † বাঙলার মন্বন্তরের বহু উল্লেখ আছে। লর্ড কর্ণওয়ালিশের মিনিটে ‡ তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, বাঙালার সর্ব্বস্থানেই তিনি ধ্বংসের ও দুঃখের চিত্র দেখিয়াছিলেন; জনসোর (শেষে স্যার) মন্বন্তরের প্রারম্ভে এদেশে আসিয়াছিলেন এবং সেই দারুণ শোক দৃশ্য দেখিয়া একান্ত মুহ্যমান হইয়াছিলেন। তাঁহার শেষ জীবনেও তিনি শত শত অনশনক্লিষ্ট বঙ্গবাসীর করুণ রোদন শুনিতে পাইতেন—তাহাদিগের অস্থি চর্ম্মসার দেহ মানসনয়নে নিরীক্ষণ করিয়া শিহরিয়া উঠিতেন; তাই তাঁহার কবিতার সে ভীষণ চিত্র আজিও বর্ত্তমান আছে। §

হেষ্টিংস সাহেব ও মিষ্টার ফ্রান্সিসের দ্বন্দ্ব যুদ্ধের সহিত বাঙালীর অনশন ব্রতের কাহিনী এক সূত্রে গ্রথিত। ॥ ১৭৭৩ খ্রীঃ অব্দে ইংলণ্ডের জনসাধারণ কোম্পানী বাহাদুরের উপর বিষম বিরক্ত হইয়াছিলেন কারণ বিলাতে বাঙালার মন্বন্তরের যে ইতিহাস পৌঁছিয়াছিল, কোম্পানী বাহাদুর তাহাকে বাঙালার বিষাদের ও বিপদের অতি কষ্ট কল্পনাময় অত্যুক্তি বলিয়া প্রখ্যাত করিয়াছিলেন। ¶ যখন হেষ্টিংস সাহেব বাঙলার মসনদে বসিয়াছিলেন তখন তিনিও ডিরেক্টর সভায় লিখিয়াছিলেন, ইংরাজের নন্দন কানন ধ্বংস হইয়াছে—জমি জমা পরিত্যাগ করিয়া প্রজাগণ পলায়ন করিয়াছে—রাজস্ব প্রতি দিন সঙ্কুচিত হইয়া যাইতেছে ! *

বাংলার হিন্দুরাজ সিংহাসন যখন টলিয়াছিল, যখন প্রবল বন্যার দুর্নিবার্য্য স্রোতের মত পাঠান বাহিনী আসিয়া বাংলার হিন্দু নরপতির নাম বিলুপ্ত করিয়াছিল—সেই হিন্দু ও পাঠান সংঘর্ষের অব্যবহিত পরে—হিন্দুর রাজসিংহাসনে মুসলমান প্রতিষ্ঠার সেই ঊষায় বিধাতার নিদারুণ অভিসম্পাত, অগ্নি মুখে দেখা দিয়াছিল ! তখন সহস্র বাঙালী প্রতি দিন অনশনে মরিতে লাগিল। যাহারা জীবিত ছিল তাহারা মৃতের সৎকার করিতে করিতে নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া অবশেষে শব দেহগুলি ভাসাইয়া দিতে লাগিল। গলিত শব সংস্পর্শে নদীর জল বিষ তুল্য হইয়া উঠিল—পূতিগন্ধে চতুর্দ্দিক ভরিয়া গেল।

---

* Papers &c relating to the Famine in Bengal and Orissa (1866) Presented to Parliament by Her Majesty's Command. Vol. I.

† Selection of papers printed by order of Court of Directors.

‡ Minute of Gov. General 18th September 1789 and his letter to Court of Directors 2 August 1789.

§ Life of Lord Teigenmonth by his son.

॥ Minute by Mr. Francis delevered on the 5th Nov., 1776 and the Governor General's reply.

¶ General letter from Bengal the 3rd November, 1773.

* General letter from Bengal 5th September, 1772.

যাহারা অনশনে মরিল না তাহারাও শেষে রোগাক্রান্ত হইয়া একে একে মৃত্যু মুখে পতিত হইতে লাগিল—রাজ্যের কর্ণধার পর্য্যন্ত নিষ্কৃতি পায় নাই।

শত নরপতি যে রাজধানীকে দিনে দিনে মাসে মাসে বর্ষে বর্ষে—ফলে ফুলে, উদ্যানে হর্ম্মে, ধনে জনে জগতে অতুল করিয়া তুলিয়াছিলেন—কত বৈদেশিক পরিব্রাজক যে নগরী দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন, ইতিহাস বিশ্রুত সেই মহাসমৃদ্ধিশালিনী নগরী—হিন্দুর অনাদি গৌরবভাণ্ডার—মোগল পাঠানের কীর্ত্তিতীর্থ—বঙ্গভূমির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হেমকণ্ঠহার এক বৎসর মধ্যে বিনষ্ট হইয়াছিল। তাহার অগণিত রাজপথ এক বৎসর মধ্যে নীরব হইল—এক বর্ষ মধ্যেই উচ্চ সৌধচূড় ভাঙ্গিয়া পড়িল—রাজপথ সমূহ আবর্জ্জনা পরিপূর্ণ জঙ্গল হইয়া গেল—উদ্যান অরণ্য হইল! দুই সহস্র বৎসরের সেই রাজধানী যে এক বৎসরে বিলুপ্ত হইয়াছিল একথা এখন বিশ্বাস হয় না। মনে হয় এ কাহিনী সত্য নহে—ইহা অলীক—ইহা আরব্য উপন্যাসের কল্পনা মাত্র। কিন্তু কবি কল্পনা নহে, ইহা সত্য। সেই নিদারুণ সত্যের অতি অভ্রান্ত প্রমাণ এখনো দুর্ভেদ্য বিশাল অরণ্যে অরণ্যবাসী বিকটদশন ভীষণ শার্দ্দূলের গগন বিদারী-ভৈরব হুঙ্কারে ও বৃক্ষে বৃক্ষে শাখা মৃগাদির চীৎকারে চিরসঞ্জীবিত রহিয়াছে, লর্ড কার্জ্জন বাঙালার সেই বিনষ্ট গৌরবের পুনরুদ্ধার করিতে তৎপর হইয়া দেশের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন।

মুসলমানের আগমনে ও হিন্দুর তিরোধানে বর্ষমধ্যে গৌড়ের যে অবস্থা ঘটিয়াছিল—ইংরাজের আগমনে মোগলের তিরোধানে বর্ষমধ্যে বাঙালারও সেই অবস্থা হইয়াছিল। বাঙালার ভাগ্য বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিধাতা বাঙালীর সহিষ্ণুতাও পরীক্ষা করিয়াছেন। আমাদের ইতিহাস নাই তাই সেই কাহিনী করুণহৃদয় স্যার জন সাহেবের কবিতায় অক্ষরে অক্ষরে নয়ন বারি নিসিক্ত হইয়া—চিরদিনের সাক্ষী-স্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে।

বাঙালী বেদনা সহিতে জানে। অদৃষ্টবাদী বঙ্গবাসী তাহার প্রতিদিনের সুখ ও দুঃখ অদৃষ্টের উপর বিশ্বাস করিয়া নীরবে ভোগ করে। যে মানসিক উত্তেজনা অন্য জাতিকে অতি সহজে উন্মত্ত করিয়া তুলে, বাঙালী তাহাকে বশীকরণ মন্ত্রে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। বাঙালী সহ্য করিতে জানে, সহ্য করে; কিন্তু তাহার অসন্তোষ চিরস্থায়ী, কথায় উহা প্রকাশ পায় না; তাই বাঙালীর দুঃখ কাহিনীর ইতিহাস নাই। বঙ্গের শেষ নবাব তাঁহার শাসন সময়ের মুমূর্ষু অবস্থায় যখন প্রজার নিকট হইতে ৮১, ৭৫, ৫৩০, টাকা কর আদায় করিয়াছিলেন বাঙালী তখন নীরব ছিল, আবার অধিক নহে ত্রিশ বৎসর পর যখন বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যায় ইংরাজ নবাব ২,৬৮,০০,০০০, টাকা আদায় করিয়া লইলেন বাঙালী তখনও নীরবই থাকিল!

বাঙালা ১১৭৪ সালে ফসল ভাল হয় নাই; সুতরাং চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছিল। পর বৎসর আশ্বিন মাসে যখন বাঙলার প্রতি গৃহে মহানন্দে মহাপূজার আয়োজন হইতেছিল, তখন বাঙালার কৃষক আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল।

ইংরাজ এদেশের নূতন অতিথি না হইলেও

তখনও দেশের সহিত তাঁহাদিগের ভাল পরিচয় ছিল না। কৃষকের শস্যপূর্ণ শ্যামল ক্ষেত্র দেখিয়াই তাঁহারা পুলকিত হইয়াছিলেন, তাই ভাদ্র মাসে বাঙালার কৌন্সীল মান্দ্রাজের সাহায্য কল্পে চাউল পাঠাইবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন। আশ্বিনে ও কার্ত্তিকে বিন্দুমাত্র বারি পাত হইল না—নানা স্থান হইতে সংবাদ আসিল যে মাঠের ধান্য মাঠেই শুকাইয়া মরিয়া গিয়াছে, শ্যামশস্য ক্ষেত্র দগ্ধ হইয়া খড়ের বনে পরিণত হইয়াছে! বিভাগীয় ইংরাজ ও এদেশীয় কর্ম্মচারীগণ সর্ব্বদাই আতঙ্ক পূর্ণ সংবাদ প্রেরণ করিয়া কলিকাতার তদানীন্তন ইংরাজ কর্ত্তাকে এতই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন যে তিনি সেই বিপদের সংবাদ বিলাতে প্রেরণ করিলেন!* তখন ভেরেলষ্ট সাহেব ইংরাজের বড় কর্ত্তা ছিলেন। মন্বন্তরের বৎসর (১৭৭৬) বিলাতে বাঙালার যে সংবাদ প্রেরিত হইয়াছিল, বড় কর্ত্তা সে পত্রে স্বাক্ষর পর্য্যন্ত করেন নাই ছোট কর্ত্তা জন্ কার্টিয়ার সাহেবের স্বাক্ষর সংযুক্ত হইয়া উহা বিলাতে গিয়াছিল!* ইংরাজের বড় সাহেবের এই কার্য্য যে অকস্মাৎ ভ্রম ক্রমে ঘটিয়াছিল, তাহা নহে। জন্ কার্টিয়ারের পত্র যেদিন বিলাতে যায় বড় সাহেব সেই দিনই অন্য একখানি পত্র সহি করিয়াছিলেন, অথচ যে পত্রে বাঙালার দুর্ভিক্ষের ইঙ্গিত ছিল সে পত্রে সহি করেন নাই! ইহার পর ভেরেলষ্ট সাহেব আর অধিক দিন এদেশে ছিলেন না, কিন্তু যাইবার সময়ও ডিরেক্টর সভায় কোন সংবাদ দেন নাই। যে বোঝা অনায়াসে অপরের স্কন্ধে চাপাইতে পারা যায় কোন্ মূর্খ সাধ করিয়া তাহা নিজের শিরে তুলিয়া লয়? বড় সাহেব মূর্খ ছিলেন না।

দেশে তখন অধিক চাউল ছিল না। যাহা ছিল তাহারও অধিক পরিমাণ কোম্পানী বাহাদুর পল্টনের জন্য ক্রয় করিয়া লইলেন। রামধন ও মবারক তখন এক বেলা 'আধ-পেটা' খাইতেছিল শেষে তাহারা দুই সন্ধ্যাই উপবাস করিতে লাগিল। তখন বিলাতে সংবাদ গেল যে বাঙ্লার মাত্র একটী জেলায় অন্নকষ্ট কিছু অধিক হইয়াছে—হয়ত অল্প পরিমাণে রাজস্ব মাপ দিতে হইবে। দারুণ দুঃসংবাদ বটে! † যে দিন এই সংবাদ গিয়াছিল তাহার দশদিন মাত্র পরে পুনরায় ডেসপ্যাচে লিখিত হইয়াছিল যে যদিও লোকের দুর্দ্দশা সত্য সত্যই অধিক হইয়াছে, কিন্তু সরকারের রাজস্ব কমে নাই! বাঙালা ও বিহারে রাজস্ব রীতিমতই আদায় হইতেছে। ‡ ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত ইংরাজ সরকার মনে করিলেন যে বাঙ্গালায় অন্নকষ্টে তাঁহাদিগের চিন্তনীয় বিষয় কেবল রাজস্ব এবং প্রজাদিগের নিকট হইতে 'নরমে গরমে' সেই রাজস্ব আদায় করাই তাঁহাদিগের একমাত্র কর্ত্তব্য! § রাজস্ব মাপ দিবার প্রস্তাবও যে মধ্যে মধ্যে না হইয়াছিল তাহা নহে—কিন্তু সে প্রস্তাব শুধু কাগজে

* Letter from the President and Council to the Court of Director : 23 November 1768. Paras 8,9 & 10.

† Letter from the President and Council to the Court of Directors : 25th January 1770 : para 48.

‡ Bengal Letter—4th February 1770 paras 4, 5 & 6.

§ Do. para 6.

পত্রেই রহিয়া গেল, কার্য্যে পরিণত হইল না।*

চৈত্র মাস আসিল—চৈত্রের যাহা কিছু ফসল হইল তাহা সকলে দেখিতেই পাইল না! মহম্মদ রেজা খাঁ তখন বাঙ্গালার রাজস্ব বিভাগের কর্ণধার ছিলেন। তিনি নাম কিনিবার লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া শত করা দশ টাকা করিয়া রাজস্ব বৃদ্ধি করিলেন! মুসলমান মীরজাফর নিজ ঘৃণিত স্বার্থ সিদ্ধি করিবার জন্য বাঙালীর শোণিতসিক্ত ভূপৃষ্ঠে দণ্ডায়মান হন নাই, কিন্তু মুসলমান রেজা তাহাই করিয়াছিলেন! মীরজাফরের মুখ চাহিয়া ইতিহাস যদি তাঁহার সপক্ষে একটা কথাও কহিতে পারে, রেজা খাঁর জন্য তাহাও পারিবে না! রেজা খাঁ যখন বাহবা লইলেন তখন বাঙলার চতুর্দ্দিকে অন্নকষ্ট—জলকষ্ট—অগ্নিভয়। শুধু ইহাই নহে তিনিই সেই অন্নকষ্ট বৃদ্ধির কারণ হইয়াছিলেন। অভাগ্য বাঙালী কি করিবে? যে কোনও দিনও গৃহের বাহির হয় নাই সেও ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে করিল, কিন্তু ভিক্ষা মিলিল না। এত দিনও যাহার গরু ছিল, লাঙ্গল ছিল—সে এখন তাহা বিক্রয় করিল; থালা-ঘটি বাটি প্রভৃতি তৈজসাদি পূর্ব্বেই বিক্রয় করিয়াছিল, অবশেষে বপন করিবার বীজ পর্য্যন্ত নিঃশেষে ফুরাইয়া বাঙালার মবারক ও রামধনগণ দলে দলে মরিতে লাগিল!

উহারা মরে মরুক, কিন্তু বিলাতে তখন অর্থের অত্যন্ত প্রয়োজন। সে অর্থ উহাদিগকে যোগাইতেই হইবে! শুনিতে পাওয়া যায় ১৭৫৭ খৃঃ অব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৭৬৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত - এই নয় বর্ষ মধ্যেই উৎকোচ প্রদান করে কেবল বাঙালা হইতেই প্রায় পাঁচ কোটী মুদ্রা † আদায় করা হইয়াছিল! কোম্পানীর কার্য্য কলাপে বিলাতের বড় সাহেব যাহাতে কোন গোলযোগ না করেন কোম্পানী বাহাদুর সেজন্য সভার প্রধান প্রধান সভ্যদিগকে উৎকোচ প্রদান করিতেন! এই উৎকোচ প্রদান ব্যাপারের সহিত কেহ কেহ বা স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বরেরও নাম সংযুক্ত করিয়াছেন! ‡

"গজনীর মামুদ, নাদির শাহ, আহম্মদ শাহ আবদালী বা নাগপুরের বর্গীরা ভারতের ধনি-সন্তানদিগকে লুণ্ঠন করিয়া কত টাকা লইয়া গিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ ছাত্র-পাঠ্য ইতিহাস গ্রন্থেও সময়ে সময়ে দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু কোম্পানীর আমলে ভারতীয় কৃষক সম্প্রদায়ের নিকট হইতে কত টাকা লুণ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার হিসাব সহজে পাওয়া যায় না। মিঃ ডিগ্‌বী বলেন, পলাশীর

---

* We shall afterwards see that on this occasion they (remissions) were not in the end granted,

Mr. Hunter remarks on the Great. Famine of 1769-70.

† ৪, ৯৪, ০৪, ১৮০, টাকা—quoted from "দেশের কথা"।

‡ Nor was the Company in good repute at home. An enquiry was set on foot, and it was found that the Company had devoted in one your £100,000 to bribery. But the House of Commons stifles enquiry. The recipients of bribes were amongst the highest classess and the King himself was seen to have accepted a large sum.—British India and Englands' responsibilities by G. Clarke.

যুদ্ধের পর প্রায় ৫০ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষ হইতে ৫০,০০,০০,০০০ হইতে ১০,০০,০০০,০০০, পাউণ্ড (এক পাউণ্ডে ১৫৲ টাকা) ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়।* তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে বৎসরের ১৫ কোটি হইতে ৩০ কোটি মুদ্রা বিলাতে চলিয়া যাইত! ধন্য ইংরাজ বাহাদুর যাঁহারা এমন করিয়া শোষণ করিতে জানেন—আর সেই রামধন ও মবারক এবং কুক সাহেবের "আহে রাম ঠাকুর"—এত শোষণেও যাহারা শোণিতশূন্য হইয়া মরিয়া যায় না! একজন মনীষি ইংরাজ তাই বলিয়াছেন—

Possibly, since the world began, no investment has ever yeilded the profit reaped from the Indian plunder. +

(৩)

মহা শ্মশান।

In the General Letter from this Committee we have endeavoured to give a very faithful, candid, and impartial account of the distress this country has suffered from the severity of a famine; indeed; it is scarcely possible that any description could be an enaggeration of the misery the inhabitants of it have encountered with.

Bengal General Letter (Public)
11th Sept., 1770.

পৃথিবীতে এমন ভাষা নাই, ভাষায় এমন শব্দ নাই, শব্দের এমন শক্তি নাই যে সেই মহাশ্মশানের বর্ণনা করিতে পারে—যে শ্মশানে পুত্র মরিলে পিতা রোদন করে নাই, ভাবিয়াছিল, এক মুষ্টি ভিক্ষার অন্ন—আমিত খাইয়া বাঁচিব'—যে শ্মশানে একটি মৃতদেহ দশজনে কাড়াকাড়ি করিয়া খাইয়াছিল—যে শ্মশানে অজ্ঞান ক্ষুধিত সন্তান দুগ্ধের আশায় তাহার মৃত জননীর স্তনদ্বয় চুষিয়া জল বাহির করিয়াছিল এবং তাহাই পান করিয়া কণ্ঠ শীতল করিতে না করিতেই চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়া ক্ষুধার জ্বালা হইতে বাঁচিয়াছিল!

এখনো মনে হইলে শরীর অবশ হইয়া আইসে যে বেহার হইতে বঙ্গভূমি পর্য্যন্ত সমস্তই এক মহা শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল! কে কাহার সংবাদ লয়—কে কাহার দিকে চাহিয়া দেখে। পুর্ণিয়ায় শত শত লোক অনশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। প্রতি দিন অন্ন শত ক্ষুধিত ব্যথিত গৃহহীন আশ্রয়হীন দীন প্রজা কোম্পানী বাহাদুরকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে রাজপথে পড়িয়া মরিতেছিল।+ তখন দেখিবার কেহ ছিলনা।

নিরুপায় গৃহস্থগণ শেষে গৃহদ্বার বিক্রয় করিতে লাগিল—বালা, হাঁসুলি, মল, পৈচা অনেক দিন পূর্ব্বেই বিক্রয় করিয়া খাইয়াছে। তাহাতেও যখন কুলাইল না তখন জননী সন্তানকে বিক্রয় করিতে লাগিল, পিতা তাহার ক্ষুধিত তৃষিত জীবন্মৃত পুত্রকে বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিল! হায়রে অদৃষ্ট! এক দিন গেল—দুই দিন গেল, তৃতীয় দিবসে কেহ

* দেশের কথা—দেউস্কর।
\+ Law of Civilisation & Decay—Brookes Adams. (As quoted in "দেশের কথা।")

আর পুত্র কন্যা ক্রয় করিতে চাহিল না! একটা ছেলে লইয়া কে জঞ্জাল ঘাড়ে করিবে —পাঁচটা টাকা থাকিলে কয়েক দিন প্রাণ বাঁচিবে! * অর্থের জন্য—আহারের জন্য শেষে শান্ত শিষ্ট বঙ্গপ্রজা ডাকাইত হইল—ক্ষুধিত পথিককে হত্যা করিয়া তাহার নিকট এক কণা তণ্ডুলও পাইল না দেখিয়া শেষে তাহাকেই পার্শ্ববর্ত্তী বনের মধ্যে টানিয়া লইয়া গেল—দগ্ধ করিয়া আহার করিবে!

ডুকারেল সাহেব তখন পুর্ণিয়ার শাসন-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি কলিকাতায় জানাইলেন—'পূর্ণিয়ার যে দুঃখ কাহিনী, যে দুর্দ্দশার কথা জানাইয়াছি পরগণাগুলির অবস্থাও তদ্রূপ। নগরের নানাস্থানে এত মৃতদেহ পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে যে পাছে দুর্ভিক্ষের সঙ্গে সঙ্গে মড়ক আসিয়া উপস্থিত হয়, সেই ভয়ে আমি শবগুলি স্থানান্তরিত করিবার বন্দোবস্ত করিতেছি। সহরের বায়ু দুর্গন্ধময় হইয়া উঠিয়াছে। গত তিন দিবসেই সহস্রের অধিক মৃতদেহ সমাহিত হইয়াছে…… পরগণা চারিটির প্রায় অর্দ্ধেক প্রজা মরিয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হইবে বলিয়া মনে হয় না; আমি স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছি এবং যেমন সংবাদ পাইয়াছি যদি তদনুসারে মৃতের সংখ্যা নির্দ্ধারণ করি, তবে বলিতে হয় যে অর্দ্ধেকেরও অধিক প্রজা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে! † কলিকাতার কৌন্সীল যখন ডিরেক্টর সভায় পত্র লিখিয়াছিলেন তখন জানাইয়াছিলেন—মৃতের সংখ্যা বর্ণনাতীত; সদা-সচ্ছল পূর্ণিয়াতেই এক তৃতীয়াংশেরও অধিক প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছে—অন্যান্য স্থানের অবস্থাও এইরূপ!‡ মহাশ্মশান আর কাহাকে বলে?

বাঙলার বৃক্ষলতা গুল্মাদির অভাব নাই —কোন দিনই ছিল না। যশোহরের হতভাগ্য অধিবাসিগণ § যত দিন পারিয়াছিল বৃক্ষপত্র বন্যলতা, তৃণ প্রভৃতি আহার করিয়া জীবন ধারণ করিয়াছিল—তাহার পর নিরুপায় হইয়া পুত্র-কন্যা বিক্রয় করিয়াছিল, শেষে কেহ বা স্থানান্তরে পলায়ন করিতে করিতে পথেই মরিয়া পড়িয়া থাকিল। কেহ বা বাঞ্ছিত স্থানে যাইয়া দেখিল উত্তপ্ত কটাহ হইতে অগ্নিমধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে!

বীরভূমি, বিষ্ণুপুর, রাজমহল, দিনাজপুর, রাজসাহী, মালদহ, কোন স্থানের কথা বলিব? কোম্পানীর মুলুকে এমন স্থান ছিল না যেখানে হতভাগ্য বঙ্গবাসী অনশনে অকালে আত্মবলি দেয় নাই। বাঙালী সেজন্য নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়াছিল—আর কাহাকেও ধিক্কার দেয় নাই। বেহার হইতে সংবাদ আসিয়াছিল, 'প্রায় ২ লক্ষ লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে—কত যে পলায়ন করিয়াছে তাহার সীমা নাই। কিন্তু পাটনার ফৌজের বড় কর্ত্তা তখন ভবিষ্যতের জন্য পল্টনদের খাদ্য সংগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি হয়ত মনে করিয়াছিলেন জীর্ণ শীর্ণ 'নিগারের দল যদি মরিয়াই যায় তাহাতে কি—পল্টন বাঁচিলেই সব বাঁচিল। আলেকজান্দার সাহেবের পত্রে

* Consultation of the 28th April, 1770.

† Letter from Mr. Ducaral to Mr, Becker. 16th;Feb, 1770.

‡ Bengal General Letter : 9th May, 1770. para 3.

§ Consultation of the 28th April, 1770

কোম্পানী বাহাদুর যদিও জানিয়াছিলেন যে পল্টনের খাদ্য সংগ্রহ করায় দেশের লোকের বড়ই কষ্ট হইতেছে, তথাপি তাঁহারা নীরব রহিলেন! পল্টনের জন্য যে দেশের লোকের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতে হইতেছে পাটনার ফৌজের কর্ত্তাও কি সে কথা বুঝেন নাই? তিনিও তখন উহা জানিতেন * কিন্তু গ্রাহ্য করেন নাই। পাটনায় তখন প্রতিদিন অন্যূন ১৫০ লোক অনাহারে মরিতেছিল! †

জেনেরাল বার্কার কৈফিয়ৎ দিতে ত্রুটী করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে পাটনার বাজারে সে সময় প্রতিদিন সেইদিনের উপযুক্ত চাউল বিক্রয় হইত। অথচ রমবল্ড সাহেবের লিখিত মিনিট ‡ হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে দুর্ভিক্ষের সূচনাতেই (আশ্বিন মাসে) পাটনায় টাকায় ১০ সের দরে চাউল বিক্রয় হইতেছিল। তিনি লিখিয়াছিলেন—'দরিদ্রের অবস্থা প্রতিদিন শোচনীয় হইতেছে। শস্যের উপর যে শুল্ক ধার্য্য ছিল, দুই তিন মাস হইল তাহা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।...প্রথম রবিশস্যের অবস্থাই যখন এইরূপ এবং জলের অভাবে যখন কৃষির ফসল ব্যবস্থা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে তখন দ্বিতীয় ফসলের সময় অভাব যে আরও অধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।' এই ত দুর্ভিক্ষের সূচনার কথা! কিন্তু দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী যখন বাঙালা ও বেহার গ্রাস করিতেছিল—যখন মৃতের সংখ্যা গণনা করিবার সম্ভাবনা ছিল না—যখন দুই লক্ষ লোক অনাহারে বিগতজীবন হইয়াছিল তখনো বেহার-ফৌজের বড় সাহেব কৈফিয়ৎ দিয়াছিলেন যে পাটনার বাজারে সে সময়ে প্রতিদিন সেই দিনের উপযুক্ত যথেষ্ট চাউল আমদানী হইত! [মহারাজা সেতাব রায়ের পত্র হইতে জানা যায় যে কোম্পানী বাহাদুর ঢাকা হইতে ৪০০০ মণ চাউল আনাইয়া পল্টনদিগের জন্য মজুত রাখিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু তখন পর্য্যন্তও সে চাউল আসিয়া পৌছায় নাই। মহারাজা তাই নির্ব্বন্ধাতিসহকারে অনুরোধ করিয়াছিলেন—'বাঁকিপুরের পল্টনের জন্য শীঘ্রই অন্যত্র হইতে চাউল আমদানী করা হউক, তাহারা যেন দেশের উৎপন্ন ধান্য সমস্তই না খাইয়া ফেলে কারণ দেশের লোকের পক্ষেই উহা যথেষ্ট নহে!] §

সরকারী কীটদষ্ট দপ্তর বলিয়া দিতেছে যে মন্বন্তর আরম্ভ হইতেই কোম্পানী বাহাদুর সিপাহীরক্ষা ও রাজস্বের চিন্তায় নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন। বেকার সাহেবের মিনিটে তাই লিখিত রহিয়াছে যে সৈন্যদিগের পূর্ব্বাহ্নেই ১২০০০ মণ চাউল সংগ্রহ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। সেইজন্য পাটনার উপর ৮০,০০০ এবং দিনাজপুর ও পূর্ণিয়ার উপর ৪০,০০০ মণ চাউল সংগ্রহের আদেশ হইয়াছিল। ¶ এদিকে পাটনায় তখন দুর্ভিক্ষের ভীষণ অনল জ্বলিতেছিল এবং পল্টনের

* Letter from General Robert Barker : 13th Jnne, 1770.
† Consultation of the 28th April, 1770.
* Bengal Public Consultation 23 Oct. 1769.
* Letter from Moharaja Shitab Roy—Received 4th January, 1770.
† Bengal Consultation : 23rd Oct, 1769.

জন্য চাউল সংগ্রহের ছয় মাস মধ্যেই পূর্ণিয়ার এক তৃতীয়াংশ অধিবাসী মরিয়া বাঁচিয়াছিল! *

বেকার সাহেব যখন মুর্শিদাবাদের রেসিডেন্ট তখনো কোম্পানী বাহাদুর বাঙালায় একটি নবাবী সিংহাসন খাড়া রাখিয়া নানা ভাবে নানা উপায়ে বাঙলা শাসন করিতেছিলেন এবং ইতিপূর্ব্ব হইতেই মধ্যে মধ্যে বাঙলার মসনদ নীলামে তুলিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতেছিলেন।† নবাব মীরজাফর খাঁর তৃতীয় পুত্র মবারক-উদ্-দৌলা তখন বাঙলার নবাব বলিয়া প্রখ্যাত ছিলেন। তাঁহার একান্ত দুরদৃষ্ট যে তাঁহারই আমলে মুর্শিদাবাদে দুর্ভিক্ষের প্রবল অনল জ্বলিয়া উঠিয়াছিল।

রেসিডেন্ট সাহেব মধ্যে মধ্যেই মুর্শিদাবাদ কাহিনী লিখিয়া পাঠাইতেন; শেষে একদিন লিখিয়াছিলেন—'নগরের চারিদিকে ১৬ ক্রোশের মধ্যে চাউলের দর টাকায় তিন সের দাঁড়াইয়াছে—অন্যান্য শস্যের মূল্যও সেই অনুপাতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। সেই দুর্ম্মূল্য চাউলও আবার পরিমাণে এত অল্প আমদানী হইতেছে যে অর্দ্ধেক লোকেরই কুলায় না! কেবল মুর্শিদাবাদ সহর তলিতেই প্রতিদিবস পাঁচশত অধিবাসী অনশন ব্রত গ্রহণ করিয়া প্রাণদান করিতেছে—নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহ হইতে মৃতের যে সংখ্যা শুনিতে পাওয়া যায় তাহা এত অধিক যে সহসা বিশ্বাস হয় না!' ‡

মুর্শিদাবাদে তখন প্রতিদিন এত লোক মরিতে লাগিল যে কে তাহাদিগের সংকার করে! মুমূর্ষু এবং মৃতে রাজপথগুলি পূর্ণ হইয়া উঠিল, দুর্গন্ধে মুর্শিদাবাদে বাস করা দুরূহ হইল! এতদিনো যাহারা কোনক্রমে বাঁচিয়াছিল তাহারা তখন মৃত মনুষ্যের গলিত শবদেহ ছিঁড়িয়া খাইতে লাগিল—শৃগাল-কুকুরে কত খাইবে! § প্রেতভূমি আর কাহাকে বলে? প্রতি ষোলজনে ছয় জন করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল ইহা মুর্শিদাবাদের রেসিডেন্ট সাহেবের স্বহস্ত লিখিত সংবাদ!

তখনো কিন্তু মুর্শিদাবাদের সরকারী গোলায় প্রায় ১০।১২ সহস্র মণ চাউল বর্ত্তমান ছিল! কোম্পানীবাহাদুর উহা পল্টনের জন্য

* Patna, from which this supply was drawn, was one of the most cruelty striken districts: W. W. Hunter.

† There are Several Candidates for the throne but that the most rightlous and equitable course to be followed in this emigrant affairs should be *to put the post of Soobadari to public sale*......the highest bid...in on behalf of Naja Moodullah. Secret Select Committee: 10th Feb, 1765.

‡ Consultation of the 19th July, 1770.

§ The scene of misery, that intervened and still continues shocks humanity too much to bear description, certain it is that in several parts, the living have fed on the dead, and the number that has perished in those provinces which have suffered most is calculated to have been within these few months as six is to sixteen of the whole inhabitants.

Letter from Mr. Becker: 2nd June, 1770.

রাখিয়াদিয়াছিলেন—কি জানি যদি বাঙলায় ভবিষ্যৎ ফসল ভাল না হয়, যদি ফসল উঠিতে বিলম্বই হইয়া পড়ে! অথচ সহস্র অনশন-ক্লিষ্টের করুণ আর্ত্তনাদ, মরণোন্মুখের শেষ অশ্রু, মৃতের কোটরগত চক্ষু ও কুক্ষিগত দেহ—যাহা লইয়া তখন শৃগালে-কুকুরে মানুষে-মানুষে টানাটানি কাড়াকাড়ি করিতেছিল—যে দুর্দ্দশার কাহিনী লিখিতে বসিয়া রেসিডেণ্ট সাহেব বলিয়াছিলেন যে উহার বর্ণনা মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব—এই সমুদয় প্রত্যক্ষ করিয়াও মুর্শিদাবাদের কর্ত্তাদিগের হৃদয় দ্রব হয় নাই। তাঁহারা ঢাকা হইতে যে চাউল আনাইয়াছিলেন তাহা কোম্পানীর পল্টন হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্র দাসদাসী পর্য্যন্ত—এমন কি যাহারাই কোম্পানীর মুখাপেক্ষী বলিয়া পরিগণিত ছিল তাহারা সকলেই টাকায় ১৫ সের দরে ক্রয় করিতে পাইয়াছিল! কিন্তু রামধন ও নবারক সে সুবিধা পায় নাই! তাহারা যে কোম্পানী বাহাদুরের দাসদাসী অথবা একান্ত মুখাপেক্ষী ছিল না—তাহারা যে পুত্র-কন্যা বিক্রয় করিয়াও কোম্পানীর রাজস্ব যোগাইয়া ছিল! *

ইতিপূর্ব্বেই দেশে রোগ দেখা দিয়াছিল। বসন্তের প্রকোপে গ্রামের পর গ্রাম উৎসন্ন যাইতে লাগিল; যাহার গৃহে একজনকে ধরিল তাহার আর কেহ বাঁচিল না। মুতাক্ষরীণে দেখিতে পাই—"দুর্ভিক্ষ এবং রোগ একই সময়ে এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে তিন মাসের মধ্যেই সহস্র সহস্র ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। কতগ্রাম, এমন কি কত নগর পর্য্যন্ত যে ধ্বংস হইয়াছিল তাহার সীমা নাই।"†

এ মহা শ্মশানে তবে রামধন ও নবারক থাকিল কেন? কোম্পানী বাহাদুরের জন্য—কোম্পানীর রাজস্ব পরিশোধ করিবার জন্য—মহম্মদ রেজা খাঁ, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ ও রাজা দেবী-সিংহের জন্য!

ইংরাজ বাহাদুর বণিকের জাতি। বাঙলার এই ঘোর দুর্দ্দিনেও কোম্পানী বাহাদুর মালদহের বস্ত্র ব্যবসায়ের লোভ ত্যাগ করিতে পারেন নাই। কোম্পানী বাহাদুরের অর্থ ছিল তাহা সত্য, কিন্তু মালদহের শিল্পীকুল প্রায় মরিয়া ফৌত হইয়াছিল। যাহারা জীবিত ছিল, তাহারাও নিতান্ত ক্লিষ্ট রুগ্ন ও শক্তিহীন হইয়াছিল। মালদহের রেসিডেণ্ট বাহাদুর তাই কলিকাতায় জানাইয়াছিলেন—'এবারকার মরসুমে মোট চল্লিশ সহস্র খণ্ডের অধিক বস্ত্র পাওয়া যাইবে না।' কলিকাতার বোর্ড এ সংবাদে হতাশ হইয়াছিলেন বটে কিন্তু রেসিডেণ্ট সাহেবের পৃষ্ঠদেশে হস্তামর্ষণ-

* A quantity of rice directed by the President & Council to be purchased in Dacca District has been received there & distributed to the Hon'ble Company's troops, the servants of the Factory and in general all dependants of the English, at 15 seers per Rupee. Ten or twelve thousand maunds still remain which, I imagine, will enable you to continue the distribution as long as the delay in gathering in the present harvest may render it necessary.

Proceedings of Provincial Council at Moorshedabad 27th Sept: 1770

† Mutaqhurin—vol. III.

পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন—'তা'ত ঠিকই, কিন্তু আমরা তোমার কর্ম্মকুশলতা এবং দক্ষতার উপরেই নির্ভর করিয়া আছি।'* ধন্য সেই জাতি, যে জাতি শূন্য ভাণ্ড হইতেও মধু সংগ্রহ করিতে চাহে! কোম্পানী বাহাদুরের দূতগণ রেশমের দাদন দিবার জন্য রঙ্গপুর, কুমারখালী, বোয়ালিয়া জঙ্গীপুর প্রভৃতি স্থানের আড়ং সমূহে গমন করিয়াছিল। তাহারা সকলেই সংবাদ দিল—কার্ত্তিক অগ্রহায়ণের বন্দে পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে পরিমাণ রেশম পাওয়া যাইত, এবার তাহার অর্দ্ধেকও মিলিবে না!'†

শ্রী—

সদুপায়।

বরিশালের কোনো একস্থান হইতে বিশ্বস্তসূত্রে খবর পাইলাম যে, যদিও আজকাল করকচ লবণ বিলাতী লবণের চেয়ে শস্তা হইয়াছে তবু আমাদের সংবাদদাতার পরিচিত মুসলমানগণ অধিক দাম দিয়াও বিলাতী লবণ খাইতেছে। তিনি বলেন যে সেখানকার মুসলমানগণ আজকাল সুবিধা বিচার করিয়া বিলাতী কাপড় বা লবণ ব্যবহার করে না। তাহারা নিতান্তই জেদ করিয়া করে।

অনেকস্থলে নমশূদ্রদের মধ্যেও এইরূপ ঘটনার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

আমরা পার্টিশন ব্যাপারে বিরক্ত হইয়া একদিন দেশকে বিলাতি কাপড় ছাড়াইব ইহাই পণ করিয়াছিলাম, ইহা অপেক্ষা বড় কথা এবং দূরের কথা আমরা ভাবি নাই।

যদি জিজ্ঞাসা কর ইহা অপেক্ষা বড় কথাটা কি তবে আমি এই উত্তর দিব যে—বাংলাদেশকে দুইভাগ করার দ্বারা যে আশঙ্কার কারণ ঘটিয়াছে সেই কারণটাকেই দূর করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করা—রাগপ্রকাশ করাটা তাহার কাছে গৌণ।

পার্টিশনে আমাদের প্রধান আশঙ্কার কারণ কি? সে কথা আমরা নিজেরা অনেকবার আলোচনা করিয়াছি। এমন কি, আমাদের মনে এই ধারণা আছে যে, সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই কর্ত্তৃপক্ষ বাংলাকে পূর্ব্ব ও অপূর্ব্ব এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়া বঙ্গকে ব্যঙ্গ অর্থাৎ বিকলাঙ্গ করিয়াছেন।

বাংলাদেশের পূর্ব্বভাগে মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। ধর্ম্মগত ও সমাজগত কারণে মুসলমানের মধ্যে হিন্দুর চেয়ে ঐক্য বেশি—সুতরাং শক্তির প্রধান উপকরণ তাহাদের মধ্যে নিহিত হইয়া আছে। এই মুসলমান অংশ, ভাষা সাহিত্য শিক্ষা প্রভৃতির

* Bengal Public consultation : 19th Sept, 1770.

† Letter from the Chief & Council at Cossimbazar to Richard Becker Esq., Chief & Council of Revenue at Moorshedabad : 14th Dec, 1770.

একত্ববশতঃ হিন্দুদের সঙ্গে অনেকগুলি বন্ধনে বদ্ধ আছে। যদি বাংলাকে হিন্দুপ্রধান ও মুসলমানপ্রধান এই দুই অংশে একবার ভাগ করা যায়, তবে ক্রমে ক্রমে হিন্দু মুসলমানের সকল বন্ধনই শিথিল করিয়া দেওয়া সহজ হয়।

ম্যাপে দাগ টানিয়া হিন্দুর সঙ্গে হিন্দুকে পৃথক করিয়া দেওয়া কঠিন। কারণ বাঙালী হিন্দুর মধ্যে সামাজিক ঐক্য আছে। কিন্তু মুসলমান ও হিন্দুর মাঝখানে একটা ভেদ রহিয়া গেছে। সেই ভেদটা যে কতখানি তাহা উভয়ে পরস্পর কাছাকাছি আছে বলিয়াই প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করা যায় নাই;—দুই পক্ষে একরকম করিয়া মিলিয়া ছিলাম।

কিন্তু যে ভেদটা আছে রাজা যদি চেষ্টা করিয়া সেই ভেদটাকে বড় করিতে চান এবং দুই পক্ষকে যথাসম্ভব স্বতন্ত্র করিয়া তোলেন তবে কালক্রমে হিন্দুমুসলমানের দূরত্ব এবং পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষাবিদ্বেষের তীব্রতা বাড়িয়া চলিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

আসল কথা, আমাদের দুর্ভাগ্য-দেশে ভেদ জন্মাইয়া দেওয়া কিছুতেই শক্ত নহে, মিলন ঘটাইয়া তোলাই কঠিন। বেহারীগণ বাঙালীর প্রতিবেশী এবং বাঙালী অনেক দিন হইতেই বেহারীগণের সঙ্গে কারবার করিতেছে কিন্তু বাঙালীর সঙ্গে বেহারীর সৌহৃদ্য নাই সে কথা বেহারীবাসী বাঙালী-মাত্রেই জানেন। শিক্ষিত উড়িয়াগণ বাঙালী হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলিয়া দাঁড় করাইতে উৎসুক এবং আসামীদেরও সেইরূপ অবস্থা। অতএব উড়িষ্যা আসাম বেহার ও বাংলা জড়াইয়া আমরা যে দেশকে বহুদিন হইতে বাংলা দেশ বলিয়া জানিয়া আসিয়াছি তাহার সমস্ত অধিবাসী আপনাদিগকে বাঙালী বলিয়া কখনো স্বীকার করে নাই এবং বাঙালীও বেহারী উড়িয়া এবং আসামীকে আপন করিয়া লইতে কখনো চেষ্টামাত্র করে নাই বরঞ্চ তাহাদিগকে নিজেদের অপেক্ষা হীন মনে করিয়া অবজ্ঞাদ্বারা পীড়িত করিয়াছে।

অতএব বাংলাদেশের যে অংশের লোকেরা আপনাদিগকে বাঙালী বলিয়া জানে সে অংশটি খুব বড় নহে এবং তাহার মধ্যেও যে ভূভাগ ফলে শস্যে উর্ব্বর, ধনে ধান্যে পূর্ণ, সেখানকার অধিবাসীর শরীরে বল আছে, মনে তেজ আছে, ম্যালেরিয়া এবং দুর্ভিক্ষ যাহাদের প্রাণের সারভাগ শুষিয়া লয় নাই সেই অংশটিই মুসলমানপ্রধান—সেখানে মুসলমান সংখ্যা বৎসরে বৎসরে বাড়িয়া চলিয়াছে, হিন্দু বিরল হইয়া পড়িতেছে।

এমন অবস্থায় এই বাঙালীর বাংলাটুকুকেও এমন করিয়া যদি ভাগ করা যায় যাহাতে মুসলমান-বাংলা ও হিন্দু-বাংলাকে মোটামুটি স্বতন্ত্র করিয়া ফেলা যায় তাহা হইলে বাংলা দেশের মত এমন খণ্ডিত দেশ ভারতবর্ষে আর একটিও থাকিবে না।

এমন স্থলে বঙ্গবিভাগের জন্য আমরা ইংরেজরাজের প্রতি যতই রাগ করি না কেন এবং সেই ক্ষোভ প্রকাশ করিবার জন্য বিলাতী বর্জ্জন আমাদের পক্ষে যতই একান্ত আবশ্যক হোক্ না, তাহার চেয়ে বড় আবশ্যক আমাদের পক্ষে কি ছিল? না, রাজকৃত বিভাগের দ্বারা আমাদের মধ্যে যাতে বিভাগ না ঘটে নিজের চেষ্টায় তাহারই সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা করা।

সেদিকে দৃষ্টি না করিয়া আমরা বয়কট্ ব্যাপারটাকেই এত একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া

ধরিয়া লইয়াছিলাম, যে কোনো প্রকারেই হোক্ বয়কট্‌কে জয়ী করিয়া তোলাতেই আমাদের সমস্ত জেদ এত বেশিমাত্রায় চড়িয়া গিয়াছিল যে, বঙ্গবিভাগের যে পরিণাম আশঙ্কা করিয়া পার্টিশনকে আমরা বিভীষিকা বলিয়া জানিয়াছিলাম সেই পরিণামকেই অগ্রসর হইতে আমরা সহায়তা করিলাম।

আমরা ধৈর্য্য হারাইয়া, সাধারণের ইচ্ছা অনিচ্ছা সুবিধা অসুবিধা বিচারমাত্র না করিয়া বিলাতী লবণ ও কাপড়ের বহিষ্কারসাধনের কাছে আর কোনো ভালমন্দকে গণ্য করিতে ইচ্ছাই করিলাম না। ক্রমশ লোকের সম্মতিকে জয় করিয়া লইবার বিলম্ব আমরা সহিতে পারিলাম না, ইংরেজকে হাতে হাতে তাহার কর্ম্মফল দেখাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম।

এই উপলক্ষে আমরা দেশের নিম্নশ্রেণীর প্রজাগণের ইচ্ছা ও সুবিধাকে দলন করিবার আয়োজন করিয়াছিলাম সে কথা স্বীকার করিতে আমাদের ভাল লাগে না কিন্তু কথাটাকে মিথ্যা বলিতে পারি না।

তাহার ফল এই হইয়াছে, বাসনার অত্যুগ্রতা দ্বারা আমরা নিজের চেষ্টাতেই দেশের এক দলকে আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইয়াছি। তাহাদিগকে আমাদের মনের মত কাপড় পরাইতে কতদূর পারিলাম তাহা জানি না কিন্তু তাহাদের মন খোয়াইলাম। ইংরেজের শত্রুতাসাধনে কতটুকু কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না, দেশের মধ্যে শত্রুতাকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছি তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

এবার এতকাল পরে আমাদের বক্তারা ইংরেজি সভার উচ্চমঞ্চ ছাড়িয়া দেশের সাধারণ লোকের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। দেশের লোকের মনে একটা প্রশ্ন উদয় হইল—একি ব্যাপার, হঠাৎ আমাদের জন্য বাবুদের এত মাথাব্যথা হইল কেন?

বস্তুতই তাহাদের জন্য আমাদের মাথাব্যথা পূর্ব্বেও অত্যন্ত বেশি ছিল না, এখনো একমুহূর্ত্তে অত্যন্ত বেশি হইয়া উঠে নাই। আমরা এই কথা মনে লইয়া তাহাদের কাছে যাই নাই যে "দেশী কাপড় পরিলে তোমাদের মঙ্গল হইবে এই জন্যই আমাদের দিনে আহার নাই এবং রাত্রে নিদ্রার অবকাশ ঘটিতেছে না।" আমরা এই বলিয়াই গিয়াছিলাম যে, ইংরেজকে জব্দ করিতে চাই কিন্তু তোমরা আমাদের সঙ্গে যোগ না দিলে বয়কট সম্পূর্ণ হইবে না অতএব ক্ষতি স্বীকার করিয়াও তোমাদিগকে দেশী কাপড় পরিতে হইবে।"

কখনো যাহাদের মঙ্গল চিন্তা ও মঙ্গল চেষ্টা করি নাই, যাহাদিগকে আপনলোক বলিয়া কখনো কাছে টানি নাই, যাহাদিগকে বরাবর অশ্রদ্ধাই করিয়াছি, ক্ষতি স্বীকার করাইবার বেলা তাহাদিগকে ভাই বলিয়া ডাক পাড়িলে মনের সঙ্গে তাহাদের সাড়া পাওয়া সম্ভবপর হয় না।

সাড়া যখন না পাই তখন রাগ হয়। মনে এই হয় যে, কোনোদিন যাহাদিগকে গ্রাহ্যমাত্র করি নাই আজ তাহাদিগকে এত আদর করিয়াও বশ করিতে পারিলাম না! উল্টা ইহাদের গুমর বাড়িয়া যাইতেছে।

যাহারা উপরে থাকে, যাহারা নিজেদিগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানে, নীচের লোকদের সম্বন্ধে তাহাদের এইরূপ অধৈর্য্য ঘটে। অশ্রদ্ধাবশতই

মানব প্রকৃতির সঙ্গে তাহাদের অপরিচয় জন্মে। ইংরেজও ঠিক এই কারণবশতই আমাদের দ্বারা তাহার কোনো অভিপ্রায়সাধনের ব্যাঘাত ঘটিলেই কার্য্যকারণ বিচার না করিয়া একেবারে রাগিয়া উঠে;—আমরা যখন নীচে আছি তখন উপরওয়ালার ইচ্ছা আমাদের ইচ্ছা দ্বারা অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণে বাধা পাইলেও সেটাকে অবিমিশ্র স্পর্দ্ধা বলিয়া মনে হয়।

ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে আমাদের বক্তারা যখন মুসলমান কৃষিসম্প্রদায়ের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারেন নাই তখন তাঁহারা অত্যন্ত রাগ করিয়াছিলেন। এ কথা তাঁহারা মনেও চিন্তা করেন নাই যে আমরা, যে মুসলমানদের অথবা আমাদের দেশের জনসাধারণের যথার্থ হিতৈষী তাহার কোন প্রমাণ কোন দিন দিই নাই অতএব হঠাৎ আমরা যখন তাহাদিগকে বেশি দামে বেশী কাপড় পরিতে বলিলাম তখন যদি তাহারা আমাদের হিতৈষিতায় সন্দেহ বোধ করে তবে তাহাদিগকে দোষী করা যায় না। ভাইয়ের জন্য ভাই ক্ষতি স্বীকার করিয়া থাকে বটে কিন্তু ভাই বলিয়া একজন থামকা আসিয়া দাঁড়াইলে যে অমনি তখনি কেহ তাহাকে ঘরের অংশ ছাড়িয়া দেয় এমনতর ঘটে না। আমরা যে দেশের সাধারণ লোকের ভাই তাহা দেশের সাধারণ লোকে জানে না এবং আমাদের মনের মধ্যেও যে তাহাদের প্রতি ভ্রাতৃভাব অত্যন্ত জাগরূক আমাদের ব্যবহারে এখনো তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি সত্য কথাটা এই যে, ইংরেজের উপরে রাগ করিয়াই আমরা দেশের লোকের কাছে ছুটিয়াছিলাম, দেশের লোকের প্রতি ভালবাসা বশতই যে গিয়াছিলাম তাহা নহে। এমন অবস্থায় "ভাই" শব্দটা আমাদের কণ্ঠে ঠিক বিশুদ্ধ কোমল সুরে বাজে না—যে কড়ি সুরটা আর সমস্ত স্বরগ্রাম ছাপাইয়া কাণে আসিয়া বাজে সেটা অন্যের প্রতি বিদ্বেষ।

আমরা দেশের শিক্ষিত লোকেরা জন্মভূমিকে লক্ষ্য করিয়া মা শব্দটাকে ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছি। এই শব্দের দ্বারা আমাদের হৃদয়াবেগ এতই জাগিয়া উঠে যে, আমরা মনে করিতে পারি না দেশের মধ্যে মাকে আমরা সত্য করিয়া তুলি নাই। আমরা মনে করি কেবল গানের দ্বারা কেবল ভাবোন্মাদের দ্বারা মা সমস্ত দেশের মধ্যে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছেন। এই জন্য দেশের সাধারণ গণসমাজ যদি স্বদেশের মধ্যে মাকে অনুভব না করে তবে আমরা অধৈর্য্য হইয়া মনে করি সেটা হয় তাহাদের ইচ্ছাকৃত অন্ধতার ভাব, নয় আমাদের শত্রুপক্ষ তাহাদিগকে মাতৃবিদ্রোহে উত্তেজিত করিয়াছে। কিন্তু আমরাই যে মাকে দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করি নাই এই অপরাধটা আমরা কোনমতেই নিজের স্কন্ধে লইতে রাজি নহি।

ইহার ফল এই হইয়াছে, যাহারা আমাদের সঙ্গে স্বাভাবিক কারণেই যোগ দিতে পারে নাই, যাহারা বরাবর যে পথে চলিয়া আসিতেছিল সেই চিরাভ্যস্ত পথ হইতে হঠাৎ ইংরাজিপড়া বাবুদের কথায় সরিতে ইচ্ছা করিল না আমরা যথাসাধ্য তাহাদের প্রতি বলপ্রয়োগ করিয়াছি, তাহাদিগকে পরাস্ত করিবার জন্য আমাদের জেদ বাড়িয়া গিয়াছে। আমরা নিজেকে এই

বলিয়া বুঝাইয়াছি যাহারা আত্মহিত বুঝে না, বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে আত্মহিতে প্রবৃত্ত করাইব।

আমাদের দুর্ভাগ্যই এই, আমরা স্বাধীনতা চাই কিন্তু স্বাধীনতাকে আমরা অন্তরের সহিত বিশ্বাস করি না। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি শ্রদ্ধা রাখিবার মত ধৈর্য্য আমাদের নাই ;—আমরা ভয় দেখাইয়া তাহার বুদ্ধিকে দ্রুতবেগে পদানত করিবার জন্য চেষ্টা করি। পিতৃ-পুরুষকে নরকস্থ করিবার ভয়, ধোবা নাপিত বন্ধ করিবার শাসন, ঘরে অগ্নিপ্রয়োগ বা পথের মধ্যে ধরিয়া ঠেঙাইয়া দিবার বিভীষিকা, এ সমস্তই দাসবৃত্তিকে অন্তরের মধ্যে চিরস্থায়ী করিয়া দিবার উপায় ;—কাজ ফাঁকি দিবার জন্য পথ বাঁচাইবার জন্য আমরা যখনি এই সকল উপায় অবলম্বন করি তখনি প্রমাণ হয়, বুদ্ধির ও আচরণের স্বাধীনতা যে মানুষের পক্ষে কি অমূল্য ধন তাহা আমরা জানিনা। আমরা মনে করি আমার মতে সকলকে চালানই সকলের পক্ষে চরম শ্রেয় অতএব সকলে যদি না চলে তবে ভুল বুঝাইয়াও চালাইতে হইবে অথবা চালনার সকলের চেয়ে সহজ উপায় আছে জবরদস্তি।

বয়কটের জেদে পড়িয়া আমরা এই সকল সংক্ষিপ্ত উপায় অবলম্বন করিয়া হিতবুদ্ধির মূলে আঘাত করিয়াছি তাহাতে সন্দেহ নাই। অল্পদিন হইল মফঃস্বল হইতে পত্র পাইয়াছি সেখানকার কোন একটি বড় বাজারের লোকে নোটিশ পাইয়াছে যে যদি তাহারা বিলাতী জিনিষ পরিত্যাগ করিয়া দেশী জিনিষের আমদানী না করে তবে নির্দ্দিষ্ট কালের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলেই বাজারে আগুন লাগিবে। সেই সঙ্গে স্থানীয় ও নিকটবর্ত্তী জমিদারের আমলাদিগকে প্রাণহানির ভয় দেখানো হইয়াছে।

এইরূপভাবে নোটিশ দিয়া কোথাও কোথাও আগুন লাগানো হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে জোর করিয়া মাল আমদানি বন্ধ করিবার চেষ্টা হইয়াছে এবং খরিদদারদিগকে বলপূর্ব্বক বিলাতী জিনিষ খরিদ করিতে নিরস্ত করা হইয়াছে। ক্রমে এখন সেই উৎসাহ ঘরে আগুন লাগানো এবং মানুষ মারাতে গিয়া পৌঁছিয়াছে।

দুঃখের বিষয় এই যে, এইরূপ উৎপাতকে আমাদের দেশের অনেক ভদ্রলোক আজও অন্যায় বলিয়া মনে করিতেছেন না—তাঁহারা স্থির করিয়াছেন দেশের হিতসাধনের উপলক্ষ্যে এরূপ উপদ্রব করা যাইতে পারে।

ইঁহাদের নিকট ন্যায়ধর্ম্মের দোহাই পাড়া মিথ্যা ;—ইঁহারা বলেন মাতৃভূমির মঙ্গলের জন্য যাহা করা যাইবে তাহা অধর্ম্ম হইতে পারে না। কিন্তু অধর্ম্মের দ্বারা যে মাতৃভূমির মঙ্গল কখনই হইবে না সে কথা বিমুখ বুদ্ধির কাছেও বারবার বলিতে হইবে।

জিজ্ঞাসা করি, বাজারে আগুন লাগাইয়া অথবা অনিচ্ছুক লোকের মাথা ভাঙিয়া যদি আমরা বিলাতী কাপড় ছাড়াইয়া একদল লোককে দেশী কাপড় ধরাই তবে বাহিরে মাত্র দেশী কাপড় পরাইয়া ইঁহাদের সমস্ত অন্তঃকরণকে কি স্বদেশীর বিরুদ্ধে চিরদিনের জন্য বিদ্রোহী করিয়া তুলি না? দেশের যে সম্প্রদায়ের লোক স্বদেশী প্রচারের ব্রত লইয়াছেন তাঁহাদের প্রতি এই সকল লোকের বিদ্বেষকে কি চিরস্থায়ী করা হয় না?

এইরূপ ঘটনাই কি ঘটিতেছে না; "যাহারা কখনো বিপদে আপদে সুখে দুখে আমাদিগকে স্নেহ করে নাই, আমাদিগকে যাহারা সামাজিক ব্যবহারে পশুর অপেক্ষা অধিক ঘৃণা করে তাহারা আজ কাপড় পরানো বা অন্য যে কোনো উপলক্ষ্যে আমাদের প্রতি জবরদস্তি প্রকাশ করিবে, ইহা আমরা সহ্য করিব না" দেশের নিম্নশ্রেণীর মুসলমান এবং নমশূদ্রের মধ্যে এইরূপ অসহিষ্ণুতা জাগিয়া উঠিয়াছে। ইহারা জোর করিয়া, এমন কি, ক্ষতি স্বীকার করিয়াও বিলাতী সামগ্রী ব্যবহার করিতেছে।

তাই বলিতেছি, বিলাতী দ্রব্য ব্যবহারই দেশের চরম অহিত নহে, গৃহবিচ্ছেদের মত এত বড় অহিত আর কিছুই নাই। দেশের একপক্ষ প্রবল হইয়া কেবলমাত্র জোরের দ্বারা অপর ক্ষীণ পক্ষকে নিজের মত-শৃঙ্খলে দাসের মত পশুর মত আবদ্ধ করিবে ইহার মত ইষ্টহানিও আর কিছু হইতে পারে না। এমন করিয়া, বন্দে মাতরম্ মন্ত্র উচ্চারণ করিলেও মাতার বন্দনা করা হইবে না—এবং দেশের লোককে মুখে ভাই বলিয়া কাজে ভ্রাতৃদ্রোহিতা করা হইবে। সবলে গলা টিপিয়া ধরিয়া মিলনকে মিলন বলে না,—ভয় দেখাইয়া, এমন কি, কাগজে কুৎসিত গালি দিয়া মতের অনৈক্য নিরস্ত করাকেও জাতীয় ঐক্য সাধন বলে না।

এ সকল প্রণালী দাসত্বেরই প্রণালী। যাহারা এইরূপ উপদ্রবকে দেশহিতের উপায় বলিয়া প্রচার করে তাহারা স্বজাতির লজ্জাকর হীনতারই পরিচয় দেয় এবং এইপ্রকার উৎপাত করিয়া যাহাদিগকে দলন দমন করিয়া দেওয়া যায় তাহাদিগকেও হীনতাতেই দীক্ষা দেওয়া হয়।

সেদিন কাগজে দেখিতেছিলাম, মর্লিকে যখন বলা হইয়াছিল যে প্রাচ্যগণ কোনো প্রকার আপোশে অধিকার প্রাপ্তির মূল্য বোঝে না—তাহারা জোরকেই মানে—তখন তিনি বলিয়াছিলেন, তাহা হইতে পারে কিন্তু আমরা ত প্রাচ্য নই আমরা পাশ্চাত্য।

কথাটা শুনিয়া মনের মধ্যে আক্ষেপ বোধ হইয়াছিল। আক্ষেপের কারণ এই যে আমাদের ব্যবহারে আমরা প্রাচ্যদের বিরুদ্ধে এই গুরুতর অপবাদের সমর্থন করিয়া থাকি। অন্যকে জোরের দ্বারা অভিভূত করিয়া চালনা করিব এই অতি হীনবুদ্ধিকে আমরা কিছুতে ছাড়িতে চাহি না। যেখানে আমরা মুখে স্বাধীনতাকে চাই সেখানেও আমারা নিজের কর্তৃত্ব অন্যের প্রতি অবৈধ বলের সহিত খাটাইবার প্রবৃত্তিকে খর্ব্ব করিতে পারি না। উহার প্রতি জোর না খাটাইলে উহার মঙ্গল হইবে না অতএব যেমন করিয়া পারি আমাকে কর্ত্তা হইতে হইবে। হিতানুষ্ঠানের উপায়ের দ্বারাও আমরা মানুষের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করি এবং এই প্রকার অশ্রদ্ধার ঔদ্ধত্য দ্বারা আমরা নিজের এবং অন্য পক্ষের মনুষ্যত্বকে নষ্ট করিতে থাকি।

যদি মানুষের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা থাকে তবে লোকের ঘরে আগুন লাগানো এবং মারধোর করিয়া গুণ্ডামি করিতে আমাদের কদাচই প্রবৃত্তি হইবে না; তবে আমরা পরম ধৈর্য্যের সহিত মানুষের বুদ্ধিকে হৃদয়কে, মানুষের ইচ্ছাকে মঙ্গলের দিকে ধর্ম্মের দিকে আকর্ষণ করিতে প্রাণপাত করিতে পারিব। তখন আমরা মানুষকেই চাহিব, মানুষ কি কাপড় পরিবে বা কি নুন খাইবে তাহাকেই

সকলের চেয়ে বড় করিয়া চাহিব না। মানুষকে চাহিলে মানুষের সেবা করিতে হয়, পরস্পরের ব্যবধান দূর করিতে হয়—নিজেকে নম্র করিতে হয়। মানুষকে যদি চাই তবে যথার্থভাবে মানুষের সাধনা করিতে হইবে; তাহাকে কোনো মতে আমার মতে ভিড়াইবার, আমার দলে টানিবার জন্য টানাটানি মারামারি না করিয়া আমাকে তাহার কাছে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। সে যখন বুঝিবে আমি তাহাকে আমার অনুবর্ত্তী অধীন করিবার জন্য বলপূর্ব্বক চেষ্টা করিতেছিনা—আমি নিজেকে তাহারই মঙ্গল সাধনের জন্য উৎসর্গ করিয়াছি তখনি সে বুঝিবে আমি মানুষের সঙ্গে মনুষ্যোচিত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছি—তখনি সে বুঝিবে বন্দে মাতরম্ মন্ত্রের দ্বারা আমরা সেই মাকে বন্দনা করিতেছি দেশের ছোটবড় সকলেই যাঁহার সন্তান। তখন মুসলমানই কি আর নমশূদ্রই কি, বেহারী উড়িয়া অথবা অন্য যে কোনো ইংরাজি শিক্ষায় পশ্চাদ্বর্ত্তী জাতিই কি, নিজের শ্রেষ্ঠতার অভিমান লইয়া কাহাকেও ব্যবহারে বা বাক্যে বা চিন্তায় অপমানিত করিব না। তখনি সকল মানুষের সেবা ও সম্মানের দ্বারা, যিনি সকল প্রজার প্রজাপতি, তাঁহার প্রসন্নতা এই ভাগ্যহীন দেশের প্রতি আকর্ষণ করিতে পারিব। নতুবা, আমার রাগ হইয়াছে বলিয়াই দেশের সকল লোককে আমি রাগাইয়া তুলিব, অথবা আমি ইচ্ছা করিতেছি বলিয়া দেশের সকল লোকের ইচ্ছাকে আমার অনুগত করিব ইহা কোনো বাগ্মিতার দ্বারা কদাচ ঘটিবে না। ক্ষণকালের জন্য একটা উৎসাহের উত্তাপ জাগাইয়া তুলিতে পারি কিন্তু তাহা সত্যকার ইন্ধনের অভাবে কখনই স্থায়ী হইতে পারিবে না। সেই সত্য পদার্থ মানুষ—সেই সত্য পদার্থ মানুষের হৃদয় বুদ্ধি মানুষের মনুষ্যত্ব, স্বদেশী মিলের কাপড় অথবা করকচ লবণ নহে। সেই মানুষকে প্রত্যহ অপমানিত করিয়া মিলের কাপড়ের পূজা করিতে থাকিলে আমরা দেবতার বর পাইব না। বরঞ্চ উল্টা ফলই পাইতে থাকিব।

একটি কথা আমরা কখনো ভুলিলে চলিবে না যে, অন্যায়ের দ্বারা, অবৈধ উপায়ের দ্বারা কার্য্যোদ্ধারের নীতি অবলম্বন করিলে কাজ আমরা অল্পই পাই অথচ তাহাতে করিয়া সমস্ত দেশের বিচারবুদ্ধি বিকৃত হইয়া যায়। তখন কে কাহাকে কিসের দোহাই দিয়া কোন্ সীমার মধ্যে সংযত করিবে? দেশহিতের নাম করিয়া যদি মিথ্যাকেও পবিত্র করিয়া লই এবং অন্যায়কেও ন্যায়ের আসনে বসাই তবে কাহাকে কোন্‌খানে ঠেকাইব? শিশুও যদি দেশের হিতাহিত সম্বন্ধে বিচারক হইয়া উঠে এবং উন্মত্তও যদি দেশের উন্নতিসাধনের ভারগ্রহণ করে তবে সেই উচ্ছৃঙ্খলতা সংক্রামক হইতে থাকিবে, মহামারীর ব্যাপ্তির মত তাহাকে রোধ করা কঠিন হইবে। তখন দেশহিতৈষীর ভয়ঙ্কর হস্ত হইতে দেশকে রক্ষা করাই আমাদের পক্ষে সকলের চেয়ে দুঃখকর সমস্যা হইয়া পড়িবে। দুর্ব্বুদ্ধি স্বভাবতই কোনো বন্ধন স্বীকার করে না; বৃহৎভাবে সকলের সহিত যুক্ত হইয়া বৃহৎ কাজ করিতে সে সহজেই অক্ষম। দুঃস্বপ্ন যেমন দেখিতে দেখিতে অসঙ্গত অসংলগ্নভাবে এক বিভীষিকা হইতে আর এক বিভীষিকায় লাফ দিয়া চলিতে থাকে তেমনি মঙ্গলবুদ্ধির অরাজকতার দিনে নিতান্তই সামান্য কারণে চন্দননগরের

মেয়রকে হত্যা করিবার আয়োজন হয়, কোথাও কিছু নাই হঠাৎ কুষ্টিয়ার নিতান্ত নিরপরাধ পাদ্রির পৃষ্ঠে গুলি বর্ষিত হয়, কেন যে ট্রামগাড়ির প্রতি সাংঘাতিক আক্রমণের উদ্যোগ হয় তাহা কিছুই বুঝিতে পারা যায় না; বিভীষিকা অত্যন্ত তুচ্ছ উপলক্ষ্য অবলম্বন করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে, এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন মত্ততা মাতৃভূমির হৃৎপিণ্ডকেই বিদীর্ণ করিয়া দেয়। এইরূপ ধর্ম্মহীন ব্যাপারে প্রণালীর ঐক্য থাকে না, প্রয়োজনের গুরুলঘুতা বিচার চলিয়া যায়, উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে সুসঙ্গতি স্থান পায় না, একটা উদ্‌ভ্রান্ত দুঃসাহসিকতাই লোকের কল্পনাকে উত্তেজিত করিয়া তুলে। অন্ত বারবার দেশকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে যে অধ্যবসায়ই শক্তি এবং অধৈর্য্যই দুর্ব্বলতা; প্রশস্ত ধর্ম্মের পথে চলাই নিজের শক্তির প্রতি সম্মান এবং উৎপাতের সংকীর্ণ পথ সন্ধান করাই কাপুরুষতা, তাহাই মানবের প্রকৃত শক্তির প্রতি অশ্রদ্ধা, মানবের মনুষ্যধর্ম্মের প্রতি অবিশ্বাস। অসংযম নিজেকে প্রবল বলিয়া অহঙ্কার করে; কিন্তু তাহার প্রবলতা কিসে? সে কেবল আমাদের যথার্থ অন্তরতর বলের সম্বলকে অপহরণ করিবার বেলায়। এই বিকৃতিকে যে-কোনো উদ্দেশ্যসাধনের জন্যই একবার প্রশ্রয় দিলে সয়তানের কাছে মাথা বিকাইয়া রাখা হয়। প্রেমের কাজে, সৃজনের কাজে পালনের কাজেই যথার্থভাবে আমাদের সমস্ত শক্তির বিকাশ ঘটে; কোনো একটা দিকে আমরা মঙ্গলের পথ নিজের শক্তিতে একটুমাত্র কাটিয়া দিলেই তাহা অভাবনীয়রূপে শাখায় প্রশাখায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে;—একটা কিছুকে গড়িয়া তুলিলে কতকটা কৃতকার্য্য হইবামাত্র সেই আনন্দে আমাদের শক্তি অচিন্তনীয়রূপে নবনব সৃষ্টিদ্বারা নিজেকে চরিতার্থ করিতে থাকে। এই মিলনের পথ, সৃজনের পথই ধর্ম্মের পথ। কিন্তু ধর্ম্মের পথ দুর্গম—দুর্গংপথস্তৎকবয়ো বদন্তি। এই পথেই আমাদের সমস্ত পৌরুষের প্রয়োজন, ইহার পাথেয় সংগ্রহ করিতেই আমাদের সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে হইবে; ইহার পারিতোষিক অহংকার তৃপ্তিতে নহে অহংকার বিসর্জ্জনে; ইহার সফলতা অন্যকে পরাস্ত করিয়া নহে, নিজেকে পরিপূর্ণ করিয়া।*

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মৃত্যু।

হে নিশ্চিত, হে অজ্ঞাত, হে সুহৃৎ, জানি
তুমি পুরাতন।
তোমার নিবিড় প্রেম কোন্ রহস্যের মাঝে
রেখেছ গোপন?
তোমার মঙ্গলমূর্ত্তি সে কি দেখা দিবে শুধু
বিভীষিকা ধরি?

---

* এই প্রবন্ধটি ভারতী সম্পাদিকা মহাশয়া বঙ্গদর্শনে প্রকাশের অনুমতি দেওয়ায় আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম। বঃ সঃ।

মর্ম্মে মর্ম্মে ভয়-কম্প দিবে ধমনীতে মোর
রক্ত রোধ করি ?

দিবে কোন্ রূপে দেখা করি শুধু তাই ভয়,
তাই ভাবি মনে !
জীবনের দুঃখ সুখ একান্ত নির্ভরে তবে
সঁপিব কেমনে ?
তোমার অলক্ষ্য মুখে দেখিব না, শান্ত-সৌম্য
করুণা প্রকাশ ?
বরাভয় করে তব দেখিব না,—দুঃখ-দৈন্ত-
মোচন-প্রয়াস ?

একদা আসিবে তুমি, খুলে দিবে মৃত্তিকার
মিলন-বন্ধন ;
তখন কি গ্রহ, তারা, ধরণী-জননী-অঙ্ক
রবেনা স্মরণ ?
জীবনে জড়ান যত স্নেহ মমতার গ্রন্থি
হইবে শিথিল ?
তখন কি দৃষ্টিপথে নিরখিব মূর্ত্তি তব
ভ্রুকুটি-কুটিল ?

অপরিচিতের মত র'ব তব মুখ চাহি'
কম্পিত অন্তরে ?
কঠিন আদেশ তব শুনিব শ্রবণে শুধু
নির্ব্বাক্ অধরে ?
নষ্টনীড় বিহঙ্গের শূন্য পরিণাম শুধু
জাগিবে কি মনে ?
অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিরাশার মূর্ত্তি ধরি'
দাঁড়া'বে সে ক্ষণে ?

না—না—না, করুণাময়, সে পরমক্ষণে তুমি
দিবে যবে দেখা—
দেখা দিয়ো ব্যক্ত রূপে মঙ্গল-মূরতি ধরি',
মুখে শান্তি-লেখা !
স্বস্তি-বাণী উচ্চারিয়া তোমার আশীষ-স্পর্শ
দিয়ো মোর মাথে ;
তার পর, ভস্ম করি' পৃথিবীর ক্লিন্ন তনু
নিয়ো মোরে সাথে !

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।

বঙ্গদর্শন।

জাতীয় শিক্ষা।

শুভক্ষণে ভগবানের সিংহাসন টলিয়াছে, জাতীয় অভ্যুত্থানের জন্য রাজাধিরাজের অমোঘ আহ্বান আমাদের হৃদয়ে পঁহুছিয়াছে, তাই আমাদের মৃতপ্রায় নিদ্রিত জীবনে স্পন্দন আরম্ভ হইয়াছে,—স্বয়ং জগদম্বা অপার স্নেহভরে শিয়রে বসিয়া মৃতসঞ্জীবন-মধুর কর-স্পর্শে ধীরে ধীরে জড়তা বিতাড়িত করিতেছেন। জাতীয় শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা এই প্রথম স্পন্দন।

এ আহ্বান পার্থিব রাজার আদেশ পত্র নহে যে, সহি মোহর দেখিয়া চিনিলাম, আর ভাষা পড়িয়াই কর্ত্তব্য বুঝিয়া লইলাম। এ অধ্যাত্মরাজ্যের পরোয়ানা—প্রত্যাদেশ। ইহাকে আধ্যাত্মিক ভাষায়, আধ্যাত্মিক ভাবে আলোচনা করিতে হইবে, আধ্যাত্মিক পবিত্রতার সহিত আধ্যাত্মিক সাধনের প্রণালীতে বুঝিতে হইবে।

জাতীয় শিক্ষার নাম শুনিয়া অবধি প্রাণে এক অভিনব পুলক-মিশ্রিত আবেগের সঞ্চার হইয়াছে; কোন্ গ্রন্থে এ শিক্ষার তত্ত্ব জানিতে পারি, কোন্ মহাত্মা সিদ্ধপুরুষের নিকট এ শিক্ষায় দীক্ষালাভ করি, এই বলিয়া নিয়ত প্রাণের মধ্যে একটা কণ্ডুয়া, একটা অনিবার্য্য ব্যাকুলতা অনুভব করিতেছি।

প্রথমেই গ্রন্থের কথা মনে পড়া স্বাভাবিক। কেমন একটা বদভ্যাস, কেমন একটা পর-নির্ভরশীলতার রোগ আমাদের জন্মিয়া গিয়াছে যে, প্রাণের মধ্যে কোন প্রশ্নের আবির্ভাব হইলে তাহার প্রথম আঘাতেই আমরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ি, তাহার তাড়না হইতে বাঁচিবার ঔষধ নিজের আত্মার নিকট না চাহিয়া, নিজের হৃদয়োদ্যানে অন্বেষণ না করিয়া, কোন্ গ্রন্থকার এ বিষয়ে কি বলিয়াছেন, তাহাই জানিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠি। এ স্থলেও প্রথমেই 'পুঁথি পাঁজি' দেখিবার প্রবৃত্তি উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে প্রবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গেই নিবৃত্তি ও আসিয়া দেখা দিল, তাই নিরর্থক বই ঘাঁটার দায় হইতে বাঁচিয়া গেলাম, এবং মনে মনে আওড়াইলাম,

"নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।"

কাহার গ্রন্থ দেখিব—কোথায় এ গ্রন্থের অনুসন্ধান করিব? অবশ্য ইংরাজের পুস্তকালয়ে ইংরাজের গ্রন্থ। কেমন করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হয়, আমাদের সে কথা বলিয়া দিবার গ্রন্থ পর্য্যন্ত নাই; কিন্তু কেমন করিয়া নাচিতে হয়, কেমন করিয়া দাবা খেলিতে হয়,কেমন করিয়া 'বড়্শি' দিয়া মাছ-মারিতে

হয় ইংরাজ তাহাও গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিতে ভুলেন নাই। সুতরাং নূতন কিছু জানিবার সাধ হইলে সর্ব্বাগ্রে ইংরাজের গ্রন্থাগারেই চক্ষু পড়ে। কিন্তু এস্থলে দুইটি আপত্তি উপস্থিত। প্রথম, ভারতে জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজন সবে মাত্র নূতন ভাবে অনুভূত হইল; সুতরাং ইংরাজ এ বিষয়ে পুস্তক লিখিয়া রাখিয়াছেন, এ বিশ্বাস করিতে গেলে স্বীকার করিতে হইবে, 'রাম না জন্মিতে রামায়ণ' লিখিবার শক্তি ইংরাজের আছে। কিন্তু এতটা স্বীকার করিয়া-লইবার উপযুক্ত শ্রদ্ধা বা ভক্তি উপার্জ্জন করিবার এখনও অনেক বিলম্ব আছে। দ্বিতীয়, ইংরাজ রাম-জন্মের পরে যে রামায়ণ লেখেন, তাহাতেও অভ্রান্তির তুলনায় ভ্রান্তির ভাগই বেশী থাকে। ইংরাজ তাঁহার স্বদেশ এবং স্বজাতি সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহাতে ভ্রান্তির ভাগ অল্প থাকিতে পারে—অতিশয়োক্তি ছাড়া আর কোন দোষ নাও থাকিতে পারে। কিন্তু ভারতের ধর্ম্ম, ইতিহাস, সমাজ—ইংরাজ যাহাই স্পর্শ করিয়াছেন, তাহাতেই বাঘের নখ বসাইয়াছেন, সে ঘা কখনও শুকাইবে কি না ভগবান্ জানেন। প্রাচীন ভারতের ধর্ম্ম, সমাজ, ইতিহাস, সকলই প্রাচীন; সুতরাং সকলের উপরেই দীর্ঘকালে কিছু না কিছু আবর্জ্জনা জন্মিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইংরাজ যেখানে এক গুণ আবর্জ্জনা সরাইয়াছেন, নিজের সৃষ্ট নূতন আবর্জ্জনায় আবার তাহা ঢাকিয়াছেন। এ আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিবার জন্য বোধ হয় ভারতে কোন হার্কিউলসের জন্ম-গ্রহণের প্রয়োজন হইবে। সত্যের আসন সর্ব্বোচ্চ হইলেও ব্যবহারে যাহারা উহাকে শক্তির পাদ-পীঠে স্থাপন করিতে কুণ্ঠিত হয় না, সত্য সত্যই তাহাদের হিতোপদেশ গ্রহণ করিবার সময়েও অনেক বিতর্ক, অনেক বিবেচনা আসিয়া উপস্থিত হয়।

কেবল এক খানি গ্রন্থ—পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ইংরাজীতে লিখিত শিক্ষা-বিষয়ক গ্রন্থখানি—প্রথম বাহির হইলে অতি শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিয়াছিলাম, এখন তাহাই মনে পড়িল। যদি এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত শিক্ষা-বিষয়ক কোন গ্রন্থে ভারতের বিশেষ উপকার হইবার, ভারতবাসীর চক্ষু ফুটিবার কোন সম্ভাবনা থাকে, তবে সেই গ্রন্থে। যাঁহার জীবন প্রাচ্য-প্রতীচ্য-শিক্ষা-সফলতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ, যিনি দীর্ঘকাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী সর্ব্বাধ্যক্ষের আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, যিনি গভর্ণমেণ্টের আধুনিক শিক্ষা-নীতি প্রবর্ত্তনের সময়ে মন্ত্রণা সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াও নির্ভীকভাবে স্বাধীন হৃদয়ে নিজের মন্তব্য স্বতন্ত্র ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া স্বাভাবিক তেজস্বিতা, চিন্তাশীলতা, ধীরতা এবং স্বদেশ বাৎসল্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহার গ্রন্থের প্রশংসায় প্রবৃত্ত হওয়া অনাবশ্যক। কিন্তু এমন সুন্দর গ্রন্থও আমাদের বর্ত্তমান আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তিসাধনে পর্য্যাপ্ত বলিয়া বোধ হয় না। তাহার কারণ, তিনি যখন গ্রন্থ লিখেন, তখন কেবল কোন কোন উন্নত হৃদয়ে জাতীয় শিক্ষার আকাঙ্ক্ষার অস্পষ্ট ঈষৎ স্পন্দন হইতেছিল মাত্র, সমগ্র জাতীয় হৃদয়ে তাহার স্ফুরণ হয় নাই, —সর্ব্বোচ্চ তরুগুলির সর্ব্বোচ্চ শাখায় যে বাতাসের ঈষৎ হিল্লোল লাগিয়াছিল বটে,

কিন্তু তখন দেশের সহর-পল্লী সর্বত্র ইহা প্রবল খরস্রোতে প্রবাহিত হয় নাই। আগত-প্রতিষেধ মানবীয় মনীষার কার্য্য, কিন্তু অনাগত প্রতিষেধ আপ্ত-জ্ঞান যোগী ঋষির কার্য্য। ক্ষুধার উদ্রেকে যাহা পর্য্যাপ্ত, ক্ষুধায় দাবানল জ্বলিয়া উঠিলে তাহাতে তৃপ্তি-লাভ বা শরীর-রক্ষা কোনটাই হয় না।

যে সকল মহাত্মা জাতীয় শিক্ষার পৌরোহিত্য গ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহাদের দেশ-হিতৈষার গভীর চিন্তা এই অভিনব শিক্ষা সংহিতার প্রসূতি, যাঁহাদের অক্লান্ত শ্রম, সময় ও অর্থ ব্যয়ে ইহা সম্ভবপর হইল বলিয়া বোধ হইতেছে এবং যাঁহাদের বিদ্যা বুদ্ধিমত্তা ও স্বার্থত্যাগ আমাদের জাতীয় তরণীর বর্ত্তমান কর্ণধার, মনে করিলাম তাঁহাদের কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিলে বুঝি বা উপদেশ পাইতে পারি। কিন্তু একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া যে উত্তর পাইলাম তাহাতে যে বিশেষ ফললাভ করিতে পারিব, তেমন আশা বা উৎসাহ পাইলাম না। তিনি বলিলেন, "আমরা জাতীয় শিক্ষার দিক্ নির্দ্দেশ করিয়া যাঁহাদের হাতে ইহার ভার দিয়াছি, আপাততঃ ইহার সফলতা তাঁহাদিগের বিদ্যা, বুদ্ধি ধৈর্য্য এবং শিক্ষা-দান কৌশলের উপরেই নির্ভর করিতেছে।" পুস্তকের কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, "পুস্তকের কথা এখনও আমাদিগেরই মাথার ভিতরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আপনাদিগকে আর কি বলিয়া দিব?"

এত দিনে আরব্ধ ব্যাপারের প্রকৃত গুরুত্ব এবং নিজের দুর্ব্বলতা, অসারতা, অযোগ্যতা ভাল করিয়া বুঝিলাম! জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষক হইয়া আসিয়াছি, কিন্তু যে শিক্ষা দিতে হইবে, তাহা কোথাও দিন কোথাও পাই নাই;—অর্থাৎ, যাহা নিজের ঘরে নাই, তাহাই দান করিতে হইবে। দিন দিন জীবন পথের নূতন নূতন অসংখ্য যাত্রী জ্ঞানার্থী হইয়া আমাদের দ্বারে উপস্থিত হইতেছে। আমরাও তাহাদিগের জ্ঞান-পিপাসা চরিতার্থ করিব বলিয়া আশ্বাস দিয়া তাহাদিগকে গৃহে স্থান দিতেছি; আমরা তাহাদিগকে কি দেই, তাহা জানিবার জন্য —দেখিবার জন্য অনন্ত-নয়ন জগৎ আমাদিগের প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে; এ দিকে কিন্তু আমাদের ভাণ্ড শূন্য! গৃহের অভাব বুঝিয়া বাহিরে অনুসন্ধান করিতেছি, কিছুই পাইতেছি না; অন্যের দ্বারে উপস্থিত হইতেছি, কেহই কিছু দিতেছেন না। সদাব্রত খুলিয়াছি, কিন্তু ক্ষুধিত পান্থের ক্ষুধা দূর করিতে পারিতেছি না। এখন উপায় কি?

শিক্ষকের আসন গ্রহণ করিয়া 'আমি কিছুই জানি না' বলা যে কতদূর মূর্খতা, কতদূর নির্লজ্জতা, এবং কতদূর আত্মসম্মান-বোধ-শূন্যতা, তাহা আমি জানি। যে পরিমাণ দুঃসাহসিকতা থাকিলে এ কথা প্রকাশ্য ভাবে বলা যাইতে পারে, তাহা আমার আছে, তাই কথাটা এমন করিয়া বলিয়া ফেলিলাম। অজ্ঞানতার অবস্থা শোচনীয় বটে, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু যে নিজে অজ্ঞ, লোকে যদি তাহাকে বিজ্ঞ মনে করে,—যে নির্ধন লোকে যদি তাহাকে ধনী মনে করে, তবে তাহার দুরবস্থার বোধ হয় আর সীমাই থাকে না।

যাহা হউক, একা আমারই যে এরূপ দুরবস্থা, এমন বোধ হয় না ; আমার বিশ্বাস, যাঁহারা জাতীয় শিক্ষার শিক্ষকতা গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই সুযোগ্য হইলেও আমার মত অযোগ্য পাত্রও অনেক আছেন, কিন্তু হাস্যাস্পদ হইবার ভয়ে কেহই ধরা দিতেছেন না। যদি এ কথা সত্য হয়, তবে অন্ততঃ এই শ্রেণীর শিক্ষকদিগের উপকারের নিমিত্ত বিষয়টার আলোচনা হওয়া উচিত। এ সম্বন্ধে কেহ কিছু বলেন কিনা, তাহা জানিবার জন্য বিশেষ যত্নের সহিত, বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে সংবাদ ও সাময়িক পত্রের দিকে লক্ষ্য রাখি, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে গুলি আমার চক্ষে পড়ে তাহাদের মধ্যে কোথাও এ বিষয়ের কোন আলোচনা দেখিতে পাই না।

অথচ আলোচনার নিতান্তই প্রয়োজন। গগন-মণ্ডলের মেঘ ও কোয়াসা যেমন বাতাসে উড়িয়া যায়, ডোবার দুর্গন্ধময় ময়লাপূর্ণ অস্বাস্থ্যকর আবদ্ধ জল যেমন নূতন বন্যায় দূর হইয়া যায়, আলোচনায় সেইরূপ সমস্ত ভ্রান্তি ও কুসংস্কার, আমাদের মনের সমস্ত ধাঁধা ও অন্ধকার অপসারিত হইতে পারে। যে সকল মনস্বী মহাপুরুষ জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাঁহাদের মনে হয়ত কোন অন্ধকার নাই। কিন্তু প্রণয়নকারীদিগের জন্য ব্যবস্থা নহে ; যাহারা প্রদর্শিত পথে চলিবে, ব্যবস্থা তাহাদিগেরই জন্য ; সুতরাং জাতীয় শিক্ষা-সম্বন্ধে যাহাতে আপামর সাধারণ সকলের মনে একটা স্পষ্ট ধারণা জন্মিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে ইহার যথোচিত বিস্তৃত আলোচনা হওয়া উচিত। আলোচনায় উদ্দেশ্য ও আদর্শ জন-সাধারণের হৃদয়ে মুদ্রিত হইবে ; আলোচনায় পন্থা, প্রণালী ও উপায় অবধারিত হইবে ; আলোচনা শিক্ষক, অভিভাবক ও বালকের কর্তব্য অবধারণ করিবে। আলোচনার আর একটা মুখ্য ফল এই যে, কোন প্রয়োজনীয় বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ হইলে যদি ভ্রান্ত মত এবং ভ্রান্ত উপদেশ প্রচারিত হইতে থাকে, তাহা হইলে সমাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী চিন্তাশীল পণ্ডিতেরা উদাসীন থাকিয়া তাহার প্রশ্রয় দিতে পারেন না, তখন তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে ভ্রান্তি প্রদর্শন ও কূটতর্ক খণ্ডন করিয়া জন-সাধারণের চিন্তা-স্রোতকে অভ্রান্ত শুদ্ধ পথে প্রবাহিত করেন।

কেহ বলিতে পারেন, এখনই এত আলোচনার প্রয়োজন কি ? জাতীয় শিক্ষা সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে, সবেমাত্র কয়েকটি জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এখনই এত হৈ চৈ করিয়া লাভ কি ? কিছু দিন কার্য্য চলুক, কার্য্যের একটা দাঁড়া পড়ুক, সাধারণে জাতীয় শিক্ষার একটা ফল দেখুক তাহার পরে আলোচনা হইবে, তখন প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়া ভ্রমত্রুটি সংশোধন করিবার অবসর পাওয়া যাইবে। মোটে কার্য্যই হইল না, তাহার আবার আলোচনা কি ? আগে প্রশ্ন, তাহার পরে ত সমালোচনা ?

যাঁহারা কার্য্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিবেন এ যুক্তির সারবত্তা কত। আগে যেমন তেমন করিয়া একখান ঘর খাড়া হউক, তাহার পরে দোষগুণ দেখিয়া সংশোধন করা যাইবে, এই ন্যায়ের বশবর্ত্তী হইয়া যে ঘরামী ঘর তুলে, আবার তাহাকে

উহা না ভাঙ্গিলে চলে না। যে গ্রন্থকার আগে বিশেষ আলোচনা না করিয়াই গ্রন্থ লিখিয়া ফেলেন, তাঁহার গ্রন্থের সমালোচনা কদাচিৎ হইলেও সেই রূপই হয়। "ভুক্তে পশুন্তি বর্ব্বরাঃ"—একটা চলিত কথা; ইহার প্রয়োগ আমাদের সকল কার্য্যেই চলিতে পারে, এবং সকল কার্য্যেরই আরম্ভে বচনটি স্মরণ করিলে আমরা অনেক আক্ষেপ অনেক অনুতাপ, অনেক আত্মগ্লানি, অনেক ভাঙ্গাচোরা হইতে বাঁচিয়া যাইতে পারি।

যাঁহারা দূরে দাঁড়াইয়া জাতীয় শিক্ষার আলোচনার পরিবর্ত্তে ফল—বাক্যের পরিবর্ত্তে কার্য্য—দেখিতে চাহেন, তাঁহাদের আগ্রহ এবং সহৃদয়তার জন্য তাঁহাদিগকে শতবার নমস্কার করিয়া ও ধন্যবাদ দিয়া অতি বিনীত ভাবে নিবেদন করিতে চাই যে, কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট বেচারীদিগের অবস্থা ঠিক তাঁহাদিগের মতন নহে। শিক্ষক যে যাহা পান নাই তাহাই দিতে বসিয়াছেন, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইলেই শিক্ষকের মনে নানা তর্ক, নানা সন্দেহ উঠে, তিনি অন্ধকার দেখিতে থাকেন। প্রথমেই তাঁহার মনে হয়, এই সকল বালক গবর্ণমেণ্টের স্কুল কলেজে বড় বড় বেতনের বড় বড় শিক্ষকের নিকট শিক্ষা লাভ করিতেছিল। সেখানে ঘর বাড়ী কত বড়, লাইব্রেরী কেমন জাঁকাল, আসবাব পত্র কেমন সুন্দর ও প্রচুর, বৃত্তি লাভ করিবার ও চাকুরী পাইবার কত প্রলোভন! সে সমস্ত ছাড়িয়া বালকেরা এখানে আইসে কিসের লোভে, আর আমরাই বা তাহাদিগকে স্থান দেই কিসের আশায়, কোন্ সাহসে? যদি জাতীয় শিক্ষার অভ্যন্তরে এমন কিছু থাকে, যাহার তুলনায় গবর্ণমেণ্ট-স্কুলের বাহ্যসম্পদ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, তবে তাহা কি, এবং বালকেরা তাহা কি পরিমাণে পাইতেছে? "সেই ছোলা সেই দাঁড়"—বালকের সেই সমস্তই বর্ত্তমান আছে, কেবল বিদ্যালয়ের নামটার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। শিক্ষাতে বালকের সেই অভক্তি, বালকের প্রতি শিক্ষকের সেই বিরক্তি; বালকের সেই অনিচ্ছায় আদেশ-পালন, শিক্ষকের সেই বিফল তর্জ্জন গর্জ্জন; বালকের সেই ফাঁকি দিবার বাসনা, শিক্ষকের সেই কঠোর শাসন ও বেত্র-দণ্ডের কল্পনা—সেই সমস্তই বর্ত্তমান। কই, আজিও ত বালক গৃহ অপেক্ষা বিদ্যালয়কে অধিক সুখের স্থান মনে করিল না, আজিও ত সে, শিক্ষককে পিতামাতার মত বিশ্বস্ত আত্মীয় বলিয়া জানিল না, আজিও ত ছুটির দিনে সহপাঠীদিগকে দেখিবার জন্য তাহার প্রাণ ছট ফট করিল না! এখনও সেই গোলমাল গোলোযোগ, সেই ঝগড়া বিরোধ, সেই নালিশ ফরিয়াদ সমান ভাবেই চলিতেছে! এখনও জাতীয় বিদ্যালয়ের ছেলেকে অন্য ছেলেদের মধ্য হইতে বাছিয়া বাহির করা যায় না, এখনও তাহার চলন-চরিত্রও আচার ব্যবহারে তাহাকে জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র বলিয়া চিনিতে পারা গেল না! তবে আর তাহাকে কি শিক্ষা দিলাম, জাতীয় শিক্ষার বিশেষত্বের পরিচয় কি দিতে পারিলাম? সেই দুর্ব্বলের জন্য সবলকে অপেক্ষা করিতে হইতেছে, সবলের সঙ্গে দুর্ব্বলকে প্রাণপণে দৌড়িতে হইতেছে,—শক্তির সঙ্গে কর্ম্মের সামঞ্জস্য নাই, পাকস্থলী জঠরাগ্নি

এবং ক্ষুধার সঙ্গে অন্নের অনুপাত নাই! সকলকেই সমপরিমাণে অন্ন পরিবেশন করিতেছি, পরিবেশনে ছোট বড়, সবল দুর্ব্বল, সুস্থ রুগ্ন বিবেচনা করিবার অবসর পাইতেছি না,—যে আরও চায় তাহাকে দিতে পারিতেছি না, যে খাইতে পারে না তাহাকে ধমক দিতেছি! তবে আর জাতীয় বিদ্যালয়ের সৃষ্টি হইল কি জন্য, জাতীয় শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্ব রহিল কোথায়? শিক্ষার প্রধান কার্য্য শিক্ষার্থীর হৃদয়ে আগ্রহ-জনন—উৎকৃষ্ট চরিত্র-লাভের আগ্রহ, কঠোর বিদ্যা-লাভের আগ্রহ, মঙ্গল-সাধনে প্রাণ উৎসর্গ করিবার আগ্রহ বালকের হৃদয়ে জন্মাইয়া দেওয়া। শিক্ষক হাজার বিদ্বান্ হইলেও তাঁহার বিদ্যার কণামাত্র বালকের মস্তিষ্কে প্রেরণ করিতে পারেন না, যদি তাহার হৃদয়ের আগ্রহ তাহাকে আকৃষ্ট ও প্রবর্ত্তিত না করে। আমরা বালকের হৃদয়ে তেমন জলন্ত আগ্রহ, সেই অদম্য আকাঙ্ক্ষা জন্মাইতে পারিতেছি কোথায়? জ্ঞান এবং প্রেমের সম্মিলনে বাক্যে যে মাধুর্য্য, যে আকর্ষণ, যে শক্তি জন্মে, আমাদের বাক্যে তাহা আছে কি—আমরা সে কৌশলে সিদ্ধিলাভ করিয়াছি কি?

যে দিকে তাকাই, সে দিকেই আমাদের ত্রুটি, আমাদের অক্ষমতা, আমাদের অযোগ্যতাই চক্ষে পড়ে! বিশ্ব-মাতা আমাদের হৃদয়ে জাতীয় উন্নতির আকাঙ্ক্ষা আনিয়া দিয়াছেন, ইহা তাঁহার অযাচিত কৃপা; কিন্তু এই আকাঙ্ক্ষার পরিপূরণে যে শক্তির প্রয়োজন, তাহা আমাদিগকে কঠোর সাধনা-দ্বারা, তীব্র তপস্যাদ্বারা, অক্লান্ত পুরুষকার দ্বারা তাঁহার নিকট হইতেই লাভ করিতে হইবে। কর্ম্মের সঙ্গে ফলের যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, মনুষ্যত্বের সঙ্গে পুরুষকারের যে চির-সম্মিলন, তাহা রহিত করিয়া বিশ্ব-মাতা আমাদের আলস্যের খাতিরে বিশ্বে বিশৃঙ্খলা আনিবেন না—নিশ্চয়ই না।

অভাব ভাবের পুরোবর্ত্তী, প্রয়োজন-বোধ পরিপূরণের পুরোবর্ত্তী। প্রয়োজন যখন অনুভব করিয়াছি, জাতীয় হৃদয়ে জাতীয় দেবতার আসন পাতিয়া যখন ব্যাকুল চিত্তে প্রতীক্ষা করিতেছি, বিনামন্ত্রে আবাহন করিতেছি, তখন শীঘ্রই কোন অমিতশক্তি মহাপুরুষ জাতীয় শিক্ষার পুরোহিতরূপে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হইয়া অমোঘমন্ত্রে কুল-দেবতার আহ্বান করিবেন, তাঁহার প্রদর্শিত পূজা-পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া আমরা বররূপে বাঞ্ছিত শক্তি লাভ করিব।

কিন্তু যে পর্য্যন্ত সেই মহাপুরুষের দর্শন লাভ করিতে না পারিতেছি, সে পর্য্যন্ত আমাদিগকে আলোচনার কলরব অবলম্বন করিয়া জাগিয়া থাকিতেই হইবে, কেন না, বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের পক্ষে নিদ্রার নামান্তর মৃত্যু।

আলোচনার প্রয়োজন অনুভব করিতেছি কিন্তু দুঃখের বিষয়, আলোচনা দেখিতে পাইতেছিনা। যে বিষয়ের গুরুত্ব যত অধিক, তাহার আলোচনায় ততই ভয় হয়—পাছে লোকে অর্ব্বাচীনের অসমীক্ষ্যকারিতা এবং অসমীক্ষ্য-বাদিতা বলিয়া উপহাস করে। কিন্তু অনেক সময়ে অর্ব্বাচীনেরও প্রয়োজন উপলব্ধি করা যায় অনেক সময়ে অর্ব্বাচীনের বাক্যও নিস্তব্ধ সভায় মুখরতার উৎস খুলিয়া দেয়।

জাতীয় শিক্ষার আলোচনায় নিস্তব্ধতা ভঙ্গের জন্ম কোন অসমীক্ষ্যবাদীর প্রয়োজন হইয়াছে সন্দেহ নাই। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের এক যুগ পূর্ব্বে যাঁহারা জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, এবং এ দিকে জাতীয়-মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্ম "শিক্ষা পরিচয়" লইয়া দেশবাসীর দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলেন, আজ তাঁহাদের মধ্যে কেহ যদি এই অর্ব্বাচীনের আসন গ্রহণ করে তাহা হইলে তাহার এই প্রগল্‌ভতা মার্জ্জনীয় হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী।*

গৌড়-কাহিনী।

স্বাধীন শাসন-সূচনা।

গৌড়ীয় সাম্রাজ্যে স্বাধীন শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার পক্ষে অনেক অনুকূল অবস্থা সংঘটিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে দিল্লী সাম্রাজ্যের ছত্রভঙ্গ অবস্থা বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। তজ্জন্য ত্রয়োদশ বৎসর পর্য্যন্ত দিল্লীশ্বর আর বঙ্গভূমির প্রতি দৃষ্টিপাত করিবারও অবসর প্রাপ্ত হইলেন না। এই দীর্ঘকাল স্বাতন্ত্র লাভ করিয়া, গৌড়ীয় সাম্রাজ্য দিন দিন প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। সময় এবং সুযোগ প্রাপ্ত হইবামাত্র, গৌড়ীয়গণ যে অনায়াসেই এরূপ পরাক্রান্ত সাম্রাজ্য সংস্থাপনে সফলকাম হইল, তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ ছিল না। তাহা আকস্মিক দৈব ঘটনা বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না। প্রথম হইতেই স্বাধীনতালিপ্সা গৌড়ীয় সাম্রাজ্যকে দিল্লীর শাসন পাশ ছিন্ন করিয়া ফেলিবার জন্য নিয়ত উৎসাহিত করিয়া আসিতেছিল। সুলতান সামসুদ্দীন সময় পাইয়া, দেশের লোকের সেই স্বাভাবিক স্বাধীনতালিপ্সা সবল করিয়াই, যথাসাধ্য আত্মশক্তি সুদৃঢ় করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

সেকালে একালের মত সাংঘাতিক সমর কৌশল প্রচলিত না থাকায়, বাহুবল এবং অকুতোভয়তার উপরেই সমধিক নির্ভর করিতে হইত। গৌড়ীয় সাম্রাজ্যে তাহার কিছুমাত্র অভাব ছিল না। বাঙ্গালীর বাহুবলের প্রভাব ছিল না;—অকুতোভয়তাও নানা কারণে বিলক্ষণ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। নদীমাতৃক বঙ্গভূমি, স্মরণাতীত

* প্রবন্ধ লেখক মহাশয় "শিক্ষা পরিচয়" পত্রের সম্পাদক ছিলেন এবং এখন একটি জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষরূপে কার্য্য করিতেছেন। বঃ সঃ।

পুরাকাল হইতে, বিবিধ দুরতিক্রমনীয় জলদুর্গে সুরক্ষিত হইয়া, শত্রুসেনার আক্রমণ-বেগ প্রতিহত করিয়া আসিয়াছে। রণতরণী ভিন্ন,—কেবল স্থলপথে,—বঙ্গভূমি আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা ছিল না। জলযুদ্ধে বাঙ্গালীর অশিক্ষিত পটুত্ব ভারতবিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। কি পোতনির্ম্মাণ কৌশলে, কি পোতচালনদক্ষতায়, কোন বিষয়েই, ভারতবর্ষের অন্য কোনও প্রদেশের লোক তাহাদিগকে বাঙ্গালীর সমকক্ষ বলিয়া স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিতে পারিত না। ইহার উপর বঙ্গভূমির সীমাসংলগ্ন পার্ব্বত্যপ্রদেশ হইতে হস্তি সংগ্রহ করিয়া,—পালন ও শিক্ষাকৌশলে বাঙ্গালীরা রণহস্তিসহায়তায় দুর্দ্ধর্ষ বলিয়া আরও সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। সুলতান সামসুদ্দীন এই সকল সুপরিচিতপথেই দেশরক্ষার সুব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং ত্রয়োদশ বর্ষের অবসর লাভ করিয়া, সুলতান সামসুদ্দীন বিলক্ষণ শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন।

সুলতান সামসুদ্দীন যখন এইরূপ স্বাধীন সাম্রাজ্য সংস্থাপনে নিয়ত অবসরশূন্য, সেই সময়ে দিল্লীর সিংহাসনে একজন প্রকৃত প্রতিভাশালী নূতন সম্রাট আরূঢ় হইলেন। তাঁহার নাম ফিরোজ শাহ তোগলক। তিনি পঞ্চাশৎবর্ষ বয়ঃক্রমকালে সিংহাসনে আরোহণ করায়, ভোগাভিলাষ অপেক্ষা আত্মত্যাগ তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছিল। "তারিখ—ই—ফিরোজশাহী" * নামক পারস্যভাষানিবদ্ধ সুবিখ্যাত ইতিহাসে তাঁহারই কীর্ত্তিকলাপ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়া রহিয়াছে।

ফিরোজ শাহ বিদ্বান্ এবং বিদ্যোৎসাহী বলিয়া সুপরিচিত ছিলেন। তিনি প্রজাপরায়ণ ন্যায়নিষ্ঠ সুযোগ্য সম্রাট বলিয়াও খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা বিষয়সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, ফকিরি গ্রহণ করিয়া, নিয়ত ধর্ম্মানুশীলনে সময়ক্ষেপন করিতেন। তাঁহার স্বাভাবিক পুণ্য পিপাসা তাঁহার পুত্রের জীবনকেও সরস করিয়া দিয়াছিল। ছত্রভঙ্গ দিল্লীসাম্রাজ্যকে শক্তিশালী করিয়া তুলিবার জন্য ফিরোজ শাহ উদারনীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি সিংহাসনে পদার্পণ করিবার পূর্ব্ব হইতেই ভারতবর্ষের হিন্দুমুসলমানের মধ্যে স্বার্থ-সমন্বয় সংস্থাপিত হইবার সূত্রপাত হইয়াছিল। মোগলগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ ও অধিকার করিবার আয়োজন করায়, ভারতবর্ষের হিন্দুমুসলমান

* "তারিখ-ই-ফিরোজসাহী" নামে দুইখানি ইতিহাস রচিত হইয়াছিল। একখানি জিয়াউদ্দীন বারনী নামক সমসাময়িক ঐতিহাসিকের লেখনী প্রসূত ফিরোজ শাহের বিজয় রাজ্যের প্রথম ছয় বৎসরের ইতিহাস। অপর গ্রন্থ সামস-ই-সিরাজ-আফিক নামক প্রায় সমকালবর্ত্তী ঐতিহাসিকের লেখনীপ্রসূত। এই উভয় গ্রন্থই দিল্লীসাম্রাজ্যের ইতিহাস। তথাপি উভয় গ্রন্থেই প্রসঙ্গক্রমে বঙ্গভূমির নানা বৃত্তান্ত উল্লিখিত হইয়াছে। পক্ষপাতপূর্ণ অতিশয়োক্তি প্রকাশে উভয় লেখকই সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহাদের গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিবার সময়ে যেরূপ সতর্কতা আবশ্যক, দুর্ভাগ্যক্রমে অনেক বাঙ্গালী লেখক সেরূপ সতর্কতা অবলম্বন করেন না। পুরাতন লিখিত প্রমাণ এখনও অনেকের নিকট অকাট্য প্রমাণ বলিয়া বিনা বিচারে আস্থা লাভ করিতেছে।

তাহাদের পুরাতন সাম্রাজ্য কলহ এবং অন্যান্য পার্থক্য বিস্মৃত হইয়া দেশরক্ষার্থ সমানভাবে উৎসাহযুক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ফিরোজসাহ সিংহাসনে পদার্পণ করিয়া, নিরপেক্ষ শাসন-ব্যবস্থায় হিন্দুমুসলমানের স্বার্থ-সমন্বয়কে উত্তরোত্তর সুদৃঢ় করিয়া তুলিবার নানাচেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। উত্তর কালে আকবর বাদসাহ যে উদারনীতি সুবিস্তৃত করিয়া বিশ্ববিখ্যাত শাসন-সাফল্যে আপন নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন, ভারতবর্ষের মুসলমান সম্রাটদিগের মধ্যে পুণ্যশ্লোক ফিরোজ শাহই প্রথমে তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি শিক্ষাবিস্তারে নিরতিশয় উৎসাহদান করিয়া, হিন্দুমুসলমানকে জ্ঞানবলে বলীয়ান করিবার আয়োজন করিয়াছিলেন,—এবং তাহাদিগের মধ্যে জ্ঞানের আদানপ্রদানে ধর্ম্মান্ধতা বিদূরিত করিবার আশায় বিবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদিত করাইয়াছিলেন! কৃষি বানিজ্যের উন্নতিসাধনের জন্য বহুসংখ্যক পয়ঃ প্রণালী খনিত হইয়াছিল। উৎপন্ন শস্যের পরিমাণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভূমির কর এরূপ সহৃদয়তার সহিত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল যে, তাহাতে কৃষককুলের কিছু মাত্র কষ্ট হইবার আশঙ্কা ছিল না। ফিরোজ সাহের শাসনকালের সকল ইতিহাসেই এ সকল কথা উল্লিখিত আছে।

ফিরোজ শাহের এবং সামসুদ্দীনের শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে প্রচুর সামঞ্জস্য লক্ষিত হইয়া থাকে। উভয়েই বিল্পবযুগের অবসানে ছত্রভঙ্গ সাম্রাজ্যের উন্নতি সাধনের জন্য লালায়িত ;—তাহার জন্য উভয়ে প্রায় এক পথেই প্রধাবিত। সে পথ গর্ব্বান্ধ বিদেশ-বিজেতার স্বেচ্ছাচারের পথ নহে ;—তাহা স্বদেশানুরক্ত ভক্ত সাধকের আত্মত্যাগের সুপরিচিত সরল পথ। তাহাতে পদার্পণ করিয়া, এই দুই মুসলমান সম্রাট খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর ভারতবাসী হিন্দুমুসলমানকে যেরূপ একপ্রাণতায় অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা সেকালের বিল্পবযুগের পক্ষে নিরতিশয় বিস্ময়ের বিষয় হইয়া রহিয়াছে।

ফিরোজশাহ সিংহাসনে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বেই বঙ্গভূমিকে পুনরায় দিল্লী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিবার আয়োজন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাহাতেই ফিরোজ শাহের সহিত সামসুদ্দীনের তুমুল সাম্রাজ্য কলহ উপস্থিত হইয়াছিল। কিরূপে তাহার সূত্রপাত হয়, তদ্বিষয়ে দিল্লীর এবং গৌড়ের ইতিহাস লেখকদিগের মধ্যে মত-ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। "সামসুদ্দীন পাণ্ডুয়ার রাজধানীতে দিল্লীর "হাউজ-ই-সামসী" নামক সুবিখ্যাত বাদশাহী স্নানাগার নির্ম্মাণ করায়, ফিরোজ শাহ ক্রোধান্ধ হইয়া সামসুদ্দীনের প্রগল্‌ভতার দণ্ডদান করিবার জন্য বঙ্গভূমি আক্রমণ করিতে লালায়িত হইয়া উঠিয়াছিলেন!" ইহা গৌড়ীয় ইতিহাস লেখক গোলাম হোসেনের কথা। এত সামান্য কারণে ফিরোজশাহের পক্ষে তাঁহার বিজয় রাজ্যের প্রথম বৎসরে অভিষেকক্রিয়া যথাশাস্ত্র সুসম্পন্ন হইবার পূর্ব্বেই,—যুদ্ধ-কলহের অনিশ্চিত ফলাফলের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিবার সম্ভাবনা ছিল না। দিল্লীর ইতিহাসলেখকগণ ভিন্ন কারণের উল্লেখ

করিয়া গিয়াছেন। সুলতান সামসুদ্দীন বঙ্গভূমির স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াই নিরস্ত হন নাই ;—তিনি দিল্লীশ্বরের আক্রমণ পথ চিররুদ্ধ করিবার আশায়, ত্রিহুত অধিকার করিয়া, বারাণসি পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। সুতরাং সামসুদ্দীনকে শাসন করিয়া, নষ্ট রাজ্যের উদ্ধার সাধন করা ফিরোজ শাহের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্যে পরিণত হইয়াছিল। অবস্থানুসারে দিল্লীর ইতিহাস লেখকগণের এই উক্তিই প্রকৃত কারণ ব্যক্ত করিতেছে বলিয়া বোধ হয়।

ত্রিহুত হইতে বারাণসি পর্য্যন্ত নানা স্থান পুরাতন মিথিলা রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। সে রাজ্য অতি পুরাকাল হইতে বাহুবলে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া, জ্ঞান ও ধর্ম্মের অনুশীলনে ভারতবিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। মুসলমান শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে গৌড়াধিপতি লক্ষ্মণসেন দেব একবার মিথিলা রাজ্যের কিয়দংশে অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। মিথিলা প্রদেশে "লক্ষ্মণ-সংবৎ" অদ্যাপি তাহার স্মৃতি বহন করিয়া আসিতেছে। তৎকালে বারাণসিতেও লক্ষ্মণ সেন দেবের জয়স্তম্ভ সংস্থাপিত হইবার কথা লক্ষ্মণ সেন দেবের বীরপুত্র বিশ্বরূপ সেন দেবের তাম্র শাসনে উল্লিখিত হইয়া রহিয়াছে। মুসলমানাধিকার বিস্তৃত হইবার সময়ে ত্রিহুত অঞ্চলে যে সকল হিন্দু সামন্ত রাজা বাস করিতেন, তাঁহারা দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করিলেও, স্বরাজ্যে স্বাধীন ভূপতির ন্যায় সর্ব্বপ্রকার শাসন ক্ষমতা পরিচালিত করিতেন। তজ্জন্য দিল্লীশ্বরগণ ত্রিহুত অঞ্চলে বহুসংখ্যক মুসলমান জায়গীরদার সংস্থাপিত করিবার অসুবিধা লক্ষ্য করিয়া, হিন্দু সামন্তবর্গের মৌখিক বশ্যতাস্বীকারেই পরিতৃপ্ত থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ত্রিহুত কাহার, তদ্বিষয়ে তর্ক বিতর্কের অভাব হইত না। গৌড়ীয় সুলতানগণ লক্ষ্মণসেনদেবের দিগ্‌বিজয়কাহিনীর উপর নির্ভর করিয়া, ত্রিহুতকে গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিবার চেষ্টা করিলে, ত্রিহুতের হিন্দু সামন্তগণ দিল্লীর শরণাপন্ন হইয়া পড়িতেন। বঙ্গভূমি অধিকার করিবার পক্ষে ত্রিহুতের উপর আধিপত্য রক্ষা করা অনিবার্য্য বলিয়া, দিল্লীশ্বরগণ চিরদিনই ত্রিহুতের জন্য লালায়িত ছিলেন। স্বাতন্ত্র্য লাভ করিবার পর, গৌড়ীয় সাম্রাজ্যকে দিল্লীশ্বরের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার আশায়, সুলতান সামসুদ্দীন ত্রিহুত অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। ত্রিহুতের হিন্দু সামন্তগণকে গৌড়ীয় শাসন পাশ হইতে মুক্ত করিয়া লইয়া, তাঁহাদের সহায়তার পূর্ব্বক বং বঙ্গভূমি আক্রমণ ও অধিকার করিবার প্রলোভনে, ফিরোজ শাহ সিংহাসনে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বেই, ত্রিহুতের উদ্ধার সাধন করিবার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টা কঠিন হইল না। হিন্দু সামন্তগণ দলে দলে তাঁহার সেনাবলের সহিত মিলিত হইতে লাগিলেন। তখন সেই সমবেত বাহিনী বঙ্গভূমি আক্রমণ করিবার আয়োজন করিতে লাগিল। *

*The Emperor set out from Delhi on 10 Shawal 754. A. H. reached Oudh, crossed the Sro river, when Ilyas Shah with-drew to Tirhut. The Emperor, crossing

সামস-ই-সিরাজের গ্রন্থে এই যুদ্ধযাত্রার যে বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, তাহা পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়,—ফিরোজ শাহ বঙ্গভূমি আক্রমণ করিবার জন্য কিরূপ বিপুল আয়োজন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। রণহস্তি সংগৃহীত হইয়াছিল ;—ষষ্টি সহস্র অশ্বারোহী সজ্জীভূত হইয়াছিল ;—সপ্ততি সহস্র খাঁনাম মালুক সেনার সহিত দুই লক্ষ পদাতি সেনা মিলিত হইয়াছিল ;—এক সহস্র রণতরণী শ্রো, গঙ্গা এবং কুলী নদী আলোড়িত করিয়া দিল্লীশ্বরের বিজয় বাহিনী বহন করিয়াছিল।* তৎকালে গৌড়ীয় সাম্রাজ্য সত্য সত্যই পরাক্রান্ত হইয়া না উঠিলে, দিল্লীশ্বরের পক্ষে এরূপ বিপুল আয়োজনে শক্তিক্ষয় করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইত না।

ফিরোজ শাহ এইরূপে লক্ষ্মণাবতী অভিমুখে বিজয় যাত্রায় বহির্গত হইয়া, সরল পথ পরিহার করিয়া, পূর্ণিয়ার ভিতর দিয়া বক্রপথে পাণ্ডুয়ার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তৎকালে পাণ্ডুয়া এবং একডালা নামক স্থানে দুইটি রাজদুর্গ বর্ত্তমান ছিল। সামসুদ্দীন আপন পুত্রের উপর পাণ্ডুয়া দুর্গের রক্ষা ভার বিন্যস্ত করিয়া, স্বয়ং একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বঙ্গভূমি আবার যুদ্ধভূমিতে পরিণত হইল। অল্প আয়াস লভ্য শস্য সম্ভারে, বিশ্ববিখ্যাত শিল্প কৌশল বলে এবং সুদূর বিস্তৃত বাণিজ্য সৌভাগ্যে সেকালের বঙ্গভূমি এরূপ অভ্যুদয় লাভ করিয়াছিল যে তাহাকে অধিকার ও উপভোগ করিবার জন্য প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিগণ সমরকলহে লিপ্ত হইয়া, এদেশের জলস্থল নিয়ত রুধির রঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে যাহারা আত্মরক্ষা করিয়া স্বাতন্ত্র্যলাভের জন্য লালায়িত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারা ফিরোজ শাহের বিপুল বাহিনীর গতিরোধ করিবার দৃঢ় সংকল্প লইয়াই সামসুদ্দীনের সহিত মিলিত হইতে লাগিল। তাহারা কাহারা ? তাহাদের নাম গোত্র কালসাগরে বুদ্বুদের মত বিলীন হইয়া গিয়াছে ; কেবল ফিরোজ শাহের ইতিহাস লেখকদিগের গ্রন্থে লিখিত আছে,—তাহারা বাঙ্গালী,—"বাঙ্গালী পাইক এবং বাঙ্গালী রাজা !" তাহাদের বীর কীর্ত্তির বিজয়স্তম্ভ বর্ত্তমান না থাকিলেও, বঙ্গদেশের বিবিধ গ্রামের শৈবালাকীর্ণ পুরাতন পরিখা, এবং লতাগুল্মাচ্ছন্ন দুর্গ প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি তাহাদের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া, বাঙ্গালীর নাম গৌরবমণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে।

ফিরোজ শাহ পাণ্ডুয়ার নিকটবর্ত্তী হইয়া সসৈন্যে দুর্গাবরোধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি যেখানে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন তাহাকে চিরস্মরণীয় করিবার জন্য ইতিহাস লেখকগণ তাহাকে "ফিরোজাবাদ" নামে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। রিয়াজ-উস-সলাতিন গ্রন্থে তাহাই আবার "ফিরোজপুরাবাদ নামে উল্লিখিত হইয়া আসিতেছে। ফিরোজাবাদ বা ফিরোজপুরাবাদ তুল্যভাবেই লিপিকরপ্রমাদে বিপর্য্যস্ত হইয়াছে; বলিয়া*

the Sio, marched through Arsa-i Kharasa and Gorakpur, the Rajas whereof paid him homage, and enlisted themselves on his side.—*Barni.*

* Firuz Shah sailed to Bengal in one thousand flotilla of war-vessels, and his

বোধ হয়। ফিরোজ শাহ যেখানে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত নাম "ফিরোজপুর"—এক্ষণে "পিরোজপুর" নামে পরিচিত, পুরাতন মালদহ নগরের একাংশ মাত্র।

এই স্থান পুরাকাল হইতেই প্রসিদ্ধ বন্দর রূপে অভ্যুদয় লাভ করিয়াছিল। পাণ্ডুয়া নগরে গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী সংস্থাপিত হইলে, ইহা কিছুদিনের জন্য রাজধানীর নগর-দ্বার রূপেই পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। এখানে এখনও নানা ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে প্রস্তর নির্ম্মিত পুরাতন নগর-তোরণ অদ্যাপি পর্য্যটকগণের বিস্ময় উৎপাদিত করিয়া আসিতেছে।

পাণ্ডুয়ার দুর্গমূলে মুসলমান সম্রাটের সহিত মুসলমান সম্রাটের তুমুল রণকোলাহল উপস্থিত হইতে বিলম্ব ঘটিল না। বঙ্গভূমি কাহার হইবে, তাহার মীমাংসার জন্য উভয় পক্ষই অকাতরে রক্তদান করিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে দুর্গ রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিল। সুলতান সামসুদ্দীনের বীরপুত্র যথাসাধ্য স্বাধীনতা রক্ষার চেষ্টা করিয়াও, পরাভূত এবং কারারুদ্ধ হইয়া পড়িলেন!

এই যুদ্ধে বিজয় লাভ করিয়াও, ফিরোজ শাহ আনন্দ লাভ করিতে পারিলেন না পাণ্ডুয়া পরাভূত হইলেও, বঙ্গভূমি পরাভূত হইল না;—সুলতান-পুত্র কারারুদ্ধ হইলেও সুলতান তাঁহার মুক্তিকামনায় স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিতে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন না। তাঁহার হতাহত সেনাদল দুর্গমধ্যে পড়িয়া রহিল; যাহারা কারারুদ্ধ না হইয়া, পলায়ন করিবার অবসর লাভ করিল, তাহারা আর একবার লড়িয়া দেখিবার জন্য একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। সম্রাট ফিরোজ শাহ সগৌরবে নগর প্রবেশ করিয়াও, সে কালের লুণ্ঠন লোলুপ বর্ব্বর বিজেতার ন্যায় বর্ব্বরতা প্রকাশ করিলেন না। তিনি নাগরিকগণকে অশ্বাস প্রদান করিয়া, সেনাদলকে নগর লুণ্ঠন হইতে নিরস্ত রাখিয়া, একডালা দুর্গ অবরোধ করিবার জন্য নদী পার হইতে প্রবৃত্ত হইলেন।† ফিরোজ শাহের পক্ষে বিজিত রাজধানীর নাগরিকগণের সম্ভ্রম রক্ষার এরূপ উদারতা দেখিয়া, তাঁহার বিজয় বাহিনীর আত্মসংবরণের এরূপ সহিষ্ণুতা লক্ষ্য করিয়া, স্বভাবতই মনে হয় একালের সামরিক ব্যাপারেও, অনেক

rout lay across the Sro, the Ganges, and the Kusi rivers. His expeditionary force consisted of 70000 Khanans and Moluks, two *laks* infantry, 60000 cavalry, besides an elephant corps.—*Sams-i-Saraj.*

* গোলাম হোসেন লিখিয়াছিলেন—"ফিরোজপুর আবাদাস্ত"। তাহাই লিপিকর প্রমাদে "ফিরোজপুরাবাদ অস্ত" হইয়াছে বলিয়া, "ফিরোজপুর" এখন "ফিরোজপুরাবাদ" হইয়া উঠিয়াছে। যাঁহারা পুরাতন গ্রন্থের ভ্রম প্রমাদও বিনা বিচারে উদ্ধৃত করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের কৃপায় ফিরোজপুরাবাদ নাম নানা গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে!

† Firuz Shah, not oppressing the people of Pandua, captured in battle the son of Sultan Shamsuddin, and marched towards the fort of Ekdala.—*Riaz-usSalateen.*

স্থলেই, এরূপ আত্মসংবরণের ব্যাপার দুর্লভ হইয়া রহিয়াছে!

এক ডালা দুর্গ কোথায় ছিল, তাহা লইয়া একালের ইতিহাস লেখকগণের মধ্যে বিলক্ষণ বাদানুবাদের সূত্রপাত হইয়াছে। মুসলমান লিখিত পুরাতন ইতিহাস মুদ্রিত ও সম্যক্ সুপরিচিত হইবার পূর্ব্বেই, কোন কোন ইংরাজ লেখক একডালার স্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। দিনাজপুরের ভূতপূর্ব্ব কলেক্টর ওয়েষ্টমেকট সাহেব একডালাকে দিনাজপুরে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। রেণেল্ সাহেবের মানচিত্রে ঢাকার নিকটে একডালার নাম দেখিয়া, বিভারিজ সাহেব তাহাকে "ভাওয়ালের জঙ্গলে" স্থান দান করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। সম্প্রতি যাঁহারা বগুড়ার অন্তর্গত মহাস্থান গড়কে পুরাতন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগর বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার আয়োজন করিতেছেন, তাঁহারা আবার একডালাকে বগুড়া জেলায় টানিয়া লইবার চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন।

অধ্যাপক ব্লকম্যান একবার বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, বঙ্গদেশের বহুস্থান "একডালা" নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। তাহার অনেক স্থানেই কোন না কোন আকারের রাজদুর্গ বর্ত্তমান ছিল; এবং তাহার জন্যই স্থানের নাম "একডালা" হইয়া থাকিবে। সেকালের সেনানিবাস "দম্‌দমা" নামে কথিত হইত বলিয়া, অদ্যাপি বঙ্গদেশের অনেক স্থানের নাম "দম্‌দমা" বলিয়া পরিচিত আছে। "একডালার" কথাও সেইরূপ। ফিরোজ শাহ পাণ্ডুয়ার নিকটবর্ত্তী একডালার দুর্গেই সুলতান সামসুদ্দীনকে অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহা যে মালদহ জেলায় অবস্থিত সে বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই।

"তারিখ-ই-ফিরোজশাহীর" সমসাময়িক লেখকের পক্ষে একডালার প্রকৃত অবস্থান সম্বন্ধে ভুল করিবার সম্ভাবনা ছিল না। তিনি স্পষ্টই লিখিয়া গিয়াছেন,—"পাণ্ডুয়ার নিকটবর্ত্তী একটি মৌজার নাম একডালা;—তাহার একদিকে নদী, অন্যদিকে মহাবন।" * সমসাময়িক ইতিহাসে দুর্গাবরোধের যে সকল বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে, তাহাতেও একডালা দুর্গ পাণ্ডুয়ার নিকটবর্ত্তী বলিয়াই প্রতিভাত হয়। এখন আর সে পুরাতন দুর্গের চিহ্নমাত্রও বর্ত্তমান নাই;—তাহাতেই তাহার স্থান নির্ণয়ের বাদানুবাদে ইতিহাস ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতেছে! স্থানের নামও পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়া, আধুনিক লেখকগণকে গবেষণা বিস্তার করিবার সুযোগ প্রদান করিয়া থাকিতে পারে। কারণ, সামস্-ই-সিরাজের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়,—ফিরোজ শাহের দুর্গাক্রমণের পরে একডালার নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া, তাহা "আজাদপুর" নামে কথিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। † গৌড়ীয় ধ্বংসাবশেষের অন্তরালে—বিজনবনের অভ্যন্তরে—কত জয়পরাজয়ের লীলা-

* Ekdala is the name of a mouza close to Pandua, on one side of it is a river, and on another a jungle.—*Barni.*

† Shams-i-Siraj

ভূমি এইরূপে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে! একদা যে মহানন্দা-স্রোত শত সহস্র রণতরণীর পার্শ্ব-ধৌত করিয়া কলনিনাদে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইত, এখন তাহা গ্রীষ্মকালে অনেকস্থানেই প্রায় জলশূন্য হইয়া পড়ে! এই মহানন্দা আর সেই মহানন্দা;—এই মালদহ আর সেই মালদহ,—এই বাঙ্গালী আর সেই বাঙ্গালী, এক বিচিত্র স্বপ্নমোহে হৃদয় মন অভিভূত করিয়া দেয়! এই সকল কারণে, গৌড়কাহিনী এখন আরব্যোপন্যাসের কাল্পনিক কাহিনীর ন্যায় বিস্ময়াবহ হইয়া উঠিয়াছে;—এখন সেকালের সকল কথা সাহস করিয়া বিশ্বাস করিতেও ইতস্ততঃ উপস্থিত হয়!

যাঁহারা বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমানগণকে রণভীরু কাপুরুষ সাজাইয়া ইতিহাস রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের কপোল কল্পিত উপাখ্যানের উপর আস্থা স্থাপন করিয়া, একালের লোকে সেকালের ঐতিহাসিক সত্যের উপর আস্থাস্থাপন করিতে ইতস্ততঃ করিলে, তজ্জন্য কাহাকেও ভর্ৎসনা করিবার উপায় নাই। যাহারা স্বদেশের ইতিহাস সংকলনের জন্য যথাযোগ্য আগ্রহ প্রকাশে বিরত হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের ভাগ্যে এরূপ বিড়ম্বনা ভোগ কিছুমাত্র বিস্ময়ের ব্যাপার বলিয়া তর্ক-করিবারও উপায় নাই! নৈসর্গিক কারণ-পরম্পরা যে সকল সামরিক ব্যাপারে কেবল বাঙ্গালীদিগকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পারদর্শিতালাভের যোগ্য করিয়া তুলিয়াছিল, তাহার জন্য সেকালের বাঙ্গালী স্বদেশে বিদেশে সুপরিচিত থাকিয়াও, এখন সকলের কাছেই অপরিচিত হইয়া উঠিয়াছে! এখন বাঙ্গালী-ভীরু—বাঙ্গালী কাপুরুষ—বাঙ্গালী অন্তঃসারশূন্য বলিয়া নিন্দিত হইলেও, এই বাঙ্গালীরাই সেই বাঙ্গালীবংশধর—সেই হিন্দু, সেই মুসলমান,—বঙ্গমাতার স্নেহানুপালিত যুগল সন্তান,—সেই দেশ, সেই শস্যক্ষেত্র, সেই নদনদী অদ্যাপি উপভোগ করিয়া আসিতেছে। সেকালে যে সকল কারণে তাহারা স্বার্থ-সমন্বয়ে এক হইয়া উঠিয়াছিল, একালেও তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম উপস্থিত হয় নাই। অথচ অদৃষ্টের নিদারুণ পরিহাস রূপে, সমুচিত স্বদেশপ্রীতির অভাবে, তাহাদের সে প্রীতিবন্ধন উত্তরোত্তর শিথিল হইয়া পড়িতেছে! আমরা যে সময়ের কাহিনীসংকলনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তখনকার বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমান তাহাদের জয় পরাজয়ে তুল্যভাবে সহিষ্ণু হইয়া, স্বদেশের স্বাতন্ত্র্যরক্ষার্থ কিরূপ অধ্যবসায়ের পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছে, ফিরোজ শাহের ইতিহাসে তাহা কিয়ংপরিমাণে বিবৃত হইয়া রহিয়াছে। সে ইতিহাস বাঙ্গালীর বিজয়-গৌরবের ইতিহাস নহে;—তাহা দিল্লীশ্বরের বিজয়-গৌরবের ইতিহাস। সে ইতিহাস বাঙ্গালীর স্বদেশানুরাগ প্রসূত স্বজাতি পক্ষপাতপুষ্ট পদলালিত্যলীলার নিদর্শন নহে;—তাহা দিল্লীশ্বরের বেতনলুব্ধ সুপরিচিত পার্শ্বচরগণের লেখনীপ্রসূত সমসাময়িক ইতিহাস। তথাপি তাহাতে বাঙ্গালীর অতুল অধ্যবসায়ের প্রচুর পরিচয় অভিব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। সেকালের বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমান তাহাদের স্বদেশের স্বাতন্ত্র্যরক্ষার আশায় অকাতরে জীবন বিসর্জ্জন করিয়া,—পুনঃ পুনঃ পরাভূত হইয়াও,—পরিণামে কিরূপে বিজয়লাভ

করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহার কথা চিরদিনই সহৃদয় ইতিহাস লেখকের নিকট সমুচিত সমাদর লাভ করিতে পারিবে।

ফিরোজ শাহ একডালা দুর্গের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র, উভয়পক্ষে পুনরায় শক্তিপরীক্ষার সূত্রপাত হইল। রাজধানী শত্রুহস্তে পরাভূত হইয়া গিয়াছে,—সুলতান পুত্র শত্রু শিবিরে কারারুদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন,—বিজয়োন্মত্ত শত্রু সেনা সগর্ব্বে কৃপাণ আস্ফালিত করিয়া একডালা দুর্গ ভূমিসাৎ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে,—তাহাতে সুলতান সামসুদ্দীন কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তিনি সসৈন্যে দুর্গের বাহিরে আসিয়া, সম্মুখ সমরে দিল্লীশ্বরের গতিরোধ করিবার জন্য অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

প্রথম দিবসে যে যুদ্ধ হইল, তাহা ইতিহাসে "রুধিরাক্ত" * বলিয়া উল্লিখিত হইয়া রহিয়াছে। সে যুদ্ধে কেহ কাহাকেও ক্ষমা করিল না;—তথাপি কেহ কাহাকেও পরাভূত করিতে পারিল না। সম্রাট ফিরোজ শাহ তাঁহার বিপুল বাহিনী লইয়া দ্বাবিংশতি দিবস পর্য্যন্ত উপর্য্যুপরি দুর্গ প্রাচীর আক্রমণ করিতে লাগিলেন;—তথাপি দুর্গমধ্যে প্রবেশলাভ করিতে পারিলেন না! এই দুর্গাক্রমণে অস্ত্র শস্ত্রের অভাব ছিল না,—আগ্নেয়াস্ত্র পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইয়াছিল।† আক্রমণকারিগণের পক্ষে সমুচিত শৌর্য্যবীর্য্য প্রকাশেরও কোনরূপ অভাব ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না;—স্বয়ং সম্রাট এবং সামন্ত নরপালগণ সেনাচালনা করিয়াছিলেন। তথাপি একডালা দুর্গ পরাভূত হইল না! তাহা দিন দিন অজেয় বলিয়াই প্রতিভাত হইতে লাগিল।

যখন বাহুবল এইরূপে পুনঃ পুনঃ ব্যর্থ হইয়া গেল, তখন ফিরোজ সাহ ছল কৌশল অবলম্বন করিবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠিলেন। তিনি সসৈন্যে পলায়ন করিবার ভাণ করিয়া, গঙ্গাতীরে—একডালা হইতে সাতক্রোশ দূরে—শিবির সন্নিবেশ করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে দুর্গমূল হইতে বাদশাহের বিপুল বাহিনী অন্তর্হিত হইতে লাগিল;—হস্তি, অশ্ব, পটমণ্ডপ, আগ্নেয়াস্ত্র কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল, দুর্গবাসিগণ তাহার সন্ধান লাভ করিলেন না।

এই সময়ে মালদহ প্রদেশের প্রসিদ্ধ সাধুপুরুষ সেখ মকদুম সাহেবের দেহান্তর সংঘটিত হয়। তিনি নিয়ত অরণ্যমধ্যে বাস করিতেন বলিয়া, অরণ্যের রাজা (রাজা বিয়াবাণী) নামে কথিত হইতেন। দেশের লোকে তাঁহাকে পীরের ন্যায় পূজা করিত। সে বিষয়ে হিন্দু মুসলমান দিগের মধ্যে অল্পকালেই এক আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য সংস্থাপিত হইয়া গিয়াছিল।

---

* Riaz-us-Salateen.

† "Owing to the sword and the arrow, and the spear and the gun,
The market of fighting became warm on both sides.
The bodies of heroes were emptied of their souls.
Like roses on their faces budded forth wounds."

Riaz us-salateen.

তাহার জন্য অদ্যাপি মুসলমান সাধুপুরুষদিগের সমাধিক্ষেত্রে মুসলমানের ন্যায় হিন্দুরাও ভক্তিভরে উপহার প্রদান করিয়া আসিতেছে! "রাজা বিয়াবাণীর" অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করিবার জন্য দেশের লোক ছুটিয়া আসিতে লাগিল। সেই অবসরে সুলতান সামসুদ্দীন ফকির সাজিয়া দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি সাধুপুরুষের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যথাশাস্ত্র যোগদান করিয়া, ফকিরের ছদ্মবেশেই ফিরোজ শাহের শিবিরে প্রবেশ করিলেন। স্বয়ং সমস্ত শিবির পরিদর্শন করিয়া সামসুদ্দিন দুর্গ মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর, সে কথা ফিরোজ সাহের কর্ণগোচর হইল। তখন আর পরিতাপের অবধি রহিল না!

পলায়ন কেবল ভাণ,—সময় ও সুযোগ অন্বেষণ করিবার ছল কৌশল,—সামসুদ্দীন তাহা এইরূপে অবগত হইবামাত্র, সম্রাটকে সময় ও সুযোগ লাভের অবসর দান করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি সসৈন্যে দুর্গ হইতে বাহির হইয়া, সম্রাটের শিবির আক্রমণ করিবার জন্য ধাবিত হইলেন।

উভয়পক্ষে যেরূপ বীরবিক্রম প্রকাশিত হইয়াছিল, অল্পযুদ্ধেই সেরূপ বীরবিক্রম প্রকাশিত হইয়া থাকে। সুলতান সামসুদ্দীন এবং সুলতান ফিরোজ শাহ আপন আপন রাজছত্রতলে দণ্ডায়মান হইয়া, সেনাচালনায় ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। উভয়পক্ষেই সেনাদল বুঝিয়াছিল,—এই সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমি কাহার হইবে তাহার মীমাংসার জন্যই পরস্পরের মস্তক লক্ষ্য করিয়া পরস্পরের শাণিত কৃপাণ অনবরত উত্থিত এবং পতিত হইতেছে। বিজয়লক্ষ্মী কখন এক দিকে কখন অন্যদিকে কটাক্ষপাত করিয়া সময় কৌতুক দর্শন করিতেছেন।

সামসুদ্দীন বিজয়লাভ করিতে পারিলেন না। বাদসাহের বিপুল বাহিনী পরাভূত হইল না;—কেবল একলক্ষ বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমান তাহাদের শবরাশি দিয়া রণক্ষেত্র ঢাকিয়া ফেলিয়া চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল! সামসুদ্দীন পুনরায় দুর্গ মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন,—তাঁহার ছত্রপতাকা দিল্লীশ্বরের হস্তগত হইল!

অতঃপর আর যুদ্ধ হইল না;—উভয়পক্ষে সন্ধি সংস্থাপিত হইয়া গেল। কি কারণে সহসা সন্ধি সংস্থাপিত হইল, সে বিষয়ে ফিরোজশাহের ইতিহাস লেখকগণের সহিত গৌড়ীয় জনশ্রুতির সামঞ্জস্য-সংস্থাপনের উপায় নাই। দিল্লীশ্বরের ইতিহাস লেখকগণ লিখিয়া গিয়াছেন,—"দুর্গাভ্যন্তর হইতে অবরুদ্ধ রমণীগণ অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া কাতরকণ্ঠে আর্ত্তনাদ আরম্ভ করায়, ফিরোজ শাহ যুদ্ধ ত্যাগ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন"।* মালদহ প্রদেশের জনশ্রুতি অবলম্বন করিয়া, গোলাম হোসেন যে ইতিহাস রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে ইহার উল্লেখ নাই। এই একটি বিষয়ে মত পার্থক্য থাকিলেও,

* The females of the garrison, uncovering their heads, exhibited themselves and raised loud lamentations, which softened the heart of Firur shah, who abandoned the work of destruction.—Shamsi - Siroj.

আর একটি বিষয়ে মত পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় না। সকলেই লিখিয়া গিয়াছেন,—"বর্ষাকালের প্রারম্ভে এই রণ কোলাহল নিরস্ত করিয়া, সম্রাট ফিরোজ শাহ সন্ধি সংস্থাপিত করিয়াছিলেন।" গোলাম হোসেন লিখিয়া গিয়াছেন,—"বর্ষাকালে বঙ্গভূমি জলার্ণব হইয়া পড়ে, সেই আশঙ্কায়—বর্ষা আসিতেছে দেখিয়াই—ফিরোজ শাহ সন্ধির জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন"। * এই কাহিনী সত্য হইলে, ফিরোজ শাহের ব্যাকুলতার কারণ বুঝিতে পারা যায়।

যাহারা পুনঃ পুনঃ পরাভূত হইয়াও, শেষ পর্য্যন্ত দুর্গরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল;—যাহারা লক্ষবীর বিসর্জ্জন দিয়াও, স্বদেশের গৌরবরক্ষার্থ পরাজয় স্বীকারে সম্মত হয় নাই,—তাহারা বর্ষাকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারিলে, আক্রমণকারিগণকে সত্য সত্যই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতে পারিত। বর্ষা আসিতেছে বলিয়া তাহাদের পক্ষে সন্ধির জন্য ব্যাকুল হইবার সম্ভাবনা ছিল না। আর তাহারা ব্যাকুল হইলেই যে ফিরোজ শাহ দুর্গ অধিকার না করিয়া, বাঙ্গালীর স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করিতে আসিয়া স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিয়া লইতে সম্মত হইয়া,—বিজয়লব্ধ বন্দিগণকে অকাতরে মুক্তিদান করিয়া,—কেবল রমণী কণ্ঠের কাতরক্রন্দনে অভিভূত হইয়াই—সন্ধির জন্য সম্মতিজ্ঞাপন করিবেন, তাহারও সম্ভাবনা ছিল না! সুতরাং সন্ধি-সংস্থাপনের প্রকৃত কারণ যে মুক্ত কণ্ঠে ব্যক্ত হয় নাই, তাহাই বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হয়। একজন সত্যনিষ্ঠ ইতিহাস লেখক তাহা ইঙ্গিতে ব্যক্ত করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন,—"বর্ষার উপর দোষ চাপাইবার সুবিধা পাইয়া, ইতিহাস লেখকগণ ফিরোজ শাহের প্রত্যাবর্ত্তনের তদনুরূপ কারণ নির্দ্দেশ করিলেও, এই অভিযানে দিল্লীশ্বরের দুর্ব্বলতাই প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল।" †

সন্ধি সংস্থাপনের পর ফিরোজ শাহ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। গৌড়ীয় সুলতান দিল্লীশ্বরের মিত্রমধ্যে পরিগণিত হইলেন। উভয়ের মধ্যে শিষ্টাচার রক্ষার্থ উপঢৌকনের আদান প্রদান প্রচলিত হইল। বঙ্গভূমি পুনঃ পুনঃ পরাভূত হইয়াও, পরিণামে স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়া, গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের গৌরববর্দ্ধন করিল!

ফিরোজ শাহের বঙ্গবিজয় চেষ্টা প্রকৃত পক্ষে এইরূপে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল! কিন্তু তাঁহার বেতন লুব্ধ ইতিহাস লেখকগণ, সে কথার উল্লেখ না করিয়া, বঙ্গবীরগণকে ব্যঙ্গ করিয়াই, ব্যর্থবিজয়-যাত্রার মনস্তাপ দূর করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।‡ তাঁহারা যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহা বিদুষ-

* In short, when the period of seige was protracted, and the rainy season set in, in that in the rains, the country of Bengal becomes one sheet of water, and cause for anxiety arises, Sultan Firuz Shah made overtures for peace.—*Riaz-us Salateen.*

† But the invasion only resulted in confession of weakness, conveniently attributed to the periodical flooding of the country.—J. A. S. B. 1870. page 254.

‡ The well-known Bengal Paiks, who for years had borne the name of the

কের রচনায় উপযুক্ত হইলেও ঐতিহাসিকের রচনায় উপযুক্ত বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। কিন্তু তাহাকেই ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়া, একালের কোন কোন ইংরাজ লেখক বাঙ্গালীকে উপহাস করিবার প্রলোভনত্যাগ করিতে পারেন নাই। * যাহা হউক, এই সকল ব্যঙ্গোক্তির মধ্যেও একটি ঐতিহাসিক সত্য প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে;—তাহা প্রকারান্তরে বহুমূল্য। যাহারা দিল্লীশ্বরের গতিরোধ করিয়া স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অকাতরে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিল, তাহারা "বাঙ্গালী পাইক এবং বাঙ্গালী রাজা।" তাহারা পরাভূত হইলেও, পলায়ন করে নাই;—শত্রুহস্তে নিহত হইয়াছিল।

বাঙ্গালার ইতিহাস নানা কারণে সত্য মিথ্যায় আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। সমুচিত আলোচনার অভাবে, দিল্লীর পরিহাস পরায়ণ ইতিহাস লেখকগণের সকল কথাই বিনা বিচারে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া পুনঃ পুনঃ উদ্ধৃত হইয়া আসিতেছে। তাহাতেই ধারাবাহিক কলঙ্ককাহিনী বাঙ্গালীর স্মৃতি চিরকলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে! বর্ত্তমান ব্যাপারে বর্ষার উপর দোষ চাপান হইলেও, বর্ষার কিছুমাত্র অপরাধ ছিল না। কারণ, ফিরোজ শাহার চৈত্র মাসের শেষে (৫ই এপ্রেল, ১৩৫৩) প্রত্যাবর্ত্তন করিবার কথা, এই সকল ইতিহাসেই লিখিত রহিয়াছে!† গোলাম হোসেন পুরাতন লেখকগণের এই সকল কুৎসাপূর্ণ অসম্ভব কাহিনীর কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই। বাঙ্গালী পাইক এবং বাঙ্গালী রাজারা তাহাদের জন্মভূমির স্বাধীনতারক্ষার জন্য রণক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়াছিল;—পলায়ন না করিয়া জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিল,—দিল্লীশ্বর বিজয় লাভ করিয়াও, বর্ষা না আসিতেই বর্ষার আশঙ্কায়, রিক্তহস্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন,—বঙ্গভূমি আবার স্বাধীন হইয়া উঠিয়াছিল। এই সকল স্বীকৃত বিবরণের সহিত ব্যঙ্গোক্তির কিছুমাত্র সামঞ্জস্য না থাকায়, তাহা দিল্লীশ্বরের বেতনলুব্ধ ইতিহাসলেখকগণের সত্যনিষ্ঠার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারে না! বরং বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমান যে তৎকালে স্বাধীনতা লাভের জন্য

"Bengal Ancients," or "the dead," had taken a quid from Ilyas the Bhang-eater, in order to show that they were ready to sacrifice their lives for him; and standing in front of the train of that wild maniac, together with the mouldy-looking Bengalee Rajas, they bravely threw about their arms and legs; but as soon as the battle commenced, they put from fear their fingers into their months, gave up standing to attention, threw away swords and arrows, rubbed their foreheads on the ground, and were consumed by the swords of the enemies.—*Barni*.

* A graphic description, by the way, of the Bengal Military Police in 1354 A.D. —*Professor Blochmann*.

† Tarikh-i-Firoz Shahi.

আত্মত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াই অধ্যবসায় বলে পরিণামে দিল্লীশ্বরের ন্যায় প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে তাড়িত করিয়া, বিজয় লাভ করিয়াছিল, তাহাই প্রকারান্তরে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ফিরোজ শাহের ব্যবহার,—তাঁহার বিপুল বাহিনী সংগ্রহের চেষ্টা, ত্রিহুতের সামন্তগণের সহায়তা গ্রহণের ব্যগ্রতা,—নগর লুণ্ঠন না করিয়া নাগরিকগণের সহানুভূতি আকর্ষণের আয়োজন,—বাহুবলে দুর্গজয়ে অসমর্থ হইয়া ছল কৌশলে সফল কাম হইবার আশায় পলায়ন করিবার ভাণ,—বর্ষা আসিবার পূর্ব্বেই সন্ধির জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ,—গৌড়েশ্বরকে সর্ব্বপ্রকার স্বাতন্ত্র্য সম্ভোগের অবসর দান করিয়া অভিযানের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া রিক্তহস্তে প্রত্যাবর্ত্তন,—গৌড়েশ্বরকে সমকক্ষ সম্রাটের ন্যায় উপঢৌকন-বিনিময়ে সম্বর্দ্ধনা,—দিল্লীশ্বরের বেতনভুক্ত ইতিহাসলেখকগণের ব্যঙ্গোক্তির সহিত কিছুমাত্র সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে না। তাঁহাদিগের বর্ণনা অতিবাদপরায়ণ চাটুকারগণের চাটুবাক্য বলিয়াই প্রতিভাত হয়। তাহা ইতিহাস নহে,—উপাখ্যান!*

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

সফল-স্বপ্ন।*

(১)

হরিবাবু আপিস হইতে আসিয়াই চাপ্‌কান জুতা সমেত বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। তাঁহার স্ত্রী বিন্দু তাড়াতাড়ি আসিয়া পাখা করিতে করিতে বলিল, "আজকে কি বড় শ্রান্ত হয়েছ?" তাহার স্বামীর ম্লান ক্লিষ্টমুখ ও জ্যোতিহীন চক্ষু দেখিয়া বিন্দু বড় ভীত হইয়াছিল।

হরিবাবু বলিলেন, "হাঁ, আজ সমস্ত দিন বড় কষ্ট পেয়েছি, আজ মনটা বড় খারাপ, শরীরটাও কেমন কেমন কচ্ছে। উঃ দুরদৃষ্ট!" তৎপরে বুকভাঙা গভীর দীর্ঘশ্বাস।

বিন্দু ব্যথিত হইয়া শান্ত সোহাগে স্বামীকে একটি চুম্বন করিয়া স্বামীর চাপকানের বোতাম ও জুতা মোজা খুলিয়া দিয়া কাপড় ছাড়াইয়া হাত মুখ ধুইবার জল দিল। এবং—সেবা শুশ্রূষায়—স্বামীকে সুস্থ করিতে, যত্ন করিতে লাগিল।

বিন্দু বার বৎসর হরিবাবুর গৃহিণী। কিন্তু বিন্দু এখনো যেন নবোঢ়া বধূটির মত ব্রীড়াময়ী, সোহাগশীলা এবং স্বামীতে নিতান্ত নির্ভরপরায়ণা। এখন প্রেমের আগ্রহ-আবেগ উচ্ছ্বসিত না হইলেও প্রাণের কাণায় কাণায় থরটানে বহিতেছিল। সে স্বামীকে

---

* বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের রাজসাহীর শাখা সভার তৃতীয় বার্ষিক দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনে লেখক কর্তৃক পঠিত।

* কোন ইংরাজি গল্প হইতে।

ম্লান দেখিয়া বড়ই ব্যথিত হইয়া তাঁহার কষ্টের কারণ আন্দাজ করিতে লাগিল; কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিল না; তথাপি স্বামীকে কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। কষ্টের সময় কষ্টের কথা উত্থাপন করিতে সে ভাল বাসিত না। সে জানিত যে রাত্রির বিশ্রামে সুস্থচিত্ত হইয়া স্বামী নিজে সমস্ত বলিবেন—রাত্রির বিশ্রাম, মানসরোগের এমনি চমৎকার মহৌষধি।

বিন্দু খাইবার ঠাঁই করিয়া স্বামীকে ডাকিল। হরিবাবু বলিলেন, "আমি এখন খাব না; যদি ভাল থাকি, একটু রাত্রে খাব। তুমি খাওগে যাও।"

বিন্দু স্বামীর পদতলে আসিয়া বসিল এবং এক হাতে স্বামীর পদসংবাহন ও অন্যহস্তে পাখার বাতাস করিতে লাগিল।

হরিবাবুর যেন বোধ হইতে লাগিল, যে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কেমন অবশ শিথিল হইয়া আসিতেছে; মাথার ভিতর বোঁ বোঁ করিতেছে। জীবনী ক্রিয়া যেন স্তব্ধ হইয়া আসিতেছে। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আঃ বিন্দু, কত আশা ভরসা করেছিলাম; সব শেষ হয়ে গেল। বিন্দু ঝিকে একটু তামাক দিতে বল ত।" তামাক সকল দুঃখ বিনাশন, হতাশের অবলম্বন!

ঝি তামাক আনিয়া দিল। হুঁকায় এক টান দিতেই হরিবাবুর গা বমি বমি করিয়া উঠিল। তিনি বুঝিলেন যে, তাঁহার অতিপ্রিয় তামাকে যখন অরুচি হইয়াছে, তখন তাঁহার জীবন সঙ্কট নিশ্চিত। নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, অগতির গতি তামাকও তাঁহাকে ত্যাগ করিল! হায়!

তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। পায়ের তলা হইতে পৃথিবী যেন সরিয়া যাইতেছিল। সংসারে সব যেন ওলট পালট হইয়া যাইতেছিল। বিন্দুকে মনে করিয়া তিনি কাতর হইতেছিলেন। বাল্যাবধি প্রেমময়ী গৃহিণী গৃহকর্ম্ম ও স্বামীসেবায় পরিশ্রম করিতেছেন, আহা, তাঁহাকে কখন সুখ শান্তি, আরামে বিশ্রাম দিতে পারিলেন না, ইহা কি কম কষ্টের কথা। তিনি আজ কত আশা করিয়া, কি আনন্দোদ্বেলিত হৃদয় লইয়া আপিসে গিয়াছিলেন,—বিন্দুকে সুসংবাদ দিবেন বলিয়া কতই না আকাশকুসুম চয়ন করিতেছিলেন, কিন্তু হায়, সব আশা ভাঙ্গিয়া গেল, সব আনন্দ দগ্ধ হইল,—আজ একি বিষাদগুরু চিন্তাকুল চিত্তে তিনি শুধু দুঃখ ও পরাজয় সংবাদ বহন করিয়া বাড়ী ফিরিয়াছেন! কি দুর্দ্দৈব! হায় মনুষ্যের আশাবাহিত নিবুদ্ধিতা! বিন্দুর ভগ্নী ইন্দু ধনাঢ্যের গৃহিনী, তার কত সুখ, কত সম্পদ! আর বিন্দু দরিদ্র কেরাণীর হাতে পড়িয়া শুধু কষ্ট লাঞ্ছনাই ভোগ করিতেছে। দুই ভগ্নীর এমন অদৃষ্টের তারতম্য কেন? বিন্দু যদি আমার গৃহিণী না হইয়া কোন ধনাঢ্যের গৃহ অলঙ্কৃত করিত, সে সুখী হইত, আমিও নিশ্চিন্ত থাকিতাম।

হরিবাবু চিন্তায় দুঃখে মুহ্যমান হইয়া যন্ত্রণাব্যঞ্জক অস্ফুট ধ্বনি করিলেন। বিন্দু কাতর হইয়া আগ্রহে স্বামীর মুখের প্রতি চাহিল।

হরিবাবু চিন্তাদূর করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নিস্ফলতার ক্ষোভে তিনি দাঁত কড় মড় করিয়া উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন।

সংসারের অবহেলা, উপেক্ষা, তাচ্ছিল্য তিনি ভুলিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহার নিম্নতন কর্ম্মচারীর দ্বারা পরাভবে, তাঁহার মর্ম্ম স্থল ছিন্ন ভিন্ন হইতেছিল। পনর বৎসর বয়সে তিনি সাহা লাহা কোম্পানির আফিসে প্রবেশ করেন, সে আজ কুড়ি বৎসরের কথা। সামান্য বেতনের বিল সরকার হইতে পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও কর্ত্তব্য পালন দ্বারা তিনি এখন আপিসের প্রধান কেরাণী। তাঁহার একাগ্র প্রভুসেবার পুরস্কার স্বরূপ সংপ্রতি শূন্যীভূত' খাজাঞ্চির পদ তাঁহার নায্য প্রাপ্য ছিল; কিন্তু সাহা লাহা বাবুরা তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া—সতীশকে সেই পদ দিলেন। সতীশ ত বালক মাত্র; এবং এত কাল পর্য্যন্ত সে তাঁহারই অধস্তন আজ্ঞাবাহী কর্ম্মচারী ছিল। হায়, প্রভুদের কি অবিচার! কাল হইতে তিনি বালকের অধীন, আজ্ঞাবহ হইবেন।

ইহা মনে করিয়া হরিবাবু পুনরায় কাতর শব্দ করিলেন। তিনি চিন্তা রোধ করিতে পারিতেছিলেন না। এই পরাভব কি তাঁহার দোষে হইয়াছে? যদিও তিনি চির দিন প্রাণপণে কর্ত্তব্য পালন করিয়া প্রভুসেবা করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি আপন কর্ম্মিষ্ঠতা প্রচার করিবার মত তৎপরতা তাঁহার ছিল না। তিনি সতীশের মত অগ্রসর নীতিতে পরিপক্ক ছিলেন না; সেই জন্যই আজ সতীশ তাঁহাকে অতিক্রম ও উল্লঙ্ঘন করিয়া খাজাঞ্চির উচ্চ টেবিলের সম্মুখে গিয়া জাঁকাইয়া বসিল, আর তিনি সেই মসীমলিন পুরাতন টেবিলে বসিয়া বালক সতীশের আজ্ঞা পালনের জন্য অপেক্ষা করিবেন। হায় দগ্ধ অদৃষ্ট,' ধিক্ নিষ্ঠুর ললাটলিপি!

হরিবাবু বড় আশা করিয়াছিলেন, তিনিই জ্যেষ্ঠ পুরাতন কর্ম্মচারী বলিয়া তিনিই শূন্যপদ পাইবেন। মাসিক ত্রিশ টাকা বেতন বৃদ্ধি হইবে, বিন্দুকে কিছু সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দিতে পারিবেন বলিয়া বড় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন। আশাহত হইয়া আজ তিনি একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন; বিন্দুর দিকে চাহিতেও তাঁহার কান্না আসিতেছে। তাঁহার টানাটানির সংসারে বিন্দুর নিপুণ গৃহিণীপণা যথাসম্ভব পরিপাট্য ও শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়াছে; হরিবাবু মনে করিয়াছিলেন একটু স্বচ্ছলতা হইলে বিন্দুর চিন্তা পরিশ্রমের লাঘব হইবে; বিন্দুকে নিশ্চিন্ত সুখী দেখিয়া নিজেও নিশ্চিন্ত সুখী হইবেন। হায়, সকল আশা যে ফুরাইল।

তাঁহার মনে হইতে লাগিল, এখন তাঁহার মরণ মঙ্গল। তাঁহার পাঁচ হাজার টাকার জীবন বীমা করা আছে। বিন্দু কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া এ যাবৎ "প্রিমিয়ম্" দিয়া সেই "পলিসিটি" বজায় রাখিয়াছে। তিনি মরিলে বিন্দু সেই পাঁচ হাজার টাকা পাইয়া সুখী হইতে পারে। তাঁহার মৃত্যু একান্তই স্পৃহনীয়—এই মৃত্যুতে বিন্দুর সুখ এবং আপনার পরাভবগ্লানি হইতে অব্যাহতি! তবে এস মৃত্যু এস! হে সকলসন্তাপ হরণ, নূতন পরাভব, নূতন দুঃখ দ্বারা আক্রান্ত হইবার পূর্ব্বে আমাকে তোমার শান্ত স্নিগ্ধ ক্রোড়ে গ্রহণ কর। এস মৃত্যু, এস!

হরিবাবু সহসা বক্ষে বেদনা অনুভব করিলেন; তিনি বুঝিলেন, হৃৎপিণ্ডের সহসা

সঙ্কোচনের এ বেদনা। তাড়াতাড়ি বুকটাকে চাপিয়া ধরিলেন, সংজ্ঞালুপ্ত হইল।

এই ঘটনা এত অতর্কিত, এত ঝটিতি, যে তিনি প্রথমত মনে করিলেন ইহা মূর্চ্ছা বা তদ্রূপ আর কিছু। কিন্তু শীঘ্রই তিনি বুঝিতে পারিলেন, ইহা সর্ব্বগ্লানিহর মৃত্যুর শান্ত শীতল কোল। তিনি মরণের সীমার মধ্যে আসিয়া বিরাট শান্তি অনুভব করিয়া সুখী হইলেন।

মৃত্যুর পরে তাঁহার দিব্যজ্ঞান লাভ হইল। বেলুনে উঠিয়া দূর হইতে নগরের বিস্তৃত সম্পূর্ণ চিত্রশোভা দেখার মত তিনি আপনার মর্ত্ত্যজীবনখানিকে স্পষ্ট, অগুপ্ত সম্পূর্ণ দেখিতে পাইলেন। সুন্দর পুণ্য-হর্ম্ম্যবীথি, দূর হইতে ধূলিশূন্য, আবর্জ্জনা-শূন্য; সুখশান্তির শ্যামশস্পাবৃত প্রশস্ত ক্ষেত্র, ভাবরাগস্নেহসখ্যের বিচিত্র উদ্যান, শুশ্রূষারূপিণী নদীধারা, সম্মিলিত-নগর-কোলাহলের মত পুত্রকন্যার কলগুঞ্জন বড় অপূর্ব্ব সুন্দর বোধ হইতেছিল। পাপের পঙ্কমলিন প্রণালী ও পূতিময় গহ্বর সকল এই শোভাসম্মিলনের মধ্যে বড় একটা নজরে পড়িতেছিল না। হরিবাবু দেখিলেন, তাঁহার মর্ত্ত্যজীবন বিন্দুর স্নেহমার্জ্জিত সুচিক্কণ, সুন্দর, প্রায় নিখুঁত ছিল।

কিন্তু এই সুন্দর জীবনশোভার ভিতর তাঁহার পুত্রকন্যা ও পত্নীর করুণ বিলাপ বড় মর্ম্মন্তুদ বলিয়া মনে হইতেছিল। আহা, আজ তাহারা তাঁহারই জন্য কাঁদিয়া আকুল। এ ক্রন্দন দেখিয়া দুঃখও হয়, সুখও হয়।

বিন্দুর ভগ্নী ইন্দু, ভগ্নীপতির মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া, বিন্দুর বাড়িতে আসিয়া, কাঁদিয়া আছাড়িয়া পড়িল। ধনাঢ্যগৃহিনী গর্ব্বিতা ইন্দুকে শোকসন্তপ্ত দেখিয়া হরিবাবু আশ্চর্য্য হইলেন, সুখী হইলেন। প্রথম শোকাবেগ-শমিতা ইন্দু বলিল, "দিদি, তোর ভাগ্যে এমন কেন হ'ল? হরিবাবু যে তোকে বড় ভালবাসত দিদি; আমি অভাগিনী স্বামী-স্নেহবঞ্চিতা, তোর বদলে আমি বিধবা হ'লে ত' কোন ক্ষতি হ'ত না"। ইন্দু দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ইন্দুর কান্না দেখিয়া হরিবাবুরও কান্না আসিতেছিল; কিন্তু 'আত্মা কাঁদে না' বলিয়া শুধু দুঃখিত হইলেন। ভাবিলেন, "হায়, আমি কি ভ্রান্ত; মনে করিতাম ধনাঢ্য-বধূরা বুঝি বড় সুখী। বিন্দুর অর্থকষ্ট দূর করিবার জন্য আজ আমি মৃত্যুকে আবাহন করিয়া বরণ করিলাম। কিন্তু বিন্দুর সুখের তুলনায় ইন্দু আপনাকে অভাগিনী মনে করিতেছে। বিন্দু সুখী ছিল, শুনিয়াও সুখ হইল।" জীবনে যে ঘটনা সূত্র জটিল বোধ হইত, এখন মরণের ঐন্দ্রজালিক পারে দাঁড়াইয়া হরিবাবু একে একে সে সকল মুক্ত দেখিতে লাগিলেন।

তাঁহার মৃত্যুতে প্রতিবাসী পরিচিতদিগের দুঃখ দেখিয়া হরিবাবু বড় আরাম অনুভব করিতেছিলেন। রামবাবু, শ্যামবাবু, যদু-বাবু প্রভৃতির উপর জীবদ্দশায় তিনি কত বিরক্ত হইয়াছেন; তাঁহাদিগকে সহানুভূতিশূন্য ভব্যতাবর্জ্জিত বর্ব্বর মনে করিয়া কত অবিচার করিয়াছেন। এখন তাঁহারাই তাঁহার মৃত্যুতে কাতর হইয়া, তাঁহারই ছেলেমেয়েগুলিকে যত্ন করিতেছেন, বিন্দুকে সান্ত্বনা ও সাহায্য দিতেছেন। হায়, এখন

জীবনের পরপারে আসিয়া অতীতের ত্রুটি সংশোধন করিবার উপায় কৈ?

সন্ধ্যার সময় গৃহের মধ্যে যখন অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিয়া জমাট বাঁধিতেছিল, যখন ঝি মৃৎপ্রদীপ জ্বালিয়া প্রত্যেক ঘরে সন্ধ্যা দেখাইতেছিল, যখন ক্রন্দনক্লান্ত শিশুগুলি তাহাদের ভূলুন্ঠিতা মাতার চারিদিকে বসিয়া ঢুলিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে কে বহির্দ্বারের কড়ায় কটকটা শব্দ করিল। হরিবাবু—অর্থাৎ সেই আত্মা, যাহা এতদিন হরিবাবু-নামচিহ্নিত দেহ আশ্রয় করিয়া ছিল,—ভাবিতে লাগিলেন, 'এমন সময় আবার কে আসিল'? ঝি দরজা খুলিয়া দিল। হরিবাবু সতীশবাবুর মিষ্ট কণ্ঠ শুনিয়া চমকিত হইলেন।

সতীশবাবু ঝিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "হাঁগা, হরিবাবু আজ আপিসে যান নি, তাঁর কি কোন অসুখ করেছে? আমরা বড় চিন্তিত হয়ে' খবর নিতে এসেছি।"

হরিবাবু অবাক্। সতীশ, যাহাকে তিনি নিষ্ঠুর রাক্ষস প্রকৃতি মনে করিতে ছিলেন, সে তাঁহারই জন্য চিন্তিত! আপিসের সমস্ত দিনের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর, উজান রাস্তা বহিয়া আসিয়া তাঁহারই সন্ধান, তাঁহারই কুশল প্রশ্ন? এ উদ্বেগ, তাঁহাকে নিম্ন কর্ম্মচারী রূপে আদেশ করিবার সুখে বঞ্চিত হইতে হইবে বলিয়া কি?

ঝি সতীশবাবুর প্রশ্ন শুনিয়া কাঁদিয়া বলিল, "বাবু গো, আমাদের সর্ব্বনাশ হয়ে' গেছে; আমাদের বাবু স্বর্গে গেছেন"।

সতীশবাবু কাতর হইয়া সেখানে বসিয়া পড়িলেন। অনেকক্ষণ কিছু বলিতে পারিলেন না। তাহার পর যখন নতমস্তক উঠাইলেন, হরিবাবু সবিস্ময়ে দেখিলেন, দুই গণ্ড বহিয়া শোকাশ্রুর মন্দাকিনীধারা প্রবাহিত হইতেছে। হরিবাবু সতীশবাবুকে মমতাহীন, পরসুখদলন, নিষ্ঠুর রাক্ষস মনে করিতেছিলেন, কিন্তু এ কি যবনিকা উদ্ঘাটন! তিনি মনে করিতেন, তাঁহার সন্ততি স্ত্রী ভিন্ন অপর কেহ তাঁহার অভাব অনুভব করিবে না। কিন্তু মৃত্যু কি মধুর! কত পরকে আপন করিয়া দেয়! কত দোষ ত্রুটি গোপন করিয়া ফেলে, বিস্মৃত করিয়া দেয়। যে সতীশবাবু তাঁহাকে উলঙ্ঘন করিয়া উচ্চপদ গ্রাস করিয়া ছিলেন, তিনি এখন হরিবাবুর জন্য দুঃখিত, ব্যথিত। তিনি যে আর মসীলিপ্ত ভাঙাটেবিলে বসিয়া লেজার লিখিবেন না, ইহার জন্য আপিসের অন্তত একজনও দুঃখিত—ইহা কি মধুর সুখদৃশ্য!

সতীশবাবুর যাওয়ার পর ঘণ্টা খানেক অতিবাহিত হইয়াছে। শিশুগুলি ভীতি-বিহ্বল ক্ষুব্ধ চিত্তে শয্যা আশ্রয় করিয়াছে। দ্বারে এক খানা গাড়ী আসিয়া লাগিল, এবং কড়া নাড়ার শব্দ উঠিল। ঝি গিয়া দরজা খুলিয়া দিল। হরিবাবু সবিস্ময়ে দেখিলেন—লাহা বাবু স্বয়ং।

তিনি ঝিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হরিবাবু আজ আপিস যান নি কেন? অসুখ করেছে বুঝি? আমি একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করিতে পারি কি?"

ঝি কাঁদিয়া হরিবাবুর মৃত্যু সংবাদ জানাইল।

লাহাবাবু ওষ্ঠ দংশন করিয়া হৃদয়াবেগ দমন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, বোধ

বুঝা গেল। অনেকক্ষণ পরে আপনা আপনি বলিয়া উঠিলেন, "এবার আমাদের আপিসের বড় দুর্দ্দিন। পুরাণো খাজাঞ্চি গেল, পুরাণো বড় বাবু গেল; মনে করেছিলাম, হরিবাবু আছেন, হায় হায়, হরিবাবুকেও আমরা হারালাম। আমাদের সর্ব্বনাশ দেখ্‌ছি।"

হরিবাবু বড় খুসি হইলেন। কিন্তু মনে মনে বলিলেন, "সুবিচার করে, খাজাঞ্চির পদটা আমায় দিলে, আমাকেও এত শীঘ্র মরতে হ'ত না। সবই অ-দৃষ্ট অদৃষ্ট!"

সহসা হরিবাবু গায়ে কিসের আঘাত পাইয়া চমকিয়া উঠিলেন। দেখিলেন তিনি মৃত বা মূর্চ্ছিত নহেন, সদ্য সুপ্তোত্থিত। বিন্দু তাঁহাকে বাতাস করিতে করিতে ঢুলিয়া পড়াতে পাখাখানা তাঁহার গায়ে গিয়া ঠেকিয়া ঘুম ভাঙাইয়াছে। লংসাহেবের পিঞ্জার ঘড়ীতে ঢংঢং করিয়া দুইটা বাজিল, হরিবাবু চোখ মুছিতে মুছিতে উঠিয়া বসিলেন।

বিন্দু স্বামীকে সচেতন দেখিয়া হাসিয়া বলিল, "খুব ঘুমিয়েছ। এখন কিছু খাও।"

হরিবাবু একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "বড় ক্লান্ত হয়ে' পড়েছিলাম, তাই এসেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তুমি এখনো বসে' বাতাসই করছ! তুমি খেয়েছ"?

বিন্দু হাসিয়া বলিল, "প্রসাদের অপেক্ষায় আছি।"

হরিবাবু সস্নেহে সোহাগময়ী মৃদু-হাসরম্যা পত্নীকে বুকে চাপিয়া ভাবসুখে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

২

পর দিন কিছু বিলম্বে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাড়াতাড়ি স্নানাহার করিয়া তিনি ট্রামের উদ্দেশে ছুটিলেন। পত্নীর সহিত কোন কথাবার্ত্তাই হইল না। বিন্দু দুঃখিত হইল। স্বামীর বিমনা হওয়ার কারণ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অজ্ঞাতই রহিবে। স্বামীকে উন্মনা দেখিয়া পতিগতপ্রাণা সাধ্বীর বিষম ক্লেশ হইতেছিল, কারণ জানিয়া যদি প্রতিকার সম্ভব হয়, এই জন্য কারণ জানিতে বিন্দুর এত আগ্রহ।

হরিবাবু গত রাত্রের স্বপ্ন চিন্তা করিতে করিতে আপিসে গেলেন। আজ তাঁহার প্রসন্ন চিত্তে আশা ও আশ্বাস ভিন্ন নিরানন্দকর কিছু ছিল না। তিনি মনে করিতেছিলেন, সমস্ত সংসার কিছু তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া উচ্ছেদ করিতে বদ্ধ পরিকর নহে। যেমন করিয়া হৌক, তিনি অবস্থার উন্নতি করিবেনই। এজগতে সকলে সর্ব্বপ্রকারে সুখী হয় না। হয়ত কাহারো অর্থ আছে, স্বাস্থ্য নাই; কাহারো দুই আছে, পারিবারিক শান্তি নাই। অতএব মানুষ আপনার জীবনটি যেমনভাবে পায় তাহাতেই সন্তুষ্ট সুখী থাকা উচিত। দৈনন্দিন জীবন হইতে যতখানি সম্ভব সুখশান্তি নিষ্কাসিত করিয়া লওয়া উচিত। ষোল আনার অভাবে বারআনা ত্যাগকরা মূঢ়তা—মূর্খতা।

আপিসে পৌছিতে বিলম্ব হইল। যাইতেই সতীশবাবু প্রভৃতি সাগ্রহে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া উঠিয়া নমস্কার করিলেন। হরিবাবু প্রতিনমস্কার করিলেন; আংশিক স্বপ্ন সাফল্য দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। হরিবাবু আপনার ভাঙা চেয়ারে ছারপোকার আক্রমণ নিবারণের জন্য একখানা খবরের

কাগজ পাতিয়া বসিতে যাইবেন, সতীশবাবু তাঁহাকে বলিলেন, "লাহা বাবু একবার আপনাকে খুঁজিয়া গিয়াছেন, এবং আপনি আসিলেই খাস কামরায় পাঠাইয়া দিতে বলিয়া গিয়াছেন"। হরিবাবু অধিকতর বিস্মিত হইয়া বাবুদের কামরায় গেলেন।

তখন সাহাবাবু ও লাহাবাবু বরফ লেমনেড চুমুকে চুমুকে পান করিতেছিলেন। হরিবাবুকে দেখিয়া লাহাবাবু বলিলেন, "দেখুন হরিবাবু, রামেশ্বর বাবু কাজে অবসর নিচ্ছেন। আমরা আপনাকে তাঁর পদে নিযুক্ত করেছি। আপনি তাঁর কাছে চার্জ্জটা বুঝে নেবেন। কাল আপনি সকাল সকাল বাড়ী চলে গিছলেন বলে' কাল আর আপনাকে বলতে পারি নি"।

হরিবাবু আনন্দ-বিহ্বল হৃদয়ে অভিভূত হইয়া কৃতজ্ঞতার কথা কিছুই বলিতে পারিলেন না। ভাবমুখর নির্বাকদৃষ্টিতে অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেলেন।

এখন হরিবাবু বুঝিলেন, কেন তিনি খাজাঞ্চির পদ পান নাই। তিনি যে ম্যানেজার হইলেন। শত মুদ্রা মাসিক আয়বৃদ্ধি! পৃথিবী এখন তাঁহার চক্ষে রামধনুর সপ্তবর্ণে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সেই বিচিত্র বর্ণে তিনি দেখিলেন তাঁহারই বিন্দুর সন্তোষ-স্নেহস্মিতহাস্য ও কাঞ্চনাভরণ-বিচ্ছুরিত স্নিগ্ধ জ্যোতি!

বিন্দুকে কখন এই খবর দিয়া তাঁহার সুখপ্রদীপ্ত মুখখানি চুম্বনাচ্ছন্ন করিয়া দিবেন, তাহাই ভাবিতে ভাবিতে হরিবাবুর আপিসের ঘণ্টা কয়টা কূর্ম্মমন্থর গতিতে কোন মতে কাটিয়া গেল, সেদিন আর কোন কাজ হইল না।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

গোটা দুই তিন কঠিন কথা।

অবতারবাদ ও সাকারবাদ।

ফলত অবতারবাদ মাত্রেই সাকারবাদ। অবতীর্ণ হইতে গেলেই ঈশ্বরকে কোন না কোন আকার ধারণ করিতে হয়। আমাদের দেশে অবতার স্বীকার করিয়াও হয়ত কেহ বা নিরাকারবাদী থাকিতে পারেন। আমাদের শাস্ত্রে অবতার অসংখ্য, যুগাবতার লীলা-বতার, গুণাবতার, আবেশাবতার ইত্যাদি বহুবিধ অবতারের উল্লেখ আছে, আবার পূর্ণ অবতারেরও উল্লেখ আছে, আর মায়াবাদের সাহায্যে কোনো ব্যক্তি অবতার দেহকে মায়িক বলিয়া, অবতারীর নিরাশরত্ব সম্পূর্ণরূপেই রক্ষা করিতে পারেন। আর এরূপ সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা যে আমাদের মধ্যে একেবারেই হয় নাই, তাহাও নহে। কিন্তু খৃষ্টীয় অবতারবাদে—ইন্‌কারণেষন্—রক্তমাংসময় দেহ ধারণ বোঝায়। এখানে গুণাবতার, আবেশাবতার প্রভৃতির স্থান নাই। এখানে Word made flesh

—ঈশ্বরের যে বাক্য অনাদি আদি হইতে ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন, যিনি স্বয়ং ঈশ্বর —God or very God—তাহাই রক্তমাংসে পরিণত বা প্রকাশিত হয়। সুতরাং এখানে অবতারকে সাকার বলিতেই হয়। তবে যে আকারে যিশু ইহলোকে বিহার করিয়াছিলেন, তাহা সত্যই তাঁর দেহ ছিল, না, কেবল মাত্র ছায়াবাজির ছায়ার মত ছিল,—এ প্রশ্ন প্রাচী খৃষ্টমণ্ডলীর মধ্যেও উঠিয়াছিল। একদল লোকে যিশুর নরাকৃতি যে রক্তমাংস গঠিত ছিল, ইহা বিশ্বাস করিতেন না, তাঁরা বলিতেন যে যিশুকে কেবল মানুষের মত দেখাইত মাত্র, বস্তুত তিনি মানব দেহধারী ছিলেন না। আমাদের পরিভাষায় বলিতে গেলে; এই বলিতে হয় যে ইহাঁরা যিশুর মানব দেহকে "মায়িক" বলিয়া স্বীকার করিতেন, "কায়িক" বলিয়া মানিতেন না। কিন্তু খৃষ্টীয়মণ্ডলী ইহাদিগকে "হেরেটিক" বা অবিশ্বাসী বলিয়া বর্জ্জন করেন। তদবধি যিশু যে নরদেহে, সত্য সত্যই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহা সকল খৃষ্টীয়ান-মণ্ডলীই একবাক্যে স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। আর যিশু ও ঈশ্বরেতে যখন বস্তুত তত্ত্বত in Ousia or essence, কোনই পার্থক্য নাই, তখন ঈশ্বর তত্ত্ব নিরাকার হইয়াও মানবাকার ধারণে যে তাহার মর্য্যাদাহানি হয় না, ইহা খৃষ্টীয়ান্ মাত্রেই স্বীকার করিবেন। সুতরাং খৃষ্টশিষ্য-দিগকে কোনো ক্রমেই যথার্থ নিরাকারবাদী বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

ইস্‌লামের নিরাকারবাদ।

বর্ত্তমান সময়ে প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম সকলের মধ্যে এক ইস্‌লামকেই অনেক পরিমাণে নিরাকারবাদী বলা যায়। "অনেক পরিমাণে" বলিতেছি এই জন্য যে, ইস্‌লামও দ্বৈততত্ত্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং দ্বৈতবাদ ঈশ্বর-তত্ত্বে যে পরিচ্ছিন্নতা অপরিহার্য্য রূপে আরোপিত করে তাহার দ্বারা ইস্‌লামের ঈশ্বর-তত্ত্বেও একরূপ চিদাকার আরোপিত হইয়া থাকে। তথাপি ইস্‌লাম্ ঈশ্বরের অবতার বা বিগ্রহ এ সকল কিছুই স্বীকার করেন না। সুতরাং হিন্দুধর্ম্মে কিম্বা খৃষ্টীয়ধর্ম্মে যে আকারের সাকারবাদ দেখিতে পাওয়া যায়, ইস্‌লামে সেরূপ কিছুই পাওয়া যায় না। তবে ইস্‌লাম স্বর্গের যেরূপ কল্পনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নিরাকার বাদ সম্বন্ধেও অনেকটা সন্দেহ উপস্থিত হয়। মুসলমান সাধকদিগের জীবন চরিত পাঠে এ সন্দেহ আরো দৃঢ় হইয়াই উঠে। কারণ, ইস্‌লামের ঈশ্বরতত্ত্ব একান্ত নিরাকার যদিইবা হয়, মুসলমান সাধনাতে সে নিরাকারত্ব সম্পূর্ণ রূপে রক্ষিত নাই।

ইস্‌লামের গুরুবাদ।

কারণ, ইস্‌লামে অবতারবাদ না থাকিলেও অতি পরিস্ফুট আকারে গুরুবাদ আছে। ইস্‌লাম অবতার অস্বীকার করিয়াও নবী বা প্রবক্তা স্বীকার করেন। ইহাঁরা ঈশ্বরের প্রেরিত, ঈশ্বরের প্রিয়, ঈশ্বরের আদেশ প্রচার করিয়া লোকমণ্ডলীকে ধর্ম্ম পথে লইয়া যান। রসুলকে ছাড়িয়া কোনো মুসলমান খোদার দরজায় পৌছিতে পারেন না। সুতরাং হজরত্ মোহম্মদী মুসলমান সাধনার অপরিহার্য্য অঙ্গ। গভীর যোগে ও সমাধিতে মুসলমান সাধকদিগের সম্বন্ধে

হজ্‌রত মোহম্মদ বা আলী প্রভৃতি তাঁহার আসন্ন পরিচারক ও শিষ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ সর্ব্বদাই প্রকাশিত হইয়া থাকেন। যে সাধক এইরূপে ধ্যানযোগে আল্লার রসুলের বা তাঁহার অনুচরগণের সাক্ষাৎকার লাভ করেন, ইস্‌লাম তাঁহাকে অতি উচ্চ অধিকারী বলিয়া গণ্য করেন। সুতরাং তত্ত্বাঙ্গে একরূপ নিরাকার হইয়াও, সাধনাবলে, এই গুরুবাদ নিবন্ধন, ইস্‌লাম যে সাকার-আশ্রয় লইয়া থাকেন, ইহা অস্বীকার করা অসম্ভব।

সাকারোপাসনা-পরদেবোপাসনা।

অতএব, জগতে প্রাচীন কাল হইতে যে সকল ধর্ম্ম লোকসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, তাহার আলোচনাতে দেখি যে এক ভারতবর্ষে, নির্গুণ ব্রহ্মোপাসকদিগের দ্বারাই কেবল যথার্থ নিরাকারতত্ত্ব আয়ত্ত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। আর সকল ধর্ম্মেই কোথাও বা তত্ত্বাঙ্গে ও সাধনাঙ্গে উভয়ত, কোথাও বা অন্তত সাধনাঙ্গেও, কোনো না কোনো আকারে সাকারবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহুদী, খৃষ্টীয়ান, বা ইস্‌লাম ধর্ম্মে যে আপাতত সাকারোপাসনার তীব্র প্রতিবাদ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অর্থ একান্তভাবে সাকারোপাসনা বর্জ্জন করা নহে, কিন্তু পরদেবোপাসনা মাত্রকে বিগর্হিত বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করা। ইহুদায় মূর্ত্তিপূজা পাপ বলিয়া পরিত্যক্ত হয়। ইহুদীয় এই আদেশের বশেই খৃষ্টীয়ান-মণ্ডলী মধ্যেও সাকারোপাসনা বর্জ্জিত হইয়াছে। ইস্‌লামও এই দশাজ্ঞাকে ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া মানেন, এবং ইস্‌লামের সাকারোপাসনার বিরুদ্ধে যে তীব্র প্রতিবাদ দেখা যায়, তাহাও মূলে ইহুদা ধর্ম্ম হইতেই গৃহীত হইয়াছে। মোহম্মদের সময়ে আরবে নানা প্রকারের দেব দেবীর ভজনা বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল। এই সকল দেবোপাসনার সঙ্গে প্রথম হইতেই ইস্‌লামের ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বিতা দাঁড়াইয়া যায়। ক্রমে এই দেবোপাসকদিগের সঙ্গে মোহম্মদ ও তাঁহার শিষ্যগণের মারাত্মক বিরোধ উপস্থিত হয়, এবং ইহাদের হাতে প্রথমে হজরত্‌ ও তাঁহার ভক্তগণ নিরতিশয় লাঞ্ছনা প্রাপ্ত হন। এই কারণে, ভূতপরস্তদের প্রতি স্বভাবতঃই ইস্‌লামের একটা গভীর বিদ্বেষ জন্মিয়া যায়। আপনার মণ্ডলীর পবিত্রতা, অর্থাৎ পার্থক্য, রাখিবার জন্য, মোহম্মদকে অতি তীব্রভাবে এই সাকারাবাদের নিন্দা করিতে হয়। সুতরাং মূলত ইহুদীয়, খৃষ্টীয় বা মোহম্মদীয় ধর্ম্মে যে সাকারবাদ বর্জ্জিত হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম নিরাকারবাদ প্রতিষ্ঠা করা নহে, কিন্তু ঐকান্তিকভাবে পরদেবোপাসনার মত্র প্রতিরোধ করা। যে প্রয়োজনে প্রাচীন ভারতে, আর্য্যসমাজে, অনার্য্য মিশ্রণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া, আপনাদিগের জাতিগত প্রাধান্য, বিশেষত্ব, ও বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবার জন্য জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ঠিক তদনুরূপ প্রয়োজনে, ইহুদীয় ও পরে খৃষ্টীয় ও মোহম্মদীয় ধর্ম্মে সাকারোপাসনার বিরুদ্ধে এরূপ কঠোর নিষেধ প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রচ্ছন্ন সাকারবাদ।

ফলত প্রকৃত নিরাকারবাদী সাকারো-

পাসনাকে মিথ্যা ও কল্পিত বলিয়া বর্জ্জন করিলেও, পাপ বলিয়া কখনো ঘৃণা করিতে পারেন না। সাকারোপাসনায় ঈশ্বরের অবমাননা হয়, এ কথা যাঁরা বলেন, তাঁরা বাস্তবিক একান্ত নিরাকারবাদী নহেন। অজ্ঞাতসারে, তাঁহারা ঈশ্বরের কোনো নির্দ্দিষ্ট আকার আছে, ইহা ধরিয়া লন। যাঁর কোনো নিজস্ব আকার আছে, অন্য আকারে উপস্থিত করিলেই তাঁহার গৌরবহানির সম্ভাবনা আছে, ইহা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু যাঁর নিজস্ব কোনো আকারই নাই, যে বস্তু একান্ত নিরাকার, তাহাতে কোনো ভক্তিযোগ্য আকার আরোপ করিলে তাঁহার অবমাননা হইবে কেন? সুতরাং সাকারোপাসনারকে যাঁরা পাপ বলিয়া বর্জ্জন করিতে বলেন, তাঁহাদিগকে প্রচ্ছন্ন-সাকার-বাদী ভিন্ন, আর কিই বা বলা যাইতে পারে? ভারতের নির্গুণ ব্রহ্মোপাসক বা শুদ্ধাদ্বৈত-বাদীই প্রকৃত নিরাকারবাদী; সুতরাং তাঁহারা সাকারোপাসনাকে অসৎ বলিয়া উপেক্ষা করিলেও, কখনো অপরাধ বলিয়া নিষেধ করেন না। হিন্দু বৈদান্তিকেরা নিরাকারের উপাসক হইয়াও খৃষ্টীয়ান বা মুসলমান ধর্ম্মোপদেষ্টাগণের ন্যায়, কেন যে দেশ প্রচলিত প্রতিমা-পূজার কোনো বিশেষ প্রতিবাদ করেন না,—তাঁহাদের বিশুদ্ধনিরা-কারবাদই ইহার প্রধান কারণ।

অবিদ্যাবদ্বিষয়াণি।

ইহাঁদের চক্ষে, সাক্ষাৎ ব্রহ্মানুভূতি না হওয়া পর্য্যন্ত জীব যা কিছু সাধন ভজন করুক না কেন, সকলই পরমার্থিক দৃষ্টিতে মিথ্যা, সকলই অবিদ্যাবদ্বিষয়ানি। বিষয়ে, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার,—এ সকলই মায়াধীন, মায়াভিভূত। জীব যতক্ষণ না এ সকলকে একান্তভাবে অতিক্রম করিতে পারিয়াছে, ততক্ষণ তাহার আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হয় না। ততক্ষণ সে যে কোনো প্রকারের উপাসনায় নিযুক্ত হউক না কেন, তৎসমুদায়ই মায়িক, মিথ্যা, কল্পিত। সমাধিতে আত্মসাক্ষাৎকার হয়। সমাধিতে সকল ইন্দ্রিয়চেষ্টা রুদ্ধ হইয়া যায়। সে অবস্থায় দ্রষ্টা স্বরূপে অবস্থান করেন; আর তখন কঃ কেন পশ্যেৎ—কে কাহার দ্বারা কা'কে দেখে, কে কিসের দ্বারা কা'কে শোনে,—সকলেই ব্রহ্মাত্মৈকত্বে একীভূত হইয়া, কেবল আনন্দঘন মাত্র অনুভূত হয়। তখন উপাস্য উপাসকের সম্বন্ধও লুপ্ত হয়। এইজন্য অদ্বৈত সিদ্ধান্তে উপাসনামাত্রেই, ভেদাত্মক বলিয়া, মিথ্যা। কিন্তু মিথ্যা হইলেও, নিষ্ফল নহে। কারণ ইহার দ্বারাই ক্রমে শুদ্ধচিত্ত হইয়া, সাধক অদ্বৈততত্ত্বে প্রবেশ করেন। নিম্ন অধিকারীর জন্য উপাসনাদি নিত্য কর্ম্মরূপে বিহিত হয়।

ক্রমশ।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বাঙ্গালার জমীদার।

The ancient houses of Bengal, who had enjoyed a semi-independence under the Moghuls and whom the British Government subsequently acknowledged as the lords of the soil, fared still worse. *From the year 1770 the ruin of two thirds of the old aristocracy of Lower Bengal dates.—W. Hunter.*

এদেশে আসিয়া কোম্পানী বাহাদুর যখন নানা উপায়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছিলেন, তখনো বাঙ্গালার জমীদারগণের প্রভু-শক্তি পূর্ব্বমতই ছিল। সরকার বাহাদুর তাঁহাদের উপর হস্তক্ষেপ করেন নাই। বঙ্গীয় জমীদারগণ অর্দ্ধস্বাধীন নৃপতির ন্যায় আপন-আপন জমীদারী শাসন করিতেন ও যাঁহারা সীমান্তে অবস্থান করিতেছিলেন তাঁহারা সীমারক্ষার জন্য দায়ী ছিলেন, তখন সকলকেই আপন-আপন দেয় রাজকর যথাযোগ্য সময়ে যোগাইতে হইত—বাঙ্গালার নায়েব উহা গ্রহণ করিতেন।

বাঙ্গালায় যখন দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইল তখন তাঁহাদিগের হৃদয়-শোণিত শুষ্ক হইয়া উঠিল, প্রজা বাঁচিবে কিসে? তাঁহারাই বা কোম্পানী বাহাদুরের রাজস্ব দিবেন কিরূপে? সর্ব্ব প্রথমে বর্দ্ধমান হইতে রোদনের রোল উঠিল। মহারাজা ব্যাকুল-হৃদয়ে কোম্পানী বাহাদুরকে জানাইলেন;—

'এ বৎসরের জলকষ্ট এবং শস্যের দুর্ম্মূল্যতা আমি কেমন করিয়া বর্ণনা করিব! ক্ষেত্রে যে শস্য ছিল তাহা প্রথমেই ঝলসাইয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে—এখন উহা পশ্বাদির আহারের জন্য কর্ত্তিত হইতেছে। পুষ্করিণীগুলি শুষ্ক—যে সামান্য জল আছে তাহা বর্দ্ধমানের নাগরিকদিগের পক্ষেই একান্ত অপ্রচুর।......প্রজাগণ এ দেশ ত্যাগ করিয়া দলে দলে পলায়ন করিতেছে; এত দুর্দ্দৈব সত্বেও কোম্পানীর রাজস্ব আদায়ে আমার শৈথিল্য নাই! কিন্তু দুর্দ্দশাগ্রস্থ হইয়াও যে কেমন করিয়া দেশে লোক থাকিবে—কেমন করিয়াই যে তাহারা খাজনা দিবে তাহা বুঝিতে পারি না। আপনারা বঙ্গের রক্ষক—তাই দাস আজি কর্ত্তব্য-বোধে এ সকল সংবাদ নিবেদন করিতেছে। আপনারা এখন বন্দোবস্ত করুন যেন এ দেশ জনশূন্য হইয়া না যায়—প্রজাগণ যেন তাহাদিগের গৃহে থাকিতে পায়।' *

---

* Bengal Public consultation : Nov 20, 1769

বর্দ্ধমানের দুর্দ্দশা দেখিয়া রাজস্ব মাপ দিবার প্রস্তাব প্রথমে তথা হইতেই উত্থাপিত হইয়াছিল। প্রেসিডেণ্ট গ্রাহাম সাহেব পর্য্যন্ত কোম্পানী বাহাদুরের চৈতন্য সম্পাদনে চেষ্টা করিয়াছিলেন। * অনেক বিচার-বিতর্কের পর বাঙ্গালার বণিক কর্ত্তারা বলিয়াছিলেন যে তাঁহারা আড়াই কি তিন লক্ষ মুদ্রা মাপ দিতে পারেন কিন্তু বর্দ্ধমানধীপকেও তাহার অংশ বহন করিতে হইবে এবং চারি বর্ষের রাজস্বের সহিত নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে প্রজাদিগকে অবশিষ্টাংশ পরিশোধ করিতে হইবে! + ইহারই নাম রাজস্ব মাপ! কোম্পানী বাহাদুর যদিও পাশ্চাত্য সত্যনিষ্ঠার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া বিলাতের কর্ত্তাদিগের নিকট লিখিয়াছিলেন যে আড়াই কি তিন লক্ষ মুদ্রা রাজস্ব 'মাপ' দেওয়া হইয়াছে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এক লক্ষ (!) মুদ্রাও মাপ দেওয়া হয় নাই! ‡

যে রাজবংশ মুসলমান বাদশাহের সময়ে সিংহাসনের মিত্র বলিয়া পরিগণিত ছিলেন— নগণ্য জমীদার-প্রজা বলিয়া নহে; ধনে জনে অতুল সম্পদে যাঁহার প্রাসাদ সর্ব্বদা আনন্দধাম বলিয়া বর্দ্ধমানে বিখ্যাত ছিল—কোম্পানী বাহাদুরের আমলে, বাঙ্গালায় সেই কাল মন্বন্তরে তাঁহার জমীদারিও শ্মশান হইয়াছিল। যাঁহার অধিকৃত ভূমি এতদূর বিস্তৃত ছিল যে তিনি এক দিনে যতদূরই কেন গমন না করুন, কখনই স্বাধিকারের বাহিরে যাইয়া তাঁহাকে নিদ্রিত হইতে হইত না—সেই বর্দ্ধমানের রাজবংশ এক বৎসরে ভিখারী হইয়াছিল! বৃদ্ধ মহারাজা মন্বন্তরের শেষ শেষ সময়ে শোকে প্রাণত্যাগ করিলেন। তখন তাঁহার রাজকোষ শূন্য ছিল! যাঁহার অর্থের পরিমাণ ছিল না, তাঁহারই শ্রাদ্ধের জন্য রাজপরিবারের অলঙ্কারাদি গলাইয়া বিক্রয় করিতে হইয়াছিল! ইহার ষোড়শবর্ষ পরেই বর্দ্ধমানের নবীন মহারাজা কোম্পানী বাহাদুরের রাজস্ব পরিশোধ করিতে অসমর্থ হইয়া আপনার রাজপ্রাসাদে আপনিই বন্দী হইয়াছিলেন—তাঁহার ভূসম্পত্তি নিলামে উঠিয়াছিল! ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বিধাতার

---

* Letter from J. Graham Esq resident to the Collector-General Nov 10, 1769

† In our letter of the 25th January 1770, by the Grafton, we informed you that, on account of the famine which prevailed throughout the country, *we had made a remmission to the farmers in the Burdwan province of about 2½ or 3 lacks of rupees, on condition that they should discharge it at certain periods, with the rent of the next year.*—Bengal General Letter: Feb 12, 1771.

Agreed that it be adopted; but the Board at the same time think the Rajah should bear his portion of this remission:—Bengal Public consultation.

Nov. 20, 1769.

‡ *In reality less than a single lac, or only £8218 was remitted* and even this had to be paid up at the commencement of the next year.—W. Hunter.

বঙ্গের মত বৰ্দ্ধমানের রাজবংশ ধ্বংস করিয়াছিল।

রাজসাহীর গৌরব লক্ষ্মী—নাটোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—বঙ্গের প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভবানী—যাঁহার শক্তি ও সমৃদ্ধি, প্রতিভা ও দয়া প্রবাদবাক্যের ন্যায় সমস্ত বাঙ্গালায় বিশ্রুত ছিল—যাঁহার উল্লেখ করিতে হইলে লোকে এখনো 'বাহান্ন লক্ষের ঘর' বলিয়া থাকে—যে রঘুনন্দনের বুদ্ধি বলে বাঙ্গালার প্রায় পঞ্চমাংশ নাটোরের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল—যাঁহার রাজত্বের পরিমাণ সেকালে দ্বাদশ সহস্র বর্গমাইলেরও অধিক ছিল—রাজসাহী বগুড়া, পাবনা, রঙ্গপুর, যশোহরের অর্দ্ধাংশ, ফরিদপুরের প্রায় সমুদয় ভাগ এবং মুর্শিদাবাদের উত্তর খণ্ড যাঁহার জমীদারী ছিল—যিনি ২৪৫১০২২ মুদ্রা রাজস্ব প্রদান করিতেন, সেই রঘুনন্দনের ভ্রাতষ্পুত্রবধূ মহারাণী ভবানীও কোম্পানীর রাজস্বের ভয়ে বিচলিতা হইয়া ছিলেন—তিনিও ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের স্পর্শে দগ্ধ হইয়া কোম্পানী বাহাদুরের নিকট আবেদন জানাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন!

রাউস সাহেব তখন রাজসাহীর সুপারভাইজার ছিলেন। রাউস সাহেব সহৃদয় ছিলেন বলিয়া অনুমান হয়, নতুবা রাজসাহীর দুঃস্থ প্রজাকুলের অবস্থা বর্ণনা করিয়া তিনি কোম্পানী বাহাদুরের অপ্রিয় ভাজন হইতেন না। মহারাণী ভবানী দেশের অবস্থা দর্শনে নিজের অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছিলেন তাই রাউস সাহেবের নিকট লিখিয়াছিলেন—

'প্রজাগণ মরিয়া কৌত হইয়াছে—অনেকে পলায়নও করিয়াছে। রাজসাহী তাই বিধ্বংস-প্রায় জনশূন্য হইয়াছে। আপনারা যখন দেশের করগ্রাহী এবং আপনারাই যখন এ দেশের বিচার কর্ত্তা, তখন যদি নিজেরা ভাল করিয়া দেখিয়া-শুনিয়া এ দেশের বকেয়া রাজস্বের একটা বিলি-বন্দোবস্ত না করেন তবে আমার আর উপায়ান্তর নাই। এতকাল হইতে বংশানুক্রমে আমি যে জমীদারী ভোগ করিতেছি, তাহা হইলে, উহা হইতে আমি অচিরে বঞ্চিতা হইব! আপনারা আমাকে যেরূপ স্নেহ ও শ্রদ্ধা করেন তাহাতে আমি আশা করি যে আপনারা বন্ধুর মত এমন কোনো-একটা বন্দোবস্ত করিবেন যেন আমি আমার সম্পত্তি হইতে বঞ্চিতা না হই এবং আগামী বর্ষের মাল গুজারিও অনায়াসে প্রদান করিতে পারি।' *

মহারাণীর চেষ্টা বৃথা হইয়াছিল। রাউস সাহেবের অনুরোধ ব্যর্থ হইয়াছিল। কোম্পানী বাহাদুর রাউস সাহেবকে লিখিয়াছিলেন—'আপনার নিকট রাণী যে আর্জ্জি করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে আগামী বর্ষের রাজস্ব যাহাতে সম্পূর্ণরূপে আদায় হয় তদ্বিষয়ে আমাদিগের ন্যায় আপনাদের দৃষ্টি থাকা একান্ত প্রয়োজন—জমীদারের কথার উপর নির্ভর করিবার প্রয়োজন নাই। চুক্তি ভঙ্গের জন্য পুরুষানুক্রমে রাণীকে যে দণ্ডভোগ করিতে হইবে তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ মানসে তিনি কি উপায় অবলম্বন করিতে চাহেন আমরা সানন্দ-হৃদয়ে তাহা শ্রবণ করিব।' † কোম্পানী

* 'Proceedings of the Provincial Council at Moorshedabad: 20 May, 1771

† 'With respect to the *arzee* addressed to you by the *Ranee* we can only say that

বাহাদুর এই খানেই নিরস্ত হন নাই তাঁহারা মহারাণী ভবানীকে রাজ্যবিচ্যুতা করিবারও ভয় দেখাইয়া ছিলেন ! * রাজসাহীর অপর এক জন জমীদারকেও রাউস সাহেব জানাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে সরকার বাহাদুর তাঁহাদের পাওনা গণ্ডা ষোলো আনা বুঝিয়া লইতে চাহেন—এক কড়া কড়িও ছাড়িবেন না—কোনরূপ আপত্তিই গ্রাহ্য করিবেন না ! †

নদীয়ার রাজা—যাঁহার বংশ এক দিন বাঙ্গালার সিংহাসন আলোকিত করিয়াছিল—তিনিও মন্বন্তরের সময়ে লাঞ্ছিত লুণ্ঠিত, এবং অপমানিত হইয়া রাজ্য হারাইয়া ছিলেন। কোম্পানী বাহাদুর কাহাকেও ছাড়েন নাই। ‡ যে রাজমহল এক দিন বাঙ্গালার নবাবের রাজধানী ছিল—বালেশ্বরে জাহাজ রাখিয়া হুগলির বাজারে পণ্য মাথায় করিয়া বিক্রয় করিবার আদেশ লাভ করিতেও কোম্পানী বাহাদুর এক দিন ভিখারীর বেশে যে রাজমহলের নবাবদরবারে কত না কুর্ণীশ করিয়াছিলেন, সেই রাজমহলের জমীদারগণ একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। §

ইতিহাস অতীতের সাক্ষী ; বীরভূমির কলেক্টরীর দপ্তর হইতে সেই জীর্ণ ইতিহাস উদ্ধার করিলে দেখা যাইবে যে সেই বঙ্গবিখ্যাত মল্লভূমির (বিষ্ণুপুর) বৃদ্ধ হিন্দুরাজা রাজস্বের দায়ে অনেক দিন পর্য্যন্ত কারারুদ্ধ থাকিয়া অবশেষে মরিবার জন্যই কারামুক্ত হইয়াছিলেন ! বীরভূমির মুসলমান নরপতি যতদিন অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছিলেন ততদিন পর্য্যন্ত রক্ষা পাইয়াছিলেন বটে কিন্তু পরিণত-বয়স্ক হইবা মাত্রই বকেয়ার দায়ে কারাকক্ষে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন !

দিনাজপুরের রাজা বৈজনাথ ভবিষ্যতের ভয়ে ভীত হইয়া করুণকণ্ঠে দিনাজপুরের

---

it must become our object as well as yours to secure the Government's revenue for the ensuing year, without placing any dependence on the Zemindar's engagements ; but we shall be glad to hear what proposals the *Ranee* is disposed to make for the liquidation of the balance that may remain due of the present year on making up the general account current, to prevent the penalty of engagement she is now under, being in force against her and her son.—Proceedings of the Provincial Council at Moorshedabad : May 20, 1771.

* Letter from President and Council to the Court of Directors : 5 March, 1774 (*para* 6).

† I have now, however, informed the Zemindar of your determination to admit no balances upon any account whatsoever ; and if the collections will not enable him to fulfil his engagements, I conceive there is always one expedient left, that of selling some of the lands of his Zemindary.—Letter of Mr. Rous : 13 April, 1771

‡ Bengal Letter : 10 November, 1773 (paras 8 and 11)

§ Consultation of the 28th April, 1770.

দৈন্যদশা জানাইয়া ছিলেন এবং "যায় না যায়" প্রদর্শন মানসে বাঙ্গালার নায়েব-দেওয়ানের নিকট দিনাজপুরের হস্তবুদ * প্রেরণ পূর্ব্বক দয়া ভিক্ষা করিয়াছিলেন। ভাবিয়াছিলেন, সরকার বাহাদুর, "হস্তবুদ" দেখিয়াই তাঁহাকে 'না যায়ের' দায় হইতে অব্যাহতি দিবেন। হায় দুরাশা!

হস্তবুদ দেখিয়া রেভিনিউ বোর্ড বলিয়াছিলেন—'দিনাজপুরের সমুদয় সরঞ্জামী ব্যয় বাদেই আমরা ১২০০০০০ টাকা আদায় করিয়াছি (!) সুতরাং রাজার প্রেরিত হস্তবুদ কোম্পানীকে প্রবঞ্চনা করিবার ছল মাত্র!...... আমরা দিনাজপুর হইতে যে পরিমাণ অর্থ প্রত্যাশা করি রাজা যদি তাহা সংগ্রহে যত্নবান না হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার জমীদারীও যাইবে এবং মুর্শিদাবাদে আসিয়া সরকারের প্রাপ্য পরিশোধ করিবার জন্য তাঁহার 'তলব' ও হইবে। † রাজা বৈদ্যনাথ জানিতেন যে মুর্শিদাবাদে তলব অর্থেই কারাগারে প্রেরণ এবং লাঞ্ছনা। তিনি প্রাণ অপেক্ষা মানকে রক্ষা করিবার জন্য 'যত্নবান' হইলেন—প্রজার নয়নজলের সহিত তাঁহার নয়নজল মিশিয়া গেল।

হায় বঙ্গভূমি! দেশের যাঁহারা শক্তিস্তম্ভ ছিলেন, যাঁহারা কল্পতরুর ন্যায় দান করিতেন, যাঁহাদের জমীদারী এক দিন সুদূর বিস্তৃত ছিল—বাঙ্গালার সেই ধনকুবেরগণ যেন কোন্ এক মন্ত্রকুহকে সমৃদ্ধির শিখর দেশ হইতে দুর্দ্দশার অন্ধতমসাচ্ছন্ন গভীর গহ্বরে নিপতিত হইয়াছিলেন—তাঁহাদিগের প্রাসাদ, প্রসিদ্ধ, ধন, জন, সমস্তই যেন কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছিল! কয়েকখানি জীর্ণ-ভগ্ন তৈজসপত্র লইয়া তাঁহারা তখন ক্ষুদ্র ও অপরিচ্ছন্ন মৃণ্ময় কুটীরবাসী হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন! ‡ শুধু কি এক বৎসরের মন্বন্তরে এই দুর্দ্দশা সংঘটিত হইয়াছিল? কোম্পানী বাহাদুরের কালিমালিপ্ত দীর্ঘ কাহিনী এই প্রশ্নের উত্তর দিবে।

---

* দিনাজপুরের হস্তবুদ।

বাং ১১৭৬ সালের রামচন্দ্র সেনের হস্তবুদ	১৮,৬৫৬৯—১০—২—৩
আমিল রাওল কর্ত্তৃক বর্দ্ধিত	২১৭৪৭২—২—৮—২
	২০৮৩১৪১—১৪—১১—১
বাদ সরঞ্জামী ইত্যাদি	২৩৬১৪৭—২২—৮—০
	১৮৪৬৯৯৪—২—৩—১
মফস্বলের হিসাব হইতে প্রাপ্ত এবং দেশের তৎকালীন অবস্থার হস্তবুদ	১৩৭০৯০২—৩—৬—৩
প্রজাগণ মন্বন্তরে মরিয়া ফৌত হওয়ায় ও পলায়ন করায় "না জায়"	৪৭৬০৯১—১৪—১৬—২

† We must desire you to acquaint the Raja and the enclosed *purwanah* from the *Naib-Dewan* will inform him to the same purpose—that if he does not heartily co-operate with you in thus answering our expectations, he may lay his account with suffering the deprivation of his Zemindary and being summond to the city to fulfil all demands.—

Proceedings of the Provincial Council at Murshedabad : 4 Feb. 6, 1771.

‡ The proprietors of vast tracts of country, as far the eye could reach have shrivelled into tenants of mudhuts and possessors of only a few cooking pots—

Sir J. Kaye.

এক দিন যাঁহারা দেশের কর্ত্তা ছিলেন, দেশের শাসন ও সংযম যাঁহাদিগের ইঙ্গিতে নিয়মিত হইত, দেশের শ্রী ও কল্যাণ-বৃদ্ধি কামনায় যাঁহারা এককালে কতটা আয়াস স্বীকার করিতেন—যাঁহাদিগের অর্থে এক দিন মোগল ও পাঠান ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছিল, যাহাদিগের জন্যই কোম্পানী বাহাদুর এ দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন—হায়! তাঁহারাও শেষে গৃহহীন আশ্রয়হীন বনবাসী হইয়াছিলেন—কেহ বা দস্যুদল ভুক্ত হইয়া এবং কেহ কেহ বা করুণার মুষ্টি ভিক্ষা স্বরূপ ইংরাজের প্রদত্ত ক্ষুদ্র দান গ্রহণ করিয়া জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন! *

তাঁই সিয়র মুতাক্ষরীণের অনুবাদক হাজি মুস্তাফা ১৭৯০ খৃঃ অব্দে কলিকাতার আর্মষ্ট্রং সাহেবকে লিখিয়াছিলেন—'আপনাকে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে এ দেশ আজিও যেমন শস্যপূর্ণ, সকল যুগেই এই রূপই ছিল; ইহা আপনাকে বলিতেই হইবে যে রাজস্বের নানা বিভাগ হইতে এখন প্রতি বৎসর প্রায় এক কোটী মুদ্রা আদায় হইতেছে, কিন্তু পূর্ব্বে যে সকল রাজকর হয়ত একেবারেই অজ্ঞাত ছিল—অথবা এত অধিক পরিমাণে আদায় করা হইত না—(দৃষ্টান্ত স্বরূপ সোরা, অহিফেন এবং লবণের নাম করা যাইতে পারে। ১৭৫৬ খৃঃ অব্দে আমি লবণ ৩৪ টাকায় বিক্রয় হইতে দেখিয়াছি, ১৭৮০ সালে কলিকাতায় ১০৫ টাকা হইয়াছিল এবং এখন ২৫০ হইতে ৩৮০ টাকায় দাঁড়াইয়াছে); আপনি নিশ্চয়ই ইহা স্বীকার করিবেন যে এখন যেরূপ কড়ায়-গণ্ডায় রাজস্ব আদায় করা হয় হিন্দুস্থানের নৃপতিগণ কখনো সেরূপ করিতেন না। ইহাও আপনাকে মানিতেই হইবে যে যদিও সেকালের রাজসরকার অমনোযোগ এবং শিথিলতা দোষে দুষ্ট ছিল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে—যদিও প্রায় প্রতি বর্ষেই এ দেশ বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণে ও লুণ্ঠনে সর্ব্বস্বান্ত হইত এবং দেশের এক তৃতীয়াংশের—দেশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট দুইটী স্থানের আয় শত্রুর পূজাতেই ব্যয়িত হইয়া যাইত তবুও সেকালের রাজসরকার অধিক সমৃদ্ধি সম্পন্ন ছিল।

'সেকালের তহশিলদারগণ এবং বণিকগণ যে বিস্ময়কর বিপুল অর্থরাশি সঞ্চয় করিয়াছিল তাহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে সে সময় এ দেশ আরও সমৃদ্ধিশালী ছিল। মুতাক্ষরীণের আতাউল্লা খাঁর মত এখন কি এক জন তহশিলদার অথবা ভাগলপুরের ফৌজদার মাত্র চতুর্দ্দশ বৎসরে এক কোটী মুদ্রা সঞ্চয় করিতে পারে? এক জন সাধারণ নগণ্য রাজকর্ম্মচারী (যাহার হস্তে মুর্শিদাবাদের কেবল 'সিয়র' করের ভার ছিল) সেকালে দ্বাদশ বর্ষে এক কোটী মুদ্রা সঞ্চয় করিয়াছিল; এখন কি কেহ সেরূপ পারে?

'মহারাষ্ট্রীয়গণ কর্ত্তৃক যাঁহার দুই কোটী মুদ্রা লুণ্ঠিত হইয়াছে, এখন কি আর তেমন এক জন জগৎশেঠ দর্শন মাত্রেই দেয় ৫০।৬০

* They are now either homeless wanderers or pensioners on the bounty of the strangers by whom their fortunes have been overthrown:
——Thom. Bright in the British Parliament.

কি শত লক্ষ মুদ্রার হুণ্ডি গ্রহণ করিতে পারেন? ...... সেই জগৎশেঠ ১৭৮১ সালে ১৪০০০০ মুদ্রার হুণ্ডি কিস্তিবন্দী না করিয়া পরিশোধ করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন!'

'নবাবদ্বয় অথবা দশরথ খাঁ অথবা সিতাবরায়ের পরিবার (ইঁহারা সকলেই ইংরাজের মুখাপেক্ষী) বা ইংরাজের অনুগৃহীতগণ ভিন্ন, আপনি কি বলিতে পারেন যে ঢাকা বা পাটনা বা মুর্শিদাবাদে আর এক জনও শ্রীশালী হইয়া উঠিয়াছেন? এই সকল নবোত্থিত সমৃদ্ধ ব্যক্তিগণ কিরূপে শ্রীসম্পন্ন হইলেন? দেশের পূর্ব্ব সমৃদ্ধিশালীদিগের চিতাভস্ম সংগ্রহ করিয়া। আপনি কি দেখিতেছেন না যে এই সকল নগরে এবং মালদহ, পূর্ণিয়া ও হুগলিতে সমৃদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং প্রাসাদের স্থানে এখন মৃণ্ময় কুটীর শির তুলিয়া চতুর্দ্দিকে কেবল দারুণ দুর্দ্দশা ও ধ্বংসের চিত্র দেখাইয়া দিতেছে!' *

মন্বন্তরের বিংশবর্ষ পর হাজিমুস্তাফা† বাঙ্গালার যে চিত্র লিখিয়াছিলেন সেই চিত্রই বলিয়া দিতেছে যে শুধু এক বৎসরের দুর্ভিক্ষে বঙ্গভূমিকে শ্মশান করে নাই। কোম্পানীর "Revenue farmer" দিগের ইতিহাসও সেই কথাই বলিয়া দেয়। ইঁহারাই কোম্পানীর আমলে প্রজাদিগের কর্ত্তা ছিলেন, কিন্তু কোম্পানীর রাজস্ব ষোল আনা আদায় করিতে পারেন নাই বলিয়া কর্ম্মবিচ্যুত হইয়াছিলেন! তাঁহাদিগের জীবন মরণের ভরসা, পরিবার প্রতিপালনের একমাত্র অবলম্বন গুলি পর্য্যন্ত সরকার বাহাদুর কাড়িয়া লইয়াছিলেন এবং ইহাতেও তুষ্ট না হইয়া তাঁহাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন! ‡ শ্মশান বঙ্গভূমি হইতে অর্থ শোষণ করিতে পারেন নাই বলিয়া কোম্পানীর তহশিলদারগণ (Revenue Agents) অনতিবিলম্বে বিতাড়িত হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিল! ¶ একজন মনীষি ইংরাজ তাই বলিয়াছেন :—"*Much of modern European national prosperity is based upon the plunder of nations representing ancient civilisations.*"—

ক্রমশ।

শ্রী—

---

* Seir Muta-gher-in—Vol iv

† হাজিমুস্তাফা মুসলমান নহেন ফিরিঙ্গী। তিনি একজন ফরাসী ছিলেন।

‡ Bengal Letter ... 25 January 1770; Para 48
Do ... 12 February 1771; para 44
Do ... 15 November 1771; para 3&9
Do ... 10 November 1773; para 3
Do ... 10 November 1773; para 6&7

¶ At the close of the Famine, the Revenue Agents being unable to wring the land tax out of their depopulated estates were sharply dispossessed:
Sir W. W. Hunter on the great Famine of 1769-70.
c. f. Bengal Letter : 10 November, 1773.

অন্নকষ্টে স্বদেশীর কর্ত্তব্য।

——:০:——

খাদ্যশস্যের পরিমাণ বাড়িলে অন্নকষ্ট ঘুচে, খাদ্যশস্য কমিলে অন্নকষ্ট বাড়ে। দুর্ভিক্ষের সময় ভারতের খাদ্যশস্য বিদেশে বিক্রীত হইলে, অন্য সমুদয় অবস্থা সমান থাকিলে) শস্য কমে সুতরাং দুর্ভিক্ষ বৃদ্ধি হয়। যেখানে অন্নকষ্ট বাড়িতেছে, অথবা দুর্ভিক্ষ ঘন ঘন হইতেছে, সেখানে খাদ্য-শস্যের নিঃসারণ বন্ধ হইলে দেশের মঙ্গল— এই সকল কথা আমি আমার লিখিত "রপ্তানি ও দুর্ভিক্ষ" নামক প্রবন্ধে বলিয়াছি।

ভারতের খাদ্যশস্যের রপ্তানির বিরুদ্ধে যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করা যাইতে পারে তাহা আমি যথাশক্তি পরিষ্কার ভাবে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। তবে সেই প্রবন্ধে এক পক্ষই দেখান হইয়াছে। তথাপি এ কথা তাহাতে ব্যক্ত করিয়াছি যে আমরা যদি ইংরাজের স্থানে অধিষ্ঠিত হইতাম, অর্থাৎ অন্যদেশ জয় করিতাম, তাহা হইলে ইংরেজ-গবর্ণমেণ্ট যেমন অবাধবাণিজ্যে ভারত হইতে শস্য ক্রয় করিতেছেন, অথবা ক্রয় করিতে দিতেছেন, আমরাও সেই রকম করিতাম। ভারতে খাদ্যশস্যের রপ্তানির ফল আলোচনা করিলে, সহসা ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের যত দোষ বা ত্রুটী বোধ হয়, আমাদের পক্ষ ও ইংরাজদের পক্ষ উভয় পক্ষ নিরপেক্ষ ভাবে সমালোচনা করিলে, তত দোষ বোধ হইবে না। আমার পূর্ব্ব প্রবন্ধে কেবল আমাদের পক্ষ হইতে, এ বিষয়টী আলোচনা করিয়াছিলাম। এক্ষণে ইংরা-জের পক্ষ হইতে আলোচনা করিব। পাঠক দুই পক্ষ বিবেচনা করিয়া ধীর ভাবে রায় দিবেন। তবে এ কথা এ স্থলেও বক্তব্য যে সরকার বাহাদুর যে কয়েকটী যুক্তি সময় সময় প্রদর্শন করিয়া থাকেন, আমার বিবে-চনায় তাহা ভারত পক্ষে নিতান্ত অমূলক ও ভ্রান্ত। আমি আমার পূর্ব্বপ্রবন্ধে তাহাই সাধ্যমত দেখাইয়াছি।

ইংরাজগবর্ণমেণ্ট পক্ষে, এবং খাদ্যশস্য রপ্তানির অনুকূলে, এ কথা বলা যাইতে পারে, সকল অবস্থাতেই অবাধ-বাণিজ্য ভাল, এ কথা অনেক ইংরাজ যথার্থই বিশ্বাস করেন। বস্তুতঃ ইংলণ্ডের পক্ষে যাহা ভাল বলিয়া ধনতত্ত্ব পুস্তকে লেখা আছে, তাহা ভারতের পক্ষেও ভাল, এইরূপ অনেক ইংরাজের ভ্রম হইতে পারে। ভারতবাসীর নিকট ভারত সম্বন্ধীয় কোন কোন বিষয় স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া বোধ হইলেও, ইংরাজের নিকট সেরূপ বোধ হওয়া কঠিন। ভিন্ন ভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায়, ধনতত্ত্বের সূত্রগুলিও যে ভিন্ন ভাবে প্রয়োগ হয়, এ কথা ইউরোপেও নূতন প্রতিভাত হই-তেছে। পূর্ব্বে এমনি একটা ধারণা ছিল, যেমন দুই আর দুইতে চারি হয়, তাহা সকল দেশেই সকলকালেই সত্য, ধন-

তত্ত্বের মীমাংসাগুলিও তেমনি সত্য। অবাধ-বাণিজ্য যদি ইংলণ্ডের জন্য ভাল হয়, তাহা হইলে তাহা, কি ভারতে কি ইংলণ্ডে, সকল দেশেরই পক্ষেই ভাল, ভাল হইতে বাধ্য। প্রধানত জর্ম্মান ধনতাত্ত্বিকদিগের ব্যাখ্যা ও উপদেশে, এই ভ্রান্তি ক্রমে ক্রমে অপনীত হইতেছে। কিন্তু এক্ষণেও ইংলণ্ডে প্রাচীন মতের প্রাবল্য রহিয়াছে। ইংলণ্ডে শ্রীযুক্ত চেম্বারলেন সাহেব প্রমুখ দল "টারিফ রিফর্ম্ম" (Tariff Reform) নামক আন্দোলন দ্বারা নূতন (অবাধবাণিজ্য বিরোধী) মতটী কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু ইংলণ্ডের অনেক লোকই এই মতের অদ্যাপি বিরোধী।

আর একটা কথা বিশেষ বিবেচ্য। (১) বাজারদরে ভারতবাসী যেমন ভারতে শস্য ক্রয় করিয়া থাকেন, ইংরাজও তেমনি বাজারদরে, মূল্য দিয়া, শস্য ক্রয় করিয়া থাকেন। ইংরাজ মূল্য না দিয়া শস্য লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যান না। দেশে, বা জগতে, সর্ব্বত্রই যাহার ধন অধিক, তাহার সুবিধাও অধিক। বাজারে মাল জমা রহিয়াছে, যাহার যেমন টাকার সংস্থান আছে, সে সেই রকম, আপনার প্রয়োজন মত, জিনিষ খরিদ করিয়া লয়।—আমার টাকা আছে, আমি মাল খরিদ করিলাম; তোমার টাকা নাই, তুমি খরিদ করিতে পারিলে না। সে দোষ কি আমার? ইংরাজের অধিক টাকা আছে, ইংরাজ বাজারে ইচ্ছামত শস্য খরিদ করিতে পারে; ভারতবাসীর ত ধন নাই, সে দোষ কি ইংরাজের? ঈশ্বর সকল ব্যক্তিকে সমান ধনশালী করেন নাই, তাহার জন্য কি ধনশালী ব্যক্তি অপরাধী? এই সংসারে যাহার যেমন বুদ্ধিবল, বাহুবল, দৈব বল আছে, সে তেমনি ধন উপার্জ্জন করিতেছে। যে ব্যক্তি বুদ্ধিহীন বলহীন বা ভাগ্যহীন, সে ধন উপার্জ্জন করিতে পারিতেছে না, সে দোষ কি বুদ্ধিমান্ বলবান বা ভাগ্যবান্ ব্যক্তির? বসুন্ধরা ত পড়িয়া রহিয়াছে,—বিবিধ রত্নশালিনী, নানা সুখদায়িনী, মধুরহাসিনী, সর্ব্বপ্রয়োজন-সাধিকা বসুমতী প্রকাশ্যে সকলের জন্যই বিরাজ করিতেছেন। যে ব্যক্তি শক্তি দ্বারা, বুদ্ধি দ্বারা, অথবা পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি দ্বারা, তাঁহাকে উপাসনা করিয়া সন্তুষ্ট করিতে পারিতেছে, তিনি তাহাকে বর দিতেছেন, ধন দিতেছেন, সুখ দিতেছেন। তুমি যদি অশক্ত হও, তুমি যদি নির্ব্বোধ হও, তোমার যদি ইহজন্ম বা পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির অভাব থাকে, এবং তজ্জন্যই যদি তুমি বসুমতীকে পূজা করিতে না পার, সে দোষ কি আমার, না শক্তিশালী, জ্ঞানী, ভাগ্যবান ধনীর? সুতরাং ভারত যদি, তাহার দারিদ্র্য বশত, উপযুক্ত পরিমাণে শস্য ক্রয় করিতে না পারে, আর বুদ্ধিমান বৈজ্ঞানিক, উদ্যমশীল, কর্ম্মপটু ইংলণ্ড যদি তাহার প্রয়োজন মত শস্য (যেমন অষ্ট্রেলিয়া ও মার্কিন দেশ হইতে লয় তেমনি) ভারত হইতে খরিদ করিতে পারে, এবং খরিদ করে, সে দোষ কি ধনী ইংলণ্ডের?—

ভাবিয়া দেখুন—দেশে ত এক্ষণে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। আপনি ধনী। কত গরিব লোক না খাইয়া মরিয়া যাইতেছে। তা'রা

আপনার স্বদেশী। তজ্জন্য আপনি কি বাজারে আপনার প্রয়োজন অপেক্ষা কম পরিমাণে চাউল ক্রয় করিতেছেন। গরিব লোকরা যদি কংগ্রেস করিয়া একটা "রেজোলিউসন" (resolution) পাস করে যে, "এই সভায় স্থিরীকৃত হইল যে আমাদিগের মধ্যে যখন অনেকে একবেলাও খাইতে পাইতেছে না তখন ধনী লোকেরা দুই বেলা খাইবার জন্য খাদ্য সংগ্রহ করিতেছে, এবং তদ্ধেতু আমাদের অনেকের জন্য একবেলা খাইবার অন্ন জুটিতেছে না, তন্নিমিত্ত আমাদের মধ্যে অনেকেরই অনাহারে মৃত্যু হইতেছে; এইরূপ অবস্থায় ধনিগণ যে দুই বেলা খাইবার জন্য চাউল ক্রয় করিতেছে, তাহা এই সভা, গরিবদিগের উপর ধনিদিগের নিষ্ঠুর অত্যাচার মনে করেন; এবং এমন অবস্থায় যাহাতে ধনিগণ অবাধে বাজারে ইচ্ছামত ও প্রয়োজন মত খাদ্য ক্রয় করিতে না পারেন, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টের একটী আইন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য; এবং যদি গবর্ণমেণ্ট শীঘ্র এইরূপ আইন না করেন তাহা হইলে ধনিগণের উপর আমরা (কাঙ্গালীগণ) বলপ্রয়োগ করিয়া আমাদের দুঃখ মোচন করিব"। ভারতের গরিবগণ যদি সভা করিয়া এইরূপ একটা "রেজোলিউশন" চালনা করে, তাহা হইলে ধনী ভারতবাসিগণ কি তাহা সঙ্গত মনে করেন? যদি ঐরূপ মন্তব্য সঙ্গত না মনে করেন, তাহা হইলে, ধনী ইংলণ্ড খাদ্যের উপকরণ ক্রয় করিতেছে বলিয়া, গরিব ভারতবাসিগণ সঙ্গতভাবে আপত্তি করিতে পারেন না।

(২) যদি কোন ভারতবাসী বলেন ভারত ও ইংলণ্ড ভিন্ন দেশ। নিজের দেশের লোকের সঙ্গে এক কথা, বিদেশী ইংরাজের সঙ্গে আর এক কথা। তাহারও উত্তর অতি সহজ। যদি ভারত আর ইংলণ্ড এক শাসনের অধীন বলিয়া উভয়ে এক প্রতিযোগিতার নিয়মে আবদ্ধ হইতে বাধ্য নহে এ কথা মনে করেন, তাহা হইলে এইটীও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে ভিন্ন দেশ নিজের স্বার্থ অগ্রে রক্ষা করিয়া, পরে অপর দেশের স্বার্থ রক্ষা করিবে। আত্মরক্ষা জীবজগতের কার্য্যের মূল মন্ত্র, উন্নতির ভিত্তি। ইংলণ্ড ভারতের জন্য আত্মরক্ষা করিতে ক্ষান্ত হউন, যুক্তি সঙ্গত ভাবে এরূপ অনুরোধ আমরা কখনই করিতে পারি না। এই জন্যই আমি পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি আমরাও ইংরাজের স্থলে অধিষ্ঠিত হইলে, ইংরাজের ন্যায় কার্য্য করিতাম। তবে যদি বলেন, ইংলণ্ড দাসদিগকে মুক্তিদান করিবার জন্য প্রভূত অর্থ ত্যাগ করিয়াছিলেন,—সে স্বতন্ত্র কথা।

এখানে আর একটী কথা বলা আবশ্যক। কেহ সঙ্গত ভাবে এমন মনে করিতে পারেন না যে "ইংলণ্ড যদি নিজের স্বার্থ অগ্রে রক্ষা করিয়া তবে ভারতের স্বার্থ রক্ষা করেন, তাহা হইলে ভারতে ইংলণ্ডের শাসন বর্ত্তমান সময় কিরূপে মঙ্গলপ্রদ বা ইচ্ছনীয় হইতে পারে?" এ কথা মনে করিলে অসঙ্গত হইবে। কারণ ইংরাজের ব্যবহারে ভারতবাসী সময় সময় নিতান্ত দুঃখিত হইয়া যাহাই বলুন না কেন, যেরূপ করুণাবহ আর্ত্তনাদ করুন না কেন,—উত্তেজনায় ভ্রান্ত নিতান্ত অল্প কয়েকজন লোকের

কিরূপ ভাব হইতে পারে তাহা বলিতে পারি না—কিন্তু বোধ করি তদ্ভিন্ন সকল ভারতবাসীর মনের কথা এই যে, ভারতবাসী বর্ত্তমান সময় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে ত্যাগ করিতে চাহে না, নিজে ত্যাগ করা দূরে থাকুক, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক আমাদিগকে ত্যাগ করিতে চাহিতেন, আমরা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে ভারতে, অন্তত আর কিছুকাল, থাকিয়া আমাদের রক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ করিতাম। কেননা, আমরা আত্মরক্ষা করিতে অদ্যাপি অক্ষম। আমরা জানি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সরিলেই, অন্য কোন প্রবল জাতি আমাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইবে এবং আমাদিগের অদ্যাপি এমন অবস্থা হয় নাই যে সেই প্রবল জাতিদের আমরা পরাস্ত করিয়া ব্রিটিশ প্রদত্ত স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারি। সুতরাং ভারতবাসীর মধ্যে যাঁহারা নিতান্ত ইংরাজ বিদ্বেষী তাঁহাদিগকেও যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, "এই মুহূর্ত্তে যদি ইংরাজ জাতি বলে যে, হে ভারতবাসিগণ, তোমরা যদি যথার্থই ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমরা কল্যই বা এক মাস পরে, ভারত ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে প্রস্তুত আছি। তোমরা বল, আমরা কল্য বা এক মাস পরে চলিয়া যাইব কি না"। তাহার উত্তরে নিতান্ত ইংরাজ-বিদ্বেষী ভারতবাসীও বলিবেন যে "ইংরাজ, তোমরা কল্য বা একমাস পরে চলিয়া যাইও না। অন্ততঃ আর কিছুকাল ভারতে থাকিয়া, স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত হইবার সময় দেও"।

আবার, ইংরাজ যদি বলেন, "হে ভারতবাসীগণ, তোমরা যদি আমাদের গবর্ণমেণ্ট চাহ, তাহা হইলে আমাদিগের সহিত একটা চুক্তি কর। কিন্তু বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট যে নিয়মে চলিতেছে, মোটামুটি সে সকল সর্ত্তে আমরা থাকিতে স্বীকার আছি, নতুবা অস্বীকার। অর্থাৎ আমরা খাদ্য শস্য ভারত হইতে বাজার দরে কিনিব, আমরা "হোম চার্জ্জস" জন্য ইংলণ্ডে এত টাকা প্রতিবৎসর পাঠাইব, অধিকাংশ প্রধান পদ আমরা নিজের জন্য রাখিব ইত্যাদি"। ইংলণ্ডের এই কল্পিত প্রস্তাব যদি সমুদয় ভারতবাসী আলোচনা করেন, তাহা হইলে ভারতবাসীগণ কি উত্তর দেন? বেশ কল্পনা করা যাইতে পারে, ভারতবাসীগণ এই উত্তর দিবেন যে "হে ইংরাজগণ, তোমাদিগের প্রস্তাবিত সর্ত্তের মধ্যে কতকগুলিকে আমাদের বিশেষ অসুবিধা বা কষ্টজনক বোধ হইলেও, আমাদের মঙ্গলের জন্য এদেশে তোমরা আর কিছুকাল থাক। আমাদিগের অসুবিধাজনক সর্ত্তগুলি যথাসাধ্য পরিবর্ত্তন করিবার জন্য তোমাদিগকে অনুরোধ করি এবং আশাও করি তোমরা ক্রমে পরিবর্ত্তন করিয়া আমাদিগের সন্তোষজনক ভাবে শাসন করিবে। আমরা তোমাদিগের সহিত চুক্তি করিতে সম্মত আছি। তোমরা কিছুকাল শাসন করিতে থাকিলে আমরা উপকৃত হইব।" কারণ, যাঁহারা চরমপন্থী, অথবা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিতান্ত বিরোধী, তাঁহারাও এটা মনে করেন যে স্বাধীনতা

লাভ করিতে হইলে, গবর্ণমেণ্টের এদেশে এখন কিছুকাল থাকা আবশ্যক। মিসর দেশেও গরমদল সম্বন্ধে লর্ড মিলনার ঐরূপ একটা কথা বলিয়াছেন যে, ইজিপ্টের বর্ত্তমান অবস্থার ইহা একটী বিদ্রূপবৎ ব্যাপার যে, যে গরম মৈসরগণ ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট উচ্ছেদ করিবার জন্য ব্যস্ত তাঁহারাই আবার ইচ্ছা করেন যে সেই ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট আর কিছু কাল ইজিপ্টে থাকিয়া, ইজিপ্টবাসিগণকে স্বাধীনতার উপযুক্ত হইবার অবসর ও সুবিধা দেন। যাহা হউক, ধীর চিত্তে বিবেচনা করিলে সকলেই স্বীকার করিবেন, মঙ্গলের ও উন্নতির জন্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এখনও অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য আবশ্যক।

আমরা এক্ষণে খাদ্য শস্যের অভাবের সহিত এই সকল কথার কি সম্বন্ধ আছে তাহা বিবেচনা করিব। পাঠক হয়ত বলিবেন যে, এই প্রস্তাব লেখকের মতে (১) ভারতে খাদ্যশস্যের রপ্তানিতে বর্ত্তমান অবস্থায় দুর্ভিক্ষ বাড়িতেছে; (২) ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট রপ্তানি বন্ধ করিতেছেন না বলিয়া আমরা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে, (অন্ততঃ এক হিসাবে) দুষিতে পারি না। (৩) খাদ্য শস্যের রপ্তানি বন্ধ না করিলেও ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ভারতের জন্য আবশ্যক। যদি ইহাই এই প্রস্তাব লেখকের মত হয়, তাহা হইলে ভারতে যে অন্নকষ্ট হইতেছে তাহার নিবারণের কি কোন উপায় নাই?

উপায় আছে। সেই উপায় আলোচনা করাই এই সকল প্রবন্ধের অন্তিম ও মুখ্য উদ্দেশ্য।

আমার পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি যে আমরা গবর্ণমেণ্টের নিকটই পুনঃ পুনঃ কাঁদি, নিজে প্রতিকারের চেষ্টা করি না। আমাদের দেশে যে কোন অনিষ্ট ঘটুক, নিজে তাহার প্রতিকার না করা কিছুকাল হইতে আমাদের বিষম অভ্যাস হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু এতদিন পরে সংবাদপত্রে অতি আশাপ্রদ অনুষ্ঠানের কথা দেখিলাম। দুর্ভিক্ষে সাহায্যের জন্য কৃষ্ণনগরে যে সভা হইয়াছিল, তাহাতে বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষের জন্য অর্থ সংগ্রহ করার ব্যবস্থা হইলে পর, আর একটী কার্য্য হইয়াছিল। তাহা এই—যাহাতে দেশে দুর্ভিক্ষ না হয় তাহার উপায় উদ্ভাবন ও অবলম্বন করিবার জন্য একটী স্থায়ী সমিতি গঠিত হইয়াছিল! ইংলণ্ডে সুশিক্ষা-প্রাপ্ত চিন্তাশীল সদাশয় শ্রদ্ধেয় জমীদার শ্রীযুক্ত বিপ্রদাস পাল মহাশয়ের প্রস্তাবে এই সভা স্থাপিত হইয়াছে। প্রত্যেক জেলাতে এইরূপ এক একটী সভা সংস্থাপিত হওয়া আবশ্যক। দুর্ভিক্ষ-নিবারণী সভার কার্য্য ভ্রান্ত পথে না যায়, তজ্জন্য ইহাতে ভারতের ধনতত্ত্ব সমুচিত ভাবে আলোচনা করার ব্যবস্থা করা উচিত। প্রতি মাসে এক দিন ভারতের ধনতত্ত্বের সূত্রগুলি আলোচনা ও ব্যাখ্যা করা কর্ত্তব্য; ধন সম্বন্ধে ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করা উচিত। সেই তথ্যগুলি ধনতত্ত্বের সূত্রসহ কিরূপ সংযোজিত তাহা স্থির করা আবশ্যক। যে বিষয়গুলি বর্ত্তমান রাজনীতির নিয়মে আবদ্ধ, এবং যাহা এক্ষণে পরিবর্ত্তন হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই তাহা লক্ষ্য করিয়া আমাদের দুর্ভিক্ষ নিবারণের

ব্যবস্থা বা চেষ্টা করিতে হইবে। ইহার একটী দৃষ্টান্ত বলিতেছি—বিলাতে ভারতবর্ষের ব্যয় নির্ব্বাহ করা উপলক্ষে "হোম চার্জ্জস" বলিয়া ভারতবর্ষকে প্রতি বৎসর অনেক গুলি টাকা পাঠাইতে হয়। এই বাৎসরিক ব্যয় উঠাইয়া দেওয়া বা কমান ভারতবাসীর ক্ষমতাধীন নহে। সুতরাং দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভাগুলি এই নিয়মটী লক্ষ্য করিয়া ব্যবস্থা করিবেন। এই কথার সঙ্গে পাটের আবাদের সম্বন্ধ আছে; তাহা পরে কোন প্রবন্ধে বুঝাইব। ভারতবর্ষের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে আমাদিগের দেশে শিক্ষিত লোকদের মধ্যেও অধিকাংশই নিতান্ত অজ্ঞ। এই অজ্ঞতা দূর করিতে হইবে। ভারতীয় ধনতত্ত্ব সম্বন্ধে একখানি মাসিক পত্র বাহির করিতে পারিলে ভাল হয়।

এখন দেখা যাউক ভারতের অন্ন কষ্ট কিরূপে আমরা নিজের চেষ্টায় দূর করিতে পারি। আমরা নীচে কয়েকটি উপায়ের প্রস্তাব করিতেছি। তাহার মধ্যে ভারতের অবস্থা ক্রমে, কোন উপায়টী কত দূর সাধ্য তাহা ভাবিয়া দেখা আবশ্যক ;—

১। যেখানে অন্নকষ্ট, সেখানে যাহাতে অন্নের বৃদ্ধি হয় তাহাই কর্ত্তব্য। সুতরাং অধিক জমি আবাদ করা উচিত। যে সকল জমি পতিত আছে (প্রয়োজন হইলে জঙ্গল কাটিয়া বা বাঁধ দিয়া) কর্ষণ করা আবশ্যক। আমরা ইহাকে বহিঃ-প্রসার-কর্ষণ বলিতে পারি।

২। যে সকল জমি আবাদ হইতেছে তাহাতে সার দিয়া অথবা অন্য কোন উপায়ে তাহার ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে। ইংরাজিতে ইহাকে intensive cultivation বলে। আমরা ইহাকে অন্তরুন্নতি কর্ষণ বলিতে পারি। প্রথম দুইটী উপায় ফসল অধিক বৃদ্ধি করা সম্বন্ধে। কিন্তু কেবল ফসল অধিক জন্মিলে ভারতের অন্নকষ্ট ঘুচিবে না। ভারতের ফসল, যতদূর সম্ভব, ভারতের জন্য ভারতে রাখিতে হইবে, ভারতবাসিগণের ভোগ্য করিতে হইবে। শস্য যতই অধিক উৎপন্ন হউক, তাহা যদি ভারত হইতে নিষ্ক্রান্ত হয় তাহা হইলে ভারতবাসীর অন্নকষ্ট ঘুচিবে না। তজ্জন্য নিম্নলিখিত উপায় গুলিও সঙ্গে সঙ্গে অবলম্বন করিতে হইবে।

৩। ধর্ম্ম গোলা স্থাপন করিতে হইবে। প্রত্যেক সুজন্মা বৎসরে কৃষকগণ উদ্বৃত্ত শস্যের অংশ এই গোলাতে জমা রাখিবে। যে কৃষকের যখন অন্ন কষ্ট হইবে সে এই গোলা হইতে শস্য ঋণ লইতে পারিবে। যখন সামর্থ্য হইবে, তখন এই ঋণ, অতি অল্প বৃদ্ধিসহ পরিশোধ করিবে। দুর্ভিক্ষের সময় দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিদিগকে এই গোলার ধান দিয়া রক্ষা করা হইবে।

৪। জমীদারগণ যে খাজনা পান তাহার কতক অংশ নগদ টাকাতে না লইয়া শস্যে লইবেন। এই শস্য গোলাজাত করিয়া রাখিবেন। অজন্মা বৎসরে এই গোলার ধান প্রজাদিগকে অল্প বৃদ্ধিতে (সুদে) কর্জ্জ দিয়া দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রজাদিগকে রক্ষা করিবেন। সুজন্মা বৎসরে উক্ত কর্জ্জ দেওয়া শস্য, বৃদ্ধি সহ আদায় করিয়া আবার গোলাজাত করিবেন। যদি এই গোলা হইতে জমীদার কিছু লাভের আশা করেন তাহা

হইলে গোলাতে অধিক ধান জমিলে এমন পরিমাণ বিক্রয় করিতে পারেন, যাহাতে তাহার মূল ধানের উপর শতকরা ২৲ টাকা অথবা গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটীর ৩॥০ টাকা করিয়া সুদ পোষায়।

৫। স্বদেশপ্রেমিকগণ দীনজন-হিতার্থে শস্য সঞ্চয় ও বিতরণ করিবার জন্য কোম্পানি গঠন করিতে পারেন। ঐ কোম্পানি কেন্দ্র স্থানের নিকটবর্ত্তী প্রতি গ্রামে তাহার শাখা স্থাপন করিয়া দুর্ভিক্ষ সময়ে তাহার গোলা হইতে ধান অল্প মূল্যে বিক্রয়, অথবা অল্প মূল্যে কর্জ্জ দিতে পারেন, এবং অবস্থামত দান করিতেও পারেন। এই গুলিকে "ধর্ম্মশস্যসজ্ঞ" মনে করিতে হইবে।

৬। বিদেশী দ্রব্য কিনিবার জন্য দেশের অন্ন যাহাতে বাহির হইয়া না যায় তন্নিমিত্ত এ দেশের প্রয়োজনীয় দ্রব্য যাহাতে নির্ম্মিত হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। সংক্ষেপে, দেশীয় শিল্পের উন্নতি করিতে হইবে। দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য যে সকল শিল্পের উন্নতির আবশ্যক তাহাকে "ধর্ম্মশিল্প" বিবেচনা করিতে হইবে।

৭। ভারতবাসিগণকে যথাসম্ভব বিলাস দ্রব্য পরিবর্জ্জন করিতে হইবে। বিলাস বর্জ্জন স্বদেশসেবা-ধর্ম্মের অঙ্গ বলিতে হইবে। বিলাস দ্রব্য ত্যাগ করিয়া যে টাকা উদ্বৃত্ত হইবে তাহাতে দেশের ফসল বৃদ্ধির জন্য অধিক জমি আবাদ করিতে এবং কৃষি প্রণালীর উন্নতি সাধন করিতে হইবে। আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে পরিবর্দ্ধিত অন্ন দেশের লোকের মুখে গিয়া পড়ে তাহারও উপায় করিতে হইবে।

৮। সামাজিক ক্রিয়া কলাপে প্রাচীন হিন্দু সমাজে যেরূপ ভোজন করানের ব্যবস্থা ছিল তাহাই আবার প্রচলিত করিতে হইবে। অর্থাৎ সামাজিক অনুষ্ঠানে অন্যান্য অপেক্ষাকৃত কম প্রয়োজনীয় ব্যয় কমাইয়া অধিকতর লোককে সুলভ স্বাস্থ্যজনক যথাসম্ভব উপাদেয় খাদ্য ভোজন করাইতে হইবে। অর্থনীতিটা, ধর্ম্মনীতির ও সমাজ নীতির এবং সমাজের ক্রিয়াকলাপের অঙ্গীভূত করিতে হইবে। প্রাচীন হিন্দু-সমাজে বড়মানুষি ছিল অন্নদানে। নব্য হিন্দু সমাজের বড়মানুষি বিলাসে ও গর্ব্ববিকাশে। আমরা ছিলাম দেবতা, হইতেছি পশুরও অধম।

উপরে যে আটটী উপায়ের কথা বলা হইল, তাহার প্রত্যেকটীর উপর এক একটী স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিলে সুবিধা অসুবিধা বুঝা যাইবে। দেশের লোককে এই সকল প্রয়োজনীয় বিষয় চিন্তা করাইতে শিখাইতে হইবে বা চিন্তা করিবার জন্য উত্তেজনা করিতে হইবে। শিক্ষিত লেখকদিগকে বৃথা পাণ্ডিত্য প্রদর্শন বা "পেডান্ট্রি"র পথ হইতে ফিরাইয়া দেশের সদ্যঃ প্রয়োজনীয় বিষয়ে প্রবৃত্ত করিতে হইবে। পাঠকদিগের বর্ত্তমান হীন অভিরুচি পরিবর্ত্তন করাইতে হইবে।

উপরিউক্ত উপায় সকল আমরা কতদূর অবলম্বন করিতে পারি, বা অবলম্বন করিলে কতদূর সফল হইতে পারি, তাহা দেশের বর্ত্তমান অবস্থা, আমাদের দেশের আইন কানুন, বর্ত্তমান শাসনপ্রণালীর নিয়ম, ধনবিজ্ঞানের উপদেশ, এবং আমাদিগের

ক্ষমতাধীন কার্য্যের সীমা, এ সমুদয়গুলি ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিতে হইবে, এবং চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে কাজ করিতে হইবে, কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা করিতে হইবে। নিজে উদ্বোধিত হইতে হইবে, দেশের লোককে উদ্বোধিত করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্টের আইনের মধ্যে থাকিয়া নিজের সাহায্যে, আত্মচেষ্টায়, গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে বিরোধ না করিয়া, শনৈঃ শনৈঃ আর্থিক উন্নতি লাভের চেষ্টা আবশ্যক। পরীক্ষাস্থলে যদি আমাদের কোন মত বা কার্য্য ভ্রান্ত বলিয়া পরিষ্কার বুঝা যায়, তাহা ত্যাগ করিতে হইবে। এখন কেবল অক্লান্ত অধ্যবসায় চাই; তথ্য সংগ্রহে, মস্তিষ্ক চালনায়, জ্ঞানপ্রচারে, লোক-উদ্বোধনে—অবিরাম শ্রম চাই—অবিরাম চিন্তা, অবিরাম কার্য্য আবশ্যক। ভাই ভগিনীর অন্নকষ্ট দূর করিবার জন্য, প্রেম-কমণ্ডলু হস্তে অন্নদায়িনী অন্নপূর্ণার মন্দিরের উদ্দেশ্যে তীর্থযাত্রা করিতে হইবে জগন্নাথের বিশ্বপুরীতে সমুদয় জগতই খাইতেছে, সকল জীবই খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছে, কেবল ভারতবাসী চেষ্টা করিলে দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিতে পারিবে না, অন্নপূর্ণার জগতে কেবল ভারতবাসী অন্ন না পাইয়া দুর্ভিক্ষে মরিবে ইহা কদাচ সঙ্গত নহে; মঙ্গলময় বিধাতার এ বিধান নহে! হিন্দু মুসলমান, খৃষ্টান, কে কোথায় আছ, এস, দয়াল ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া এই অনশন-ক্লিষ্ট, মৃত্যুমুখে-পতিত ভারতের এই অসহায় ভাই ভগিনীদের অন্ন কষ্ট দূর করিতে অগ্রসর হও—এ মহেন্দ্রক্ষণ হেলায় হারাইও না।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

রাজ-তপস্বিনী।

(জীবনা-প্রসঙ্গ।)

সে যাত্রায় সফল মনোরথ না হইয়া রায়-মহাশয় সপরিবারে গৃহে ফিরিয়া গেলেন। এই সময়ে কয় সপ্তাহের জন্য আমি পুটিয়া হইতে অনুপস্থিত ছিলাম সুতরাং রাজ-কুমারের সঙ্গে ভুবন বাবুর আর কোনরূপ মনান্তরের কারণ ঘটিয়াছিল কি না বলিতে পারি না। তবে ইহা লক্ষ্য করিতাম যে বধূরাণীর পীড়াদির সময় মহারাণী বৈবাহিক এবং বৈবাহিকাকে শীঘ্র আনাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেও কুমার তাহাতে বড় গা গোছ করিতেন না।

আমাদের পুটিয়া ত্যাগের পর রায় মহাশয়েরা পুনরায় জামাতৃ গৃহে আসিয়াছিলেন। এবং আর একবার কুমারকে নিজের মতে আনিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিলেন। ইহার ফলে যে গুরুতর মনোভঙ্গ উভয়ের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইল কখনও তাহার অপনোদন হয় নাই।

সচরাচর রাজবাটীর নিয়ম এই যে বধূরাণীদের পিতৃ বা মাতৃকুলের আত্মীয়েরা সহসা রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পারেন না। কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে

পিতাকেও গৃহকর্ত্রীর অনুমতি লইতে হইবে। ভুবন বাবু এই নিয়ম মানিয়া চলিতেন না। গৃহস্থ বাড়ীর মত যখন তখন তিনি শুদ্ধান্তঃপুরে চলিয়া যাইতেন এবং বধূরাণীর প্রকোষ্ঠে অনেকক্ষণ ধরিয়া অবস্থিতি করিতেন। বিবাহের প্রায় অব্যবহিত পর হইতেই এইরূপ ঘটায় বড় অসুবিধা হইল। অন্য কোন দরবারে এই অবারিত যাতায়াত সম্ভব হইত না—এবং মহারাণী মাতার চক্ষুলজ্জা বড় বেশী বলিয়াই তিনি পরিজনবর্গের অসন্তোষ উপলব্ধি করিয়াও ইহাতে কখন উচ্চ বাচ্য করিতেন না। কিন্তু নিজের আবরু রক্ষার জন্য সে প্রকোষ্ঠ তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হইল। পুত্রবধূ এবং তাঁহার দলবলের অবস্থিতির জন্য প্রায় সমস্ত বাড়ী ছাড়িয়া দিয়া অতঃপর তিনি ছোট বাড়ীর চত্বরে বাস করিতেন।

বধূরাণীদের আত্মীয় স্বজনের অবারিত পুর-প্রবেশ সম্বন্ধে প্রায় সকল রাজ পরিবারে যে কঠোর বিধি নিষেধের চলন অন্ততঃ সে কালে ছিল, আপাতদৃষ্টিতে অসঙ্গত মনে হইলেও তাহা একটা বিশিষ্ট নৈতিক ভিত্তির উপর স্থাপিত। প্রায়শ হীনাবস্থার লোকেরাই রাজাদিগকে কন্যা দান করিতেন; অতএব রাজোচিত শিক্ষা দীক্ষা লাভের জন্য বিবাহের পর পিত্রালয়ের সংশ্রব তেমন ঘনিষ্ট রাখা বাঞ্ছনীয় হইত না। রায় মহাশয় মহারাণীর ভদ্রতায় উৎসাহিত হইয়া সেই চিরাচরিত প্রথার উচ্ছেদ সাধন করায় লাভ বড় হয় নাই। বধূরাণী তাঁহার প্রাতঃস্মরণীয়া শ্বশ্রূর সহবাসে প্রথম হইতে অভ্যস্ত হইলে উত্তর কালে যে অশান্তি ঘটিয়াছিল, তাহা কদাপি সম্ভবপর হইত না।

সে যাহা হউক, পুনরায় জামাতৃ-গৃহে আসিয়া ভুবন বাবু কিছুদিন মধ্যে কুমারকে আবার বৈষয়িক পরামর্শ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথম প্রথম কুমার মহাশয় নীরবে সকল শুনিয়া যাইতেন, কিন্তু কুসংসর্গের ফলে অভ্যাস দোষে তিনি ইদানীন্তন আর বড় প্রকৃতিস্থ থাকিতেন না। রায় মহাশয় বোধহয় আদৌ বুঝিতে পারেন নাই যে দত্তকগৃহীতা মাতা হইলেও মহারাণীর প্রতি কুমারের অসীম ভক্তি ছিল, তাঁহার নিন্দা কখন তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। এ দিকে মাতা বৈবাহিকের পরামর্শ গ্রহণ করিতে না পারায় তাঁহাদের কাছে এতই অপরাধিনী হইয়া পড়িয়াছিলেন যে সম্প্রতি বধূরাণীর প্রকোষ্ঠ তাঁহার কার্য্য প্রণালীর তীব্র সমালোচনায় অহোরাত্র ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইত। কথা গুলার কতক কতক মহারাণীর কানে না উঠিত এমত নহে। সেই পরীবাদে বালিকা বধূ পর্য্যন্ত যোগদান করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন শুনিয়া মাতা সত্য সত্যই বড় ক্ষুণ্ণ হইতেন। প্রথমে বিশ্বাস করিতেন না, কিন্তু শেষে যখন আর অবিশ্বাসের স্থান থাকিত না তখন সংবাদবাহিকাদিগকে নিরুৎসাহী করিবার জন্য বলিতেন—"যখন ছেলের বিবাহ দিয়াছি, ঐ বউ লইয়াইত ঘর করিতে হইবে।" মাতার কুৎসা শুনিয়া কুমার এক দিন মহা বিরক্ত হইয়া উঠিলেন এবং মার কাছে গিয়া রায় মহাশয়ের সকল কথা বলিয়া দিলেন। সব শুনিয়া মহারাণী বলিলেন—

"কোকন, তুমি আমার দত্তকপুত্র। তোমার শ্বশুরের সব কথা কি আমায় বলা উচিত? তিনি হলেন তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী, তাঁর পরামর্শের উপর আমার কথা তোমার শোনা কর্ত্তব্য হয় না।" ইহাতে কুমার উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। বলিতে লাগিলেন যে সে সব কিছু আমি শুনিব না, আর রায় মহাশয়ের ঐ সব কথা মুকাবেলা করিয়া দিব। তৎক্ষণাৎ তিনি শ্বশুরকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন, কিন্তু তিনি তখন ভিতরে আসিতে অনিচ্ছুক। কুমার ছাড়েন না, লোকের উপর লোক ছুটিল। শেষে রায় মহাশয় আসিলে কুমার তাঁহাকে বারান্দায় বসাইলেন এবং মাতাকে কপাটের অন্তরালে রাখিয়া প্রশ্ন করিলেন—"কেমন রায় মহাশয়, আপনি আমার কুঠরীতে বসিয়া আজ বলিয়াছেন যে মহারাণী তোমায় অসিদ্ধ করিবেন, জমীদারী তোমাকে দিবেন না। সকল সম্পত্তি কেবল দান করিয়া আর ভগ্নীকে দিয়া শেষ করিলেন। আমি ঢাকা হইতে লোক আনাইয়া তোমার জমীদারী তোমায় দেওয়াইব। মহারাণী বিষয় কর্ম্ম ভাল বোঝেন না! এ সব কথা কেন আমায় বলিলেন? আপনার অভিপ্রায় কি?" রায় মহাশয় দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন—"বাবাজি, এ সব কথা কখন আমি বলিয়াছি? আমি কিছু বলি নাই, আপনি আমার উপর মহারাণীর মন চটাইয়া দিবার জন্য এ সকল বলিতেছেন। আপনি আমার মনে বড় আঘাত দিলেন।" কুমার রুদ্ধ দ্বারের অদূরে মাতার কাছে দাঁড়াইয়াছিলেন, অত্যন্ত রাগিয়া উঠিয়া আত্ম-হারা হইলেন। "কি আমি মিথ্যা বলিয়াছি, আর আপনার মনে আঘাত দিয়াছি!" তিনি সজোরে বাহির হইয়া রায় মহাশয়ের দিকে রুখিয়া আসিতেছিলেন, মহারাণী তাঁহার হাত ধরিয়া নিবারণ করিলেন।

কুমারের এই অধীরতার দৃশ্য যে মহারাণী মাতার চক্ষে বড় বীভৎস দেখাইল তাহা বলা বহুল্য। তিনি তাঁহাকে মৃদু অনুযোগ করিয়া অনেক বুঝাইলেন। কুমার অতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, মার কাছে ভর্ৎসিত ও প্রতিরুদ্ধ হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন "মা আপনার নিন্দা আমার কাছে করিবে? ওরা সকলেই আপনার নিন্দা করে। যদি আমার নিন্দা আমার কাছে করে, তাহাও সহ্য হয়, কিন্তু আপনার কুৎসা আমার কাছে করিবে এতদূর সাধ্য?" মা অশ্রুমোচন করিয়া বলিলেন "কোকন, তোমার শ্বশুর এবং স্ত্রীর কোন কথা আমায় বলিতে নাই!"

রায় মহাশয় জামাতার এই ব্যবহারে নিরতিশয় ক্ষুণ্ণ হইলেন, কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া মহারাণীর উদ্দেশে বলিলেন "আমি বিদায় হই। আমার উপর জামাতা বাবাজীর মন না ফিরিলে আর আমি আসিব না। বেণারসে হয়ত আপনার সঙ্গে দেখা করিব।" তিনি তৎক্ষণাৎ রাজবাড়ী ত্যাগ করিয়া গেলেন।

মহারাণী নিজের পিত্রালয়ে তাঁহার সপরিবারে কয়দিন অবস্থানের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। কুমার এতদূর অপ্রসন্ন হইয়াছিলেন, যে বধূরাণীকে তাঁহার পিতা

মাতার সহিত আর সাক্ষাৎ করিতে দিবেন না স্থির করিলেন। কিন্তু মাতৃস্বসা শ্রীসুন্দরী দেবীর অনুরোধে শেষে তাহাতে আর আপত্তি করিতে পারিলেন না। বধূরাণী মহারাণী মাতার সঙ্গে বাবুর বাড়ীতে গিয়া বাপ মার সহিত মিলিত হইলেন। এ দিকে মহারাণী নিজে বৈবাহিক ও বৈবাহিকাকে অনেক করিয়া বুঝাইলেন এবং ছেলের অপরাধের জন্য তাঁহাদের নিকট বারম্বার ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তাঁহারা অতঃপর আর প্রত্যাগমন করিবেন না বুঝিয়া তিনি বহুমূল্য বস্ত্র ও অলঙ্কার তাঁহাদিগকে উপঢৌকন দিলেন, যাতায়াতের সমস্ত খরচ নিজের তহবিল হইতে নির্ব্বাহ করিলেন। কুমার ইহাতে বিরাগ প্রকাশ করিলে তাহা গ্রাহ্য করিলেন না।

শ্রী শ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

ইংরাজ-বর্জ্জিত ভারত।

ভারতের অভিমুখে-যাত্রা পথে।

লোহিত সমুদ্রে, মধ্যাহ্ন। আলোক, আলোক, এত আলোক যে এই আলোক দেখিয়া বিমুগ্ধ হইতে হয়, বিস্মিত হইতে হয়; যেন এক প্রকার আধো-আঁধার হইতে বাহির হইয়া চোখ্ আরও খুলিয়া গিয়াছে, আরও স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাইতেছি। আধুনিক জাহাজের সাহায্যে এই পরিবর্ত্তনটা খুব দ্রুতভাবে সংঘটিত হয়। এই সকল জাহাজের উপর এখন আর বাতাসের কোন হাত নাই; এই সকল জাহাজ, উত্তর দেশের শরৎকাল হইতে, আমাদিগকে হঠাৎ এইখানকার চির-গ্রীষ্মের মধ্যে আনিয়া ফেলে, ঋতুর ক্রম-সংক্রমণ আদৌ উপলব্ধি হয় না।

জল ঘোর নীল; রূপার ঝালরগুলা যেন ঝিকমিক্ করিতেছে—নাচিয়া বেড়াইতেছে। মনে হইতেছে যেন আকাশ, পৃথিবী হইতে আরও দূরে সরিয়া গিয়াছে, মেঘগুলা যেন আরও সুস্পষ্ট আকার ধারণ করিয়া শূন্যে ঝুলিতেছে; আকাশের গভীরতা ক্রমেই প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে; দূরত্বের মধ্যে জাহাজ যতই অগ্রসর হইতেছে, ততই আকাশকে আরও বেশী করিয়া উপলব্ধি করিতেছি।

আরও আলোক, ক্রমাগতই আলোক। বাস্তবিকই নেত্র যেন বিস্ফারিত হইয়া, বেশী বেশী রশ্মি, বেশী বেশী রং গ্রহণ করিতেছে। ...তবে কি, নেত্র ইহার পূর্ব্বে ভাল করিয়া কিছুই দেখিতে পাইতেছিল না?—না জানি কোন্ তিমির-রাজ্য হইতে এই মাত্র বাহির হইয়াছে। ঘোর নিস্তব্ধতার মধ্যে, কাহারও আদেশের অপেক্ষা না করিয়া, এই যে শুভ্র আলোক-উৎসবের আয়োজন—স্বর্ণাভ আলোক-উৎসবের আয়োজন চতুর্দ্দিকে দেখা যাইতেছে—এ কিসের উৎসব?...

এইখানে,—এই প্রাচ্য ভূখণ্ডের প্রাচীন সমাধিক্ষেত্রের উপর, বিলুপ্ত মানব-সঙ্ঘের এই ধূলি রাশির উপর, এই বিষাদময় উৎসব অবিরাম চলিতেছে; কেবল, উত্তর দেশের অভিমুখে গেলে, এ সব ভুলিয়া যাইতে হয়; তাহার পর, এই সব প্রদেশে ফিরিয়া

আসিলেই আবার সেই একই দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, আবার বিস্ময়ে মন অভিভূত হইয়া পড়ে। সেই একই উষ্ণ ও অবসাদ-ক্লান্ত উপসাগরের উপর —সেই একই প্রস্তরময় কিংবা বালুকাময় পুরাতন তটভূমির উপর,—সেই সব ধ্বংসাবশেষের উপর,—এবং যে সকল মৃত প্রস্তর-স্তূপ বাইবেল-বর্ণিত জাতিসমূহের গূঢ় রহস্যকে, পূর্ব্বপুরুষদিগের ধর্ম্মসমূহের গূঢ় রহস্যকে, আগলাইয়া রহিয়াছে, সেই সব প্রস্তর স্তূপের উপর—এই আলোক রশ্মি অবিরাম পতিত হইতেছে। আমাদের কল্পনা, এই বিষাদময় আলোকের উৎসবকে দূর অতীতে লইয়া গিয়া, প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনীর সহিত উহাকে একসূত্রে বাঁধিয়া দেয়; তাই মনে হয়, এই আলোকউৎসব যেন অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, এবং ইহার বুঝি শেষ নাই।...

কিন্তু, বাইবেল-বর্ণিত এই অতীত,—যাহার আপেক্ষিক প্রাচীনতায় আমাদের বিভ্রম উপস্থিত হয়, যাহার উপর আমাদের এত বিশ্বাস,—জগতের ভীষণ অতীতের তুলনায় এই অতীতটা সে দিনের বলিলেই হয়। এই সমস্ত আলোক, যাহা আমাদের নিকট এত উজ্জ্বল বলিয়া মনে হয়, যাহাতে আমাদের নেত্রের মত্ততা উপস্থিত হয়, উহা আমাদের ক্ষুদ্র সূর্য্যের ক্ষণস্থায়ী ক্রিয়ামাত্র; এই সূর্য্য আমাদের এই ক্ষুদ্রতম পৃথিবীর উপর আলো দিতে দিতে ধীরে ধীরে একদিন নির্ব্বাপিত হইবে; এখন সূর্য্য সেই নির্ব্বাণের পথেই চলিয়াছে। আমাদের পৃথিবী, পাছে শীতল হইয়া পড়ে এই ভয়ে, সূর্য্যের খুব কাছে-কাছে রহিয়াছে; আরও তাহার ভয়, পাছে সেই ভীষণ অন্ধকারের মধ্যে গিয়া পড়ে—যেখানে অপেক্ষাকৃত বড় গ্রহগুলা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আকাশের এই নীলিমা, যাহার উপর চির-পরিবর্ত্তনশীল বিচিত্র-আকারের মেঘগুলা অবিরাম খেলা করিয়া বেড়াইতেছে এবং যাহা অতলস্পর্শ গভীর বলিয়া আমাদের মনে প্রতিভাত হয়, উহা একটা পাতলা অবগুণ্ঠন মাত্র; আমাদের চোখকে ভুলাইবার জন্য, কালো অন্ধকারকে আমাদের নিকট হইতে লুকাইয়া রাখিবার জন্য, এই নীল অবগুণ্ঠন আমাদের সম্মুখে প্রসারিত রহিয়াছে; এ সমস্ত আসলে কিছুই নহে; আসল কথা, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার উহার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। এই অন্ধকারই নিত্য পদার্থ, এই অন্ধকারই সর্ব্বাধিপতি; ইহার আদি নাই, অন্ত নাই; অনাদি কাল হইতে, ঐ কৃষ্ণবর্ণ শূন্যের মধ্য দিয়া, নিস্তব্ধভাবে কত শত জগৎ স্বকীয় কক্ষ হইতে চ্যুত হইতেছে, এই কৃষ্ণ-বর্ণ মহাশূন্য কখনও তাহাদিগকে আটকায় নাই,—কখনও তাহাদিগকে আটকাইবে না।

আকাশ ও সমুদ্রের এই সমস্ত উজ্জ্বল নীলিমার মধ্য দিয়া এখনও ৭।৮ দিন চলিতে হইবে, তাহার পরেই আমার যাত্রা শেষ হইবে, আমার গন্তব্যস্থানে আমি উপনীত হইব। ধর্ম্মের পীঠস্থান, মানব-চিন্তার লীলাভূমি—সেই ভারতবর্ষে আমি এখন যাইতেছি; আমার ভয় হইতেছে পাছে সেখানে গিয়া কিছুই না পাই—পাছে সেখানে গিয়া আবার প্রতারিত হই। আত্মবিনোদনের জন্য, কিংবা শুধু

একটা মনের খেয়ালে এবার আমি সেখানে যাইতেছি না; আর্য্য-জ্ঞানের রত্নভাণ্ডার যাঁহাদের হস্তে, তাঁহাদের নিকট এবার চিত্তশান্তি যাচ্ঞা করিতে যাইতেছি। খৃষ্টধর্ম্মের আশা-ভরসা আমার চিত্ত হইতে তিরোহিত হইয়াছে; আত্মার অনির্দ্দেশ্য দীর্ঘস্থায়িত্বের উপর তাঁহাদের যে বিশ্বাস আছে, খৃষ্টধর্ম্মের আশ্বাসের পরিবর্ত্তে সেই কঠোরতর বিশ্বাসটি যদি তাঁহারা আমাকে দিতে পারেন,—তাই জানিবার জন্যই আমি তাঁহাদের নিকট যাইতেছি .....

এই সময়ে সূর্য্য অস্ত হইতেছে। কি চমৎকার দৃশ্য! এই সূর্য্য—আমাদের এই নিজস্ব সূর্য্য,—যে সূর্য্য, অনাদিকাল হইতে ঘুরিতে ঘুরিতে, আমাদিগকে তাহার দিকে নিয়ত আকর্ষণ করিতেছে—আর এক মুহূর্ত্ত পরেই অন্য অগণ্য সূর্য্যের মধ্যে হারাইয়া যাইবে। এই সেই অস্তাচলের অধিত্যকা—যেখানে নৈশ আকাশের স্বচ্ছতার মধ্য দিয়া, আমরাও ঘুরিতে ঘুরিতে সেই মহা রাত্রির অভিমুখে—সেই অন্তহীন তমোরাশির অভিমুখে এখনি গমন করিব। এক্ষণে সায়াহ্নের কুহক-জালে আচ্ছন্ন হইয়া, এই অস্তমান সূর্য্যের তাম্র পাটল প্রভা নিরীক্ষণ করা যাক্। পূর্ব্বদিকে, সমুদ্রের ঊর্দ্ধে, দিগন্তের উচ্চদেশে, জনশূন্য উজাড় রক্তবর্ণ প্রস্তরের একটি পর্ব্বতমালা, জলন্ত অঙ্গারের ন্যায় লাল হইয়া উঠিয়াছে। এই পর্ব্বতগুলি—সেনাই, সের্ব্বাল ও হোরেব্। আবার সেই মূসার সময়কার পৌরাণিক কাহিনীর প্রভাব আমাদের মনকে অধিকার করিল—সেই সকল কাহিনী, যাহা বংশ-পরম্পরাক্রমে, ধর্ম্মভাবের যেন একটা ভূমি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে।

কিন্তু এই জলন্ত শিখরগুলি নির্ব্বাপিত হইতে আর বড় বিলম্ব নাই। সূর্য্য জলরাশির পশ্চাতে ঢলিয়া পড়িল, সায়াহ্নের ক্ষণিক মায়া-দৃশ্য অন্তর্হিত হইল; সন্ধ্যার ধূসরতার মধ্যে, সিনাই, সের্ব্বাল, ও হোরেব, বিলুপ্ত হইল,—বিলীন হইল। আর উহাদিগকে দেখা যায় না;—আসলে উহারা কি? ধরা-পৃষ্ঠে কতকগুলি পাথর একস্থানে আটকাইয়া পড়িয়াছে এই মাত্র; কিন্তু বাইবেলের "exodus"-পরিচ্ছেদের কবিত্ব প্রভাবে, উহাদিগকে আমরা কল্পনায় অত্যন্ত বাড়াইয়া তুলিয়াছি!

অনন্ত রাত্রি—প্রশান্ত রাত্রি আসিয়া এখনি সকল পদার্থের যথাযথ পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবে। এখনি, অনন্ত আকাশে, সৌররাজ্যের যাত্রীদল দেখা দিয়াছে। উহাদের মধ্যে কাহারও যদি পদস্খলন হয়, তাহা হইলে সকলেই ঐ অন্ধকারাচ্ছন্ন অগাধ শূন্যের মধ্যে পতিত হইবে, আমরাও পতিত হইব—এই ভাবটা আবার আমার মনে জাগিয়া উঠিল। সূর্য্য আমাদিগকে ক্রমাগত টানিতেছে—কিন্তু আমাদের এই ক্ষুদ্র গ্রহদের কি দুর্দ্দশা, সূর্য্যের অভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে অথচ কস্মিন কালেও সেখানে পৌঁছিতে পারিবে না; এই সকল সূর্য্যেরা তবু কতকটা স্বাধীনভাবে শূন্যের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু আমাদের গ্রহগণ, পেঁচাল গতি অনুসরণ করিয়া ক্রমাগতই সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ছুটিতেছে।

মধ্য আকাশ হইতে দিগন্ত পর্য্যন্ত,

কোথাও একটি মেঘ নাই, আকাশেও চমৎকার স্বচ্ছতা। এক্ষণে আমাদের নেত্রসমক্ষে সেই অসীম শূন্য উদ্‌ঘাটিত, যেখানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অসংখ্য জগৎ ক্রমশ পতিত হইতেছে, অগ্নিময়বৃষ্টিবিন্দুবৎ ক্রমাগত পতিত হইতেছে; যাই হোক্, কিন্তু নিশার আগমনে, তারকা-খচিত আকাশ হইতে আমাদের জন্য মধুর শান্তি নামিয়া আসিল।

মনে হয় যেন উপর হইতে, সোৎকণ্ঠ স্নেহ আসিয়া আমাদের অন্তরাত্মার উপর অল্পে অল্পে স্নিগ্ধছায়া বিস্তার করিতেছে ......আহা যাঁহাদের নিকটে আমি এখন যাইতেছি সেই ভারতের তত্ত্বজ্ঞানীরা এই স্নেহযত্ন, এই অনুকম্পার সত্যতা সম্বন্ধে যদি আমারধ্রুব বিশ্বাস জন্মাইয়া দিতে পারেন!

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য।*

ভারতবর্ষের ইতিহাস কাহাদের ইতিহাস? প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে ভারতের ইতিহাস কাহারও স্বতন্ত্র ইতিহাস নহে। যে আর্য্যগণ একদিন তাঁহাদের বুদ্ধি শক্তি প্রভাবে, তমসাচ্ছন্ন ভারতকে মহিমালোকসমুদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়া ভারতেতিহাসের ভিত্তিস্থাপনা করিয়াছিলেন; যে আর্য্যগণ অতঃপর অনার্য্যগণের সহিত মিশিয়া, প্রতিলোম বিবাহে, এবং অনার্য্যাচরিত বিবিধ আচার ধর্ম্ম দেবতা ও পূজাপ্রণালী গ্রহণে তাহাদিগকে সমাজান্তর্গত করিয়া লইয়া, বৈদিকসমাজের সম্পূর্ণ বিরোধী আধুনিক হিন্দুসমাজকে গঠিত করিয়া তুলিয়াছিলেন; হিন্দুর আত্মঘাতী গৃহবিবাদের অবকাশে যে মুসলমান, এদেশে আসিয়া বংশপরম্পরাক্রমে জন্ম মৃত্যু দ্বারা এ দেশের মাটিকে আপনার করিয়া লইল—ভারতের ইতিহাস ইহাদের মধ্যে কাহার? —স্বতন্ত্র কাহারও নহে! তবে সে কি হিন্দু-মুসলমানের? তাহাও নহে। সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী দিয়া ইহাকে বাঁধিতে যাওয়া শুধু আমাদের অহঙ্কার প্রকাশ করা মাত্র!

ভারতবর্ষ কাহারও নিজস্ব সম্পত্তি নহে; এবং, এক দিন যে কোন এক বিশিষ্ট জাতি তাহার সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া বসিবে তাহাও নহে। ভারতের ইতিহাস সত্ত্বের ইতিহাস নহে—তাহা সত্যের ইতিহাস। যে মহান্ সত্য নানা আঘাত সংঘাতের মধ্য দিয়া পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, আমাদিগকে তাহারই সাহায্য করিতে হইবে। ব্যক্তি বিশেষ, বা সমাজ বিশেষের কর্ত্তৃত্বলাভের চেষ্টায় মর্য্যাদা কিছু নাই। ভারতবর্ষকে একটি অপূর্ব্ব পরিপূর্ণাকারে গড়িয়া তুলিতে হইবে। আমরা তাহার একটা উপকরণ মাত্র—একথা যেন মনে রাখি। আমরা

* পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সম্প্রতি ছাত্রসমাজে যে বক্তৃতা করেন ইহা তাহারই সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম।

যদি দূরে দূরে থাকি, বা নিজের স্বাতন্ত্র্যে খণ্ডাকারে প্রকাশিত হইতে চাই—সে নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য আমরাই দায়ী। আমরা যেটুকু মিলিতে পারিব—সেই টুকুই সার্থক হইবে। যেটুকু গণ্ডীবদ্ধ সেটুকু নিরর্থক—এবং তাহার নাশ অবশ্যম্ভাবী।

আজ যে পশ্চিম হইতে ইংরেজ আসিয়া ভারতেতিহাসের একটা প্রধান অংশ জুড়িয়া বসিয়াছে—ইহা কি সম্পূর্ণ আকস্মিক, অপ্রয়োজনীয়? ইংরাজের নিকট কি আজ আমাদের শিখিবার কিছুই নাই? তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যাহা আমাদের দিয়া গিয়াছেন বিশ্বমানব-ভাণ্ডারে তাহাপেক্ষা নূতন জ্ঞান কি আর কিছুই থাকিতে পারে না? নিখিলমানবের সঙ্গে জ্ঞানপ্রেম কর্ম্মের নানা আদান প্রদানে আমাদের অনেক প্রয়োজন আছে; ইংরেজ বিধাতৃপ্রণোদিত হইয়া তাহারই উদ্যম আমাদের মধ্যে জাগাইতে আসিয়াছে,—সফল না হওয়া পর্য্যন্ত সে নিশ্চিন্ত হইবে না। সে সফলতা পূর্ব্ব ও পশ্চিমের মিলনে, বিরোধে নহে। ভারতবর্ষ হইতে অসময়ে ইংরাজকে তাড়াইবার আমাদের অধিকার? আমরাই বা কাহারা?—হিন্দু না মুসলমান? বাঙ্গালী না মারাঠি না পাঞ্জাবী? যাহারা—যে সম্মিলিত সমষ্টি—একদিন সম্পূর্ণ সত্যের সহিত "আমরাই ভারতবর্ষ" একথা বলিতে পারিবে—এ অহঙ্কার তাহাদেরই মুখে শোভা পাইবে।

আজ মহাভারতবর্ষ গঠনের ভার আমাদের উপর। সমুদয় শ্রেষ্ঠ উপকরণ লইয়া আজ আমাদের এক মহাসম্পূর্ণতাকে গঠিত করিয়া তুলিতে হইবে! গণ্ডীবদ্ধ থাকিয়া ভারতের ইতিহাসকে যেন আমরা দরিদ্র করিয়া না তুলি।

ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধুনাতন মনীষিগণ একথা বুঝিয়াছিলেন তাই তাঁহারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে মিলাইয়া কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ রামমোহন রায়, রাণাড়ে, এবং বিবেকানন্দের নাম করিতে পারি। ইঁহারা প্রত্যেকেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাধনাকে একীভূত করিতে চাহিয়াছেন; ইঁহারা বুঝাইয়াছেন, যে জ্ঞান শুধু এক দেশ বা জাতির মধ্য আবদ্ধ নহে, পৃথিবীর যে দেশেই যে কেহ জ্ঞানকে মুক্ত করিয়াছেন, জড়ত্বের শৃঙ্খল মোচন করিয়া মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিকে উন্মুখ করিয়া দিয়াছেন তিনিই আমাদের আপন—তিনি ভারতের ঋষি হউন বা প্রতীচ্যেরমনীষী হউন,—তাঁহাকে লইয়া আমরা মানবমাত্রেই ধন্য।

বঙ্কিমচন্দ্রও অসীম প্রতিভাবলে বাংলা সাহিত্যে পশ্চিম এবং পূর্ব্বের মিলন সাধন করিয়া বঙ্গসাহিত্যকে, পূর্ণ পরিণতির পথে অগ্রসর করাইয়া, কম সার্থক করিয়া তোলেন নাই।

অতএব, আজ আমাদের এই মিলনের সাধনা করিতে হইবে; রাজনৈতিক বল লাভের জন্য নহে, মনুষ্যত্ব লাভের জন্য; স্বার্থবুদ্ধির পথ দিয়া নহে, ধর্ম্মবুদ্ধির মধ্য দিয়া।

কিন্তু আজ এই মিলনের পথে যে বিরোধ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে—ইহা কি মিলনের পক্ষে সম্পূর্ণই প্রতিকূল? তাহা নহে। আমাদের ভক্তিতত্ত্বে বিরোধও মিলন সাধ-

নার একটা অঙ্গ স্বরূপ। কারণ অসত্যকে অবলম্বন করিয়া সত্যের নিকট যে পরাজয় —তাহার মত স্থায়ী লাভ আর নাই। অসংশয়ে বিনাবিচারে যাহা গ্রহণ করিলাম —তাহাতে আমার প্রতিষ্ঠা থাকে কোথায়?

আজ আমরা আমাদের জীবনের মাঝে এক অবমাননার বেদনা অনুভব করিতেছি। এতদিন আমরা, নিজের মর্য্যাদার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, শুধুই অপরের দান গ্রহণ করিয়া আসিতেছিলাম। আত্মমর্য্যাদার প্রস্তরে ঘসিয়া তাঁহার মূল্য যাচাই করিয়া তাহাকে আপনার করিয়া লইতে এতদিন পারি নাই। কাজে কাজেই সে দান আমাদের অন্তরে মিশিতে পায় নাই; তাহা শুধু বাহিরের পোষাকী জিনিস হইয়া উঠিতেছিল। সে যে দান নহে, সে যে শুধু অপমান, আজ তাহা আমরা আমাদের ক্ষুণ্ণ আত্মমর্য্যাদায় স্পষ্টই উপলব্ধি করিতেছি, এবং এই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার প্রভাবেই আজ যত বিরোধ উপস্থিত হইতেছে।

আপনার মর্য্যাদায় দণ্ডায়মান হইয়া যে দিন অপরের দান লইতে পারিব সেই দিন সে গ্রহণে সার্থকতা, কারণ তাহাতে নীচতা নাই—সে দান তখন আমাদের অন্তরাত্মার সহিত যথার্থ মিশিয়া, আমাদের এই অতৃপ্তি অশান্তি বিদূরিত করিতে সমর্থ হইবে। মহাত্মা রামমোহন দীনের ন্যায় পাশ্চাত্যের চরণতলে উপস্থিত হন নাই, তিনি শুধু প্রতীচ্যের জ্ঞানে আপনার জ্ঞানের অসম্পূর্ণতাটুকুকে পূর্ণ করিতে চাহিয়াছিলেন মাত্র। এবং সেই জন্যই তিনি প্রাচ্যের জ্ঞানরত্ন-ভাণ্ডার-দ্বারে দাঁড়াইয়া গর্ব্বের সহিত প্রতীচ্যের মুক্তারাজি আহরণ করিয়া তাহাদিগকে যথার্থ আপনার করিয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন।

আসল কথা এই, পশ্চিমের সহিত প্রাচ্যকে মিলিতেই হইবে। পশ্চিমকে, আপনার শক্তিতে আপনার করিয়া লইতেই হইবে। আমাদের যদি আত্মশক্তির অভাব ঘটে বা পশ্চিম যদি আপনাকে সত্যভাবে প্রকাশ করিতে কৃপণতা করে—উভয়ই ক্ষোভের বিষয়। অধুনা ইংরেজ, ডেভিড্‌-হেয়ার প্রমুখ তাহার পূর্ব্বতন মনীষিগণের ন্যায়, তাহার ইংরেজী সভ্যতার পূর্ণ অভিব্যক্তির পরিচয় আমাদিগকে দিতেছে না; এবং সেই জন্যই, পূর্ব্বকালের ছাত্র সম্প্রদায়ের ন্যায় আধুনিক ছাত্রগণের সেক্সপীয়র বা বায়রণের কাব্য পাঠে, সে আন্তরিক অনুরাগ আর নাই;—সাহিত্যের মধ্য দিয়া ইংরাজের সহিত যে মিলন তখন ফুটিয়া উঠিতেছিল, আজ তাহা প্রতিহত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার যাহা শ্রেষ্ঠ যাহা সত্য তাহা হইতে ইংরাজ আজ আমাদিগকে স্বেচ্ছায় দূরে রাখিতেছে; এমত অবস্থায় যদি স্বভাবতঃই মিলন না আসে তবে প্রবল সিডিসনের আইন করিয়া দুর্ব্বল আমাদিগকে বাঁধিয়া রাখা, অসন্তোষ-বৃদ্ধি করামাত্র—দূর করা নহে! সুশাসন এবং ভাল আইন মানুষের চরম লাভ নহে; মানুষ মানুষকে চায়—মানুষ হৃদয়কে চায়; তাহা যদি সে না পায়, সে কিছুতেই তৃপ্ত হইতে পারে না।

কিন্তু একথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে দীনতার নিকটেই হীনতা ধরা পড়ে,—শক্তির নিকটেই যথার্থ মর্য্যাদা

প্রকাশ পায়; অতএব সকল দিকেই আমাদিগকে শক্তিশালী হইতে হইবে। আমাদিগের সকল দাবীই আমাদিগকে জয় করিয়া লইতে হইবে—হীনতার দ্বারা নহে, কিন্তু মহত্ত্বের দ্বারা, মনুষ্যত্বের দ্বারা! "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"—দুর্ব্বল পরমাত্মাকে জানিতে পারে না, দেবতাকে যে চাহে তাহাকে দেবগুণোচিত প্রকৃতিসম্পন্ন হইতে হইবে।

তীব্র উক্তির দ্বারা নহে, দুঃসাহিক কার্য্যের দ্বারা নহে, কিন্তু ত্যাগের দ্বারা আজ আমাদিগকে শ্রেয়কে বরণ করিয়া লইতে হইবে। যখন আমরা নিজের চেষ্টার দ্বারা, নিজের ত্যাগের দ্বারা, দেশকে আপন করিয়া লইতে এবং দেশের উপর আমাদের সত্য অধিকার স্থাপন করিতে পারিব—তখন আর আমরা দীন নই, আমরা তখন ইংরাজের সহযোগী। আমাদের দীনতার অভাবে তখন ইংরাজেরও আর হীনতা প্রকাশ পাইবে না। ভারত আজ আপন মূঢ়তায়, শাস্ত্রে ধর্ম্ম সমাজে কেবলই আপনাকে বঞ্চনা ও অপমান করিতেছে। সত্যের দ্বারা ত্যাগের দ্বারা, আজ তাহাকে নিজের আত্মাকে উপলব্ধি করিতে হইবে। তাহা হইলেই আমরা যাহা চাহিতেছি তাহা পাইব এবং পশ্চিমের সহিত প্রাচ্যের মিলন সম্পূর্ণ হইবে। সেই দিনই ভারত-ইতিহাসের এই বিরোধ-সঙ্কুল বর্ত্তমান প্রর্কের অবসান হইবে!

উমা-পরিণয়।

কুমার-সম্ভব।

(১)

ওষধিপতি-বিশদজ্যোতি হতেছে উপচিত—
লভিয়া তবে লগন শুভ যামিত্র*-যোজিত,
বন্ধুজন সহিত গিরি বিহিত আয়োজন
করিছে থির,—পার্ব্বতীর বিবাহ-প্রয়োজন!

(২)

বিবাহোচিত বহুলবিধ দ্রব্য থরে থরে'
পৌর নারী সাজাতে ভারি ব্যগ্র ঘরে ঘরে!
সবাই নগে সমানে যোগে; এমনি হয় বোধ
আজিকে যেন একটি গৃহ—পুরী ও অবরোধ!

(৩)

সন্তানক-পুষ্পদলে পূরিল যত পথ,
পট্ট-বাসে রচিত কেতু উড়িল পত পত,
হিরণ্ময় তোরণচয় উজলে পুরী হেন—
স্বর্গ হতে অমরাবতী নামিল সেথা যেন!

(৪)

উমার শুভ বিবাহ আজ, অচলরাজ তাই
মানিছে উমা-বিহনে আর তনয় তাঁর নাই!
উমারে যেন নিরখি' নি'ন কত না দিন পরে!
আজিকে যেন বাঁচিল উমা, আছিল উমা মরে'!

---

* লগ্ন হইতে সপ্তম রাশি।

(৫)

আশিস্ শিরে অঙ্কে ফিরে অঙ্ক ছাড়ি' ছাড়ি,'
ভূষার পরে ভূষণ পরে নগেন্দ্রকুমারী!
শিখরি-কুলে অনেকে ছিল স্নেহের নিধি বটে—
সবার স্নেহ জড়িত হয়ে' পড়িল একি ঘটে!

(৬)

সবিতা যার দেবতা সেই শুভ মুহূর্ত্তকে,
উত্তর-ফল্গুনী আর চন্দ্রমার যোগে,
মাঙ্গলিক অঙ্গরাগে সাজাতে পার্ব্বতী
লাগিল যত বন্ধুবধূ পতিপুত্রবতী!

(৭)

শরীরে শ্বেত শরিষা পড়ি' দূর্ব্বাদল সাথে—
আমরি কিবা পার্ব্বতীর মধুর শোভা তাতে!
শিথিল করি' দুকূল পরি,' হস্তে ধরি' শেল
উজলে ভূমি যেথায় উমা অঙ্গে মাখে তেল!

(৮)

গ্রহিলে বালা বিবাহে-পালা' নূতন দুটি শর,
ও তনুখানি উঠিলা ফুটি' তাহারি লুটি' কর!
অসিত তিথি অতীতে নিতি যেমতি শশিকলা
নবীন রবি-কিরণ লভি' অতীব উজ্জ্বলা!

(৯)

লোধ্র-রজে গাত্র মাজি' হরে তৈল-ভার,
কালেয়-যোগে অঙ্গরাগ করে শৈলজার;
স্নানের বাস পরায়ে' তবে গৃহিণী সবে তাঁয়
চারিটি থামে রচিত এক ভবনে লয়ে' যায়।

(১০)

বসায়ে' সেথা 'বিদূর'-মণি-মেদুর শিলাতলে—
বিলম্বিত মুকুতামালা মরি কি ঝলমলে!
ঝরায়ে' হেমকুম্ভবারি করায় তাঁরি স্নান,
সঙ্গে উঠে'বাদ্য বাজি' মোহন মধু তান!

(১১)

কুশল স্নানে অচলবালা বিমল-কলেবরা,
কি শোভে পতি-বরণোচিত বসন হলে' পরা!'
বরষা শেষে থামিয়া গেছে মেঘের বারি-ঝরা—
বিকচ কাশ কুসুমে আজ খচিত যেন ধরা!

(১২)

সেথান হতে পতিব্রতা রমণী কতিপয়
পার্ব্বতীরে তখন এক বেদীর প্রতি লয়—
সাধিবে বেশ-বাসন সেথা; আসন পাতা তলে?
চারিটি মণি-দণ্ড পরে চন্দ্রাতপ দোলে!

(১৩)

পূর্ব্ব-মুখী করিয়া সেথা বসায়ে প্রমদায়
সমুখে বসি' থমকি' রহে রমণী সমুদায়!
নিরখি' তাঁর স্বভাব-শোভা ভুলিল দু'নয়ন—
ক্ষণেক তরে রহিল পড়ে' যতেক প্রসাধন!

(১৪)

ধূপের ধূমে শুকায়ে' পরে উমার ভিজে চুল,
রমণী এক তাহার মাঝে প্রথমে গুঁজে ফুল,
বাঁধিয়া দিল চিকুর-জাল কি সুন্দর করে'
দূর্ব্বা-সাথী শুভ্র-ভাতি লোধ্রমালা-ডোরে!

(১৫)

লেপিয়া চারু অঙ্গে শ্বেত অগুরু চন্দন,
রোচনা গুলি' পত্রাবলী করিল বিরচন!
ফুটিল তাহে উমার শোভা মন্দাকিনী-জিনে'—
চক্রবাক-বিহগ যাঁর অঙ্কিত পুলিনে!

(১৬)

ভ্রমর-যোগে কমল যায় কেমন ভাল দেখা!
কি শোভা ধরে শশীর'পরে মেঘের কাল
রেখা!
উমার মুখে চিকণচারু অলকদাম লুটি'
তুলনা-কথা দুটির কোথা দিলেক নাম টুটি!

(১৭)

কপোলে মাখা হইল রুখু লোধ্র-ফুল-কণা,
তাহারি প্রতি রচিল অতি-গৌর গোরোচনা ;
কর্ণপূর যবাঙ্কুর-বর্ণ লাগি' শাদা
এমনি শোভা উঠিল জাগি'—পড়িল আঁখি
বাঁধা !

(১৮)

সুঠামে-ভাঙা অঙ্গ ; রাঙা ঠোঁঠে সে কাটা
রেখা—
মাজিয়া দিতে মধুর ছিটে যেতেছে মিঠে দেখা !
স্ফুরিয়া উঠে' কি ছটা ছুটে, কেমনে কে বলিবে !
সুচিছে যেন অচিরে তার লাবণ্য ফলিবে !

(১৯)

আরেক সখী চরণতল রাঙায়ে' আলতায়—
"পতির শিরে চাঁদের কলা পরশ' এই পায়"
বলিয়া যবে আশীর্ব্বাদ করিল পরিহাসি,'
বালিকা তারে মালিকা মারে কথাটি নাহি ভাষি'

(২০)

প্রস্ফুটিত কমলফুলদলের সম লিখা'
নয়ন দুটি নিরখি' তাঁর, যতেক প্রসাধিকা—
ফুটিবে কিবা বিশেষ বিভা মানসে নাহি মানে,
কুশল কাজ বলিয়া আজ কাজল চোখে টানে !

(২১)

বিকচ ফুল-নিকরে যথা ললিত লতা সাজে,
উদয়শীল তারায় যথা রজনীবালা রাজে,
বিলীয়মান মরালগণে তটিনী যথা ভায়,
উজলে উমা তেমনি মরি গহনা পরি' গায় !

(২২)

অমন মনোমোহন রূপ মুকুর খানি ধরে'
নিরখে বালা ডাগর চোখে, পলক নাহি পড়ে !
মহেশ্বরে মিলন তরে আকুল বড় মন,—
হেরিলে পতি সকল সতী-নারীর আভরণ !

(২৩)

লইয়া এক আঙুলে করি' তরল হরিতাল,
আরেকটিতে গ্রহণ করি' পুণ্য মনছাল,
দিলেন রাণী তিলক টানি' মেয়ের মুখ তুলে'—
শ্রবণমূলে অমল দুল 'দন্তপাতা' দুলে !

(২৪)

উমার যবে উদিল সবে প্রথম যৌবন,
তখন হতে মাতার মনে যে আশা অনুখন
বাড়িতেছিল—আজিকে যেন সেই সে মনোরথে
সুতার ভালে ফোঁটায় তোলে ফুটায়ে'কোন মতে!

(২৫)

নয়ন-জলে আকুল, ঝলে রাণীর দুটি আঁখি—
আরেক ঠাঁই বাঁধিলা তাই উর্ণাময় রাখী !
ধাত্রী আসি' আঙুল দিয়ে সরায়ে' নিয়ে তায়
পরায়ে দিল উমার হাতে সঠিক জায়গায় !

(২৬)

ক্ষীরোদ-বেলা যেমনি সাজে শুভ্র ফেনা-সরে,
শরতে যথা রজনী রাজে পূর্ণশশিকরে—
দুকূল পরি' নবীন, নব মুকুর করে ধরি,
তেমনি উমা শোভিল কিবা আমরি মরি মরি।

(২৭)

যতেক কুল-দেবতা ছিল পরম পূজনীয়া,
কুলের প্রভা উমারে সবা' প্রণাম করাইয়া—
কি কাজ তবে করিতে হবে গান নি মাতা ভুলি
লওয়ান সতী-ললনাদের পুণ্য পদ-ধূলি !

(২৮)

"অখণ্ডিত পতির প্রেম লভহ তুমি উমে !"
—আশিসে তাঁরা, যখন তিনি নমিলা ভূমি চুমে' !
ধূর্জ্জটীর অর্দ্ধ-দেহভাগিনী বালা পিছু
তাঁদের হেন আশীর্ব্বাদও করিয়াছিলা নীচু !

শ্রীবেহারীলাল গোস্বামী।

[ক্রমশ]

সাময়িক প্রসঙ্গ।

জাতীয় উৎসব।*

শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ।

আজ আমরা পুনরায় দলে দলে এই চতুর্থ বাৎসরিক জাতীয় উৎসবক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছি। আমার চক্ষে আজিকার দিনের এ উৎসব অতি পবিত্র। জাতীয় জীবনের মহেন্দ্রক্ষণে চারিবৎসর পূর্ব্বে এমন দিনে আমরা যে বয়কটকে গ্রহণ করিয়াছিলাম—সৌভাগ্যক্রমে আজ তাহাই আমাদের মুক্তির চরমপন্থারূপে আবির্ভূত হইয়াছে। কোন কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত থাকার নামই 'বয়কট'; সকল বিষয়ে নহে, কিন্তু কতক কতক বিষয়ে আমার কার্য্যের উপর অপর কোন ব্যক্তির হাত থাকিতে পারে না। আমি যদি মদ না খাই, আমি যদি বিদেশী কাপড় না পরি, আমি যদি মোকর্দ্দমা না চালাই—তাহাতে কেহ আমাকে বাধা করিতে পারে না। আমি যদি আমার আত্মমর্য্যাদার প্রতি নির্ভর রাখিয়া এ সকল বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হই, আমি যদি স্বেচ্ছাকৃত দাসত্বে আমার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবনতি সাধন না করি,—তাহা আমারই পক্ষে শ্রেয়স্কর।

নীলচাষী রাইয়তদিগের কথা মনে করিয়া দেখুন। অত্যাচার-জর্জরিত প্রপীড়িত তাহারা, যখন আত্মরক্ষাকল্পে 'নীল স্পর্শ করিব না' বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল তখন কিছুই তাহাদিগকে তাহাদের সংকল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিল না,—অনুনয় নয়, অনুযোগ নয়, পৈশাচিক নিষ্ঠুরতাও নয়। লুণ্ঠিত, সর্ব্বস্বান্ত, ভস্মীভূত-চিরমায়াবদ্ধক্ষুদ্র-ভিটাটুকু হইতে বিতাড়িত হইয়া, লাঞ্ছিত-স্ত্রীপুত্রকন্যাসমভিব্যাহারে, পথের ভিখারীর মত মুক্ত প্রান্তরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে,—বুভুক্ষু শিশুগণের কাতর অশ্রুজলের সহিত অন্তরযামী বিধাতার চরণতলে তাহাদের নীরব নয়নজল কতদিন মিশিয়াছে, কিন্তু তবু তাহাদের প্রতিজ্ঞা টলে নাই; তবু তাহাদের সংকল্প, অচল—অটল—স্থির!—পরীক্ষার পর, অবশেষে তাহারাই জয়ী হইয়াছিল। আমাদেরও আজ এই শত অন্যায় অত্যাচার পীড়নের মধ্য দিয়া সংকল্প অটল রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। আমাদেরও আজ প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে—"এই হস্ত আর যথাসম্ভব বিদেশী দ্রব্য স্পর্শ করিবে না!" আত্মমর্য্যাদা যেন কখনও আমরা না ভুলি। সে দুর্দ্দিন যেন আমাদের কখনও না আসে!

সভাপতি শ্রীযুক্ত গজনভি মহোদয়:

এই ৭ই আগষ্ট আমাদের জাতীয় জীবনে নূতন যুগ আনিয়াছে। ভিক্ষা, আন্দোলন, আবেদন, নিবেদনে যখন কোনই ফল হইল না তখন, হতাশ্বাস হইয়া, আমরা শুভক্ষণে বঙ্গভঙ্গের প্রতীকারকল্পে, টাউন-

---

* গত ৭ই, আগষ্ট কলিকাতায় জাতীয় উৎসব উপলক্ষে যে বিরাট অধিবেশন হয়, তাহাতে যে যে বক্তৃতা হইয়াছিল তাহার সার সঙ্কলন।

হলের সেই মহাসভায় ইংরাজের পণ্য বর্জ্জন করিতে প্রতিজ্ঞা করিলাম। সেই আমাদের আত্মনির্ভরতার সূচনা। আমাদের সে মন্তব্য, সম্পূর্ণ আইন ও ন্যায়সঙ্গতই হইয়াছিল; এমন কি (এখন তাহাদের চিত্ত পরিবর্ত্তিত হইলেও) সে সময় ইংলিশম্যান ষ্টেটস্‌ম্যান প্রভৃতি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদ-পত্রসমূহও আগ্রহভরে তাহার সমর্থন করিয়াছিল। কিন্তু প্রথমতঃ জাতীয়-শক্তির প্রতিবাদকল্পে উদ্ভূত হইলেও, আজ ইহার ব্যাপ্তি এবং উন্নতি দেখিয়া আমরা নিজেরাই বিস্মিত। ইহাই আজ আমাদের শিল্পকে উন্নত, জাতীয়ভাবকে পরিপুষ্ট এবং আমাদের প্রত্যেক চিন্তার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ধর্ম্ম নীতি সমাজ শিক্ষা এবং গার্হস্থ্য-ব্যাপার প্রভৃতি সকলই আজ এই ভাবে অনুপ্রাণিত। আমাদের অন্তঃপুরে আমাদের গৃহকর্ত্রীগণের হৃদয়ে আজ ইহার দৃঢ় প্রতিষ্ঠা। কর্তৃপক্ষ বালকসম্প্রদায়ের উপর ইহার প্রভাব দেখিয়া বিস্মিত। হায়! Damoclesএর খড়্গসম মস্তকোপরি দোদুল্যমান Risley circular! তোমার প্রভাব কোথায় লুপ্ত হইল? কোথায় বালকবৃন্দ এ সকল শিক্ষা করিল? অন্তঃপুরে অনুসন্ধান কর; সেখানে—সেখানে সার্কুলার নাই, প্রমোসনের লোভ নাই, গুপ্তদূতের তীক্ষ্ণদৃষ্টি যথায় প্রবেশ করে না —সেখানে, আমাদের জননীগণ-পরিচালিত, সকল মঙ্গলময় প্রভাবের পীঠস্থান সেই গৃহ-নীড়েই, এ শিক্ষা তাহাদের কোমল হৃদয়ে প্রতিদিন সঞ্চারিত হইয়া উঠিতেছে! আজ এ দৃঢ়মূল স্বদেশীকে উৎপাটিত করা সুসাধ্য নহে। অন্তঃপুরকে কেন্দ্র করিয়া আজ সমগ্র দেশে ইহা পরিব্যাপ্ত। অত্যাচার এবং উৎপীড়নে ইহা ধ্বংস প্রাপ্ত হয় নাই—হইবে না—হইতে পারে না। আমরা উৎপীড়ন করিয়া থাকি, ভয়প্রদর্শন করি ইত্যাদি যে সকল অভিযোগ রাজপুরুষগণ আমাদের নামে আনিয়া থাকেন, তাহা তাঁহাদের কল্পনাপ্রসূত মাত্র। পূর্ব্ব বাংলার সেই সকল গণ্ডগোলের পর দেশের নেতৃগণ কর্তৃক প্রকাশিত ইস্তাহারে, ম্যাজিষ্ট্রেট এবং জজগণের রায় হইতে উদ্ধৃত অংশ সমূহে তাহা সপ্রমাণিত হইবে।

অবশ্য, কোন স্থলে যে সামান্যরূপ অত্যাচার বা উৎপীড়ন আমাদের দ্বারা হয় নাই তাহা বলিতে পারি না; সম্পূর্ণ ন্যায়জনক কার্য্যেও অসঙ্গতি আছে। তবে মোটামুটি আমরা যে প্রশংসনীয় সংযমের সহিত অগ্রসর হইয়াছি সে কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। অনুনয় এবং অনুরোধই আমাদের একমাত্র অস্ত্র;—অত্যাচার বা উৎপীড়ন নহে। দেশের আইন প্রণয়ণের উপর যদি আমাদের কোন কর্তৃত্ব থাকিত, তাহা হইলে ইংরাজ-ঔপনিবেশিকগণের ন্যায় আমরাও আমাদের নবজাত শিল্পগুলির রক্ষাকল্পে রক্ষা-শুল্কের প্রাচীর তুলিতে পারিতাম; কিন্তু, যখন রাজকার্য্যে আমাদের কোন হাতই নাই, তখন বাধ্য হইয়া আমাদিগকে নৈতিক এবং সামাজিক বিধিব্যবস্থার সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। আমি "বয়কট" কথার পক্ষপাতী নহি; "বর্জ্জন" কথাটাই আমার ভাল বলিয়া মনে হয়; ইহাতে কোন বিদ্বেষের ঝঙ্কার নাই; জনসমূহকে সম্বোধন করিবার

সময় সাধারণতঃ আমরা এই কথাই ব্যবহার করিয়া থাকি।

এই আন্দোলনে বস্ত্রবয়নশিল্পেরই অধিক উন্নতি হইয়াছে। যে সকল তন্তুবায় ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া দৈনিক মজুরের কার্য্য করিতেছিল, আজ তাহারা পুনরায় স্বকীয় ব্যবসায়ে মনঃসংযোগ করিয়াছে; সমগ্র বাংলায় এই সম্প্রদায় অধুনা বিশেষ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেট, তাঁহার শাসনসংক্রান্ত রিপোর্টে এই কথারই সমর্থন করিয়াছেন।

স্বদেশী আন্দোলনের ফলে আজ দেশের সর্ব্বত্র কলকারখানা, বীমা কোম্পানি, যৌথ কারবার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—হইতেছেও;—তাহাদের প্রত্যেকেরই বেশ উন্নতাবস্থা।

ভারতীয় কল-জাত বস্ত্রাদি এবং ধুতির পরিমাণ প্রতি বৎসর ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯০৭-৮ সালে, উৎপন্ন ধুতির পরিমাণ ২২ ক্রোড় গজ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে!

এ আন্দোলনে হিন্দু এবং মুসলমান উভয় পক্ষেরই লাভ; এক হিসাবে শেষোক্তই অধিক লাভবান্। কারণ হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানগণ অধিকতর দারিদ্র্যক্লিষ্ট; অতএব, দেশের অর্থ যদি দেশে রহিয়া যায় (স্বদেশী আন্দোলনের মূল সূত্রও তাহাই) তাহা হইলে তাহাতে ধনী হিন্দু অপেক্ষা দরিদ্র মুসলমানগণেরই সুবিধা বেশী। বিশেষতঃ তন্তুবায় সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান; এবং স্বদেশী ব্যাপারে এই সম্প্রদায়ই সমধিক লাভবান। সুতরাং, অন্ততঃ নিজের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াও, এই আন্দোলনের স্থায়িত্ব বিষয়ে মুসলমানভ্রাতাগণের সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক।

হিন্দুবন্ধুগণের প্রতি নিবেদন, তাঁহারা যেন হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর ঘনিষ্ঠতা ও সৌহার্দ্দ্যবৃদ্ধিকল্পে সচেষ্ট হন; এ বিষয়ে দায়িত্ব তাঁহাদেরই অধিক।

দেশের বর্ত্তমান অবস্থা বিপদসঙ্কুল হইয়া পড়িয়াছে। সমগ্রদেশময় আজ অসন্তোষ এবং অশান্তি পরিব্যাপ্ত। ইহা অস্বীকার করিবার জো নাই। গভর্ণমেণ্টের নির্ব্বুদ্ধিতাই ইহার মূলকারণ। তত্রাচ আইনসঙ্গতভাবে কার্য্য করাই আমাদের পক্ষে সুসঙ্গত। আইনবহির্ভূত কার্য্যে আমাদেরই সমূহ ক্ষতি। নীতি এবং ন্যায়কার্য্যের দ্বারাই আমরা আমাদের শিল্পসম্বন্ধীয় ও রাজনৈতিক পুনরভ্যুত্থান লাভ করিব। আমাদের এ কার্য্য—পবিত্র, বিধাতৃ-অভিপ্রেত। ভগবান ধর্ম্মস্বরূপ; অধর্ম্মে জাতীয় জীবনের উন্নতি সংসাধিত হইতে পারে না।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

"বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে আমরা কৃতসংকল্প। Morleyর settled fact কে unsettled করিতেই হইবে। আমাদের কালে আমরা সফলকাম না হইতে পারি; কিন্তু আমরা যাহা পারিলাম না আমাদের পুত্র পৌত্রাদি একদিন তাহা সংসাধিত করিবে। 'স্বদেশী' আমাদিগের দেহ মনে নবীনশক্তি এবং নূতন উত্তেজনা আনয়ন করিয়াছে। এ আন্দোলন আজ কেবলমাত্র বঙ্গদেশে আবদ্ধ নহে, সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত। ভগবান আমাদের নেতা এবং পরিচালক। তিনি আমাদের

অন্তরে যে হোমাগ্নি প্রজ্বালিত করিয়াছেন তাহা কখন নির্ব্বাপিত হইবে না। শ্রীকৃষ্ণ যেমন অর্জ্জুনের সারথি হইয়া তাঁহাকে যুদ্ধে দুর্দ্ধর্ষ এবং নির্ভীক করিয়া তুলিয়াছিলেন, সেইরূপ ভগবানও আজ আমাদের নেতা এবং বিধাতারূপে দণ্ডায়মান; তাঁহারই কৃপাবলে আজ আমরা আমাদের এই পতিত জন্মভূমির পুনরভ্যুত্থান বিষয়ে কৃতকার্য্য হইব। কারারুদ্ধ হই, বধ্যমঞ্চে বিলম্বিত হই—স্বদেশী আমরা পরিত্যাগ করিতে পারিনা।—স্বদেশী আমাদের জীবন,—স্বদেশী আমাদের সংস্থিতি।

আজ আমাদের মহা দুর্দ্দিন; কিন্তু তাই বলিয়া কি আমরা আজ আমাদের কর্ত্তব্য ভুলিয়া বসিয়া থাকিব? কখনই নয়। 'স্বদেশী' পরিত্যাগ করিলে চলিবে না। তাহাতে যদি দুঃখ আসে, বাধা আসে,—হাসিমুখে সকলই গ্রহণ করিতে হইবে। প্রহ্লাদের পক্ষে যেমন হরিনাম, আমাদিগের পক্ষে স্বদেশীও তাই। কিন্তু আমরা যেন আইন-বহির্ভূত কার্য্য না করি। অনুনয় আমাদের মূল মন্ত্র। আইনের মধ্যে থাকিয়াও আমাদের কার্য্যের প্রসার অনেক আছে। তোমরা বলিবে—'আইন নাই',—আইন না থাক—ধর্ম্ম আছে, নীতি আছে। সে কথা আমরা কেন ভুলি?

'বয়কট' বিষয়ে আমরা সকলেই একমত। আংলোইণ্ডিয়ান প্রভুরা বলিয়া থাকেন যে 'বয়কট' জাতীয়-বিদ্বেষ বৃদ্ধি করে। কিন্তু আমাদের 'বয়কট' জাতীয়-বিদ্বেষ-প্রণোদিত নহে; ইহা সভ্যতা এবং সদিচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত। জাতীয় বিদ্বেষ যদি যথার্থই উৎপন্ন হইয়া থাকে তবে গভর্ণমেণ্টের অত্যাচারপূর্ণ আইনকানুনই তাহার জন্য দায়ী। ভারত-লক্ষ্মী, আজ অতীত-সম্পদ নষ্টশ্রী ভারতকে ঘোর দারিদ্র্য-তমসাবৃত করিয়া, সাগর পারে অন্তর্হিতা; এই স্বদেশী বয়কটের প্রভাবে তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিয়া এ ভারতে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

জগতের প্রতি জাতিই এখন ভারতের কথা জানিবার নিমিত্ত উৎসুক—সুতরাং ভারতের আশা উদ্দেশ্য বাসনা প্রভৃতির বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা প্রচার নিবারণ করা প্রতি শিক্ষিত ভারত-সন্তানেরই কর্ত্তব্য। ভারত যে পৃথিবীর নগণ্য অংশ নহে, ভারতের নরনারী যে বিবেকহীন বর্ব্বর নহে, ভারতও যে বিদ্যামণ্ডিত মহিমাসমুজ্জ্বল এবং উন্নতিপ্রয়াসী,—ভারতের জাতীয় আশা যে দুরাশা নহে, অন্যায় নহে, অপিচ সম্পূর্ণ ন্যায় এবং নীতিসঙ্গত—তাহা স্পষ্টাক্ষরে জগতের নিকট প্রচার করিতে হইবে। ভারতের বিষয়ে জগতকে উদ্বোধিত করিতে হইবে। ফল যাহাই হউক, কিন্তু ইহা এখন আমাদের আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ্র পাল।

আমাদিগকে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে একমাত্র স্বদেশী এবং বয়কটের উপরই আমাদের জাতীয় জীবনের চরম আশা ভরসা নির্ভর করিতেছে। বয়কট আমাদের চাই-ই চাই; 'বয়কট' নহিলে আমাদের চলিতে পারে না। অত্যাচারিত বা আক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে মুক্তির তিনটি পথ প্রশস্ত;—হয় পলায়ন, নয় আত্মরক্ষা, না হয় পুনরাক্রমণ। তন্মধ্যে

শেষোক্তটি আপাতঃ স্পৃহনীয়-বোধ হইলেও, দ্বিতীয়টিই অধিকাংশ সময়ে শ্রেষ্ঠ এবং অধিক কার্য্যকরী ; অন্ততঃ, আমাদের বিষয়ে, আমরাত তাহার সার্থকতা দেখিতে পাইতেছি। আমাদের স্বকীয় গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ থাকিয়াই, আজ আমরা এতদূর জয়ী। বয়কটকে অনেকে অসংযম বলিয়া থাকেন ; কিন্তু আমার ত বোধ হয় সংযম যদি কিছুতে থাকে তবে তাহা বয়কটেই ! ইংরাজেরা বয়কটকে বলিয়া থাকেন "Passive resistance" বা 'নিষ্ক্রিয় বাধা'। যাহা 'নিষ্ক্রিয়', তাহা অসংযম হইবে কি করিয়া ? এরূপ ভ্রমাত্মক বাক্য আমি আর কখনও শুনি নাই। 'বয়কটে' বরঞ্চ, আমি, অধিকতরভাবে সংযমের উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ 'বয়কট' ত নিবৃত্তির নামান্তর মাত্র। প্রবৃত্তিকে খর্ব্ব করিয়া' যদি নিবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলাম তবে আমার মত সংযমী কে ? চাকচিক্যময় সুলভ বিলাতী দ্রব্যের লোভ বর্জ্জন করিয়া যদি আমি অপেক্ষাকৃত দুর্ম্মূল্যে স্বদেশজাত মলিন দ্রব্য ক্রয় করিতে পারি—তাহা কি আমার সংযমতার পরিচায়ক নহে ? অতএব এই বয়কটের, এই সংযমতার উপরেই, আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া জাতীয় জীবনের পথে আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। প্রতি সমাজেই মানবের আপনাপন কয়েকটি অধিকার আছে ; বয়কট সেই অধিকার লইয়াই প্রচলিত। আমি যদি কাহারও সংশ্রব পরিত্যাগ করি, তাহাতে আমি তাহার কোন অধিকার ক্ষুণ্ণ করিতে যাইতেছি না, আমারও অধিকারের গণ্ডী আমি ত্যাগ করিতেছি না। আমি আমার ইচ্ছামত দ্রব্যাদি ব্যবহার করিব ; অভীষ্ট লোকের সহিত আলাপ রাখিব ; অনিপ্সিত কাহারও সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিব না ; দুষ্ক্রিয়কারীর সহিত এক পংক্তিতে ভোজনে বসিব না ; আমি ক্ষৌরকার হই, বা রজক হই, কিম্বা পুরোহিত হই, ইচ্ছা হইলে, কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির কার্য্যাদি করিব না ;—সে অধিকার হইতে কেহ আমাকে বঞ্চিত করিতে পারে না। অন্ততঃ সে দুর্দ্দিন আজিও এ দেশে আসে নাই।

পরিশেষে আমার বক্তব্য, 'স্বদেশী' আমাদের একমাত্র আশা : অতএব, ভারতের মুক্তির জন্য "বয়কট" ও 'স্বদেশী" প্রতিষ্ঠার একান্ত প্রয়োজন।

হেমেন্দ্রলাল।*

(সমালোচনা।)

হেমেন্দ্রলাল একখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাস। লেখক শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ ঘোষ। ভবানী বাবু "পরিণয় কাহিনী" "সরমার সুখ" প্রভৃতি গল্পের পুস্তক রচনা করিয়া ইতিপূর্ব্বে সুলেখক বলিয়া বঙ্গসাহিত্যে পরিচিত হইয়াছিলেন, এবার হেমেন্দ্রলাল তাঁহাকে বঙ্গসাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিল।

গ্রন্থখানি পাঠে আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। উপন্যাস পাঠ করিয়া অনেক দিন এরূপ সুখ সম্ভোগ করি নাই। ইহার বিস্তৃত আলোচনা করিবার ইচ্ছা সত্বেও তাহা হইয়া উঠিল না, বলিয়া আমরা দুঃখিত—সংক্ষেপে নিম্নে এ গ্রন্থের পরিচয় দিলাম।

উপন্যাস খানির ঘটনার কাল নবাব আলিবর্দ্দি ও তাঁহার দৌহিত্র সিরাজের আমলের। ইহাতে কোন কোন ঐতিহাসিক চরিত্র আছে, কিন্তু গ্রন্থকার ভূমিকায় বলিয়া দিয়াছেন, ইহা ঐতিহাসিক উপন্যাস নহে। কারণ এই আখ্যায়িকার অধিকাংশ ব্যাপারই কল্পিত। কল্পিত হোক, কিন্তু গ্রন্থে বর্ণিত সেকালের সকল চিত্রই যেন যথাযথ। সেকালের ঘর-সংসার, কর্ত্তা, গৃহিনী, পতি পত্নী, পুত্র কন্যা, বধূ, দাস দাসী, শিক্ষা, সহবৎ, উৎসব, আমোদ, প্রমোদ. ভক্তি প্রেম, সুখ দুঃখ, সব চিত্রই যেন জীবন্ত। গ্রন্থকার বর্ণনায় সিদ্ধহস্ত। তাঁহার স্বভাব বর্ণনা, মজলিস বর্ণনা, রূপ বর্ণনা, সকল বর্ণনাই পড়িলে মনে হয় যেন বর্ণিত বিষয় গুলি সম্মুখে প্রত্যক্ষ করিতেছি, যেন সে সব চক্ষের উপরে ভাসিতেছে। তাহাতে অতি-রঞ্জন নাই বলিলেই হয়। তাঁহার ভাষা অধিকাংশ স্থলে মধুর, প্রাঞ্জল, প্রাণস্পর্শী, উপন্যাসের বিশেষ উপযোগী। উপন্যাসের চরিত্রগুলিও সাধারণত প্রস্ফুট, ও স্বাভাবিক। এ গ্রন্থে তবে কি দোষ নাই? আছে। কিন্তু ছাপার অসংখ্য ভুল ভ্রান্তি ছাড়া অন্য অন্য যে সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষ গ্রন্থের গুণে তাহা একরূপ ঢাকিয়া গিয়াছে। লেখক গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠায় যে শোক-চিত্র আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছেন—ভাষার অসংযমে তাহার গাম্ভীর্য্য নষ্ট হইয়াছে,—এরূপ স্থলে কমলাকান্তের দপ্তরের বা উদ্‌ভ্রান্তপ্রেমের ভাষা ঠিক শোভন হয় না শ্মশানক্ষেত্রে বাসরের মধুর মিলন সঙ্গীত—মিষ্ট লাগে না, বরং তাহা শ্রবণন্দ্রিয়ের পীড়া জনক! আমরা হিরণ্যকশিপুর মত "হরি"-বিদ্বেষী নহি কিন্তু এ কথা বলিতে বাধ্য যে "সে সুখের নৃত্য, সে আনন্দের হাসি আর নাই,—হরি! হরি! আর যে থাকিবে না" আমরা এইরূপ 'হরি! হরি!'র বিদ্বেষী! (১ম পৃষ্ঠা) "হেমেন্দ্রলালের তীক্ষ্ণ মেধা, অনেক দেখিল,

---

* মূল্য ১।০ ও ১৸০ কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

অনেক শিখিল। কিছু কিছু উপার্জ্জনও করিতে আরম্ভ করিল।"—(৫ পৃষ্ঠা) এখানে ভাষায় একটু অসাবধানতা লক্ষিত হয়। এ প্রকার শিথিলতা স্থানে স্থানে আছে, কিন্তু বলিয়াছি ত যে-সে সব ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে।

"অনেক দিন হয়"—"রূপের ফাঁদে ত পড়িয়াছিল না" এ ভাবের প্রয়োগগুলি বোধ হয় গ্রন্থকার প্রাদেশিক-মায়া ত্যাগ করিতে না পারিয়াই রাখিয়াছেন, কিন্তু বঙ্গ-ভঙ্গের দিনে ভাষার .প্রাদেশিকতা, সাধু-ভাষায় লিখিত পুস্তকে না রাখাই ভাল।

ভাষার কথা ছাড়িয়া, গ্রন্থের চরিত্র সম্বন্ধে ২।৪টি কথা বলিয়াই আমাদের এ সমালোচনা শেষ করিব।

পিয়ার চরিত্রে, যেন "মৃণালিনী"র গিরিজায়ার সামান্য ছায়া পড়িয়াছে। কিন্তু ইহাকে অনুকরণ বলা চলে না। গ্রন্থকার পিয়ারকে যে ভাবে আঁকিয়াছেন, তাহাতে তাহাকে পুনরায় বিবাহ-বন্ধনে না বাঁধিয়া, সুরত বিবির চির-সঙ্গিনী করিলেই যেন ঠিক হইত। সে সাদেককে ভাল বাসিয়া ছিল বাসুক ; ভালবাসায় আপত্তি নাই, কিন্তু— এই ভাল বাসিয়াও যে যদি সুরতের জন্য আত্মসুখে বলি দিত, তাহা হইলেই তাহার চরিত্রের সামঞ্জস্য রক্ষা হইত। সুরতের জন্য এইরূপ করাই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক—গ্রন্থকার তাহাকে সে মহত্ত্ব হইতে বঞ্চিতা করিয়াছেন বলিয়া দুঃখ হয়। কিন্তু আর উপায় নাই, আমাদের অনুরোধে ভবিষ্যতে ইহার প্রতীকার করিতে গ্রন্থকার যদি বা স্বীকৃত হন, পিয়ারের মতিও যদি ফিরে, কিন্তু সাদেক, তাহার বড় সাধের 'আধেক' পিয়ারকে কখনই তালাক দিতে রাজি হইবে না! বরং কাজি ডাকিবে।

গ্রন্থকার ফৈজি বিবিকে ঐতিহাসিক চরিত্র-হইতে কিছু ভিন্ন উপাদানে গড়িয়াছেন। তাঁহার নিপুণ হস্তে ফৈজি-চরিত্র উন্নত, মধুর ও কামিনীসুলভ কমনীয়তায় ভূষিত হইয়াছে। তাহার রমনীয়ত্ব অধিকতর ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেই অলোক-সামান্যা অভাগিনীর প্রতি পাঠকের সহানুভূতি যেন সহজেই উদ্রিক্ত হয়! তাহার সেই শোচনীয় ভীষণ পরিণামে, সেই নিষ্ঠুর বর্ব্বর কঠোর দণ্ডে প্রাণ শিহরিয়া ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠে! গ্রন্থকারকে কিন্তু একটি কথা জিজ্ঞাসার আছে যাহার সমস্ত শরীরের ওজন একুশ সের মাত্র, তাহার অঙ্গ বিশেষের বর্ণনায় "বিপুল" প্রয়োগ চলে কি?

তার পর সেই অনাঘ্রাত পূজার কুসুম, সুরত বিবির কথা! সে চরিত্র বড় পবিত্র বড় মধুর! সুরতের চির দিন কুমারী থাকিবার সাধ কেন হইল, তাহা সুরত বুঝে নাই, গ্রন্থকারও বুঝাইতে চেষ্টা করেন নাই পিয়ার সন্দেহ করিয়াছিল মাত্র, কিন্তু সে সন্দেহ ভঞ্জন হয় নাই, বরং সুরতের কথায় তাহা অমূলকই মনে হইয়াছিল, সে চরিত্র সরল অথচ চিররহস্যময়! কন্যাগতপ্রাণ ঋষিতুল্য পিতা খাঁ সাহেবের স্বর্গারোহণের পর ভবিষ্যতে সুরত বিবির জীবন কি ভাবে কাটিয়াছিল তাহা জানিবার জন্য একটা অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা মনে জাগিয়া থাকে, পুস্তকের অসম্পূর্ণতা দূর করিবার জন্য আশা করি গ্রন্থকার ভবিষ্য-সংস্করণে সে বিষয়ে বিবেচনা করিবেন।

এখন গ্রন্থের নায়ক হেমেন্দ্রলালের কিছু পরিচয় আবশ্যক। হেমেন্দ্র শৈশবে, অতি শৈশবেই, পিতৃ-মাতৃহীন হইয়াছিল! জ্যেষ্ঠতাত ভৈরবচন্দ্র রায় ও জ্যেষ্ঠতাত-পত্নী মহামায়া তাহাকে পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। রায় মহাশয় হেমেন্দ্রের সময়োচিত শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে ক্রটী করেন নাই, হেমেন্দ্র গুরু মহাশয়ের নিকট, বাঙলা লেখা পড়া, কড়াকিয়া গণিত বিদ্যা ও মৌলভি সাহেবের নিকট পারস্ত ও আরবীয় ভাষা শিক্ষা লাভ করে। হেমেন্দ্র মেধাবী, অল্পদিনেই শিক্ষনীয় বিষয় গুলি সম্যক আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিল, গীত বাদ্যেও অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিল, কিন্তু কেবল মানসিক শিক্ষাতেই তাহার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় নাই; দৌড়াইতে, সাঁতার কাটিতে, ঘোড়ায় চড়িতে, নৌকা চালাইতে, হেমেন্দ্র বড় নিপুণ। কুস্তিতে, লাঠি খেলায়, তলবার ও বন্দুক বর্শা চালনায়, হেমেন্দ্রের প্রতিপত্তি যথেষ্ট। হেমেন্দ্র দুর্ব্বলের সহায়, দুষ্টের যম! হেমেন্দ্রের দীর্ঘ গৌরদেহ বলিষ্ঠ, সুগঠিত বক্ষ বিশাল, বাহু পুরুযোচিত দৃঢ় মাংস পেশী সমন্বিত, শৌর্য্যব্যঞ্জক। এইরূপ শিক্ষাসহবৎ ও রূপগুণ লইয়া হেমেন্দ্র গৃহ হইতে অভিমানভরে চলিয়া গিয়া মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল—নবাব সরকারে প্রবেশ করিয়াই কিন্তু হেমেন্দ্রলাল একবার রাজরোষে পড়িয়া প্রাণ হারাইতে বসিয়া ছিল; কিন্তু তাহা তাহার শৌর্য্য বীর্য্যের জন্য বা দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচার দমনের চেষ্টায় নিমিত্ত নহে—সে অন্য কারণে। তার পরেই হেমেন্দ্রের ভাগ্যচক্র ফিরিয়া গেল, ক্রমে হেমেন্দ্র রাজা উপাধি পাইলেন, কিন্তু এই উপাধি লাভ করিতে তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে বা ঋণদায়ে জড়িত হইতে হয় নাই, তাঁহার কৃত কার্য্যে নবাব সরকার খুসী হইয়াই এ উপাধি দিয়াছিলেন কিন্তু কেবল ফাঁকা উপাধি দিয়া হেমেন্দ্রকে বিপদগ্রস্ত করেন নাই, অগ্রে রাজ-সম্মানের উপযোগী বিষয় দান করিয়া তবে এ উপাধি। উপাধি তখন ব্যাধি ছিল না! গ্রন্থকার হেমেন্দ্রের যে প্রকার শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের কথা বলিয়াছেন তখনকার আমলে অধিকাংশ ভদ্র সন্তানেরই সেইরূপ শিক্ষা স্বাস্থ্য ছিল—সাধারণ লোকেরত কথাই নাই, তখন ঘরে ঘরে বলিষ্ঠ তেজস্বী রামমোহন বিরাজ করিত। ভবানী বাবু তাঁহার এই উপন্যাসে কেবল হেমেন্দ্রের নহে, সে কালের অনেক চিত্রই বড় উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন, তিনি মুখে স্পষ্ট কিছু বলেন নাই, কিন্তু তাঁহার লেখায় অনেক স্থলেই কমলাকান্তের সেই মর্ম্মকথা প্রকাশ পাইয়াছে,—

> "তুয়া বঁধু পড়ে মনে
> চাই বৃন্দাবন পানে
> কাবের ছলনা করি কাঁদি"

বিষবৃক্ষের কুন্দনন্দিনী নগেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কি করিলে যেমনটি ছিল আবার তেমনই হয়? এই গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে পাঠকের মনে অনেক বার এইরূপ প্রশ্নের উদয় হইবে—কিন্তু, বুঝি বা—

> এবারের মত বসন্তগত জীবনে,
> হায়, যে রজনী গেছে, ফিরাইব তায় কেমনে?

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

বঙ্গদর্শন।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ইংরাজের দান।

Your (John Grose Esq: Supervisor of Rungpore) *humane intention of distributing a daily charity in grain to the amount of Rs. 5. (Five !) for the relief of the poor* meets with our entire approbation and we desire you will continue it so long as the scarcity may render it necessary to do so.—Provincial Council at Moorshedabad: 4th October, 1770.

সে আজ বহুদিনের বার্দ্ধক্যজীর্ণ অতি পুরাতন কাহিনী; তখন বাদশাহ শাজেহান দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার শাসন সময়ে একবার বালাঘাট এবং দৌলতাবাদে ঘোর অনাবৃষ্টি হইয়াছিল। সেই অনাবৃষ্টির ফলে দাক্ষিণাত্যে এবং গুজরাটে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। বাদশাহ শাজেহান তখন বুরহানপুরে অবস্থান করিতেছিলেন।

সেকালের সেই মন্বন্তরে একটুকরা রুটীর জন্য মানুষ আত্মবিক্রয় করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল; এক খণ্ড পিষ্টকের বিনিময়ে উচ্চ রাজপদ বিক্রীত হইতেছিল। অনেক দিন পর্য্যন্ত কুক্কুরের মাংস মেষমাংস রূপে বাজারে চলিয়াছিল—কেহ অনুসন্ধান করে নাই—সস্তায় যাহা পাইয়াছে তাহাই লইয়াছে। অনশনে মৃত হতভাগ্যদিগের অস্থিচূর্ণ গোধূম চূর্ণের সহিত মিশ্রিত হইয়া আহার্য্যরূপে প্রচলিত হইয়াছিল। শেষে এমন দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছিল যে একজন বুভুক্ষিত আর একজনকে জীবন্ত পোড়াইয়া ছিঁড়িয়া খাইয়াছিল—পিতা পুত্রের মাংস আহার করিতে কুণ্ঠা বোধ করে নাই!

দরিদ্রদিগের সাহায্য কামনায় বাদশাহ তখন আহমদাবাদে, বুরহানপুরে এবং সুরাটে লঙ্গড়্খানা প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন, সে সকল লঙ্গড়খানায় সর্ব্বদা খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত থাকিত। বাদশাহ যতদিন বুরহানপুরে ছিলেন ততদিন প্রতি সোমবারে দরিদ্রদিগের মধ্যে পঞ্চ সহস্র মুদ্রা বিতরিত হইত। বাদশাহ অনেক দিন তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন—বিংশ সোমবারে এক লক্ষ মুদ্রা দানে ব্যয়িত হইয়াছিল; আহম্মদাবাদেও পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা বিতরিত হইয়াছিল। বাদশাহের আদেশে শেষে ৭০ লক্ষ মুদ্রা পরিমাণ রাজকর মাপ দেওয়া হইয়াছিল—কোম্পানীর প্রজার ন্যায় বাদশাহের প্রজাদিগকে সেই রাজকর নববর্ষারম্ভে পরিশোধ করিতে হয় নাই।*

* Badsanama—Vol. I.

বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের কালেও একবার শস্য মহার্ঘ হইয়াছিল—"মন্বন্তর" হয় নাই। দেশে প্রতিষ্ঠিত লঙ্গড়খানা সত্বেও বাদশাহের আদেশে দ্বাবিংশ নূতন লঙ্গড়খানা প্রস্তুত হইয়াছিল—সে সকল স্থানে চাউল এবং অন্ন উভয়ই বিতরিত হইত। দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগকে অর্থদান করিবারও আদেশ ছিল—আমির-ওমরাহগণ তদ্বিষয়ে যত্নবান হইয়াছিলেন। শস্যের উপর যে কর ধার্য্য ছিল বাদশাহ উহা উঠাইয়া দিয়াছিলেন। নানাস্থান হইতে প্রচুর শস্য আসায় দুঃস্থ ব্যক্তিগণ রক্ষা পাইয়াছিল।*

বাংলার মন্বন্তর কয়েকটী গ্রাম বা নগরে নিবদ্ধ ছিল না—উহা সমগ্র বঙ্গভূমি ও বিহারে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল—জননী তাহার মৃত সন্তানকে আহার করিয়া দুই দিন বাঁচিয়াছিল—যখন এক কোটী বঙ্গবাসী অনশনে চির নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিল, যখন সুজলা সুফলা বঙ্গভূমি মহারণ্যে পরিণত হইয়াছিল কোম্পানী বাহাদুর তখন এদেশে বাদশাহের বাদশাহ। তাঁহারা নিজের প্রাপ্য কড়ি ষোলো আনার স্থলে আঠারো আনা বুঝিয়া লইয়াছিলেন বটে কিন্তু বাংলা ও বাঙালীর জন্য কি কিছুই করে নাই?

ইংরাজ তত্বাবধারকগণ (Supervisors) তখন বাংলার রক্ষণাবেক্ষণে অথবা 'নানাবিধ প্রবন্ধ-সঙ্কলনে (!) নিযুক্ত থাকিয়া তাৎকালীন সাহিত্য জগতে যশস্বী হইতেছিলেন।† তাঁহারা যদিও কলিকাতা এবং মুর্শিদাবাদ কৌন্সীলের হস্তে ক্রীড়নক স্বরূপ বিরাজ করিতেছিলেন, কিন্তু সকলেই হৃদয়হীন বা নির্ব্বোধ ছিলেন না। তাই দুর্ভিক্ষ দেখিয়াই তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে যে সকল স্থানে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে, সেই সকল স্থান হইতে কোম্পানীর পল্টন সরাইয়া লওয়াই কর্ত্তব্য। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে তাহা হইলে দরিদ্র প্রজাবৃন্দ দুই দিন খাইয়া বাঁচিবে নতুবা তাহাদিগের মুখের গ্রাস সিপাহীরাই কাড়িয়া খাইবে। কিন্তু কৌন্সীল এ প্রস্তাব গ্রাহ্য করেন নাই। কেন করিলেন না?

ইতিহাস তাহাও বলিয়া দিতেছে। কৌন্সীলের পত্রে প্রকাশ যে সে বিষয়ে বিলাতের কোন আদেশ ছিলনা। কোম্পানী বাহাদুর যদি শক্তিশালী হইতেন, যদি 'প্রজার হিত সাধনে তাঁহাদিগের ইচ্ছা থাকিত, তাহা হইলে ভেরেলেষ্ট সাহেবের মত দুর্ভিক্ষের সংবাদ গোপন না রাখিয়া তাঁহারা পূর্ব্বেই বিলাতের আদেশ আনাইতে পারিতেন, অথবা দেশের অবস্থা বিবেচনা করিয়া পল্টনকে সরাইয়াও পরে আদেশ সংগ্রহ করিতে পারিতেন। ডিরেক্টর সভার আদেশ ভিন্ন কোম্পানী বাহাদুর যে কখনই কোন কার্য্য করেন নাই এমন কথা কি ইতিহাস বলিতে পারে?

শুধু আদেশের অভাবেই যে সৈন্যসঞ্চালন করা ঘটিয়া উঠে নাই তাহা

---

* Muntakhabu—L—Lubab.

† Proceedings of the President and Select Committee: Dated 16th August, 1769 as quoted in Kaye's Administration of the E. I Company. এই বিষয়ের বিশেষ বিবরণ "ভারতী" পত্রিকার "বাঙ্গালার মন্বন্তর" ইতি শীর্ষক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

নহে। কোম্পানী বাহাদুর বলিয়াছিলেন যে বাঙলার বায়ু তখন অত্যন্ত উষ্ণ ছিল—উষ্ণ দেশে উষ্ণ বাতাসে গমনাগমন করিলে সৈন্যদিগের অসুস্থ (!) হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা ছিল! রাজনৈতিক কারণেও তখন সৈন্য সামন্ত নিকটে রাখা প্রয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু ইতিহাস বলিয়া দিতেছে যে বাঙলায় বা বাঙলা সীমান্তে তখন যুদ্ধ বিগ্রহের আদৌ কোন সম্ভাবনাই ছিল না! কোম্পানী বাহাদুর তাঁহাদিগের ননীর পুত্তলি পল্টনকুলকে একস্থানে বসাইয়া রাখেন নাই বটে, কিন্তু তাহাদিগকে এক দুর্ভিক্ষ পীড়িত স্থান হইতে অন্য দুর্ভিক্ষ পীড়িত স্থানে লইয়া যাইতে লাগিলেন—অথচ বিলাতে প্রচার করিয়া দিলেন যে ইংলণ্ডেশ্বরের মঙ্গল কামনাতেই তাঁহারা এইরূপ করিতেছেন!* হতভাগ্য রামধন ও মবারক পথে পথে কাঁদিয়া ফিরিতে লাগিল—কোম্পানী বাহাদুরের লাল পল্টন তাহাদিগের অন্নমুষ্টি কাড়িয়া লইয়া উদর পূরণ করিতে আরম্ভ করিল।†

আমরা ইতি পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে কোম্পানী বাহাদুর রাজস্ব মাপ দিবার একটা ভাণ করিয়াছিলেন। বৰ্দ্ধমানের উপর তাঁহাদিগের কিছু অধিক দয়া হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। তাই তথায় একলক্ষ মুদ্রা রাজস্ব মাপ দিয়াও ‡ তাঁহারা ক্ষান্ত হন নাই। বিলাতে লিখিয়াছিলেন—বর্দ্ধমানে 'নাধায়ের' ঘরে ৮২,১৮০ টাকা পড়িয়াছে; দেশের অবস্থা বিবেচনায় (!) বিশেষ পরীক্ষা করিয়া যদি দেখা যায় যে প্রজাগণ উহা পরিশোধ করিতে পারিবে না, তবে আমরা উহাও মাপ দিব।' কোম্পানী-বাহাদুরের দুর্ভাগ্য যে সরকারী পত্র এতকাল পর প্রকাশ করিতেছে যে "the revenue have been collected without balance"—রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় আদায় হইয়াছে, কিছুই বাকি নাই! (§) যাহা হউক, মোটের উপর হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে যখন বাঙলার শতকরা ৩৫ জন, এবং কৃষিজীবি দিগের মধ্যে শতকরা ৫০ জন মরিয়া গিয়াছিল, কোম্পানী বাহাদুর তখন দয়া-পরবশ হইয়া শতকরা পাঁচ টাকা করিয়াও রাজস্ব মাপ দিতে পারেন নাই, বরং শতকরা দশটাকা করিয়া বৃদ্ধিই করিয়াছিলেন! ¶

দুর্ভিক্ষের সূচনাতেই কোম্পানী বাহাদুর পরোয়ানা জাহির করিয়াছিলেন যে কেহ যেন ধান্য বা চাউল ক্রয় করিয়া মজুদ না করে—কেহ যেন শস্যাদির ব্যবসায় এক-

* Bengal General Letter (public) 9th May, 1770.

† Correspondences of Mr. Alexander, supervisor of Patna, General Sir Robert Banker, Colonel Galliez, Captain Harper and consultations; May and June 1770

‡ অর্থাৎ মাপ দিবার প্রস্তাব করিয়াও (!!)

Bengal General Letter; 25th January, 1770 "In reality less than a single case.... ......was remitted.........W.W. Hunter.

§ Letter of Raja Tejchand of Burdwan 14 May, 1771.

¶ Sir W. W. Hunter.

চেটিয়া করিয়া না লয়। এই পরোয়ানার ফলে কি ঘটিয়াছিল? ডিরেকটর সভার শাসন-বাক্যে সে কাহিনী জীবিত রহিয়াছে। ডিরেকটর সভা নিতান্ত ঘৃণাভরে কোম্পানী বাহাদুরকে লিখিয়াছিলেন—

'বেকার সাহেব এবং মহম্মদ রেজা খাঁর পত্রে জানা গেল যে কোম্পানীর ইংরাজ গোমস্তাগণ যে কেবল শস্যের ব্যবসায় একচেটিয়া করিয়া লইয়াছেন তাহা নহে, দরিদ্র উপায়হীন প্রজাদিগের নিকট হইতে তাঁহারা বলপূর্ব্বক বপন করিবার বীজ গুলি পর্য্যন্ত ক্রয় করিয়াছেন! এই সংবাদ পাঠে আমরা স্বতঃই মনে করিয়াছিলাম যে এই সকল দুষ্কৃতকারীদিগের নাম ধাম, রাজপদ প্রভৃতি সম্বন্ধে আপনারা নিশ্চয়ই সবিশেষ অনুসন্ধান করিবেন; যে সকল হতভাগ্য বঙ্গবাসীদিগের মৃত্যুশয্যার বেদনা বর্ণনা করাও অসম্ভব, তাহাদিগের দুর্দ্দিনের সুযোগে নিজেরা লাভবান হইবার আশা কোম্পানীর যে সকল কর্ম্মচারীগণ কল্পনাতেও করিয়াছে এবং এইরূপে কোম্পানীর সুনাম কলঙ্কমলিন করিয়া তুলিয়াছে—আমরা মনে করিয়াছিলাম যে আপনারা তাহাদিগকে আদর্শ দণ্ড প্রদান করিবেন।* বিলাতের পত্র হইতে জানা যায় যে তাঁহারা এরূপ প্রমাণও পাইয়াছিলেন যে নিঃসঙ্কোচে বলিয়াছিলেন—কোম্পানীর কৌন্সীলের সভ্যগণ এবং প্রাদেশিক সুপারভাইজরগণ তখন তামাক, গুপারি ও লবণ একচেটিয়া করিয়া লইয়াছিলেন এবং দয়া ধর্ম্ম সমস্তই বিসর্জ্জন দিয়া, সেই একচেটিয়া বাণিজ্যের মধ্যে চাউল ও অন্যান্য শস্যাদি পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়াছিলেন!†

কোম্পানী বাহাদুর ডিরেক্টর সকলের রক্তচক্ষু দর্শনে বিচলিত হইয়া বাংলায় একটা অনুসন্ধানের ভাণ করিয়াছিলেন। অনুসন্ধান সমাপ্ত হইলে পর বিলাতে লিখিয়াছিলেন—রাম! এমন কি কখনো হয়? ইংরাজে—বিশেষতঃ কোম্পানীর ইংরাজকর্ম্মচারীগণ কি এমন কার্য্য কখনো করিতে পারে। এ সমস্তই "কালা আদমী" দিগের কাজ—তাহারাই কেবল লাভের চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়ায়—দয়া ধর্ম্ম কিছুই মানে না!‡

ইতিহাস নিতান্ত নিষ্ঠুর—অপ্রিয় সত্য পর্য্যন্ত অনায়াসে প্রকাশ করিয়া দেয়। সেই নিষ্ঠুর ইতিহাস আমাদিগের হস্তে একখানি পত্র দিয়াছে। পত্রখানি ঢাকার সুপারভাইজর কেল্‌থাসেল্ সাহেবের। সেই পত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে নায়েব-ফৌজদার তাঁহাকে বারংবার বিশেষ অনুরোধ করিয়া লিখিয়াছেন—ইংরাজের এদেশীয় গোমস্তাগণ এই মন্বন্তরের সময় ইংরাজদিগের জন্য অত্যন্ত অধিক পরিমাণে চাউল ক্রয় করিয়া লইতেছে—এ প্রথা রহিত করা একান্ত কর্ত্তব্য। এই অভিযোগ শুনিয়া কোম্পানী বাহাদুর অম্লান বদনে বলিয়াছিলেন—শ্রীহট্টে যদি চাউলের অবাধ-বাণিজ্য চলে তাহাতে

* London despatch, 28th August, 1771. *Cf.* also postcript to London despatch 18th December, 1771.

† London Despatch, 18 December, 1771. Para 2.

‡ Bengal General Letter (public) 9th March, 1772.

ক্ষতি কি। উহা বন্ধ করিবার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না! (*)

বাংলার দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগের সাহায্যার্থ কোম্পানী বাহাদুর, যে দান করেন নাই তাহা নহে। সে কাহিনীও ইতিহাস লিখিয়া রাখিয়াছে। রঙ্গপুরের সুপারভাইজর সাহেবের বিশেষ অনুরোধে তাঁহারা তথায় প্রতিদিন পাঁচ টাকার (!) চাউল বিতরণের আদেশ দিয়াছিলেন! পূর্ব্বে প্রতিদিন দশ টাকার চাউল বিতরিত হইত কিন্তু ব্যয় বাহুল্য ভয়ে সরকার বাহাদুর দশ টাকার স্থলে পাঁচ টাকা করিয়াছিলেন! যে নগরে প্রতিদিন চল্লিশ সহস্র ব্যক্তি অনশনে মৃতকল্প হইতেছিল তথায় প্রতিদিন নগদ পঞ্চ মুদ্রার চাউল বিতরণ—ইহার তুলনা কি পৃথিবীর ইতিহাসে মিলিবে?

ইতিহাস এই স্থানেই নীরব হয় নাই—কোম্পানীর দানশীলতার কথা আরো কহিয়াছে। কোম্পানী বাহাদুর বাখরগঞ্জ হইতে ৫৫৪৪৯ মন চাউল ক্রয় করিয়া মুঙ্গের বহরমপুর, কাশীমবাজার, মুরাদাবাগ্ এবং মুর্শিদাবাদে বিক্রয় করিয়াছিলেন। বিতরণ নহে—বিক্রয়! কোম্পানীর নিজ হিসাব হইতে দেখা যায় যে তাঁহাদের মোট ৮৪৬৮৭ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল কিন্তু চাউল বিক্রয় করিয়া ১৫২২৮২ মুদ্রা ঘরে আসিয়াছিল। সুতরাং সেই দারুণ দুর্ভিক্ষের সময় বাংলার কর্ত্তা—বাংলার রাজা বাংলার চাউল সংগ্রহ করিয়া প্রজার নিকট বিক্রয় করিয়াছিলেন এবং ৬৭৫৯৫ মুদ্রা লাভ করিয়া বণিকজাতির রাজত্বের পরিচয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এরূপ দৃষ্টান্তও পৃথিবীর ইতিহাসে আর পাওয়া যাইবে কি না জানি না; ঐতিহাসিক মেকলে এবং মিল্ বোধহয় এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিতেন। কোম্পানীর চাউল বিক্রয়ের হিসাব দেখিবার জন্য পাঠকের কৌতূহল হইতে পারে বলিয়া উহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

Account current of the Rice from Backergunj.†

Dr.		*Cr.*	
To amount of invoices transmitted by the chief and Council of Dacca	58,813	By account: Sales of rice sold at the following places:—	
Sundry charges thereon ...	22,214	Monghyr, Berhampur, Cossimbazar Moradabag Moorshedabad*	1,52,282
Further charges in trasmitting the same	3,660		
	84,687	Sicca	1,52,282
To balance gaimed by this account	67,593		
Sicca	1,52,282		

* Proceedings of the Provincial Council at Moorshedabad. 4th February, 1771.
† Secret consultation: 1st February, 1771.

কোম্পানী বাহাদুরের দানশীলতার পরিচয় স্বজাতির মুখে ভাল শুনাইবে বলিয়া ঐতিহাসিক হণ্টার সাহেবের হিসাব দিয়ে প্রদত্ত হইল। তিনি লিখিয়াছেন—তিন কোটী অনশন ক্লিষ্ট বঙ্গবাসীর ছয় মাসের সাহায্যকল্পে কোম্পানী বাহাদুর প্রথমে ৪০ সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিতে চাহিয়াছিলেন। দেশীয় জমীদারগণ সেই সময়, ৪৭০০০ মুদ্রা দান করিয়াছিলেন এবং অতিরিক্ত ব্যয়-ভারও বহন করিতে চাহিয়াছিলেন।

মোট ৮৭০০০ মুদ্রাতে কিছুই হয় নাই। বীরভূমির প্রভৃতির সাহায্য ধরিয়া যখন ১৮১০০০ মুদ্রা ব্যয় হইয়া গেল তখন কোম্পানী বাহাদুর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া ছিলেন। যদিও দেশীয় জমীদারগণ সমুদয় উদ্বৃত্ত ব্যয়ভার বহন করিতে সম্মত হইয়া-ছিলেন, কিন্তু সিলেক্ট কমিটি তাহাতে আপত্তি করিয়াছিলেন। ১৭৭১ খৃঃ অব্দের ১লা ফেব্রুয়ারি তারিখের সিলেক্ট কমিটির মন্তব্য হইতে জানা যায় যে কোম্পানী বাহাদুর অবশেষে ৬০০০০ সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন। যদি পশ্চিম সীমান্তের জন্য সাহায্যের ব্যয় ৩০০০০ মুদ্রা হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যায়, তাহা হইলে দানের জন্য কোম্পানী বাহাদুরের মোট ৯০০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। এই সঙ্গে জমীদারদিগের অর্থ সাহায্য ধরিলে মোট ১৩৭০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ইহার ভিতর হইতে চাউল বিক্রয়ের লাভ বাদ দেওয়া আবশ্যক। তাহা হইলেই থাকে ৬৯৪১০ টাকা! এই টাকার মধ্যে জমীদারগণ ৪৭০০০ দিয়া-ছিলেন। সুতরাং কোম্পানী বাহাদুর ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে মোট ২২৪১০ টাকা দান করিয়াছিলেন!* অথচ ১৭৭১ খৃঃ অব্দে কোম্পানী বাহাদুর ১৫৩৩৩৬৬০ মুদ্রা রাজস্ব আদায় করিয়া লইয়াছিলেন!†

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সুজলাং সুফলাং মাতরং।

We are much concerned to acquaint you that we are under some apprehensions, *lest the revenue may suffer in* different parts of the provinces, *from the remarkable plenty and cheapness of all kinds of grain occasioned by an uncommonly favourable season for the harvest.*

Bengal General Letter (Revenue Department)

December 3, 1772.

কাল মন্বন্তর এক বৎসরের জন্য বাংলায় আসিয়াছিল। সেই এক বৎসরেই বাংলার কৃষককুল ধ্বংশ প্রাপ্ত হইল—মালদহের সূচি-শিল্প কর্ম্মনাশার জলে ডুবিয়া গেল—

* Sir W. W. Hunter.

† Bengal General Letter (Revenue Department) 3 Nov. 1772.

কাশীমবাজারের রেশম ভাগীরথীর তরঙ্গে ভাসিয়া গেল—চূণ, লবণ প্রভৃতির ব্যবসায় লুপ্ত হইবার উপক্রম হইল! সেই এক বৎসরেই বর্দ্ধমান, বিষ্ণুপুর, বীরভূমি গেল—নাটোর, দিনাজপুর, পূর্ণিয়া গেল—যশোহর, রাজমহল, পাটনা গেল!

বঙ্গজননী আবার সুজলা-সুফলা হইয়া উঠিলেন—কিন্তু তাঁহার ধানের ক্ষেতের আম্র-বৃক্ষতলে মাঠের রাখাল আর বাঁশের বাঁশীতে মেঠো রাগিনী গাহিল না! ১৭৭০ খৃঃ অব্দের বর্ষার আতপতাপিত বিদগ্ধ ক্ষেত্র সমূহ আবার সরস হইল—মাঠে আবার শস্য ফলিল। কিন্তু বাঙালার জীবনী-শক্তি তখন আর ছিল না। তখনো অনশন ক্লিষ্ট নিরাশ্রয় সহস্র সহস্র বঙ্গবাসী গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে—এক শ্মশান হইতে অন্য শ্মশানে—আহারের জন্য, আশ্রয়ের জন্য, জীবন্মৃতের মত বিচরণ করিতেছিল। তখনো ধান পাকিতে বিলম্ব ছিল।

অগ্রহায়ণ মাসে কোম্পানী বাহাদুর ঘোষণা করিলেন যে দেশে আর দুর্ভিক্ষ নাই। শস্যাদি রপ্তানী করিবার আদেশ দিয়া তখন কোম্পানী বাহাদুর নিশ্চিন্ত হইলেন! * কিন্তু বাংলা তখনো খাইতে পাইতেছিল না। ইতি পূর্ব্বেই কার্ত্তিক মাসে মাদ্রাজ হইতে এক জাহাজ-পূর্ণ চাউল আসিয়াছিল। ফরাসী ত্যুপ্রে মহাশয় বাংলার অন্নকষ্টে ব্যথিত হইয়া কাপ্তান ষ্টেনেথের 'এলিজাবেথ' জাহাজে চাউল পাঠাইয়াছিলেন। ষ্টেনেথ সাহেব নানা দৈব দুর্য্যোগে সময়মত বাংলায় আসিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি যখন আসিয়া পৌছিয়াছিলেন তখনো হয়ত এ দেশের কিছু উপকার করিতে পারিতেন। যে সকল হতভাগ্যগণ তখন বাংলার শ্যাম শস্যক্ষেত্রগুলির দিকে ব্যগ্র-নয়নে চাহিয়া আশায় আশায় কোন রূপে জীবন ধারণ করিতেছিল, ষ্টেনেথ সাহেবের চাউল বাংলার বাজারে নামিতে পারিলে তাহারা হয়ত মরিত না।

তখনো ধান পাকিতে পক্ষাধিক কাল বিলম্ব ছিল; বাংলায় সেই বিস্তীর্ণ শ্যাম-সিন্ধু তখন মৃদু পবন হিল্লোলে দুলিয়া দুলিয়া নাচিতেছিল। কিন্তু সেই পক্ষকাল এক যুগেরও অধিক হইল—দিন আর গেল না! বাংলার অস্নেহ প্রদীপ একদিন অকস্মাৎ নির্ব্বাপিত হইয়া গেল—লক্ষ লক্ষ হতভাগ্য ক্ষুধার্ত্ত বঙ্গবাসী ক্ষেত্রপূর্ণ শস্যের দিকে চাহিয়া চাহিয়া মরিয়া গেল! † সরকার বাহাদুর ষ্টেনেথ সাহেবের চাউল ক্রয় করিয়া লইলেন না কিংবা ষ্টেনেথ সাহেব নিজ দায়িত্বে চাউল বিক্রয় করিলে যদি তাঁহার কোন ক্ষতি হয়, কোম্পানী বাহাদুর নিরন্ন

* The famine having now entirely ceased, and there being not only a great abundance, but also a prospect of a more plentiful harvest—Agreed—That the embargo on rice be taken off, and that a publication be issued to that purpose.

Consultation: 14th Nov. 1770.

† Millions of famished wretches died in the struggle to live through the few intervening weeks that separated them from the harvest.—W. W. Hunter.

প্রজার মুখের দিকে চাহিয়া সে ক্ষতিপূরণেও সম্মত হইলেন না।* মান্দ্রাজের চাউল বাংলার দ্বার দেশ হইতে ফিরিয়া গেল।

মন্বন্তরের পর যে প্রথম ফসল হইয়াছিল তাহার তিন মাস পর বাংলার মাঠ আবার 'সোনার ধানে' ভরিয়া গেল। কোম্পানী বাহাদুর খ্রীষ্টমাসের আনন্দকোলাহল-চঞ্চল-সন্ধ্যায় বিলাতে লিখিলেন—মন্বন্তর আর নাই, মেঘ কাটিয়াছে, বাংলায় এত ধান জন্মিয়াছে যে তাহা বর্ণনীয় নহে।† তখনই স্থির হইয়া গেল এবার খুব সস্তা দরে সিপাহীদিগের অন্ততঃ এক বৎসরের খাদ্য ক্রয় করিয়া রাখিতে হইবে।

শ্মশান বঙ্গভূমি যে পুনরায় সুজলা সুফলা হইয়া উঠিল, সে কাহার জন্য? বাংলার এক-তৃতীয়াংশ অধিবাসী তখন অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিল। ধন-ধান্যহীনা প্রেতভূমি দেখিয়া কোম্পানী বাহাদুর এতদিন রাজস্বের জন্য চিন্তিত হইয়াছিলেন, এখন আবার সেই শ্মশানে সুরভি কুসুম ফুটিয়া উঠিল দেখিয়া, সেই শীর্ণা তরঙ্গিনী সম্পূর্ণশরীরা হইল দেখিয়া—সেই দাবদগ্ধ কুঞ্জবন আবার হাসিয়া উঠিল দেখিয়া, রাজস্বসংগ্রহের জন্য কোম্পানী বাহাদুর পুনরায় ব্যস্ত হইলেন!‡ লোভ এমনিই বটে!

প্রকৃতি রাণী এক বৎসরে (১৭৭০) যাহা দেন নাই, ক্রমাগত তিন বৎসরে (১৭৭১-৭২-৭৩) তাহার অনেক অধিক দান করিলেন!§ কিন্তু বাংলার সে শোভা, বঙ্গবাসীর সে প্রাণ, বাঙালীর সে আনন্দ-কোলাহল, বাংলার সে ধন আর কি শীঘ্র ফিরিয়াছিল? যাহা যায় তাহা আর আসে না, যদি কখনো আসে তবে সে এত বিলম্বে যে আসা না আসা তুল্য হইয়া উঠে। বাংলায় আবার শস্যের প্রাচুর্য্য ঘটিল বটে কিন্তু তাহা দেখিবার এবং উপভোগ করিবার লোক আর কেহ রহিল না!¶ কোম্পানী বাহাদুর কিছু বিলম্বে বুঝিয়াছিলেন যে শ্মশানে শোভা ফুটিয়াছে—নন্দনে নহে!

১৭৭০ খৃঃ অব্দের চৈত্রের শেষভাগে অথবা বৈশাখের প্রারম্ভে কোম্পানী বাহাদুর স্বীকার করিলেন বাংলার এক তৃতীয়াংশ প্রজা মরিয়া গিয়াছে; জ্যৈষ্ঠ মাসে বলিলেন মৃতের সংখ্যা প্রতি ষোল জনে ছয় জন; তখন

* Letter from Captain J. Stenneth to the President and Governor in Council: 16th October, 1770; and Bengal Public consultation: 22nd October 1770.

† Letter from the President, and Council to the Court of Directors: 22 December 1770. Do. 24 December 1770.

‡ Bengal Letter: 3 December, 1772.

§ Letter from President and Council to London

Dated 10th January 1772.

Do. Dated 10th November 1773.

Do. Dated 30th December 1773.

¶ Sir W. W. Hunter.

ইহাও স্থির হইল যে বাংলার কৃষক এবং করদাতৃগণের অর্দ্ধেক ধ্বংশ প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার পর বর্ষাগমে যখন কোম্পানী বাহাদুর দেখিলেন যে ধ্বংশের বিরাম নাই—মৃত্যুর বিরাম নাই, তখন নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া বিলাতে সংবাদ দিলেন যে অগণিত কৃষক এবং শিল্পিকুল মন্বন্তরে মরিয়া গিয়াছে।*

কিছুদিন পর কোম্পানী বাহাদুর যখন বুঝিয়াছিলেন যে বাংলায় তখন যে পরিমাণ কর্ষণযোগ্য ভূমি ছিল, সে পরিমাণ কৃষক আর ছিলনা তখন তাঁহারা বকেয়া রাজস্বের চিন্তায় আকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহারা তখন দিব্যচক্ষে দেখিতে লাগিলেন যে যাহাদের সহিত রাজস্বের বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহারা কিছুতেই বকেয়া পরিশোধ করিতে পারিবে না। বিলাতের কর্ত্তাদেরও তখন মাথা ঘুরিয়া উঠিল। বাংলার রামধন ও জবান্ আকন্দ মরে মরুক্, কিন্তু কোম্পানীর রাজস্ব ত চাই-ই চাই!

যখন দেখা গেল যে বাংলার অনাবাদী ভূখণ্ডের সংখ্যাই অধিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে তখন কোম্পানী বাহাদুর তাহার কারণ নির্দ্দেশের জন্ত কমিশনর নিযুক্ত করিলেন। কমিশনরগণ নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া নিতান্ত ব্যথিত ও শঙ্কিত চিত্তে দেখিতে লাগিলেন বাংলার অতি উৎকৃষ্ট বিভাগ সমূহ ধ্বংশ প্রাপ্ত হইয়াছে—রাজস্ব প্রতিদিন হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে!† বাংলার হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা হেষ্টিংস সাহেব তখন স্বয়ং সফরে বাহির হইয়া স্থির করিলেন যে বাংলার অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশ লোক কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে!‡ ইহার বিংশ বর্ষ পর সরকার বাহাদুর একবার বাংলার জনসংখ্যা নির্দ্ধারণে যত্নবান হইয়া দেখিয়াছিলেন যে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, মাত্র নয় মাসে বাংলার এক কোটী অধিবাসীকে শমন ভবনে প্রেরণ করিয়াছিল!¶ কোন য়ুরোপীয় জাতি এমন দুর্দ্দশার কথা কল্পনাও করিতে পারে না।

যে দেশের কৃষিই প্রধান বৃত্তি—যে দেশের কৃষিই জীবন—কৃষকই যে দেশের শক্তি ও সম্পদ, সে দেশের এক-তৃতীয়াংশ লোক মরিয়া কোত হইয়া গেলে আর কি থাকিল? বাংলায় তাই এক-তৃতীয়াংশ কর্ষণীয় ভূমিও পতিত পড়িয়া রহিল। মন্বন্তরের তিন বৎসর পরও এত অধিক কর্ষণযোগ্য ভূমি বাংলায় পতিত ছিল যে কোম্পানী বাহাদুর স্থির করিয়াছিলেন পার্শ্ববর্ত্তী নৃপতিবৃন্দের রাজ্য হইতে ছলে কৌশলে প্রজা ভুলাইয়া বাংলায় আনিবেন! §

সর্ব্বপ্রথমে বেহারেই এই কার্য্য আরম্ভ

* Consultation of the 9th June, 1770 and Letter of Mr. James Alexander, Supervisor of Behar and of Mr. Ducarel of Purneah, February 16, 1770.

† Letter of the President and Council to the Court of Directors: 5th: September 1772.

‡ Do. 3rd November, 1772.

¶ Sir W. W. Hunter.

§ Letter from President and Council to the Court of Directors: 10th November, 1773.

হইয়াছিল। তখন বিলাতে কোম্পানীবাহাদুরের অনেক অর্থের প্রয়োজন ছিল। বঙ্গভূমি তাই সেই অর্থ যোগাইতে লাগিল। হেষ্টিংস বাহাদুর বাংলার সীমান্ত প্রদেশের কর বৃদ্ধি করিলেন না। তিনি যে প্রজার দুঃখে ব্যথিত হইয়া এরূপ করিয়াছিলেন তাহা নহে—ইংরেজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই ওরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল! তিনি মনে করিয়াছিলেন যে দয়ার একটা আবরণ কিছুদিনের জন্য সম্মুখে রাখিলেই নবাব-উজীরের রাজ্য হইতে প্রজা সংগ্রহ করা সহজসাধ্য হইবে! হেষ্টিংস সাহেব প্রজা ধরিবার এই ফাঁদ পাতিয়াছিলেন! *

মন্বন্তরের পূর্ব্বে বাঙ্গালায় কর্ষণীয় ভূমি যত ছিল তাহার অধিক ছিল কৃষক—কৃষিই ছিল জীবন যাপনের প্রধানতম উপায়। এখনো যেমন, তখনো তেমনি বঙ্গবাসী একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাইয়া বাসা বাঁধিতে ভাল বাসিত না—বাঙালী চিরদিনই স্থিতিশীল,—গতিশীল নহে। কৃষককুল তাই জমীদারদিগের মুষ্টিমধ্যে নিবদ্ধ থাকিত। কিন্তু মন্বন্তরের পর ছয় বৎসরের মধ্যে বাংলার সে ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। তখন কৃষক যত ছিল, ভূমি ছিল তাহার অনেক অধিক—তাই বাংলার রামধন ও মবারকগণ আর রায় জমীদারদিগের করতলগত থাকিল না, বরং রায় জমীদারই তখন নানা উপায়ে তাহাদিগকে নিজের জমীদারীর মধ্যে সংস্থাপিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

বঙ্গের কৃষককুল তখন ধীরে ধীরে দুই দুই ভাগে বিভাগ হইয়া গেল। এক ভাগ পিতৃপিতামহদের 'বসতবাটী' পরিত্যাগ করিল না—আপন গ্রামেই বাস করিয়া 'খুদ্‌কাস্ত' নামে পরিচিত হইয়া পড়িল; আর একদল নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহারা যেখানেই কিছু অধিক লাভের প্রত্যাশা দেখিল, সেইস্থানেই যাইয়া 'চাষ-আবাদ' করিতে লাগিল। তাহারাই ইতিহাস-কথিত 'পাইকস্থ' প্রজা। আপন আপন ভূমি পতিত ফেলিয়া না রাখিয়া জমীদারগণ পাইকস্থ প্রজাদিগকে আহ্বান করিতে লাগিলেন।

সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায় যে, দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে বয়স্কব্যক্তি অপেক্ষা যুবক এবং বালকই অধিক ধ্বংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বাংলাতেও তাহাই ঘটিয়াছিল। মন্বন্তরের করাল গ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়াও বৃদ্ধগণ কালের হস্তে আত্মসমর্পণ করিল। তাহাদিগের মৃত্যুর পর শূন্য স্থান পূর্ণ করিবার উপযুক্ত লোক বাংলায় তখন আর বেশী ছিল না। † তাই মন্বন্তরের পর ১০।১৫ বৎসর ধরিয়া বাংলা ক্রমেই জনশূন্য হইয়া পড়িতেছিল।

---

* While the province in general was rack-rented to supply the pressing necessities of the company in England, Warren Hastings interposed on behalf of the frontier, in order that *there might be such a show of lenity as to procure a supply of inhabitants from the neighbouring districts of the Nabab – Vigier.*—Sir W. W. Hunter.

† Letter from Christopher Keating Esq: Collector to John Shore Esq: President of the Board of Revenue. 3 July, 1789.

বাংলায় যখন এইরূপে লোক ক্ষয় হইতেছিল তখন জমীদারদিগের ভিতর 'প্রজাপত্তন্' করা লইয়া মহা কলহের সৃষ্টি হইয়াছিল। একজন অন্যের পাইকস্থ প্রজাদিগকে লোভ দেখাইয়া নিজের জমীদারী মধ্যে টানিয়া লইতে লাগিলেন—অল্প খাজনা ও কম 'নজর' লইয়া তাহাদিগকে নিজেদের জমীদারী মধ্যে বসাইতে লাগিলেন। সুবিধা বুঝিয়া পাইকস্থ প্রজাগণও দর বাড়াইল। তখন জমীদারে জমীদারে প্রজাসংস্থাপন ব্যাপার লইয়া একটা বিষম প্রতিযোগিতা হইল। * যিনি অল্প দর দিলেন তিনিই পাইকস্থ প্রজা ক্রয় করিলেন। যে জমীর খাজানা ছিল ৩৲ টাকা পাইকস্থগণ তাহা এক টাকায় পাইল। † ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ও কায়স্থ জাতীয় পাইকস্থগণ আরও অল্প নজরে এবং করে জমী পাইতে লাগিল। ‡

খুদকাস্থ প্রজাগণ এতদিন বেশ স্বচ্ছন্দেই ছিল, কিন্তু পাইকস্থদিগের প্রতিযোগিতায় পরাজিত হইয়া গেল। তাহারা মনে করিল যে, যে জমীদারদিগের জন্য তাহারা এত করিয়াছে এখন তাঁহারাই প্রজার লোভে তাহাদিগের অনিষ্ট করিলেন! খুদকাস্থগণ তাই আপন আপন জমীদারদিগকে ত্যাগ করিয়া যেখানে সুবিধা পাইতে লাগিল সেই স্থানে চলিয়া গেল। অনেকে বাংলাই পরিত্যাগ করিল। বঙ্গভূমি প্রতিদিন জনশূন্য হইতে লাগিল; ইংরাজ ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কারণ নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া চিন্তিত হইলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস শেষে তিনবৎসর পর ব্যক্ত করিলেন—কোম্পানী বাহাদুরের এক-তৃতীয়াংশ জমীদারী অরণ্য হইয়া গিয়াছে—সে অরণ্যে কেবল বন্য জন্তু বাস করে। ¶

কিন্তু সেই মহারণ্যে কুসুম ফুটিয়াছিল—সেই মরুভূমে আবার মন্দাকিনী বহিয়াছিল। বাংলা অরণ্য হইয়াছিল বটে, কিন্তু অন্নকষ্ট আর ছিল না। বঙ্গজননী স্নেহ মধুর বাক্যে আবার ডাকিয়াছিলেন—

আয় আয় আয়　　আছ যে যেথায়,
আয় তোরা সবে ছুটিয়া,
ভাণ্ডার-দ্বার খুলেছে জননী
অন্ন যেতেছে লুটিয়া।
ওপার হইতে আয় খেয়া দিয়ে,
ওপাড়া হইতে আয় মায়ে ঝিয়ে,
কে কাঁদে ক্ষুধায়　　জননী সুধায়
আয় তোরা সবে ছুটিয়া!
ভাণ্ডার-দ্বার খুলেছে জননী
অন্ন যেতেছে লুটিয়া! §

(ক্রমশঃ)

---

* Introduction to the Regulations—C. D. Field.

† Strictures and observations on the monitary system of landed property in Bengal by Gonesh Dass with replies.

‡ Introduction to the Regulations—C. D. Field.

¶ Minute of the Governor General 18th September 1789, and his letter the Court of Directors: 2August. 1789

§ শরৎ—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

উমা-পরিণয়।

(কুমার-সম্ভব)

(২৯)

শৈলেশের বিষয় আর আশয় সে যেমন
তাহারি মত করিয়া যত বিবাহ-আয়োজন,—
সুধীর মনে, সুহৃদ্ জনে শোভিত সভামাঝে
রহিলা বসি, যবে না শশি-শেখর আসি' রাজে

(৩০)

এ দিকে তবে 'কুবের'-নগে শিবের পুরোভাগে—
যেমনি শুভ বিবাহে তাঁর হইয়াছিল আগে—
তাহারি মত গহনা কত মাতৃকা-মণ্ডলী
স্তরে স্তরে ন্যস্ত করে পরম কুতূহলী!

(৩১)

মাতৃকাদের সম্মানের তরে সে বিভূষণ
পরম ঈশ করিলা শুধু ঈষৎ পরশন!
সেই যে চিরগৃহীত বেশ হরের তনুগত
তাহাই এবে ধরিল শোভা বরের অনুমত!

(৩২)

ভস্ম সেই হইল শ্বেত চন্দনের তুল,
কপাল-মালা করিল ভালে শিরের ভূষা ভুল!
প্রান্ত ভাগে রক্ত-রাগে হংসপাঁতি-আঁকা'
দুকূল সাজে রাজিল গজ-অজিন লোহ-মাখা!

(৩৩)

শঙ্খ * হতে কিরণ লভি' নয়ন সবি ফোটে!
পিঙ্গ তারা-ভরা' যে আঁখি জ্বলিছে ভাল-পটে—
তাহাই মানি, ললাট খানি হরিতালাঙ্কিত
তিলক-হেন তুলিল যেন করি' অলঙ্কৃত!

(৩৪)

ও কলেবরে ভুজগবর আছিল যতটাই
সকলি আজ ভূষার কাজ করিল যথা-ঠাঁই!
কেবল সারা দেহেই শুধু রূপান্তর ঘটে—
ফণীর শিরে মণির শোভা তেমনি তর' ফোটে।

(৩৫)

শিখরে শশী ঠিকরে কর দিবস' নাহি মানি'!
মুদিত মলা, যে-হেতু কলা উদিত এক খানি!
—এ হেন সিত-কিরণ নিত' ভূষণ যাঁর শিরে,
মুকুট-মণি রচিতে তাঁর লাগিবে আর কি রে?

(৩৬)

জগতে যত মধুর ছবি একা যে সবি সৃজে—
এরূপে চারু বরের বেশ সাধিলা তিনি নিজে!
নিকটগত প্রমথ পরে আনিল তরবারি,
তাহারি মাঝে নেহারে প্রভু প্রতিমা আপনারি।

(৩৭)

ব্যাঘ্রাজিনে আবৃত মহাপৃষ্ঠ বৃষবর
ভক্তি-ভরে হ্রস্ব করে বিশাল কলেবর;
ভৃত্য-ভুজে করিয়া ভর চড়িয়া পিঠে তারি—
কৈলাসেই উঠিয়া যেন—চলিলা ত্রিপুরারি!

(৩৮)

পিনাকি-পিছে সপ্ত-মাতা আপনমত যানে
যেতেছে চলি'—বাহন টলি' দুলায় দুল কানে!
কমল-মুখে পরাগ-প্রায় স্ফুরিয়া প্রভা-রাশ
পদ্ম-ফুলে সরসী-সম শোভিল নীলাকাশ!

---

* কপালাস্থি-মালা।

(৩৯)

মাতৃকা-সভা কনক-প্রভা বিথারি' চলিয়াছে ;
কপালমালা-ভূষিতা কালী চলিছে পাছে পাছে !
সুনীল মেঘে বলাকা লেগে' অমনি যায় উড়ে,—
বিজলী বালা চমকি' যার সমুখে ভায় দূরে !

(৪০)

প্রভুর আগে প্রমথ জাগে যতেক—সবে মিলে'
বিবাহে-শুভ বিবিধরূপ বাদ্য বাজাইলে,
ত্রিদিব জুড়ে' বিমান-চূড়ে পরশি' সেই স্বর
জানায় দেবে—শিবের এবে সেবার অবসর।

(৪১)

মরীচিমালী ধরিলা শিরে ভকতিভরে আনি'
অমর-কারু-রচিত চারু ছত্র এক খানি !
ঝালর নব দুকূল-ধব শোভিল অবিদূরে—
যেমনধারা গাঙ্গ-ধারা গঙ্গাধর-চূড়ে !

(৪২)

মূর্ত্তিমতী গঙ্গা আর যমুনা সেই ক্ষণ
চামর-হাতে প্রমথনাথে করিতে সুবীজন
লাগিলা যদি উভয়ে, নদী-মূরতি পরিহরি',
তবুও মানি—হংস আসি' বসিছে দেহ 'পরি ;

(৪৩)

প্রথম বেধা সরোজী সেথা করিল আগমন,
আসিলা হরি পুরুষবর শ্রীবৎস-শোভন—
বিজয় বাণী ভাষিলা, তাঁরি মহিমা সুমহৎ
বাড়ায়ে' দিতে আরো সে,—ঘৃতে বহ্নিরাশিবৎ !

(৪৪)

মূরতি এক, উপাধি-ভেদে শুধু যে ত্রিধা হন ;
প্রবর কিবা অবর ভাব সবারি সাধারণ !
হরির বড় কখনো হর, হরের বড় হরি,
দোঁহার বড় বিধাতা, কভু দু'হুই বেধা' পরি !

(৪৫)

ইন্দ্র-আদি দিগধিপতি পঁহুছে তথি এসে'—
ছাড়িয়া রাজ-চিহ্ন যত বিনীতমত বেশে !
"কোথায় প্রভু ?"—ঠারিয়া পুছে, নন্দী বুঝে' উঠে'
দেখায় ভবে,—প্রণমে সবে কৃতাঞ্জলিপুটে।

(৪৬)

কমলাসনে কাঁপায়ে' শির আপ্যায়িলা হর,
হরিরে ভাষি,' সুরেশে হাসি' করিলা সমাদর।
দেবতা বাকি সবারে আঁখি চাহিয়া শুধু সেবা
করিলা প্রভু ক্রমান্বয়ে প্রধান যাঁর যে বা।

(৪৭)

সপ্ত-ঋষি সমুখে আসি' আশিসি' ভাষে জয় !
হাসিয়া তবে ঈষৎ হাসি সবারে শিব কয়—
এই যে বিবা'-সমিতি কিবা বিতত চারিভিত,
আপনাদেরে আগেই এতে বরেছি পুরোহিত !"

(৪৮)

বিশ্বাবসু-প্রমুখ মুনি-গায়ক সুনিপুণ
মধুর স্বরে গাহিছে তাঁর ত্রিপুর-জয় গুণ !
সে গান শুনি' সারাটি পথ উতরে অবহেলে—
প্রভুর শিরে আঁধার নাশি' চাঁদের হাসি খেলে।

(৪৯)

আকাশে বৃষ মহেশে বহি' চলিলা লীলা-মদে,
কনকময় ঘুমুর ঝুমু ঝুমুর ঝুঁ শবদে !
তটাভিঘাত করিয়া জাঁকে যেন রে পাঁকে লুটি'
বিষাণ-দু'হু যেতেছে মুহু সঘন মেঘ টুটি !

(৫০)

অচলপতি-পালিত, অতি অজেয়, বহুশিলা—
মুহূর্ত্তে সে পুরীতে এসে' বৃষভ পঁহুছিলা।
সমুখভাগে পিনাকী আগে করে যে আঁখিপাত—
সে যেন ষাঁড়ে সোনার তারে টানিল অচিরাৎ !

(৫১)

নীরদনীলকণ্ঠ উপকণ্ঠে অবতরে—
নিরখি' নিল পৌরজন কৌতূহল ভরে!
ত্রিপুর-জয়ে যে পথপানে সায়ক হানে আগে
তা'হ'তে নামি আসিলা স্বামী আসন্ন ভূভাগে;

(৫২)

অমনি নগ অগ্রসরে লইতে হরে গ্রহি'।
ধনীর সেরা বান্ধবেরা মাতঙ্গে আরোহি'
চলিছে সাথে;—যেন রে মাথে বিকচতরুতান
আজিকে তাঁরি সানুর সারি হতেছে আগুয়ান!

(৫৩)

অমর বরযাত্রী আর ধরণীধর-দলে,
নগর-দ্বার হইলে খোলা, তুমুল কোলাহলে—
সুবহুদূরে অমনি উড়ে, ছুটিল কলনাদ—
যেন রে স্রোতে দু'ধার হতে টুটিল জল-বাঁধ!

(৫৪)

প্রণমে হর;—অবনীধর সরম মনে পায়,
উনি যে বিভু, পূজিছে ত্রিভুবনের জনে যাঁয়!
জানে না শিব-মহিমা-বশে আগেই ত সে নিজে
আনত চূড়ে অনেক দূরে লুটিছে ধরণী যে!

(৫৫)

বিকশি' উঠে শিখরি-মুখ, পরম সুখী হিয়া—
ফিরিছে ঘরে জামাতা হরে সরণি দেখাইয়া!
ডাহিনে বামে রতন-বেণী আপণ-শ্রেণী শোভে,
কুসুম-রাশি-নিচিত পথে নিহিত পদ ডোবে!

(৫৬)

নগরে তবে রমণী সবে অমনি সেই ক্ষণে
হইল অতি লালসাবতী বরের দরশনে,—
ফেলিয়া রাখি হাতের বাকি অপর কাজ শত
করেছে সারা হর্ম্ম্যে তারা কর্ম্ম এই মত:—

(৫৭)

কেহ বা ছোটে জানালা-ধারে যা' দিতেছিল আলা;
কুসুমহারে চিকুর-ভার বাঁধিতেছিল বালা,—
হেরিতে বরে আবেগ-ভরে কবরী-কেশপাশ
খসিল তার—তুলিতে আর নহিল অবকাশ!

(৫৮)

দাসীহে-ধরা' আলতাপরা' দক্ষ পদখানি
কেহ বা তার হস্ত হ'তে লইল বলে টানি!
বিলাস-মৃদুমন্দগতি সীমন্তিনী টুটে'
লাক্ষা-রাগে রাঙায়ে পথ জানালাপানে ছুটে!

(৫৯)

কেহ বা সবে কাজলে টানি' দিয়েছে ডানি আঁখি,
বামের চোখে টানিবে পাছে—এখনো আছে বাকি—
সারা না হতে আলোকপথে উতরে ত্বরা করি'
কাজল-টানা তুলিকাখানা কমল-করে ধরি'!

(৬০)

জানালা থাকি' আকুল-আঁখি হানিল কোনো বালা',
রভসে-খোলা' নীবিটি তোলা মানিল মনো-জ্বালা!
কাঁকণ-প্রভা বিকশি' শোভা পশিল নাভি-কূপে—
বসন খানি ধরিয়া করে রহিল কোন রূপে!

(৬১)

আরেক বালা আধেক মালা গেঁথে' যে ত্বরা উঠে,
ফেলিতে পদ—মুকুতা যত যেতেছে ধরা লুটে'!
হায় রে তার চন্দ্রহার—কি দশা ওর আজি—
আঙুল-মূলে পড়িল খুলে' কেবল ডোর গাছি!

(৬২)

সবার মুখে আসব ঢুকে' সুবাস ধীরি বয়,
পুলকে মাখি' চটুল আঁখি নারীরা নিরীখয়,—
চপল-অলি কপোল'-পরি, ছুটায়ে পরিমল,
জানালা মাঝে যেন রে রাজে বিকচ শতদল!

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিহারীলাল গোস্বামী।

নূতন রসায়ন শাস্ত্র।

এমন কোন বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের নাম করিতে পারা যায় না, যাহাকে কেবল একজন বৈজ্ঞানিকই তাঁহার ক্ষুদ্র জীবনের চেষ্টায় ঠিক মত গড়িয়া তুলিয়াছেন। ইহাদের প্রত্যেকেরই ইতিহাসে নানা কালের নানা বৈজ্ঞানিক হস্তচিহ্ন সুস্পষ্ট নজরে পড়ে। আলোকের প্রচলিত সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠায় ইয়ং ও ফ্রেজ্‌নেল্ সাহেবের খুব দাবি আছে সত্য, কিন্তু নিউটন্ ও ডেকার্টেকে ঐ প্রতিষ্ঠাতৃগণের সহিত একাসনে বসাইয়া সম্মান না করিলে, বিচারমূঢ়তা প্রকাশ করা হয়। ইঁহারা আলোক তত্ত্বের যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন, সেগুলিকে হাতের গোড়ায় না পাইলে; আজ ঈথরীয় সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হইত। নব্য রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, ইহাও কোন এক বৈজ্ঞানিকের চেষ্টায় সুসম্পন্ন হয় নাই। তবে একশত বৎসর ধরিয়া নানা পণ্ডিত যে সকল অমূল্য তথ্য সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা লইয়াই নব্য রসায়ন-শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে।

এসিড যুক্ত জলে ব্যাটারির দুই প্রান্তের তার ডুবাইয়া রাখিলে, এক প্রান্ত হইতে হাইড্রোজেন বাষ্প এবং অপর প্রান্ত হইতে অক্সিজেন বাষ্প বাহির হইতে আরম্ভ করে আজকাল এই ব্যাপারটি সাধারণের এত সুপরিচিত যে, ইহার আর ব্যাখ্যানের আবশ্যক হয় না। কিন্তু একশত বৎসর পূর্ব্বে বড় বড় বৈজ্ঞানিকও ইহার কথা জানিতেন না। নিকলসন্ সাহেব সর্ব্বপ্রথমে এই প্রকারে হাইড্রোজেনের উৎপত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং কারণ অনুসন্ধানের জন্য পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ঠিক কথা বলিতে গেলে, আধুনিক রসায়নশাস্ত্রের ভিত্তি নিকলসন্ সাহেব কর্ত্তৃকই ঐ সময়ে প্রোথিত হইয়াছিল, এবং তার পর ডালটন্ ডেভি ও ফারাডে প্রভৃতি মহাপণ্ডিতগণ তাহারি উপরে রসায়ন শাস্ত্রকে দাঁড় করাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রতিমার সৌন্দর্য্য বিধানের গৌরব কুম্ভকার ও চিত্রকরের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতে গেলে; সৌন্দর্য্যের কতটা অঙ্গবিন্যাসে এবং কতটা তুলি চালনায় ফুটিয়াছে হিসাব করা যেমন কঠিন হইয়া দাঁড়ায়, আধুনিক রসায়ন শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠার গৌরব কোন্ বৈজ্ঞানিকের কতটা প্রাপ্য তাহা হিসাব করা সেইপ্রকার দায় হইয়া পড়ে।

নূতন রসায়ন শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতৃগণের কথা উঠিলেই, সর্ব্বপ্রথমে ডাল্‌টন্ সাহেবের নাম আমাদের মনে পড়িয়া যায়। এই মহাত্মাই আণবিক সিদ্ধান্তের (Molecular atomic hypothesis) প্রতিষ্ঠাতা। ইনিই সর্ব্বপ্রথমে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, আমরা বালি চূণ পাথর প্রভৃতি যে সকল বিচিত্র পদার্থ দেখি, তাহাদের প্রত্যেকটিই

এক এক বিশেষ জাতীয় ক্ষুদ্র কণা বা অণু (molecules) দ্বারা গঠিত। অর্থাৎ বস্তুর একমাত্র গঠন-সামগ্রী তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ বা অণু। পাথরের কতকগুলি অণু একত্রিত হইলে পাথর হয়, এবং জলের অণু জোট্ বাঁধিলে জল হয়। তিনি আরো বলিয়াছিলেন, আমরা যেগুলিকে অণু বলিতেছি, তাহারা এক একটা অখণ্ড জিনিস নয়। দুই বা ততোধিক অংশে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণা দ্বারা তাহাদের প্রত্যেকটিই প্রস্তুত হইয়াছে। এই অতি সূক্ষ্ম জড় কণাগুলিকে ডালটন্ সাহেব পরমাণু (Atoms) নামে অভিহিত করিয়াছিলেন।

পরমাণু অবিনাশী এবং সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড খুঁজিয়া কেবল আশী প্রকারের ভিন্ন জাতীয় পরমাণুর সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু অণুর জাতি সংখ্যায় এত অধিক যে, তাহার গণনা চলে না। ব্রহ্মাণ্ডে যতগুলি বিভিন্ন পদার্থ আছে, বিভিন্ন জাতীয় অণুও ঠিক তত গুলিই আছে।

কাজেই দেখা যাইতেছে, ডালটনের কথা সত্য হইলে, এবং আমাদের সূক্ষ্ম দিব্য দৃষ্টি থাকিলে পদার্থকে আমরা সাধারণতঃ যেমন সমঘন দেখি, কখনই সেপ্রকার দেখিতাম না। অত্যন্ত ঘন ও কঠিন পদার্থও অণুময় হইয়া আমাদের দিব্য দৃষ্টির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইত, এবং এই সকল অণুর প্রত্যেকটিরই গর্ভে দুই বা ততোধিক ক্ষুদ্র পরমাণু দেখা যাইত। তা' ছাড়া আমরা কোন অণুকে স্থির দেখিতাম না। তাহাদের প্রত্যেকটিই অতি দ্রুত গতিতে আমাদের চক্ষুর সম্মুখে কম্পিত হইতে থাকিত। মানুষ আজও এইপ্রকার দিব্যদৃষ্টি পায় নাই। অতি উৎকৃষ্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা দ্বারা অণুবীক্ষণ ছাড়া আর সকল কাজই চলে। সুতরাং, আমরা যে শীঘ্র অণু পরমাণুর সহিত চাক্ষুষ পরিচয় লাভ করিব তাহার আশা নাই। কিন্তু চাক্ষুষ পরিচয় ব্যতীত ইহাদের অস্তিত্বের এত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে এখন আর তাহার বিরুদ্ধে কোন কথাই বলা চলে না। অণু জিনিসটা এতই ক্ষুদ্র যে, একখানি ডাক-টিকিট যে ক্ষুদ্র স্থান অধিকার করিয়া থাকে, তাহাতে ইহাদের প্রায় পাঁচলক্ষটিকে একস্তরে সাজানো যাইতে পারে। এক একটি অণু আবার দুই বা ততোধিক পরমাণু দ্বারা গঠিত। সুতরাং এ প্রকার অতিক্ষুদ্র পদার্থকে যদি চক্ষু বা যন্ত্র দ্বারা দেখিতে না পাওয়া যায়, তজ্জন্য চক্ষু বা যন্ত্রকে দোষ দেওয়া যায় না।

ডালটন সাহেব ও তাঁহার পরবর্ত্তী পণ্ডিতগণ অণু পরমাণুর আয়তনের কথা প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, ইহাদের গুরুত্বও স্থির করিয়াছিলেন। কতগুলি হাইড্রোজেনের অণু সমবেত হইলে, রতি-প্রমাণ ভারি হইবে, হিসাবে তাহা জানা যায় নাই বটে, কিন্তু হাইড্রোজেনর পরমাণু অপেক্ষা অপর পদার্থের পরমাণুগুলি কতগুণ ভারি তাহা নিশ্চয়রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া গেছে। এই হিসাবে হাইড্রোজেনের পরমাণু অপেক্ষা গন্ধকের পরমাণুকে বত্রিশগুণ ভারি এবং পারদের পরমাণুকে দুইশতগুণ ভারি দেখা গিয়াছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি অসংখ্য পৃষ্ঠ

বস্তুর প্রত্যেকটিই এক এক পৃথক জাতীয় অণুদ্বারা গঠিত, কিন্তু এই অণুগুলিকে বিশ্লেষ করিলে যে পরমাণু পাওয়া যায় তাহার সংখ্যা কেবল আশীটি মাত্র। অর্থাৎ এই আশী জাতীয় পরমাণু নানাপ্রকারে পরস্পরের সহিত মিলিয়া এই ব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টির বৈচিত্র্য বিধান করিয়াছে। অণু পরমাণুর এই সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া পরমাণু সকল কি প্রকারে পরস্পরের সহিত মিলিত হয়, এবং রাসায়নিক কার্য্যে তাহারা কি প্রকারে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, ডালটন্ সাহেব তাহার অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহাতে জানা গিয়াছিল, কোন পরমাণুই কখনো একক ও মুক্তাবস্থায় থাকে না। ইহারা নিকটে কোনও বিজাতীয় পরমাণু পাইলেই তাহাদের সহিত মিশিয়া এক একটা অণুর সৃষ্টি করে এবং বিজাতীয় পরমাণুর অভাব হইলে স্বজাতীয় পরমাণুই জোট বাঁধিয়া অণুর রচনা করিতে থাকে। মৌলিক পদার্থকে বিশ্লেষ করিলে যে সকল অণু পাওয়া যায় তাহা ঐ প্রকারে স্বজাতীয় পরমাণুর সমষ্টি, এবং যৌগিক পদার্থের অণু বিজাতীয় পরমাণুর সমষ্টি।

ডালটন্ সাহেব তাঁহার আবিষ্কার-বিবরণী প্রচার করিতে আরম্ভ করিলে, অপর পণ্ডিতগণ নানাপ্রকারে প্রতিবাদ করিয়া কথাগুলাকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু শেষে ডালটনের নিকট সকলকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল। অণু পরমাণুর সংযোগ বিয়োগ প্রভৃতি বিষয় বুঝাইবার সময় ডালটন্ সাহেব তাহাদের চিত্র আঁকিয়া বুঝাইতেন। ব্যাপারটি তাৎকালিক পণ্ডিতগণের ভাল লাগে নাই। ডালটনের শিষ্যগণ বীজগণিতের সূত্র অনুসারে রাসায়নিক পরিবর্ত্তনের প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়া, গুরুর বক্তব্য বিষয়টাকে সহজ-বোধ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন। আজও সেই বীজগণিতিক প্রথায় রাসায়নিক পরিবর্ত্তন সকল প্রকাশ করা হইয়া থাকে।

ডালটন্ যখন তাঁহার আণবিক সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়া জগতকে চমকিত করিতেছিলেন, ইংলণ্ডের আর এক দিক হইতে হামফ্রে ডেভি নামক তাহার একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী বৈজ্ঞানিকের আবির্ভাব হইয়াছিল। রাসায়নিক বিশ্লেষণ-লব্ধ অণু পরমাণুর সহিত ধনাত্মক (Positive) এবং ঋণাত্মক (Negative) বিদ্যুতের নিগূঢ় সম্বন্ধের কথা ইঁহারি মনে সর্ব্বপ্রথমে উদিত হইয়াছিল। আণবিক সিদ্ধান্তের আলোচনাকালীন আমরা দেখিয়াছি, পরমাণু সকল বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলে তাহারা কোন ক্রমে একক থাকিতে চায় না; স্বজাতীয় বিজাতীয় যে কোন পরমাণুকে নিকটে পাইলে তাহাদের সহিত মিলিয়া ইহারা একএকটি অণুর রচনা করে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে একই জাতীয় পরমাণুর সম্মিলনে যে সকল অণুর উৎপত্তি হয়, তাহাদের ভিতরকার বাঁধন তত দৃঢ় হয় না—কিন্তু বিজাতীয় পরমাণুর সম্মিলনজাত অণুর পরমাণুগুলি খুব দৃঢ়ভাবে সম্বদ্ধ থাকে। ইহাদিগকে কোনমতেই সহজে বিশ্লেষণ করা যায় না। ডালটন্ ও তাঁহার শিষ্যগণ এই পরমাণুর আকর্ষণকে রাসায়নিক আকর্ষণ বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু

ইহার উৎপত্তি কোথায়, এবং পদার্থবিশেষে রাসায়নিক শক্তির প্রাচুর্য্য কেন থাকে, তাহা কেহই স্থির করিতে পারেন নাই। এই ব্যাপারগুলি ডেভি সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। ইনি রয়াল ইনষ্টিটিউটের প্রকাণ্ড বৈদ্যুতিক ব্যাটারি লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। পরীক্ষায় জানা গিয়াছিল, বিদ্যুৎ পরিচালন করিয়া কোন যৌগিক পদার্থকে বিশ্লেষ করিলে যে দুটা জিনিস পাওয়া যায়, তাহারা ঠিক ধনাত্মক ও ঋণাত্মক বিদ্যুতের ন্যায় কার্য্য করে। আণবিক সিদ্ধান্তের সহিত ইহার যোগ কোথায় এবং রাসায়নিক আকর্ষণ ব্যাপারটা যে কি, ডেভি সাহেবও তাহার সুমীমাংসা করিতে পারেন নাই।

ডেভির পরই জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত ফ্যারাডের অভ্যুদয় হইয়াছিল। ইনিও ডেভির ন্যায় বৈদ্যুতিক বিশ্লেষণের উপর দৃষ্টি রাখিয়া গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ফ্যারাডে দেখিয়াছিলেন, বৈদ্যুতিক প্রবাহ দ্বারা কোন যৌগিক পদার্থকে বিযুক্ত করিলে, বিদ্যুতের পরিমাণের সহিত বিশ্লিষ্ট পদার্থের পরিমাণের একটা নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ প্রকাশ হইয়া পড়ে। অতি ক্ষীণ ধারায় জোরাল বিদ্যুৎ প্রবাহ চালনা করিলে বহুক্ষণে যে পরিমাণ রাসায়নিক কার্য্য হয়, অতি অল্পক্ষণের দুর্ব্বল প্রবাহ (Low Electro-motive force) স্থূলধারায় চলিয়া অবিকল সেই কার্য্য করে। প্রবাহের বলবত্তার (Electro motive force) সহিত রাসায়নিক কার্য্যের কোন সম্বন্ধই ফ্যারাডে সাহেব খুঁজিয়া পান নাই। তা' ছাড়া ইনি আরো দেখিয়াছিলেন, বিদ্যুৎ প্রবাহের সাহায্যে কোন যৌগিক পদার্থকে বিশ্লিষ্ট করিলে ব্যাটারির তারের দুই প্রান্তে যেসকল মৌলিক পদার্থ জমা হয়, তাহাদের গুরুত্ব তাহাদের পরমাণবিক গুরুত্বের সহিত সমানুপাতী হইয়া দাঁড়ায়। মৌলিক পদার্থের পরমাণবিক গুরুত্ব পূর্ব্বপণ্ডিতগণ নিছক্ রাসায়নিক প্রথায় নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন। বৈদ্যুতিক বিশ্লেষণেও সেই পরমাণবিক গুরুত্বের পরিচয় পাইয়া ফ্যারাডে সাহেব বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। রাসায়নিক কার্য্যের সহিত বৈদ্যুতিক ব্যাপারের যে একটা নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে ডেভি সাহেব অনেক পূর্ব্বে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছিলেন। ফ্যারাডের এই সকল আবিষ্কারে ডেভির কথার মর্ম্ম সকলে বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক কার্য্য প্রত্যক্ষ এক না হইলেও মূলের কোন এক স্থানে যে উভয়ের ঐক্য আছে, তাহাও সকলে বুঝিয়াছিলেন।

ডেভি ও ফ্যারাডে যেসকল তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সেগুলিতে অণুমাত্র কল্পনার কথা ছিল না; সকলগুলিই প্রত্যক্ষ পরীক্ষালব্ধ ব্যাপার। কাজেই অতি অল্পকাল মধ্যে নবতত্ত্বগুলি বৈজ্ঞানিক মহলে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু ডালটনের পরমাণবিক সিদ্ধান্তের সহিত এই সকল বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক কার্য্যের যোগ কোথায় তাহা ডেভি বা ফ্যারাডে কেহই দেখাইতে পারেন নাই।

পাশ্চাত্য রসায়নশাস্ত্রের উন্নতিকালকে

যদি দুইভাগে ভাগ করিয়া আলোচনা করা যায়, তবে ডাল্টন্ ডেভি ও ফ্যারাডের গবেষণাকালকে রসায়নের প্রাচীন যুগ বলিতে হয়। ইঁহারা সেই সময়ে ইহাকে যে মূর্ত্তি দিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, নব্য রসায়নশাস্ত্রের আর সে মূর্ত্তি নাই। নানা বৈজ্ঞানিকের হাতে পড়িয়া ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নানা রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ কিপ্রকারে রসায়নশাস্ত্রের নূতন আকার দিয়াছেন, এখন তাহার আলোচনা করা যাউক।

যে সকল পাঠক আধুনিক বিজ্ঞানের খবর রাখেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই গতি-সিদ্ধান্তের (Kinetic theory) কথা শুনিয়াছেন। এই সিদ্ধান্তে বিশ্বাস করিলে বলিতে হয়, আমরা যাহাকে তরল পদার্থ বলি তাহা কেবল অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সচল অণুর সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নয়! একটা বিশেষ আকর্ষণী শক্তি ঐ গতিশীল অণুগুলিকে কাছাকাছি রাখে। কিন্তু এই আকর্ষণ এত প্রবল নয় যে, তাহাদ্বারা অণুগুলি গায়ে গায়ে লাগিয়া দৃঢ় আবদ্ধ থাকিতে পারে। কাজেই ইহাদের পরস্পরের মধ্যে বেশ একটু অবকাশ থাকিয়া যায়। গতি-সিদ্ধান্তিগণ বলেন, তরল পদার্থের অস্থির অণুগুলি সর্ব্বদাই ঐ অতি সঙ্কীর্ণ ব্যবধানের ভিতর দিয়া চলাফেরা করে।

ব্যাটারির দুইপ্রান্তসংলগ্ন তার তরল পদার্থে ডুবাইলে ব্যাটারির বিদ্যুৎ দ্বারা কতকগুলি পদার্থকে বিশ্লিষ্ট হইতে দেখা যায়। বিশুদ্ধ জলের ভিতর দিয়া ঐ প্রকার বিদ্যুৎ চালাইলে জল বিশ্লিষ্ট হয় না। কিন্তু এসিড্ ক্ষার ও নানা লবণ জাতীয় পদার্থ, এই প্রকার অতি সহজেই মৌলিক উপাদানে পৃথক হইয়া পড়ে। একটা উদাহরণ লওয়া যাউক। মনে করা যাউক যেন হাইড্রোক্লোরিক এসিডের * ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ-প্রবাহ পরিচালনা করা যাইতেছে। এই পরীক্ষায় এসিডে নিমজ্জিত তারদ্বয়ের একটির গা দিয়া স্পষ্ট ক্লোরিন বাষ্প বাহির হইতে আরম্ভ করিবে, এবং অপরটি হইতে হাইড্রোজেন উঠিতে থাকিবে। এই দুইটি বাষ্প যে, হাইড্রোক্লোরিক এসিডের বিশ্লেষণ হইতেই উৎপন্ন হয়, তাহাতে আর সন্দেহ করিতে পারা যায় না। কারণ এই দুই বাষ্পকে যদি কেহ সংগ্রহ করেন, এবং কোন পাত্রে রাখিয়া তাহাতে বিদ্যুৎ প্রয়োগ করেন, তবে উভয়ের সংযোগে আবার হাইড্রোক্লোরিক এসিডেরই উৎপত্তি হইয়া পড়িবে।

পূর্ব্বের উদাহরণ হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, যে রাসায়নিক শক্তি হাইড্রোজেন ও ক্লোরিণের পরমাণুকে একত্র করিয়া এক একটি হাইড্রোক্লোরিক এসিডের অণুর রচনা করিয়াছিল, বিদ্যুৎপ্রবাহ সেই শক্তিরই উপর জয়লাভ করিয়া আবদ্ধ পরমাণুগুলিকে মুক্ত করিয়া দেয় এবং তারপর মুক্ত পরমাণুগুলি নিজেদের পথ নিজেরাই খুঁজিয়া লইয়া সেই বৈদ্যুতিক তারের এক এক প্রান্তে আসিয়া সঞ্চিত হইতে আরম্ভ করে। কিন্তু আশ্চর্য্যের

* পাঠক অবশ্যই জানেন, হাইড্রোক্লোরিক এসিড এক প্রকার যৌগিক পদার্থ। এক পরমাণু হাইড্রোজেন এবং আর এক পরমাণু ক্লোরিন্ মিলিয়া ঐ এসিডের এক একটি অণুর রচনা করে।

বিষয়, জল মিশ্রিত হাইড্রোক্লোরিক এসিডের কোটি কোটি অণু এই প্রকারে কোটি কোটি পরমাণুতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নির্দ্দিষ্ট তারের দিকে যাইবার জন্য ছুটাছুটি করিতে থাকিলেও জলে এই ছুটাছুটির কোন লক্ষণই প্রকাশ পায় না। এসিড-মিশ্রিত জলটা ঠিক্ পূর্ব্বের ন্যায়ই নিশ্চল ও অচঞ্চল অবস্থাতেই রহিয়া যায়।

বৈদ্যুতিক শক্তি কিপ্রকারে রাসায়নিক শক্তির বিরুদ্ধাচরণ করে, এবং যে পদার্থের ভিতর দিয়া নানা বাষ্পকণার এত ছুটাছুটি, তাহাই বা কেন অচঞ্চল থাকে, এখন এই দুটি প্রশ্নের মীমাংসা করা যাউক। কোন নূতন প্রাকৃতিক ব্যাপার আবিষ্কৃত হইলে, কোন কালেই তাহার ব্যাখ্যানের অভাব হয় না। জ্ঞান বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যুগে যুগে এই প্রকারে যে কত প্রাকৃতিক ব্যাপারের কত ব্যাখ্যান দিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। কিন্তু আধুনিক যুগে কঠোর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় তাহাদের প্রায় সকলকেই পরাহত হইতে হইয়াছে। বিদ্যুতের বিশ্লেষনী শক্তির অস্তিত্ব প্রকাশ হওয়ার পর নানা দেশের বৈজ্ঞানিকগণ ইহার কারণ স্থির করিবার জন্য গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং অল্পদিন মধ্যে তিন চারি প্রকারের ব্যাখ্যান প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় তাহাদের প্রায় সকলগুলিতেই নানাপ্রকার ভুল ধরা পড়িয়া গেছে। আজ কাল কেবল ক্লসিয়স্ (Clausius) সাহেবের সিদ্ধান্তটিই (Electrolytic dissociation theory) পূর্ব্বোক্ত ব্যাপারের নির্ভুল ব্যাখ্যান বলিয়াই স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে।

পূর্ব্ববৈজ্ঞানিকগণ মনে করিতেন, জল ও হাইড্রোক্লোরিক্ এসিড একসঙ্গে মিশাইলে উভয়ের অণু বুঝি অবিকৃত থাকিয়াই পাশা-পাশি বিচরণ করে। ফ্যারাডে ও তাঁহার সমসাময়িক বৈজ্ঞানিকগণ এই প্রকার একটা বিশ্বাসকে মনে রাখিয়া গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন। কাজেই ইহাঁদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া পড়িয়াছিল। ক্লসিয়স্ সাহেব ঐসকল প্রাচীন সংস্কারকে মনে স্থান না দিয়া সত্যানুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং শেষে দেখিয়াছিলেন হাইড্রোক্লোরিক মিশ্রিত জলে এসিড ও জলের অণু কোন-প্রকারে অবিকৃত অবস্থায় থাকিতে পারে না। জলে এসিড্ ঢালিবামাত্র তাহার অণুগুলি আপনা হইতেই বিশ্লিষ্ট হইয়া অসংখ্য হাইড্রোজেন্ ও ক্লোরিণের পরমাণুতে পরিণত হইয়া পড়ে, এবং সঙ্গে সঙ্গে হাই-ড্রোজেন্ ও ক্লোরিণের পরমাণুগুলি আপনা হইতেই ধনাত্মক ও ঋণাত্মক বিদ্যুতে পূর্ণ হইয়া যায়। উপমার সাহায্য লইলে বলিতে পারা যায়, সাধারণ জলে হাইড্রোক্লোরিক এসিড্ মিশিবামাত্র তাহার ক্লোরিণ্ ও হাই-ড্রোজেনের পরমাণুগুলি বন্ধনমুক্ত হইয়া ছোট ছোট নৌকার মত জলে ভাসিয়া উঠে। হাইড্রোজেনের নৌকায় ধনাত্মক বিদ্যুৎ বোঝাই থাকে, এবং ক্লোরিণের নৌকায় ঋণাত্মক বিদ্যুৎ থাকে।

অতি সংকীর্ণ খালের ভিতর এতগুলা নৌকা ভাসিতে থাকিলে, তাহাদের পরস্প-রের মধ্যে সংঘর্ষণ হওয়া আশ্চর্য্য নয়। ক্লসিয়স্ সাহেব বলেন, জল মিশ্রিত পদার্থে

এপ্রকার পরমাণবিক সংঘর্ষণ প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। বিপরীত জাতীয় বিদ্যুৎ বোঝাই দুখানা নৌকা যখন খুব কাছাকাছি আসিয়া পরস্পরকে ধাক্কা দেয়, তাহারা আবার সেই পূর্ব্বেকার হাইড্রোক্লোরিক এসিডের অণুর সংযোগ পাইয়া ডুবিয়া যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে এই প্রকার সংযোগ বিযোগ অধিকাংশ জল মিশ্র পদার্থে অবিরাম চলিয়া থাকে। ধনাত্মক ও ঋণাত্মক বিদ্যুৎ বোঝাই জোড়া জোড়া নৌকা যেমন একদিকে ডুবিয়া যায়, অপর দিকে তেমনি জোড়া জোড়া নূতন নৌকা ভাসিয়া উঠিয়া সেই ক্ষয়ের পূরণ করে।

ক্লসিয়স্ সাহেবের পূর্ব্বোক্ত কথাগুলিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে, বৈদ্যুতিক বিশ্লেষণের সকল সমস্যার মীমাংসা হইয়া যায়। ধনাত্মক ও ঋণাত্মক বিদ্যুৎ যে পরস্পরকে আকর্ষণ করে তাহা শত শত পরীক্ষায় নিশ্চয়রূপে জানা গিয়াছে, এবং একই জাতীয় বিদ্যুৎ যে পরস্পর দূরে যাইবার চেষ্টা করে তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং যখন হাইড্রোক্লোরিক এসিডের জলে ব্যাটারির তার নিমজ্জিত করা যায়, তখন তারের যে প্রান্তটি ঋণাত্মক তড়িতে পূর্ণ (kathode) তাহাতে যে, ধনাত্মক বিদ্যুৎযুক্ত হাইড্রোজেন তরণীগুলি আসিয়া ঠেকিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

বক্তব্য বিষয়টিকে সহজ করিবার জন্য আমরা এপর্য্যন্ত এক হাইড্রোক্লোরিক এসিডের কার্য্য লইয়াই আলোচনা করিতেছিলাম। শত শত পরীক্ষায় স্থির হইয়া গিয়াছে, কেবল হাইড্রোক্লোরিক এসিড নয়, অধিকাংশ যৌগিক পদার্থকেই জলে মিশাইলে তাহাদের অণুগুলি ঠিক পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দ্বিধা হইয়া পড়ে, এবং এক ভাগে ধনাত্মক এবং অপর ভাগে ঋণাত্মক বিদ্যুৎ আপনা হইতেই উৎপন্ন হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে ফ্যারাডে ও ডেভি প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ বিদ্যুৎ ও রসায়নের কার্য্যের মধ্যকার যে সম্বন্ধটিকে খুঁজিতে খুঁজিতে তাঁহাদের জীবন অবসান করিয়াছিলেন তাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের নিকট আপনা হইতেই ধরা দিয়াছে। রাসায়নিক কার্য্যেরও একটা কিনারা এই অধিকারের সাহায্যে দেখিতে পাওয়া যায়। চিনি প্রভৃতি কতকগুলি জৈব পদার্থের রাসায়নিক কার্য্য অত্যন্ত অল্প। ইহাদের অণুগুলিকে বিশ্লিষ্ট করিয়া মৌলিক পরমাণুতে পরিণত করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। জলে মিশাইলেও ইহাদের অণু বিভক্ত হইয়া ধনাত্মক ও ঋণাত্মক বিদ্যুৎ বহন করে না। কিন্তু এসিড ও ক্ষার প্রভৃতি সক্রিয় জিনিসগুলাকে জলে ফেলিবামাত্র তাহাদের অণুগুলি ভাঙ্গিয়া বিদ্যুৎ-যুক্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং, জলস্পর্শে ভাঙ্গিয়া গিয়া বিদ্যুৎ-পূর্ণ হওয়াই যে রাসায়নিক কার্য্যের একটা গোড়ার কারণ, তাহা আমরা সহজে অনুমাণ করিতে পারি।

আধুনিক রসায়নবিদ্ পণ্ডিতগণ পূর্ব্বোক্ত অণুবিভাগ অবলম্বন করিয়াই আধুনিক রসায়ন শাস্ত্রকে রূপান্তরিত করিয়াছেন। ডাল্টন্ সাহেব অণু পরমাণুর অস্তিত্ব মাত্র প্রমাণ করিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু কোন্ শক্তিতে পরমাণু মিলিয়া অণু হয়, এবং কোন্ শক্তিতেই বা

অণু বিচ্ছিন্ন হইয়া আবার পরমাণুতে পরিণত হয়, তাহার সন্ধান তিনি দিতে পারেন নাই। জল মিশ্রিত অণুকে দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া বিদ্যুৎযুক্ত হইতে দেখিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ সেই রাসায়নিক শক্তির কিঞ্চিৎ পরিচয় সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু অণুবিভাগ হয় কেন, এবং বিদ্যুতের উৎপত্তিই বা কোথা হইতে হয়, এসকল গোড়ার খবর আজও রহস্যাবৃত রহিয়াছে। আজকাল রেডিয়ম (Radium) প্রভৃতি কতকগুলি পদার্থের তেজ নির্গমণ ও অক্রিয়তা লইয়া যেপ্রকার গবেষণা চলিতেছে, তাহাতে আশা করা যায়, রাসায়নিক শক্তির আরো গোড়ার খবর শীঘ্রই আবিষ্কৃত হইয়া পড়িবে।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

ষড়দর্শন।

(২)

ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ নামে অভিহিত, ইহা শ্রুতি সিদ্ধ। সম্প্রতি তাহার লক্ষণ নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য। বাদরায়ণ ব্রহ্মের এইরূপ লক্ষণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন—*

যাহা হইতে পরিদৃশ্যমান জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও প্রলয় হয় তিনিই ব্রহ্ম। অর্থাৎ যিনি জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ তিনিই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ভিন্ন কোন পদার্থ জগতের কারণ হইতে পারে না ইহা পঞ্চম ও তৎপরবর্ত্তী সূত্রের ব্যাখ্যায় বিশেষ ভাবে সমর্থিত হইয়াছে। লক্ষণ দ্বিবিধ—স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ। যাহা দ্বারা লক্ষ্য বস্তুর স্বরূপ অর্থাৎ প্রকৃত অবস্থা বুঝা যায়, তাহা সেই বস্তুর স্বরূপ লক্ষণ। যেমন অবকাশ আকাশের স্বরূপ লক্ষণ। ইহা দ্বারা আকাশের স্বরূপ মাত্র বুঝা যায়। যতকাল লক্ষ্য বস্তু বর্ত্তমান থাকে স্বরূপ লক্ষণও ততকাল পর্য্যন্তই লক্ষ্য বস্তুতে পরিলক্ষিত হয়। লক্ষ্য বস্তুর অভাব হইলে স্বরূপ লক্ষণের অস্তিত্ব থাকে না। যে লক্ষণ, লক্ষ্য বস্তুর অবস্থিতি সময়ে নিয়মিত রূপে অবস্থিত থাকে না, এবং যদ্দ্বারা লক্ষ্য বস্তুটী অন্যবিধ পদার্থ হইতে ভিন্ন, ইহা বুঝা যায়, তাহা তটস্থ লক্ষণ। এক গৃহে এক রকমের চারি খানি দর্পণ আছে। এবং চারি খানিতে রক্ত, কৃষ্ণ, পীত, ও নীল এই চারি প্রকার রং-এর প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। এই অবস্থায় উক্ত রং সকলকে, সেই দর্পণ সমুদয়ের তটস্থ লক্ষণ বলা হইয়া থাকে, কারণ পূর্ব্বোক্ত রং-এর প্রতিবিম্ব দর্পণে নিয়মিত ভাবে সকল সময়ে থাকে না। দর্পণ সকল পরস্পর ভিন্ন, ইহা মাত্রই এই লক্ষণ দ্বারা বুঝা যায়।

জগৎ কারণত্ব, ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ নহে। উহা তাহার তটস্থ লক্ষণ। জগৎ উৎপত্তি ও বিনাশশীল, সকল সময়ে তাহা বর্ত্তমান থাকে না, সে জন্য জগৎ কারণত্ব সকল

---

* বেদান্ত সূত্র ১। পা ১। সূ২।

সময়ে ব্রহ্মের থাকিতে পারে না। যখন তিনি জগৎ উৎপাদন করেন, তখনই তাহাতে জগৎ-কারণত্ব বর্ত্তমান থাকে। এই লক্ষণ দ্বারা ইহা মাত্র বুঝা যায় যে, জগৎ নির্ম্মাণে অসমর্থ যে সকল পদার্থ আমাদের অনুভূত হইতেছে, সে সমস্ত পদার্থ হইতে ভিন্ন কোন একটী পদার্থকে ব্রহ্ম বলা যায়। ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ "আনন্দ" অর্থাৎ সুখরূপতা,—ইহা 'পঞ্চপাদিকা বিবরণ' নামক প্রকরণ গ্রন্থে লিখিত আছে। ইহা দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝা যায়। এই আনন্দ, জ্ঞান ও অস্তিত্ব স্বরূপ। অস্তিত্ব, জ্ঞান ও সুখ এই তিনটী পরস্পর অভিন্ন। একটীকে ছাড়িয়া অপরটী অনুভূত হয় না এবং থাকিতেও পারে না। ব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রমাণের আলোচনা সময়ে এই বিষয়ে ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ের যথাসম্ভব বিস্তৃত বর্ণনা করিতে যত্ন করিব। এ স্থলে কার্য্য-কারণ-ভাব সম্বন্ধে কএকটী কথা বলিয়াই লক্ষণ-প্রকরণের উপসংহার করিতে ইচ্ছা করি।

কার্য্য কারণ ভাব সম্বন্ধে আমাদের দর্শনে তিনটী মত প্রচলিত আছে।

১ম,—আরম্ভবাদ, যাহা ইংরাজী ভাষায় Theory of agglomeration বলিয়া প্রসিদ্ধ।

২য়,—পরিণাম বাদ, যাহা Theory of evolution বলিয়া বিখ্যাত।

৩য়,—বিবর্ত্ত বাদ, যাহা ইংরাজীতে Theory of illusion বলিয়া প্রসিদ্ধ।

নৈয়ায়িক, বৈশেষিক ও পূর্ব্বমীমাংসকগণ,—আরম্ভবাদী। তাঁহারা পরমাণুর সংযোগে নূতন নূতন পদার্থের উৎপত্তি স্বীকার করেন। ইহাদের মতে কার্য্য ও কারণ পরস্পর ভিন্ন, এবং উভয়ই সৎপদার্থ। সাংখ্য, পাতঞ্জল ও পাশুপত মতাবলম্বিগণ পরিণাম বাদী। ইহারা বলেন যে সত্ব, রজঃ তমঃ, এই গুণত্রয় স্বরূপ প্রকৃতিই, জগতের মূল কারণ। এই প্রকৃতিই, বুদ্ধি, অহংকার, ইন্দ্রিয়, সূক্ষ্ম ভূত ও স্থূলভূত রূপে পরিণত হয়। ইহাদের মতে কার্য্য ও কারণ উভয়ই সৎ। কার্য্য কারণ হইতে অভিন্ন, এবং উৎপত্তির পূর্ব্বে, কার্য্য সকল কারণে সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে। যাহা উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণে থাকে না, এরূপ কোন কার্য্যেরই উৎপত্তি হয় না। ইঁহারা সৎকার্য্যবাদী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এই সকল বিষয়ে অধিক বলিতে হইলে, বেদান্ত মত হইতে, অনেক দূরে সরিয়া পড়িতে হয়; সাংখ্য মতের আলোচনা সময়ে ইহার বিস্তৃত বর্ণনা করিতে ইচ্ছা রহিল। এইক্ষণ বিবর্ত্তবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকগণ বিবর্ত্তবাদী। তাঁহারা বলেন পূর্ব্বোক্ত সচ্চিদানন্দ রূপ ব্রহ্মই,—মায়া বা অজ্ঞানের শক্তি প্রভাবে সীমাবদ্ধ জগৎ স্বরূপে দৃষ্ট হইতেছে। যেমন অন্ধকারে একটী বস্তু অন্যবিধ বস্তু বলিয়া ভ্রমের বিষয় হয়, সেইরূপ অপরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ অসীম ব্রহ্মাণ্ড, পরিছিন্ন (সীমাবদ্ধ) জগৎরূপে আমাদের ভ্রমের বিষয় হইয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে জগতের অস্তিত্ব নাই। ইহাদের মতে জগৎ, ব্রহ্মের বিবর্ত্ত। বিবর্ত্তদ্বারা ব্রহ্মের স্বাভাবিক অবস্থার কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় না। তিনি সসীম, অন্যবিধ পদার্থরূপে জ্ঞানের বিষয় মাত্রই হইয়া থাকেন। নিজের

স্বরূপের কোনরূপ পরিবর্ত্তন না হইলেও, যাহা অন্যবিধ পদার্থ রূপে জ্ঞানবিষয় হইয়া থাকে, সেই অন্যবিধ পদার্থকে তাহার বিবর্ত্ত বলা যায়। অন্ধকারে যখন আমরা কোন বৃক্ষকে মনুষ্য মনে করিয়া থাকি, তখন কল্পিত মনুষ্যকে বৃক্ষের বিবর্ত্ত বলা যায়। কারণ এই কল্পনা দ্বারা বৃক্ষের স্বরূপের বাস্তবিক কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় না, বৃক্ষ কেবল মনুষ্য রূপে জ্ঞানের বিষয় মাত্র হইয়া থাকে। সেইরূপ, জগৎ-কল্পনা দ্বারা, ব্রহ্মের স্বরূপের কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় না, মাত্র ব্রহ্ম, পরিচ্ছিন্ন ও জড়ভাবে জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকেন, সুতরাং জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত। বিবর্ত্ত-শব্দের যৌগিক অর্থ এইরূপ হইতে পারে, বিবর্ত্ততে বিরুদ্ধ ভাবেন জ্ঞায়তে যঃ স বিবর্ত্তঃ অর্থাৎ যাহা আশ্রয়ের বিপরীতভাবাপন্ন বলিয়া জ্ঞানের বিষয়, তাহা সেই আশ্রয়ের বিবর্ত্ত নামে কথিত হইয়া থাকে। ব্রহ্ম সৎ, চিৎ ও আনন্দ স্বরূপ, এবং সর্ব্বব্যাপী; জগৎ জড়, দুঃখময় ও পরিচ্ছিন্ন, সুতরাং এই জগৎ ব্রহ্মের বিপরীত ভাবাপন্ন, এবং তাহা বিপরীত ভাবেই ব্রহ্মে জ্ঞাত হইতেছে, সে জন্য ইহা ব্রহ্মের বিবর্ত্ত।

যাহা সম্পূর্ণভাবে জ্ঞাত বা সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞাত সেইরূপ বস্তুতে কখনও অন্য কোন পদার্থের কল্পনা হয় না। যাহা এক ভাবে জ্ঞাত ও অপর ভাবে অজ্ঞাত, তাহাতেই অন্য রকম পদার্থের কল্পনা হইয়া থাকে। কোন বৃক্ষ নিকটবর্ত্তী ভাবে জ্ঞাত এবং বৃক্ষভাবে অজ্ঞাত হইলে, তাহাতে "ইহা মনুষ্য" এইরূপ কল্পনা হইয়া থাকে। সেইরূপ ব্রহ্ম, সৎ স্বরূপে জ্ঞাত, এবং চিৎ, আনন্দ ও অসীম ভাবে অজ্ঞাত হইলে, জড়, দুঃখ, ও সসীম জগৎ কল্পিত হয়। সে জন্য কল্পিত পদার্থ সকল, অজ্ঞাত ভাবের বিপরীত স্বভাব-সম্পন্ন বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে। বস্তুর অজ্ঞাত ভাবের উপর কল্পিত পদার্থের অস্তিত্ব নির্ভর করে, সে জন্য জ্ঞান দ্বারা তাহার অজ্ঞাত ভাব বিনষ্ট হইলে কল্পিত পদার্থের অস্তিত্ব অনুভূত হয় না। বৈদান্তিক অদ্বৈত-বাদিগণ, জ্ঞাতভাবাপন্ন বস্তুকে কল্পিত পদার্থের অধিকরণ, এবং অজ্ঞাত ভাবাপন্ন বস্তুকে কল্পিত পদার্থের অধিষ্ঠান বলিয়া থাকেন। অধিকরণ ও অধিষ্ঠান এই দুইটী শব্দের বৈদান্তিক-সম্মত অর্থ প্রকাশ করা যাইতেছে। অধিলক্ষীকৃতা জ্ঞানবিষয়ীকৃতা ক্রিয়তে যত্র তৎ অধিকরণং, অর্থাৎ যাহা জ্ঞানের বিষয় হইলে, তাহাতে অন্য পদার্থ কৃত বা উৎপাদিত হয়, তাহা সেই উৎপাদিত পদার্থের অধিকরণ। ব্রহ্মের সৎস্বরূপতা বা অস্তিত্বরূপতা জ্ঞাত হইলে, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ তাহাতে উৎপাদিত হয় এইরূপ মনে করা যায়, সেজন্য ব্রহ্মের সৎস্বরূপতা জগতের আধার বা অধিকরণ; এবং ব্রহ্মের চিৎ ও আনন্দরূপতা অধিষ্ঠান। অধিলক্ষীকৃত্য স্থীয়তে যত্র তৎ অধিষ্ঠানং, অর্থাৎ যাহার উপর নির্ভর করিয়া কোন পদার্থ অবস্থিত থাকে, তাহা সেই পদার্থের অধিষ্ঠান। ব্রহ্মের অজ্ঞাত চিৎ ও আনন্দ-রূপতার উপর নির্ভর করিয়া কল্পিত পদার্থ অবস্থিত থাকে, সেজন্য চিৎ ও আনন্দরূপতা কল্পিত পদার্থের অধিষ্ঠান। ব্রহ্মের সৎ অংশ জ্ঞাত হইলে, তাহাতে জগৎ কল্পিত হয়, সেজন্য জগৎ সৎ, এইরূপ অনুভব হইয়া থাকে।

চিৎ ও আনন্দাংশ প্রভৃতি অজ্ঞাত থাকা সময়ে কল্পিত হয় বলিয়া, জগৎ চিৎ ও আনন্দময়, এইরূপ অনুভব হয় না। প্রত্যুত ব্রহ্মের চিৎ, আনন্দ ও অসীমত্ব জ্ঞান হইলে, জগতের অভাবই হইয়া থাকে। ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া জগৎ কল্পিত হয়, সেজন্য ব্রহ্ম জগদুৎপত্তির উপাদান কারণ, এবং ব্রহ্মের সত্তা দ্বারা জগৎ সংস্বরূপে পরিস্ফুরিত হয়, সেজন্য ব্রহ্ম তাহার স্থিতি কারণ, এবং বিনাশ সময়ে যেন তাহাতেই মিলাইয়া যায় এইরূপ বোধ হওয়ায়, তিনি প্রলয়ের কারণ, ইহা অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়া থাকেন। প্রকৃতপক্ষে, জগতের ও তাহার স্থিতি বা প্রলয়ের সহিত, ব্রহ্মের বাস্তবিক কোন সম্বন্ধ নাই। অজ্ঞানের শক্তিপ্রভাবেই এই সকল তাহাতে আরোপিত হইয়া থাকে। সুতরাং অজ্ঞানই জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ, ব্রহ্ম সেই অজ্ঞানের বিষয় এবং আশ্রয়, সে জন্য তাহাকে জগদুৎপত্তি প্রভৃতির কারণ বলা হইয়া থাকে। ইহাই বেদান্তের অদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্ত। কিন্তু ভট্টভাস্করমতাবলম্বী রামানুজ সম্প্রদায়, এই বিবর্ত্তবাদ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে এই জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম এবং তাহা সত্য। শঙ্কর এই ব্রহ্মপরিণামবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বলেন যে নিরবয়ব ও নির্ব্বিকার পদার্থের কোনরূপ পরিণাম হইতে পারে না। ব্রহ্ম নিরবয়ব ও নির্ব্বিকার, সুতরাং তাহার কোনরূপ পরিণাম হওয়া সম্ভাবিত নহে। পরিণামবাদের সমালোচনা সময়ে, এই বিষয়ে যথা সম্ভব যুক্তি প্রদর্শন করিব। এ স্থলে তাহার বিচার না করিয়া, অদ্বৈতবাদের অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে বিচার করা কর্ত্তব্য, সুতরাং এইক্ষণে লক্ষণ প্রকরণের উপসংহার করিয়া, ব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রমাণ আছে কিনা এই বিষয়ের বিচারে বারান্তরে প্রবৃত্ত হইব।

শ্রীগুরুচরণ তর্কতীর্থ।

মহম্মদ।

—:০:—

খৃষ্টীয় ছয় ও সাত শতাব্দীর ইতিহাস, খৃষ্টীয় ধর্ম্মের সর্ব্বনাশের ইতিহাস, খৃষ্টান সমাজের অধঃপতনের ইতিহাস। যদি এই সময়ে দূর আরবের মরুভূমে মহম্মদের যোগাগ্নি প্রজ্বলিত না হইত, তাহা হইলে খৃষ্টান সমাজের বিশাল পাপরাশি বিদগ্ধ করিয়া নবশক্তি-অগ্নিকুল খৃষ্টান ধর্ম্ম কর্ম্ম ও সমাজকে রক্ষা করিতে পারিত না। খৃষ্টান সমাজ আপনার পাপ-স্তূপে সমাধিস্থ হইয়া জগতে পাপের পরিণামের স্মৃতি-স্তম্ভ হইয়া ভাবী জগতের পরিহার্য্য বিপথের নিদর্শক হইয়া থাকিত।

যে শিক্ষার গুণে মরুবাসী অসভ্য কাফ্রি সাহারার দুর্গম বালুকাক্ষেত্রে সান্ধ্য রবি লক্ষ্য করিয়া অনাদি অনন্ত ভগবানকে পূজা করিতেছে, সেই শিক্ষার প্রতিঘাতের গুণে আটলান্টিক মহাসাগরের উভয় কূলে যুনানী-মণ্ডলী স্বীয় শিক্ষা ও দীক্ষার গুণে জগতে মহিমান্বিত হইয়াছে।

খৃষ্টীয় সাত শতাব্দীর প্রারম্ভে মক্কানগর আরবের নগরসমষ্টির মধ্যে একটী গণ্যমান্য নগর বলিয়া বিদিত ছিল। সমুদ্রের অনতি দূরে অবস্থিত ও পর্ব্বত মালায় পরিরক্ষিত হইয়া মক্কানগর আরবদেশের মধ্যে এক সমৃদ্ধিশালী নগর বলিয়া বিবেচিত হইত।

মক্কার মধ্যস্থলে কাব্বা। কাব্বা তদানীন্তন পৌত্তলিক আরবদিগের দেবমন্দির। ইহা সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গের উপর অবস্থিত। এই কাব্বার অধিকারীগণ মক্কার ধাম ধর্ম্মের অধিপতি ছিলেন। তাঁহারা "মালেক" বলিয়া অভিহিত হইতেন।

খুরজৈত বংশীয়েরা অনেক দিন মক্কার মালেক ছিলেন। খুরজৈত বংশীয় শেষ মালেকের কন্যাকে ফির বংশীয় কোশাই নামক এক ব্যক্তি বিবাহ করেন। এবং পরে খুরজৈতদিগকে দূরীভূত করিয়া মক্কার মালেক হন। কুশাই খৃষ্টীয় পাঁচ শতাব্দীর মধ্যভাগে জীবিত ছিলেন। ৪৮০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

কুশাই জীবদ্দশায় আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র আবদ-উল-দরকে মালিক পদে মনোনীত করিয়া যান। পিতার মৃত্যুর পর আবদ নির্ব্বিবাদে মালেক হইলেন। কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর, কুশাই বংশীয়েরা মালেকের পদ লইয়া আপনাদের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ করে। এই বিবাদে মক্কাবাসীয়া সকলেই কোন না কোন পক্ষে যোগ দেয়, শেষে বিবাদ তখনকার মত আপোষে মিটিয়া যায়! এই মীমাংসার বলে, আবদ উল-দরের ভ্রাতুষ্পুত্র আবদ-উস্-সামস্, সিকদা (মক্কার যাত্রীদের পানীয় জলের আধিপত্য) এবং 'রফিদ্যা' (দরিদ্র কর) প্রাপ্ত হন; আবদ-উস্ সামস্ আপনার এই সকল আধিপত্য আপনার ভ্রাতা হাসেমকে দান করেন। হাসেম অন্য অন্য মক্কাবাসীর ন্যায় বাণিজ্য কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া বিস্তর অর্থ সঞ্চয় করেন। একবার এইরূপ বাণিজ্য করিতে গিয়া হাসেমের প্রবাসে মৃত্যু হয় (খৃ-৫১০)। হাসেমের মৃত্যুর পর, তাহার সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধার্ম্মিক মুত্তালিব, রফিদ্যা ও সিকদ্যার ভার প্রাপ্ত হইলেন।

হাসেম যাদস্ত্রীববাসিনী এক রমণীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, ঐ রমণীতে তাঁহার এক পুত্র হয়। মুত্তালিব এক্ষণে আপনার সেই "শ্বেতকেশ যুবক ভ্রাতুষ্পুত্রকে" যাদস্ত্রীব হইতে মক্কায় আনয়ন করেন। মক্কাবাসীগণ ঐ যুবককে মুত্তালিবের দাস ভ্রমে "আবদ্-উল-মত্তালিব'' মুত্তালিব-দাস বলিয়া ডাকিত।

এই সময়ে কুশাই বংশীয় প্রবীণ ব্যক্তিগণ সভা আহ্বান করিয়া কাব্বাদের মন্দিরের কার্য্য, নিষ্পন্ন করিতেন। এই সভাতে আবদ-উল মত্তালিবের বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ছিল। তৎকালিক প্রথা অনুসারে আবদ মত্তালিব নিজের বংশের শ্রীবৃদ্ধি কামনায় উপাস্য দেবতার নিকট জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বলি দিবেন বলিয়া মানত করেন।

আবদ উল-মত্তালিব প্রাণপ্রতিম জ্যেষ্ঠ

পুত্র আবদুল্লাকে, দেবমন্দিরে উৎসর্গ করিতে চলিলেন। কিন্তু নিয়তি লিপি অন্যরূপ। দৈবাদেশে আবদুল্লার শোণিত-পাতের বিনিময়ে উষ্ট্রশোণিতপাতে দেবগণ তৃপ্ত হইলেন।

আবদুল্লা জুহ্রী বংশীয়া আমীনাকে বিবাহ করেন। ২৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে আবদুল্লার মৃত্যু হয়। স্বামীর মৃত্যুর কয়েক দিন পরে বিয়োগ বিধুরা আমীনা একটী পুত্র সন্তান প্রসব করে। সেই শিশুই ভাবী মুসলমান ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক 'মহম্মদ। (খৃ৫৭০) ছয় বৎসর বয়ঃক্রমকালে মহম্মদের মাতৃ-বিয়োগ হয়। এ পর্য্যন্ত তিনি পিতামহের আশ্রয়ে থাকিয়া প্রতিপালিত হইতেছিলেন, এক্ষণে তাঁহার মাতার মৃত্যুর ৩।৪ বৎসর পরে তাঁহার পিতামহের মৃত্যু হইল (৫৭৯)।

আবদ-উল-মত্তালিব মৃত্যুকালে আপনার পুত্র আবু তালিবের হস্তে পিতৃমাতৃহীন মহম্মদকে অর্পণ করিয়া গেলেন।

পিতৃমাতৃহীন বালক পিতৃব্যেরস্নেহে লালিত পালিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু সেই দিন হইতে তাঁহার মুখে গভীর চিন্তার রেখা দেখা দিল। পিতৃব্যের সংসারের কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়াও তিনি প্রকৃতির প্রাকৃত চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। আরবদিগের জাতি-সুলভ জ্ঞাতি-বিবাদ, ও কাজমেলার জঘন্য আমোদ প্রমোদ সেই চিন্তাশীল যুবকের হৃদয়ের চিন্তাভার গভীরতর করিয়া তুলিল। মক্কার প্রমোদময় রাজপথে তিনি শূন্যমনে ও শূন্য দৃষ্টিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। লোকে তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব দেখিয়া "অল-আমীন"—সুধী-বর—বলিয়া ডাকিত। পথের বালকেরা তাঁহার সাক্ষাতে তৃপ্ত হইত। দীন দুঃখীরা তাঁহার কথায় শান্তি পাইত।

পঁচিশ বৎসর বয়সে খাদিজা নাম্নী এক আত্মীয়ার কর্ম্মচারীরূপে মহম্মদ সিরিয়া প্রদেশে গমন করেন। খাদিজা তাঁহার বিষয় বুদ্ধি ও সততা দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। পরে তাঁহার গুণের পক্ষপাতিনী হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন।

খাদিজার গর্ভে তাঁহার তিন পুত্র ও চারি কন্যা জন্মে। পুত্র গুলির অল্প বয়সেই মৃত্যু হয়। পুত্র শোকে তিনি অত্যন্ত সন্তপ্ত ছিলেন। আবু তালিবের পুত্র আলির সহিত নিজের কনিষ্ঠা কন্যা ফতেমার সহিত বিবাহ দিয়া মহম্মদ স্বীয় হৃদয়ের এই অভাব কিয়ৎ পরিমাণে দূর করিতে পারিয়াছিলেন।

ক্ষুব্ধহৃদয় মহম্মদ চারি দিকে অত্যাচার ও অনাচার দেখিয়া মর্ম্মপীড়িত হইতে লাগিলেন। স্বজাতিবর্গ গৃহবিবাদে জর্জ্জরিত, অধর্ম্ম ধর্ম্মের নামে প্রচারিত, ভ্রষ্টাচার সদাচার রূপে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া ধর্ম্মপ্রাণ মহম্মদের সাধু-হৃদয়ে ঘোরতর আঘাত লাগিল। ইহার উপায় কি? এ চিন্তা তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিল।

পৌত্তলিক আরবদিগের বীভৎস পাশবাচার ও পতিত খৃষ্টান সমাজের বিলাসের উপচার দেখিয়া মহম্মদ আর কোথাও শান্তি পাইলেন না। তিনি প্রকৃতির শান্তিময়ী রচনাতে স্বহৃদয়ের শান্তির উপকরণ খুঁজিতে লাগিলেন। এই অনন্ত বিশ্ব—অনন্ত আকাশ, এই নক্ষত্র মালা, এই বালুকাময় অপার মরুক্ষেত্র—কে সৃষ্টি করিল? হিরার গিরিগহ্বরে বসিয়া

বসিয়া যোগীবর সর্ব্বদাই এই চিন্তায় নিরত। তন্ময় হইয়া যোগীবর শুনিলেন ;—কীর্ত্তন কর। যোগী জিজ্ঞাসিলেন—কি কীর্ত্তন করিব? উত্তর ;—স্রষ্টার গুণ কীর্ত্তন কর। এইরূপে পৃথিবীর কঠিন বাস্তবে পরিবৃত হইয়া, অপার্থিবের চিন্তা করিতে করিতে মহম্মদ এক নূতন অপার্থিব ধন পাইলেন। এই-রূপে তাঁহার নূতন ধর্ম্মের আবিষ্কার হইল। এইরূপে মুসলমান ধর্ম্মের প্রচারের সূত্রপাত হইল।

মহম্মদ তাঁহার প্রবুদ্ধ জ্ঞান প্রথমে খাদিজাকে জ্ঞাত করিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী খাদিজা তাহার প্রথমা দীক্ষিতা স্বধর্ম্মিণী হইলেন।

রমণী হৃদয় আধ্যাত্মিক জগতে স্বচ্ছসলিলা নদী; ইহার স্বচ্ছবক্ষে নূতন ভাবের প্রথম প্রতিবিম্ব পড়ে। ইহার তরঙ্গে নূতন ভাবের প্রথম রঙ্গ দেখা যায়। এই জগতের রঙ্গ-ভূমিতে যখন যেখানে নূতন ভাবের খেলা আরম্ভ হইয়াছে রমণী হৃদয় সেইখানেই তাহার প্রথম আভাস প্রাপ্ত হইয়াছে।

খাদিজা রমণীরত্ন; মহম্মদ যখন জগতের অশান্তিময় পৈশাচিক তাণ্ডবে দলিত-হৃদয় হইয়া গৃহে ফিরিতেন, তখন খাদিজার কোমল আচরণে তাঁহার হৃদয় অনেকটা শান্তি লাভ করিত।

খাদিজা শক্তিরূপিনী; জগতের উপহাস যখন মহম্মদের গভীর চিন্তাপূর্ণ জীবনকে ভ্রান্তির নিদর্শক বলিয়া নির্দ্দেশ করিত, তিনি শূন্যমনে আত্মহারা হইয়া আপনার বিশ্বাসে সন্দিহান হইতেন, তাঁহার মহাবল-হৃদয়ে দৌর্ব্বল্যের ছায়া পড়িত,—খাদিজার পতিভক্তি, মহাশক্তিরূপে স্বীয় বিশ্বাসের সঞ্জীবনে, স্বামীর আত্মবিশ্বাসকে পুনর্জ্জীবিত করিত। মহম্মদ তখন নূতন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, তাঁহার নূতন শিষ্যের আবশ্যক। খাদিজার পতিভক্তি গুরুভক্তির রূপ ধারণ করিলে তিনি এখন শিষ্যারূপিনী হইলেন। নবদীক্ষিতা হইয়া পতির পাদমূলে নবধর্ম্মের নূতন তত্ত্ব শিক্ষা করিতে বসিলেন।

খাদিজার মৃত্যুরপর মহম্মদ আর যেসকল রমণীকে বিবাহ করেন তাহাদের মধ্যে কাহাতেও খাদিজার দৈবমূর্ত্তি দেখিতে পান নাই।

মহম্মদ প্রথমে আপনার নূতন ধর্ম্ম স্বজন-বর্গের মধ্যে প্রচার আরম্ভ করেন।

লোকে পূর্ব্বে তাঁহাকে ভ্রান্ত ভাবুক বলিয়া উপেক্ষা করিত, এক্ষণে তাঁহার ধর্ম্ম-প্রচার দেখিয়া তাঁহাকে সমাজদ্রোহী বলিয়া জানিল। তাঁহার স্বগোত্রীয়েরা তাঁহার উপর খড়্গহস্ত হইল।

তিন বৎসর অবিশ্রান্ত শিক্ষাদানে তিনি ত্রিশ জন মাত্র শিষ্য পাইলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই দমিলেন না। এক্ষণে এক প্রকাশ্য সভা করিয়া কাবার অধিকারীগণকে, পুত্ত-লিকা পূজা পরিত্যাগ করিয়া এক ঈশ্বরের আরাধনার যাথার্থ্য বুঝাইতে চেষ্টা করি-লেন। তাঁহার অগ্নিময় বক্তৃতা শুনিয়া, তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর একাগ্রতা দেখিয়া, কুর-শাইতগণ মুখে বিদ্রূপ প্রকাশ করিলেও অন্তরে বিলক্ষণ ভীত হইল। তাহারা বুঝিল আজি যে ক্ষুদ্রতেজছটা তাহাদের নগরের মধ্যস্থলে উঠিয়াছে কালে তাহা এক বৃহৎ অগ্নিস্রোতে পরিণত হইয়া, তাহা-

দের প্রতিপত্তি নষ্ট করিয়া কাব্বার ধর্ম্মমন্দির ধ্বংস করিবে। তাহারা সর্ব্বত্র মহম্মদের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে সাবধান করিতে লাগিল। তাহারা মক্কার তীর্থযাত্রীদিগকে ঐন্দ্রজালিক মহম্মদের ছায়া মাড়াইতে নিষেধ করিল। ফল বিপরীত ফলিল। দূরদেশবাসী তীর্থ যাত্রীগণ ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজাল কিরূপ, মায়াবীর মায়া বিস্তার কি উপায়ে, তাহা জানিবার জন্য ব্যস্ত হইল; এবং পুরোহিতের নিষেধ সত্বেও মহম্মদের ধর্ম্মকাহিনী আগ্রহের সহিত শুনিয়া মক্কার নূতন ধর্ম্ম প্রচারের কথা দেশে রটনা করিতে লাগিল। এদিকে কুরাশাইতগণের শত্রুতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; পিতৃব্য আবু অলিব ও আত্মীয় আবু বাকর প্রভৃতির সহায়তায় গুণে মহম্মদের কোনরূপ দৈহিক অত্যাচার এপর্যান্ত ঘটে নাই, কিন্তু তাঁহার শিষ্যগণ নানারূপে উৎপীড়িত হইতে লাগিল। তাহারা অনেকে প্রবাসে গিয়া আত্মরক্ষা করিল।

মহম্মদ মক্কায় বসিয়া আপনার নবধর্ম্মের শিক্ষা বিতরণ করিতে লাগিলেন। তিনি আপনার যুক্তির ও নীতির বলে ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে কেহ কোন অলৌকিক ব্যাপার দেখাইয়া তাঁহার ঈশ্বরমাহাত্ম্য প্রকাশ করিতে বলিলে, তিনি উত্তর করিলেন;—মূর্খ তোমরা আবার তোমাদের স্রষ্টার নিদর্শন চাও? আপনাদের সুকৌশলসম্পন্ন দেহের প্রতি দৃষ্টি কর, আপনার স্রষ্টার নিদর্শন পাইবে; দিবা রাত্রির পর্য্যায় পরিবর্ত্তন লক্ষ্য কর, জীবের জন্ম মৃত্যুর বিষয় ভাব, নিজের নিদ্রা ও প্রবুদ্ধ অবস্থায় কথা ভাবিয়া দেখ, জগতের একত্বে বিশেষত্ব দেখ, আকাশে মেঘমালার বিকাশ বিলয় দেখ, বায়ু প্রবাহের পরিবর্ত্তন দেখ, মানবজাতির বিভিন্ন শাখার বৈষম্যে সাম্য ও তাহাদের সাম্যে বৈষম্য দেখ; ইহাতেও কি তোমাদের স্রষ্টার অসীম ক্ষমতার পরিচয় পাও না?

এইরূপে প্রকৃতির মধ্যে প্রকৃতির স্রষ্টার পরিচয় পাইয়া মহম্মদ আপনার প্রাকৃতিক ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। 'তোমার সৃজন মধ্যে তোমাকেই হেরি'—এই শিক্ষা বিস্তারে প্রবৃত্ত হইলেন। সমগ্র জগতই তাহার চক্ষে অলৌকিক ব্যাপার; জগতের সকল বস্তুতেই তিনি ঈশ্বরের হস্ত দেখিতেন। এইরূপে তিনি প্রকৃতির ঈশ্বরকে দেখিতে দেখিতে প্রকৃতিতত্বে তন্ময় হইয়া ঐশ্বরিক বাক্য প্রকৃতির মুখে শুনিতে লাগিলেন। দেবভাষা তাঁহার কর্ণে পঁহুছিল। স্বর্গীয় দূত আসিয়া তাঁহার তন্ময় অবস্থায়, জগতের জন্মকাহিনী, শ্রেষ্ঠ জীবের উৎপত্তি, তাহার পরিণাম, তাহার কর্ত্তব্য কথা, তাহার স্রষ্টার মহত্ব গাথা সকলই তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলেন প্রতি কর্ত্তব্য কার্য্যেই তিনি ঈশ্বরের আদেশে আদিষ্ট হইতে লাগিলেন; এইরূপে তিনি নিদ্রাবস্থায় জাগরিত, জাগরিত অবস্থায় নিদ্রিত হইয়া ঈশ্বর তত্বে তন্ময় হইয়া, প্রবুদ্ধ যোগীরূপে নূতন ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন।

আবুতালিবের মৃত্যুতে সহায়শূন্য মহম্মদ ওমেয়া ও অপরাপর কুলশত্রুদিগের দ্বারা বিশেষ উৎপীড়িত হইলেন। তাহারা হাসেম-বংশীয়দিগের গৃহবিবাদে মহা আনন্দিত হইল; তাহারা ধর্ম্মদ্রোহী কুলশত্রু মহম্মদকে,

তাঁহার জ্ঞাতিদের সহিত যোগ দিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। সহায়হীন পত্নীশোকে কাতর মহম্মদ, মক্কা ত্যাগ করিয়া তেয়ফা চলিলেন, সঙ্গে একমাত্র সহায় প্রভুভক্ত জৈদ।

তেয়াফাবাসীগণ তাহাকে দেখিয়া পাগল বলিয়া লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিল ও হাত তালি দিয়া তাড়াইয়া দিল; ক্ষত পদে ক্লান্ত দেহে মহম্মদ, বিজনে গলবস্ত্রে বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া ভগবানকে ডাকিলেন, মনের আবেগে বলিলেন—দয়াময় আমাকে ত্যাগ করিও না। বিদেশীর হস্তে, শত্রুর হস্তে আমাকে নিক্ষেপ করিও না। দয়াময়, তোমার দয়া থাকিলে আমি নির্ভয়, আর কাহাকেও ভয় করি না।

মহম্মদ পুনরায় মক্কায় ফিরিলেন। কিন্তু সেই অবধি মক্কাবাসিদের নিকট বড় আর ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেন না। তীর্থযাত্রী বিদেশীকে দেখিলে, তিনি তাঁহার নূতন ধর্ম্মের নূতন তত্ত্ব বুঝাইতেন। এইরূপে তাঁহার ধর্ম্মপ্রচার চলিতেছে, এমন সময়ে একদিন তিনি দেখিলেন, যে, ছয়জন যাদ্‌ৰীববাসী তীর্থযাত্রী বণিক কি কথোপকথন করিতেছে, তিনি তাহাদিগকে ডাকিলেন, নিজের নবধর্ম্মের তত্ত্ব বুঝাইলেন;—তাহারা নূতন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। পর বৎসর ঐ যাদ্‌ৰীববাসীরা আর ছয়জন নূতন যাদ্‌ৰীববাসীকে সঙ্গে করিয়া আসিল, তাহারাও মহম্মদের ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল।

তাহারা প্রতিজ্ঞা করিল—

১। ঈশ্বরের পূজায় ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই জড়িত করিব না।

২। পরস্বাপহরণ করিব না।

৩। ব্যভিচার দোষে দুষ্ট হইব না।

৪। আপনার সন্তানকে বলিরূপে বধ করিব না।

৫। পরনিন্দা পর গ্লানি করিব না।

৬। সকল ন্যায্য বিষয়ে ঈশ্বরাদিষ্ট ধর্ম্মনেতার অনুসরণ করিব।

৭। বিপদে, সম্পদে, সকল বিষয়ে তাঁহার বিশ্বাস ভাজন থাকিব।

এইরূপে প্রতিজ্ঞাসূত্রে বদ্ধ হইয়া তাহারা মহম্মদের এক শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া আপনাদের নগরে মহম্মদের নূতন ধর্ম্ম প্রচারের জন্য প্রত্যাগমন করিল।

যাদ্‌ৰীব নগরে মুসলমান-ধর্ম্ম অল্পকাল মধ্যে প্রচার হইয়া পড়িল।

বিপক্ষের দল মুসলমান ধর্ম্মের প্রচার দেখিয়া ভীত হইল। তাহারা মহম্মদকে গোপনে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। মহম্মদ আর মক্কানগরে অবস্থান নিরাপদ মনে করিলেন না, তিনি স্বজনবর্গ লইয়া যাদ্‌ৰীব নগরে গমন করিলেন। এই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া মুসলমান দিগের কালগণনা আরম্ভ হইয়াছে। যাদ্‌ৰীবে প্রবেশ কাল হইতে মহম্মদের ও মহম্মদীয় ধর্ম্মের গৌরব ছটার বিকাশ হয়। দীনবেশ নিরাহার ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক, এখন হইতে প্রকৃত মালেক হইলেন। বিশালরাজ্যের অধিপতি, অসংখ্য মানব হৃদয়ের নেতা, প্রবল সমাজের প্রবর্ত্তক মহম্মদ, স্বভাবে আচরণে সেই পূর্ব্বের মহম্মদই রহিলেন।

যাদ্‌ৰীব নগর মদিনা (উজ্জ্বল) নামে অভিহিত হইল। মদিনা এখন প্রাচীর

বেষ্টিত সুরক্ষিত সমৃদ্ধিশালী নগর। কিন্তু মহম্মদের সময়ে ইহা গ্রাম সমষ্টি মাত্র ছিল। শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য মহম্মদ ইহাকে পরিখাবেষ্টিত করিয়াছিলেন।

উপাসনা'গৃহের জন্য, মসজিদের আবশ্যক হইল, কথিত আছে এই মসজিদের নির্ম্মাণ কার্য্যে মহম্মদ স্বহস্তে সাহায্য করিয়াছিলেন। অপর অপর প্রয়োজনীয় গৃহ নির্ম্মিত হইল। মহম্মদ মদিনায় বসিয়া আপনার ধর্ম্ম প্রচারে নিরত হইলেন।

মহম্মদ স্বভাবত অতি কোমল প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি স্বজনের ক্লেশ ও দুঃখে অতিশয় অভিভূত হইতেন। তাহার শত্রুগণ তাঁহাকে কামিনীকোমল বলিয়া বিদ্রূপ করিত। আজ সেই মহম্মদ কর্ত্তব্যের দায়ে পড়িয়া, স্বধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য রণ সজ্জায় প্রস্তুত হইলেন।

আহলের নেতৃত্বে মক্কাবাসিগণ সদলে মদিনা আক্রমণ করিল, কিন্তু বদরের যুদ্ধে তাহাদের পরাজয় হইল। এই অসম যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া মুসলমানগণের ধর্ম্ম নেতার প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি হয়। তাহারা বুঝিল যে এই যুদ্ধে জয়লাভ ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহের ফল; ইহা তাহাদের নিজেদের বাহুবলে সাধিত হয় নাই।

এইরূপে মক্কাবাসী ও ইহুদিগের সহিত, আত্মরক্ষা করিতে গিয়া মহম্মদকে অনেক যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। পরিণামে মুসলমানদিগেরই জয় হয়। মক্কা মহম্মদের হস্তগত হইল। ক্রমে সমগ্র আরবজাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখা তাঁহার ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিলে, তিনি বুঝিলেন, পৃথিবীতে তাঁহার কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, ধর্ম্মের বীজ বপন হইয়াছে, এখন উহার বিস্তার অপরের জন্য নির্দ্দিষ্ট রহিল। মহম্মদ মক্কা দর্শনে চলিলেন, তথায় বৎসরকাল বাস করিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়!

মুসলমানদের চক্ষে, মহম্মদ যথার্থ ধর্ম্মের নেতা ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষ।

ভিন্নধর্ম্মীদের কাছেও তাঁহার চরিত্রের মাহাত্ম্য কম নয়।

পিতৃ মাতৃ হীন বালক, জগতে, শৈশবে শ্রেষ্ঠ স্নেহরসে বঞ্চিত হইয়া প্রাকৃতিক প্রপঞ্চে সেই স্নেহের অনুসন্ধান করিল। অসভ্য নিরক্ষর জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রকৃতির পুস্তকে সে আপনার প্রতিভার গুণে, এমনই জ্ঞান উপার্জ্জন করিল যে, তাহার বলে, তাহার মুখনিঃসৃত বাক্যাবলী জগতের ভাষারত্নাবলীর মধ্যে পরিণত হইল। হিরার গিরি গহ্বরে, যোগী মহম্মদ এমনই যোগ সাধনা করিলেন যে তাহার ফলে এমন এক যোগ শাস্ত্রের উৎপত্তি হইল, যাহার যুক্তি খণ্ডন করিতে জগতের ভিন্নধর্ম্মী পণ্ডিতমণ্ডলী ব্যতিব্যস্ত। ধর্ম্মে, কর্ম্মে, এই জগতে সকল মানবের সমান অধিকার, ইহাই মহম্মদের অভিনব শিক্ষা; তাঁহার মতে মনুষ্যের সমাজ সাম্যের সমাজ। এই বৈষম্যপূর্ণ জগতে, তাঁহার এই সাম্য শিক্ষার বলে, মহম্মদীয় সমাজ ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় জগতে এত অল্প কালের মধ্যে আপনার অদ্ভুত কর্ম্ম সাফল্যের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

শ্রীঃ—

স্বরূপোপাসনা সম্পদুপাসনা ও প্রতীকোপাসনা।

আর এই নিম্ন অধিকারেও শ্রেষ্ঠনিকৃষ্ট ভেদ আছে। ফলতঃ বেদান্তে তিনপ্রকারের উপাসনার বিধান আছে। স্বরূপোপাসনা, সম্পদুপাসনা, ও প্রতীকোপাসনা। স্বরূপোপাসনা—ব্রহ্মাত্মৈকত্ববোধ ; তাহাকে প্রকৃতপক্ষে উপাসনা বলা যায় না ; কারণ স্বরূপোপলব্ধিতে উপাস্য-উপাসক ভেদ থাকে না। স্বরূপোপাসনায় যতক্ষণ অধিকার না জন্মে, ততক্ষণ সম্পদুপাসনা বা প্রতীকোপাসনা বিহিত হয় ; ইহার মধ্যে সম্পদুপাসক মধ্যম অধিকারী, প্রতীকোপাসক নিকৃষ্ট অধিকারী।

সম্পদুপাসনা।

দুই বস্তুর মধ্যে কোনো সামান্য ধর্ম্ম দেখিয়া, ক্ষুদ্রতরের সাহায্যে যে বৃহত্তরের জ্ঞান জন্মে, তাহার নাম সম্পদজ্ঞান। ভূগোল শিখিবার কালে ক্ষুদ্র কমলালেবুর সাহায্যে বৃহৎ ও অপরিমেয়প্রায় যে এই পৃথিবী তাহার আকারের জ্ঞান সাধিত হয়, এ জ্ঞান সম্পদজ্ঞান। দৃষ্ট ও পরিমিত কমলা লেবুর সঙ্গে অদৃষ্ট ও অপরিমিত পৃথিবীর আকারের সাদৃশ্য আছে, সুতরাং ভূগোল, পৃথিবী কমলালেবুর মত গোলাকার এই উপদেশ দিয়া, পৃথিবীর আকারের জ্ঞান জন্মায়। পৃথিবী যদি উপাসক হইতেন, তবে কমলালেবু অবলম্বনে তাঁহার যে উপাসনা হইত, তাহাকেই সম্পদুপাসনা বলা যাইতে পারিত।

প্রাণোপাসনা।

প্রাণোপাসনা, ও সূর্য্যোপাসনা উভয়ই সম্পদুপাসনা। নিরাকারবাদীও প্রাণরূপে ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা ইহাকে স্বরূপোপাসনা বলিয়াই গণনা করেন। ফলতঃ প্রাণতত্ত্ব ও পরাতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্বে, প্রভেদ বিস্তর। উপনিষদে ব্রহ্মকে প্রাণরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে—

* * * *

'যিনি সর্ব্বভূতে প্রকাশ পাইতেছেন, তিনি প্রাণ স্বরূপ।' কিন্তু এখানে প্রাণ বলিতে বিশ্বপ্রাণ বোঝায়। জীবে যাহা ধর্ম্মভাবে প্রাণরূপে প্রকাশিত হয়, তাহা নহে, কিন্তু যে নিত্যবস্তুকে আশ্রয় করিয়া এ সকল প্রাণ স্থিতি করিতেছে তাহাকেই এখানে প্রাণ বলা হইয়াছে। এ প্রাণ অদ্বৈত বস্তু। আমার, তোমার, তাহার—এবম্বিধ উপাধি এ প্রাণে আরোপিত হয় না। যাঁহারা ব্রহ্মরূপে আপনার বিশিষ্ট প্রাণের ধ্যান করেন, তাঁহাদের প্রাণাত্মবুদ্ধি নষ্ট হয় নাই। আর এই প্রাণাত্মবুদ্ধি, দেহাত্মবুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ট হইলেও, অবিদ্যান্তর্গত। প্রাণময় কোষ, কোষপঞ্চকের দ্বিতীয় কোষ। বেদান্ত বলেন যে পঞ্চকোষভেদ না হওয়া পর্য্যন্ত

অদ্বৈতব্রহ্মতত্বে জীব কখনো পৌঁছিতে পারে না। সুতরাং প্রাণোপাসনা স্বরূপ-উপাসনার অন্তর্গত বলিয়া গৃহীত হয় না। প্রাণোপাসনা সম্পদুপাসনা। প্রাণের সঙ্গে ব্রহ্মের সামান্যধর্ম্ম আছে। ব্রহ্ম চৈতন্যস্বরূপ, প্রাণ চৈতন্যরূপী। প্রাণের মধ্যে, প্রাণরূপে, প্রাণাবলম্বনে, ব্রহ্মোপাসনা করিতে হইলে, প্রাণের এই চৈতন্যধর্ম্মকেই কেবল ধ্যান করিতে হইবে। প্রাণ যেমন চৈতন্যরূপী, তেমনি জড়দেহেও আবদ্ধ, জড়ের দোষগুণের দ্বারা সর্ব্বদাই স্বল্পবিস্তর অভিভূত হয়। আবার প্রাণ গমনাগমনশীল, প্রকাশাপ্রকাশাধীন। প্রাণের সংসার আছে, সংস্থিতি আছে। এ সকল ব্রহ্মে নাই। সুতরাং সমগ্রপ্রাণকে,—তার জড়সংশ্লিষ্টতা, গতাগতি, জন্মমৃত্যুজরাভিভূতি, প্রভৃতি বর্জ্জন না করিয়া,—উপাসনা, এবং তাহার ধ্যান ধারণার চেষ্টা করিলে, তাহা সম্পদুপাসনা বলিয়া পরিগণিত হইবে না। মূল উপাস্যের সঙ্গে সম্পদের যে সামান্য ধর্ম্ম, তাহাই সম্পদুপাসনার প্রাণ, যখনই ধ্যান এই সামান্য ধর্ম্মকে অতিক্রম করে, তখনই ইহা নষ্ট হইয়া যায়।

সূর্য্যোপাসনা।

প্রাণোপাসনার ন্যায়, সূর্য্যোপাসনাও, বেদান্তে সম্পদুপাসনা বলিয়া পরিগণিত হয়। এখানেও ব্রহ্মের সঙ্গে সূর্য্যের যে সামান্যধর্ম্ম রহিয়াছে, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই কেবল সূর্য্যের উপাসনা করিলে, তাহা সম্পদ্ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, অন্যথা নহে। ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ ও জগৎপ্রকাশক; ব্রহ্ম আপনাকে প্রকাশিত করিতে যাইয়া এই ব্রহ্মাণ্ডকে প্রকাশিত করিয়াছেন ও প্রতিনিয়তই প্রকাশিত করিতেছেন। ইহাই ব্রহ্মচৈতন্যের মূল লক্ষণ। এই অর্থেই ব্রহ্ম জ্ঞান-সূর্য্য। আর এইখানেই ব্রহ্মের সঙ্গে সূর্য্যের সামান্যধর্ম্ম লক্ষিত হয়। কারণ সূর্য্যও স্বয়ং প্রকাশ, অপর কিছু সূর্য্যকে প্রকাশিত করে না, করিতে পারে না; অথচ সূর্য্য, অপর যাহা কিছু দৃষ্ট বস্তু, তৎসমুদায়কে আপনি প্রকাশিত হইতে যাইয়াই তাহার সঙ্গে সঙ্গে, অবশ্যম্ভাবিরূপে, আপনাকে প্রকাশিত করিতেছেন। সূর্য্যের এই স্বয়ংপ্রকাশত্ব ও জগৎপ্রকাশকত্ব ধর্ম্মকে ধ্যানের বিষয়ীভূত করিয়া যে সূর্য্যোপাসনা হয়, তাহাই সম্পদুপাসনা। তদ্বারা ব্রহ্মধ্যানের সহায়তা হয়। তাহাই ব্রহ্মোপাসনার সোপানরূপে পরিগণিত হইতে পারে।

সম্পদুপাসনা ও নিরাকারবাদ।

নির্ব্বিশেষ, নিরাকার ব্রহ্ম বস্তুকে যখন মূল উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়া সেই উপাসনার নিম্নতর সোপানরূপে সম্পদুপাসনা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তখন ইহার দ্বারা যে নিরাকারবাদের বা অপরোক্ষ ব্রহ্মোপাসনার মর্য্যাদাহানি হয়, এমন বলা যায় না। ফলতঃ প্রকৃত ব্রহ্মতত্বের দিক হইতে দেখিলে, খৃষ্টীয়ান, মোহম্মদীয়ান, প্রভৃতি নিরাকারোপাসকাভিমানী ধর্ম্মসম্প্রদায়সকলে যেরূপ উপাসনা প্রচলিত আছে, তাহাও স্বরূপ-উপাসনা বলিয়া গৃহীত হইবে না। খৃষ্টীয়ানেরা ঈশ্বরকে পিতা ও প্রভুরূপে ভজনা করেন। মুসলমান সাধকেরাও তাঁহাকে রাজা ও প্রভু

এবং কথনো কথনো সখারূপেও ভজনা করিয়া থাকেন। আর, সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে ঈশ্বরে পিতৃত্ব, প্রভুত্ব, বা স্বামিত্ব আরোপ করাও সম্পদজ্ঞানেরই লক্ষণ। আধুনিক নিরাকারবাদের আলোচনায় সবিস্তারে এ বিষয়ের বিচার করিব।

প্রতীকোপাসনা ও সাকারবাদ।

প্রতীকোপাসনাই, অতি স্থূলভাবে সাকারোপাসনা বলিয়া বিবেচিত হয়। কাষ্ঠলোষ্ট্রের উপাসনাই প্রকৃত প্রতীকোপাসনা। দেশ-প্রচলিত প্রতিমা-পূজাকে ঠিক প্রতীকোপাসনা বলা যায় কি না, সন্দেহের কথা। কারণ, মূর্ত্তিমাত্রেই যদিও প্রতীক তথাপি ভগবদ্‌স্বরূপের কোনো না কোনো ধর্ম্মের সঙ্গে প্রতিমাদির স্বল্পবিস্তর সামান্যধর্ম্ম প্রকাশেরও চেষ্টা হইয়া থাকে। প্রতিমাপূজাতে এইজন্য সম্পদ ও প্রতীকের মাঝামাঝি একটাভাব আছে। ইহাকে প্রতীকাশ্রিত সম্পদুপাসনা বলা যাইতে পারে। যাহা হৌক, প্রতীকোপাসনাকে বেদান্তে অধ্যাসজনিত উপাসনা বলে। অধ্যাস অর্থ—পরত্রদৃষ্ট অন্যত্রাবভাসঃ—অন্যত্রদৃষ্ট কোনো বস্তুকে, যেস্থানে তাহা প্রকৃতপক্ষে নাই, সেখানে আরোপ করার নাম অধ্যাস। কোনোকালে বনে যে সর্প দৃষ্ট হইয়াছিল, গৃহস্থিত রজ্জুতে সেই সর্পের অস্তিত্ব আরোপ করাকে অধ্যাস বলে। ইহা অধ্যাসের ধর্ম্ম। প্রতীকোপাসনা অধ্যাসজনিত উপাসনা; ইহার অর্থ এই যে শাস্ত্রে শ্রুত, গুরূপদেশে প্রাপ্ত, অথবা আপনার বুদ্ধিতে প্রকাশিত, বা আত্মাতে আভাসরূপে অনুভূত যে ঈশ্বরতত্ত্ব, বা ব্রহ্মতত্ত্ব, তাহাকে, যে বস্তুতে তাহার স্বতঃ প্রকাশ নাই, তাহাতে আরোপ করিয়া, ঈশ্বর বা ব্রহ্মরূপে সে বস্তুর পূজা করাই প্রতীকোপাসনা। এখানেও, সুতরাং, সাধক একেবারে নিরাকার ঈশ্বরতত্ত্বের জ্ঞানবর্জ্জিত নহেন। উপাসনার অবলম্বন সাকার অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইলেও, উপাস্য যিনি, তিনি নিরাকার অতীন্দ্রিয়; প্রতীকোপাসনায়ও এ জ্ঞানের অভাব বা বিলোপ হয় না। সুতরাং প্রতীকোপাসনাকেও প্রকৃত পক্ষে সাকারবাদ বলা যায় না। তবে ইহা নিকৃষ্ট অধিকার, বেদান্ত স্বয়ংই এ কথা স্বীকার করেন।

আধুনিক নিরাকারবাদ।

আমাদের আধুনিক নিরাকারবাদও মোটামুটী সম্পদসোপান পর্য্যন্তই উঠিয়াছে। ভগবানের ইচ্ছা হইলে প্রবন্ধান্তরে ইহার বিস্তৃত আলোচনার চেষ্টা করিব।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

শোনিত-সোপান।

(ফরাসী হইতে)

১

দন্দোলো নিনেতাকে ভাল বাসে।

দন্দোলো যুবাপুরুষ; উহার কালো চোখ্; উহার জলন্ত মুখশ্রীতে কেমন একটা বিশেষত্ব আছে, উহার ভ্রূযুগল সুপরিব্যক্ত এবং উহার চলন ভঙ্গীতে একটা গর্ব্বের ভাব লক্ষিত হয়। বয়স ২০ বৎসর। দন্দোলো যেরূপ শিক্ষা লাভ করিয়াছে সেরূপ শিক্ষা পাইলে রাজপুত্রেরাও কৃতার্থ হয়। এই শিক্ষার জন্য, দন্দোলো তাহার এক খুড়ার নিকট ঋণী। তাহার পিতৃব্য, একটি ক্ষুদ্র পল্লীর বৃদ্ধ পাদ্রি; তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে রোমের একটি উৎকৃষ্ট বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, তাঁহার পিতৃব্য বেশীদিন জীবিত ছিলেন না; যে সময়ে তাঁহার তত্ত্বাবধান ও আশ্রয় বিশেষ আবশ্যক, ঠিক সেই সময়েই দন্দোলো তাহার পিতৃব্যকে হারাইল। যে বয়সে জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবার তেমন সামর্থ্য থাকে না সেই বয়সে দন্দোলোকে সম্পূর্ণরূপে আপনার উপর নির্ভর করিতে হইল। এখন দন্দোলো কি করিবে? তাহার জনক জননীর নিকট আবার ফিরিয়া যাওয়া ভিন্ন তাহার গত্যন্তর ছিল না। পিতা দরিদ্র কৃষক; তাঁহার একটা জোৎ আছে কিন্তু তাহার এখন ধ্বংসাবস্থা; আর একটা ক্ষেত আছে, তাহা হইতেই কোন প্রকারে তাঁহাদের গুজরান চলে। পিতার নিকট হইতে সুপরামর্শ পাইবার জন্যই এখন সে পিতৃগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। এবং মনে মনে করিল যত দিন না তাহার প্রতি ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি হয় ততদিন সে পিত্রালয়েই থাকিবে। ছয় মাস কাল পরিবারের মধ্যে বাস করিয়া, বেচারা দন্দোলের মনে হইল, নিনেতাকে বিবাহ করিলেই সে সুখী হইবে; উহাই তাহার সুখ সৌভাগ্য লাভের একমাত্র উপায়।

নিনেতার অনুপম গঠন সৌন্দর্য্যের,—তাহার অনন্যসাধারণ অনিন্দ্য মুখশ্রীর বর্ণনা করিবার চেষ্টা আমি করিব না। নিনেতা তরুণবয়স্কা ইটালি দেশীয়া রমণী, একজন ধনী জোৎদারের দুহিতা। ইটালীয় রমণী বলাতেই এক কথায় বুঝিয়া লইবে—নিনেতা দন্দোলোর মত একজন যুবা পুরুষের প্রেমের প্রতি অন্ধ ছিল না। দন্দোলো নিনেতাকে যেমন তাহার হৃদয় দান করিয়াছিল, নিনেতাও তাহার প্রতিদানে বিমুখ হয় নাই।

কিন্তু দুইটি প্রাণী পরস্পরকে ভাল বাসিলে, পরস্পরের সহিত হৃদয় বিনিময় করিলেই যথেষ্ট হয় না। উহাদের মিলন, জনক জননীর আশীর্ব্বাদের দ্বারা, প্রচলিত ধর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা পূত হওয়া চাই। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই একদিন মধুর সায়াহ্নে

যখন মৃদুমন্দ সমীরণ কুসুম-সৌরভ বহন করিতেছিল এবং প্রেমিকজনের প্রিয় তারকা সেই শুক-তারা যখন মাঠ ময়দানের ঘাসের উপর স্বকীয় কম্পমান কিরণ বর্ষণ করিতেছিল সেই সময়ে নিনেতা ও দন্দোলো শপথ করিল যে, তাহাদের প্রেমের বন্ধন কখনই ছিন্ন হইবে না—২০ বৎসর বয়সের প্রেমিক যুগল যেরূপ শপথ করিতে পারে ইহা সেইরূপ শপথ—ইহাতে কৃত্রিমতার লেশ মাত্র নাই। কিন্তু নিনেতার মাতা শ্রীমতী ক্লোটিল্দা একজন উচ্চাভিলাষিণী রমণী; যত দিন তিনি দরিদ্র ছিলেন, ধন ঐশ্বর্য্য লাভ করাই তাঁহার এক মাত্র বাসনা ছিল। এখন তিনি ধনী হইয়াছেন, এখন আবার তাঁহার এই সাধ হইয়াছে—নিনেতাকে কোন উচ্চকুলে বিবাহ দিয়া, সেই কুল-গৌরবে তিনিও গৌরবান্বিত হয়েন। এই বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া, তিনি ঐ প্রেমিক যুগলের সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিতে উদ্যত হইলেন। তিনি দেখিলেন, নিনেতার উপর দন্দোলোর ভালবাসা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। দন্দোলো প্রতিদিনই কৃষিক্ষেত্রে আইসে—এক দিনও ফাঁক যায় না। ক্লোটিল্দা সে বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য করিতেও পারেন না; কেন না দন্দোলোর পিতা, ক্লোটিল্দার স্বামীর বাল্য-সহচর ছিলেন। গোড়ায় তিনি উহাদের এই ভালবাসাকে ছেলেমানুসি বলিয়া মনে করিতেন, কিন্তু ক্রমে যখন দেখিলেন, এই ভালবাসা বালকের শুধু একটা খেয়াল মাত্র নহে, বালক বালিকার মনের গভীর দেশে উহার শিকড় নামিতেছে, তখন তিনি স্থির করিলেন, এক আঘাতেই উহাকে নির্ম্মূল করিয়া দিবেন। তাই একদিন দন্দোলোর নিকট স্পষ্ট করিয়া কথাটা পাড়িলেন।

একদিন প্রভাতে, দন্দোলো যেমন প্রতিদিন আসিয়া থাকে, সেইরূপ তাহার বাক্‌দত্তার নিকটে আসিতেছে;—শ্রীমতী ক্লোটিল্দা তাহাকে আট্‌কাইয়া এই কথা বলিলেন:—

"দন্দোলো, তুমি নিনেতাকে ভালবাসো—না?"

হঠাৎ এইরূপ জিজ্ঞাসা করায়, দন্দোলো থতমত খাইয়া গেল, লজ্জায় তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল, সে উত্তর না করিয়া কিছুকাল চুপ্ করিয়া রহিল।

শ্রীমতী ক্লোটিল্দা আবার বলিলেন:—

"মিছে কেন আমার কাছে ঢাক্‌বার চেষ্টা কর্‌চ? আমি আগেই জান্‌তে পেরেছি, আর তুমি যে রকম থতমত খাচ্চ, তাতে কথাটা আরও ঠিক্ বলে মনে হচ্চে।"

দন্দোলো ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল, কোন উত্তর করিল না।

শ্রীমতী বলিতে লাগিলেন:—"নিনেতাকে ভাল বাসিয়াছ সে ভালই, কিন্তু আমার মেয়ে ধনী, আর তুমি দরিদ্র; সে এমন লোকের সহিত বিবাহ করতে পারে, যে ব্যক্তি ধনে নিনেতার সমকক্ষ। বড় বড় জোৎদারের ছেলেরা আমার মেয়েকে বিবাহ করবার জন্য কত চেষ্টা করচে। নিনেতার যে রকম রূপ, যে রকম টাকা কড়ি, তাতে সে আরও উচ্চ বংশে বিবাহ করবার আশা রাখে; এমন কি কোন বড় জমিদারও, এই জোৎদারের মেয়েকে বিবাহ করে' গর্ব্ব অনুভব করতে পারে।

তোমার দারিদ্র্যের হীনতা অনুভব করবার জন্য আমি তোমাকে এ কথা বলচিনে, দারিদ্র্যের জন্য তোমাকে আমি লাঞ্ছনা করচিনে। টাকা কড়িওয়ালা কত ছেলে নিনেতাকে বিবাহ করতে চেয়ে ছিল, কিন্তু তারা নীচ বংশের ব'লে, আমি তাদের প্রার্থনা গ্রাহ্য করি নি। আমি চাই বটে, নিনেতার খুব উচ্চ কুলে বিবাহ হয়, কিন্তু তবু, তোমার যদি টাকা কড়ি থাকৃত, আমি তোমার সঙ্গেই বিবাহ দিতাম। বাছা, আমি এখন যা তোমাকে বল্‌চি,—বেশ বিবেচনা করে দেখ:—তুমি যদি টাকা রোজকার করে ধনী হতে পার, তাহলে আমার মেয়েকে উচ্চকুলে বিবাহ দেবার সংকল্প আমি পরিত্যাগ করি। এর জন্য আমি তোমাকে ৪ বৎসর সময় দিলাম। যাও এখন টাকা কড়ি রোজগার করগে, তারপর ফিরে এসে নিনেতাকে বিবাহ কোরো।

এই উচ্চাভিলাষিণী রমণী সরল-অন্তঃকরণে এই কথা বলিল, না উহাকে শুধু সরাইয়া দিবার জন্য,ছল করিয়া এমন একটা সর্ত্তের কথা বলিল, যাহা তাহার পক্ষে পালন করা দুঃসাধ্য? সে যাই হোক্, শ্রীমতী এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিলেন; দন্দোলোর মাথায় বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল, নানা কুচিন্তা আসিয়া তার মনকে অধিকার করিল।

দন্দোলো অনেকক্ষণ ধরিয়া পায়চালি করিতে করিতে আপনার অদৃষ্টকে ধিক্কার করিতে লাগিল। কিন্তু দন্দোলো দৃঢ়প্রকৃতির লোক; দন্দোলো ভাবিল, যতই কাঁদাকাটি করি না কেন, ঘটনাচক্র ফিরিবার নহে। সে আপনার মন বাঁধিল, ধন উপার্জ্জন করিবার জন্য দৃঢ়সংকল্প হইল। তাকে শুধু চার বৎসর সময় দেওয়া হইয়াছে। চারি বৎসর অতীত হইলেই, শ্রীমতী ক্লোটিলদা স্বকীয় অঙ্গীকার হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন। তখন নিনেতা অপরের ধর্ম্মপত্নী হইবে। এই চিন্তায় সে ব্যাকুল হইয়া পড়িল। কিন্তু আশাই যৌবনের চিরসুহৃৎ; আশা বলিল, আমার অবস্থার পরিবর্ত্তন হইলেও হইতে পারে। দন্দোলো ভাবিল,—নিনেতার জন্য, নিনেতার ভালবাসার জন্য, এ পৃথিবীতে অসাধ্য কি আছে?

পর দিনই, দন্দোলো প্রস্থান করিল। অবশ্য প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে, নিনেতার নিকট শেষ বিদায় গ্রহণ করিল এবং তাহার ভালবাসার কখনও ক্ষয় হইবে না এই বলিয়া নিনেতাকে আবার শপথ করাইয়া লইল। দন্দোলো এখন কোথায় যাইতেছে? কি করিবে?—সে তার কিছুই জানে না; শুধু জানে একটা কাজ করিতে হইবে; কি উপায়ে সে কাজ সুসিদ্ধ হইবে সে তাহা জানে না। তাহার মনে শুধু এই কথাটি জাগিতেছে—ধনী হইতে হইবে, নিনেতাকে বিবাহ করিতে হইবে।

২

আকাশে তারা ঝিক্ মিক্ করিতেছে, সোঁ সোঁ করিয়া বাতাস বহিতেছে, বাতাসে অরণ্যের গাছগুলা আন্দোলিত হইতেছে। মধ্যে মধ্যে ঝোপ্‌ঝাপের উপর দিয়া পাথর গড়াইয়া পড়িতেছে, গাছের ডাল-পালা নড়িতেছে, অরণ্যের মধ্যে যে দুই একটা পরিষ্কার খোলা জমি আছে, তাহার উপর জ্যোৎস্না পড়িয়াছে এবং সেই

জ্যোৎস্নার উপর কতকগুলি ছায়া অঙ্কিত হইয়াছে। ফুসফুস কথা ও ডাকাডাকির কণ্ঠস্বর শুনা যাইতেছে, তাহাতেই জানা যাইতেছে, এই নিভৃত নির্জ্জন স্থানে মানুষ আছে। এই মানুষগুলা কে? এবং কি উদ্দেশ্যেই বা এহেন সময়ে দুরারোহ পর্ব্বতের উপর উঠিতেছে?—আমরা কিছুই বলিব না; উহাদের কথাতেই তাহা প্রকাশ পাইবে।

একটা লোক—আচ্ছাদন বস্ত্রে আপাদ মস্তক আবৃত—একটা ত্রিশফুট লম্বা মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া একটা হাঁক্ দিল। এই সঙ্কেত-ধ্বনির পর, লোকের কোলাহল আরও ঘন ঘন শুনা যাইতে লাগিল এবং একটু পরেই, একই রকম বস্ত্রাবৃত আরও ১৪ জন লোক ঐ লোকটাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। উহাদের উদ্ভট পরিচ্ছদ, এই নৈশ দৃশ্যের সহিত বেশ খাপ খাইয়াছে।

প্রথমে যে হাঁক্ দিয়াছিল, সেই বোধ হয় উহাদের সর্দ্দার। সে বলিয়া উঠিল:—

"সবাই হাজির?"

এই কথায়, ১৪ জন লোক সারিবন্দি হইয়া দাঁড়াইল, এবং তাহাদের প্রত্যেকের নাম একে একে উচ্চারিত হইতে লাগিল, আর প্রত্যেকেই জবাব দিতে লাগিল:—

"এই আমি।"

সর্দ্দারের নাম ফর্জা। সর্দ্দার, এক দল লোককে এইরূপ বলিল:—"আজ্‌কের লুটের মাল্‌টা ভাল ত? আজ হুজুর-বাহাদুর মাকাস্‌তেলো শুধু একজন লোক সঙ্গে করে' রোমে গিয়েছিলেন, তাঁকে থলি-ঝাড়া করেছ ত? মোহরগুলা সব হাতিয়েছ ত? তাঁর হীরকগুলা তোমাদের হাতে এসেছে ত? একে লোকটার বিপুল দেহ, তাতে আবার সঙ্গে টাকার বোঝা, তিনি যতদূর যাবেন মনে করেছিলেন ততটা কি যেতে পেরেছিলেন?"

"আমরা বেশ কাজ গুছিয়েছি—এই দেখ আমাদের লুটের মাল।" ফর্জা যাহাকে সম্বোধন করিয়া কথা বলিতেছিল, সে এইরূপ উত্তর দিয়া একটা টাকার থলিয়া ঝাঁকাইতে লাগিল এবং তাহার মধ্যে হইতে কতকগুলা হীরক ঝিক্‌মিক্ করিয়া উঠিল।

—"বেশ বেশ! খুব ভাল! আর তুমি পাওলো, তুমি কি পেলে?"—"এই বনের ধারে একটি বালিকাকে দেখ্‌তে পেলুম; তার গলায় একটা সুন্দর হার ছিল, মেয়েটা দেখ্‌তেও বেশ সুশ্রী; আমি যেই চুমো খেতে গেলুম, অমনি সে মূর্চ্ছা গেল; আমি তখন তার গলা থেকে হারটা খুলে নিলুম, আর তার গলার মত টুক্‌টুকে ঠোঁটে একটা চুমো খেলুম।"

—"আর তুমি জ্যাকপো?"

—"কৌণ্ট রাঞ্জেটির দাসীর আমি নেক্‌-নজরে পড়ে গিয়েছি, সে আমার সহিত বন্ধুর মত ব্যবহার করে; আর কিছুদিন পরেই তার মনিবের রাজবাটীতে আমি স্বচ্ছন্দে গতিবিধি করতে পারব। তার পরে যা হবে তা বলা বাহুল্য।"

—"আর তুমি মার্কো? যার হাত তুমি বেঁধে রেখেছ, ও যে তোমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে ও লোকটা কে? কি বিষণ্ণ মুখ! একেবারে মড়ার মত ফ্যাকাশে।"

—"ওকে আমরা বনের মধ্যে পেয়েছি।

ওর চেহারাটা একজন বড় আমীরের মত; দেখুন না, কেমন সুন্দর পোষাক পরেছে! আমরা ওর পকেট হাত্‌ড়াবার সময় কিছু পাইনি; মনে করলুম, যদি পকেটে কিছু না পাই, ওর কাপড় বিক্রী করে' আমাদের পরিশ্রমের ক্ষতি পূরণ করব। তাই ওকে এখানে এনেছি। 'যখন দেখ্‌লে, ওর কাকুতি-মিনতি আমরা কিছুই শুনলুম না, তখন থেকে ও একেবারে চুপ হয়ে আছে।"

—"তা বেশ্‌ হয়েছে, ওর পোষাকটা খুলে নিতে এখনি হুকুম দেব।"

এই নূতন ব্যক্তির সম্বন্ধে আর বেশী কিছু আলোচনা না করিয়া, ফর্জ্জা পূর্ব্বের মত আবার প্রশ্ন করিতে লাগিল এবং সকলেই আপনার আপনার দৈনিক কাজের হিসাব দিতে লাগিল। ফর্জ্জা বলিল:—

"তোমরা একটা কথা বল্‌তে ভুলে গেছ; আমি এই পর্ব্বতের তলায়, আমার পায়ের কাছে একটা মড়া পেয়েছিলুম, তার গা থেকে কাপড় চোপড় কে খুলে নিয়েছে; তার ক্ষত জায়গা থেকে এখনও রক্ত ঝরচে; মনে হয় এই সবেমাত্র কে খুন করেছে; তোমাদের মধ্যে কে তাকে মেরেছে বল। আমি তোমাদের পুরাতন সর্দ্দার—আমার কাছে খুলে বল। কি! তবে কি তোরা আমার কাছে লুকোচ্ছিস্‌?"

—"কি! তোরা কবুল করবিনে?"

এইবার উহারা একটা কৈফিয়ৎ দিল। সকলেই শপথ করিয়া বলিল, এই হত্যাকাণ্ডে তাহারা কেহই লিপ্ত নহে।

তখন ফর্জ্জা হাসিয়া বলিল,—"আমাদের ব্যবসায়ে না জানি কে আবার আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে আরম্ভ করলে।" এই রসিকতায়, দস্যুরা খুব উল্লসিত হইয়া উঠিল; এতক্ষণ উহারা যেরূপ গোম্‌সা মুখ করিয়াছিল, উহাদের সেই গোম্‌সা ভাবটা চলিয়া গেল। কেবল একজন এই উল্লাসহিল্লোলে কোন যোগ দেয় নাই;—যার হাত বাঁধা ছিল সে বেচারার মুখ হইতে এ পর্য্যন্ত একটি কথাও বাহির হয় নাই। দস্যুদের মধ্যে একজন ইহা লক্ষ্য করিয়াছিল, সে কৌটিল্য সহকারে তাহার সঙ্গীদিগকে এই কথাটা জানাইয়া দিল। এই সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিবামাত্র, ঐ অপরিচিত ব্যক্তির প্রতি আবার সকলের মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। তাহাদের সর্দ্দার ফর্জ্জা তাহাকে প্রশ্ন করিল:—

"এ সময়ে এই বনে তুমি কি করতে এসেছিলে? তোমার এই পোষাক যদি ইটালি দেশীয় কৌণ্টের পোষাক না হ'ত, তা হ'লে তোমাকে একজন হতভাগা দরিদ্র ঠাওরাতুম;—আর, তা হলে তোমাকে আমাদের দলেও নিতুম, কিন্তু যখন দেখা যাচ্চে তুমি আমাদের ব্যবসায়ী নও—তোমার ঐ পোষাকটা আমাদের দিতে হবে, আমাদের কৌণ্ট সাজবার দরকার হলে, ঐ পোষাকটা আমাদের কাজে লাগ্‌বে। দেখ্‌ পাওলো, আমাদের একটা মোটা কাপড়ের হাত-কাটা লম্বা কোর্ত্তা নিয়ে আয় তো। ভদ্রলোকটির পোষাকের সঙ্গে আমরা বদ্‌লাবদলি করব—নৈলে, রাত্রের শীতে ওঁর বড় কষ্ট হবে।" অপরিচিত ব্যক্তি উত্তর করিল:—

"আমি পথ ভুলে এসেছি...দোহাই তোমাদের, আমাকে প্রাণে মেরো না।"

"আমরা তোমার প্রাণ নিতে চাইনে;

দেখ আমরা ইচ্ছা করে কারও রক্তপাত করিনে; তোমার পোষাক খুলে আমাদের দেও; তার পর তুমি যেতে পার, এখানে থাকতেও পার, যা' তোমার খুশি করতে পার। এমন কি আমাদের সামান্য ভোজনেও তুমি যোগ দিতে পার, আমাদের আহার প্রস্তুত।" অপরিচিত ব্যক্তি বলিল :—

"আমার উপর নির্দ্দয় হয়ো না, আমাকে এই বস্ত্র হতে বঞ্চিত কোরো না; তোমরা জান না, এই বস্ত্রটা অল্প মূল্যের হ'লেও, এর উপর আমার জীবনের কতটা নির্ভর করচে; আমার সমস্ত ভবিষ্যৎটাই এই বস্ত্রের মধ্যে রয়েছে; দোহাই তোমাদের,এই বস্ত্র আমার গা থেকে খুলে নিয়ো না; কিছু দিনের মধ্যেই তোমাদের এই ঋণ আমি সুদ সমেত পরিশোধ করব।"

"তুমি দেখছি আমাদের নিতান্ত আনাড়ি ভেবেছ। তুমি মনে করেছ তোমার এই লোভানিতে আমরা ভুলে যাব? তোমার কাছ থেকে আমরা কি পাব তা বেশ জানি; তুমি এখান থেকে চলে গেলেই, আমাদের পিছনে পুলিস লেলিয়ে দেবে, কিন্তু তাতে আমরা ভয় করিনে; সে সন্ধান আমরা আগে থাকতেই পাব।"

যখন এই কথা বার্ত্তা চলিতেছিল ঐ অপরিচিত ব্যক্তি,চারি পার্শ্বের লোকের লুব্ধ দৃষ্টি হইতে একটা রত্ন-কৌটা লুকাইবার চেষ্টা করিতেছিল, অবশেষে তার পায়ের কাছে একটা পাথর পড়িয়া আছে দেখিয়া তাহার পিছনে কৌটাটা গুঁজিয়া রাখিল; কিন্তু সেই কৌটার গায়ে একটা হীরা বসানো ছিল,চাঁদের আলোয় সেই হীরাটা ঝিক্ মিক্ করিয়া উঠিল; একজন দস্যুর নজরে পড়ায়, সেই কৌটাটা সে কুড়াইয়া লইয়া বলিল :—

"একটা খুব সরেশ মাল পাওয়া গেছে।"

"ওঃ! ওটা আমকে ফিরিয়ে দেও, ওটা আমাকে ফিরিয়ে দেও; ওটা আমার জীবন, আমার সুখ, আমার যথাসর্ব্বস্ব!" এই কথায় একটা হাসির গর্‌রা উঠিল। ফর্জ্জা আবার আরম্ভ করিল :—

"আমাদের কাছ থেকে জিনিসটা বুঝি হুজুর বাহাদুর চুরি করবেন মনে করেছিলেন। এখন বুঝতে পারচি, পোষাকটা খুলে দিতে আপনি কেন এত নারাজ।"কৌণ্টের পোষাক-পরা লোকটা হতাশ হইয়া পড়িল। "হা ভগবান্! হা ভগবান্! আমি আমার সর্ব্বস্ব খোয়ালুম আমার দুষ্কর্ম্ম-অর্জ্জিত ফলটা পর্য্যন্ত হারালুম!" এই কথা গুলি এত মৃদুস্বরে,বলিল যে দস্যুরা তা শুনিতে পাইল না; কিন্তু তাহারা দেখিল, উহার মুখের অবয়ব-রেখা কুঞ্চিত হইতেছে, চক্ষু দিয়া অগ্নি ছুটিতেছে; এবং যখন সে ঐ কৌটাটা দস্যুদের সম্মুখে ফেলিয়া দিল, তখন তাহার হাত কাঁপিতে ছিল; তার অঙ্গগুলা অসংযত ভাবে এক একবার ঝাকি দিয়া উঠিতেছিল। এই সমস্ত দেখিয়া তাহারা বুঝিল, তাহার অন্তরের মধ্যে কি একটা ভয়ানক যুঝাযুঝি চলিতেছে; ধন লালসায় কিংবা কতকগুলা হীরা খোয়া গেল বলিয়া যে তাহার চোখ দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে তাহা নহে। অশক্ত নিষ্ফল ক্রোধের অন্তরালে নিশ্চয়ই আরও কোন আবেগ প্রচ্ছন্ন আছে।

দস্যুরা কৌটাটা লইয়া ফর্জ্জার হাতে দিল; ফর্জ্জা তাহার দলবলের সমক্ষে

দেখ আমরা ইচ্ছা করে কারও রক্তপাত করিনে; তোমার পোষাক খুলে আমাদের দেও; তার পর তুমি যেতে পার, এখানে থাক্‌তেও পার, যা' তোমার খুশি করতে পার। এমন কি আমাদের সামান্য ভোজনেও তুমি যোগ দিতে পার, আমাদের আহার প্রস্তুত।" অপরিচিত ব্যক্তি বলিল :—

"আমার উপর নির্দ্দয় হয়ো না, আমাকে এই বস্ত্র হতে বঞ্চিত কোরো না; তোমরা জান না, এই বস্ত্রটা অল্প মূল্যের হ'লেও, এর উপর আমার জীবনের কতটা নির্ভর করচে; আমার সমস্ত ভবিষ্যৎটাই এই বস্ত্রের মধ্যে রয়েছে; দোহাই তোমাদের, এই বস্ত্র আমার গা থেকে খুলে নিয়ো না; কিছু দিনের মধ্যেই তোমাদের এই ঋণ আমি সুদ সমেত পরিশোধ করব।"

"তুমি দেখছি আমাদের নিতান্ত আনাড়ি ভেবেছ। তুমি মনে করেছ তোমার এই লোভানিতে আমরা ভুলে যাব? তোমার কাছ থেকে আমরা কি পাব তা বেশ জানি; তুমি এখান থেকে চলে গেলেই, আমাদের পিছনে পুলিস লেলিয়ে দেবে, কিন্তু তাতে আমরা ভয় করিনে; সে সন্ধান আমরা আগে থাক্‌তেই পাব।"

যখন এই কথা বার্ত্তা চলিতেছিল ঐ অপরিচিত ব্যক্তি, চারি পার্শ্বের লোকের লুব্ধ দৃষ্টি হইতে একটা রত্ন-কৌটা লুকাইবার চেষ্টা করিতেছিল, অবশেষে তার পায়ের কাছে একটা পাথর পড়িয়া আছে দেখিয়া তাহার পিছনে কৌটাটা গুঁজিয়া রাখিল; কিন্তু সেই কৌটার গায়ে একটা হীরা বসানো ছিল, চাঁদের আলোয় সেই হীরাটা ঝিক্ মিক্ করিয়া উঠিল; একজন দস্যুর নজরে পড়ায়, সেই কৌটাটা সে কুড়াইয়া লইয়া বলিল :—

"একটা খুব সরেশ মাল পাওয়া গেছে।"

"ওঃ! ওটা আমাকে ফিরিয়ে দেও, ওটা আমাকে ফিরিয়ে দেও; ওটা আমার জীবন, আমার সুখ, আমার যথাসর্ব্বস্ব!" এই কথায় একটা হাসির গর্‌রা উঠিল। কর্ত্তা আবার আরম্ভ করিল :—

"আমাদের কাছ থেকে জিনিসটা বুঝি হুজুর বাহাদুর চুরি করবেন মনে করেছিলেন। এখন বুঝতে পারচি, পোষাকটা খুলে দিতে আপনি কেন এত নারাজ।" কৌপ্তের পোষাক-পরা লোকটা হতাশ হইয়া পড়িল। "হা ভগবান্! হা ভগবান্! আমি আমার সর্ব্বস্ব খোয়ালুম আমার দুষ্কর্ম্ম-অর্জ্জিত ফলটা পর্য্যন্ত হারালুম!" এই কথা গুলি এত মৃদুস্বরে বলিল যে দস্যুরা তা শুনিতে পাইল না; কিন্তু তাহারা দেখিল, উহার মুখের অবয়ব-রেখা কুঞ্চিত হইতেছে, চক্ষু দিয়া অগ্নি ছুটিতেছে; এবং যখন সে ঐ কৌটাটা দস্যুদের সম্মুখে ফেলিয়া দিল, তখন তাহার হাত কাঁপিতে ছিল; তার অঙ্গগুলা অসংযত ভাবে এক একবার ঝাঁকি দিয়া উঠিতেছিল। এই সমস্ত দেখিয়া তাহারা বুঝিল, তাহার অন্তরের মধ্যে কি একটা ভয়ানক যুঝাযুঝি চলিতেছে; ধন লালসায় কিংবা কতকগুলা হীরা খোয়া গেল বলিয়া যে তাহার চোখ দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে তাহা নহে। অশক্ত নিষ্ফল ক্রোধের অন্তরালে নিশ্চয়ই আরও কোন আবেগ প্রচ্ছন্ন আছে।

দস্যুরা কৌটাটা লইয়া কর্ত্তার হাতে দিল; কর্ত্তা তাহার দলবলের সমক্ষে

ওর চেহারাটা একজন বড় আমীরের মত; দেখুন না, কেমন সুন্দর পোষাক পরেছে! আমরা ওর পকেট হাত্ড়াবার সময় কিছু পাইনি; মনে করলুম, যদি পকেটে কিছু না পাই, ওর কাপড় বিক্রী করে' আমাদের পরিশ্রমের ক্ষতি পূরণ করব। তাই ওকে এখানে এনেছি। যখন দেখ্‌লে, ওর কাকুতি-মিনতি আমরা কিছুই শুনলুম না, তখন থেকে ও একেবারে চুপ হয়ে আছে।"

—"তা বেশ হয়েছে, ওর পোষাকটা খুলে নিতে এখনি হুকুম দেব।"

এই নূতন ব্যক্তির সম্বন্ধে আর বেশী কিছু আলোচনা না করিয়া, ফর্জ্জা পূর্ব্বের মত আবার প্রশ্ন করিতে লাগিল এবং সকলেই আপনার আপনার দৈনিক কাজের হিসাব দিতে লাগিল। ফর্জ্জা বলিল:—

"তোমরা একটা কথা বল্‌তে ভুলে গেছ; আমি এই পর্ব্বতের তলায়, আমার পায়ের কাছে একটা মড়া পেয়েছিলুম, তার গা থেকে কাপড় চোপড় কে খুলে নিয়েছে; তার ক্ষত জায়গা থেকে এখনও রক্ত ঝর্‌চে; মনে হয় এই সবেমাত্র কে খুন করেছে; তোমাদের মধ্যে কে তাকে মেরেছে বল। আমি তোমাদের পুরাতন সর্দ্দার—আমার কাছে খুলে বল। কি! তবে কি তোরা আমার কাছে লুকোচ্ছিস্‌?"

—"কি! তোরা কবুল করবিনে?"

এইবার উহারা একটা কৈফিয়ৎ দিল। সকলেই শপথ করিয়া বলিল, এই হত্যাকাণ্ডে তাহারা কেহই লিপ্ত নহে।

তখন ফর্জ্জা হাসিয়া বলিল,—"আমাদের ব্যবসায়ে না জানি কে আবার আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে আরম্ভ কর্‌লে।" এই রসিকতায়, দস্যুরা খুব উল্লসিত হইয়া উঠিল; এতক্ষণ উহারা যেরূপ গোম্‌সা মুখ করিয়াছিল, উহাদের সেই গোম্‌সা ভাবটা চলিয়া গেল। কেবল একজন এই উল্লাসহিল্লোলে কোন যোগ দেয় নাই;—যার হাত বাঁধা ছিল সে বেচারার মুখ হইতে এ পর্য্যন্ত একটি কথাও বাহির হয় নাই। দস্যুদের মধ্যে একজন ইহা লক্ষ্য করিয়াছিল, সে কৌটিল্য সহকারে তাহার সঙ্গীদিগকে এই কথাটা জানাইয়া দিল। এই সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিবামাত্র, ঐ অপরিচিত ব্যক্তির প্রতি আবার সকলের মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। তাহাদের সর্দ্দার ফর্জ্জা তাহাকে প্রশ্ন করিল:—

"এ সময়ে এই বনে তুমি কি কর্‌তে এসেছিলে? তোমার এই পোষাক যদি ইটালি দেশীয় কৌণ্টের পোষাক না হ'ত, তা হ'লে তোমাকে একজন হতভাগা দরিদ্র ঠাওরাতুম;—আর, তা হলে তোমাকে আমাদের দলেও নিতুম, কিন্তু যখন দেখা যাচ্চে তুমি আমাদের ব্যবসায়ী নও—তোমার ঐ পোষাকটা আমাদের দিতে হবে, আমাদের কৌণ্ট সাজবার দরকার হলে, ঐ পোষাকটা আমাদের কাজে লাগ্‌বে। দেখ্‌ পাওলো, আমাদের একটা মোটা কাপড়ের হাত-কাটা লম্বা কোর্ত্তা নিয়ে আয় তো। ভদ্রলোকটির পোষাকের সঙ্গে আমরা বদ্‌লাবদলি করব—নৈলে, রাত্রের শীতে ওঁর বড় কষ্ট হবে।" অপরিচিত ব্যক্তি উত্তর করিল:—

"আমি পথ ভুলে এসেছি…দোহাই তোমাদের, আমাকে প্রাণে মেরো না।"

"আমরা তোমার প্রাণ নিতে চাইনে;

জ্যোৎস্নার উপর কতকগুলি ছায়া অঙ্কিত হইয়াছে। ফুসফুস কথা ও ডাকা-ডাকির কণ্ঠস্বর শুনা যাইতেছে, তাহাতেই জানা যাইতেছে, এই নিভৃত নির্জ্জন স্থানে মানুষ আছে। এই মানুষগুলা কে? এবং কি উদ্দেশ্যেই বা এহেন সময়ে দুরারোহ পর্ব্বতের উপর উঠিতেছে?—আমরা কিছুই বলিব না; উহাদের কথান্তেই তাহা প্রকাশ পাইবে।

একটা লোক—আচ্ছাদন বস্ত্রে আপাদ মস্তক আবৃত—একটা ত্রিশফুট লম্বা মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া একটা হাঁক্ দিল। এই সঙ্কেত-ধ্বনির পর, লোকের কোলাহল আরও ঘন ঘন শুনা যাইতে লাগিল এবং একটু পরেই, একই রকম বস্ত্রাবৃত আরও ১৪ জন লোক ঐ লোকটাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। উহাদের উদ্ভট পরিচ্ছদ,এই নৈশ দৃশ্যের সহিত বেশ খাপ খাইয়াছে।

প্রথমে যে হাঁক্ দিয়াছিল, সেই বোধ হয় উহাদের সর্দ্দার। সে বলিয়া উঠিল :—

"সবাই হাজির?"

এই কথায়, ১৪ জন লোক সারিবন্দি হইয়া দাঁড়াইল, এবং তাহাদের প্রত্যেকের নাম একে একে উচ্চারিত হইতে লাগিল, আর প্রত্যেকেই জবাব দিতে লাগিল :—

"এই আমি।"

সর্দ্দারের নাম ফর্জা। সর্দ্দার, এক দল লোককে এইরূপ বলিল :—"আজ্‌কের লুটের মাল্‌টা ভাল ত? আজ হুজুর-বাহাদুর মাকাস্‌তেলো শুধু একজন লোক সঙ্গে করে' রোমে গিয়েছিলেন, তাঁকে থলি-ঝাড়া করেছ ত? মোহরগুলা সব হাতিয়েছ ত? তাঁর হীরকগুলা তোমাদের হাতে এসেছে ত? একে লোকটার বিপুল দেহ, তাতে আবার সঙ্গে টাকার বোঝা, তিনি যতদূর যাবেন মনে করেছিলেন ততটা কি যেতে পেরেছিলেন?"

"আমরা বেশ কাজ গুছিয়েছি—এই দেখ আমাদের লুটের মাল।" ফর্জা যাহাকে সম্বোধন করিয়া কথা বলিতেছিল, সে এইরূপ উত্তর দিয়া একটা টাকার থলিয়া ঝাঁকাইতে লাগিল এবং তাহার মধ্যে হইতে কতকগুলা হীরক ঝিক্‌মিক্ করিয়া উঠিল।

—"বেশ বেশ! খুব ভাল! আর তুমি পাওলো, তুমি কি পেলে?"—"এই বনের ধারে একটি বালিকাকে দেখ্‌তে পেলুম; তার গলায় একটা সুন্দর হার ছিল, মেয়েটী দেখ্‌তেও বেশ সুশ্রী; আমি যেই চুমো খেতে গেলুম, অমনি সে মূর্চ্ছা গেল; আমি তখন তার গলা থেকে হারটা খুলে নিলুম, আর তার গলার মত টুক্‌টুকে ঠোঁটে একটা চুমো খেলুম।"

—"আর তুমি জ্যাকপো?"

—"কৌণ্ট রাঙ্গেন্টির দাসীর আমি নেক্-নজরে পড়ে গিয়েছি, সে আমার সহিত বন্ধুর মত ব্যবহার করে; আর কিছুদিন পরেই তার মনিবের রাজবাটীতে আমি স্বচ্ছন্দে গতিবিধি করতে পারব। তার পরে যা হবে তা বলা বাহুল্য।"

—"আর তুমি মার্কো? যার হাত তুমি বেঁধে রেখেছ, ও যে তোমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে ও লোকটা কে? কি বিষণ্ণ মুখ! একেবারে মড়ার মত ফ্যাকাশে।"

—"ওকে আমরা বনের মধ্যে পেয়েছি।

তোমার দারিদ্র্যের হীনতা অনুভব করবার জন্য আমি তোমাকে এ কথা বলচিনে, দারিদ্র্যের জন্য তোমাকে আমি লাঞ্ছনা করচিনে। টাকা কড়িওয়ালা কত ছেলে নিনেতাকে বিবাহ করতে চেয়ে ছিল, কিন্তু তারা নীচ বংশের ব'লে, আমি তাদের প্রার্থনা গ্রাহ্য করি নি। আমি চাই বটে, নিনেতার খুব উচ্চ কুলে বিবাহ হয়, কিন্তু তবু, তোমায় যদি টাকা কড়ি থাক্‌ত, আমি তোমার সঙ্গেই বিবাহ দিতাম। বাছা, আমি এখন যা তোমাকে বল্‌চি,—বেশ বিবেচনা করে দেখ:—তুমি যদি টাকা রোজকার করে ধনী হতে পার, তাহলে আমার মেয়েকে উচ্চকুলে বিবাহ দেবার সংকল্প আমি পরিত্যাগ করি। এর জন্য আমি তোমাকে ৪ বৎসর সময় দিলাম। যাও এখন টাকা কড়ি রোজগার করগে, তারপর ফিরে এসে নিনেতাকে বিবাহ কোরো।

এই উচ্চাভিলাষিণী রমণী সরল-অন্তঃকরণে এই কথা বলিল, না উহাকে শুধু সরাইয়া দিবার জন্য,ছল করিয়া এমন একটা সর্ত্তের কথা বলিল, যাহা তাহার পক্ষে পালন করা দুঃসাধ্য? সে যাই হোক্, শ্রীমতী এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিলেন; দন্দোলোর মাথায় বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল, নানা কুচিন্তা আসিয়া তার মনকে অধিকার করিল।

দন্দোলো অনেকক্ষণ ধরিয়া পায়চালি করিতে করিতে আপনার অদৃষ্টকে ধিক্কার করিতে লাগিল। কিন্তু দন্দোলো দৃঢ়প্রকৃতির লোক; দন্দোলো ভাবিল, যতই কাঁদাকাটি করি না কেন, ঘটনাচক্র ফিরিবার নহে। সে আপনার মন বাঁধিল, ধন উপার্জ্জন করিবার জন্য দৃঢ়সংকল্প হইল। তাকে শুধু চার বৎসর সময় দেওয়া হইয়াছে। চারি বৎসর অতীত হইলেই, শ্রীমতী ক্লোটিলদা স্বকীয় অঙ্গীকার হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন। তখন নিনেতা অপরের ধর্ম্মপত্নী হইবে। এই চিন্তায় সে ব্যাকুল হইয়া পড়িল। কিন্তু আশাই যৌবনের চিরসুহৃৎ; আশা বলিল, আমার অবস্থার পরিবর্ত্তন হইলেও হইতে পারে। দন্দোলো ভাবিল,—নিনেতার জন্য, নিনেতার ভালবাসার জন্য, এ পৃথিবীতে অসাধ্য কি আছে?

পর দিনই, দন্দোলো প্রস্থান করিল। অবশ্য প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে, নিনেতার নিকট শেষ বিদায় গ্রহণ করিল এবং তাহার ভালবাসার কখনও ক্ষয় হইবে না এই বলিয়া নিনেতাকে আবার শপথ করাইয়া লইল। দন্দোলো এখন কোথায় যাইতেছে? কি করিবে?—সে তার কিছুই জানে না; শুধু জানে একটা কাজ করিতে হইবে; কি উপায়ে সে কাজ সুসিদ্ধ হইবে সে তাহা জানে না। তাহার মনে শুধু এই কথাটি জাগিতেছে—ধনী হইতে হইবে, নিনেতাকে বিবাহ করিতে হইবে।

২

আকাশে তারা ঝিক্ মিক্ করিতেছে, সোঁ সোঁ করিয়া বাতাস বহিতেছে, বাতাসে অরণ্যের গাছগুলা আন্দোলিত হইতেছে। মধ্যে মধ্যে ঝোপ্‌ঝাপের উপর দিয়া পাথর গড়াইয়া পড়িতেছে, গাছের ডাল-পালা নড়িতেছে, অরণ্যের মধ্যে যে দুই একটা পরিষ্কার খোলা জমি আছে, তাহার উপর জ্যোৎস্না পড়িয়াছে এবং সেই

যখন মৃদুমন্দ সমীরণ কুসুম-সৌরভ বহন করিতেছিল এবং প্রেমিকজনের প্রিয় তারকা সেই শুক-তারা যখন মাঠ ময়দানের ঘাসের উপর স্বকীয় কম্পমান কিরণ বর্ষণ করিতে ছিল সেই সময়ে নিনেতা ও দন্দোলো শপথ করিল যে, তাহাদের প্রেমের বন্ধন কখনই ছিন্ন হইবে না—২০ বৎসর বয়সের প্রেমিক যুগল যেরূপ শপথ করিতে পারে ইহা সেই-রূপ শপথ—ইহাতে কৃত্রিমতার লেশ মাত্র নাই। কিন্তু নিনেতার মাতা শ্রীমতী ক্লোটিল্‌দা একজন উচ্চাভিলাষিণী রমণী; যত দিন তিনি দরিদ্র ছিলেন, ধন ঐশ্বর্য্য লাভ করাই তাঁহার এক মাত্র বাসনা ছিল। এখন তিনি ধনী হইয়াছেন, এখন আবার তাঁহার এই সাধ হইয়াছে—নিনেতাকে কোন উচ্চকুলে বিবাহ দিয়া, সেই কুল-গৌরবে তিনিও গৌরবান্বিত হয়েন। এই বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া, তিনি ঐ প্রেমিক যুগলের সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিতে উদ্যত হইলেন। তিনি দেখিলেন, নিনেতার উপর দন্দোলোর ভালবাসা দিন দিন বৃদ্ধি পাই-তেছে। দন্দোলো প্রতিদিনই কৃষিক্ষেত্রে আইসে - এক দিনও ফাঁক যায় না। ক্লোটিল্‌দা সে বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য করিতেও পারেন না; কেন না দন্দোলোর পিতা, ক্লোটিল্‌দার স্বামীর বাল্য-সহচর ছিলেন। গোড়ায় তিনি উঁহাদের এই ভালবাসাকে ছেলেমানুসি বলিয়া মনে করিতেন, কিন্তু ক্রমে যখন দেখিলেন, এই ভালবাসা বালকের শুধু একটা খেয়াল মাত্র নহে, বালক বালিকার মনের গভীর দেশে উহার শিকড় নামিতেছে, তখন তিনি স্থির করিলেন, এক আঘাতেই উহাকে নির্ম্মূল করিয়া দিবেন। তাই একদিন দন্দোলোর নিকট স্পষ্ট করিয়া কথাটা পাড়িলেন।

একদিন প্রভাতে, দন্দোলো যেমন প্রতি দিন আসিয়া থাকে, সেইরূপ তাহার বাক্‌দত্তার নিকটে আসিতেছে;—শ্রীমতী ক্লোটিল্‌দা তাহাকে আট্‌কাইয়া এই কথা বলিলেন:—

"দন্দোলো, তুমি নিনেতাকে ভালবাসো —না?"

হঠাৎ এইরূপ জিজ্ঞাসা করায়, দন্দোলো থতমত খাইয়া গেল, লজ্জায় তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল, সে উত্তর না করিয়া কিছুকাল চুপ্ করিয়া রহিল।

শ্রীমতী ক্লোটিল্‌দা আবার বলিলেন:—

"মিছে কেন আমার কাছে ঢাক্‌বার চেষ্টা কর্‌চ? আমি আগেই জান্‌তে পেরেছি, আর তুমি যে রকম্ থতমত খাচ্চ, তাতে কথাটা আরও ঠিক্ বলে মনে হচ্চে।"

দন্দোলো ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল, কোন উত্তর করিল না।

শ্রীমতী বলিতে লাগিলেন:—"নিনে-তাকে ভাল বাসিয়াছ সে ভালই, কিন্তু আমার মেয়ে ধনী, আর তুমি দরিদ্র; সে এমন লোকের সহিত বিবাহ কর্‌তে পারে, যে ব্যক্তি ধনে নিনেতার সমকক্ষ। বড় বড় জোৎদারের ছেলেরা আমার মেয়েকে বিবাহ কর্‌বার জন্য কত চেষ্টা কর্‌চে। নিনেতার যে রকম রূপ, যে রকম টাকা কড়ি, তাতে সে আরও উচ্চ বংশে বিবাহ কর্‌বার আশা রাখে; এমন কি কোন বড় জমিদারও, এই জোৎদারের মেয়েকে বিবাহ করে' গর্ব্ব অনুভব কর্‌তে পারে।

শোনিত-সোপান।

(ফরাসী হইতে)

১

দন্দোলো নিনেতাকে ভাল বাসে।

দন্দোলো যুবাপুরুষ; উহার কালো চোখ্; উহার অলস্ত মুখশ্রীতে কেমন একটা বিশেষত্ব আছে, উহার ভ্রূযুগল সুপরিব্যক্ত এবং উহার চলন ভঙ্গীতে একটা গর্ব্বের ভাব লক্ষিত হয়। বয়স ২০ বৎসর। দন্দোলো যেরূপ শিক্ষা লাভ করিয়াছে সেরূপ শিক্ষা পাইলে রাজপুত্রেরাও কৃতার্থ হয়। এই শিক্ষার জন্য, দন্দোলো তাহার এক খুড়ার নিকট ঋণী। তাহার পিতৃব্য, একটি ক্ষুদ্র পল্লীর বৃদ্ধ পাদ্রি; তিনি তাঁহার ভ্রাতুস্পুত্রকে রোমের একটি উৎকৃষ্ট বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, তাঁহার পিতৃব্য বেশীদিন জীবিত ছিলেন না; যে সময়ে তাঁহার তত্ত্বাবধান ও আশ্রয় বিশেষ আবশ্যক, ঠিক সেই সময়েই দন্দোলো তাহার পিতৃব্যকে হারাইল। যে বয়সে জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবার তেমন সামর্থ্য থাকে না সেই বয়সে দন্দোলোকে সম্পূর্ণরূপে আপনার উপর নির্ভর করিতে হইল। এখন দন্দোলো কি করিবে? তাহার জনক জননীর নিকট আবার ফিরিয়া যাওয়া ভিন্ন তাহার গত্যন্তর ছিল না। পিতা দরিদ্র কৃষক; তাঁহার একটা জোৎ আছে কিন্তু তাহার এখন ধ্বংসাবস্থা; আর একটা ক্ষেত আছে,তাহা হইতেই কোন প্রকারে তাঁহাদের গুজরান চলে। পিতার নিকট হইতে সুপরামর্শ পাইবার জন্যই এখন সে পিতৃগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। এবং মনে মনে করিল যত দিন না তাহার প্রতি ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি হয় ততদিন সে পিত্রালয়েই থাকিবে। ছয় মাস কাল পরিবারের মধ্যে বাস করিয়া, বেচারা দন্দোলের মনে হইল, নিনেতাকে বিবাহ করিলেই সে সুখী হইবে; উহাই তাহার সুখ সৌভাগ্য লাভের একমাত্র উপায়।

নিনেতার অনুপম গঠন সৌন্দর্য্যের,—তাহার অনন্যসাধারণ অনিন্দ্য মুখশ্রীর বর্ণনা করিবার চেষ্টা আমি করিব না। নিনেতা তরুণবয়স্কা ইটালি দেশীয়া রমণী, একজন ধনী জোৎদারের দুহিতা। ইটালীয় রমণী বলাতেই এক কথায় বুঝিয়া লইবে—নিনেতা দন্দোলোর মত একজন যুবা পুরুষের প্রেমের প্রতি অন্ধ ছিল না। দন্দোলো নিনেতাকে যেমন তাহার হৃদয় দান করিয়াছিল, নিনেতাও তাহার প্রতিদানে বিমুখ হয় নাই।

কিন্তু দুইটি প্রাণী পরস্পরকে ভাল বাসিলে, পরস্পরের সহিত হৃদয় বিনিময় করিলেই যথেষ্ট হয় না। উহাদের মিলন, জনক জননীর আশীর্ব্বাদের দ্বারা, প্রচলিত ধর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা পূত হওয়া চাই। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই একদিন মধুর সায়াহ্নে

এবং কখনো কখনো সখারূপেও ভজনা করিয়া থাকেন। আর, সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে ঈশ্বরে পিতৃত্ব, প্রভুত্ব, বা স্বামিত্ব আরোপ করাও সম্পদজ্ঞানেরই লক্ষণ। আধুনিক নিরাকারবাদের আলোচনায় সবিস্তারে এ বিষয়ের বিচার করিব।

প্রতীকোপাসনা ও সাকারবাদ।

প্রতীকোপাসনাই, অতি স্থূলভাবে সাকারোপাসনা বলিয়া বিবেচিত হয়। কাষ্ঠলোষ্ট্রের উপাসনাই প্রকৃত প্রতীকোপাসনা। দেশ-প্রচলিত প্রতিমা-পূজাকে ঠিক প্রতীকোপাসনা বলা যায় কি না, সন্দেহের কথা। কারণ, মূর্ত্তিমাত্রেই যদিও প্রতীক তথাপি ভগবদ্‌স্বরূপের কোনো না কোনো ধর্ম্মের সঙ্গে প্রতিমাদির স্বল্পবিস্তর সামান্যধর্ম্ম প্রকাশেরও চেষ্টা হইয়া থাকে। প্রতিমাপূজাতে এইজন্য সম্পদ ও প্রতীকের মাঝামাঝি একটাভাব আছে। ইহাকে প্রতীকাশ্রিত সম্পদুপাসনা বলা যাইতে পারে। যাহা হোক, প্রতীকোপাসনাকে বেদান্তে অধ্যাসজনিত উপাসনা বলে। অধ্যাস অর্থ—পরত্রদৃষ্ট অন্যত্রাবভাসঃ—অন্যত্রদৃষ্ট কোনো বস্তুকে, যেস্থানে তাহা প্রকৃতপক্ষে নাই, সেখানে আরোপ করার নাম অধ্যাস। কোনোকালে বনে যে সর্প দৃষ্ট হইয়াছিল, গৃহস্থিত রজ্জুতে সেই সর্পের অস্তিত্ব আরোপ করাকে অধ্যাস বলে। ইহা অধ্যাসের ধর্ম্ম। প্রতীকোপাসনা অধ্যাসজনিত : উপাসনা ; ইহার অর্থ এই যে শাস্ত্রে শ্রুত, গুরুপদেশে প্রাপ্ত, অথবা আপনার বুদ্ধিতে প্রকাশিত, বা আত্মাতে আভাসরূপে অনুভূত যে ঈশ্বরতত্ত্ব, বা ব্রহ্মতত্ত্ব, তাহাকে, যে বস্তুতে তাহার স্বতঃ প্রকাশ নাই, তাহাতে আরোপ করিয়া, ঈশ্বর বা ব্রহ্মরূপে সে বস্তুর পূজা করাই প্রতীকোপাসনা। এখানেও, সুতরাং, সাধক একেবারে নিরাকার ঈশ্বরতত্ত্বের জ্ঞানবর্জ্জিত নহেন। উপাসনার অবলম্বন সাকার অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইলেও, উপাস্য যিনি, তিনি নিরাকার অতীন্দ্রিয় ; প্রতীকোপাসনায়ও এ জ্ঞানের অভাব বা বিলোপ হয় না। সুতরাং প্রতীকোপাসনাকেও প্রকৃত পক্ষে সাকারবাদ বলা যায় না। তবে ইহা নিকৃষ্ট অধিকার, বেদান্ত স্বয়ংই এ কথা স্বীকার করেন।

আধুনিক নিরাকারবাদ।

আমাদের আধুনিক নিরাকারবাদও মোটামুটী সম্পদসোপান পর্য্যন্তই উঠিয়াছে। ভগবানের ইচ্ছা হইলে প্রবন্ধান্তরে ইহার বিস্তৃত আলোচনার চেষ্টা করিব।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

অদ্বৈতব্রহ্মতত্ত্বে জীব কখনো পৌঁছিতে পারে না। সুতরাং প্রাণোপাসনা স্বরূপ-উপাসনার অন্তর্গত বলিয়া গৃহীত হয় না। প্রাণোপাসনা সম্পদুপাসনা। প্রাণের সঙ্গে ব্রহ্মের সামান্যধর্ম্ম আছে। ব্রহ্ম চৈতন্যস্বরূপ, প্রাণ চৈতন্যরূপী। প্রাণের মধ্যে, প্রাণরূপে, প্রাণাবলম্বনে, ব্রহ্মোপাসনা করিতে হইলে, প্রাণের এই চৈতন্য-ধর্ম্মকেই কেবল ধ্যান করিতে হইবে। প্রাণ যেমন চৈতন্যরূপী, তেমনি জড়দেহেও আবদ্ধ, জড়ের দোষগুণের দ্বারা সর্ব্বদাই স্বল্পবিস্তর অভিভূত হয়। আবার প্রাণ গমনাগমনশীল, প্রকাশাপ্রকাশাধীন। প্রাণের সংসার আছে, সংস্থিতি আছে। এ সকল ব্রহ্মে নাই। সুতরাং সমগ্রপ্রাণকে,—তার জড়সংশ্লিষ্টতা, গতাগতি, জন্মমৃত্যুজরাভিভূতি, প্রভৃতি বর্জ্জন না করিয়া,—উপাসনা, এবং তাহার ধ্যান ধারণার চেষ্টা করিলে, তাহা সম্পদুপাসনা বলিয়া পরিগণিত হইবে না। মূল উপাস্যের সঙ্গে সম্পদের যে সামান্য ধর্ম্ম, তাহাই সম্পদুপাসনার প্রাণ, যখনই ধ্যান এই সামান্য ধর্ম্মকে অতিক্রম করে, তখনই ইহা নষ্ট হইয়া যায়।

সূর্য্যোপাসনা।

প্রাণোপাসনার ন্যায়, সূর্য্যোপাসনাও, বেদান্তে সম্পদুপাসনা বলিয়া পরিগণিত হয়। এখানেও ব্রহ্মের সঙ্গে সূর্য্যের যে সামান্যধর্ম্ম রহিয়াছে, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই কেবল সূর্য্যের উপাসনা করিলে, তাহা সম্পদ্ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, অন্যথা নহে। ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ ও জগৎ-প্রকাশক; ব্রহ্ম আপনাকে প্রকাশিত করিতে যাইয়া এই ব্রহ্মাণ্ডকে প্রকাশিত করিয়াছেন ও প্রতিনিয়তই প্রকাশিত করিতেছেন। ইহাই ব্রহ্মচৈতন্যের মূল লক্ষণ। এই অর্থেই ব্রহ্ম জ্ঞান-সূর্য্য। আর এইখানেই ব্রহ্মের সঙ্গে সূর্য্যের সামান্যধর্ম্ম লক্ষিত হয়। কারণ সূর্য্যও স্বয়ং প্রকাশ, অপর কিছু সূর্য্যকে প্রকাশিত করে না, করিতে পারে না; অথচ সূর্য্য, অপর যাহা কিছু দৃষ্ট বস্তু, তৎসমুদায়কে আপনি প্রকাশিত হইতে যাইয়াই তাহার সঙ্গে সঙ্গে, অবশ্যম্ভাবিরূপে, আপনাকে প্রকাশিত করিতেছেন। সূর্য্যের এই স্বয়ংপ্রকাশত্ব ও জগৎপ্রকাশকত্ব ধর্ম্মকে ধ্যানের বিষয়ীভূত করিয়া যে সূর্য্যোপাসনা হয়, তাহাই সম্পদুপাসনা। তদ্দ্বারা ব্রহ্মধ্যানের সহায়তা হয়। তাহাই ব্রহ্মোপাসনার সোপানরূপে পরিগণিত হইতে পারে।

সম্পদুপাসনা ও নিরাকারবাদ।

নির্ব্বিশেষ, নিরাকার ব্রহ্ম বস্তুকে যখন মূল উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়া সেই উপাসনার নিম্নতর সোপানরূপে সম্পদুপাসনা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তখন ইহার দ্বারা যে নিরাকার-বাদের বা অপরোক্ষ ব্রহ্মোপাসনার মর্য্যাদা-হানি হয়, এমন বলা যায় না। ফলতঃ প্রকৃত ব্রহ্মতত্ত্বের দিক হইতে দেখিলে, খৃষ্টীয়ান, মোহম্মদীয়ান, প্রভৃতি নিরাকারোপাসকাভিমানী ধর্ম্মসম্প্রদায়সকলে যেরূপ উপাসনা প্রচলিত আছে, তাহাও স্বরূপ-উপাসনা বলিয়া গৃহীত হইবে না। খৃষ্টীয়ানেরা ঈশ্বরকে পিতা ও প্রভুরূপে ভজনা করেন। মুসলমান সাধকেরাও তাঁহাকে রাজা ও প্রভু

কথা এরূপ মিষ্ট ভাবে শুনাইয়াছিলেন, যে কোন অকৌশল ঘটিতে পায় নাই।

এ বিষয়ে ডাক্তার সরকার গুরুর পন্থানুসরণ করিতেন না। তিনি যে সাধারণতঃ লোকপ্রিয় ছিলেন না, তাঁহার নির্ভীকতা এবং স্পষ্টবাদিতাই তাহার এক মাত্র কারণ। কিন্তু তাঁহাকে যে ভাল করিয়া জানিত তদীয় হৃদয়-সৌন্দর্য্যে তাহাকেই মুগ্ধ হইতে হইত। ফলতঃ সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী বিজ্ঞানবিদের কঠোর বহিরাবরণের ভিতর যে মমতা এবং পরদুঃখ-কাতরতা তিনি পোষণ করিতেন, তাহা যথার্থই অলৌকিক। দারিদ্র্যই যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীজাতির পদস্খলনের কারণ সে কথা একদিন আমার সঙ্গে হইতেছিল। বলিতে বলিতে তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন এবং অস্ফুটস্বরে আপনা আপনি বলিলেন, "উঃ! আমরা কি করিতেছি!" আর একদিন বলিয়াছিলেন—"দেখ, লোকের দুঃখ কষ্টে আমি যে আন্তরিক সমবেদনা অনুভব করি, তার কারণ বড় কষ্টে নিজে মানুষ হইয়াছি।"

এই উভয় মহানুভবের চরিত্রে আমি কতকগুলি ভাব লক্ষ্য করিতাম যাহা মহারাণী মাতা ছাড়া পূর্ব্বে আর কাহাতেও দেখি নাই। ডাক্তার সরকার মহারাণীর কথা উঠিলেই তাঁহাকে "রমণীকুলের আদর্শ" বলিয়া প্রশংসা করিতেন। ইহাতে যথার্থই আমি গৌরব বোধ করিতাম।

রাজাবাবু এবং ডাক্তার সরকারকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম রাধাগোবিন্দ মারা যে যাইবেই এমন কোন কথা নাই,—ভাল হইতেও পারে। অতএব তাঁহার সম্বন্ধে কতকটা নিশ্চিত হইয়া ২২শে শ্রাবণ রাত্রে আমি পুটিয়া যাত্রা করিলাম।

পরদিন নাটোর ষ্টেসনে পৌঁছিয়া খবর পাইলাম মহারাণী মাতার কাশী গমন স্থগিদ হইয়াছে।

সেই দিন অপরাহ্নে তাঁহাকে প্রণাম করিতে গেলাম। দেখিলাম কয়মাসে মার মূর্ত্তি শুষ্ক শীর্ণ মলিন হইয়াছে, সেই জ্যোতির্ম্ময় মুখে বিষাদের কালিমা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। আমায় দেখিয়া স্নেহের হাসি হাসিলেন। সেই ক্ষীণ হাস্য রেখায় উদ্ভাসিত মাতৃমূর্ত্তিতে যুগপৎ আমি অসীম ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার এবং আত্মোৎসর্গ ও সকল বিষয়ে ভগবানের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরের ভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। এই সুদীর্ঘকাল পরে যখনই সে স্বর্গীয় মূর্ত্তি মানস নেত্রে দেখিতে পাই, সেই দিনকার কথাই বিশেষরূপে মনে পড়ে।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

দেশের দশা।*

পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হইলেই স্বাগত সম্বোধন ও কুশল প্রশ্ন করাই আমাদিগের দেশের এই চিরন্তন প্রথা, কিন্তু আমি জানিয়া শুনিয়া আপনাদিগকে কি কুশল জিজ্ঞাসা করিব? যে দেশের লোকের বার্ষিক আয় গড়ে ২৭৲ টাকা মাত্র, অথচ চাউলের মণ ৬৲ টাকা, যেখানে বিলাস সামগ্রী দূরে থাকুক, প্রাণধারণের একান্ত আবশ্যক নির্ম্মল জলও দুষ্প্রাপ্য, যেখানে ম্যালেরিয়া রোগে অনেক সময় হাজার করা ১৮ জন মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সে দেশে পরস্পরের সাক্ষাতে কুশল প্রশ্ন সেত কেবল শূন্যগর্ভ শিষ্টাচার মাত্র।

আমাদের এই জেলায় হিন্দু মুসলমান লইয়া প্রায় ২১ লক্ষ লোকের বাস। ইহাদের মধ্যে কয়জনের অবস্থা সচ্ছল? ১৯০১ সালের ইন্‌কম টেক্সের তালিকায় কেবলমাত্র ৩৮৯৩ জনের নাম পাওয়া যায়। অপর সকলের বার্ষিক আয় ৫০০ টাকারও কম।

এই এতগুলি লোকের মধ্যে শতকরা প্রায় ৮০ জন কৃষিকর্ম্ম দ্বারা প্রাণধারণ করে। এই জেলায় সর্ব্বসমেত প্রায় ১ কোটী বিঘা জমি আছে। তন্মধ্যে আন্দাজ ৩,০০০,০০০ ত্রিশ লক্ষ বিঘাতে বৎসর বৎসর চাষ হয়। ইহাই আমাদের ১৭ লক্ষ চাষীর প্রধান অবলম্বন। গড়ে প্রত্যেকের অংশে ১৸০ পৌনে দুই বিঘা জমি ধরিতে পারা যায়।

এই জমির মধ্যে প্রায় ২৭ লক্ষ বিঘাতে ধান্য প্রভৃতি আহার্য্য শস্যের চাষ হয়। গড়ে প্রতি বিঘায় ৩ মণ করিয়া উপস্বত্ব হইলে, প্রত্যেক চাষীর অংশে আন্দাজ ৫ মণ ধরিতে পারা যায়। ইহাতে কোন ক্রমেই বৎসরের খরচ কুলায় না।

বাকী ৩ লক্ষ বিঘা জমিতে পাট, সর্ষপ প্রভৃতি যে সকল জিনিষের চাষ হয় তাহা হইতে ইহারা কতক সাহায্য পায়। কিন্তু অনেককেই দিনমজুরের কার্য্য করিতে হয়। মজুরি পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু আবশ্যক দ্রব্যাদির মূল্য এত বাড়িয়াছে যে, কিছুতেই তাহাদের কুলাইয়া উঠে না। বিশেষ এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে শিল্পী মজুর নাই।

ইহাদের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য নাই বলিলেই হয়। যাহা কিছু আছে তাহা কেবল আহার্য্য শস্য বিক্রয়, অথবা অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে পাট তুলা প্রভৃতি কোন কোন কাঁচা উপাদান বিক্রয়। কলকারখানার সাহায্য পাইলে এই সকল সামগ্রী হইতে কত বহুমূল্য ব্যবহার্য্য জিনিষ প্রস্তুত হইতে পারিত। সহজ অবস্থাতেই ইঁহাদের এত টানাটানি, অজন্মা হইলে ত আর রক্ষা নাই। অনেকের ভাগ্যেই দুই সন্ধ্যা আহার জুটিয়া উঠে না।

---

* চব্বিশ পরগণার গত "জেলা সমিতির" সভাপতি ডাক্তার শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার মহাশয়ের বক্তৃতা হইতে। এই "বক্তৃতা"টি শ্রদ্ধাস্পদ সভাপতি মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়ায় আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম। বঃ সঃ

তারপর আমাদের তাঁতি, কামার, কুমার, যোগী, কাঁসারি প্রভৃতি কারিকর জাতি। স্ত্রীপুরুষে ইহাদের সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ (১৯৮০০)। পূর্ব্বে যখন এদেশে বিদেশীয় বাণিজ্যের স্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হয় নাই, তখন ইহাদের অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল। নূতন ধরণের ব্যবসা বাণিজ্যের চাপ ইহাদের উপরেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পড়িয়াছে। ইহারাই পূর্ব্বে আমাদিগের আবশ্যক কাপড়, জুতা, কুড়ুল, কোদালি, সিন্ধুক, বাক্স সমস্তই প্রস্তুত করিত। এতদ্ভিন্ন স্থানে স্থানে বেশ বড় আয়তনের ব্যবসায়ও চালাইত। দমদমা, আগুলিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে পূর্ব্বে পাটের চট ও থলিয়া বুনন ব্যবসায় যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। এই সকল জিনিষ অন্যান্য দেশে রপ্তানি হইত। এই অঞ্চলে জোলার কাপড়ও যথেষ্ট প্রস্তুত হইত। এখন সে সমস্তই লোপ পাইয়াছে। যে সকল শিল্পী এই সব কার্য্যে লিপ্ত ছিল, তাহারা এখন উপায়ান্তর না দেখিয়া, হয়, কৃষিকার্য্য করিতেছে, না হয়, মজুরি করিতেছে।

এই সঙ্গে উচ্চ এক শ্রেণী ব্যবসায়ীর উল্লেখ করিতে হয়। আমাদিগের নবশাক ভ্রাতৃগণের পক্ষে ব্যবসায়ই প্রধান অবলম্বন। পূর্ব্বে ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই বড় বড় ব্যবসা চালাইতেন। গোবরডাঙ্গার লুপ্তপ্রায় চিনির কারবার তাহার একটি দৃষ্টান্ত স্থল। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রামে ১২০টি চিনির কারবার ছিল। প্রতি বৎসর প্রায় এক ক্রোর টাকার ব্যবসা হইত। এই গ্রামের রাস্তা বাঁধাইবার জন্য ইটের প্রয়োজন হইত না। এত গুড়ের আমদানি হইত যে, তাহার কলসের খোলাতেই বড় বড় পাকা রাস্তা প্রস্তুত হইত। গোবরডাঙ্গার চিনি কেবল আমাদের এই জেলাতে নয়, প্রায় সমস্ত বাঙ্গালা দেশেই প্রচলিত ছিল। এই প্রকাণ্ড ব্যবসায় একবারে লোপ পাইয়াছে বলিলেই হয়। গত বৎসর ১০টি মাত্র ছোট কারবার ছিল। এ বৎসর ৬টি মাত্র অবশিষ্ট আছে।

এই সকল ব্যবসায়ী ও কারিকরগণ এখন নিতান্ত কষ্টে দিনাতিপাত করিতেছে। যে সকল কলকারখানা স্থাপিত ও নূতন ব্যবসায়ের আরম্ভ হওয়াতে আমাদের কারিকর ও ব্যবসায়ীশ্রেণীর ব্যবসায় লোপ পাইয়াছে—সেই সকল কলকারখানা অথবা ব্যবসায়ে তাহারা কোন কাজকর্ম্ম পাইতেছে না।

এখন ২৪ পরগণা জেলাতে কয়েকটী নূতন ধরণের বৃহৎ কারখানা আছে।—যথা গালার কারখানা ২ কাগজের ২ বরফের ৩ সাবানের ১ চিনির ১ রেশমের ১ সোরার ১ পাথরের ১ গ্যাসের ১ দড়ির ২ ময়দার ১ দুগ্ধের ১ গাড়ী প্রস্তুত করিবার ১ চামড়ার কারখানা ১ ট্রামওয়ে ১ ডকইয়ার্ড ২ লোহা ও পিত্তল ঢালাই কারখানা ১৩ তেলের কল ২ তেলের ডিপো ৩ পাটের কল ৩৩ তুলার কল ৬ পাটের গাটবাঁধা ১১ মিউনিসিপালিটীর কারখানা ১ ইলেক্‌ট্রিক কারখানা ১ রাসায়নিক দ্রব্যের কারখানা ১ এ সব ছাড়া আরও অনেকগুলি ছোট ছোট কারখানা থাকা জানা যায়।

যদি এই সকল কারিকর সামান্য মজুর হইয়া কলকারখানায় প্রবেশ করে, তবে তাহাদের অন্নের সংস্থান হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহার জন্য যে নূতন রূপ শিক্ষায়

আবশ্যক তাহা তাহাদের নাই। কাজেই অনেকে কৃষিকার্য্য অথবা দিন মজুরের কার্য্য করিতেছে। কেহ কেহ অতি সামান্যরূপ ব্যবসা চালাইয়া কোনরূপে দিনাতিপাত করে। কেবল দুই চারিজন মাত্র বড় বড় ব্যবসায়ে লিপ্ত আছে।

তার পর আমাদের মধ্যশ্রেণীর (হিন্দু মুসলমান) ভদ্রলোক। ইঁহাদের প্রধান অবলম্বন ব্যবসায়,—(যেমন ওকালতি, ডাক্তারি ইত্যাদি) অথবা চাকুরি। এই শ্রেণীর অনেকেরই অবস্থা দিন দিন অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। জিনিষপত্র দিন দিন দুর্ম্মূল্য হইতেছে। কিন্তু ইঁহাদের অনেকেরই আয় একেবারে সীমাবদ্ধ। কেবল জন কয়েকের অবস্থা একটু সচ্ছল। একে সামান্য আয়, তাহাতে পরিবারের লোকসংখ্যা অধিক, পুত্রকন্যাদিগের শিক্ষা দিবার খরচও কম নয়, আবার মাঝে মাঝে কন্যাদায় প্রভৃতি ত আছেই। এইরূপ নানাপ্রকার প্রতিকূল অবস্থার সংঘর্ষে আমাদের সমাজের মেরুদণ্ডস্বরূপ এই মধ্যশ্রেণীর ভদ্রলোকগণ একেবারে নিষ্পেষিত হইতেছেন! দুই সন্ধ্যা অন্নসংস্থান করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। মনের অনেক সুসঙ্গত ইচ্ছাকে চাপিয়া রাখিয়া, ও সকল প্রকার অভাবকে কাটিয়া ছাটিয়া ছোট করিয়া কোন্ রকমে তাঁহারা জীবন ধারণ করিতেছেন। মোটের উপর শতকরা ২।৩ জনে সচ্ছল অবস্থায় আছেন কি না সন্দেহ।

তৎপর আমাদের জমিদার শ্রেণী। অনেকে মনে করেন, তাঁহাদের অবস্থা বেশ সচ্ছল। কিন্তু যিনি জমিদার তিনিই জানেন, তাঁহার সীমাবদ্ধ আয় লইয়া নিত্যবর্দ্ধনশীল টেক্স, শতপ্রকারের চাঁদা, ম্যাটহোম্ এবং ইভিনিং পার্টির ব্যয়ভার বহন করিয়া তিনি কেমন সুখে আছেন।

দারিদ্র্যজনিত অর্দ্ধাহারে আমাদিগের অধিকাংশেরই শরীর অদৃঢ়পুষ্ট। এরূপ দুর্ব্বল শরীর, পরিষ্কার জলের অভাবে সত্বরই রোগের আধার হইয়া পড়ে। এই জেলায় কিরূপ জলকষ্ট তাহা কাহারও অবিদিত নাই। ভাগীরথীর তীরে হালিসহর হইতে বজবজ্ পর্য্যন্ত যতগুলি সহর ও পল্লী ছিল তাহাতে কোনও দিনও জলকষ্ট ছিল না। কিন্তু কয়েক বৎসর হইতে গঙ্গার জল দূষিত হইয়াছে। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির রাসায়নিক পরীক্ষক ডাক্তার শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলেন, যে ভাগীরথীর তীরস্থ কোন কোন কলকারখানায় যে সেপটিক্ ট্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে তাহা হইতে নিকটস্থ পল্লীগুলির বিশেষ ভয়ের কারণ আছে। কলিকাতার জল উত্তমরূপে ছাঁকিয়া লওয়া হয়, তথাপিও তাহাতে এখন অনেক রোগজনক কীটাণু পাওয়া যাইতেছে। যে সকল জায়গায় জল না ছাঁকিয়া পান করা হয়, সে সকল স্থানে স্বাস্থ্যভঙ্গের বিশেষ আশঙ্কা।

গঙ্গা ভিন্ন এই জেলার অন্যান্য প্রায় সকল নদীর জলই পানের অনুপযুক্ত।

আমাদের যে ২৫টি মিউনিসিপ্যালিটি আছে, তাহাদের মধ্যেও অনেক স্থলেই জলকষ্ট বর্ত্তমান।

এই জেলার ৫০০০ হাজার পল্লীগ্রামের মধ্যে ভাগীরথীর সন্নিকটস্থ ন্যূনাধিক ৫০০

শত বাদ দিলে, বাকী ৪৫০০ চারি হাজার পাঁচ শত পল্লীর অধিবাসীদিগকে পানীয় জলের জন্য পুরাতন পুষ্করিণী, ডোবা, ছোট নদী, নালা ও খাল বিলের উপর নির্ভর করিতে হয়।' এই জলাশয়গুলি প্রায়ই গ্রীষ্মকালে শুকাইয়া যায়। তখন পিপাসা নিবারণের জন্য সকলকে যে কি ভয়ানক কষ্ট সহ্য করিতে হয়, তাহা ভুক্তভোগী ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন। বর্ষাকালে নূতন জলে সেইগুলি পরিপূর্ণ হয় বটে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে তাহা পানের উপযুক্ত নহে এবং তাহা হইতে নানাপ্রকার রোগেরও সৃষ্টি হয়। ইহার উপর অজ্ঞতাবশতঃ লোকে পাট, শণ ইত্যাদি ভিজাইয়া এই জল বিষাক্ত করে। এই দারুণ জলকষ্ট নিবারণের উপযুক্ত উপায় আপনাদিগকে নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।'

তার পর আমাদের এই জেলার প্রায় সর্ব্বত্রই নিম্ন ও সমতল। সেই জন্য বর্ষার জল সহজে নিকাশ হইতে পারে না। বিশেষতঃ অনেকগুলি নদীর মুখ একবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত বেঙ্গল সেণ্ট্রাল রেলপথ কতকগুলি নদী, নালা ও ঢালু জমীর উপর দিয়া অনুপ্রস্থভাবে চলিয়া যাওয়াতে, আবশ্যকানুযায়ী পয়ঃপ্রণালীর অভাবে বর্ষার জল নানাস্থানে আবদ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং অনেকগুলি ক্ষুদ্র ডোবা, খাল, বিল বৎসরের তিন চারি মাস অপরিষ্কার জলে পরিপূর্ণ থাকে এবং ম্যালেরিয়াবাহক মশক ও অন্যান্য নানাপ্রকার কীট পতঙ্গের জন্মের হেতু স্বরূপ হয়, অথচ এই জলই আমাদের ব্যবহার্য্য।

এই ম্যালেরিয়া আমাদের যে কি সর্ব্বনাশ করিতেছে, তাহা বলা যায় না। পূর্ব্বে যখন দেশের লোকের অবস্থা সচ্ছল ছিল, তখন ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগের সহিত তাহারা কিছুদিন যুঝিতে পারিত। কিন্তু এখন অন্নকষ্ট ও জলকষ্টে শরীর দুর্ব্বল হওয়াতে লোকে সেরূপ যুদ্ধে একবারে অসমর্থ। গত ১৯০১—১৯০৫ সাল পর্য্যন্ত কেবল জ্বররোগে এই জেলায় প্রত্যেক ১০০০ হাজার লোকের মধ্যে ১৮ জন মারা পড়িয়াছে। বলা বাহুল্য, এই জ্বরের প্রায় সমস্তই ম্যালেরিয়া জ্বর।

এই ম্যালেরিয়ার জন্যই কোন কোন পল্লীগ্রামের অবস্থাপন্ন ভদ্রলোকে ভদ্রাসন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। যখন তাঁহারা নিজ গ্রামে ছিলেন, তখন স্কুল পাঠশালা প্রভৃতি নানাবিধ সৎকার্য্যে নিয়োজিত থাকিতেন। এখন তাঁহাদের অভাবে গ্রামের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইতেছে।

এইত গেল আমাদের প্রধান প্রধান দুর্দ্দশার তালিকা—দারিদ্র্য, জলকষ্ট ও ম্যালেরিয়ার কথা। এই সকল আপদের সহিত যুঝিতে হইলে যে বলের প্রয়োজন, এখন দেখা যাউক, আমাদের সে বল আছে কি না। শিক্ষাই মানবহৃদয়ে বলসঞ্চার করে! কিন্তু আমাদের দেশে শিক্ষার বিস্তার হইতেছে কি ? ১৮৯৪ খ্রীঃ অঃ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১,৯২৭ ও ছাত্রসংখ্যা ৭৩,৫৬৬ ছিল। ১৯০১ খ্রীঃ অঃ আমাদের এই জেলার সকল রকম বিদ্যালয়ের সমষ্টি ১৭৬৮ এবং ছাত্রসংখ্যা প্রায় ৭৪ হাজার হইয়াছে। স্কুলের

সংখ্যা এই ৭ বৎসরে অনেক কমিয়াছে, ছাত্রসংখ্যাও বেশী বাড়ে নাই। ১৮৯২ সালে বিদ্যালয়ে যাইবার উপযুক্ত বয়স্ক বালকের মধ্যে শতকরা ৪৩ জন লেখাপড়া শিখিত; ১৯০১ সালে শতকরা ৪২ জন লেখাপড়া করে। ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, লোকশিক্ষা আশানুরূপ উন্নতিলাভ করিতেছে না, বরং কিছু কিছু অবনতির দিকে চলিয়াছে।

কোন জাতির উন্নতি একমাত্র পুরুষদিগের শিক্ষার উপর নির্ভর করে না। স্ত্রীশিক্ষা ভিন্ন কোন জাতিই উন্নত হইতে পারে না। নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের দেশে ১৮৯৭ সালে বিদ্যালাভের উপযুক্ত বয়স্কাদিগের মধ্যে বিদ্যার্থিনীর সংখ্যা শতকরা ৪ জন হইয়াও এখন ক্রমশঃ আবার কমিতে আরম্ভ হইয়াছে।

এই জেলায় লোক সংখ্যার অনুপাতে, লিখিতে পড়িতে জানে এমন লোকের সংখ্যা বড়ই নিরাশাজনক। আমাদের জেলার ২১ লক্ষ লোকের মধ্যে কেবল ২৩০,০০০ দুই লক্ষ ত্রিশ হাজার অর্থাৎ শতকরা প্রায় ১১ জন মাত্র লিখিতে পড়িতে সক্ষম। যে জেলায় ভারতের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত, সে জেলারই যখন এই দশা, তখন আর দেশের আশা ভরসা কোথায়?

তারপর কার্য্যকরী বিদ্যার চর্চ্চা ত একবারে নাই বলিলেই হয়।

কৃষিকার্য্যের উন্নতি ভিন্ন দেশের যে কোন আশাই নাই, একথা আমরা সকলেই জানি। কৃষিই আমাদের ১৭ লক্ষ লোকের উপজীবিকা। অন্যান্য দেশের ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের ভিতর কার্য্যকরী বিদ্যার বহুল বিস্তার ব্যতীত শ্রমশিল্পের উন্নতির কোন আশাই নাই।

মধ্যশ্রেণীর ভদ্রলোকের শিক্ষার গতি এখন কেবল ওকালতি, ডাক্তারি প্রভৃতি ব্যবসায়ের, আর না হয়, চাকুরির দিকে। কিন্তু এই সকল কাজে আর সুবিধা নাই বলিলেই হয়।

অন্নকষ্টের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এখন দেখা যাউক, জীবনধারণের অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য আমাদের কত খরচ হয়।

২১ লক্ষ লোকের পরিধেয় বস্ত্রের জন্য প্রত্যেকের অন্ততঃ ২০ গজ অর্থাৎ ২৲ টাকা মূল্যের বস্ত্র ধরিলে, মোট ৪২ লক্ষ টাকা খরচ হয়, ইহার মধ্যে আমাদের ১১০০০ বার হাজার তাঁতী ও কয়েক সহস্র জোলা কিয়দংশ প্রাপ্ত হয়।

২১ লক্ষ লোকের মধ্যে প্রায় ২২৫০০০ দুই লক্ষ পঁচিশ হাজার লোকে লিখিতে ও পড়িতে পারে। ধরিয়া লওয়া যাউক, যাহারা লেখা পড়া জানে তাহারা সকলেই জুতা ব্যবহার করে। প্রত্যেকের জন্য বৎসরে ২৲ টাকা ধরিলে আমাদের জুতার খরচ বৎসরে অন্যূন ৪৷৷০ লক্ষ টাকা। ইহার কতকাংশ বিদেশে যায়।

২১ লক্ষ লোকের প্রত্যেকের জন্য বৎসরে অন্ততঃ ৫ সের করিয়া গুড় বা চিনি ধরিলে একুনে ২৫০০০০ দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মণ খরচ হয়। ইহার মূল্য প্রায় ২০০০০০০ কুড়ি লক্ষ টাকা। এক চব্বিশ পরগণাতেই এখন প্রায় ১৩০০০ তের হাজার বিঘা জমীতে

ইক্ষুর চাষ হয়। তাহাতে মোট ১৩০০০০ এক লক্ষ ত্রিশ হাজার মণ গুড় বা চিনি হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত খেজুরগাছেরও অভাব নাই। কিন্তু গোবরডাঙ্গার চিনির কারখানাগুলি বন্ধ হওয়া অবধি অন্য স্থান হইতে চিনি আনাইতে হইতেছে, এবং তাহাতে অনর্থক অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হইতেছে। চব্বিশ পরগণাতেই যথেষ্ট গুড় ও চিনি প্রস্তুত হইতে পারে।

২১ লক্ষ লোকের জন্য বৎসরে প্রায় ৬০০০০০ ছয় লক্ষ টাকার লবণ খরচ হয়। পূর্ব্বে আমাদের এই জেলাতেই অনেক লবণ প্রস্তুত হইত; এখনও হইতে পারে। অনেকের ধারণা আছে, গবর্ণমেণ্ট লবণ প্রস্তুত করিবার ব্যবসায় চালাইতে অনুমতি দিবেন না, ইহা নিতান্তই অমূলক। তবে বর্ত্তমান অবস্থায় লবণ প্রস্তুত করিবার ব্যবসায় লাভজনক হয় কি না, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার বিষয়।

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যের উন্নত কল কারখানা এদেশে করিলে তাহাতে আমাদিগের নানা সুবিধা।

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের শ্রমশিল্প-বিভাগের পরামর্শদাতা শ্রীযুক্ত জে জি কমিং মহোদয় যে ব্যবসা গুলি বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত করিতে পরামর্শ দিয়াছেন, তাহার তালিকা এই; (১) বস্ত্র ও কারপেট বয়ন (২) চীনা বাসন (৩) কাঠের জিনিষ (৪) মাদুর (৫) চামড়া (৬) ছুরি কাঁচি (৭) পিতলের বাসন (৮) কাচের জিনিষ (৯) নানা প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য (১০) দেশলাই (১১) সাবান (১২) সুগন্ধি দ্রব্য (১৩) গালা (১৪) ও নানাবিধ উদ্ভিজ্জ তৈল প্রস্তুত করা এবং (১৫) তুলা ও রেশম-জাতসূত্র ও বস্ত্র রঞ্জন। এতদ্ব্যতীত ছাতা, রং, মোজা, চামড়ার জিনিষ এবং ফলের মোরব্বা ও চাটনি প্রস্তুত করিবার প্রস্তাবও তিনি অনুমোদন করেন।

উল্লিখিত তালিকার মধ্যে অনেক গুলি শ্রমশিল্পই এ জেলাতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। কাপড় ও চামড়ার কারবার বহুল পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত করা আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। তদ্ভিন্ন নূতন উপায়ে চিনি প্রস্তুত করিবার জন্যও এই জেলার নানা স্থান উপযুক্ত বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু এইরূপ কল কারখানা চালাইতে হইলে মূলধন চাই, অভিজ্ঞতা চাই ও সমবেত হইয়া কার্য্য করিবার ক্ষমতা সাধুতা সত্যনিষ্ঠা ও অধ্যবসায় শ্রমপটুতা প্রভৃতি থাকা চাই।

দ্বিতীয়তঃ—স্বদেশীয় বস্তুর বহুল প্রচার ও ব্যবহার দ্বারা দেশের ধন দেশে রক্ষা করিতে হইবে। এ বিষয়ে বাঙ্গালীর কাছে কোন কথাই নূতন নহে। মাতৃভূমির দৈন্য নিবারণের জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়া যাঁহারা নূতন নূতন ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতেছেন, তাঁহারা যে সাধ্যানুসারে, স্বদেশীয় বস্তু ব্যবহার করিবেন ইহা ত স্বতঃসিদ্ধ। আমি যদি আমার তন্তুবায় ভ্রাতার কাপড় ক্রয় না করি তবে মাতৃচরণে আমি অপরাধী। একমাত্র স্বদেশীয় বস্তু ব্যবহারে আমার কিঞ্চিৎ আর্থিক ক্ষতি হইলেও হইতে পারে, কিন্তু মাতৃচরণে অপরাধ জনিত আত্মগ্লানি অপেক্ষা এরূপ ক্ষতি স্বীকার কি সহস্রগুণে শ্রেয় নহে? আবশ্যক দ্রব্যাদি ক্রয়কালে

আমি কি আমার অনশনপীড়িত, রোগক্লিষ্ট শ্রমশিল্পী ভ্রাতৃগণের নিরাশাব্যঞ্জক মুখ ভুলিতে পারি? ঐ ব্যবসায়জীবীর সহিত আমাদের যে কি রক্তসম্বন্ধ, বঙ্গজননী প্রতিজনের কর্ণে অতি করুণস্বরে তাহা ব্যক্ত করিতেছেন! নিতান্ত কঠোর হৃদয় না হইলে জননীর সে কাতরস্বর বিস্মৃত হওয়া অসম্ভব।

আর একটী কথা বলিয়াই আমি আমার বক্তব্য শেষ করিব। ম্যালেরিয়া নিবারণই বলুন, জলকষ্ট নিবারণই বলুন, জলনিকাশের নূতন বন্দোবস্তই বলুন, আর জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তারই বলুন, সকল কার্য্যই আমাদিগের সমবেত শক্তি ও চেষ্টার উপর নির্ভর করে। আত্মনির্ভর ব্যক্তিগত জীবনের ন্যায়, জাতিগত জীবনের পক্ষেও নিতান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু জাতিগত আত্মনির্ভর ব্যক্তিগত আত্মনির্ভরের সমষ্টিমাত্র। আমাদিগের এই জেলার অধিবাসীদিগের মনকে এমন করিয়া গড়িতে হইবে যে, কেহ যেন অন্যের মুখ পেক্ষী না হন। আমরা সকলেই যেন একমন একপ্রাণ হইয়া স্বদেশের যে কোন মঙ্গলকর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে পারি।

যে সকল কারণে জাতিগত ও সম্প্রদায়গত পার্থক্যের সৃষ্টি হয়, আমাদের মধ্যে তাহার অভাব নাই। কিন্তু মাতৃভক্তির দ্বারা সে সকল অন্তরায় দূর করিতে হইবে। মাতৃভূমির কোন মঙ্গলকর কার্য্যের ইঙ্গিত পাইবামাত্র আত্মাভিমান, স্বার্থপরতা, ঔদাসীন্য ও অসূয়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাদিগকে একত্র হইতে হইবে।

জেলার সমস্ত না হউক, অন্ততঃ অধিকাংশ লোককে এক চিন্তা ও এক কার্য্যে নিরত করিতে না পারিলে, আমাদের উন্নতির উপায় নাই। কি উপায়ে সকলকে এক মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া, একই উদ্দেশ্যে প্রবৃত্ত করিতে পারা যায়, ইহাই এখন আমাদের প্রধান চিন্তার বিষয়। আমার মনে হয়, আমাদের যে যে পল্লীতে ডাকঘর আছে, সেই পল্লীগুলিকে কেন্দ্র স্বরূপ করিয়া আমরা সবডিভিসন কমিটীর অধীনে কতকগুলি শাখা কমিটি গঠন করিতে পারি। বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের ৫০০০ পাঁচ হাজার পল্লীর প্রত্যেকটিতে এক একটি সমিতি গঠন করিবার আশা করিতে পারি না। কিন্তু আমাদের যে ১৭৬৮ পল্লীতে এক একটি বিদ্যালয় আছে তাহার প্রত্যেকটীতে এক একটী প্রশাখা কমিটি গঠিত হওয়া অসম্ভব নয়। জলকষ্ট হইলে, জল নিকাশের আবশ্যক হইলে, অথবা কোন সংক্রামক পীড়ার আবির্ভাব হইলে স্থানীয় কমিটি নিকটস্থ কেন্দ্রে সংবাদ দিতে পারেন। তাঁহারা আবার সবডিভিসন কমিটিতে সংবাদ দিবেন এবং জেলা কমিটি তাঁহাদের নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিতে পারিবেন।

এরূপ একটি মহৎ কার্য্যে অনেক লোককে অনেক দিন ধরিয়া পরিশ্রম করিতে হইবে। কিছুই এক দিনে গড়ে না। যাঁহারা এ কার্য্যে ব্রতী হইবেন তাঁহাদিগকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে। প্রচারক ব্রত-গ্রহণ করিয়া গ্রামে গ্রামে লোকের নিকট এই সকল সমিতির আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিতে হইবে; এবং সর্ব্বসাধারণকে এজন্য

প্রস্তুত হইবার উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে। আমাদিগের উদ্দেশ্য সাধন সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট হইতে যে সাহায্য লাভের সম্ভাবনা আছে, আমি তাহার উল্লেখ করি নাই, কারণ আমরা যতই আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিতে পারিব ততই আমাদিগের মঙ্গল হইবে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, আমাদিগের কার্য্য সুপ্রণালীতে চালিত হইলে আমরা গবর্ণমেণ্টের সহানুভূতি লাভে বঞ্চিত হইব না।

আমাদের দেশের কার্য্যের একটা প্রধান অন্তরায় এই যে, আমরা আশু ফল প্রত্যাশা করি। কিন্তু জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠা এক দিনের কার্য্যে নহে। যুগ যুগান্তের পরিশ্রম ও সাধনা ব্যতীত তাহা সিদ্ধ হইবার নয়। আর একটি বিঘ্ন এই যে, আমরা প্রত্যেকেই নেতা হইতে চাই, অপরের নেতৃত্ব স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। কিন্তু গুরু হইতে হইলে যে প্রথমে শিষ্যত্ব স্বীকার করিতে হয়, তাহা আমরা অনেক সময় বিস্মৃত হই। যাঁহারা আমার প্রস্তাবিত পল্লী-সমিতির নেতা হইবেন, হয় ত তাঁহাদিগের নাম, তাঁহাদিগের কার্য্য, সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে না, নীরবে বিনা আড়ম্বরে তাঁহাদিগকে কার্য্য করিতে হইবে। কিন্তু সেজন্য যেন তাঁহারা নিরুৎসাহিত না হন। সমুদ্র মধ্যে ফলশস্য-সুশোভিত মনুষ্যবাসের উপযুক্ত যে মহাদ্বীপ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অসংখ্য কীটাণুর যুগ যুগান্তরব্যাপী ধারাবাহিক অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও দেহ বিসর্জ্জনের নিদর্শন। ঐ ক্ষুদ্র কীটাণুর ন্যায় আমাদিগকেও যুগ যুগান্তর ধরিয়া, তিল তিল করিয়া দেহপাত করিয়া, জননীজন্মভূমির গৌরবের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। কোন কার্য্যই জগতে আকস্মিক নয়। আমাদিগের দুঃখ দুর্দ্দশা সমস্তই আমাদিগের কার্য্যের ফল। কর্ম্ম দ্বারাই কর্ম্মজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। আমরা যদি উপযুক্ত হই, যিনি কর্ম্মফলদাতা—তিনি যে আমাদিগের কল্যাণ করিবেন, তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই।

দেশহিত।

বঙ্গব্যবচ্ছেদের আঘাতে বাংলাদেশে স্বাদেশিকতার যে উদ্দীপনা জ্বলিয়া উঠিয়াছে তাহা যে অন্য দেশের এ শ্রেণীয় উদ্দীপনার ঠিক নকল নহে, তাহা যে আমাদের দেশের স্বকীয় প্রকৃতি অনুসারে একটি বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে এমন কথা আমাদের দেশের কোনো বিখ্যাত ইংরেজি কাগজে পড়িয়াছি। লেখক বলেন যে আমাদের দেশের এই স্বাদেশিকতার উৎসাহ গভীরতর আধ্যাত্মিক ভাবে পূর্ণ; এই জন্য ইহা একটা ধর্ম্মসাধনার আকার ধারণ করিতেছে।

একথা নিশ্চয় মনে রাখিতে হইবে যে আমাদের দেশের কোনো উদ্যোগ যদি দেশের সর্ব্বসাধারণকে আশ্রয় করিতে চায় তবে তাহা ধর্ম্মকে অবলম্বন না করিলে কোনো মতেই কৃতকার্য্য হইবে না।

কোনো দেশব্যাপী সুবিধা, কোনো রাষ্ট্রীয় স্বার্থসাধনের প্রলোভন কোনো দিন আমাদের দেশের সাধারণ লোকের মনে শক্তি সঞ্চার করে নাই।

অতএব আমাদের দেশের বর্ত্তমান উদ্দীপনা যদি ধর্ম্মের উদ্দীপনাই হইয়া দাঁড়ায়, দেশের ধর্ম্মবুদ্ধিকে যদি একটা নূতন চৈতন্যে উদ্বোধিত করিয়া তোলে তবে তাহা সত্য হইবে, স্থায়ী হইবে, দেশের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই।

আমাদের বর্ত্তমান অন্দোলন সেই সত্যতা লাভ করিয়াছে অথবা করিবে কিনা তাহা নিশ্চয় নিরূপণ করিয়া বলিবার ক্ষমতা আমি রাখি না। এইটুকু বলা যায় যে. দেশে যদি দুই চারিজন মহাত্মাও এই আন্দোলনকে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পোলিটিকাল চাঞ্চল্য মাত্র বলিয়া অনুভব না করেন, তাঁহারা যদি ইহার নিগূঢ় কেন্দ্রস্থলে সেই ধর্ম্মের অগ্নিকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া থাকেন যে অগ্নি সমস্ত মিথ্যাকে ভিতর হইতে দগ্ধ করিয়া ফেলে, সমস্ত দীনতাকে ভস্মসাৎ করিয়া দেয় এবং আমাদের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ও মহামূল্য তাহাকেই তপ্ত সুবর্ণের মত উজ্জ্বল করিয়া তোলে—তবে তাঁহাদের সেই উপলব্ধি ও সাধনা নিশ্চয়ই নানা প্রকার সাময়িক বিক্ষিপ্ততাকে ব্যর্থ করিয়া চরম সফলতা আনয়ন করিবে।

কিন্তু আমরা যে এই ধর্ম্মের মূর্ত্তিকে দেখিতে পাইয়াছি তাহার প্রমাণ কিসে পাওয়া যাইবে? যে ইঁহাকে দেখিয়াছে সে ত আর উদাসীন থাকিতে পারে না। সে একান্ত উদ্বেগ একান্ত সতর্কতার সহিত ইঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য জাগ্রত থাকে—কোনো ভ্রষ্টতা কোনো ত্রুটি সে সহ্য করিতে পারে না। সেই প্রাণান্তিক সতর্কতা যদি দেখিতে না পাই, যদি দেখি উপস্থিত কোন উদ্দেশ্য সাধনের কৃপণতায় আমাদের দুর্ব্বল চিত্তকে এমনি অভিভূত করে যে আমাদের সাধনার কেন্দ্রস্থিত ধর্ম্মকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করার গুরুত্ব আমরা বিস্মৃত হই তবে ইহার মত উৎকণ্ঠার বিষয় আর কিছুই হইতে পারে না। রাজার সন্দেহ জাগ্রত হইয়া আমাদের চারিদিকে যে শাসন জাল বিস্তার করিতেছে তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ আমরা সর্ব্বদা উচ্চকণ্ঠেই প্রকাশ করিতেছি কিন্তু যেখানে আমাদের স্বদেশের লোক আমাদের যজ্ঞের পবিত্র হুতাশনে পাপ পদার্থ নিক্ষেপ করিয়া আমাদের হোমকে নষ্ট করিতেছে তাহাদিগকে আমরা কেন সমস্ত মনের সহিত ভৎর্সনা করিবার, তিরস্কৃত করিবার, শক্তি অনুভব করিতেছি না? তাহারাই কি আমাদের সকলের চেয়ে ভয়ঙ্কর শত্রু নহে?

চৈতন্যদেব একদিন বাংলাদেশে প্রেমের ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। কাম জিনিষটা অতি সহজেই প্রেমের ছদ্মবেশ ধরিয়া দলে ভিড়িয়া পড়ে এই জন্য চৈতন্য যে কিরূপ একান্ত সতর্ক ছিলেন তাহা তাঁহার অনুগত শিষ্য হরিদাসের প্রতি অত্যন্ত কঠোর ব্যবহারে প্রমাণিত হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় চৈতন্যের মনে যে প্রেম ধর্ম্মের আদর্শ ছিল তাহা কত উচ্চ, তাহা কিরূপ নিষ্কলঙ্ক! তাহার কোথাও লেশমাত্র কালিমাপাতের আশঙ্কায় তাঁহাকে কিরূপ অসহিষ্ণু ও কঠিন করিয়াছিল। নিজের দলের লোকের প্রতি

দুর্ব্বল মমতাকে তিনি মনে স্থান দেন নাই—ধর্ম্মের উজ্জ্বলতাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করার প্রতিই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল।

আজ আমরা দেশে যদি শক্তিধর্ম্মকেই প্রচার করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়া থাকি তবে তাহারও কি কোথাও বিপদের কোনো সম্ভাবনা নাই? সে বিপদ, কি কেবলই, যাহাদিগকে আমরা শত্রুপক্ষ বলিয়া জানি তাহাদেরই নিকট হইতেই? উন্মত্ততা, অন্যায় ও অত্যাচার কি শক্তিরই ছদ্মবেশ ধরিয়া তাহার মূলে আঘাত করে না? যথার্থ দুর্ব্বলতাই কি উচ্ছৃঙ্খলতার আকার ধারণ করিয়া প্রবলতার ভান করে না? যাহা শক্তি নহে কিন্তু শক্তির বিড়ম্বনা শক্তিধর্ম্মসাধনায় তাহার মত সর্ব্বনেশে বিঘ্ন আর ত কিছুই নাই। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে তাহার অভ্যুদয়ের লক্ষণ চারিদিকে দেখা যাইতেছে কিন্তু আমাদের মধ্যে যাঁহারা তাহাকে স্পষ্টত প্রশ্রয় দিতেছেন না তাঁহারাও তাহাকে ক্ষমাহীন কঠোর শাসন ও ভর্ৎসনার দ্বারা দূরে ঠেকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন না। যে শক্তি ধর্ম্ম, তিনি যদি আমাদের স্পষ্ট উপলব্ধিগোচর হইতেন তবে তাঁহার এই সকল নকল উৎপাতকে কখনও এক দণ্ডের জন্যও সহ্য করিতে পারিতাম না। আজ দস্যুবৃত্তি, তস্করতা, অন্যায় পীড়ন দেশহিতের নাম ধরিয়া চারিদিকে সঞ্চরণ করিতেছে এ কি এক মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন যাঁহারা জানেন, আত্মহিত, দেশহিত, লোকহিত, যে কোনো হিতসাধনাই লক্ষ্য হউক না কেন কেবলমাত্র বীর ও ত্যাগী ও তপস্বী তাহার যথার্থ সাধক। জাতির চরিত্রকে নষ্ট করিয়া আমরা জাতিকে গড়িয়া তুলিব এমন ভয়ঙ্কর ভুলকে তিনি কখনই এক মুহূর্ত্তের জন্যও মনে স্থান দিতে পারেন না যিনি ধর্ম্মকেই শক্তি বলিয়া নিশ্চয় জানেন।

আমাদের দেশের সকল অমঙ্গলের মূল কোথায়? যেখানে আমরা বিচ্ছিন্ন। অতএব আমাদের দেশে বহুকে এক করিয়া তোলাই দেশহিতের সাধনা। বহুকে এক করিয়া তুলিতে পারে কে? ধর্ম্ম। প্রয়োজনের প্রলোভনে ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দিলেই বিশ্বাসের বন্ধন শিথিল হইয়া যায়। যে অধর্ম্ম দ্বারা আমরা অন্যকে আঘাত করিতে চাই সেই অধর্ম্মের হাত হইতে আমরা নিজেকে বাঁচাইব কি করিয়া, মিথ্যাকে, অন্যায়কে যদি আমরা কোনো কারণেই প্রশ্রয় দিই তবে আমরা নিজেদের মধ্যেই সন্দেহ, বিশ্বাসঘাতকতা, ভ্রাতৃবিদ্রোহের বীজ বপন করিব—এমন একটি প্রদীপকে নিভাইয়া দিব যে আলোকের অভাবে পুত্র মাতাকে আঘাত করিবে, ভাই ভাইয়ের পক্ষে বিভীষিকা হইয়া উঠিবে। যে ছিদ্র দিয়া আমাদের দলের মধ্যে বিশ্বাস হীন, চরিত্র হীন, ধর্ম্মসংশয়ীগণ অবাধে প্রবেশ করিতে পারিবে সেই ছিদ্রকেই দলবৃদ্ধি শক্তিবৃদ্ধির উপায় মনে করিয়া কি কোনো দূরদর্শী কোনো যথার্থ দেশহিতৈষী নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? আমাদের দেশের যে দুইটি প্রাচীন মহাকাব্য আছে সেই দুই মহাকাব্যেই এই একটি মাত্র নীতি প্রচার করিয়াছে যে, অধর্ম্ম যেখানে যে নামে যে বেশেই প্রবেশ

লাভ করিয়াছে সেই খানেই ভয়ঙ্কর সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে, আমরা শনির সঙ্গে কলির সঙ্গে আপাতত সন্ধি করিয়া মহৎ কার্য্য উদ্ধার করিব এমন ভ্রম আমাদের দেশের কোথাও যদি প্রবেশ করে তবে আমাদের দেশের মহাকবিদের শিক্ষা মিথ্যা ও আমাদের দেশের মহাঋষিদের সাধনা ব্যর্থ হইবে। আমাদের দেশের পূজনীয় শাস্ত্র ফলের আসক্তি ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। কারণ, ফল লক্ষ্য নহে, ধর্ম্মই লক্ষ্য। দেশের কাজেও ভারতবর্ষ যেন এই শাস্ত্রবাক্য কদাচ বিস্মৃত না হয়। দেশের হিতসাধনের জন্য আমরা প্রাণ সমর্পণ করিব কেননা সেই রূপ মঙ্গলের জন্য প্রাণ সমর্পণ করাই ধর্ম্ম; কিন্তু কোনো ফল—সে ফলকে ইতিহাসে যত লোভনীয় বলিয়াই প্রচার করুক না—সেরূপ কোনো ফল লাভ করিবার জন্য ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দিব এরূপ নাস্তিকতাকে প্রশ্রয় দিলে রক্ষা পাইব না। বাইবেলে কথিত আছে, ফলের লোভে ধর্ম্মকে ত্যাগ করিয়া আদিম মানব স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া মরণ ধর্ম্ম লাভ করিয়াছে। ফল লাভ চরম লাভ নহে, ধর্ম্ম লাভেই লাভ, এ কথা যদি কেবল দেশ হিতের বেলাতেই না খাটে তবে দেশহিত মানুষের যথার্থ হিত নহে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আশ্বিন সংক্রান্তি।

ওগো সর্ব্বসহা মাতঃ পুণ্য জন্মভূমি
আজি বর্ষ অন্তে মোরা এসেছি আবার
তোমার উদার ক্রোড়ে আহ্বানে তোমার
সমবেত পুত্রগণে কি বলিবে তুমি
অয়ি শোকক্ষামেক্ষণা রুদ্ধওষ্ঠাধরা
অশ্রুভরা নয়নের নীরব ভাষায়?
জানি মোরা জানি তুমি কি দুখে কাতরা,
কেন এই ম্লান মুখ, ধূসর ধূলায়
শতচ্ছিন্ন ক্ষৌমবাস, শোণিত অঙ্কিত
তব বক্ষাঞ্চলে লেখা রুধির অক্ষরে
রূঢ় রাজবিধি-তরবারি-বিদারিত
বিক্ষত বক্ষের ব্যথা। জলস্থলাম্বরে
তোমার বেদনাতুর মাতৃমূর্ত্তি খানি
আজি কহিতেছে তব অকথিত বাণী।

রাখী॥

ওগো গ্রন্থি প্রীতিময়ী, প্রেমের বলয়,
আজি এ মিলোনোৎসবে হস্তহস্তান্তরে
তুমি ফিরিতেছ সুখে, প্রেমের নিগড়ে
হৃদয়ের সনে তুমি বাঁধিছ হৃদয়।
আজি এই শরতের মধুর প্রভাতে
কে তোমারে শুনালে গো বিচ্ছেদের বাণী,
নিদারুণ রাজ-আজ্ঞা-অশনি-সম্পাতে
দ্বিভক্ত বঙ্গের কথা? তুমি তুচ্ছ মানি'
নির্ম্মমতা বিদেশীর, স্নেহতন্তুজালে
বাঁধিলে সুদৃঢ় করি অন্তর বাহির।
হে পবিত্র-কর-সূত্র, শুধু কি মাতা'লে
প্রেমোৎসবে? শক্তি হীন হস্ত বাঙালীর
কর্ম্মের বলিষ্ঠ বর্ম্মে করিয়া মণ্ডিত,
করিলে স্বদেশ-সেবা ব্রতে নিয়োজিত।

পল্লী ব্যবস্থা।

সাম্রাজ্যের ব্যবস্থা সম্রাট করিতেছেন, সমাজের ব্যবস্থা নেতৃবর্গ করিতেছেন; তাহাতে যে অমিত শক্তি, প্রভূত অর্থ এবং অকুণ্ঠিত প্রভাব ও সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি-বৃত্তির প্রয়োজন, আমাদের সে সমস্তেরই অভাব, মুখ্যভাবে সে সকল ব্যবস্থার সঙ্গে আমাদের সম্পর্কও অতি অল্প। সম্রাটের বিধি নিষেধ পালন করিলেই তাঁহার সঙ্গে রাজা-প্রজা-সম্বন্ধ রক্ষিত হইল; নেতৃবর্গের উপদেশের মনন, ধারণ ও যথাশক্তি অনুষ্ঠানেই স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্য সাধিত হইল। কিন্তু আমার বাড়ী ঘর, আমার আত্মীয় পরিজন, আমার সুখশান্তি, আমার ধর্ম্মকর্ম্ম, আমার জীবন মরণ যে পল্লীতে তাহার দিকে আমি না চাহিলে কে চাহিবে,—তাহার অভাব আমি না ঘুচাইলে কে ঘুচাইবে? সম্রাটের নামের মহিমা আছে; দোহাই দিয়া দেখ, যথা সম্ভব ফল পাইবে। সম্রাটের অসীম দয়াও আছে; তাহা না থাকিলে ভারতের লক্ষ লক্ষ লোক প্লেগে মরিতেছে দেখিয়া সহানুভূতি সূচক পত্র লিখিতেন না। কিন্তু সম্রাট সর্ব্বব্যাপী নহেন; ভারতেই যখন পদার্পণ করিবারে অবসর তাঁহার নাই, তখন তোমার দুর্দ্দশা দেখিবার জন্য তিনি তোমার গণ্ডগ্রামে পদার্পণ করিতে আসিবেন, এ চিন্তা বাতুলতা।

পল্লীগ্রাম ক্ষুদ্র, নগণ্য; পল্লীগ্রামের প্রত্যেক 'আমি'ই ক্ষুদ্র, নগণ্য। কিন্তু নিতান্ত নগণ্য হইলেও জীবন-মরণ কাহারও নিকট নগণ্য নহে। অতএব আইস ভাই!—সকল গুলি ক্ষুদ্র 'আমি' সম্মিলিত হইয়া একটা 'আমরা' হই; এবং 'আমাদের' শুভাশুভের, 'আমাদের' জীবন-মরণের চিন্তা করি।

এ ক্ষেত্রে আমরাই আমাদের প্রধান সহায়, তাহার পরে জগন্মাতা মহাশক্তি—ঈশ্বর। ঈশ্বর পরে কেন? আগে একটা গল্প বলি। এক গ্রামে ফেণাই নামে একটি গরিব ছিল; তাহার মা তাহাকে ভাতের ফেণ খাওয়াইয়া মানুষ করিয়াছিল, তাই তাহার নাম ফেণাই। ফেণাই গরিব, কিন্তু বড় মাতৃভক্ত, তাহার মা মরিলে তাহার ইচ্ছা হইল মার বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ করে, কিন্তু হাতে কিছু নাই। ঘটিবাটি সব বিক্রয় করিয়া ফেণাই পাঁচটি টাকা সংগ্রহ করিল, এবং অবশিষ্ট অর্থের জন্য সে ভিক্ষায় বাহির হইল। তাহার অবস্থায় সকলের দয়া হইল, সকলেই কিছু কিছু দিল, এবং ফেণাইর মার বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ হইল। ঐ গ্রামে কানাই নামে

আর একটি গরিব লোক ছিল; তাহারও মা মরিল, সেও ফেণাইর দৃষ্টান্তে ভিক্ষায় বাহির হইল, কিন্তু কেহ তাহাকে ভিক্ষা দিল না। তাহার কারণ, লোকে জানিত, কানাইর এক বিধবা মাসী মরিবার সময়ে তাহাকে কতকগুলি টাকা দিয়া গিয়াছে, কিন্তু কানাই তাহা লুকাইয়া রাখিয়াছে, প্রাণান্তে খরচ করে না। কানাই সে টাকা বাহির করিল না, তাহার মার শ্রাদ্ধও হইল না।

আমাদের কোন্ বিষয়ে কতটুকু শক্তি আছে কি, না আছে, তাহা ঈশ্বর জানেন। আমরা যদি ফেণাইর দৃষ্টান্তের অনুসরণ করি—আমাদের যাহার যতটুকু শক্তি আছে, কর্ত্তব্য কর্ম্মে নিঃশেষে তাহার প্রয়োগ করি, তাহা হইলে অবশিষ্ট যে শক্তি ও সুযোগের প্রয়োজন হইবে, ঈশ্বর তাহা দিবেন। কিন্তু আমরা যদি কানাইর দৃষ্টান্তের অনুসরণ করি স্বার্থ বা আলস্যের পরামর্শ শুনিয়া যদি কর্ত্তব্য পালনে নিজের সমগ্র শক্তি-প্রয়োগে কৃপণতা করি, তবে ঈশ্বর কখনও সদয় হইবেন না, আমাদের কপট প্রার্থনা সফল করিবেন না, এই জন্যই বলি, আমাদের কর্ত্তব্য-পালনে, আমাদের হিত-সাধনে, আমাদের দুঃখ-মোচনে, এবং আমাদের উন্নতি-বিধানে, আমাদেরই যত্ন, চেষ্টা, কর্তৃত্ব, পরিশ্রম, স্বার্থত্যাগ—এক কথায় পুরুষকার অগ্রগণ্য, তাহার পরে জগদম্বার কৃপা। যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝ, তাহার জন্য প্রাণপণে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমে খাটিতে থাক, আর সেই সঙ্গে একমনে সর্ব্বসিদ্ধিদাতা ভগবান্‌কে ডাকিতে থাক, অবশ্য তিনি সহায় হইবেন।

পল্লী-সমিতি।

পল্লীবাসীদিগের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য, সকলের একত্র সম্মিলন। গ্রামের হিন্দু মুসলমান, ছোট বড়, ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, সকলে দিনান্তে একবার একত্র সম্মিলিত হও, পরস্পরের প্রতি সদ্ভাব বৃদ্ধি কর, পরস্পরের সুখ দুঃখের আলাপ কর, গ্রামের অতীতের সমালোচনা কর, ভবিষ্যতের চিন্তা কর, পণ্ডিতের শাস্ত্র বুঝ, ধার্ম্মিকের উপদেশ গ্রহণ কর, গরিবের দুঃখের কথায় কাণ দেও, ইতিহাসের গল্প শুন। রাজ-নীতি, রাজ-বিধি, রাজ্য-শাসন, এ সকল বিষয়ে তোমাদের চিন্তা ও আলোচনা করিবার অধিকার অবশ্যই আছে; কিন্তু এ সব বড় বড় বিষয়ের আলোচনায় বড় বড় মাথাই যখন খাটিতেছে, তখন এ সকল বিষয়ের চিন্তায় আপাততঃ মস্তিষ্ক ক্লান্ত না করিয়া তাঁহাদের সিদ্ধান্তই শুনিয়া রাখ; এবং যে ভাবনা তুমি ছাড়া আর কেহ ভাবিবে না, সেই ভাবনাই ভাব, যে কায তুমি ছাড়া আর কেহ করিয়া দিতে আসিবে না সেই কাযই কর।

সমস্ত গ্রামটাকে এই দৈনিক বা সাপ্তাহিক সম্মিলনের ফলে একটা পরিবারে পরিণত করিতে হইবে, মনে মনে এইরূপ একটা উদ্দেশ্য বা আদর্শ গঠন করিয়া রাখ। সর্ব্বদা যাহাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়,—আলাপে ভাব-বিনিময় হয়, সুখ-দুঃখের কথা শুনিয়া সমবেদনা জন্মে, যথাশক্তি পরস্পরের সুখের বৃদ্ধি ও দুঃখের লাঘব করিবার জন্য আগ্রহ জন্মে,—তাহারাইত আত্মীয়, তাহারাইত পরস্পর এক পরিবার। যে গ্রামে এই

অবস্থা আছে সে গ্রাম শান্তিনিকেতন, সে গ্রামে উন্নতির ব্যবস্থা সহজেই সুফল প্রসব করিবে। যে গ্রামে ইহার অভাব আছে সেখানে সর্ব্বাগ্রেই এই সম্মিলনের সুব্যবস্থা করিতে হইবে।

গ্রাম যদি খুব বড় হয়, তবে প্রত্যেক পাড়ার দৈনিক বা সাপ্তাহিক সম্মিলন, এবং সমস্ত পাড়া মিলিয়া মাসিক সম্মিলন করিলে ভাল হয়। ইহাতে কায ভাল হইবে, অথচ প্রত্যেক পাড়ার প্রত্যেকের সঙ্গে সমস্ত গ্রামের যোগ রহিবে। ক্ষেত্র যত ছোট হয়, কায তত ভাল হয়, ইহা জানা কথা। যে কৃষকের জমি অল্প, তাহার ফসল ভাল জন্মে, কেননা, জমি অল্প হইলে সে প্রত্যেক খণ্ড জমির জন্য যথোচিত যত্ন করিতে পারে। ইহাতে পাড়ায় পাড়ায় ভাল ফসলের জন্য প্রতিযোগিতা জন্মিতে পারে, সে আরও ভাল কথা। অমুক পাড়ায় বেশ ভাল কায হইতেছে, আমরাও ঐরূপ করিতে পারিব না কেন? ইহাই প্রতিযোগিতার ভাব। কিন্তু সাবধান, যেন হিংসা উপস্থিত না হয়, কেন না হিংসা, বিবাদ বিসংবাদ ঘটাইয়া কার্য্য ব্যর্থ করে, হৃদয়ের সর্ব্বনাশ ঘটায়। হিংসা পরের উন্নতি সহিতে পারে না, প্রতিযোগিতা নিজের অবনতি সহিতে পারে না, ইহাই প্রভেদ। যদি নিজের অবনতি দেখ, অন্যের উন্নতি লক্ষ্য করিয়া, অন্যের সাহায্য লইয়া সেই পথে চল; যদি নিজে উন্নত হও, অন্যকে ডাকিয়া নিজের পথ দেখাও, এবং তাহাকে উপদেশ দিয়া ও সাহায্য করিয়া উন্নতির পথে চালাও। ইহাই এক যোগে কার্য্য-সাধন, ইহাই একতার লক্ষণ। সর্ব্বদা মনে রাখ, আমরা একই পরিবারের লোক, আমরা একই শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ; আমাদের একই উদ্দেশ্য—আমাদের উন্নতি-বিধান, সর্ব্ববিষয়ে সকলের অবস্থা ভাল করা।

একটা কথা এস্থলে বলিয়া রাখা ভাল, কথাটা মনে রাখিয়া চলিলে আমাদের এ সম্মিলন স্থায়ী হইবে, নতুবা পদে পদে ইহা ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্ভাবনা দেখা দিবে। কথাটা এই যে, সকলে মিলিয়া কাজ করিতে গেলে নিজকে একটুকু ছোট করিতে হয়, নতুবা কাজ চলে না। মায়িক জগতে অহঙ্কার—অহং জ্ঞান—'আমি' সকলের আগে বটে, কিন্তু সামাজিক সম্মিলিত কার্য্যে—ঐটিকে সকলের পাছে রাখিতে হইবে, উহাকে আগে ছাড়িয়া দিলে সব, ভাঙ্গিয়া চূরিয়া একাকার করিয়া ফেলিবে। আমি যত বড়ই হই না কেন, দশের বুদ্ধি, দশের শক্তি, দশের সম্মান আমার চেয়ে বড়, একথা সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে; যে ইহা মনে রাখিতে জানে না, সে প্রতি কার্য্যে প্রতিপদে অপ্রতিভ হয়। সে দশ জনের সঙ্গে কখনও চলিতে পারে না; কাহারও সঙ্গে তাহার সদ্ভাব থাকে না।

সম্মিলনের কার্য্যে সর্ব্ববিষয়ে সকলের মত এক হইবে, ইহা সম্ভাবিত নহে, প্রার্থনীয়ও নহে। এই জন্য অধিকাংশের মতানুসারে কার্য্য চলা, সভা সমিতির নিয়ম; এ নিয়ম না রাখিলে কোন সভার কার্য্য চলে না, দশ জনে মিলিয়া কার্য্য করিবার সম্ভাবনা থাকেনা। তবে ইহাও দেখিতে হইবে, যে অল্প সংখ্যক সভ্যের মত মিলিল না, তাহাদের কোন স্বার্থ হানি না হয়,

তাহাদের কোন অনিষ্ট না ঘটে। সকলেরই মঙ্গল, সকলেরই উন্নতি, এই মূল উদ্দেশ্য সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে। অবশ্য স্বার্থত্যাগেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব, স্বার্থত্যাগেই মনুষ্যের মহত্ব; বিনা স্বার্থত্যাগে সমাজের কোন মঙ্গল, পরের কোন উপকার হইতে পারে না। স্বদেশের জন্য কত মহাত্মা কত প্রকারে স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন, কতজন কত প্রকারে দেবত্ব লাভ করিয়া স্বদেশীর নিকট—মানব জাতির নিকট চিরস্মরণীয় হইতেছেন, তাহার পরিচয় সকলেই পাইতেছেন। কিন্তু স্বার্থত্যাগ ইচ্ছাকৃত হওয়া চাই, স্বার্থত্যাগে জোর জবরদস্তী থাকিলে তাহার মূল্য কমিয়া যায়, তাহার মাহাত্ম্য থাকে না। আমাদের পল্লী-সমিতিতেও নিত্য নূতন স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন হইবে, দশজনের সুখ-শান্তি-সুবিধার জন্য অনেক সময়ে নিজের সুখ-শান্তি-সুবিধা উপেক্ষা করিবার সুযোগ উপস্থিত হইবে, এবং সে সুযোগকে ঈশ্বর-প্রেরিত আশীর্ব্বাদ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে; কিন্তু জোর জবরদস্তীর পূতি গন্ধ যেন পবিত্র স্বার্থত্যাগের পুণ্য-সৌরভ কলুষিত না করে।

গ্রামবাসীর মধ্যে প্রকৃত একতা, আত্মীয়তা, ভালবাসা জন্মিয়াছে কি না, কিসে ইহার পরীক্ষা হইবে—ইহার প্রমাণ কি? অনেকে অনেক প্রমাণ দিতে পারেন, কিন্তু আমি একটি সর্ব্ববাদিসম্মত প্রমাণের উল্লেখ করিব। আমি তোমাকে ভালবাসি কি না, তাহার পরিচয় সম্মুখে নহে, পশ্চাতে; প্রত্যক্ষে নহে, পরোক্ষে। তোমার সম্মুখে তোমাকে মিষ্ট কথা বলা, তোমার প্রিয়কার্য্য সাধন করা, তোমার মনস্তুষ্টি বিধান করা, ইহা ত সকলেই করে, অনেক সময়ে তোমাকে মজাইবার জন্য পরম শত্রু ও ইহা করিয়া থাকে। কিন্তু তোমার পরোক্ষে তোমার একটি নিন্দার কথা শুনিলে যদি আমার হৃদয়ে শেল বিঁধে, তোমার একটি তৃণ নষ্ট হইতেছে দেখিলে যদি আমার একটি মোহর নষ্ট হইয়া যাইতেছে বলিয়া মনে হয়, তোমার ছেলেটির একটা কাঁটা ফুটিলে যদি আমারই ছেলে ঘোর বিপন্ন হইয়াছে মনে করিয়া আমার চক্ষে জল আইসে, তবেই বুঝিবে আমি তোমার আত্মীয়। পল্লীগ্রামে এইরূপ পরোক্ষে উপকার করিবার সুযোগ প্রত্যহ প্রতি দণ্ডে উপস্থিত হইতেছে। যদি তোমার প্রাণে ভালবাসা থাকে, তুমি কখনও কাজ নাই বলিয়া আলস্যে দিন কাটাইতে পারিবে না। প্রাচীন সমাজের দুই জন স্বর্গীয় পুণ্যাত্মার কথা আমার মনে পড়িতেছে। এক জনের কার্য্য ছিল গ্রামের শস্য-ক্ষেত্র রক্ষা। তাঁহার চক্ষের সম্মুখে কাহারও শস্যের (অন্য বিষয়েরও বটে) কোন অনিষ্ট হইতে পারিত না। হয়ত অপরাহ্নে তিনি হাটে চলিয়াছেন, এমন সময়ে দেখিলেন কাহারও শস্য-ক্ষেত্রে গরু পড়িয়াছে, অমনি তাঁহার হাটে যাওয়া বন্ধ হইল। তিনি প্রথমে গো-স্বামীকে, তাহার পরে শস্য-স্বামীকে ডাকিতে লাগিলেন; যদি উত্তর না পাইলেন তবে নিজেই ধান্য-ক্ষেত্রে নামিয়া পড়িলেন, এবং প্রয়োজন হইলে গরুর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মাঠ দৌড়িয়া, তাহাকে তাহার গৃহস্থের ঘরে তুলিয়া দিয়া

সময় থাকিলে হাটে গেলেন, না থাকিলে এই পর্য্যন্তই হাট হইল! ইহা খোঁয়াড়ের জন্মের অনেক কাল পূর্ব্বের কথা। আর এক মহাত্মা শরীর খাটাইয়া কোন্ অশক্ত ব্যক্তির কি উপকার করিতে পারেন, গ্রামে তাহারই সুযোগ অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেন। কাহারও কুটীর খানি ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, তিনি তাহা মেরামত করিতে লাগিয়া গেলেন; কাহারও কুটীরের খুঁটিটা খসিয়া গিয়াছে, তিনি একটি বাঁশ কাটিয়া ঐস্থানের খুঁটিটা বদলাইয়া দিলেন; কোন গরিবের ঘরের ঝাঁপখানি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তিনি তাহা যোড়া দিয়া বাঁধিতে বসিলেন! ইহাতে তাঁহার যে একটা অসীম আনন্দ ছিল, মধ্যে মধ্যে তিনি তাহারও পরিচয় দিতেন। তিনি কাজ করিতে করিতে এক এক বার কাজ রাখিয়া; হাতে তালি দিয়া নাচিতে নাচিতে চক্ষু মুদিয়া গাইতেন।

"আমায় দেখা দাও হরি!

আমি শুনেছি পাণ্ডবসখা বংশীধারী।"

ইত্যাদি। তিনি অকৃতদার, তাঁহার কেহই ছিল না, কিন্তু গ্রাম শুদ্ধ সকলেই তাঁহার পরমাত্মীয় ছিল! পল্লীগ্রামের এই সকল মধুর দৃশ্য, এই সকল গভীর শিক্ষা এত শীঘ্রই ফুরাইয়া গেল! আবার কি সে দিন আসিতে পারে না?

গ্রামবাসীর মধ্যে পরস্পরের সহানুভূতি এবং সহায়তার আর একটা মহান্ উপকার আছে। প্রত্যেক সংকার্য্যেই স্বার্থত্যাগ, দৈন্য এবং বিপদের সম্ভাবনা। আমি বিপন্ন হইলে আমার পরিবারবর্গের কি দশা হইবে, কোন বিপৎসঙ্কুল সংকার্য্যে অগ্রসর হইবার সময়ে সর্ব্বপ্রথমে এই প্রশ্নই মনে উঠে। কিন্তু কার্য্যকর্ত্তা যদি জানেন তিনি বিপন্ন হইলেও তাঁহার পরিবারবর্গের দিকে চাহিবার জন্য তাঁহার আত্মীয় বন্ধুর অভাব নাই, তাহা হইলে তিনি হাসিতে হাসিতেই বিপদকে আলিঙ্গন করিতে পারেন। আমরা সকলেই কিছু সৎকার্য্য করিতে পারি না, কিন্তু সৎকার্য্যের সহায়তা কে না করিতে পারি? পূর্ব্বে লোকে গয়া কাশীতে যাইতে হইলে পরিবারবর্গকে পাড়া-প্রতিবেশীর হাতে সমর্পণ করিয়া যাইত; মক্কা মদিনায় যাত্রা করিলে এখনও তাই করে। সমর্পণেরই বা প্রয়োজন কি? গ্রামের মধ্যে কখন কাহার কতটুকু সহায়তার দরকার, তাহা কি আমরা বুঝি না? কিন্তু কেবল বুঝিলে হয় না, প্রাণের ব্যগ্রতায় অস্থির হওয়া চাই। আত্মীয়তা জন্মিলে ত অস্থির হইব, নতুবা পরের দুঃখে কে কোথায় অস্থির হয়? সেই জন্যই এই সম্মিলন, এই আত্মীয়তার প্রয়োজন। হিন্দু-মুসলমান তীর্থ-যাত্রার সময়ে পরিবারবর্গকে আত্মীয় বন্ধুর হাতে হাতে দিয়া যায়; কিন্তু জাপানবাসী যখন রুষের সঙ্গে যুদ্ধে মাতিয়াছিল, তখন তাহাদের সর্ব্বস্ব কাহার হাতে দিয়া গিয়াছিল? অথচ দেখ কার্য্যে কি হইল। জাপানবাসী গৃহস্থেরা তিন বৎসর ব্যাপী যুদ্ধে ব্যাপৃত, তাহাদের গরু বাছুর কে দেখে, তাহাদের জমি কে চষে? তখন বেকার যুবকেরা গ্রামে গ্রামে দল বাঁধিল, এবং যুদ্ধ-নিযুক্ত কৃষকদিগের ঘরে ঘরে যাইয়া, তাহাদের হাল লাঙ্গলে তাহাদেরই জমিতে শস্য জন্মাইয়া তাহাদেরই

গোলায় তুলিয়া দিল, অথচ কৃষকদের পরিবারবর্গ জানিতেও পারিল না কিসে কি হইল। যেদিকে তাকাই, আমাদের উপদেশের আমাদের শিক্ষার স্থল কোথায় নাই?

পল্লী-সমিতির কার্য্য।

নিয়ত সম্মিলনে, প্রত্যহ দেখা সাক্ষাতে আত্মীয়তার বৃদ্ধি হয় বটে; কিন্তু সম্মিলনের একটা উদ্দেশ্য, কোন না কোন একটা কার্য্য, একটা কিছু উপলক্ষ চাই, তাহা না হইলে সম্মিলন স্থায়ী হইতে পারে না। স্থান, কাল এবং গ্রাম্য লোকের অবস্থা বুঝিয়া এই সকল কার্য্যের অবধারণ করিতে হয়; যেমন সকল রোগে এক ঔষধ খাটে না, সেইরূপ সকল গ্রামের পক্ষে একই প্রকার কার্য্যের ব্যবস্থা চলিতে পারে না।

কিন্তু অনেকগুলি বিষয়ে বঙ্গদেশীয় পল্লীগ্রামের অবস্থা প্রায় একরূপ, সমস্ত পল্লীগ্রামের অভাব অসুবিধা প্রায়ই এক-প্রকার; অতএব এইসকল অভাব অসুবিধা কিসে দূর হইতে পারে, তাহারই আলোচনা করা যাউক।

এস্থলে একটি কথা সর্ব্বাগ্রে মনে রাখিতে হইবে,—আগে গ্রামটির রক্ষা হউক, পরে তাহার উন্নতি হইবে; আগে সকলে নিরাপদ হও, তাহার পরে সম্পদ-বৃদ্ধির চেষ্টা কর। মানুষের প্রধান সম্পদ ধন-প্রাণ, আগে প্রাণ, তারপরে ধন রক্ষা কর; যখন ধন-প্রাণ নিরাপদ হইবে, তখন ধনবৃদ্ধি এবং প্রাণবৃদ্ধি বা দীর্ঘায়ুঃ লাভের চেষ্টা আপনা হইতে আসিবে। কিন্তু সভ্য-সমাজে ধন এবং প্রাণ প্রায় তুল্য-মূল্য হইয়া উঠিয়াছে। প্রাণ থাকিলে ধন উপার্জ্জন হইতে পারে, একথা যেমন সত্য, ধনের অভাবে প্রাণ যায়, ইহাও তেমনি সত্য। তথাপি প্রাণেরই শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিতে হইবে, কারণ প্রাণের জন্যই ধনের প্রয়োজন।

১। অন্ন-সংস্থান। অন্নের প্রয়োজন সকলের আগে। ক্ষুধা হইলেই যেন খাইতে পাই, দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে যেন অন্নাভাবে কেহ না মরি, ইহাই সকলের আগে দেখিতে হইবে। ইহার উপায়, সম্মিলিত মূলধনে শস্য-ভাণ্ডার স্থাপন। ইহাকে দুর্ভিক্ষ-ভাণ্ডার বল, ধর্ম্ম-গোলা বল, নামে কিছু আইসে যায় না; কিন্তু দুর্ভিক্ষে কেহই না মরিয়া সকলেই বাঁচিবার এই এক উপায়। ভারতে বিদেশীর প্রভুত্ব থাকিতে, ভারতে অবাধ বাণিজ্য অব্যাহত থাকিতে, দুর্ভিক্ষে প্রাণ বাঁচাইবার ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায় বোধ হয় আর হইতে পারে না। মূলধন শুনিয়া ভয় পাইও না; ধান চাউল, পয়সা, যখন যাহার যাহা যোটে এখানে আনিয়া জমা দেও, তাহাই তোমার মূলধন হইল। অল্প বলিয়া অবহেলা করিও না—তিল কুড়াইলে তাল হয়, একথা ত সকলেই জান। তা ছাড়া টাকা লাগাইলে যেমন সুদের টাকা আইসে, ধান লাগাইলে সেইরূপ সুদের ধান আসিতে পারিবে, সে ব্যবস্থাও কর। গোলা-নির্ম্মাণ, হিসাবপত্র রক্ষণ, ধান্য দেওয়া, লওয়া, মাপা, রাখা, শুকা, পাহারা ইত্যাদি কার্য্যের ভার যাহার যেমন শক্তি সকলে ভাগে-যোগে গ্রহণ কর, সম্পাদন কর। দুই এক জনের উপর

ভার দিয়া আর সকলে যদি নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাক, দিনে দিনে মাসে মাসে খবর না লও, উন্নতি অবনতি নিজের চক্ষে না দেখ, তবে ইহা কখনও সফল হইবে না। একজন যতই বুদ্ধিমান, যতই পরিশ্রমী, যতই স্বার্থত্যাগী হউক, দশজনের কাজে সকলের উৎসাহ এবং সহায়তা না পাইলে সে কখনই সুফল দেখাইতে সমর্থ হইবে না।

২। জল-সংস্থান। জলের এক নাম জীবন, আর এক নাম নারায়ণ। জল যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনি পবিত্র। জলকে যদি নারায়ণ বলিয়া মানি, এবং তাহার পবিত্রতা রক্ষা করি, তাহা হইলে সেও আমাদের জীবনের কার্য্য করিবে—আমাদিগকে সুস্থ সবল ও দীর্ঘায়ুঃ করিয়া রাখিবে। আর জলের যদি অনাদর অমর্য্যাদা করি, জলের পবিত্রতা নষ্ট করিয়া যদি তাহা পান এবং তাহাতে স্নান করি, তাহা হইলে জলও তাহার প্রতিশোধ লইবে, জল অমৃতের কার্য্য না করিয়া গরলের কার্য্য করিবে, জল আমাদের জীবন না হইয়া আমাদের মৃত্যুর কারণ হইবে। আমাদের অস্বাস্থ্যের যত কারণ, আমাদের বসন্ত, কলেরা, ম্যালেরিয়া প্রভৃতির যত কারণ, এক কথায় আমাদের অকাল-মৃত্যুর যতগুলি কারণ আছে, কেবল অন্নাভাব ব্যতীত আর প্রায় সমস্ত গুলিই এই জলের মধ্যে লুকাইয়া থাকে। জল নিজে পবিত্র, কিন্তু অন্যকে পবিত্র করিয়া সে নিজে অপবিত্র হয়। তুমি জলে স্নান করিয়া পবিত্র হইলে, কিন্তু তোমার গায়ের ময়লা ধুইয়া লইয়া জল অপবিত্র হইল। সমস্ত ময়লা দুর্গন্ধ আকর্ষণ করিয়া লইবার একটা অসাধারণ শক্তিই জলের আছে; এমন কি, বায়ুতে যে ময়লা, দুর্গন্ধ, রোগাণু প্রভৃতি অনিষ্টকর পদার্থ থাকে, জল তাহাও টানিয়া লয়, এই জন্য নির্ম্মল জলও কিছুকাল অনাবৃত থাকিলে তাহা ঘোলা হয়, তাহাতে ময়লা জন্মে। শাদা চক্ষে ইহা দেখিতে না পাও, অণুবীক্ষণ দেখাইয়া দিতে প্রস্তুত আছে। পানীয় জল আবৃত রাখিবার প্রথা প্রাচীন।

ইংরাজ আমাদের দেশে আমাদের সঙ্গেই বাস করিতেছে, এই খাদ্য জল, এই বাত রৌদ্র, তাহার শরীরেও ক্রিয়া করিতেছে; তথাপি একটি ইংরাজ ম্যালেরিয়ায় মরে না, কিন্তু আমরা ম্যালেরিয়ার জ্বরে মরিয়া নির্ম্মূল হইতেছি। ইহার কারণ কি বলিতে পার? কোন্ রক্ষা-কবচ ইংরাজকে এভাবে রক্ষা করিতেছে তাহা জান? এ প্রশ্নের উত্তর এই জলে, ইংরাজের রক্ষা-কবচ এই জল। ইংরাজ পিপাসায় মরিবে, তবু আমাদের মত যে সে জল পান করিবে না। ইংরাজের ভ্রমণের সময়েও বোতলে বোতলে বাক্স ভরা জল সঙ্গে সঙ্গে চলে। আমাদের দেশ, আমাদের গ্রাম, সুতরাং আমাদের জল সঙ্গে লইয়া বেড়াইবার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু গ্রামে গ্রামে বিশুদ্ধ পানীয় জল যেন চাহিলেই পাইতে পারি—প্রয়োজন হইলে পয়সা দিয়াও যেন পাইতে পারি, এমন ব্যবস্থা থাকা উচিত। সহজ কথায় বলিতে গেলে, আমরা দুধটা যেমন যত্নে রাখি, পানীয় জলটাও সেইরূপ যত্নে রাখা কর্ত্তব্য। জলে পয়সা লাগে না বলিয়া যে জল অযত্নের জিনিস, তাহা নহে।

জল প্রধানতঃ আমাদের ত্রিবিধ কার্য্যে লাগে,—পান, স্নান, এবং ধৌতি। যে জলাশয়ের জল পানার্থ ব্যবহার হয়, তাহাতে নামিবার ঘাট থাকিবে না; তাহার জল আলগা দূরে থাকিয়া তুলিয়া লইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যে জলাশয়ে অবগাহন স্নানের ব্যবস্থা থাকিবে, তাহাতে মল-মূত্র ত্যাগ এবং ধৌতিকার্য্য না চলে, তাহা দেখিতে হইবে। জল যে নারায়ণ, ইহা স্নানের সময়েও মনে রাখিতে হইবে—উপরে আগে মূত্রত্যাগ করিয়া তবে সকলেরই স্নানার্থ জলে নামিতে হইবে। বাসন ধোয়া, কাপড় কাচা প্রভৃতি ধৌতি কার্য্যের জল স্নান-পান-রন্ধন প্রভৃতি কোন ভাল কাযে যেন না লাগে।

ধৌতি-কার্য্যের উপযুক্ত জলের সংস্থান প্রত্যেক বাড়ীতেই প্রায় থাকে, না থাকিলে চলে না। কিন্তু স্নান-পানের জলাশয় প্রত্যেক বাড়ীতেই থাকিবে, ইহা অসম্ভব। কোন কোন স্থলে একটা কুসংস্কার আছে, অন্যের পুখুর হইতে জল আনা অপমানের কথা। এই জন্য অনেকে নিজের পুখুরের কদর্য্য জল ব্যবহার করেন, তথাপি অন্যের পুখুরের ভাল জল আনেন না। যত শীঘ্র এ কুসংস্কার দূর হয়, ততই মঙ্গল। পানীয় এবং স্নানীয় জলের পুখুর গ্রামের মধ্যে দুই একটি করিয়া থাকিলেই যথেষ্ট। ঘাটে যাইবার সুগম পথ, আর বিশুদ্ধ জল পান করিব বলিয়া মনে মনে দৃঢ় সঙ্কল্প, এই দুইটি বর্ত্তমান থাকিলেই জলের অভাব ঘুচিল।

কিন্তু যে গ্রামে জলাশয়ের অভাব, অথচ সেখানে দাতা ধনী লোক নাই, সে গ্রামের দশা কি হইবে? এ চিন্তা সেই গ্রামের দশ জনকে মিলিয়া করিতে হইবে, আর সেই গ্রামের স্বেচ্ছাসেবকদিগকে এ পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। ভিক্ষার জন্য বাহির হওয়া, পরের উপরে নির্ভর করা বিড়ম্বনা। আত্ম-নির্ভরে দাঁড়াইয়া নিজের অভাব নিজেকেই পূরণ করিয়া লইতে হইবে। গবর্ণমেণ্টের অর্থে আমাদের দাবী আছে, কেননা উহা আমাদেরই দেওয়া; সুতরাং রাস্তা জলাশয় প্রভৃতির জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করিতে পারি। কিন্তু যদি সে প্রার্থনা পূর্ণ না হয়, তবে কি আমরা হাত পা থাকিতে বিনা জলে মরিব?

৩। আলোক-বায়ু-সংস্থান। যে স্থানে আলোক নাই, সে স্থানে একটি বীজ বুনিলে তাহা অঙ্কুরিত হইয়াই মরিয়া যায়; একটি চারা রোপণ করিলে তাহা বাড়িতে না পারিয়াই মরিয়া যায়। জীবনের পক্ষে আলোকের কত প্রয়োজন, ইহাই তাহার প্রমাণ।

বায়ুর প্রয়োজন আরও অধিক। আলোক না পাইলে কিছু কাল বাঁচি, কিন্তু বায়ু না পাইলে তখনই মরি। অপবিত্র দুর্গন্ধ রুদ্ধ বায়ু সেবন করিলে তখনই মরি না বটে, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে নানা রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া মরি।

ঘরের বাহিরে মুক্ত আকাশ-তলে আলোকে স্নান করিয়া যে নির্ম্মল বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহারই নাম প্রাণ-বায়ু,—তাহাতেই শোণিত শোধিত, শরীর সুস্থ, এবং আয়ুঃ বর্দ্ধিত হয়। ইহা যখন আমাদের প্রাণ, তখন ইহার অনাদরে অবশ্যই মৃত্যু। মনে রাখ, জল জীবন এবং বায়ু প্রাণ।

কিন্তু এই আলোক ও বায়ুর জন্য আমাদিগকে গোলাও বাঁধিতে হয় না, পুখুরও কাটিতে হয় না। ভগবানের এই দান সর্ব্বত্র প্রচুর পরিমাণে দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, চাই কেবল গ্রহণ করা, চাই কেবল দ্বার উন্মুক্ত করিয়া ঘরে আসিতে দেওয়া। আমরা যে খর্ব্বকায়, চিররুগ্ন, হীনবীর্য্য ও অল্পায়ু, আমাদের বাস-গৃহে প্রচুর আলোক ও বায়ু-সঞ্চরণের প্রতিবন্ধকতাই তাহার প্রধান কারণ। দিন রাত্রি দরজা খুলিয়া রাখিতে বলিতেছি না, ঝড় জলের সময়েও দরজা জানালা খুলিয়া রাখিয়া ঝড়ে জলে জিনিস পত্র নষ্ট করিতে বলিতেছি না; কিন্তু বাতায়নগুলির এমন বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে যে, দিন রাত্রির মধ্যে কখনও ঘরের মধ্যে বায়ু-সঞ্চার সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ না হয়। জানালার নামই বাতায়ন—বায়ুর গমনাগমনের পথ।

৪। ধন-রক্ষা-বিধান। ধনীর শত্রু অনেক—শাস্ত্রে অগ্নি, জল, তস্কর, দস্যু, রাজা এবং স্বজন, ইঁহারা সকলেই ধনীর ভয়ের কারণ বলিয়া কীর্ত্তিত। যাহা হউক, অগ্নি এবং তস্কর যে ধনের শত্রু, এ কথা কাহাকেও বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। প্রতি বৎসর অগ্নিদাহে কত লোকের সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহা কে না জানে? তথাপি এই সর্ব্বনাশ-নিবারণের বিশেষ কোন চেষ্টা লক্ষিত হয় না। খড়ের ঘর যে আগুনের বাসা, সে জ্ঞান সকলেরই আছে, তথাপি লোকে প্রতি বৎসর বহু টাকা খরচ করিয়া খড়ের ঘরই প্রস্তুত করে। যাহারা নিতান্ত দরিদ্র, তাহারা অবশ্যই নিরুপায়; কিন্তু অনেকে ইচ্ছা করিলে দুই চারি বৎসরের যত্নেও একটা দালান দিতে পারে, আর একটা করিয়া মাটির কোঠা করা বোধ হয় সকলের পক্ষেই সম্ভব। পাড়ায় একজন ধনীর বাড়ীতে একটা দালান থাকিলে পাড়ার দরিদ্রেরাও নিতান্ত মূল্যবান্ জিনিসগুলি তাহাতে রাখিতে পারে, অধিকন্তু দস্যু-তস্করের আক্রমণ হইতে ধনীর গৃহ রক্ষা করিবার পক্ষে তাহাদের একটা স্বার্থ জন্মে। কিন্তু এদিকে দৃষ্টি নাই। খড়ের ঘরগুলি পুড়িয়া ছাই হইল, গৃহস্থের সর্ব্বনাশ হইয়া গেল, কিন্তু আবার সেই পোড়া ভিটাতে বড় বড় খড়ের ঘরই উঠিতে লাগিল! অনেক সৌখীন পুরুষ খড়ের ঘরে যে অর্থ ব্যয় করেন, তাহাতে ছোট খাট দালান একটা অনায়াসে হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু সে কথা তাঁহাদের মনেই উঠে না। অনেকের আবার দালান সয় না বলিয়া কুসংস্কার আছে। হয় ত এক সময়ে দালানের উদ্যোগ হইতেছিল, এমন সময়ে একটা দুর্ঘটনা ঘটিল, অমনি সমস্ত দোষ দালানের ঘাড়ে পড়িল, দালান অসহ্য হইয়া গেল! কেন, আর কি কিছুতে দুর্ঘটনা ঘটে না? কত খড়ের ঘর আরম্ভ হইলেও দুর্ঘটনা ঘটে, তাই বলিয়া খড়ের ঘর সয় না বলিয়াত শুনিতে পাই না। কতদিন আহারে বসিলেও কত দুর্ঘটনা ঘটে, সে জন্য আহার কেহ সয় না বলিয়া ছাড়িয়া দেয় না।

ফলতঃ এ সব বিষয় অনেকটা হিতাহিত চিন্তা এবং অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। অনেক স্থলে দালান দেওয়া এমন অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে যে, ঘরে অন্ন নাই তবু কোঠা

ঘর চাই। হুগলি, বর্দ্ধমান প্রভৃতি অঞ্চলে নিতান্ত নিরন্ন যে, সেও মাটির দেয়াল দিয়া ঘরে বাস করে। যাহা অভ্যস্ত হইয়া যায়, তাহা প্রয়োজনের মধ্যে দাঁড়ায়; যাহা প্রয়োজন, তাহা লোকে যেমন করিয়াই হউক করে। যাহা ভাল, তাহা ভাল বলিয়া প্রকৃত রূপে উপলব্ধি কর, তাহার পরে অভ্যাস প্রাণের টানে আপনা হইতে আসিবে। মানুষের স্বভাবই এই, সে যাহা ভাল বলিয়া বুঝে, তাহা আপনা হইতেই করে।

আমি খড়ের ঘরের বিরোধী নই। বাসের পক্ষে খড়ের ঘরই প্রশস্ত। ইহা ভূমিকম্পে পড়ে না, পড়িলেও ইহাতে সহজে প্রাণাত্যয় ঘটে না। ইহাতে বিমুক্ত প্রাণ-বায়ু সহজে প্রবেশ করে, অবাধে বিচরণ করে, এবং শীতাতপের সমতা অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে রক্ষা করে, সুতরাং ইহাতে স্বাস্থ্য ভাল থাকে, জীবন দীর্ঘস্থায়ী হয়। কিন্তু ধন-রক্ষার পক্ষে ইহা কোনই কাজের নহে, সুতরাং ধন-রক্ষার জন্য পাকা বন্দোবস্ত করাই উচিত।

দস্যু-তস্করের হাতে পাকাঘর সম্পূর্ণ নিরাপদ না হইলেও অপেক্ষাকৃত নিরাপদ, ইহাতে প্রবেশ করিতে অপেক্ষাকৃত অধিক সময় লাগে। কিন্তু ঘর পাকা হইলেই দস্যু-তস্করের হাত হইতে বাঁচা যায় না, ইহার জন্য আরও উপায় চাই। গবর্ণমেণ্ট গৃহস্থকে নিরস্ত্র করিয়া আত্মরক্ষার উপায় হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন, কেবল চুরি ডাকাতী হইয়া গেলে থানায় সংবাদ দেওয়ার ব্যবস্থা এবং অধিকার রাখিয়াছেন মাত্র। তাহাতেও গৃহস্থের কত লাঞ্ছনা, কত প্রতি-বন্ধক, কত অর্থের প্রয়োজন, তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন। অতএব চুরি ডাকা-তীর প্রতিবিধান অপেক্ষা চুরি ডাকাতী যাহাতে না হয়, সেই ব্যবস্থাই কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্টের সে ব্যবস্থা করিবার শক্তি কতটা আছে জানি না, কিন্তু যে পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট সেরূপ কোন ব্যবস্থা না করিতেছেন, সে পর্য্যন্ত পল্লীবাসীদিগকেই আত্মরক্ষার জন্য তাহা করিতে হইবে। গ্রাম রক্ষার জন্য সকলে এক বাক্যে এক পরামর্শে চলিলে চুরি ডাকাতী ত নিশ্চয়ই কমিবে, কালে এই সকল ব্যবসায় অসম্ভবও হইতে পারে।

প্রাচীর দ্বারা বাড়ী বেষ্টন করা দরিদ্রের পক্ষে কঠিন হইতে পারে, কিন্তু যাহার ধন-খ্যাতি দস্যু তস্করকে প্রলুব্ধ করে তাহার পক্ষে নিশ্চয়ই কঠিন নহে। প্রাচীর এবং প্রাচীর-দ্বার দস্যু-তস্করের প্রথম প্রতিবন্ধক; দ্বিতীয় প্রতিবন্ধক ধনাগারের দ্বার। এই সকল দ্বারের গঠন এবং রুদ্ধ করিবার প্রণালী উভয়ই অভিনব হওয়া চাই। সচরাচর দস্যুদের একজন মই লাগাইয়া প্রাচীর লঙ্ঘিয়া ভিতরের খিল খুলিয়া দেয়, এবং সেই পথে সকলে নিঃশব্দে বাড়ীতে প্রবেশ করে। কিন্তু খিলে যদি এমন কোন সঙ্কেত থাকে যে বাড়ীর লোক ভিন্ন অন্য লোকে তাহা খুলিতে না পারে, তাহা হইলে দস্যুকে অগত্যা দরজা ভাঙ্গিয়াই বাড়ীতে প্রবেশ করিতে হইবে। যখন দস্যুরা বাড়ীর সদর দরজায় আঘাত করিতে বাধ্য হয়, তখন বাড়ীর গৃহস্থ কুম্ভকর্ণ হইলেও জাগিবে —কেহ না কেহ জাগিবে—এমন আশা করা

যায়। দৃঢ় দরজা ভাঙ্গিতে কিছু না কিছু সময় লাগেই। দরজা এমন ভাবে নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে যে, ভিতরে একজন লোক একটা বাঁশের ফলা হাতে লইয়া দাঁড়াইয়ে যেই দ্বারের সন্নিহিত হউক তাহাকে আহত করিতে পারে। যদি দস্যুরা সকলেই মই লাগাইয়া প্রাচীর লঙ্ঘন করে, তথাপি ধনাগারের দ্বারে তাহাদিগকে আবার এই বিপদে পড়িতে হইবে, সেখানে মই তাহাদিগকে সাহায্য করিতে পারিবে না।

গৃহস্থের বোধ হয় এই খানেই কর্ত্তব্যের শেষ, ইহাতেও দস্যু নিরস্ত না হইলে পলায়ন ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। সে পলায়নও সহজ নহে, তাহার ব্যবস্থাও বাড়ী নির্ম্মাণের সময়েই করিতে হইবে।

এখন গ্রামবাসীর কর্ত্তব্য বিচার্য্য। গৃহস্থ দস্যুর আক্রমণ টের পাইবামাত্র আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই শঙ্খ, শিঙ্গা, বাঁশী বা তূর্য্য-ধ্বনি দ্বারা গ্রামবাসীকে সংবাদ দিবে। গ্রামবাসী সংবাদ পাইবামাত্র যাহার যে অস্ত্র থাকে, অন্ততঃ ফলাকাটা বাঁশ লইয়া কোন নির্দ্দিষ্ট সঙ্কেতস্থানে সমবেত হইবে এবং সময়োচিত পরামর্শ করিবে। গ্রামবাসীর কর্ত্তব্য দস্যুদিগকে ধন হরণ হইতে নিবৃত্ত করা, আক্রমণ ও তর্জ্জন গর্জ্জনে তাহাদিগকে শঙ্কিত করা, দূরবর্ত্তী গ্রামবাসীকে আহ্বান করা, অন্ততঃ একটিকেও ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করা, পলায়নে প্রতিবন্ধকতা করা, সেনাক্ত করিবার জন্য তাহাদের শরীরে চিহ্ন রাখা ও অস্ত্র এবং বস্ত্রাদি কাড়িয়া রাখা, অধিকন্ত পুলিসে তৎক্ষণাৎ সংবাদ দেওয়া। ইহার কোন্‌টি কোথায় খাটে, অবস্থা-বিবেচনায় তাহা অবধারণ করিতে হইবে। দস্যুরা সচরাচর আক্রান্ত বাড়ীর প্রত্যেক মোহাড়ায় বাছা বাছা লোক পাহারা রাখে, ইহারা গ্রামবাসীকে বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইতে দেয় না। অস্ত্র-বল এবং জন-বল থাকিলে একটা মোহাড়া দলে বলে আক্রমণ করিয়া দুই একটা দস্যুকে বাঁধিয়া ফেলাই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। দস্যুরা যেমন আক্রমণ কার্য্যকেই দিন রাত্রি ধ্যান-ধারণার বিষয় করিয়াছে, আমরাও যদি আত্মরক্ষা-কার্য্যকে সেইরূপ করি, কেন কৃতকার্য্য হইব না? বাড়ী প্রস্তুত করিবার সময়ে ধনিগণ সুখ এবং সৌন্দর্য্যের কথা অবশ্যই ভাবেন, কিন্তু আপৎকালে আত্মরক্ষার কথা তেমন ভাবে চিন্তা করেন বলিয়া বোধ হয় না।

এ সকল বিষয়ে একজনের বিপদ হইলে গ্রামস্থ সকলেরই তুল্য বিপদ মনে করা উচিত। বোলতা, ভীমরুল এবং মৌমাছি এ সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষক।

৫। শিক্ষা-বিধান। শিক্ষাই যদি মানুষের সর্ব্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠতা এবং উন্নতির কারণ হয়, তাহা হইলে পল্লীগ্রামের প্রত্যেক বালক ও বালিকা যাহাতে কিছু কিছু শিক্ষা লাভ করিতে পারে, পল্লীবাসী মাত্রেরই সে বিষয়ে যত্ন করা উচিত। গবর্ণমেণ্টের কৃপায় অনেক গ্রামেই বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু এখনও অনেক গ্রাম বাকী আছে, বিশেষতঃ আপামর সাধারণ ধনী দরিদ্র সকলেরই শিক্ষালাভের অবাধ ব্যবস্থা হইবার এখনও অনেক বিলম্ব আছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের দিকে চাহিয়া থাকিয়া, এ বিষয়ে আমাদের যতটুকু শক্তি আছে

তাহাকে ঘুম পাড়াইয়া রাখা উচিত নহে। যাহা আমাদের শক্তির অতীত, তাহাতেই গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী হওয়া উচিত; কিন্তু যাহা আমাদের শক্তির আয়ত্ত, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের দ্বারস্থ হওয়া শোভা পায় না, আর গবর্ণমেণ্ট আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ না করিলেও আমাদের নির্ব্বুদ্ধিতা ভিন্ন অন্য কাহাকেও দোষ দেওয়া যায় না। ঈশ্বর আমাদিগকে যে শক্তি দিয়াছেন, তাহার যথোচিত পরিচালনাই সুখ এবং উন্নতির একমাত্র মূল; যাহারা সর্ব্ব বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকে, তাহাদের চক্ষের জল কখনও মুছে না, তাহাদের দুর্দ্দিন ও দুর্দ্দশা যাবচ্চন্দ্রদিবাকর ঘুচে না।

উচ্চশিক্ষা বিপুল ব্যয় সাধ্য, তাহা সকলের ভাগ্যে ঘটে না; কিন্তু নিম্ন শিক্ষাতে কেহই যাহাতে বঞ্চিত না হয়, গ্রামবাসী ইচ্ছা করিলে সে ব্যবস্থা করিতে পারেন। বাল্যকালের সেই পাঠশালার কথা স্মরণ আছে। তখন লেখা এবং শেখা, এই দুইটা কথাই জানা ছিল; পড়া তখন সকলের নীচে ছিল। তখন প্রত্যেকটি অক্ষরই লিখিয়া শিখিতে হইত, বিনা লেখায় কিছুই শিখিবার উপায় ছিল না। তখনকার শিক্ষার উপকরণ ছিল, প্রথমতঃ ধূলা, তাহার পরে কালি, কলম এবং পাতা। কাগজে লিখিবার অধিকার যে পাইত, সে গৌরব অনুভব করিত। খরচের মধ্যে কাগজ, আর যৎকিঞ্চিৎ মাসিক বেতন। বেতনের হার মাসিক চারি আনার অধিক কোথাও ছিল না। যে ছাত্র ইহাও না দিতে পারিত, অথচ বুদ্ধি এবং চরিত্রে শিক্ষককে খুসী রাখিত, সে বিনা বেতনেই শিক্ষা পাইত। কতজনে পয়সার অভাবে ধান, চাউল, মটর, কলাই দিত, শিক্ষক তাহা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন। জামাযোড়া এবং ছাতা জুতার সাহায্য না লইয়াও তখনকার শিক্ষা অবাধে হইতে পারিত। তখনকার শিক্ষা ছিল ব্যয়শূন্য, এখনকার শিক্ষা হইয়াছে ব্যয়বহুল; তখনকার শিক্ষার গুণ ছিল কার্য্যপটুতা, এখন হইয়াছে বাক্যপটুতা। তখন যাহারা লেখা পড়া শিখিত, তাহারা স্থান-কাল-পাত্র বিচার করিয়া ব্যবহার ও ব্যবস্থা করিতে জানিত, শ্রেয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে পারিত; এখন শ্রেয়ের স্থান প্রেয় অধিকার করিয়াছে, পুস্তকগত মুখস্থ বিদ্যার পাণ্ডিত্য ব্যবহার ও ব্যবস্থা বিষয়ে একেবারে মূর্খ করিয়া তুলিয়াছে! পৈত্রিক ভিটা বেচিয়া মূর্খতা লাভ তখন হইত না, এখন হয়।

এখন সে সময় আর আসিতে পারে না বটে, কিন্তু সে শিক্ষা, সে সারল্য, সে কার্য্যপটুতা, সে ব্যবহার-বিজ্ঞতা, সেই শ্রেয়োঽনুরাগ, সেই প্রেয়বিরাগ কি আবার আসিতে পারে না? যত্নে সময় ফিরে না, কিন্তু যত্নে শ্রেয়ঃ সাধন হইতে পারে, ব্যবস্থার সংস্কার হইতে পারে, শুভকার্য্যে অনুরাগ, স্বার্থত্যাগ ও ক্লেশ স্বীকারের প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে। ইহাকেই পুরুষকার বলে—এই যত্নেই মানুষের মহত্ত্ব।

পল্লীগ্রামে উচ্চশিক্ষা অসম্ভব হইলেও যত্নদ্বারা মানুষের মহত্ত্ব-লাভ সম্পূর্ণ সম্ভব। কিন্তু সময়ানুসারে নিম্নশিক্ষার পরিধি

বিলক্ষণ বিস্তৃত হইয়াছে, এখন আর পূর্ব্বেকার গুরুমহাশয়ের দ্বারা ইহা সম্পাদিত হইতে পারে না, এখন ইহাতে উচ্চশিক্ষিতের সহায়তার বিশেষ প্রয়োজন। যে সকল উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোক পল্লীগ্রামে বাস করেন, চাকুরী বা সৌখীনতার অনুরোধে বাড়ী ছাড়িয়া স্থানান্তরে থাকিতে বাধ্য হন না, তাঁহাদের পক্ষে দৈনিক ২।১ ঘণ্টা সময় ব্যয় করিয়া জন-সমাজের উপকার সাধন করিবার এ একটা মহা সুযোগ। যাঁহারা অধ্যয়ন, অধ্যাপন, চাকুরী, ব্যবসায় বা অন্য উপলক্ষে স্থানান্তরে থাকেন; তাঁহারাও দুর্গোৎসবাদি উপলক্ষে যখন বাড়ীতে আইসেন, তখন অনায়াসে এ ব্যাপারে মনোযোগ দিতে পারেন। যাঁহারা অল্প দিনের জন্য বাড়ীতে আইসেন, তাঁহাদিগের পক্ষে বালক বালিকাদিগকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া কঠিন হইবে, কারণ সেই অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহাদিগকে অনেক বৈষয়িক ব্যাপার সম্পাদন করিতে হয়; কিন্তু মধ্যে মধ্যে সকলে মিলিয়া পরামর্শ করা, প্রয়োজনীয় অর্থ ও শিক্ষকের বন্দোবস্ত করা, ছাত্রদিগকে পরীক্ষা করিয়া পারিতোষিক দেওয়া এবং শিক্ষকদিগকে শিক্ষার উদ্দেশ্য, প্রকৃতি ও প্রণালী সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া, ইত্যাদি বিবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠানদ্বারা তাঁহারা প্রাথমিক শিক্ষার প্রকৃত উন্নতি সাধন করিতে পারেন।

প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপযুক্ত শিক্ষক লাভ করা বড় কঠিন। সে জিনিসটাই সাধারণ হইতে স্বতন্ত্র উপাদানে গঠিত। শিক্ষক একাধারে মাতা, পিতা, ভাই, ভগিনী, সখা, গুরু এবং শাসন কর্ত্তা; তিনি নির্লোভ, নিঃস্বার্থ, নিরহঙ্কার,—তাঁহার চিত্ত উদ্বেগশূন্য, বিক্ষেপশূন্য, বিরক্তিশূন্য, সর্ব্বংসহ সহিষ্ণু; তাঁহার হৃদয়ে ছাত্রের হিতকামনা ভিন্ন আর কিছুই স্থান পায় না। এরূপ শিক্ষক বিজ্ঞাপন দিলেই মিলিবে, অথবা গবর্ণমেণ্টের কারখানায় তাহা গঠিত হইবে, একথা মনে করাই ভুল। কাহার প্রকৃতি কিরূপ উদার, কাহার চরিত্র কেমন নির্ম্মল, কাহার আশা ভরসা, সদিচ্ছা এবং আস্তিকতা কতটা দৃঢ়, তাহা গ্রামবাসী যেমন জানে, অন্যে তেমন জানে না। যাহাকে এইরূপ গুণসম্পন্ন দেখিতে পাও, তাহাকে শিক্ষকের আসনে বসাও, এবং তাহার প্রতি নিম্নলিখিত তিনটি কর্ত্তব্য পালন কর, তাহা হইলেই পল্লীগ্রামে প্রকৃত প্রাথমিক-শিক্ষার অভাব দূর হইবে।

প্রথম কর্ত্তব্য। শিক্ষকের সংসারের ভারটা অভিভাবকেরা নিজে গ্রহণ কর। শিক্ষক যদি অন্নবস্ত্রের চিন্তায় ব্যাকুল থাকেন, তাহা হইলে বালকদিগের শিক্ষার চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে না। তিনি অভ্যাস-বশে যন্ত্রের ন্যায় পুস্তকের কথাই বলিয়া যান, লোকে দেখিয়া মনে করে তিনি শিক্ষাই দিতেছেন; কিন্তু বাস্তবিক যে শিক্ষা দিবে, সেই হৃদয়, স্মৃতি এবং বুদ্ধি দারিদ্র্য-যুদ্ধেই ব্যাপৃত, কি করিলে শিশু পুত্র কন্যা এবং পরিবারবর্গ ক্ষুধার সময়ে খাইতে পাইবে, সেই সমস্যার সমাধানেই ব্যতিব্যস্ত। আমি অতি বিনয়ের সহিত অভিভাবকদিগকে বলিতেছি, সকলেই একবার ভাবিয়া দেখুন, কোন আপত্তি

বিপদের চিন্তায় মন যখন নিবিষ্ট থাকে, তখন নিজের শিশু পুত্র কন্যা আসিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে মনে কি ভাব হয়—তখন মনের অবস্থা সহিষ্ণুতার সহিত বালকদিগকে শিক্ষা দিবার অনুকূল থাকে কি না। মনে রাখিবেন, বিদ্যালয়ের বালকগুলি শিক্ষকের সন্তান নহে; তাহাদের সুন্দর পরিচ্ছদ ও উজ্জ্বল মুখ-কান্তি তাঁহার নিজের সন্তানদিগের ছিন্ন মলিন বসন ও ক্ষুধা-ক্লিষ্ট দীন-দৃষ্টি মুখ-ছবি আরও উজ্জ্বল ভাবে স্মরণ করাইয়া দেয় না কি?

শিক্ষকদিগকে রাজা, জমিদার বা বাবুর মত রাখিতে হইবে, এমন কথা বলি না, কিন্তু শিক্ষক যাহাতে নিশ্চিন্ত হইয়া একজন সাধারণ ভদ্রলোকের মত জীবন ধারণ করিতে পারেন, গ্রামবাসী ইচ্ছা করিলে এমন ব্যবস্থা অনায়াসেই করিতে পারেন। শিক্ষকের পিতৃ-মাতৃ-বিয়োগ হইলে গ্রামবাসীরই পিতৃ-মাতৃদায় উপস্থিত, শিক্ষকের গৃহ-দাহ হইলে সেটি গ্রামবাসীরই গৃহ-দাহ, শিক্ষকের পীড়া হইলে সে পীড়া গ্রামবাসীরই হইয়াছে, এবং শিক্ষকের সন্তান উপবাসী রহিলে গ্রামবাসীর সন্তানই উপবাসী রহিয়াছে, মনে এই রূপ ভাব লইয়া যখন গ্রামবাসী চিন্তিত হইবেন এবং শিক্ষক নিশ্চিন্ত থাকিবেন, তখনই শিক্ষক বালকদিগের মঙ্গল-সাধনে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিতে পারিবেন, তখনই দেশে প্রকৃত প্রাথমিক ও সার্ব্বজনিক শিক্ষার আরম্ভ হইবে।

যাহারা বলিবে, যৎকিঞ্চিৎ বেতনেই যখন শিক্ষক পাওয়া যায়, তখন আর এত কেন? তাহাদের সঙ্গে আমার কোন কথা নাই।

দ্বিতীয় কর্ত্তব্য। সন্তানের শিক্ষার ভার যাঁহার প্রতি অর্পিত হয়, কেবল সম্মুখে নহে, পরোক্ষেও তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা একান্ত কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে জ্ঞানদাতার আসন জন্মদাতারও উপরে; কেন না, জন্মদাতা সন্তানকে কেবল জীব-শ্রেণীতে আনিয়া দেন মাত্র, কিন্তু তাহাকে জ্ঞান-ধর্ম্মে ভূষিত করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব প্রদান করিবার ভার শিক্ষকের হাতে। পিতা এই কার্য্য যে পরিমাণে করিতে পারেন, সেই পরিমাণে তিনি শিক্ষক। পিতা শিক্ষক হইলে হয়ত তিনি আদর্শ শিক্ষকই হইতে পারেন, কিন্তু সকলের একাধারে সে রুচি, যোগ্যতা এবং অবসর ঘটে না, তাই শিক্ষকের পদ সমাজে অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। শিক্ষক পিতা মাতার একটি অতি গুরুতর কার্য্যে প্রতিনিধিত্ব করেন, সুতরাং তিনি অতি সম্মানেরই পাত্র; কিন্তু তাঁহার সম্মুখে না হইলেও পরোক্ষে এবং তাঁহার ছাত্রদিগের, অর্থাৎ নিজের সন্তানদিগের কর্ণ-গোচরে অভিভাবকেরা যে ভাবে শিক্ষকদিগের উল্লেখ ও তাঁহাদিগের সম্বন্ধে আলাপ করেন, তাহা শুনিলে বোধ হয় না যে তাঁহারা শিক্ষককে সম্মান করা একটা কর্ত্তব্যের মধ্যে মনে করেন। পিতা পুত্রের প্রতি—"আজ স্কুলে কি হয়েছিল রে?" পুত্র—"মাষ্টার রোজ রোজ মাইনার জন্য বিরক্ত করে। আজ দাঁড় করিয়ে রেখেছিল, আর বলেছে কাল মাইনে না দিলে আরও শাস্তি দিবে।"

পিতা—"বটে! এত আস্পর্দ্ধা! যে বিদ্যার বিদ্যা, আর যে চাকরীর চাকরী, তাই নয়ে এত! আচ্ছা রাখ, সম্পাদককে বলে ওর চাকরী খোয়াচ্ছি।" শিক্ষকের প্রতি এরূপ ভাষার প্রয়োগ শ্রবণ করিবার দুর্ভাগ্য সকলের না হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া ইহা বিরল নহে। যে শিক্ষক সম্বন্ধে বালক পিতার মুখে এরূপ উক্তি শুনিল, সে শিক্ষকের প্রতি তাহার শ্রদ্ধার পরিমাণ সহজেই অনুমেয়। যাহার প্রতি শ্রদ্ধা নাই, তাহার উপদেশেরও কোন মূল্য নাই, সে উপদেশ যেন দুর্ব্বাবনে মুক্তারাজি। এরূপ ক্ষেত্রে ব্যাস-বশিষ্ঠ স্বয়ং আসিয়া শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিলেও শিক্ষা-দানে কৃতকার্য্য হইতে পারেন বলিয়া বিশ্বাস হয় না। ইহাতে যে ক্ষতি হয়, তাহা ছাত্রের এবং তাহার পিতা মাতার—শিক্ষকের কোন ক্ষতি নাই। বরং ছেলেকে বিদ্যালয়ে না পাঠান ভাল, তথাপি অবজ্ঞাত শিক্ষকের নিকট পাঠাইয়া তাহার শ্রদ্ধা-ভক্তির মূলোচ্ছেদ করা—তাহার পরকালের মাথা খাওয়া ভাল নহে। শিক্ষক চিরদিন ছাত্রকে ভাল কথাই বলিয়া থাকেন—সে কথা তাঁহার নিজেরই হউক, আর পরেরই হউক। ছাত্র যতটা শ্রদ্ধার সহিত সেই কথা শুনে, শিক্ষকের কথা তাহার হৃদয়ে ততটা স্থিতি লাভ করে, সুতরাং তাহার উপকারও সেই পরিমাণেই হয়। যে স্থলে শ্রদ্ধা নাই, সে স্থলে গ্রহণ নাই, সুতরাং উপকারও নাই—অধোমুখ ভাণ্ডের উপর দিয়া সমুদ্র চলিয়া গেলেও তাহাতে একবিন্দু জল প্রবেশ করে না। উপদেশজাত উপকারের অনুপাত বক্তার জ্ঞানের সঙ্গে নহে, কিন্তু শ্রোতার শ্রদ্ধার সঙ্গে। যে শ্রদ্ধা এত প্রয়োজনীয়, অথচ সন্তানের হৃদয়ে যাহার উৎপাদন এত সহজ, অধিকাংশ অভিভাবক অজ্ঞতা, অনবধানতা এবং অহমিকার অন্ধতা বশতঃ তাহা তলাইয়া দেখেন না বলিয়াই সুশিক্ষায় ব্যাঘাত ঘটান। বালক শিক্ষার দুর্ভোগটুকু সমস্তই ভোগ করে, অথচ সুফলটুকু লাভ করিতে পায় না—প্রতিবন্ধক স্বয়ং অভিভাবক! শিক্ষক শ্রদ্ধার পাত্র কিনা, নিয়োগের সময়েই তাহা দেখিতে হইবে।

তৃতীয় কর্ত্তব্য। শিক্ষার বিষয়, প্রণালী এবং উদ্দেশ্য শিক্ষকের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য। পূর্ব্বকালে প্রাথমিক শিক্ষার বিষয় যাহা ছিল, এখন তাহাতে চলে না—এখন জ্ঞান, সভ্যতা এবং সামাজিক প্রয়োজনের অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে, সুতরাং সেই সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার বিষয় ও তাহার পরিমাণ অনেক বাড়িয়া পড়িয়াছে। এখনকার প্রাথমিক শিক্ষা প্রকৃত রূপে চালাইতে হইলে উচ্চশিক্ষিত শিক্ষকের প্রয়োজন; কিন্তু যেদিন উচ্চশিক্ষিত শিক্ষক পল্লীগ্রামের পাঠশালায় জীবনের পবিত্র ব্রত মনে করিয়া গুরুমহাশয়ের আসন গ্রহণ করিবেন, সে শুভ দিনের এখনও অনেক বিলম্ব। কিন্তু তত দিন প্রাথমিক শিক্ষাকে উপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকা যায় না, সুতরাং চরিত্রবান্ এবং বুদ্ধিমান ও আগ্রহান্বিত শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে উপদেশ ও আলোচনা দ্বারা আপাততঃ গড়িয়া পিটিয়া কাজের উপযুক্ত করিয়া লইতে হইবে। মানুষ জীব—দেহ, মৃত্তিকা, অগ্নি, বায়ু, জল, অন্ন, বস্ত্র,

এ সকলেরই তাহার প্রয়োজন আছে। মানুষ সামাজিক জীব—পরিবার, গ্রাম, দেশ, স্বজাতি, পরজাতি, সমস্ত মানবজাতি, এ সকলের সঙ্গেই তাহার সম্বন্ধ আছে। আবার মানুষ আধ্যাত্মিক জীব—তাহার মন, বুদ্ধি, বিবেক, আস্তিক্য, আত্মা এবং অমরত্ব-বিশ্বাস আছে। অতএব এই সমস্তই মানুষের শিখিবার বা জানিবার বিষয়। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, বহির্জগতে বা অন্তর্জগতে কিছুই মানুষের শিক্ষার অবিষয় নহে, তবে জ্ঞানের ন্যূনাধিক্য সুযোগ এবং প্রয়োজন, শক্তি এবং অধ্যবসায়ের উপর নির্ভর করে।

প্রণালীও স্বাভাবিক হওয়া উচিত। রোগ বুঝিয়া ঔষধ দেওয়া, ক্ষুধা বুঝিয়া অন্ন দেওয়া, ইহাই স্বাভাবিক। শিক্ষায় বিশেষ এই, অনেক সময়ে ক্ষুধা জন্মাইয়া অন্ন দিতে হয়, পিপাসা জন্মাইয়া জল দিতে হয়, নতুবা শিক্ষার্থীর অরুচি জন্মিয়া যায়। অক্ষুধায় আহার করিলে বৃদ্ধেরও যখন অরুচি জন্মে, তখন বালকের ত জন্মিতেই পারে। এই জন্য বলিতে পারা যায়, জ্ঞানে এবং পুণ্যে (জ্ঞানানুগত কার্য্যে) ছাত্রের আকাঙ্ক্ষা জন্মাইয়া দেওয়াই শিক্ষকের প্রধান কার্য্য। বাস্তবিক বালক ত নিজের শক্তিতেই বিদ্যা উপার্জ্জন করিবে, শিক্ষক কেবল সহায়, কেবল পথ-প্রদর্শক মাত্র।

প্রণালী সম্বন্ধে আর এক কথা এই যে, বাক্যে মধুরতা এবং হৃদয়ে ভালবাসা (পুত্রবৎ স্নেহ) না থাকিলে শিক্ষকের প্রতি ছাত্রের ভালবাসা জন্মে না, ভালবাসার সঙ্গে মিলিত না হইলে অতি উপাদেয় উপদেশও ভাল লাগে না; যাহা ভাল লাগে না, বালকেরা তাহা লইতেও চায় না। অনেক সময়ে কঠোর শাসনে বা ভয়-প্রদর্শনে কাজ হইতে দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহা প্রকৃত কাজ নহে—ভয় হইতে যাহার উৎপত্তি, তাহার মধ্যে অরুচি এবং বিদ্বেষ থাকিয়াই যায়, ভয় অপসারিত হইলেই তাহা পূর্ণমাত্রায় আবার দেখা দেয়।

পল্লী-পাঠশালার শিক্ষক ছাত্রের শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া দিতে পারেন না, এবং তাঁহার নিকট সে প্রত্যাশাও কেহ করে না; কিন্তু তিনি যদি দৃঢ় ভূমিতে ভিত্তিটি স্থাপন করিয়া দিতে পারেন,—তিনি যদি তাঁহার ছাত্রদিগের হৃদয়ে পবিত্র চরিত্র, নির্ম্মল জ্ঞান এবং সৎকর্ম্মের জন্য প্রাণপণ জলন্ত আগ্রহ জন্মাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলেই তাঁহার জীবন কৃতার্থতা লাভ করিবে, তাঁহার যত্ন জয়যুক্ত হইবে, এবং তাঁহার নিকট তাঁহার দেশ চিরদিন কৃতজ্ঞ রহিবে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য—সর্ব্বাঙ্গীন মনুষ্যত্বের অবাধ বিকাশ। এতদর্থে যাহা কিছু করিতে হয়, তাহাই কর্ত্তব্য। এই পথের বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিবার যে চেষ্টা, তাহাই বীরত্ব। এই পথে যতদূর অগ্রসর হইতে পারা যায়, তাহারই নাম উন্নতি। এই বিকাশের শেষ নাই, সীমা নাই, ইহা অনন্ত; মানব-শিশু এই অনন্ত পথের যাত্রী। হিতবাদ, সুখবাদ, জ্ঞানবাদ, কর্ম্মবাদ, মুক্তিবাদ, নির্ব্বাণবাদ, সমস্ত বাদই এই অবাধ বিকাশে নির্ব্বিবাদ।

মানুষের যত প্রকার অবস্থা, যত প্রকার কর্ম্মক্ষেত্র, যত প্রকার সম্বন্ধ আছে, সকলের মধ্যেই এই অবাধ বিকাশের প্রশস্ত পথ রহিয়াছে।

৬। স্বাস্থ্য বিধান। অন্ন, জল, বায়ু এবং আলোক যে জীবন-ধারণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; তদ্ব্যতীত শরীর সুস্থ রাখা সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা বলা উচিত। স্বাস্থ্যের নিয়ম রক্ষা না করিলে কেবল বিশুদ্ধ জল বায়ুতে সুস্থ থাকা যায় না। ইংলণ্ডে মানব-জীবনের স্থায়িত্ব গড়ে ৩৩ বৎসর ছিল, সর্ব্বসাধারণে স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন করাতে এখন উহা ৪২ বৎসরের উপরে দাঁড়াইয়াছে। ভারতবাসীর জীবনও গড়ে ৩৩ বৎসরই ছিল, কিন্তু স্বাস্থ্যের অনাদর ও অন্যান্য নানা কারণে এখন নাকি উহা ২৭ বৎসরে নামিয়াছে! ভাবিয়া দেখ আমরা কোন্ সর্ব্বনাশের পথে চলিয়াছি। সর্ব্বসাধারণের স্বাস্থ্যোন্নতি না হইলে এ বিপদ ক্রমেই বাড়িতে থাকিবে। স্বাস্থ্য-বিষয়ে অনেক পুস্তক আছে, তাহা পাঠ করিলে বিশেষ তত্ত্ব জানা যায়. এস্থলে কেবল মোটামুটি দুই চারিটা কথায় অধিক বলিবার স্থান নাই।

অঙ্গ-চালনা স্বাস্থ্যের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। ইহাতে স্বাস্থ্য ভাল হয়, বল বাড়ে। স্বাস্থ্যের সঙ্গে বল ছায়ার মত চলে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। নীরোগ মাংসপিণ্ড বা চরবি-স্তূপ সুস্থ নহে; যে শরীর নীরোগ, সবল, কর্ম্মঠ, তাহাই সুস্থ। ব্যায়াম অঙ্গ-চালনার কৃত্রিম উপায়, কিন্তু বৈজ্ঞানিক; ইহার যথোচিত অভ্যাসে শরীরের সমস্ত অঙ্গ দৃঢ়তা লাভ করে, সুতরাং বাল্যকাল হইতেই নিয়মিতরূপে ব্যায়াম-চর্চ্চা কর্ত্তব্য। দৌড়, সন্তরণ, পদব্রজন, বৃক্ষারোহণ, অশ্বারোহণ প্রভৃতি নৈসর্গিক উপায়গুলিও বাল্যকালে অভ্যাস না করিলে অভ্যস্ত হয় না। অশ্বারোহণ শিক্ষার সুযোগ সকলের ঘটে না, কিন্তু অন্যগুলি সকল অবস্থারই আয়ত্ত। এই গুলি কেবল অঙ্গচালনারই উপায় নহে, এই সমস্ত অভ্যস্ত থাকিলে অনেক সময়ে আপদ বিপদ হইতে বাঁচা যায়, জীবন রক্ষা পায়। যাঁহারা চাকুরী এবং টাকার স্বপ্নই দিন রাত্রি দেখেন, তাঁহারা ছেলের কেবল লেখা পড়ার দিকেই দৃষ্টি রাখেন; কিন্তু ছেলের সুস্থ ও সবল দেহ এবং দীর্ঘ জীবন যাঁহারা কামনা করেন, তাঁহারা ছেলের অঙ্গ-চালনা রীতিমত হইতেছে কি না সেটিও দেখেন।

লাঠি খেলা শরীরের দৃঢ়তা এবং আত্ম-রক্ষা সম্পাদনে উপকারী, তদ্ভিন্ন ইহা বাহু এবং দৃষ্টির ক্ষিপ্রতা জন্মায়। অনেক স্থলে এমন ঘটিতে দেখা যায় যে, লাঠি বা ছড়ি হাতে রহিয়াছে, অথচ শিয়াল কুকুরে কাম-ড়াইয়া গেল, এবং সেই কামড়ে মৃত্যু হইল। লাঠির ব্যবহার জানিলে, হাতের ক্ষিপ্রতা থাকিলে এমনটা হইতে পারে না। লাঠিতে যুদ্ধাদি হয় না, দেশ রক্ষা চলে না, কিন্তু অনেক আকস্মিক আপদ বিপদে আত্মরক্ষা হইতে পারে।

যাহা নিতান্ত অনিবার্য্য, তাহা পরিহার করিবার চেষ্টা অপেক্ষা সহ্য করিয়া লওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য। পৃথিবী না ছাড়িলে জল বায়ুর বিষমতা ছাড়িবার উপায় নাই। জীবন ধারণ করিতে হইলেই জল কাদা, বৃষ্টি রৌদ্র, শীত গ্রীষ্ম ছাড়িয়া পলাইবার স্থান নাই, অতএব বাল্যকাল হইতে এগুলি অভ্যাস দ্বারা সহ্য করিয়া লইলে অনেকটা

নিরাপদ থাকা যায়। আজ কাল ভদ্রলোক-দের কাপড় চোপড়ের সভ্যতা বড়ই বাড়িয়া উঠিয়াছে। বালকদিগের জামাযোড়া জুতা প্রায় অষ্টপ্রহরই আঁটা থাকে, তা কি শীত আর কি গ্রীষ্ম। ইহার ফলে তাহাদের চর্ম্ম একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়,—একটুকু ঠাণ্ডা বাতাস লাগিল কি অমনি সর্দ্দি, জ্বর, নিমনিয়া! যে সংসারে আপদ বিপদ দুঃখ দারিদ্র্যের সঙ্গে সর্ব্বদা সংগ্রাম করিতে হয়, যেখানে সুখ দুঃখের একটা ধরা বাঁধা নিয়ম নাই, যেখানে অবস্থাকে কিছুতেই স্থির রাখিতে পারা যায় না, সেই ঘোর পরীক্ষার কঠোর ক্ষেত্রে আপনার প্রাণাধিক সন্তান-দিগকে এমন ফুল বাবু, এমন অকর্ম্মণ্য, এমন নিরুপায় করিয়া তোলা পিতা মাতার প্রকৃত স্নেহের কার্য্য নহে, বরং নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য বলা যায়। সহর বাজারের এই সকল সখের পুতুল বাবু-বালক অপেক্ষা পল্লীগ্রামের অশিক্ষিত দরিদ্র-সন্তান অধিকতর সুখী ও সৌভাগ্যশালী। কারণ তাহাদিগকে সর্ব্বদা আহার বিহারে পর্য্যন্ত এত ভয়ে ভয়ে চলিতে হয় না, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও সম্পদের মধ্যে থাকিয়াও পদে পদে এত বিড়ম্বিত হইতে হয় না! সন্তানদিগকে সুখী দেখিবার ইচ্ছা থাকিলে তাহাদিগকে জীবন-যুদ্ধের জন্য বীরের ন্যায় প্রস্তুত করিতে হইবে। ছত্র-পাদুকা-জামা-যোড়ার দাসত্বে যাহারা বর্দ্ধিত হয়, তাহাদের মধ্যে এ বীরত্ব জন্মিতে পারে না, তাহারা জীবন-পথে প্রতিপদে বিপন্ন হয়। এগুলি ছাড়িয়া একেবারে সন্ন্যাসী হইতে বলিতেছি না, কিন্তু যাহাতে প্রয়োজন হইলে খালি পায়েও ২০।৩০ মাইল চলিতে পারা যায়, দুই এক ঘণ্টা জল কাদায় হাঁটিতে হইলে বা একটুকু ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগিলেই জ্বর কাসিতে ভুগিয়া মরিতে না হয়, ধনী দরিদ্র সকলকেই এরূপ ভাবে প্রস্তুত হইতে বলিতেছি। কথিত আছে, ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের স্থাপয়িতা মহাত্মা বাবর সাহকে অনেক বার জীবন লইয়া বিপন্ন হইতে হইয়াছিল, কিন্তু তিনি কখনও প্রত্যহ পদব্রজে ৫০ মাইল হাঁটিয়া, কখনও বা দিনের মধ্যে ২।৩ বার গঙ্গানদী সাঁতারিয়া পার হইয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। মানুষের বিপদ বলিয়া কহিয়া আইসে না, বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইলে ধন-রত্ন, দাস-দাসী, বন্ধু-বান্ধবও সকল সময়ে রক্ষা করিতে পারে না; তখন নিজের বল-বুদ্ধি, নিজের শরীর, নিজের সদভ্যাস এবং কষ্ট-সহিষ্ণুতাই আত্মরক্ষার একমাত্র উপায়।

আহার-নিদ্রাও স্বাধীন হওয়া উচিত। যাহাদের সুখ-সেব্য খাদ্য না হইলে আহার হয় না, কুসুম-কোমল শয্যা না হইলে নিদ্রা হয় না, তাহাদের দুঃখের সীমা থাকে না। নিয়মের ব্যতিক্রম হইলেই তাহাদের স্বাস্থ্য বিনষ্ট হয়, শরীর ভাঙ্গিয়া যায়! এমন অকর্ম্মণ্য শরীর লইয়া সংসারের কোন্ কাযটা হইতে পারে?

বাস-গৃহের ভিটা উচ্চ এবং শুষ্ক হওয়া উচিত। সরস বা ভিজা মাটি হইতে এক প্রকার বাষ্প উঠিয়া থাকে, আয়ুর্ব্বেদে ইহাকে ভূ-বায়ু বলে। ইহা শরীরের পক্ষে অত্যন্ত অপকারী, নিশ্বাসের সঙ্গে এই বায়ু শরীরস্থ হইয়া জ্বরাদি রোগ উৎপাদন করে। ভিটা উচ্চ এবং শুষ্ক হইলে ইহার ভয় থাকে

না। খাট, চৌকী, অভাব পক্ষে বাঁশের মাচা করিয়াও তাহাতে শয়ন করা উচিত; ইহাতে শয্যার উপরে ও নীচে বিশুদ্ধ মুক্ত বায়ু বিচরণ করিয়া দূষিত ভূবায়ুকে দূর করিয়া দেয়, অধিকন্তু সর্পাদির ভয়ও কমিয়া যায়। বঙ্গদেশ বাঁশের রাজ্য, সুতরাং অন্ততঃ বাঁশের মাচায় শয়ন করা সকলেরই সাধ্যায়ত্ত। আহার-নিদ্রায় বিলাস বা বাবুগিরি ছাড়াই কর্ত্তব্য, কিন্তু তাই বলিয়া পচা বাসী ভাত তরকারী খাওয়া কিম্বা দুর্গন্ধ মলিন শয্যায় শোয়া কর্ত্তব্য নহে। অবস্থা-বিপর্য্যয়ে বিনা শয্যায় শোয়া এবং বিনা উপকরণে খাওয়ার অভ্যাস না করিলে এ বিপদ হইতে বাঁচিবার উপায় নাই। খই-চিড়া-মুড়ি-ছাতু এ অবস্থার পরম সুহৃৎ। জাপানীরা শুনিয়াছি ভাতের চাপড়ী শুকাইয়া সঙ্গে লইয়া চলে; তার চেয়ে এসব কি শতগুণে শ্রেষ্ঠ নহে?

৭। ধন-সংগ্রহ-বিধান। বনবাসী ফল-মূলাশী সন্ন্যাসী ছাড়া আর সকলেরই ধনের প্রয়োজন আছে, এবং সুযোগ, শিক্ষা, শক্তি ও প্রবৃত্তি অনুসারে সকলেই ধন উপার্জ্জনের চেষ্টা করে; কিন্তু সেই বিপুল অর্থ-নীতির আলোচনা এস্থলে সম্ভব নহে, উদ্দেশ্যও নহে। দশের যাহাতে স্বার্থ আছে, সর্ব্ব-সাধারণের যাহাতে উপকার আছে, এমন সকল বিষয়ে ব্যয় করিবার জন্য অর্থ-সংগ্রহের সহজ উপায় কি হইতে পারে, এস্থলে তাহাই বিচার্য্য।

সাধারণতঃ এই সকল ব্যাপার দানের উপরে নির্ভর করে। যে সকল ধনবান্ মহাত্মার পুণ্যস্পৃহা এবং লোক-হিতৈষণা প্রবল, তাঁহারা সাধারণের হিতকর কার্য্যে অর্থ ব্যয় করিয়া যশ, পুণ্য এবং আত্মপ্রসাদ উপার্জ্জন করেন। দেশে যে সকল জলাশয় ও দেবালয় প্রভৃতি অদ্যাপি দৃষ্ট হয়, সে সকল ঐ শ্রেণীর মহাত্মাদিগেরই প্রাচীন কীর্ত্তি। উপার্জ্জিত ধনের সদ্ব্যবহার দেখিবার ইচ্ছা সদাত্মাদিগের হৃদয়ে স্বাভাবিক, সুতরাং ধনীদিগের দান-স্পৃহা এখনও বর্ত্তমান আছে, এখনও প্রতি বৎসর বহু ধনী সাধারণের হিতার্থ বহু অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। কিন্তু শিক্ষা, রুচি, সভ্যতা ইত্যাদি ইত্যাদির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল দানের প্রণালীরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পূর্ব্বে ছিল অন্ন-দান, জল-দান, ভূমি-দান—বংশপরম্পরা-ক্রমে লোকের অন্ন-জলের সংস্থান ধর্ম্ম এবং যশের কার্য্য; এখন গাড়ি ঘোড়া চলিবার উপযুক্ত রাস্তা, আর অন্নজলের অভাবে চিররোগগ্রস্তের মরিবার সময়ে একটুকু ঔষধ খাইয়া মরিবার ব্যবস্থা প্রধান দান। পূর্ব্বে রাজকীয় প্রধান দান ছিল ভূমিদান; এখন তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে উপাধি-দান। অনেক ব্যাপার এমন আছে যে, তাহা দান কি বিক্রয় ঠিক করিয়া বলা কঠিন।

দানের এইরূপ বিড়ম্বনা দর্শনে চাঁদার উদ্ভাবন হইয়াছে। দশ হাজার টাকার প্রয়োজন; কিন্তু একজনের কাছে যখন এত টাকা পাওয়া যাইতেছে না, তখন দশ হাজার লোকের নিকট হইতে এক টাকা করিয়া দান সংগ্রহ করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করাই সহজ ও পরামর্শ-সিদ্ধ, এই যুক্তি হইতেই চাঁদার উৎপত্তি। দানে সম্পূর্ণ

পর-নির্ভর, সুতরাং আকাশ-বৃত্তির ন্যায় উহা অনিশ্চিত; চাঁদায় আত্ম-নির্ভর, সুতরাং উহা নিশ্চিত। ইহাতে দেখা যাইতেছে, চাঁদাতে সাধারণের আত্ম-নির্ভর, সুতরাং শক্তি ও স্বাধীনতা বৃদ্ধি করে।

কিন্তু সেই দশ হাজার লোকের মধ্যে কতক লোক এমন আছে, যাহাদের একটাকা দেওয়াও কষ্টকর; কতক বা এমন আছে, যাহাদের সৎকার্য্যে প্রবৃত্তি মাত্রও নাই; আবার কেহ কেহ এমনও আছে যে, তাহারা মুখের কথায় বা কাগজে কলমে সর্ব্বস্বও দিতে পারে, কিন্তু বাক্স হইতে একটি পয়সা বাহির করিতেও বুকের হাড় চড় চড় করে। এই সকল কারণে যত চাঁদা স্বাক্ষর হয়, সকল স্থলে তাহা আদায় হয় না,—যাঁহারা আদায় করিতে যান, তাঁহাদিগকে নানা অন্যায় কথা শুনিতে হয়, নানা লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, বিড়ম্বনা সহিতে হয়।

মুষ্টি-ভিক্ষার কল্পনা প্রথমে কাহার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়াছিল জানি না। স্বর্গীয় শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন যখন যোগাশ্রমের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন, তখন সর্ব্ব প্রথমে মুষ্টিভিক্ষার কথা শুনিতে পাই। প্রথাটি অতি সুন্দর। রন্ধনের জন্য তণ্ডুল মাপিয়া লইয়া তাহা হইতে এক মুষ্টি একটি ভাণ্ডে রাখিয়া দেওয়া। ইহাতে কাহারও অন্নে কম পড়ে না, গৃহস্থকেও সেজন্য স্বতন্ত্র কোন ব্যয় বহন করিতে হয় না, অথচ কিছু দিন এইরূপ করিলেই সকলের অজ্ঞাতসারে সেই ভাণ্ডটি পূর্ণ হইয়া উঠে! দরিদ্র দেশে অক্লেশে অর্থ সংগ্রহ করিবার এমন সুন্দর উপায় আর একটি দেখা যায় না। শুনিয়াছি গতবারে বঙ্গদেশের কোন জেলায় এক শ্রেণীর লোক কোন বিশেষ মোকদ্দমায় পড়িয়া কেবল এই উপায়ে বিশ হাজার টাকা তুলিয়াছিল, অথচ তাহারা কাহারও নিকট ভিক্ষা, চাঁদা বা ঋণের জন্য যায় নাই। এখন ভাবিয়া দেখুন ব্যাপারটা কি! গৃহস্থের ঘরে প্রতি বেলা এক মুষ্টি চাউল—কিছুই নহে, কিন্তু ইহার পরিণাম কি, প্রভাব কত! দান এবং চাঁদা বর্ত্তমান থাকিয়া চির দিনই সমাজের উপকার করিতে থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই মুষ্টি-সংগ্রহ সকলেরই আয়ত্ত, অথচ ইহাতে কিছুমাত্র কষ্ট নাই। সুতরাং এই প্রথা প্রতি গৃহেই প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত।

এইরূপে সংগৃহীত তণ্ডুল একত্র করিয়া তাহার বিক্রয়-লব্ধ অর্থে একটা তহবিল হইতে পারে। সাধারণের বিশ্বাস-ভাজন ব্যক্তিগণ এই ভার গ্রহণ করিলে ইহাদ্বারা সমাজের কত যে উপকার হইতে পারে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। অবস্থানুসারে এই অর্থ নানা ভাগে বিভক্ত করিয়া শিক্ষা স্বাস্থ্য রাস্তা ঘাট, দূরদেশে দুর্ভিক্ষ-দমন ও বিপন্নের সহায়তা প্রভৃতি বিবিধ হিতকর বিষয়ে ইহার প্রয়োগ হইতে পারে, তদ্ভিন্ন নূতন নূতন কলকারখানায় অংশ ক্রয় করিলে যুগপৎ পল্লী-তহবিলে ধনাগমের উপায় এবং দেশীয় শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি-বিধান উভয়ই হইতে পারে।

ফলতঃ এ সমস্ত এতদিন কেবল চিন্তার বিষয়ই ছিল, শিক্ষিত ব্যক্তিগণ সময়ে সময়ে এ সকল বিষয়ে কেবল চিন্তা করিতেন মাত্র; কিন্তু এখন এই সকল দেশবাসীর

পক্ষে জীবন-মরণের বিষয়, সুতরাং আপা-মর সাধারণ সকলেরই গুরুতর কর্ত্তব্য হইয়া উঠিয়াছে। এখন আর বিফল চিন্তায়, অলীক কল্পনায়, অসার খেলায় বা তুচ্ছ আমোদে অমূল্য সময় নষ্ট করিবার অবসর নাই; এখন ছোট বড় সকলকেই স্নেহ ও বিশ্বাসের সহিত পরস্পরের স্কন্ধে ভর করিয়া কঠোর অথচ সফল কর্ম্ম-ক্ষেত্রে আপন আপন সমগ্র শক্তি লইয়া অবতরণ করিতে হইবে। এখন আর তীরে দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিবার, হাবুডুবু দেখিয়া হাসিবার সময় নহে; এখন সকলেরই কর্ম্ম-স্রোতে ঝাঁপ দিবার সময়। এখন যাহারা অন্যের উদ্যম বিফল মনে করিয়া হাসিতেছে, আর কিছুকাল পরে তাহারা কাঁদিবারও অবসর পাইবে না।

উপসংহার।

মনুষ্য বিবেকশীল জীব, তাহার হিতাহিত বিচার করিবার শক্তি আছে, মঙ্গলের আকাঙ্ক্ষা আছে, সুখ শান্তিতে সদ্ভাবে থাকিয়া জীবন অতিবাহিত করিবার বাসনা আছে; তবে তাহার এত দুঃখ, এত অশান্তি, এত বিড়ম্বনা কেন? রোগ-শোকাদি যে সকল কষ্ট শরীর-ধর্ম্মের নিত্য সহচর, তাহা না হয় অনিবার্য্য বলিয়া সহ্য করিলাম; মহামারী দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি দৈব-ঘটিত দুঃখও মাথা পাতিয়া লইলাম; কিন্তু মনুষ্য কর্ত্তৃক মনুষ্যের দুঃখ, যন্ত্রণা, নির্য্যাতন—অবিচার, অত্যাচার, অশান্তি ঘটে কেন? দেহ-ধর্ম্ম-জনিত বা দৈব-ঘটিত দুঃখ কখন কখন ঘটিয়া থাকে মাত্র, কিন্তু মনুষ্য কর্ত্তৃক সংঘটিত দুঃখ যন্ত্রণা সমাজকে নিয়ত অশান্তিময় করিয়া রাখিয়াছে, মানুষের নীচতা জনিত প্রবঞ্চনা-প্রতারণা স্বার্থপরতা মানুষকে অনবরত ব্যথিত, নিপীড়িত, ব্যতিব্যস্ত করিতেছে। সমাজের এ রোগের কি ঔষধ নাই? মানব-সন্তানের এ শোচনীয় অবস্থার কি প্রতিকার নাই?

ঔষধ আছে, প্রতিকার আছে, সকল দুঃখেরই মুক্তি আছে, কিন্তু চাই তপস্যা। সে তপস্যা ত্রিবিধ, অথবা ত্রিস্তর বিশিষ্ট।

প্রথম, সাধারণ শিক্ষা-বিস্তার,—যেন সমাজের কোথাও কোন জাতীয় কেহ নিরক্ষর মূর্খ না থাকে। দ্বিতীয়, মানব জাতির মঙ্গল-প্রচার,—যেন প্রত্যেক জাতীয় প্রত্যেক ব্যক্তি বুঝিতে পারে, মানব-সমাজের প্রকৃত স্বার্থ কোথায়, মানবের প্রকৃত মঙ্গল কি? তৃতীয়, বিশ্বাসানুরূপ কার্য্য-সাধনের অভ্যাস,—যেন ক্ষুদ্রতা বা নীচতা আসিয়া বিশ্বাসানুরূপ কার্য্যে ব্যাঘাত না ঘটায়। ইহাই সামাজিক তপস্যা, এবং ইহার সাধনেই সমাজের মুক্তি। সর্ব্ববিধ মুক্তিই মনুষ্যের নিজের হাতে, নিজের সাধ্য—একের সাধনে অন্যের মুক্তি কোথাও সম্ভব নহে। ব্যক্তির মুক্তি ব্যক্তির সাধ্যায়ত্ত, সমাজের মুক্তি সমাজের সাধ্যায়ত্ত। সাধন-পথে কেহ গুরু কেহ শিষ্য, কেহ উপদেষ্টা কেহ উপদিষ্ট হয় বটে, কিন্তু মুক্তির বেলায় কেহই কাহারও বন্ধু নহে, এক্ষেত্রে সকলেই আপনি আপনার বন্ধু।

লোকের একটা সংস্কার আছে, রাজা ভাল হইলে, রাজা দয়াশীল হইলে প্রজার, দুঃখের নিবৃত্তি হইতে পারে। কিন্তু এটি কুসংস্কার। রাজা ভাল হইলে তাঁহার কর্ত্তব্য

তিনি পালন করিতে পারেন, প্রজার মঙ্গলের জন্ত নানাবিধ মঙ্গল-বিধান করিতে পারেন, প্রজার মঙ্গলের অনুরোধে নিজ স্বার্থের সঙ্কোচন, নিজ সুখ-স্বাস্থ্যের বিসর্জ্জন করিতে পারেন; কিন্তু এই মাত্রই চরম। দুঃখের প্রকৃত নিবৃত্তি—অর্থাৎ মুক্তি—রাজ-ভাণ্ডারে নাই, রাজবিধানেও নাই; উহা প্রজার স্বায়ত্ত সম্পত্তি—সম্পূর্ণ নিজস্ব।

ইংলণ্ডের ন্যায় যে সকল দেশে রাজা থাকিলেও প্রজার উপরে অত্যাচার করিতে তাঁহার কণিকামাত্র শক্তিও নাই, অথবা ফ্রান্স আমেরিকা প্রভৃতি যে সকল দেশে প্রজা রক্তাক্ত বিপ্লব দ্বারা রাজার নাম গন্ধ পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিয়া আপনারা আপনাদিগের শাসন সংরক্ষণ সমস্তই স্বাধীন ভাবে চালাই-তেছে, সেই সকল দেশের লোকেই কি দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছে? সেই সকল দেশে রাজার অত্যাচার দূর হইয়াছে বটে, কিন্তু ধনের অত্যাচার তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে, তাই দরিদ্র প্রজা প্রাণপণে খাটিয়াও নিয়ত সেই দৈন্য, সেই দুর্দ্দশা, সেই অশান্তি ভোগ করিতেছে!

অতএব প্রজা যে পর্য্যন্ত আপনার অবস্থা আপনি না বুঝিবে, এবং অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা ও তদনুরূপ কার্য্য করিতে না শিখিবে, সে পর্য্যন্ত কি রাজা কি ধনী কেহই তাহার দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিতে পারিবে না। প্রজাকে এই সাধনে যিনি যে পরিমাণে প্রবর্ত্তিত করিতে পারিবেন, তাঁহার মানব-হিতৈষী সেই পরিমাণে পরিতৃপ্ত হইবে, তাঁহার দেশ-হিতৈষী নাম সেই পরিমাণে সার্থক হইবে।*

শ্রীশরৎচন্দ্র চৌধুরী।

উমা-পরিণয়।

(কুমার-সম্ভব)

(৬৩)

উত্তরিয়া চন্দ্রচূড় আসিলা এই মতে
তোরণ-তোলা' পতাকা-দোলা' বিপুল রাজপথে
অট্টালিকা-শিখরমালা না মানি' দিনমান
জোছনা লুটি' উঠিল ফুটি' দ্বিগুণ পরিমাণ!

(৬৪)

নয়ন ভরে' নিরখি' বরে—দৃশ্য একি সেই—
রমণীকুলে অমনি ভুলে! বিশ্ব সেকি নেই?
যেন রে শেষ-ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি সবাকার
নেত্র মাঝে পশেছে করি' চিত্ত সমাহার!

(৬৫)

"অপর্ণা যে কঠোর তপ করিল সুকুমারী
প্রাণেশরূপে পাইতে শিবে—উচিত সে উমারি।
দাসীও তাঁর হবে যে নারী সফল তারি আশা,
সুভগা কি সে, লভে যে তাঁরি বুকের
ভালবাসা!

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ রাজসাহী শাখার তৃতীয় বার্ষিক তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে লেখক কর্তৃক পঠিত।

(৬৬)

"আজিকে হেন-মধুরতর বধূ ও বর যদি
পরস্পরে যোজিত করে না দিত প্রজাপতি,
গড়িলা তবে যুগল রূপ অত যে যতনে
সকলি সেত' বিফলে যেত—এমনি লয় মনে!

(৬৭)

"সত্যই কি, অত্যধিক ক্রুদ্ধ হয়ে' কভু
পঞ্চশরে ভস্ম করে' ফেলিয়াছিল প্রভু?
—অমন বেড়ে মাধুরী হেরে' সরমে, অনুমানি,
আপনা' হাতে অতনু পাতে আপন তনুখানি!

(৬৮)

"শঙ্করের সঙ্গে দিয়ে মেয়ের বিয়ে আজ
মনের চির বাসনা ওগো সিদ্ধিল নগরাজ;—,
ধরার ভার ধারণে তাঁর, লো সখি তোরা শোন্,
উচ্চ যেই শিখর, পাবে উচ্চতরাসন!"

(৬৯)

এরূপে কত মধুর কথা কহিছে পুরনারী—
শুনিয়া গিরি-ভবনে ধীরি পঁহুছে ত্রিপুরারি।
উপরি হতে পড়িল পথে যতেক লাজ-মুঠি
চূর্ণ যে ও-সকলি এয়ো-কেয়ূরে আজ লুটি'!

(৭০)

থামিলা বৃষ; নামিলা ঈশ হরির বাহু ধরি'—
যেন রে ভানু শারদ ঘন ছাড়িল আহা মরি!
কমলাসন চলিলা আগে, পিছনে পরমেশ
শৈলেশের মহলে ঢের করিলা পরবেশ!

(৭১)

প্রভুর পাছু দিগধিরাজ-প্রমুখ দেবতারা,
ঋষিরা-সাত, তাঁদেরি সাথ পরম ঋষি যাঁরা,
সবার শেষে প্রমথ, এসে' পশিলা শিলা-ঘরে—
সুফলরাশি যেন রে আসি' সুকৃত অনুসরে!

(৭২)

সেথায় শুভ আসনে শিব বসিলা যথাচার—
রত্ন, মধুপর্ক-আদি অর্ঘ্য উপচার,
দুকূল ধবযুগল নব, নগেশ থু'ল আনি'—
মন্ত্র পড়ি' সকলি পরিগৃহীলা শূলপাণি!

(৭৩)

মহিলাদের মহল-চারী বিনীত দ্বারী সবে
দুকূলধারী বরেরে আনে বধূর পাশে তবে;
নবীন শশিকিরণ-রাশি, সাজায়ে' সাদা ফেনে,
জলধিবরে যেমতি ধরে বেলার কাছে এনে'!

(৭৪)

চাঁদিনী-আলা শরদবালা এ বিশ্বের যথা
কুমুদ-আঁখি ফুটায়, জলে ঘুচায় আবিলতা—
তেমনি চারু চন্দ্রমুখী নগেন্দ্রকুমারী
বিকশে আঁখি স্বামীর, করে বিমল মনোবারি!

(৭৫)

যেমনি শুভদৃষ্টি-কালে দোঁহার আঁখি দুটি
পরস্পরে দরশ তরে পিয়াসে ওঠে ফুটি'
অমনি লুটে! আবার উঠে, আবার যায়
পড়ে'—
এমনি দুঁহু সরমে মুহু মরমে যায় মরে'!

(৭৬)

হিঙুল-রাঙা আঙুল-গাথা' উমার পূত হাত
শৈল-গুরু সঁপিয়া দিলা, গ্রহিলা ভূতনাথ—
নগবালারি অঙ্গে নাকি পিনাকী-ভয়ে স্মর
লুকায়ে' ছিল, মুকুল তারি বাহিরিল এ কর?

(৭৭)

উমার তনু রোমাঞ্চিত হইল ঈশ-হেতু,
আকুল প্রেমে আঙুল-ঘেমে' রইল বৃষকেতু!
হরষময় পরশে দুটি জড়িল কম কর—
অতনু যেন দোঁহারি দেহে করিল সম ভর!

(৭৮)

অপরাপর বধূ ও বর মধুর উপযমে
ধরে যে বড় সুষমা হরগৌরী-সমাগমে—
আজিকে এঁরা রূপের সেরা মিলিয়া দোঁহে
আহা
ধরিলা নিজে মাধুরী কি যে, কেমনে কহি
তাহা !

(৭৯)

হোমাগ্নির চারিটি ধারে মধুর বধূবর
প্রদক্ষিয়া যেতেছে চ'লে' মিলায়ে' কলেবর !
সুমেরু-গিরি যেমনি ঘিরি', নিয়ত নিশিদিবা
ঘুরিছে আহা মরি রে দুটি শরীরে মিশি'
কিবা !

(৮০)

পরশে দোঁহে হরষে মোহে মুদিলা দুনয়ন !
দম্পতীরে তিনটি ফিরে ঘুরায়ে' হুতাশন,
পুরোধা তবে বধূরে হোম লইলা করাইয়া
জলন্ত সে অনলে লাজ-আহুতি ছড়াইয়া !

(৮১)

অঞ্জলিতে অমনি পূরি' সুরভি লাজ-ধূমা
গুরুপদেশে আনন-দেশে গ্রহণ করে উমা ;
কপোলে এসে' লাগিল যে সে রঙিন শিখা-
ধারা
ক্ষণিক তাহা শোভিল আহা কমলতুল পারা !

(৮২)

আচার-ধূমে ঘামিল রাঙা কপোলে রেণু-রেখা !
উছসি' উঠে নয়নযুগে কালাঞ্জন-লেখা !
শ্রবণে অবতংস যব-মুকুল সুকুমার
শুকায়ে' পড়ি'—মুখানি মরি ফুটিল কি উমার !

(৮৩)

বধূরে দ্বিজ কহিলা—"বাছা অচল-সুতা, শোন্
বিবাহে তব সাক্ষী এই রহিলা হুতাশন ;
এখন তুমি স্বামীর সহ ধর্ম্ম-আচরণে
নিরত থাকো, করিয়োনাকো বিচার কিছু
মনে !"

(৮৪)

নয়ন-কুটি অবধি দুটি কর্ণ অরপিয়া
গুরুর সেই বচন পান করিলা হর-প্রিয়া ;
নিদাঘে যথা প্রবল-দাপ তপন-তাপ সহি'
ঘনাগমে নবীন বারি করেন পান মহী !

(৮৫)

মধুরাকৃতি পতি সে ধ্রুব, সুদূর ধ্রুবতারা
হেরিতে নভে আদেশে যবে উমারে—শুভ
দারা
মুখানি তুলি', সরমে হায় কণ্ঠ যায় বাজি,'
বিপুলায়াসে মৃদুল ভাষে কহিলা "দেখিয়াছি !"

(৮৬)

বিধান-জানা' পুরোধা নানা বিবাহ-উপচার
এরূপে যবে সমাধা করি' দিলেন দোঁহাকার,
তখন সেই জগত-জন-জনকজননীরা
কমলাসনে আসীন পিতামহেরে প্রণমিলা !

(৮৭)

বধূরে তবে আশীর্ব্বাদ করিলা প্রজাপতি—
"হে কল্যাণি, বীরের তুমি প্রসূতি হও সতী !"
বাণীর নিধি যদিও বিধি, তবুও মহাদেবে
কেমনে শুভ কামনা ক'রে পান না
তাহা ভেবে !"

(৮৮)

কৃতোপচার চতুরায়ত বেদীতে হেমাসনে
জায়া ও পতি উভয়ে তবে বসিয়া এক সনে,—
জগতে যথা লোকের প্রথা তাহাই অনুসরি'
সলিল-পূত আতপ-চাল গ্রহিলা তনু' পরি !

(৮৯)

লক্ষ্মী দেবী দোঁহার শিরে ধরিলা শতদল
ছত্রাকারে ;—পত্রাধারে মোতির মত জল-
বিন্দু তায় ঝালর প্রায়, গ্রথিত সারি সারি !
রাজিল নাল দীর্ঘতম দণ্ড সম তারি !

(৯০)

তাহার পরে, উভয়বিধ ভারতী-ব্যবহারে
সরস্বতী করিলা মহা আরতি দোঁহাকারে—
বরেণ্য সে বরেরে পূত 'সংস্কৃতে' বলি',
বধূরে ভাবি' মধুরতর 'প্রাকৃত'-পদাবলী !

(৯১)

হেরিলা তাঁরা—অপ্সরারা করিল অভিনয়,
(নাটক মাঝে কত না আছে রচনা-পরিচয় !)
বিবিধরসে তুলিতেছিল মধুর সঙ্গীত !
রঙ্গ-ভরে দুলিতেছিল অঙ্গ সুললিত !

(৯২)

অনন্তর দেবতাগণ কৃতাঞ্জলিপুটে
গৃহীতদার ত্রিপুরারির চরণে শির লুটে'
মিনতি মাগে—"শাপাবসানে লভিয়া নিজ কায়
অতনু যেন পারেন শিবে সেবিতে পুনরায় !"

(৯৩)

এতেক শেষে বিগতরোষ আদেশে ভগবান—
তাঁহারো প্রতি পারিবে স্মর ছাড়িতে ফুলবাণ !
কর্ম্মে যাঁরা কুশল, তাঁরা যোগ্য অবসরে
প্রভুর কাছে চাহিয়া কাজে সিদ্ধি লাভ করে !

(৯৪)

অমনি অমরবৃন্দে বর্জ্জিলা সে উমানাথ,
ক্ষিতিধরপতি-কন্যা- হস্তখানা ধরে হাত !
কনক-কলস আলা, পুষ্পমালা ধরে ধর,
ক্ষিতি-বিরচিতশয্যা—আসিলা বাসরে বর !

(৯৫)

নব পরিণয় লাজে
ভূষিতা চারুবালা,
বদন তুলিল শূলী—
টানিলা মানি' জ্বালা !
কভু সমবয়সীরে
ভাষিলা গূঢ় ভাষা ;
প্রমথ মুখ বিকারে—
হাসি না যায় হাসা !*

শ্রীবিহারীলাল গোস্বামী।

গৌড়-তত্ত্ব।

—:*:—

এক সময়ে সমগ্র বঙ্গদেশ "গৌড়দেশ" নামে সুপরিচিত ছিল। অল্পকাল পূর্ব্বেও বঙ্গভাষা "গৌড়ীয় সাধুভাষা" বলিয়া অভিহিত হইত। নব্যবঙ্গের মহাকবি বাঙ্গালীকে "গৌড়জন" বলিয়াই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এখনও ভারতবর্ষের অনেক স্থলে বাঙ্গালীর নাম "গৌড়ীয়া।" এই সকল কারণে, গৌড়মণ্ডল পরিদর্শন করিয়া, বাঙ্গালীর পুরাতত্ত্ব অবগত হইবার জন্য কৌতূহল উপস্থিত হয়। কিন্তু ধারাবাহিক ইতিহাসের অভাবে

* শেষের দুইটি শ্লোকই, ইচ্ছা করিলে, সংস্কৃত 'মালিনী' ছন্দেও পাঠ করা যায়।

সে কৌতূহল সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত করিবার উপায় নাই। যাঁহারা পরিদর্শন ক্লেশ স্বীকার করিতে প্রস্তুত, তাঁহাদিগকেও পূর্ব্বগামী পরিদর্শকগণের সুপরিচিত পুরাতন পথেই ধাবিত হইতে হয়। ইহাতে কেবল এক শ্রেণীর পুরাকীর্ত্তির কথাই পুনঃ পুনঃ আলোচিত হইয়া আসিতেছে। তাহা "পাঠান-কীর্ত্তি" নামে সুপরিচিত,—পুরাতন হইলেও, বহু পুরাতন বলিয়া স্পর্দ্ধাপ্রকাশ করিতে অসমর্থ।

গৌড়মণ্ডল বহু পুরাতন সভ্য জনপদ। কত পুরাতন, কেহ তাহার সন্ধান প্রদান করিতে পারে না। এক সময়ে তাহার পরিচয়-বিজ্ঞাপক কীর্ত্তিচিহ্ন দেদীপ্যমান ছিল; এখন কালপ্রভাবে লোক-লোচনের অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে! এখনও যাহা কিছু ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান আছে, কালে তাহাও আবার বিলুপ্ত হইয়া পড়িবে। সময় থাকিতে তথ্যানুসন্ধানের আয়োজন করিলে, অনেক পুরাকীর্ত্তির কথা লোকসমাজে সুপরিচিত থাকিতে পারিত। কিন্তু বাঙ্গালী —"গৌড়জন"—তাহার জন্য যথাযোগ্য আয়োজন করে নাই!

যে সকল ইংরাজ-রাজকর্ম্মচারী কিছু কিছু আয়োজন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের অধ্যবসায়ের অভাব ছিল না। তথাপি তাঁহারা কেবল পাঠান-কীর্ত্তির কথাই বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের অপরাধ ছিল না। রাজকর্ম্মোপলক্ষে যাহা কিছু দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে, তাহাতেই তাঁহাদিগের সময় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। কেহ ইষ্টকপ্রস্তরের পর্য্যালোচনা করিয়া, সেকালের স্থাপত্য-কৌশলের আভাস প্রদান করিয়া গিয়াছেন;—কেহ দৃশ্যমান অট্টালিকাদির আয়তনের বা গঠন কালের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংকলিত করিয়া গিয়াছেন;—কেহ বা কিছু কিছু ভৌগলিক এবং ঐতিহাসিক তত্ত্বের অনুসন্ধান করিবার আগ্রহ প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন। ধারাবাহিক ইতিহাস নাই;—ইতিহাস সংকলনের ধারাবাহিক চেষ্টাও প্রবর্ত্তিত হয় নাই।*

সম্প্রতি কিছু কিছু আয়োজন আরম্ভ হইবার সূত্রপাত হইয়াছে। কোন কোন পুরাতন অট্টালিকার জীর্ণ-সংস্কার সাধিত হইয়াছে;—পারস্যভাষা নিবদ্ধ "রিয়াজ-উস্-সলাতিন" গ্রন্থের বাঙ্গালা এবং ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে;—পুনরায় গৌড়মণ্ডলের কথা "গৌড়জনের" নিকট

* ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দ হইতে কিছুকাল ক্রেটন সাহেব গুয়ামালতীর ইংরাজ কুঠীতে বাস করিয়া গৌড়ীয় ধ্বংসাবশিষ্ট অট্টালিকাদির চিত্রাঙ্কন করিয়া গিয়াছিলেন। বুকানন হামিল্টন সাহেব সরজে উপলক্ষে কিছু কিছু বিবরণ সংকলন করিয়াছিলেন। ১৮১০খৃষ্টাব্দে মেজর ফ্রাঙ্কলিন ভাগলপুর হইতে গৌড় পরিদর্শন করিতে আসিয়া ১৮১২খৃষ্টাব্দের ১২ এপ্রিল তারিখে তাহার বিস্তৃত বিবরণী বিলাতের কোর্ট অব ডিরেক্টরগণকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। জেনারেল কনিংহাম এবং মালদহের কলেক্টর রাভেন্‌সা সাহেব কিছু কিছু চিত্র ও বিবরণ সংকলন করিয়াছিলেন। অধ্যাপক ব্লকমান মুদ্রালিপি, শিলালিপি এবং পুরাতন ইতিহাস অবলম্বনে ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক তথ্যমূলক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। এ সকল চেষ্টা ইংরাজ-রাজপুরুষদিগের চেষ্টা। তাহাতে "পাঠানকীর্ত্তির" কথাই পুনঃ পুনঃ আলোচিত হইয়াছে।

সুপরিচিত করিয়া তুলিবার জন্য প্রবন্ধ এবং পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে। * এখন আর কেবল "পাঠান-কীর্ত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ কৌতূহল-পরিতৃপ্তির পক্ষে প্রচুর বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না।

কোন্ সময়ে গৌড়মণ্ডলে আর্য্য সভ্যতা বিস্তৃত হইবার সূত্রপাত হয়, তাহার জনশ্রুতি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বৈদিক-যুগে মিথিলা রাজ্য জ্ঞান গৌরবে ভারতবিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। গৌড়মণ্ডল মিথিলার উপকণ্ঠরূপে তৎসমকালেই আর্য্যসভ্যতায় সমুন্নত হইয়া থাকিবে। ইহা অনুমান মাত্র। তথাপি ইহা নিতান্ত অসঙ্গত অনুমান বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। কারণ, সংস্কৃত সাহিত্যের আদিযুগ হইতেই গৌড়মণ্ডল আর্য্যজনপদরূপে উল্লিখিত। † তৎকালের অট্টালিকাদি বর্ত্তমান থাকিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু তৎকালোচিত সভ্যতাবিজ্ঞাপক অন্যান্য প্রমাণের অভাব নাই। তাহা পর্য্যাপ্তরূপে সংকলিত হইলে, একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ হইতে পারে। যখন সেরূপ গ্রন্থ সংকলিত হইবে, তখন তাহাই গৌড়-মণ্ডলের আর্য্যবিজয়যুগের প্রকৃষ্ট কীর্ত্তিচিহ্ন বলিয়া স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিতে পারিবে। লোকসমাজের আচারব্যবহারে, সাহিত্যে, সভ্যতায় এবং জগদ্বিখ্যাত শিল্পগৌরবে তাহা অমর হইয়া রহিয়াছে।

সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে—ভগবান্ বুদ্ধদেবের আবির্ভাবে—ভারতবর্ষে এক যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। নিরুদ্ধ নির্ঝর ধারা শৈলকারাগার ভেদ করিয়া নিম্নাভি-মুখে প্রধাবিত হইবামাত্র, তাহার প্রবল প্লাবনে দেশ দেশান্তর প্লাবিত হইয়া যায়। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল প্লাবনও সেইরূপ। তাহা ভারতব্যাপ্ত হইয়া, ক্রমে জগদ্ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার কথা নানা দেশে নানা ভাষায় লিখিত হইয়া রহিয়াছে। গৌড়মণ্ডলেও তাহার প্রভাব ব্যাপ্ত হইতে বিলম্ব ঘটে নাই। শাক্যসিংহের জীবিত-কালেই তাঁহার নবধর্ম্মমত গৌড়মণ্ডলে প্রচারিত হইবার সূত্রপাত হইয়াছিল। ‡

বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইবার পর, ভারত-

* প্রবন্ধ লেখকের "গৌড়চিত্র" এবং "গৌড়কাহিনী" বিষয়ক বিবিধ প্রবন্ধ দীর্ঘকাল হইতে "প্রবাসী" এবং "বঙ্গদর্শনে" মুদ্রিত হইয়া আসিতেছে। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের গৌড়বিবরণ-মূলক দুইখানি গ্রন্থ মুদ্রাযন্ত্রে প্রেরিত হইয়াছে। বং সং।

† পানিনি-সংকলিত বিশ্ববিখ্যাত সংস্কৃত ব্যাকরণ বৌদ্ধাবির্ভাবের পূর্ব্বকালবর্ত্তী বলিয়া প্রমাণীকৃত হইয়াছে। তাহাতে গৌড়ের প্রসঙ্গের অভাব নাই। গৌড়মণ্ডলে এই ব্যাকরণের অধ্যয়ন অধ্যাপনা প্রচলিত ছিল, এক সময়ে গৌড়মণ্ডল হইতে "মহাভাষ্যের" অধ্যয়ন অধ্যাপনা কাশ্মীর প্রদেশে পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৌদ্ধবিপ্লবে গৌড়মণ্ডল বৈদিকাচারবিচ্যুত হইবার পরেও, পাণিনি ব্যাকরণের অধ্যয়ন অধ্যাপনা প্রচলিত ছিল। গৌড়াধিপতি লক্ষ্মণসেনদেবের আজ্ঞায় বৌদ্ধ পুরুষোত্তমদেব পাণিনি ব্যাকরণের ভাষাসূত্র লইয়া "ভাষাবৃত্তি" নামে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সংস্কৃত "সাহিত্যে গৌড়ীয়-রীতি" নামে একটি স্বনামখ্যাত রচনারীতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল কারণে অতি পুরাকাল হইতেই গৌড়মণ্ডলকে আর্য্যজনপদ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

‡ অতি পুরাকাল হইতে গৌড়মণ্ডলের সহিত বিহার প্রদেশের এবং বারাণসির ঘনিষ্ঠ সংস্রব বর্ত্তমান ছিল।

বর্ষের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায়, গৌড়মণ্ডলেও তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মবিবর্ত্তন যুগের অভ্যুদয় হইয়াছিল। প্রথমযুগ "সংঘর্ষ যুগ," মধ্যযুগ "সামঞ্জস্য যুগ" এবং শেষযুগ "সমন্বয় যুগ" নামে কথিত হইতে পারে। প্রথমযুগে নূতন পুরাতনের অপরিহার্য্য কলহ; মধ্য-যুগে শান্তি সংস্থাপন চেষ্টা; শেষযুগে বৌদ্ধা-চার আচ্ছন্ন করিয়া তাহার অস্থিপঞ্জরের উপর আধুনিক হিন্দু ধর্ম্মের আবরণ বিস্তার গৌড়মণ্ডলের পুরাকাহিনীকে নিরতিশয় কৌতূহলের আধার করিয়া রাখিয়াছে। কি সাহিত্য, কি শিল্প, কি স্থাপত্য কৌশল, সকলের মধ্যেই তাহার প্রচ্ছন্ন প্রভাব অদ্যাপি লক্ষিত হইয়া থাকে।

ইহলৌকিক জনহিতাকাঙ্খা এবং পার-লৌকিক সদ্গতিকামনা ভারতবর্ষীয় আর্য্য-সভ্যতার বিশেষত্ব-বিজ্ঞাপক ঐতিহাসিক তথ্য। ধর্ম্মভেদে বা ভাষাভেদে তাহাতে কখনও কোনরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হয় নাই। যিনি যে ধর্ম্ম প্রচারিত করিয়া গিয়া-ছেন, যিনি যে ভাষার সাহায্যে প্রচারকার্য্যে লিপ্ত হইয়া অভিনব মত সংস্থাপনার আয়ো-জন করিয়া গিয়াছেন, সকলেই জনহিতা-কাঙ্খাকে এবং সদ্গতিকামনাকে তুল্যভাবে সকলের উপর প্রাধান্য দান করিয়া গিয়াছেন। তজ্জন্য সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মবিপ্লবের মধ্যে ভারত-বর্ষীয় আর্য্যসভ্যতার মূল প্রকৃতি অপরিবর্ত্তিত ভাবে সুরক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। তাহাতেই সংঘর্ষের পর সামঞ্জস্য এবং সামঞ্জস্যের পর সমন্বয়-সাধন সহজ হইয়া উঠিয়াছিল। ইন্দ্র-ধনুর বিচিত্র বর্ণসমাবেশের মধ্যে যেমন এক-বর্ণের শেষ এবং অন্য বর্ণের আরম্ভের সুস্পষ্ট সীমানির্দ্দেশের উপায় নাই, ভারতবর্ষের বিচিত্র ধর্ম্মসংঘর্ষের, ধর্ম্মসামঞ্জস্যের, এবং ধর্ম্মসমন্বয়ের অবস্থাও সেইরূপ।

ইহার পর গৌড়মণ্ডলে আর এক অভি-নব বিপ্লবের সূত্রপাত হয়,—তাহা হিন্দু-মুসলমানের সাম্রাজ্য-কলহ। মুসলমান ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্ব হইতেই আরব এবং পারসিক রাজ্যের বাণিজ্যকুশল অধিবাসি-গণের সহিত গৌড়ীয় বণিক-সম্প্রদায়ের বাণিজ্য-সংস্রব বর্ত্তমান ছিল। মুসলমানধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইবার পরেও, সে সংস্রব পূর্ব্ববৎ প্রচলিত থাকায়, সমুদ্রপথে মুসলমানগণ গৌড়মণ্ডলে যাতায়াত করিতেন; কেহ কেহ বাণিজ্যোপলক্ষে এদেশে বাস করিতেও বাধ্য হইতেন। তাহাতে কোনরূপ সাম্রাজ্য-কলহ সংঘটিত হইত না। খৃষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে সাম্রাজ্যকলহের সূত্রপাত হয়। আর্য্যাবর্ত্তের কিয়দংশে মুসলমান শাসন বিস্তৃত হইবামাত্র, গৌড়-মণ্ডলেও তাহা বিস্তৃত হইতে আরম্ভ করে। তাহার সহিত ধর্ম্মকলহের মুখ্য সংস্রব বর্ত্তমান ছিল না। তাহাতেও তিনটি

শাক্যসিংহের নবধর্ম্মমত এই দুই প্রদেশেই প্রথমে প্রচারিত হয়। তৎসূত্রে তাহা শাক্যসিংহের জীবিত কালেই গৌড়মণ্ডলে প্রচারিত হইয়াছিল। অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় গৌড়মণ্ডলেও বৌদ্ধ বিহার চৈত্য এবং সংঘারাম প্রতিষ্ঠিত হয়। কিছুদিন গৌড়মণ্ডল বৌদ্ধ নরপালগণের শাসনাধীন থাকায়, এখনও নানা স্থানে পুরাতন বৌদ্ধকীর্ত্তির সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইংরাজ রাজকর্ম্মচারিগণের গ্রন্থে তাহার বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থবিবর্তন যুগের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথম যুগ সংঘর্ষ-যুগ, মধ্যযুগ সামঞ্জস্য যুগ, শেষযুগ সমন্বয় যুগ। প্রথমে স্বার্থের সঙ্গে স্বার্থের সংঘর্ষ,—গৌড়মণ্ডল কাহার হইবে, তাহার মীমাংসার জন্য বাহুবলের প্রবল আস্ফালন। তাহার পর হিন্দু মুসলমানের মধ্যে স্বার্থসামঞ্জস্যের চেষ্টা,—গৌড়মণ্ডল কিরূপে দিল্লীর আক্রমণ প্রতিহত করিয়া, স্বাধীন সাম্রাজ্যরূপে আত্মরক্ষা করিতে পারে, তাহারই উপায় উদ্ভাবন। তাহার পর হিন্দু মুসলমানের স্বার্থসমন্বয় সাধিত করিয়া, উভয়ের সমবেত বাহুবলে এবং শাসন কৌশলে গৌড়জনপদের গৌরবর্দ্ধন। গৌড়ীয় ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ইহার যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইংরাজ রাজপুরুষদিগের গ্রন্থে তাহা বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হয় নাই।

গৌড়ীয় স্বাধীন সাম্রাজ্য করতলগত করিয়া, মোগল সম্রাট যখন প্রবল প্রতাপ বিস্তৃত করিবার জন্য লালায়িত, সেই সময়ে এক আকস্মিক মারিভয়ে গৌড়ীয় রাজধানী সহসা জনশূন্য হইয়া, ক্রমে ক্রমে ধ্বংসমুখে পতিত হয়। তখন হইতে রাজনগর বিজনবনে পরিণত হইয়াছে। তথাপি সেকালের হিন্দু মুসলমানের নানা কীর্ত্তিচিহ্ন বর্ত্তমান থাকিতে পারিত। কিন্তু পরিত্যক্ত রাজনগরের বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত ইষ্টকপ্রস্তরই তাহার কাল হইয়াছিল। লোকে তাহা ভাঙ্গিয়া লইয়া, নানা দিগ্দেশে প্রেরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, অল্পকালের মধ্যেই অট্টালিকাদি অদৃশ্য হইতে আরম্ভ করে। যাহা কেহ অপহরণ করে নাই, তাহাই অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। তাহার অধিকাংশই অতুচ্চ তোরণদ্বার, অসামান্য ভজনালয়, অনধিগম্য সমাধিমন্দির!

তাহার মধ্যে অভিনিবেশ সহকারে অনুসন্ধান করিলে, হিন্দু বৌদ্ধ এবং মুসলমান শাসন-কালের নানা কীর্ত্তিচিহ্নের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। পুরাতন মন্দিরাদি লুণ্ঠন করিয়া, মস্জেদ নির্ম্মাণের উপকরণ সংগ্রহ করিবার কথা মুসলমান লিখিত ইতিহাসেই উল্লিখিত আছে। সুতরাং যাহা আছে, তাহার মধ্যেই—যাহা নাই—তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে। সেরূপ ভাবে কষ্ট স্বীকার করিয়া অনুসন্ধান কার্য্যে ব্যাপৃত হইলে, এখনও নানা নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু সেরূপ ভাবে সমগ্র ধ্বংসাবশেষের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান কার্য্য অদ্যাপি আরম্ভ হয় নাই। পুরাতন গ্রন্থে যে সকল স্থানের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা কোন্ কোন্ স্থান, তাহারও সম্যক্ সমালোচনা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। রাষ্ট্রবিপ্লবে একস্থান পুনঃ পুনঃ নাম পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছে। পরগণার নাম, গ্রাম নগরের নাম, পল্লীর নাম এইরূপে রূপান্তরিত হইয়া, তথ্যানুসন্ধানের বাধা প্রদান করিতেছে। ইহার জন্যই কখন কখন নানা তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হইয়া, প্রকৃত তথ্য অধিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে!

বৈদিক যুগে গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের অধিবাসিগণের সাংসারিক অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার বিশেষ কোনও পরিচয় প্রাপ্ত হইবার আশা নাই। বৌদ্ধযুগে গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের সবিশেষ সমৃদ্ধির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তৎকালে, যে সকল চৈত্য বিহারাদি সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহা জনসমাজের সমৃদ্ধির পরিচয় প্রদান করিত। পরবর্ত্তী সময়ে পালবংশীয় এবং নরপালগণের শাসনকালে যে সকল দীর্ঘিকা সরোবরাদি খনিত হইয়াছিল, এবং স্থানে স্থানে দুর্গাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাতেই সেকালের অভ্যুদয়ের যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। মুসলমান শাসন সময়ে স্বাধীন সাম্রাজ্য সংস্থাপিত হইলে, গৌড়মণ্ডল যে কিরূপ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, ধ্বংসাবশিষ্ট অট্টালিকাদির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে, তদ্বিষয়ে কাহারও সংশয় উপস্থিত হইতে পারে না। তথাপি তৎকালের ঐশ্বর্য্যগর্ব্বের যে সকল আভাস পুরাতন গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা কাহারও কাহারও নিকট অতিশয়োক্তি বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে। এরূপ সংশয় উপস্থিত হইবার কারণ নাই।

"নিরবধি নৃত্যগীত বাদ্যকোলাহলে।
না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গলে॥"

বৈষ্ণব কবির এই সংক্ষিপ্ত ভর্ৎসনা বাক্যের মধ্যেই সেকালের ঐশ্বর্য্যমত্ত নাগরিকগণের সাংসারিক অবস্থার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। গৌড়ীয় স্বাধীন সাম্রাজ্যের শেষভাগে স্বনামখ্যাত হোসেন শাহ বাদশাহের শাসন সময়ে তাঁহার প্রধানামাত্য দবির খাশ এবং সাকর মল্লিকের আধিপত্য ছিল। তাঁহারা সনাতন গোস্বামী এবং রূপ গোস্বামী নামে বৈষ্ণব সাহিত্যে অমর হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদের বাসগ্রাম রামকেলীর বর্ণনা করিতে গিয়া বৈষ্ণব কবি লিখিয়া গিয়াছেন,—

"ঐশ্বর্য্যের সীমা সে আশ্চর্য্য সব রীতি।"

সংস্কৃত সাহিত্যেও গৌড়মণ্ডলের অতুল ঐশ্বর্য্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সেকালের লোকে স্বর্ণপাত্রে ভোজন করিত,—তাহা একেবারে কবি কাহিনী বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে না। মুসলমান-লিখিত ইতিহাসের মধ্যেও তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।* এখনও গৌড়ীয় ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যাহা আছে, তাহা দেখিয়াই, যাহা নাই, তাহার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। জনপদ সমৃদ্ধ না হইলে, তাহার রাজধানীর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে, বহুকালের অব্যাহত লুণ্ঠনলীলার অবসানে, অদ্যাপি এরূপ বহুমূল্য ইষ্টক প্রস্তর দেখিতে পাওয়া যাইত না।†

এই সমৃদ্ধি কৃষিজাত সমৃদ্ধি বলিয়া স্বীকার করিতে সাহস হয় না। সেকালের গৌড়মণ্ডল শিল্প বাণিজ্যের জন্যই জগদ্বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল;—তাহার প্রভাবেই নানা দিগ্দেশের ধনাহরণ করিয়া সমৃদ্ধ হইয়া

* গোলাম হোসেন ইহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

From ancient times the custom in the country of Lukhnauti and East Bengal was that rich people, preparing plates of gold, used to take their food thereon, and on days of carnivals and festivities, whoever displayed a large number of golden plates, became the object of pre-eminence.—*Riaz-us-Salatin.*

† কোন কোন প্রস্তর এরূপ বহুমূল্য যে এক্ষণে সেরূপ প্রস্তর দুর্লভ

থাকিবে। কেবল কৃষির উপর নির্ভর করিয়া সেরূপ সমৃদ্ধি লাভের সম্ভাবনা কোথায়? যাহাদের বাণিজ্যপোত সমুদ্র পথে নানা দিগ্‌দেশে পণ্যদ্রব্য বহন করিত, তাহাদের দেশের লোক কালক্রমে কৃষিজীবি হইয়া পড়িয়াছে;—তাহাদের পক্ষে এখন আর সেকালের বাণিজ্য-গৌরবের ইয়ত্তা করিবারও সম্ভাবনা নাই! অবস্থা বিশেষে প্রকৃত তথ্যও কবিকাহিনী বলিয়া প্রতিভাত হয়;—আধুনিক "গৌড়জনের" পক্ষেও তাহাই হইয়াছে!

সমৃদ্ধির ন্যায় শিক্ষা সকল যুগেই গৌড়-মণ্ডলের গৌরবের কারণ বলিয়া উল্লিখিত। হিয়াঙ্গ থ্‌সঙ্গের ভ্রমণ কাহিনীতে, রাজ-তরঙ্গিনীর বর্ণনায়, হিন্দু এবং মুসলমান লেখকগণের সংস্কৃত, বাঙ্গালা এবং পারসিক গ্রন্থে গৌড়মণ্ডলের শিক্ষা সৌভাগ্যের যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহার প্রভাবে একদিকে যেমন অলৌকিক ঐশ্বর্য্য বিকাশের মধ্যে ভোগাভিলাষের প্রবল উচ্ছ্বাস,—অন্য দিকে সেইরূপ সংসারবিরাগী হিন্দু-মুসলমান সাধুপুরুষগণের অলৌকিক আত্মত্যাগের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। গৌড়মণ্ডলের অনেক স্থান ঐশ্বর্য্যের জন্য বিশ্ববিখ্যাত; অনেক স্থান আবার সাধু-পুরুষদিগের পদধূলি প্রভাবে পুণ্যময় হইয়া রহিয়াছে!

যে সকল স্থান এক সময়ে হিন্দু, বৌদ্ধ, বা মুসলমান ধর্ম্মের পুণ্যস্থান রূপে তীর্থ মহিমা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা অদ্যাপি সম্পূর্ণরূপে মহিমাবিচ্যুত হয় নাই। এখনও পর্ব্বোপলক্ষে সেই সকল পুণ্যভূমিতে হিন্দু-মুসলমানের জনতা দেখিতে পাওয়া যায়;—এখনও তাহাদের পূজার সময়, পূজার পদ্ধতি, এবং পূজার প্রয়োজনবিজ্ঞাপক জনশ্রুতির আলোচনা করিলে, নানা পুরা-কাহিনী সংকলিত হইতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ পর্য্যটক এই সকল স্থানে পদার্পণ করিবার ক্লেশস্বীকার করেন না!

গৌড়মণ্ডলের বিবিধ শিল্পি গোষ্ঠী যে সকল স্থানে বাস করিত, সেকল স্থান হইতে পুরাতন শিল্পগৌরব অন্তর্হিত হইলেও, একেবারে সকল পরিচয় বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। কোন কোন শিল্পকৌশল একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।* কিন্তু কোন কোন শিল্পকৌশল এখনও জীবন্মৃত অবস্থায় পুরাকালের শিল্পগৌরবের সাক্ষ্যদান করি-তেছে।+ সম্রাট আরঙ্গজেবের শাসন সময়ে তাঁহার নিকট "সনন্দ" গ্রহণ করিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গৌড়মণ্ডলে বাণিজ্যালয়

* গোলাম হোসেনের সময়ে তিসি বৃক্ষের ত্বক্ দ্বারা কার্পেট প্রস্তুত হইত; সে শিল্প লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। 'And a kind of carpet is manufactured from the linseed plant, which is very pretty and much liked. —*Riaz-us-Salatun*.

+ রেশম এবং কার্পাস মিশ্রিত পটবস্ত্র পুরাকালে আরব এবং পারসিক রাজ্যে বিক্রীত হইত। এখনও এই বাণিজ্য একেবারে লুপ্ত হয় নাই,—কিছু কিছু এরূপ বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সংস্থাপিত করিয়াছিলেন।* তখন তাহারা বিক্রয় করিতেন না, ক্রয় করিতেন,—যাহা ক্রয় করিতেন, তাহাই ইউরোপে বিক্রয় করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেন।† পুরাতন রাজপ্রতাপের লীলাভূমির ধ্বংসদশাপন্ন ইষ্টক প্রস্তরের ন্যায়, পুরাতন শিল্পবাণিজ্য-প্রতাপের লীলাভূমির আধুনিক জীর্ণকুটীর-গুলিও ঐতিহাসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার যোগ্য।‡ কিন্তু গৌড় পরিদর্শকগণ তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করেন বলিয়া বোধ হয় না!

বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমানের বীরপ্রতাপের অভ্রান্ত অতীত সাক্ষিরূপে কত স্থানে কত দুর্গ প্রাচীর, নগর দ্বার, পুরাতন পরিখা লতাগুল্মাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, কে তাহার সংখ্যা নির্ণয় করিতে পারে? কত সমরভূমি এইরূপে বিস্মৃত হইয়া বিজন বনে, কৃষিক্ষেত্রে, বা আধুনিক উদ্যান বাটীতে পরিণত হইয়াছে, তাহারই বা কে সংখ্যা নির্ণয় করিতে পারে? তথাপি যথাসাধ্য তাহার বিবরণ সংকলনের আয়োজন করা কর্ত্তব্য।

যে সকল হিন্দু মুসলমান ক্লাইবের "লাল পল্টন" ভুক্ত হইয়া, ইংরাজের শক্তিবিস্তারের সহায়তা সাধন করিয়াছিল, সে কালের ইংরাজ রাজপুরুষেরা তাহাদের বীরকীর্ত্তির পুরস্কার স্বরূপ তাহাদিগকে গৌড়মণ্ডলে জায়গীর দান করিয়াছিলেন। তাহা অদ্যাপি মালদহের কালেকটারীতে "ইংলিশ" নামে পরিচিত। তাহার সহিত কত পূর্ব্বস্মৃতি জড়িত হইয়া রহিয়াছে, তাহার অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলে, বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। যাহাদের বংশধর এখন হলকর্ষণ করিয়া দিনান্তে একমুষ্টি অন্ন সঞ্চয় করিতে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতেছে, তাহারাই একদিন বীর-বিক্রমে বৃটীশ রাজকর্ম্মচারিগণের নিকট জায়গীর লাভ করিয়াছিল!

গৌড়মণ্ডল পরিভ্রমণ করিয়া তথ্যানু-সন্ধানের চেষ্টা করিলে, এখনও নানা তথ্য সংকলিত হইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু ইষ্টক প্রস্তরের স্বপ্নমোহ অধিকাংশ পর্য্যটককে কেবল তাহার দিকেই আকর্ষণ করিয়া থাকে। ইহাতে কেবল এক শ্রেণীর কীর্ত্তিচিহ্নের কথাই পুনঃ পুনঃ আলোচিত হইয়া আসিতেছে। এখন স্বদেশকে জানি-বার জন্য—চিনিবার জন্য—যে নূতন আকাঙ্ক্ষা ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে, তাহা আন্তরিক হইলে, গৌড়মণ্ডলের তথ্যানুসন্ধানের জন্য নূতন ভাবে আয়োজন করিতে হইবে। যাঁহারা সে পথে অগ্রসর হই-বেন, তাঁহাদের অধ্যবসায় বিফল হইবে না।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

* As early as 1686 A. D. the English East India Company, with permission from Emperor Aurangzeb, established a Sillk-factory.

† They buy cotton and sillk piecegoods, made to order of the chiefs of English Company.—*Riaz-us-Salatun*,

‡ Pandua was once famous for its manufacture of paper; but this industry has now died out.—*Riaz-us-Salatun Notes*.

কপাল-কুণ্ডলা।*

'কপাল-কুণ্ডলা'!—শ্রবণ মাত্র ভীষণ-মধুর এ নামটীর ভিতর যেন প্রবল জলোচ্ছ্বাসময় সমুদ্র-গর্জ্জন সহসা আমাদের হৃদয় ধ্বনিত করিয়া যায়! আরম্ভে, সেই 'ধারা নিবদ্ধের কলঙ্ক রেখা লবণাম্বু বেলার সুন্দর দৃশ্য—শেষেও সেই চৈত্র-বায়ু-বিতাড়িত সফেন নদী-তরঙ্গ! কি সুন্দর সামঞ্জস্য! কপালকুণ্ডলা আদ্যন্ত পাঠ করিলে পাঠকের হৃদয়ে এই দুইটী চিত্র গভীর রেখাপাত করিয়া যায়।

এই দুইটী চিত্রই সমস্ত দার্শনিক কাব্যখানিকে একটি মনোরম প্রভায় অতি উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। একটী চিত্র, প্রবেশ; অপরটি, নিষ্ক্রমণ। একটীতে নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে চিনিয়াছিল,—একভাবে; অপরটিতে চিনিয়াছিল অন্য ভাবে। একটীতে মুগ্ধ, কৃতজ্ঞ হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে; অন্যটীতে বিমূঢ় আত্ম-প্রতারিতের বিদ্রোহী ব্যাকুলতায়! মধ্যে কেবল রহস্য-সংশয়ের প্রেতলীলায় সত্যকে মার্জ্জিত করিয়া তুলিয়াছে।

কপাল-কুণ্ডলার প্রতিপাদ্য কি? শুধু কি,—অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন, আপনাতে পরিপূর্ণ সুন্দর চিত্র-অঙ্কন? শুধু সঙ্গীত, শুধু সৌন্দর্য্য, শুধু চিত্র? গ্রন্থকারের কি উদ্দেশ্য ছিল, তাহা জানি না,—কিন্তু আমাদের যেরূপ সংস্কার জন্মিয়াছে তাহাই স্থূল ভাবে বলিতে প্রয়াস পাইব। মনে হয়, প্রকৃতির সহিত স্বাধিকার-প্রমত্ত, মানুষের যে একটা জটিল বিরোধ জন্মিয়া গিয়াছে,—যাহার ফলে প্রকৃতি ক্রমশ এত হতশ্রী হইয়া গিয়াছে, তাহারি প্রতিপাদন এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য। মানুষ ক্রমশ প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিতে না পারিয়া, স্বাধিপত্য-বিস্তারের প্রবল চেষ্টায় ক্রমে আপনার অপরিসর গণ্ডীর মধ্যে, এত অশান্তি, বিপর্য্যয় আনিয়া ফেলিয়াছে যে আপনার সতন্ত্রতা-টুকু কোন মতে রক্ষা করিতে একান্ত অক্ষম!

যাহা সহজ, যাহা সুন্দর, যাহা সম্পূর্ণ, মানুষ তাহাকে ঠিক সেই ভাবে উপলব্ধি করিতে প্রস্তুত নয়; তাহার সহজ সৌন্দর্য্যকে ভোগ্য করিয়া, আপনার মত করিয়া আয়ত্ত করিতে চায়। এই কৃত্রিমতা সংঘর্ষণের পরিণাম কি? সুকুমার সৌন্দর্য্যটুকু, নির্ম্মম নিষ্পেষণে মরিয়া যায়! প্রকৃতিও সহজে তাঁহার অনবদ্য সৌন্দর্য্যটুকু মানুষের কৌশলে ধরা দিতে দেন না। ফুল ফুটিলে, মলয় গন্ধটুকু লইয়া প্রকৃতির বিশাল ভবনে কত খেলা করে, লুকাচুরি করে; প্রকৃতির তাতেই সুখ, তাতেই তৃপ্তি! কিন্তু লুব্ধ মানুষ শুধু সে ফুল দেখিয়া সুখী নয়,—সে ফুলটী

---

* ভবানীপুর সাহিত্য-সমিতিতে পঠিত।

করায়ত্ত করিয়া, তাহার নির্ম্মল সৌরভটুকু আপনার কার্য্যকরী বিলাসে পরিণত করিতে চায়! ফল হয় কি? শুধু যে সৌন্দর্য্যটুকু বিকৃত, নষ্ট হইয়া যায় তাহা নহে, অনেক সময় মানুষও মারা যায়! 'কপালকুণ্ডলা'র চিত্র দূর হইতে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে কতকটা এই ভাবের ছায়া লক্ষ্য করি নাকি! কবি বাইরণের এই কথাটী বড় সুন্দর মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় অভিব্যক্ত হইয়াছেন :—

> We wither from our youth, we gasp away
> Sick-sick ; unfound the boon, unslaked the thirst
> Though to the last in verge of our decay
> Some phantom lures, such as we saught at first,
> All too late, so are we doubly curst.
> Love, fame, ambition, avarice—it is the same
> Each idle and ill and none the worst
> All are meteors with a different name
> And Death the Sable smoke vanishes the flame!

প্রকৃতি চিরদিন কল্যাণময়ী! মানুষের এই প্রমত্ত অত্যাচার সত্ত্বেও প্রকৃতি আপনার বিপুল-সমগ্র দান করিয়া রাখিয়াছেন; মানুষ তাহা কেবলি দানের মত করিয়া গ্রহণ করিতে চায় না; সে চায় তাহাকে পাশব বলে হরণ করিয়া, বিজয়-গর্ব্ব-মিশ্রিত একটা উৎকট আমোদের মধ্য দিয়া, আয়ত্ত করিতে। মানুষ ও প্রকৃতির এই বিরোধ চিরদিনের। কেন এ বিরোধ জন্মিয়াছে, তাহার বিচার অবশ্য এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অন্তর্গত নয়।

এ উপন্যাসের বৈচিত্র্য এই যে, ইহাতে প্রেমের লীলা নাই,—মিলন-বিরহ নাই,—জটিল ঘটনার ঘন সমাবেশ নাই,—যুদ্ধ বিগ্রহ লুণ্ঠন হত্যার দীর্ঘ কাহিনী নাই—অথচ ইহাতে প্রায় সমস্তগুলিই আছে। প্রেম আছে; কিন্তু তাহা নিতান্ত মৌন;—আপনার মহত্বে ও গাম্ভীর্য্যে আপনি বিলীন!—সে কপালকুণ্ডলার বিশ্ব-প্রেম! মনুষ্যত্ব ও বীর্য্যের অভাব নাই;—তাহা নবকুমারের মজ্জাগত! লৌকিক ঘটনাদিও বিরল নয়;—কাপালিকের কূট-চক্রান্ত, মতিবিবির জিঘাংসা, ছদ্মবেশ ও প্রতারণা! কিন্তু সকলগুলিতেই কেমন-একটু শোভন স্বাতন্ত্র্য!

এ গ্রন্থের প্রাণ, কপালকুণ্ডলা এক হিসাবে অপূর্ব্ব সামগ্রী। অন্য কোন সাহিত্যে তাহা দুর্লভ হইবার কারণ এই, যে ইহা একান্ত ভারতবর্ষীয়। একথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, তাহার প্রকৃতি একদিকে, যেমন অনন্ত, উদার, গভীর, অন্য দিকে তেমনি সনীল, স্বচ্ছ ও লঘু! একদিকে ধর্ম্ম, অন্যদিকে প্রকৃতি,—দুইটী সনাতন সামগ্রীতে সৃষ্টা কপালকুণ্ডলা জগতে অতুল বলিলেও চলে!

কপালকুণ্ডলা—নিতান্তই প্রকৃতির মেয়ে। যতগুলি এই শ্রেণীর চরিত্র সাধারণত আমাদের চোখে পড়ে,—শকুন্তলা, মিরণ্ডা, রুথ ও মেরিকরেলীর গ্লোরিয়া একসেলসিস্ (Temporal Power)—সকলগুলি অপেক্ষা কপালকুণ্ডলা যেন প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কিত। প্রারম্ভ হইতেই, মিরণ্ডা ও শকুন্তলায় প্রেমাকর্ষণের অস্পষ্ট পূর্ব্বরাগ ফুটিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু সংসারের নিকটতর সম্পর্কে আসিয়াও

কপালকুণ্ডলার প্রেম বিকশিত হয় নাই ;—যাহা ছিল তাহা স্বাভাবিক সুগভীর করুণা! কপালকুণ্ডলা যখন প্রথম নবকুমারকে দর্শন করিয়াছিল, তখন শুধু তাহার জন্য অসহায় জীবের প্রতি একটা করুণা ভিন্ন অন্য কোন ভাবের বিকাশ দেখায় নাই,—এমন কি, যখন শিবিকায় চলিয়াছে তখনো নহে; সে নবকুমারের অনুবর্ত্তিনী হইয়াছিল, শুধু ভবানী-সেবক ব্রাহ্মণের অনুরোধে! পথি-মধ্যে একজন শঠকে বহুমূল্য অলঙ্কার-দান কপালকুণ্ডলার আদিম করুণা প্রস্ফুট করিয়া তোলে।

প্রকৃতির স্নেহক্রোড় হইতে কপালকুণ্ডলা এখন মানুষের রাজ্যে উপনীত! কিন্তু এ অবস্থা তাহার হৃদয়ের প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই ;—সে প্রকৃতির স্নেহ-সূত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হয় নাই—কিছুতেই পারে নাই। কপালকুণ্ডলা এক বৎসর সংসার করিয়াছে—কিন্তু সংসারে সন্ন্যাসি-নীর স্থান কোথায়? প্রকৃতিকে যত্নের সহিত ছাঁটিয়া, এ সংসার মানুষের কঠিন হাতে গড়িয়া উঠিয়াছে! মানুষ এখানে চারিদিকে নিয়ম-শাসনের বেড়া তুলিয়া অসীমের সীমা রচিয়া দিয়াছে। এখানে স্নেহ পরিমিত; করুণা ঘটনা-সাপেক্ষ; প্রেম সসীম ও প্রতিদানকামী।

সংসারে আসিয়া, কপালকুণ্ডলা, তাই, কিছুতেই সংসারের সহিত সম্বন্ধ পাতাইতে পারে নাই। আলুলায়িত কেশপাশ বেণী-সংবদ্ধ কুন্তলে পরিণত হইতে পারে নাই। সংসারী ও যোগিনী—ভোগ ও ত্যাগে বিবাহ সিদ্ধ হয় নাই। বিজন অরণ্যে নিশীথ অন্ধ-কারের মধ্য দিয়া নারী—সে ঔষধের সন্ধানে চলিয়াছে; তাহার প্রাণ এতদূর সংসার বন্ধন শূন্য! তাহার প্রাণ 'সমুদ্রতীরে, বনে-বনে বেড়াইতে' আকুল। সংসার তাহাকে কি করিয়া গ্রহণ করিতে পারে? 'পাষাণকায়' সংসার প্রাণপণ দৃঢ়বলে চাপিয়া তাহার জীবনটুকু নষ্ট করিতে চায়! সমস্ত সংসার একেবারে তাহার প্রতিকূলতাচরণে উদ্যত!

কাপালিক এই কাব্যে একটী প্রধান পাত্র—নবকুমার তাহার অধীন,—তাহারি হস্ত চালিত পুত্তলি মাত্র! গভীর অরণ্য-গর্ভে এই কাপালিক, বুভুক্ষু অজগর সর্পের মত মুখ-ব্যাদান করিয়া বসিয়া আছে পথভ্রষ্ট, অসহায় জীব যখনই তাহার নিকটবর্ত্তী হইবে, তখনই তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে! কাব্যাংশে, কাপালিককে সংসারের অপকৃষ্ট অংশ, স্বার্থ বলা যায়; কপালকুণ্ডলা প্রকৃতি; এই স্বার্থ প্রকৃতিকে পাশববলে অধীন করিয়া পদ-দলিত করিতে চায়! কাপালিক ধর্ম্মসাধনে রত নয়,—সে ঈশ্বর-প্রাসাদাকাঙ্ক্ষী নয়; সে স্বয়ং ঈশ্বর পদবীতে উত্তরণ-কামী। যখন সে পর্ব্বত শৃঙ্গ হইতে পদচ্যুত হইয়া গেল, তখন সে আঘাত প্রকৃতির প্রতি-শোধ মনে করিয়া, তাহার বিদ্রোহী-প্রবৃত্তি পৈশাচিক প্রতিশোধ গ্রহণে উন্মুখ হইয়া উঠিল; কি ভীষণ!

কাপালিকের পর্ব্বত-শৃঙ্গ হইতে পতন, ইহাই গ্রন্থের সূচনা! এখান হইতে প্রকৃতির সহিত, মানুষের স্বার্থ-সংগ্রামের প্রকৃত প্রারম্ভ! কাপালিক এই যুদ্ধের বিপুল আয়ো-জন করিতে লাগিল! এদিকে, প্রকৃতির পক্ষে, একমাত্র নিঃসহায় কপালকুণ্ডলা।

হায়, ক্ষুদ্র এতটুকু সুকোমল প্রাণ সংহার জন্য কি নৃশংস আয়োজন! মতিবিবি, নবকুমার, শ্যামা—সকলেই সংসারের জীব।

সংসার কেমন, ধীরে ধীরে, ব্যূহ রচনা করিতেছে! শ্যামা ঔষধ আনিতে সুন্দরী কিশোরীকে নিঃশব্দে বনে পাঠাইল;—নিশীথে! তাহাতে তার কতটা দায়িত্ব, কতটা ক্ষতি বিজড়িত ছিল,—গৃহিণী কপালকুণ্ডলার আত্মীয়া শ্যামা তাহা মনেই করিল না। কারণ, সে সংসারের পক্ষে; সাংসারিক স্বার্থের পুনঃ পুনঃ তাড়নায়, তাহার কাণ্ডজ্ঞান অপহৃত হইয়াছে।

তার পর মতিবিবি। একদিন সে প্রকৃতির চরণে মুগ্ধ-হৃদয়ে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল;—যেদিন সে নিরাভরণা কপালকুণ্ডলার গৌর দেহ অলঙ্কারে সাজাইয়াছিল। কিন্তু সে-ও স্বার্থ-বিষে জর্জ্জরিত। কপালকুণ্ডলা তদপেক্ষা সুন্দরী; নবকুমার, তাই, তাহাকে ভালবাসে!—এই চিন্তাই তাহার সর্ব্বনাশের মূল। তাহার প্রাণ দিল্লীর রাজপ্রাসাদের কৃত্রিমতার আতিশর্য্যে বীতশ্রদ্ধ বটে, কিন্তু তাহার অন্তর ঠিক কৃত্রিমই আছে। প্রকৃতির কোমল স্পর্শ, প্রণয়ের প্রথম বীজ নিক্ষিপ্ত হইয়াছে,—ঊষর ক্ষেত্রে। নিরাশার দাবানলে সে প্রণয় কি বিজাতীয় হিংসার আকার ধারণ করিয়াছে! তেজস্বী, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ নবকুমার যেদিন তাহাকে বলিলেন, "আগ্রায় ফিরিয়া যাও", সেই দিন হইতে তাহার সদ্য-বিকশিত প্রেম বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তথাপি সে, রক্ত-মাংসের জীব, তথাপি সে নারী, সে কপালকুণ্ডলার জীবন হননে প্রবৃত্ত নয়; কারণ, তাহার স্বার্থ এক স্তর নিচে। কাপালিকের স্বার্থ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক—তাহার নিচে মতিবিবি, তাহার নিচে শ্যামা! নবকুমার ঠিক স্বার্থের পক্ষে নয়—ক্রমে স্বার্থের মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিল। সে অসূয়া ও ক্রোধের অধীন। অসূয়ার মূলে স্বার্থ নিহিত!—এই কয়জনে মিলিয়া ক্ষুদ্র প্রকৃতির সন্তানকে হত্যা করিতে উদ্যত!

কি কি উপায়ে হত্যার আয়োজন, অনুষ্ঠান চলিতে লাগিল, তাহার দীর্ঘ বিশ্লেষণ, এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। এখন উপসংহারের অনুসরণ করা যাউক। কপালকুণ্ডলা যখন সংসারের চক্রান্ত-নাগপাশে বদ্ধ হইয়া গৃহাভিমুখে ফিরিতে ছিলেন, তখন কাপালিকের একটী ক্ষুদ্রকার্য্যের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতে চাই। কাপালিক নবকুমারকে সুরাপান করাইতেছিলেন; কেন? গ্রন্থকারের অতুল ভাষায়, 'নবকুমারের প্রকৃতি সংহার করিতে,'—'স্নেহের অঙ্কুর পর্য্যন্ত উন্মূলিত করিতে'। কি জানি, পাছে শেষ মুহূর্ত্তে চৈতন্যদয় হয়! এই খানে নব কুমারের চরিত্রের বেশ একটা ছবি পাওয়া যায়, সে প্রকৃতির বিদ্রোহী নয়, অসূয়া মোহাচ্ছন্ন।

প্রকৃতির কপালকুণ্ডলা ধীরে ধীরে গৃহে চলিলেন;—এ সময় তাঁহার হৃদয়-ভাব বড় সুন্দর, বড় গভীর! সে আত্মত্যাগের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত, তাই নিঃশঙ্ক; জগৎ তাহার নিকট অতি তুচ্ছ। তাহার হৃদয় ধর্ম্মভাবে পরিপূর্ণ; সে ধর্ম্ম সংসারের উদ্ধতন লোক হইতে, তাহাকে আহ্বান করিতেছে।"

নবকুমার হৃত-চৈতন্য; সংসারের তীক্ষ্ণ

সুতরাং তাহার প্রকৃতি মূর্চ্ছাতুর! নবকুমার শ্মশান ভূমে চলিতে চলিতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত শবদেহ বিমর্দ্দিত করিয়া গেলেন; কপালকুণ্ডলা তাহা করিল না! সুগভীর করুণার কি সুন্দর চিত্র! নিঃস্বার্থ করুণা—তখনো মানুষের প্রতি তাহার জিঘাংসা নাই, ঘৃণা নাই;—মানুষের শবের প্রতিও তাহার আদিম করুণা উচ্ছ্বসিত!

সহসা নবকুমারের হাত কাঁপিল—ধীরে ধীরে জ্ঞান ফুটিতেছিল। প্রকৃতিকে এতদিনে নবকুমার আর একবার চিনিতে চেষ্টা করিল। কি সুন্দর, হাত কাঁপিতেছে—'ভয়ে নয়, কাঁদিতে পারিতেছে না এই ক্রোধে!—কেন, কিসের জন্য সে কাঁদিবে? বঙ্কিমচন্দ্র তাহা বলিলেন না। এইখানে নাটকের কাজ। মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্মবিশ্লেষণ নাটকের ত্বরিত ছবিতে আঁকিয়া তুলিতে হয়!

একদিন এইরূপ স্থানে নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে চিনিয়াছিল, এইরূপ স্থানে, এইরূপ দিগন্তব্যাপি অস্পষ্ট অন্ধকার ছায়ায় নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে দেখিয়াছিল! দেখিয়াছিল 'একদেবী,—উপকারিণী প্রাণদাত্রীকে! নবকুমারের তাহা স্মরণ হইল। আজ সেই প্রাণদাত্রীকে যথার্থে নবকুমার নিজহস্তে বাঁধিয়া আনিয়াছে, তাই নিষ্ফল ক্রোধ! সেই প্রাণদাত্রী কি বিশ্বাসঘাতিনী! হোক্ বিশ্বাসঘাতিনী! শুধু তাহার মুখের কথায় তাহাকে গৃহে লইবে! কৃতজ্ঞতায় তখন নবকুমারের হৃদয়ের সমস্ত বিদ্রোহানল নির্ব্বাপিত করিয়া দিয়াছে!

কিন্তু হায়, কাহাকে লইয়া যাইবে! পাখী ছাড়া পাইয়াছে সে কি আর পিঞ্জরে ফিরে! কি ভুল! প্রকৃতির মেয়ে সংসারে নির্য্যাতনাবসানে মাতৃক্রোড়ে আশ্রয় চায়! তাহাকে ফিরাইবে? কোথায়? সংসারে?

তার পর, কপালকুণ্ডলার বিদায়! মৃত্যু নয়—অন্তর্ধান!—সেই পুঞ্জীভূত ভয়-বিস্ময় বিষাদের মধ্য দিয়া সীতাদেবীর পাতাল প্রবেশের ন্যায়, কপালকুণ্ডলা তেমনি অতর্কিত, তেমনি অলৌকিক ভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে কোথায় নিমিষে অন্তর্হিত হইয়া গেল। মৃত্যুহীন, দ্বন্দ্বহীন, চিরশান্তিময় প্রকৃতির গহ্বরে ব্যথিত সন্তান লুকাইয়া পড়িল! বিমুগ্ধ, বিস্মিত ও স্তম্ভিত দর্শকের নির্নিমেষ চক্ষুর উপর শোকনাট্যের শেষ যবনিকা পড়িয়া গেল।

শ্রীত্রৈলোক্যবিহারী মুখোপাধ্যায়।

মন্বন্তর।

(৭)

অরণ্য।

They (sepoys) marched through but one extensive wood, all the way a perfect wilderness; ...... These woods abound with tigers and bears, which infested the camp every night, but did no other damage than carrying off a child and killing some of the gentlemen's hackney bullocks. Hickey's Gazette, Calcutta 29 April, 1780.

বাঙলা অরণ্য হইয়া গেল! যে দেশের মাঠঘাট, হাটবাট সমস্তই জনকোলাহল মুখরিত ছিল, যে দেশের হাস্যকোলাহল চঞ্চল গৃহে প্রতিদিন আনন্দ ও আরাম, সুখ ও শান্তি উছলিয়া উঠিত, যে দেশের অর্থ লুণ্ঠন করিয়া মোগল এবং পাঠান অর্থশালী হইয়াছিল, যে দেশের ধনরাশি ইংরাজ ব্যাপারীর জীর্ণ কোটের শূন্য থলি পূর্ণ করিয়া দিয়াছিল এবং আজিও দিতেছে—ফিরিঙ্গিরা পর্য্যন্ত যে দেশ নিতান্ত লুণ্ঠন-ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল—সেই অতুলনীয়া মহামহিমাময়ী রত্নশালিনী চিরশান্তি সুখময়ী বঙ্গভূমি—প্রাসাদে প্রাকারে, রাজপথে, বিপণিতে, উদ্যানে কুঞ্জে যাহা সদা শোভাময়ী ছিল—যুক্ত শ্যামশস্যসিন্ধু যাহার অনন্ত শোভার ভাণ্ডার—সেই দেশ এক বৎসরের এক আঘাতেই বজ্রদীর্ণ হইয়া গেল, এক মন্বন্তরে শ্মশান হইল, এক দুর্বিপাকে শ্বাপদ সঙ্কুল মহারণ্যে পরিণত হইল! সেই নন্দনের পারিজাত এক মধ্যাহ্নের মার্ত্তণ্ডতাপেই শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িল, সেই হেমনলিনী এক নিশীথেই মরিয়া গেল, সেই স্বর্ণ-মন্দাকিনী এক মুহূর্ত্তেই শুকাইয়া গেল!

ইহা শুনিলে মনে হয়, এ দেশে বুঝি কোনকালেই লোক ছিল না—এ দেশে বুঝি কখনও নৃপতি ছিলেন না, পালন-রক্ষণ-বিধি ছিল না—ইহা চিরদিনই অরণ্য! আমরা সেই মহারণ্য সুসংস্কৃত করিয়া দুই দিনের জন্য বাস করিতেছিলাম—অকস্মাৎ কোন্ এক "আশ্চর্য্য প্রদীপে" কে যেন অঙ্গুলিস্পর্শ করিল, অমনি আমরা প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়া দেখিলাম প্রাসাদ ও প্রাকার অন্তর্হিত হইয়াছে, রাজপথ এবং বিপণি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, উদ্যান ও কুঞ্জ-ভবনের চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই—অরণ্য, কেবল অরণ্য, বিস্তীর্ণ বনশ্রেণী তাহা অতি নিবিড়, ঘন অন্ধকারময়, একান্ত বিজন!

সত্যই এ দেশে সবই ছিল। এ দেশে নবাব ছিলেন—নবাবের উপর কোম্পানী বাহাদুর ছিলেন। এ দেশে ফৌজদার ছিল, ফৌজ ছিল—হয় হস্তি রথ কিছুরই অভাব ছিল না। এ দেশে রামধন ও মবারক ছিল,

আর ছিলেন বর্দ্ধমানের মহারাজা, নদীয়ার বঙ্গনৃপতি, মল্লভূমির অশীতিপর বৃদ্ধ হিন্দু রাজা, রাজসাহীর দীনপালিনী মহারাণী ভবানী, দিনাজপুরের প্রজাপালক রাজা বৈদ্যনাথ—আরও কত-কে ছিলেন, কত কি ছিল; এত থাকিতেও এ বঙ্গভূমি অরণ্য হইয়া গেল!

মন্বন্তরের তিন বৎসর মাত্র পূর্ব্বে বীর ভূমিতে প্রায় ছয় সহস্রেরও অধিক কৃষক বাস করিত। দূর বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র মধ্যে তাহাদিগের এক একখানি স্বতন্ত্র কুটীর তখন সেই দিগন্ত বিস্তারি শ্যামশোভা মধ্যে সযত্ন লিখিত অল্প্রেখ্যবৎ প্রতিভাত হইত—মন্বন্তরের পর তিন বৎসর মধ্যে ছয় সহস্রের স্থানে ৪ সহস্র রহিল! গ্রামের পর গ্রাম জনশূন্য—মরুভূমি হইয়া গেল, সমৃদ্ধিশালী নগর পর্য্যন্ত প্রেতভূমি হইয়া উঠিল।*

১৭৮৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই ভাবে চলিয়াছিল। রাজমহল † মরুতুল্য বিজন হইয়া গেল, সুবিস্তীর্ণ রাজসাহীর এরূপ দুর্দ্দশা ঘটিল যে চাপিলা, দিঘা ইসুফশাহি, তেগাছি, মহম্মদপুর; প্রভৃতি বিখ্যাত পরগণা সমূহে অর্দ্ধেক লোকই ছিল না! মোহনা শাহি, কুসুম্বী, কুণ্ডা প্রভৃতি স্থানেরও সেই অবস্থা ঘটিয়াছিল। সরকার বাহাদুর কালীগ্রামে ৫ শত, সুজানগরে ২ শত এবং অরঙ্গ নগরে ৩ শত মুদ্রা অগ্রিম "তকভি" প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন—কিন্তু দান গ্রহণ করিবার কোন লোক ছিল না!‡ মন্বন্তরের পর বৎসর বীরভূমির এক তৃতীয়াংশেরও অধিক ভূমি পতিত বলিয়া হস্তবুদে লিখিত হইয়াছিল।

অধিক দিন নহে, ১০ বৎসর মধ্যে দেখা গেল যে, বীরভূমি বন্যজন্তুর আবাসস্থান হইয়াছে—সে মহারণ্য দুর্ভেদ্য—অনতিক্রম্য—ভীষণ! যে স্থানে একদিন শত সমর-দুন্দুভি বিজয় নিনাদে বাজিয়া উঠিয়াছিল, যে স্থানে কতবার বঙ্গভাগ্যলক্ষ্মীর অদৃষ্ট পরীক্ষা হইয়া গিয়াছিল, যে পথে এক দিন কত রণোন্মত্ত সিপাহী বিজয়-তাণ্ডবে অশ্ব ছুটাইয়া প্রধাবিত হইয়াছিল—কিছুকাল পরেই সেই দেশে ইংরাজের ক্ষুদ্র একদল সিপাহী সৈন্য ৬০ ক্রোশ পথ অতি নিবিড় বনশ্রেণী ভেদ করিয়া অতিক্রম করিতে বাধ্য হইয়াছিল! সে অরণ্যে তখন ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি নির্ব্বিবাদে বাস করিত—সিপাহীদিগের গাড়ীর গরু ধরিত—সিপাহী সর্দ্দারদিগের পুত্র কন্যা লইয়া পলায়ন করিত—আরও কত কি অত্যাচার করিত!§ এই সকল দেখিয়া কাপ্তান সাহেব মনে করিলেন, বাঙলায় এমন বিজন অরণ্যমধ্যে সৈন্য-সঞ্চালন করিয়া তিনি বীরত্বের পুরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন! তিনি বাঙলার পূর্ব্ব অবস্থা জানিতেন না—তিনি জানিতেন না যে সেই

* Letter from Alexander Higginson Esq : Supervisor of Birbhoom : 22nd Feb, 1771

† Letter from Mr. Harwood, supervisor of Rajmahal, 27 May, 8771.

‡ Letter from Mr. Rous, supervisor of Rajshahi, 4 June, 1771

§ Hicky's Gazette, Calcutta, 29 April, 1780.

অরণ্য একদিন গৃহারণ্য ছিল; সেখানে কত সহস্র বঙ্গবালা তাহাদিগের প্রতিদিনের সুখ ও দুঃখ লইয়া তথায় একদিন নিশ্চিন্ত মনে বাস করিয়াছে—সে ভূমির প্রতি ধূলিকণার সহিত তাহাদিগের হর্ষ এবং বিষাদ, মিলন ও বিরহ, আশা এবং নিরাশা বিজড়িত ছিল! আরও কিছুকাল গত হইল। এত দিন পর্য্যন্ত সরকারের ডাক (mail) সেই অরণ্যের ভিতর দিয়াই কোন ক্রমে যাতায়াত করিত। কিন্তু তাহাও অসম্ভব হইয়া উঠিল বলিয়া তখন ২৫ ক্রোশ পথ ঘুরিয়া ইংরাজের ডাক চলাচল করিতে লাগিল!*

মৃতাবশিষ্ট অল্পসংখ্যক নিরুপায় কৃষক যাহারা এতদিন ছত্রভঙ্গ হইয়া কোন প্রকারে সেই অরণ্যেরই অপেক্ষাকৃত সুপরিষ্কৃত স্থানে বাস করিতেছিল, এখন তাহারা তাহাও ত্যাগ করিল। সকলে একত্রে থাকিবার জন্য লালায়িত হইয়া তাহারাও যেমন ক্রমেই সম্মুখে সুপরিষ্কৃত ভূমিখণ্ডের আশ্রয় লইতে লাগিল, ব্যাঘ্রাদিও ক্রমেই তাহাদিগের পশ্চাদনুসরণ করিল, অরণ্যও ক্রমেই বর্দ্ধিতায়তন হইয়া চলিল! কোম্পানী বাহাদুর অবশেষে ঘোষণা প্রচার করিলেন যে যে কৃষক একটা সদ্যহত শার্দ্দূল-শিশু আনিয়া দেখাইতে পারিবে সে পুরস্কৃত হইবে সে পুরস্কারও যৎসামান্য ছিল না—একজন গৃহস্থ তিন মাস স্বচ্ছন্দে সপরিবারে দিনযাপন করিতে পারে এ পরিমাণ অর্থ দিবেন বলিয়া কোম্পানী বাহাদুর ঘোষণা প্রকাশ করিয়াছিলেন! ইতিহাস দেখাইয়া দিতেছে যে বাঙলার নিদারুণ মুদ্রাসঙ্কটে যখন ইংরাজের সর্ব্বপ্রকার অবান্তর ব্যয় রহিত হইয়াছিল তখনও ব্যাঘ্র বধের পুরস্কার যথারীতি প্রদত্ত হইত।

ব্যাঘ্র ভল্লুকাদির সঙ্গে সঙ্গে বন্য হস্তির উপদ্রব প্রতিদিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। কয়েক বৎসর মধ্যেই অর্দ্ধশত সমৃদ্ধ গ্রাম হস্তির তাড়নে জনশূন্য—নিবিড় অরণ্য হইয়া গেল; † দেশের ৩০।৪০টী প্রবীন হাট লুপ্ত হইল। শেষে এমন অবস্থা হইয়াছিল যে বীরভূমির রাজা সরকার বাহাদুরকে জানাইয়াছিলেন—'হস্তির উৎপাতে এ প্রদেশ জনশূন্য হইয়া গিয়াছে, প্রজাগণ পলায়ন করিয়াছে।

এই সকল উৎপাতে যেমন প্রজাগণ পলায়ন করিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাণিজ্যও বিলুপ্ত হইয়া গেল। বীরভূমির লৌহ শিল্পীগণ পলায়ন করিল, যাহারা কয়লার ব্যবসায় করিত তাহারা পলাইল অনেক গুলি শিল্পশালা ও পণ্যপূর্ণ বিপণি এবং বিপণিপূর্ণ নগর ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া গেল। হাটে আর পশ্বাদি বিক্রীত হইত না—গোচারণ ভূমি এবং পশ্বাদির হাট সরকারি দপ্তরে 'পতিত' বলিয়া লিখিত হইল। এক বৎসরের মধ্যস্তরে বীরভূমির এত দুর্দশা ঘটিল!

বাঙলার সেই বিজন বনবাসরে যেমন

* Bill for Contigent charges Birbhoom, 29 may, 1789.

† Letter from the collector of Birbhum to the Board of Revenue April 1790.

স্থানাদি বাস করিতে লাগিল, তেমনি জবর-দস্ত খাঁ প্রভৃতি বিখ্যাত ডাকাইতগণও সদল বলে নিশ্চিন্ত চিত্তে তথায় থাকিয়া দেশ মধ্যে প্রবল অত্যাচারের রুধির স্রোত ছুটাইয়া দিল। সরকার বাহাদুর তাহাদিগকে নিরস্ত করিতে পারিলেন না। মুসলমান তহশিলদারদিগের অত্যাচারে' আপন আপন ভূমি ও সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া বাঙলার অনেক শান্ত শিষ্ঠ সমৃদ্ধ সম্ভ্রান্ত ভদ্র পরিবার লুণ্ঠন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন! * তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই প্রসিদ্ধ দস্যুদিগকে আশ্রয় দিতেন এবং নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে ডাকাইতি হইবে না গ্রামবাসীদিগকে এইরূপ আশ্বাস দিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে প্রভূত অর্থ আদায় করিয়া লইতেন। যাহারা সেই অর্থ প্রদানে অসম্মত হইত ভদ্রবংশীয় দস্যুগণ তাহাদিগের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইত।

লুণ্ঠনকারীদিগের সঙ্গে সঙ্গে বাঙলায় তখন বোম্বেটের দল প্রসিদ্ধি লাভ করিল। কর্ম্মবিচ্যুত খল স্বভাব দুষ্ট মুসলমান সৈনিকগণ মুসলমান সৈনিক সম্প্রদায়ের আবর্জ্জনা রাশি তখন দলে দলে বাহির হইয়া গ্রাম লুঠিতে লাগিল, দেশমধ্যে অবর্ণনীয় পৈশাচিক অত্যাচার আরম্ভ করিল! † তাহারা কোম্পানীর পূর্ব্ব প্রবর্ত্ত সৈনিকের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া বেড়াইত—শান্ত শিষ্ট নিরীহ গ্রামবাসীগণ তাহাদিগকে কোম্পানীর ফৌজ মনে করিয়া কোন বাধা দিতে সাহসী হইত না।

হতভাগ্য রামধন ও মবারক এইরূপে নিষ্পিষ্ট হইয়া শেষে অর্থের এবং খাদ্যের অভাবে নিজেরাই লুঠেড়া হইয়া উঠিল। চোর ডাকাইতের উপদ্রব শেষে এত বৃদ্ধি পাইল যে সন্ধ্যার পর কেহ আর একখানি শাল পর্য্যন্ত গায়ে দিয়া রাজ পথে বাহির হইতে সাহসী হইত না! ইংরাজগণ নৈশ-ভোজনে বসিয়া বাটীর প্রবেশদ্বার রুদ্ধ করিয়া দিতেন। ভোজন সমাপ্ত হইলে যখন কাটা চামচে প্লেট ইত্যাদি বাক্সে উঠিত তখন আবার রুদ্ধ দ্বার মুক্ত হইত।

তখন পেটের জ্বালায় সকলেই দস্যু হইয়াছিল। রাজসাহীর সুপারভাইজর রাউস সাহেব তাই একবার কোম্পানী-বাহাদুরকে জানাইয়াছিলেন—

সে সকল প্রজার চরিত্র এতদিন কলঙ্ক-শূন্য ছিল, দুঃখে বিপদে ও দুর্দ্দশায় এখন তাহারা দলে দলে বাহির হইয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তর দগ্ধ করিয়া দিতেছে। শুধু পেটের দায়েই তাহারা এইরূপ করিতেছে।‡

মন্বন্তরের পূর্ব্ব হইতেই বঙ্গভূমি সন্ন্যাসীর

* Many of the principal families throughout the country, being dispossesed by the Mussulman tax gathers in whole or part of their lands, lived by plunder.

—Sir W. Hunter.

† Bands of cashiered soldiers, the dregs of the Musalman armies, roamed about plundering as they went, Etc. —Sir W. Hunter.

‡ Letter from Mr. Rous, the supevisor of Rajshahi, 13 April, 1771.

পীড়নে ব্যস্ত হইয়াছিল। সন্ন্যাসীগণ তীর্থ যাত্রার ভাণ করিয়া শতে সহস্রে নানা স্থান লুণ্ঠন করিয়া বেড়াইত—উহারা কোথাও বা সাধু সাজিয়া বসিত, কোন স্থলে বা ভিক্ষা করিত। * মন্বান্তরে যখন গৃহস্থগণ সর্ব্বস্বান্ত হইল তখন তাহারাও এই সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সহিত যোগ দিল। বাঙলায় তখন সন্ন্যাসী বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। তাহারা কোম্পানীর ফৌজের সহিত লড়াই পর্য্যন্ত করিল।†

(ক্রমশ)

শোণিত-সোপান।

৩

একটু পরে, প্রস্তর-মঞ্চটি জনশূন্য হইল, নিকটে যে ক্ষুদ্র একটি পাহাড় ছিল তাহার পশ্চাতে ফর্জ্জা অন্তর্হিত হইল,—সঙ্গীরাও তাহার পিছনে পিছনে চলিল। দস্যুরা যেখানে আড্ডা গাড়িয়াছে, পাঠকের নিকট সেই গুপ্ত স্থানের আর বর্ণনা করিব না, অথবা তাহাদের উন্মত্ত আমোদ প্রমোদেরও বর্ণনা করিব না। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে, একটা টেবিলের চারি পাশে দস্যুরা বসিয়া আছে, টেবিলের উপর কতকগুলা মদের বোতল রহিয়াছে, দস্যুরা পরস্পরের সুরাপাত্রের সহিত ঠোকাঠুকি করিয়া উন্মাদের ন্যায় অট্টহাস্য করিতেছে। আমরা সেই বীভৎস মত্ততার দৃশ্য দেখাইবার জন্য পাঠককে সেখানে লইয়া যাইব না। বরং এস আমরা এই শ্যাওলা-পড়া মাটীর ঢিবির উপর বসিয়া, যতক্ষণ না উষা দেখা দেয়, এই সুন্দর ইটালি দেশের সুন্দর রাত্রির সুখস্পর্শ সমীরণ সেবন করি।

কিন্তু, মাটীর দিকে মস্তক নত করিয়া একজন কে এই দিকে আসিতেছে? মনে হইতেছে যেন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। আর কেহ নহে—ফর্জ্জা। সঙ্গীদের ত্যাগ করিয়া একাকী এই দিকে আসিতেছে কেন? উহার মুখে ঘোর বিষাদের ভাব প্রকটিত; উহাদের গুপ্ত আড্ডাটা কি প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে? ফর্জ্জা যে দলের দলপতি, সে দলের মধ্যে কি অসন্তোষ দেখা দিয়াছে? খরচ পত্রের কি অভাব হইয়াছে?—না;—উহার উদ্বেগের কারণ সে-সব কিছু নহে। তবে ঐ মত্ততার আমোদ পরিত্যাগ করিয়া এ দিকে আসিল কেন? আসল কথা, এই দস্যুপতি ফর্জ্জা, একজন ইতর দস্যু নহে। আমোদের জীবন যাপন করিবার জন্য—ধন সঞ্চয় করিবার জন্য ফর্জ্জা দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করে নাই; সে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে—প্রেমের জন্য, নিনেতার জন্য। ফর্জ্জা

---

* Letter from the President and council (select committee) to the Court of Directors; January 15, 1773.

† আনন্দমঠের পরিশিষ্টে সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

আর কেহ নহে—সেই নিনেতার বিবাহার্থী দন্দোলো।

উহাকে চিনিতে আমাদের একটু কষ্ট হইয়াছিল; যাই হোক্, দন্দোলো খুব বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। যাহার চিত্ত মহৎ ভাবে পূর্ণ ছিল—নিনেতার প্রেম যাহাকে আরও মহৎ করিয়া তুলিয়াছিল, যাহাকে আমরা ইতিপূর্ব্বে একজন ভাগ্যবানের আশ্রয় লাভ করিতে দেখিয়াছিলাম, সেই যুবা পুরুষের কেমন করিয়া এরূপ অবনতি ঘটিল?

ক্লোটিল্‌ডা ও দন্দোলোর মধ্যে যে কথা হইয়াছিল তা ত আমরা জানি; দন্দোলো ক্লটিল্‌ডার নিকট হইতে যখন বিদায় হইয়া যায় তখন ভবিষ্যতে কি করিবে সে বিষয়ে সে অনিশ্চিত ছিল, কেবল ধনোপার্জ্জন করিবে বলিয়া সংকল্প করিয়াছিল; কয়েক মাস ধরিয়া দন্দোলোর নানাপ্রকার বিড়ম্বনা ঘটিল, কিন্তু দারিদ্র্য সত্বেও সে সততার পথ হইতে কখনও বিচলিত হয় নাই। অনেক দিন কাটিয়া গেল, তথাপি ধনোপার্জ্জনের পথে এক পদও অগ্রসর হইল না। মানুষের ব্যবহারে ও ঘটনার বিপাকে হতাশ হইয়া, স্বকীয় উদ্দেশ্য সাধনকল্পে—যে পথ সাধু লোকের নিকট চির-রুদ্ধ, দান্দোলো অবশেষে সেই পাপ-পথে ধাবিত হইল। আমরা যে সময়কার কথা বলিতেছি, সেই সময়ে দস্যুদের উপদ্রবে ইটালী দেশটা ছারখার হইতেছিল, দন্দোলো সেই একদল দস্যুর দলভুক্ত হইল। দান্দোলোর নির্ব্বিকার ভাব, সাহস ও ঔদ্ধত্যে তাহার সঙ্গীরা বিস্মিত হইল এবং শীঘ্রই তাহাকে তাহাদের সর্দ্দার-পদে অভিষিক্ত করিল। দন্দোলো স্বকীয় লুটের অংশ সযত্নে সঞ্চিত করিয়া রাখিত; পক্ষান্তরে তাহার সঙ্গীরা তাহাঁদের অংশ আমোদ-আহ্লাদেই উড়াইয়া দিত। প্রথম প্রথম দন্দোলোর আচরণে উহারা অত্যন্ত বিস্ময় অনুভব করিত; কিন্তু দন্দোলোর অর্থের কোন অভাব না থাকায় এবং তাহার সঙ্গীরাও যথেষ্টরূপে লুটের ভাগ পাওয়ায়, সঙ্গীরা তাহার কাজে কোন বাধা দিত না; তাহার অদ্ভুত ধরণটা তাহারা বুঝিতে না পারিলেও, সে বিষয়ে বড় একটা মনোযোগ দিত না।

অবশেষে দন্দোলো দেখিল, পাপের রাস্তা দিয়া সে স্বকীয় বাসনার চরম লক্ষ্য-স্থানে উপনীত হইয়াছে। ক্লটিল্‌ডা দান্দোলোর নিকট যে অর্থ চাহিয়াছিল,—সেই পথহারা কৌণ্টের নিকট হইতে দস্যুরা যে রত্ন-কৌটা অপহরণ করিয়াছিল, তাহার মূল্যেই ঐ অর্থের প্রায় সংস্থান হইয়া আসিয়াছে। আর দুই তিন দিনের মধ্যেই তাহার আশালতা ফলবতী হইবে। যাহার জন্য সে ধর্ম্মকে জলাঞ্জলি দিয়াছে, সেই ললনা শীঘ্রই তাহার হইবে! কিন্তু যখন সে এই চিন্তায় উৎফুল্ল হইতেছিল, সেই সঙ্গে অনুতাপও আসিয়া তাহার চিত্তকে দগ্ধ করিতেছিল। কিরূপ মূল্য দিয়া সে এই সুখ-রত্ন ক্রয় করিতেছে সে কথাও তাহার মনে হইতে লাগিল।

একাকী—চিন্তামগ্ন দন্দোলো, আর সে দন্দোলো নাই; যে অন্তর্বাণী পাপীর চিত্তকে দগ্ধ করে, সেই অন্তর্বাণীর দংশনে, দস্যু-জনোচিত লঘু আস্ফালন, ধর্ম্মে সংশয়, উপহাস-পূর্ণ ভাঁড়ামী—সমস্তই তাহাকে পরিত্যাগ

করিয়াছে। এখন আর সে কাহাকে নির্য্যাতন কিংবা অপমান করিতে সাহস করে না। তাহার শৈশবের সুখ-স্বপ্নগুলি আবার তাহার স্মৃতি-পথে আসিয়াছে; সে বেশ অনুভব করিতেছে, রক্তপাত করিবার জন্ম সে জন্মায় নাই; যে অদৃষ্ট, তাহার সাধের বাসনাগুলি পূর্ণ করিয়া তাহাকে একটা ভীষণ পথে বলপূর্ব্বক লইয়া গিয়াছে, সে এখন সেই অদৃষ্টকে অভিসম্পাৎ করিতেছে। এখন সে নিনেতার পাণিগ্রহণ করিতে উদ্যত—এখন দস্যুদের সঙ্গ তাহার আর ভাল লাগে না। এই জন্যই তাহার মুখে বিষাদের ভাব প্রকটিত; এই জন্যই সে দস্যুদের ছাড়িয়া একাকী চলিয়া আসিয়াছে; তাহাদের উল্লাসধ্বনি এখন আর তাহাকে উত্তেজিত করিতে পারে না।

রাত্রি প্রভাত হইল; দন্দোলো (এখন আর কর্জ্জা বলিব না) প্রস্তর মঞ্চের উপর এখনও পায়চালি করিতেছে। তাহার অন্তরে অনুতাপ ও আশার যুঝাবুঝি চলিতেছে; সেই চিন্তাতেই তাহার চিত্ত নিমগ্ন;—এমন সময়ে খুব নিকটে একটা অপরিচিত অশ্রুতপূর্ব্ব কণ্ঠস্বর তাহার ধ্যান ভঙ্গ করিয়া দিল; মুখ ফিরাইয়া দেখিল, একটা বন-পথে একদল বেদিনী গান গাইতে গাইতে অগ্রসর হইতেছে। শীঘ্রই তাহারা দন্দোলোর নিকটবর্ত্তী হইল। একজন বেদিনী দল ছাড়িয়া, দান্দোলোর অভিমুখে অগ্রসর হইল, এবং তাহাকে এইরূপ বলিল:—

"কর্জ্জা-মহাশয়! সুপ্রভাত; আজ তোমার মুখ বড় ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে; কোন দুর্ঘটনা হয় নি তো?"

চিন্তামগ্ন দন্দোলো বলিল;—"সম্প্রতি তোরা কি মাতেয়োর ক্ষেত-বাড়ীতে গিয়েছিলি?"

"আমি বরাবর দেখ্‌ছি, ঐ বাড়ীর খোঁজ খবর নিতে তুমি ভালবাসো; আমার মনে পড়ে, কিছু দিন হল, সেই বাড়ীর সকলে ভাল আছে কি না, সেই বাড়ীর সুন্দরী মেয়েটি ভাল আছে কি না—জেনে আস্‌বার জন্য আমাকে একটা চক্‌চকে মোহর দিয়েছিলে; তুমি ত জান, আমার একটু গণনা-বিদ্যেও আসে,—আমি তখনই বুঝেছিলুম, তুমি যে এই কাজে হাত দিয়েছ —সে-কেবল সেই মেয়েটির জন্য।"

—"এই বারটা তোর গণনায় ভুল হয়েছে।"

—"তাই যদি হয়, এবার তোমাকে একটা নূতন খবর দেব, সে খবর শুনে তোমার ত আর কষ্ট হবে না—তাই নির্ভয়ে তোমাকে বল্‌চি।—একজন বড় কোণ্টের সঙ্গে নিনেতার বিবাহ হয়ে গেছে।"

দন্দোলো মনের আবেগে বেদিনীর হাত সাপটিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল:

—"তুই যা বল্‌চিস্ তা কি সত্য? তুই যা জানিস্ শীঘ্র আমার কাছে সব কথা খুলে বল্! এই নে বকশিস্।"

বেদিনী আবার বলিতে লাগিল:—

"কিছু দিন হল, দেখ্‌লেম্, সেই ক্ষেত-বাড়ীর সামে লোকগুলো ব্যস্ত সমস্ত হয়ে চলা ফেরা করচে; জিজ্ঞাসা করে জানলেম, মেয়েটির বিবাহের আয়োজন হচ্চে; চেঞ্জানোর

পির্জ্জার বিবাহটা শীঘ্র হবে; সর্দার মহাশয়, আর দেরী না, এই বেলা শীঘ্র যাও, না-হলে, পায়রাটি তোমার হাত থেকে ফস্‌কে যাবে —আর তাকে পাবে না।”

এই কথা বলিয়া, সে আবার সঙ্গিনীদের মধ্যে গিয়া মিশিল। শাখাপল্লবের ভিতর দিয়া তাহাদের গান অস্পষ্টরূপে শুনা যাইতেছিল।

দন্দোলো বলিয়া উঠিল; “কি! আমার হাত থেকে ফসকে যাবে! না, না, তা অসম্ভব! নিনেতা আমাকে ভালবাসে; আমি এখনি যাব, এখনি গিয়ে তার সঙ্গে আবার মিলিত হব; আর যদি ক্লোটিল্‌দা তার অঙ্গীকার রক্ষা না করে, তাহলে তার আর রক্ষা নাই; কেননা সেই উচ্চাভিলাষিণী রমণীই আমাকে এই পাপ-পথে ধাবিত করেছে!

মনে মনে একটা দৃঢ় সংকল্প করিয়া, সেই ক্ষুদ্র পাহাড়টির দিকে দন্দোলো চলিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে, একটা বড় আচ্ছাদন-বস্ত্রে আচ্ছাদিত হইয়া, এবং বহুদিনের দস্যু-বৃত্তি লব্ধ ধনরত্নাদি সঙ্গে করিয়া আবার ফিরিয়া আসিল। এইমাত্র আমরা তাহাকে এই অবস্থায় দেখিয়াছি।

দস্যুর আড্ডা হইতে দন্দোলো সহসা পলায়ন করিলে পর, তাহার দুই ঘণ্টা পরে, দস্যুরা দলে দলে একত্র হইয়া, দন্দোলো কোথায় না জানি গিয়াছে সকলেই পর-স্পরকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল; এমন সময়ে পাওলো একখানা পত্র হস্তে করিয়া তাহাদের অভিমুখে অগ্রসর হইল।

—“আমাদের সর্দার কেন পালিয়েছেন তাহার কারণ বলি শোন।” এই কথা বলিয়া পাওলো পত্রখানা খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিল:—

“তোমাদের সঙ্গে আর আমার পরিচয় নাই; তোমাদের নাম আমি ভুলিয়া গিয়াছি, সেইরূপ আমাকেও তোমরা ভুলিয়া যাও। কিন্তু যদি তোমরা কখন আমার সুখের ব্যাঘাত কর, আমি তোমাদিগকে ধরাইয়া দিব। তোমাদের গুপ্ত আড্ডা আমি জানি।”

পাওলো আরও বলিল;—ফর্জ্জা এই জন্যই টাকা খরচ করিত না, সে আবার সাধু হবে মনে করেছিল; কিন্তু সে তার সঙ্গীদের সঙ্গে, ধর্ম্মভাইদের সঙ্গে বড় একটা ভাল ব্যভার করেনি, তার অতীত জীবনের সমস্ত প্রমাণ লোপ করবার জন্য, সে বিশ্বাস-ঘাতক হয়ে আমাদের ধরিয়ে দিতেও পারে; অতএব ভাই সকল, এসো আমরা শপথ করি, যে রকম করে পারি শীঘ্র আমরা তাকে যমালয়ে পাঠাব, মরণই তার উপযুক্ত শাস্তি।” এই প্রস্তাবে সকলে হাত বাড়া-ইয়া দিল এবং এইরূপ উত্তর করিল;

—আমরা শপথ করে বলচি, যে আমা-দের ছেড়ে চলে গেছে, আমাদের হাতে তার মরণ নিশ্চিত!

৪

জোৎদার মাতেয়োর, গৃহে পেপলির কাউণ্ট কখন্ আসেন তার জন্য সকলেই আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছে। কেবল জোৎ-দারের কন্যা নিনেতার ভয় হইতেছে পাছে তিনি আসিয়া পড়েন। কেননা, তাহা হইলে নিনেতার সমস্ত সুখের আশা বিনষ্ট

হইবে। বাল্যসহচরী সিল্‌ভিয়ার সহিত একটা ঘরের মধ্যে বদ্ধ হইয়া নিনেতা দন্দোলোর শেষ পত্রখানি পাঠ করিতেছিল; পত্রখানি এতদিনে পুরাতন হইয়া গিয়াছে। প্রিয়তমাকে লাভ করিবার জন্য দন্দোলোর কত যুঝাযুঝি করিতে হইতেছে, কত বিড়ম্বনা সহ্য করিতে হইতেছে, এই সব কথা তাহাতে ছিল। এই সকল স্মৃতির মধ্যে থাকিয়া, তাহার যন্ত্রণা আরও তীব্র হইয়া উঠিয়াছে; যে ভীষণ বাস্তবতা আসন্ন, তাহা নৈরাশ্যের বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে। মাতার সংকল্পে সে বাধা দিতে চেষ্টা করিতেছে না; সে বেশ জানে, ক্লোটিল্‌ডা-ঠাকরুণ যে-ইচ্ছা একবার প্রকাশ করেন, সে ইচ্ছার বাধা দেওয়া নিষ্ফল। হাড়কাঠে গলা দিয়া কখন্ খড়্গাঘাত হয় সে যেন তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছে। যদি এই ঘৃণিত বিবাহের প্রস্তাবটা অবাধে কার্য্যে পরিণত হয়, তাহা হইলে সে কি করিবে, মনে মনে কেবল তাহারই আন্দোলন করিতেছে।

তাহার সহচরী কত আশার কথা বলিয়া তাহার বিষাদ-অন্ধকার দূর করিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইতেছে না। সহচরীর কথায় বরং তাহার মনের যাতনা আরও তীব্র হইয়া উঠিতেছে।

নিনেতাকে সে বলিল:—কেন ভাই তুমি এত কষ্ট পাচ্চ; দেখ তুমি শীঘ্রই রাজরাণী হবে, "কৌনটেশ্" হবে!—আমীর ওমারাওর ঘরে প্রবেশ করবার অধিকার পাবে; তুমি কত সুখী হবে, তোমার সুখে সকলে হিংসে করবে; উৎসব—আমোদের মধ্যেই তোমার জীবন কাট্‌বে; তুমি কত বস্ত্র অলঙ্কার পাবে। এইরূপ কল্পনার স্বপ্ন আমার মনে কতবার এসেছে—এরূপ সুখস্বপ্ন তোমার মনেও কি হয় না?

তাহার সহচরী এইরূপে যতই তাহাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিতেছে, হতভাগিনী নিনেতার বক্ষ অশ্রুজলে ততই ভাসিয়া যাইতেছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নিনেতা দন্দোলোকে বরাবরই ভাল বাসে; বিচ্ছেদে এই ভালবাসা নষ্ট হয় নাই, বরং আরও পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে; এই ভালবাসাই এখন তাহার জীবনের ভিত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে; এখন যতই বাধাবিঘ্ন আসুক না কেন, এই ভালবাসাই বিজয়ী হইয়া তাহার হৃদয় সিংহাসন অধিকার করিবে।

নিনেতা দন্দোলোর জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে; তাহার ধ্রুব বিশ্বাস, দান্দোলো আসিবে। তাহার অন্তরাত্মা যেন বলিতেছে, দান্দোলো আসিবে। কেন না, প্রেমের সহিত আশা চির বন্ধনে বদ্ধ।

যাহাই হউক, শ্রীমতী ক্লোটিল্‌ডা দন্দোলোকে যে সময় দিয়াছিলেন, তাহার তিন দিন মাত্র বাকী আছে; এ দিকে, কৌণ্ট পেপলির সহিত নিনেতার সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে; নিনেতা এ সমস্তই জানিত, কিন্তু তবু একেবারে হতাশ হয় নাই। দন্দোলো আসিতেও পারে, কোন দৈব ঘটনায় তাহার এই অবাঞ্ছনীয় বিবাহের সম্বন্ধটা ভাঙ্গিয়া যাইতেও পারে;—এইরূপে সে ইচ্ছা-সুখে কতই কল্পনা করিতেছিল। কৌণ্ট পেপলির আসিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া তাহার

এই আশা আরও দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল—"যদি পেপলি কোন কারণে না আসিতে পারে ত বড়ই ভাল হয়।" এই সময়ে নিনেত্তা মনে মনে পেপলির সকল প্রকার অশুভ কামনা করিতে লাগিল—এইরূপ চিন্তায় মুহূর্ত্তের জন্ত তাহার মনের ভারটা একটু যেন কমিয়া আসিল।

কিছুদিন পূর্ব্বে, এই বালিকাই একটি পাখীর কষ্ট দেখিতে পারিত না। তাহার হৃদয় অনুকম্পায় বিগলিত হইত। কিন্তু প্রেম মানুষকে কখন কখন বড়ই নিষ্ঠুর করিয়া তোলে!

এ দিকে, ফোৎদার মাতেয়োর গৃহে আর এক প্রকার দৃশ্যের অভিনয় চলিতেছিল। মাতেয়ো ও ক্লোটিল্ডা, পেপলির একজন অনুচরকে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিতেছিল। এই লোকটির নাম পেদ্রোলিনো। আগমন সংবাদ দিবার জন্ত তাহার প্রভু তাহাকে অগ্রেই পাঠাইয়া দেয়। পেদ্রোলিনোকে দেখিয়া মনে হইতেছিল, তাহার অন্তরে যেন কি একটা প্রচ্ছন্ন উদ্বেগ রহিয়াছে। পূর্ব্বরাত্রে সে বলিয়াছিল যে তাহার প্রভুর কয়েক ঘণ্টামাত্র পূর্ব্বে সে ছাড়িয়াছে; তাহার পর আবার রাত্রি আসিল, রাত্রি প্রভাত হইল, তবু তাঁহার দেখা নাই।

—"পথে তাঁহার কি কোন দুর্ঘটনা হইয়াছে?"—এই কথা মাতেও ও ক্লোটিল্ডা দুজনে এক সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিল। পেদ্রোলিনো দুই একটা কথায় ইহার উত্তর দিল! জিজ্ঞাসাকারীদিগকে পেদ্রোলিনো আশ্বাস দিবার চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু তাহার মনের উদ্বেগ সে ঢাকিতে পারিতেছিল না; তাহার মুখের ভাবেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছিল।

ইত্যবসরে, একটা লোক, হাতাহীন একটা বৃহৎ আলখাল্লায় আচ্ছাদিত হইয়া (যেরূপ কোর্ত্তা দস্যুরা ইতিপূর্ব্বে তাহার গাত্র হইতে উন্মোচন করিয়াছিল) দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। নিকটে আসিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল:

—"আমি পেপলির কৌণ্ট।

মাতেয়ো তিন পা পিছাইয়া গেল।

—"তুমিই পেপলির কৌণ্ট? তুমিই আমার কন্যার বাগ্‌দত্ত বর? তুমি ঠাট্টা করছ না ক্ষেপেছ?

"আমিই পেপলির কৌণ্ট, এবং আমি তার প্রমাণ দিচ্চি। আমি যে এই পোষাকে এসেচি তজ্জন্য আপনি আমাকে মার্জ্জনা করবেন, আমার সমস্ত কথা শুনলে আর আপনি আশ্চর্য্য হবেন না।"

এই কথাতেও মাতেয়োর সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল না; কোন একটা গোলযোগ উপস্থিত হইলেই মাতেও ক্লোটিলডোর শরণাপন্ন হইত। তাই, আর কোন বাক্যব্যয় না করিয়া, যে ঘরে ক্লোটিল্ডা ও পেদ্রোলিনো ছিল, সেই ঘরে আগন্তুককে লইয়া গেল।

আগন্তুককে ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই পেদ্রোলিনো বলিয়া উঠিল:—"হুজুরালী।" এই উভয় ব্যক্তির মধ্যে একবার চোখ-চাওয়া-চাউই হইয়া গেল। একজন মনোযোগী দর্শক সহজেই দেখিতে পাইবে, প্রভুর জীবনের জন্য আশঙ্কা হইয়াছে, ভৃত্যের মুখে এরূপ কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই।

মাতেয়োর ন্যায় শ্রীমতী ক্লটিল্‌ডাও বিস্মিত হইয়াছিলেন। কিন্তু যখন উঁহারা আগন্তুককে প্রকৃত পেপলির কৌণ্ট বলিয়া চিনিতে পারিতেছিলেন না, তখন আগন্তুক তাহার দলিলাদি দেখাইল, এবং অরণ্যের মধ্যে তাহার যাহা ঘটিয়াছিল সমস্ত বর্ণনা করিল; তখন তাঁহাদের সন্দেহ দূর হইল; এবং তখন তাঁহাদের বাধো-বাধো ভাব চলিয়া গিয়া ব্যগ্রতার ভাব আসিয়া উপস্থিত হইল। ক্লোটিল্‌ডা বলিলেন :—

—"তুমি যাহা বর্ণনা করলে তাহাতে আমি বড়ই ভয় পেয়েছিলেম। তোমার কি ভয়ানক বিপদই গিয়েছে। যাহোক ঈশ্বরের কৃপায় তুমি ভালোয়-ভালোয় ফিরে এসেছ, এই ঢের; যা ঘটেছে তার প্রতিবিধান এখনও হতে পারে। আর আশা করি সেজন্য এ বিবাহের কোন বিলম্ব হবে না। পেপলি উত্তর করিলেন :—

—"আমারও সেই ইচ্ছা। আমার প্রিয়তমার জন্য যে হিরার গহনা আন্‌ছিলেম সে ত রাস্তায় লুট হয়ে গেল, তাঁকে অন্য হীরার গহনা আবার দেব; আমার এই পরিচ্ছদটা আমি সহজে বদ্‌লে ফেল্‌তে পারব—তাতেও কোন বাধা হবে না। কিন্তু নিনেতা কোথায়? তাঁকে ত এখানে দেখ্‌ছি নে।" ক্লোটিল্‌ডা একটু মুচ্‌কি হাসিয়া বলিলেন;—"তোমাকে গ্রহণ করবার জন্য সে এখন সাজসজ্জা করচে।"—"তিনি যেরূপ সুন্দরী তাতে সাজসজ্জার ত কোন প্রয়োজন নাই। আমার বরং এই বেশে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে সঙ্কোচ হচ্চে।" মাতেয়ো বলিলেন :—

"আমার রবিবারের পরিচ্ছদটা তোমাকে আমি দিচ্চি।" কৌণ্ট মধুর ভাবে একটু হাসিলেন।

ক্লোটিল্‌ডা মাতেয়োর কানে-কানে বলিলেন :—"বোকারাম তুমি করচ কি? উনি তোমার চাষাড়ে কাপড় পরবেন?"

মাতেয়ো এইরূপ সম্বোধনবাক্য বিশ বৎসর ধরিয়া শুনিয়া আসিতেছেন—সুতরাং মাতেয়ো বিস্মিত না হইয়া উত্তর করিল :—

"ওঁর প্রাসাদ হতে কাপড় আনিয়ে নেওয়া যাবে।"

পেদ্রোলিনো ও পেপলি মুহূর্ত্তের জন্য একটু ভাবিত হইয়া পড়িল। তাহার পর পেপলি বলিল :—

—"আমার প্রাসাদ এখান থেকে একটু দূর—আমার প্রাসাদ লুগানাতে।"

—"কি লুগানাতে? আমি মনে করে-ছিলেম পোর্টিচিতে।" পেদ্রলিনো বলিল;—

"হুজুরের প্রাসাদ দুই জায়গাতেই আছে, কিন্তু হুজুরের পরিচ্ছদাদি লুগানার প্রাসাদেই থাকে।"

"দুইটা প্রাসাদ? আমার মেয়ের কি সৌভাগ্য!"

ক্লটিল্ডা এই কথা বলিলেন। পেপলি বলিল :—এর দরুন বিবাহের একটু বিলম্ব হতে পারে; কিন্তু এর জন্য আপনাদের কোন কষ্ট পেতে হবে না—পেদ্রোলিনো সেসা-নোতে গিয়ে অনায়াসে একটা পরিচ্ছদ নিয়ে আস্‌তে পারবে—তবে ওর হাতে কিছু টাকা দিতে হবে—কেননা, দস্যুরা আমাদের সর্ব্ব-স্বান্ত করেছে।

মাতেয়ো পেড্রোলিনের হাতে কিছু টাকা

বঙ্গদর্শন।

প্রাচ্য ভারত।

স্মরণাতীত পুরাকাল হইতে আর্য্যাবর্ত্ত এবং দাক্ষিণাত্য নামে ভারতবর্ষের দুইটি প্রধান বিভাগ কল্পিত হইয়া আসিতেছে। তন্মধ্যে যে বিভাগে আর্য্যগণ অক্ষুণ্ণপ্রতাপে অধিকার রক্ষা করিয়া, বংশানুক্রমে নিরুদ্বেগে বাস করিয়া আসিতেছিলেন, তাহারই নাম "আর্য্যাবর্ত্ত।" * তাহার পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দিকেই সমুদ্র;—উত্তরে হিমালয়; দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল;—মনুসংহিতায় এইরূপ সাধারণ ভাবের সীমানির্দ্দেশের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। † ইহা কখনও প্রকৃত ভৌগলিক সীমা বলিয়া পরিচিত ছিল কি না, পুরাতন কিংবদন্তী ভিন্ন তাহার অন্য কোন প্রমাণ বর্ত্তমান নাই। মনুসংহিতার সেই কিংবদন্তীমাত্রই উল্লিখিত হইয়াছে। ‡ তাহা কত পুরাতন কিংবদন্তী, তাহার সন্ধান লাভের উপায় নাই।

আর্য্যাবর্ত্ত।

আর্য্যাবর্ত্ত প্রধানতঃ তিনটি প্রধান প্রদেশে বিভক্ত ছিল। তাহার নাম—ব্রহ্মাবর্ত্ত, ব্রহ্মর্ষি, এবং মধ্যদেশ। সরস্বতী এবং দৃষদ্বতী নামক দুইটি নদীস্রোতের মধ্যবর্ত্তী "দেবনির্ম্মিত" দেশের নাম "ব্রহ্মাবর্ত্ত"। তাহার পর কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পঞ্চাল এবং শূরসেনক নামক প্রদেশ-চতুষ্টয়োপশোভিত "ব্রহ্মর্ষি দেশ"।" তাহার পর "মধ্যদেশ।" তাহার উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল, পশ্চিমে সরস্বতী নদীর

পূর্ব্ব সীমা।

---

* মনুসংহিতার সুপরিচিত ভাষ্যকার মেধাতিথি আর্য্যাবর্ত্ত-শব্দের ব্যুৎপত্তি-ব্যাখ্যার্থ লিখিয়া গিয়াছেন :—"আর্য্যা বর্ত্তন্তে যত্র, পুনঃ পুনরুদ্ভবন্তি, আক্রম্যাক্রম্যাপি ন চিরং তত্র ম্লেচ্ছাঃ স্থাতারো ভবন্তি।" এই ব্যাখ্যার মধ্যেই সেকালের প্রধান ঐতিহাসিক তথ্য প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। যেখানে আর্য্যগণ বংশানুক্রমে উৎপন্ন,—যেখানে ম্লেচ্ছগণ পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়াও, দীর্ঘকাল অবস্থিতি করিতে অশক্ত,—তাহারই নাম আর্য্যাবর্ত্ত। এইরূপ ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করিয়া ভাষ্যকার আর্য্যাবর্ত্ত শব্দকে ভৌগলিক সীমার বাহিরে টানিয়া আনিয়া, তাহাকে আর্য্যপ্রভাবক্ষেত্র বলিয়াই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তদনুসারে, যাহা এক সময়ে আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়া পরিচিত ছিল না, তাহাও উত্তরকালে আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্গত হইবার অবসর লাভ করিয়াছিল। আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বাংশের নাম প্রাচী। তাহার অধিকাংশই ক্রমে আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্গত হইবার পর, যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহাই প্রাচী নামে কথিত হইত। এই পার্থক্যনির্দ্দেশের জন্য আর্য্যাবর্ত্তের একটি ভৌগলিক সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তাহা হিমালয় এবং বিন্ধ্যাচলের মধ্যবর্ত্তী স্থানকেই আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়া ঘোষিত করিত। সে কত দিনের কথা, তাহারও প্রমাণ সংকলনের উপায় নাই তাহা মনুসংহিতা সংকলিত হইবার পূর্ব্ব কালের কথা।

† আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্ব্বুধাঃ ॥২।২২॥

‡ পূর্ব্বাচার্য্যগণ যে এইরূপে সাধারণ ভাবেই আর্য্যাবর্ত্তের সীমা নির্দ্দেশ করিতেন, "বিদুর্ব্বুধাঃ" বলিয়া মনু তাহারই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাহা মনুর নিকটেও পুরাকালের কথা বলিয়া পরিচিত ছিল। তাহার পর অন্যান্য স্থানেও আর্য্যপ্রভাবক্ষেত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল।

অন্তর্ধান ক্ষেত্র, পূর্ব্বে প্রয়াগ ধাম। * ইহাই আর্য্যনিবাসের চির পুরাতন পরিচয় বিজ্ঞাপক শেষ সীমা। এই সীমার মধ্যে উল্লিখিত তিনটি সুবিখ্যাত দেশে বসতি করিয়া, আর্য্যগণ তদনুসারেই আত্মপরিচয় প্রদান করিতেন। নদনদীর প্রাকৃতিক সংস্থান অবলম্বন করিয়া, এই সকল পুরাতন আর্য্যজনপদের সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকিবে। পুরাকালে সেইরূপে সীমানির্দ্দেশ করাই স্বাভাবিক প্রথা ছিল বলিয়া প্রতিভাত হয়।

এই সাধারণ সীমার মধ্যে সকল স্থানে, —এবং ইহার বাহিরেও অনেক স্থানে— আর্য্যগণ ক্রমে ক্রমে রাজ্য

সীমাবিস্তার

বিস্তার করায়, আর্য্যাবর্ত্তের পুরাতন সীমা অনেকদূর পর্য্যন্ত পূর্ব্বাভিমুখে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। দিঙ্‌নির্ণয়ের জন্য পূর্ব্বাংশ প্রাচী নামে অভিহিত হইলেও, তদ্দেশে নানা আর্য্যজনপদ প্রতিষ্ঠিত হইয়া, প্রাচীকেও সর্ব্বতোভাবে আর্য্যপ্রভাবক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছিল। যে দিগ্বিজয় লালসা এইরূপে প্রাচ্যভারতে আর্য্যপ্রভাব বিস্তৃত করিয়া, আর্য্য সমাজকে বিজয়গৌরবে বিভূষিত করিয়াছিল, তাহা ভারতবর্ষের বাহিরেও আর্য্যগৌরব বিস্তারে ধাবিত হইয়াছিল।

আর্য্যবিজয় যুগের এই সকল দিগ্বিজয় ব্যাপারের ধারাবাহিক ইতিহাস সংকলিত হইবার সম্ভাবনা নাই। তাহার

প্রভাবক্ষেত্র

সকল কথাই স্মরণাতীত পুরাকালের কথা। সুতরাং কোন্‌ সময়ে প্রাচ্যরাজ্যে আর্য্যপ্রভাবক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার সূত্রপাত হয়,—কিরূপে, কতকালে, কতদূর পর্য্যন্ত,—আর্য্যোপনিবেশ ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, তাহার সকল কথাই বিস্মৃতিগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে! পুরাতন সংস্কৃত সাহিত্যে এখনও তাহার যাহা কিছু আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা কেবল জনশ্রুতিমূলক,—নানা তর্কবিতর্কে নিরতিশয় সংশয়াচ্ছন্ন। †

প্রাচ্যরাজ্যে যে সকল আর্য্যজনপদ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল, তাহা পুরাতন সাহিত্যে সহসা জনপদরূপে উল্লিখিত হয় নাই,—ব্যক্তি বিশেষের নামানুসারে,—সমাজরূপেই উল্লিখিত

আখ্যায়িকা।

হইয়াছে। কিরূপে সেই সকল সমাজের উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহার আখ্যায়িকা নানা ভাবে উল্লিখিত। অথর্ব্ব-সংহিতায় অঙ্গ নামক এইরূপ একটি সমাজের উল্লেখ আছে। ‡ ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দেখিতে পাওয়া যায়,—বিশ্বামিত্র-শাপে অন্ধ্র, পুণ্ড্র, ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গের সমাজ পতিত হইয়াছিল। ঐতরেয় আরণ্যকে বঙ্গ-সমাজের

* হিমবদ্বিন্ধ্যয়োর্মধ্যং যৎ প্রাগ্বিনশনাদপি।
প্রত্যগেব প্রয়াগাচ্চ মধ্যদেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ২।২১॥

এই পর্য্যন্ত বর্ণনা করিয়া, প্রয়াগের পূর্ব্বদেশবর্ত্তী অন্য কোনও আর্য্যজনপদের উল্লেখ না করায়, তাহার আপেক্ষিক অর্ব্বাচীনত্ব সূচিত হইয়াছে।

† বৈদিক সাহিত্যে এবং লৌকিক সাহিত্যে এতদ্বিষয়ক যে সকল আখ্যায়িকা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার মধ্যে সর্ব্বাংশে সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায় না। কখন মগধ, কাশী, পর্য্যন্তও প্রাচ্য বলিয়া উল্লিখিত।

‡ অথর্ব্ব সংহিতার পঞ্চম কাণ্ডীয় পঞ্চমানুবাগান্তর্গত চতুর্দ্দশ শ্লোকে মগধের ন্যায় অঙ্গ যে ভাবে উল্লিখিত আছে, তাহাতে মনে হয়, তৎকালে মগধেও আর্য্যপ্রভাবক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

উল্লেখ আছে। শাংখ্যায়ন শ্রৌতসূত্রে পুণ্ড্র-সমাজের উল্লেখ আছে। দৈত্যরাজ বলীর পত্নী সুদেষ্ণার গর্ভে দীর্ঘতমা ঋষির ঔরসে পঞ্চপুত্র উৎপন্ন হইবার একটি আখ্যায়িকা মহাভারতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহাদিগের নামেই প্রাচ্য পঞ্চরাজ্যের নামকরণ হইয়াছিল। * এইরূপ আখ্যায়িকা ক্রমে নানা আকার ধারণ করিয়াছিল।

যাঁহারা আর্য্যাবর্ত্তের সুপরিচিত পুরাতন সীমার বাহিরে আসিয়া, আর্য্যপ্রভাবক্ষেত্র সুবিস্তৃত করিয়াছিলেন, তাঁহারা ঐতিহাসিক তথ্য আর্য্য নামেই পরিচিত ছিলেন। আর্য্যদিগের মধ্যে তাঁহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া কথিত! তাঁহারা পুরাতন আর্য্য-নিবাস পরিত্যাগ করিয়া, অনার্য্যপ্রভাব-ক্ষেত্রে বিজয় লাভ করিতে ধাবিত হইয়া, জন্মভূমি হইতে ক্রমে বহুদূরে আসিয়া, বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এইরূপে তাঁহারা এবং তাঁহাদিগের সন্ততিবর্গ চিরপ্রবাসী হইয়া ব্রাহ্মণসমাজের অদর্শনে, শাস্ত্রার্থালোচনার অসদ্ভাবে, আর্য্যসমাজোচিত ক্রিয়া কাণ্ডের যথাযথ মর্য্যাদারক্ষার অসামর্থ্যে, ক্রমে ক্রমে সমাজচ্যুত—"ব্রাত্য" হইবার কথা মনুসংহিতায় উল্লিখিত আছে। নানা কারণে, তাহাকেই ঐতিহাসিক তথ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। তৎ যথা,—

"শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥
পৌণ্ড্রকাশ্চোড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজাঃ
যবনাঃ শকাঃ।
পারদাপহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ॥
মুখবাহুরুপজ্জানাং যা লোকে
জাতয়ো বহিঃ।
ম্লেচ্ছাবাচশ্চার্য্যবাচঃ সর্ব্বে তে দস্যবঃ স্মৃতাঃ॥"

মনুসংহিতায় প্রথমে "ইমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ" বলিয়া উল্লেখ থাকায়, এক সময়ে,—বিজয়-যাত্রাকালে,—ইঁহারা যে সকলেই অপতিত ক্ষত্রিয় ছিলেন, তাহারাই আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরে "শনকৈঃ" - ক্রমে ক্রমে—সকলেই পতিত হইয়া, "বৃষলত্ব"—শূদ্রত্ব-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার মুখ্য কারণ "ক্রিয়ালোপাৎ", গৌণকারণ "ব্রাহ্মণাদর্শনাৎ" বলিয়া উল্লিখিত থাকায়, ঐতিহাসিক কারণ-পরম্পরা ব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে আরও একটি ঐতিহাসিক তথ্য "ম্লেচ্ছাবাচ-শ্চার্য্যবাচঃ" শব্দের মধ্যে অভিব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। আর্য্যনিবাস হইতে বহুদূরে আসিয়া, কেবল যে ক্রিয়ালোপই সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা নহে। ইঁহাদিগের মধ্যে ভাষাপার্থক্যও প্রবেশলাভ করিয়াছিল। কেহ ম্লেচ্ছভাষা গ্রহণ করিয়াছিলেন; কেহ বা আর্য্যভাষা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রাচ্যরাজ্যের ভাষাবিবর্ত্তনের মধ্যে এখনও তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু সেকালের আর্য্যসমাজ সকল শ্রেণীর ব্রাত্যগণকেই "দস্যু" নামে অভিহিত করিয়া-

---

* অঙ্গো বঙ্গঃ কলিঙ্গশ্চ পুণ্ড্রঃ সুহ্মশ্চ তে সুতাঃ।
তেষাং দেশাঃ সমাখ্যাতাঃ স্বনামকথিতা ভুবি॥ আদি। ১০৪।৫৩॥

মুসলমানেরাও এইরূপ জনশ্রুতির অবতারণা করিয়া নোয়ার বংশধরগণের নামানুসারে অঙ্গ বঙ্গের নাম প্রচলিত হইবার কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। রিয়াজ-উস্-সলাতিনে ও অন্যান্য গ্রন্থে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ছিলেন। এইরূপে প্রাচ্যরাজ্যে আর্য্যপ্রভাব—ক্ষেত্র বিস্তৃত হইবার সূচনা হইতেই, তদ্দেশে একটি অভিনব সমাজের উৎপত্তি হয়। তাহা আর্য্যসমাজ হইতে উৎপন্ন বলিয়া আর্য্যত্বাভিমানী;—আর্য্যসমাজ কর্ত্তৃক পদবিচ্যুত বলিয়া ব্রাত্যাপবাদগ্রস্ত!

সংস্কৃত সাহিত্যে যে ভাবে এই সকল নাম উল্লিখিত আছে, তাহাতে বোধ হয়—প্রথমে এই সকল নামে জনপদ বুঝাইত না। ক্রমে তাহা জনপদবাচকরূপেও ব্যবহৃত হইয়াছে। তখন এই সকল জনপদে আবার আর্য্যাচার প্রচলিত করিয়া তাহাকে সর্ব্বতোভাবে আর্য্যপ্রভাবক্ষেত্রের অধীন করিয়া লইবার চেষ্টারও ত্রুটি হয় নাই।

অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ সুহ্ম পুণ্ড্র কামরূপ—প্রাচ্যদেশের অন্তর্গত। এই সকল জনপদের মধ্যে অঙ্গ বঙ্গ পুণ্ড্র নাম সমধিক পুরাতন বলিয়া প্রতিভাত হয়;—তাহা বৈদিক সাহিত্যে উল্লিখিত হইয়া, প্রাচীনত্বের পরিচয় দান করিতেছে। এই সকল জনপদের অধিকাংশ স্থান কালক্রমে গৌড়ীয়সাম্রাজ্য বলিয়া বিশ্ববিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। তজ্জন্য এই সকল জনপদের অধিবাসিগণের পুরাতন নাম বিলুপ্ত এবং সকলেরই "গৌড়ীয়" নামক সাধারণ নাম প্রচলিত হইয়া থাকিতে পারে।

প্রাচ্যরাজ্য।

যে সকল পৃথক্ পৃথক্ প্রাচ্য জনপদ উত্তরকালে এক অখণ্ড শাসনতন্ত্রের বশীভূত হইয়া, "গৌড়ীয় সাম্রাজ্য" নামে ইতিহাসে সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল, তন্মধ্যে একটি জনপদ অতি পুরাকাল হইতে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। তাহার নাম পুণ্ড্র। একদা তাহা পুণ্ড্রদিগের অধিকারভুক্ত ছিল,—এখনও মালদহ প্রদেশে তাহাদিগের সমাজ বর্ত্তমান আছে। তাহারা বহুকাল রাজ্য হারাইয়া, কৃষকজাতিতে পরিণত হইয়াছে! যাহারা দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া, আর্য্যপ্রভাবক্ষেত্র সুবিস্তৃত করিতে আসিয়া, ক্রিয়াকলাপে ক্রমে ক্রমে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া, প্রাচ্যরাজ্যে অগৌরবে কালযাপন করিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহারাই যে বর্ত্তমান পুণ্ড্রসমাজের বীজ পুরুষ, পুণ্ড্রগণ এখনও সে কথা বিস্মৃত হইতে পারে নাই। তাহারা এখনও বলিয়া থাকে—এ দেশ একদিন তাহাদিগেরই অধিকার ভুক্ত ছিল। এখন কেহ কেহ বিদ্যাশিক্ষা করিয়া উন্নতিলাভের আয়োজন করিতেছে। মহাভারতের রচনাকালে তাহাদিগের রাজ্য পুণ্ড্র, পুণ্ড্রক, পৌণ্ড্র, পৌণ্ড্রক, এবং পৌণ্ড্রিক নামে অভিহিত হইত। তন্মধ্যে পুণ্ড্র নামই সমধিক পুরাতন বলিয়া বোধ হয়। পুণ্ড্রদেশের পুণ্ড্রসমাজের ন্যায় অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ বা সুহ্মদেশে এখনকার দিনে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ বা সুহ্মনামক কোন সমাজ বর্ত্তমান থাকিবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

পুণ্ড।

পুণ্ড্রশব্দ প্রথমে জাতিবাচক থাকিয়া, পরে জনপদ বাচকরূপে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ করিলেও, সময়ে সময়ে জাতিবাচকরূপেও ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে, এবং সেরূপ ব্যবহার এখনও একেবারে বিলুপ্ত হইতে পারে নাই।

জাতিবাচক।

মনুসংহিতার ভাষ্যকার তৎ-

প্রতি লক্ষ্য করিয়া গিয়াছেন।* রামায়ণের রচনাকালে পুণ্ড্র শব্দই প্রচলিত ছিল। তৎকালেও পুণ্ড্রদেশ কোষকারভূমি বলিয়া পরিচিত থাকিবার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। † পুণ্ড্রগণ অদ্যাপি রেশম কীটপালনের এবং রেশমসূত্র নিষ্কাসনের অশিক্ষিত পটুত্বের জন্য চিরবিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। এই সকল কারণে, বর্ত্তমান পুণ্ড্রসমাজকে পুরাতন পুণ্ড্র নামক ব্রাত্যক্ষত্রিয় সমাজ বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। পুণ্ড্রদিগের বর্ত্তমান দুর্দ্দশাও একদিনে সংঘঠিত হয় নাই;—তাহাও "শনৈঃ"—ক্রমে ক্রমে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া, তাহারা অগৌরবে কালযাপন করিতেছে। তাহাদিগের সহিত দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া, অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ ও সুহ্মনামক যে সকল ব্রাত্যসমাজ অধঃপতিত হইয়াছিল, তাহারা কোথায়?

ভগবান্ পতঞ্জলির পাণিনীয় ব্যাকরণ-মহাভাষ্যে পুণ্ড্র শব্দই উল্লিখিত আছে। তাঁহার সময়ে অঙ্গ বঙ্গ সুহ্ম পুণ্ড্র প্রভৃতি শব্দ দেশবাচক বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকিবে। অন্ততঃ মহাভাষ্যে তাহা সেই ভাবেই উল্লিখিত রহিয়াছে।" ‡ মহাভারতের রচনাকালে পুণ্ড্র শব্দ নানা ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। ছন্দের অনুরোধেই হউক আর প্রচলিত ব্যবহারের প্রভাবেই হউক, মহাভারতে পুণ্ড্র, পুণ্ড্রক, পৌণ্ড্র পৌণ্ড্রক—এমন কি একস্থলে পৌণ্ড্রিক পর্য্যন্ত—তুল্যার্থ বোধক জনপদবাচকরূপে উল্লিখিত।¶

জনপদবাচক।

পুণ্ড্ররাজ্য সকল সময়ে সমান আয়তন অধিকার করিত বলিয়া বোধ হয় না। আয়তন কখনও সংকীর্ণ হইয়া পড়িত,—কখন্ বা বহুদূর পর্য্যন্ত ব্যাপ্তিলাভ করিত। অতিপুরাকাল হইতেই এইরূপ সংকোচ-সম্প্রসারণ প্রচলিত হইয়া থাকিবে। উত্তরে কিরাতরাজ্য, দক্ষিণপূর্ব্বে বঙ্গরাজ্য, দক্ষিণ পশ্চিমে সুহ্মরাজ্য, এবং পশ্চিমে অঙ্গরাজ্য,—এই চতুঃসীমা এক সময়ে পুণ্ড্ররাজ্যের চতুঃসীমা বলিয়া পরিচিত থাকিবার আভাস মহাভারতীয় সভাপর্ব্বোক্ত ভীমসেনের দিগ্বি

চতুঃসীমা।

* মেধাতিথি লিখিয়া গিয়াছেন:—"পুণ্ড্রকাদয়ঃ শব্দাঃ পরমার্থতো জনপদশব্দাঃ * * * যদি বা পুণ্ড্রাদয়ঃ শব্দাঃ কথঞ্চিদ্দেশসম্বন্ধেন বিনা দৃষ্টাস্তে, তদৈতজ্জাতীয়া বেদিতব্যাঃ।" ইহাতেই বুঝিতে পারা যায়,—উত্তরকালে পুণ্ড্রকাদি শব্দ প্রধানতঃ জনপদবাচকরূপেই ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু ঐ সকল শব্দ যে এক সময়ে জাতিবাচক ছিল, পরে জনপদবাচকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার স্মৃতি সংস্কৃত সাহিত্য হইতে কখনও একেবারে বিলুপ্ত হইতে পারে নাই। ভাষ্যকারের এই ব্যাখ্যায় ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তই সমর্থিত হইতেছে।

† মাগধাংশ্চ মহাগ্রামান্ পুণ্ড্রাং স্বঙ্গাং স্তথৈবচ।
ভূমিঞ্চ কোষকারাণাং ভূমিঞ্চ রজতাকরাম্॥ কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড। ৪০।২৩॥

বঙ্গবাসী-সংস্করণের রামানুজ টীকা সমন্বিত বৃহৎ সংস্করণের সুবৃহৎ রামায়ণে ২২ সংখ্যক শ্লোক রূপে মুদ্রিত, এবং তাহাতে কিঞ্চিৎ পাঠান্তরও বর্ত্তমান তৎ যথা,

মাগধাংশ্চ মহাগ্রামন্ পুণ্ড্রান্ বঙ্গাংস্তথৈবচ।
পত্তনং কোষকারাণাং ভূমিঞ্চ রজতাকরাম্॥

‡ অঙ্গানাং বিষয়োঽঙ্গাঃ। বঙ্গাঃ সুহ্মাঃ। পুণ্ড্রাঃ॥ ৪।২।৫২॥

¶ আদি সভা এবং ভীষ্ম পর্ব্বে পুণ্ড্র নাম,—আদি, বন, দ্রোণ. অনুশাসন পর্ব্বে পৌণ্ড্র নাম,—সভাপর্ব্বে পুণ্ড্রক নাম,—আদি সভা পর্ব্বে পৌণ্ড্রক নাম,—এবং সভাপর্ব্বের এক স্থলে পৌণ্ড্রিক নামও দেখিতে পাওয়া যায়।

জয় বর্ণনায় প্রাপ্ত হওয়া যায়।* ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রথমে সমাজ, তাহার পরে সাম্রাজ্য;—তজ্জন্যই তাহাতে ভৌগলিক বিবরণের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহা অতি পুরাকালে স্বনামখ্যাত সমাজের অধিকারভুক্ত ছিল, তাহাই কালক্রমে বিবিধ সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত হইয়া, সর্ব্বত্র শাস্ত্র-শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছিল। প্রাচ্যরাজ্যেও যতদিন ভিন্ন ভিন্ন সমাজ ভিন্ন ভিন্ন শাসনতন্ত্রের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার চেষ্টা করিয়াছে, ততদিন অঙ্গবঙ্গাদি সমাজের পৃথক্ পৃথক্ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। তাহার পর যখন সেই সকল খণ্ড সমাজ পুণ্ড্র সমাজের সহিত একত্রে এক অখণ্ড শাসনতন্ত্রের অধীনে আসিয়া, গৌড়ীয় সাম্রাজ্যরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছে, তখন হইতে সমস্ত প্রাদেশিক পার্থক্য বিলুপ্ত হইবার কারণ উপস্থিত হইয়াছে।†

সাম্রাজ্যবিক্রম।

প্রাচ্যরাজ্যের এই সকল আর্য্যবিজয়-ক্ষেত্র পুরাকালে বাহুবলে এবং সংগ্রাম কৌশলে পরাক্রান্ত বলিয়া পরিচিত ছিল। যাঁহারা পুরাতন আর্য্যনিবাস ছাড়িয়া দূর-দেশে উপনিবেশ সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, বাহুবল ভিন্ন তাঁহাদিগের অন্য সম্বল অধিক ছিল না। ধীরে ধীরে রাজ্যবিস্তার করিয়া, আত্ম রক্ষার জন্য—অধিকার রক্ষার জন্য—তাঁহাদিগকে নিয়ত সংগ্রাম কৌশলের উদ্ভাবনা করিতে হইত। তৎকালে এ দেশের নদনদী বিলক্ষণ প্রবল ছিল, অনেক স্থান সমুদ্র গর্ভে নিহিত ছিল, এক পত্তন হইতে অন্য পত্তন বিচ্ছিন্ন ভাবে দূরে দূরে অবস্থিত ছিল। এই সকল অনিবার্য্য কারণেই, পৃথক্ পৃথক্ খণ্ডরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিতে পারে।

পূর্ব্বকথা।

ভীমসেনের দিগ্বিজয় কাহিনীতে এই সকল খণ্ডরাজ্যের মধ্যে দুইটি রাজ্য প্রবল পরাক্রমে ভারত বিখ্যাত থাকিবার উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাদিগের নাম পুণ্ড্র এবং কৌশিকীকচ্ছ। তন্মধ্যে পুণ্ড্ররাজ্য বাসুদেব নামক নরপতির অধীন ছিল। পুণ্ড্র-রাজ এবং কচ্ছরাজ উভয়েই "বলভৃতৌ"—সেনাবল রক্ষিত; উভয়েই "তীব্র পরাক্রমৌ"

* ভীমসেনের দিগ্বিজয় বর্ণনায় পুণ্ড্র, কৌশিকীকচ্ছ, বঙ্গ, তাম্রলিপ্ত এবং কর্ব্বট রাজ্যের উল্লেখ আছে। কৌশিকীকচ্ছ মিথিলার একাংশ মাত্র।

† গৌড়ীয় সাম্রাজ্য পঞ্চভাগে বিভক্ত থাকায়, প্রত্যেক ভাগই গৌড় নামে কথিত হইয়া "পঞ্চগৌড়" নামক প্রবচন প্রচলিত করিয়া থাকিতে পারে। উত্তরকালে "পঞ্চগৌড়" নামক যে সকল রাজ্যের নাম উল্লিখিত হইত, তাহার অনেক স্থানই আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্গত। তাহা প্রামাণিক হইলে, আর্য্যাবর্ত্তের অধিকাংশ স্থানকেই গৌড় বলিয়া অভিহিত করিতে হয়। তাহা কতদূর সঙ্গত বা প্রামাণিক, তাহার আলোচনা আবশ্যক। সে আলোচনার সূত্রপাত হয় নাই। কেবল বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির সুবিজ্ঞ সদস্য শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় সম্প্রতি তাহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া লিখিয়াছেন,—In some modern verses the Northern Brahmans are called "Pancha Gaudiya" i.e, Kanyakubja, Saraswata, Gauda, Mithila, Utkala; Gauda thus meaning nearly the whole of North India, a meaning the basis of which I have not yet been able to trace.—J. A. S. B. New Series vol. IV No 5. p. 280.

—প্রবল প্রতাপশালী বলিয়া উল্লিখিত। তাঁহারা উভয়ে প্রাচ্যরাজ্যের দ্বাররক্ষকের ন্যায় বর্ত্তমান ছিলেন। আর্য্যাবর্ত্ত হইতে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া, ভীমসেনকে প্রথমে এই নরপতিদ্বয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। তাহার পর বঙ্গরাজ,—তাহার পর সমুদ্রসেন—তাহার পর চন্দ্রসেন,—এবং তাহার পর তাম্রলিপ্তরাজ ও কর্ব্বটরাজ পরাভূত হইবার কথা লিখিত আছে।*

প্রাচ্যভারতের এই কয়েকটি বিভাগেই আর্য্যপ্রভাবক্ষেত্র সীমাবদ্ধ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। কালক্রমে আরও অনেক প্রাচ্যজনপদে অর্য্যপ্রতাপ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

বাণিজ্যবিস্তার।

তন্মধ্যে প্রাগ্জ্যোতিষপুর বিশেষ ভাবে উল্লিখিত হইবার যোগ্য। তাহারই নামান্তর কামরূপ। এই রাজ্য পুণ্ড্রাজ্যের পূর্ব্বসীমায় অবস্থিত ছিল। প্রাচ্যভারতে অধিকার বিস্তার করিয়া, আর্য্যগণ সাগরতীরে বাণিজ্যবন্দর প্রতিষ্ঠিত করিবার পর, সমুদ্রপথে নানা দিগ্দেশে বাণিজ্য প্রতাপ বিস্তৃত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

কোন্ পুরাকালে আর্য্যসমুদ্রযাত্রার সূত্রপাত হয়, তাহার তথ্যনির্ণয় করা অসম্ভব। বৈদিক সাহিত্যেও তাহার উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই প্রভাব বাণিজ্যের সঙ্গে জ্ঞান-

সমুদ্রযাত্রা।

বিস্তারে প্রবৃত্ত হইয়া, ভারতবর্ষের বাহিরে এক বৃহত্তর ভারতবর্ষ রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। এখনও তাহার কত কীর্ত্তিচিহ্ন নানা স্থানে পড়িয়া রহিয়াছে। ইহার সহিত প্রাচ্যভারতের সকল জনপদেরই কিছু না কিছু স্বার্থ-সংশ্রব বর্ত্তমান ছিল। তজ্জন্য প্রাচ্যভারতের সকল জনপদেই নৌবিদ্যার এবং নৌগঠন কৌশলের অভ্যুদয় সাধিত হইয়াছিল। সাহসী সুচতুর নৌচালকগণ পোতারোহণে দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে গমনাগমন করিয়া বাণিজ্যপ্রধান প্রাচ্যভারতকে ধনরত্নে সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিয়াছিল। সমুদ্রপথে বাণিজ্যব্যাপারে শক্তি সঞ্চয় করিয়া সকলেই আপন আপন অধিকারে সমুদ্রতীরে পত্তন সংস্থাপনের আয়োজন করিয়াছিল। কামলঙ্কা, ত্রিকালিঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, সপ্তগ্রাম, সুবর্ণগ্রাম তাহারই সাক্ষ্যদান করিয়া থাকে। এই সকল বাণিজ্য বন্দরে নানা দেশের বণিক্ সম্প্রদায় সমবেত হইয়া, নানা দেশের ধনরত্ন পুঞ্জীকৃত করিতেন,—তাহাতে প্রাচ্যভারতের সৌভাগ্যলক্ষ্মী উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত।

রামায়ণের রচনাকালে এ বিষয়ের যে সকল সমাচার আর্য্যসমাজে সুবিদিত ছিল,

সমুদ্রতীর।

সুগ্রীব কর্ত্তৃক সীতান্বেষণে বানরসেনা প্রেরণ প্রসঙ্গে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে তাহার উল্লেখ

---

* ততঃ পুণ্ড্রাধিপং বীরং বাসুদেবং মহাবলং।
কৌশিকীকচ্ছনিলয়ং রাজানঞ্চ মহৌজসম্।
উভৌ বলভৃতৌ বীরাবুভৌ তীব্রপরাক্রমৌ।
নির্জ্জিত্যাজৌ মহারাজ বঙ্গরাজমুপাদ্রবৎ।
সমুদ্রসেনং নির্জ্জিত্য চন্দ্রসেনঞ্চ পার্থিবং।
তাম্রলিপ্তঞ্চ রাজানং কর্ব্বটাধিপতিং তথা।

দেখিতে পাওয়া যায়। * তাহার সকল কথা —সকল ভৌগলিক বিবরণ—সম্পূর্ণ সত্য না হইতে পারে, কিন্তু তাহা যে সর্ব্বৈব কপোল-কল্পিত, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত। ইউরোপীয়গণ, যখন ইউরোপের বাহিরে নানা নবরাজ্যের সন্ধান লাভ করেন, তখন তাঁহাদিগের সাহিত্যেও কত অলৌকিক বর্ণনা স্থান লাভ করিয়াছিল,—তথাপি তাহার মূলে কিছু না কিছু সত্যসংশ্রব বর্ত্তমান ছিল। রামায়ণের বর্ণনায় প্রাচ্যভারত হইতে "সমুদ্রমবগাঢ়ান্"—সমুদ্রান্তর্গত—পত্তনসমূহের উল্লেখ আরব্ধ হইয়াছে। তৎপ্রসঙ্গে নানা দ্বীপোপদ্বীপের এবং "সপ্তদ্বীপোপশোভিত" যবদ্বীপেরও উল্লেখ আছে। † মহাভারতেও "সাগরবাসিনঃ" বলিয়া সমুদ্রতীরবর্ত্তী জনপদনিচয়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

এই সকল কারণে, প্রাচ্যভারতের আর্য্য-সাম্রাজ্য কেবল স্থল সাম্রাজ্য বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে না;—তাহা জলেস্থলে সমান প্রতাপে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার জন্যই নদনদীবক্ষে, সমুদ্রতীরবর্ত্তী বাণিজ্য-বন্দরে, এবং সুদূর সমুদ্রে নৌবিদ্যা। পথের সকল স্থানে প্রাচ্য-ভারতের অগণ্য অর্ণবযান দেখিতে পাওয়া যাইত। তাহা যে কেবল বাণিজ্যভাণ্ডার বহন করিয়াই গমনাগমন করিত, তাহা নহে। প্রয়োজন উপস্থিত হইবামাত্র এই সকল অর্ণবযান কখন আক্রমণে, কখন বা আত্মরক্ষায়, জলযুদ্ধের অসামান্য কৌশল প্রদর্শনে বিশ্ববিখ্যাত গৌরব লাভ করিত। ‡ যাহারা নক্ষত্রমাত্র অবলোকন করিয়া নৈসর্গিক বায়ুপ্রবাহের উপর নির্ভর করিয়া, নৌবিদ্যাপ্রভাবে মহাসমুদ্রে বিচরণ করিয়া প্রাচ্যভারতের প্রভাব বিস্তার করিত,—তাহাদিগের সাহস, তাহাদিগের অকুতোভয়তা, তাহাদিগের অধ্যবসায়, তাহাদিগের নৌচালন কৌশল, কাহার না বিস্ময় উৎপাদিত করিবে?

এইরূপে প্রাচ্যভারতের আর্য্যপ্রতাপ জলে স্থলে ব্যাপ্ত হইবার সময়ে, করতোয়া একটি মহানদী বলিয়া পরিচিত ছিল। তাহাই পুণ্ড্রারাজ্যের পূর্ব্বসীমা বলিয়া

---

* সমুদ্রমবগাঢ়াংশ্চ পর্ব্বতান্ পত্তনানি চ
মন্দরস্য চ যে কোটিং সংশ্রিতাঃ কেচিদালয়াঃ। কিং। ৪০। ২৫॥

† যত্নবন্তো যবদ্বীপং সপ্তরাজ্যোপশোভিতং।
সুবর্ণরূপকদ্বীপং সুবর্ণকরমণ্ডিতম্। কিং। ৪০। ৩০॥

রামায়ণের রচনাকালে সমুদ্র যাত্রা যে সর্ব্বত্র সুপরিচিত ছিল, তাহার নানা নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক স্থলে তাহার একটি উপমা বিশেষ ভাবে উল্লিখিত হইবার যোগ্য। যথা,—
স তু বৃক্ষেণ নির্ভগ্নঃ শালতাড়নবিহ্বলঃ।
গুরুভারভরাক্রান্তা নৌঃ সমার্ণেব সাগরে। কিং। ১৬। ২৪॥

‡ সিংহল দেশের পুরাতন ইতিহাসে রাঙ্গামাটীর নিকটে জলযুদ্ধ সংঘটিত হইবার আখ্যায়িকা আছে। বাঙ্গালীদিগের জলযুদ্ধ নৈপুণ্যের কথা কালিদাসের রঘুবংশে উল্লিখিত হইয়া সকলের নিকটেই সুপরিচিত হইয়া রহিয়াছে। পাঠান শাসন সময়েও নানা জলযুদ্ধের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। মোগলেরাও জলযুদ্ধের জন্য রণতরণী রক্ষা করিতেন। তাহার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য "জায়গীর নওয়ারা" নামে জায়গীর প্রচলিত ছিল।

উল্লিখিত। প্রাকৃতিক সংস্থানও তাহার পক্ষ সমর্থন করে।

করতোয়া। করতোয়ার পুরাতন নাম "সদানীরা"। সেই নামের একটি নদী শতপথ ব্রাহ্মণে উল্লিখিত আছে। অমর কোষেও "সদানীরা" করতোয়ার প্রতিশব্দ রূপেই উল্লিখিত। অতি পুরাকাল হইতেই করতোয়া এইরূপে ভারতবিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু মহাভারতীয় ভীষ্মপর্ব্বে করতোয়া এবং সদানীরা পৃথক্ পৃথক্ উল্লিখিত থাকায়, কেহ কেহ অনুমান করেন —মহাভারতোক্ত সদানীরা হয় ত শতপথ-ব্রাহ্মণোক্ত সদানীরা—তাহা করতোয়া নহে,—অন্য কোনও পৃথক্ নদী। * করতোয়া যে এক সময়ে সবিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল, "করতোয়া মাহাত্ম্য" নামক গ্রন্থই তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ। তাহাতে করতোয়া পৌণ্ড্রগণের নিত্য প্লাবনকারিণী বলিয়া মাহাত্ম্যশালিনী,—এইরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। †

বৌদ্ধবিজয় যুগে পুণ্ড্ররাজ্য "পৌণ্ড্রবর্দ্ধন" নামে কথিত হইতে আরম্ভ করে। অশোকাবদান নামক বৌদ্ধগ্রন্থে, এবং জৈনদিগের স্থবিরনামাবলীতে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ‡ এই নাম কালক্রমে বিশ্ববিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। মহাচীন হইতে যে সকল বৌদ্ধশ্রমণ ভারতবর্ষের বৌদ্ধতীর্থ দর্শন করিবার আশায় ভারতভ্রমণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা কেহ কেহ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্যেও উপনীত হইবার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৎকালে

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন। পৌণ্ড্ররাজ্য "পৌণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তি" নামেও কথিত হইত। সেকালের সকল সাম্রাজ্যই ভুক্তি, বিষয়, মণ্ডল এবং গ্রাম নামক বিবিধ বিভাগে বিভক্ত ছিল। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের একটি ভুক্তি বা প্রদেশ বলিয়া পরিচিত ছিল। রাজতরঙ্গিণীতে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৎকালে গৌড়রাজ্য কতদূর ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছিল, তাহার রাজধানীই বা কোথায় ছিল, তাহার সন্ধান লাভের উপায় নাই।

এক সময়ে গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্গত কর্ণসুবর্ণ নামক একটি রাজ্যের এবং রাজধানীর নাম সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার অধীশ্বর গৌড়েশ্বর নামেই অভিহিত হইতেন। কর্ণসুবর্ণাধিপতি রাজাধিরাজ শশাঙ্কের নাম বৌদ্ধসাহিত্যে

কর্ণসুবর্ণ। চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। তিনি বৌদ্ধদিগের সুপবিত্র

---

* শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই সংশয়ের অবতারণা করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—"করতোয়া কি সরতোয়ার অপভ্রংশ নহে?" করতোয়া করোদ্ভবা বলিয়া পৌরাণিকী বার্ত্তা প্রচলিত আছে। তাহা সরতোয়ার অপভ্রংশ হইবার সম্ভাবনা অল্প।

† "পৌণ্ড্রান্ প্লাবয়সে নিত্যং।" ইহা স্মার্ত্ত শিরোমণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক উদ্ধৃত হইয়াছে। সুতরাং "করতোয়া-মাহাত্ম্য" আধুনিক গ্রন্থ হইলেও, নিতান্ত আধুনিক বলিবার উপায় নাই।

‡ জৈনস্থবিরগণের তৃতীয় শাখা "পৌণ্ড্রবর্দ্ধনীয়া" বলিয়া কথিত। সুতরাং এক সময়ে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন-রাজ্যে জৈনদিগেরও প্রাদুর্ভাব ছিল।

বোধিদ্রুম বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে গৌড়ীয়সাম্রাজ্য পশ্চিমে কাশ্মীনগর এবং দক্ষিণে পুরুষোত্তম পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল,—কান্যকুব্জ পর্য্যন্ত আক্রান্ত হইয়াছিল। * শশাঙ্করাজ্য এইরূপে সমগ্র বঙ্গদেশ, উৎকল, মগধ, মিথিলা, কাশী-রাজ্য পর্য্যন্ত অধিকারগত করিয়া, প্রবল প্রতাপে বৌদ্ধবিজয়ের প্রতিরোধ করিতে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। এখনও মগধের পর্ব্বত-গাত্রে তাহার পরিচয় খোদিত হইয়া রহি-য়াছে। † এই বিপুল বিজয় রাজ্যের অধীশ্বর উত্তর বঙ্গে বাণরাজা নামে পরিচিত;—লোকে নানা স্থানে তাঁহার রাজধানীর এবং রাজদুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখাইয়া দিয়া থাকে।

গৌড়ীয়-সাম্রাজ্যে সমর কলহের অভাব ছিল না। যিনি যখন ভারতবর্ষে শক্তি বিস্তারের আয়োজন করিয়াছেন, তাঁহাকেই গৌড়রাজ্য আক্রমণ ও অধিকার করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইয়াছে।

অশোক শাসন। তজ্জন্য কখন অশোক সাম্রাজ্যের এবং কখন গুপ্তসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া, গৌড়ীয় জনপদনিচয় নানা বিপ্লব দর্শন করিয়াছে। তাহার ধারাবাহিক ইতিহাস বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু এখনও কিছু কিছু কীর্ত্তিচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। ‡

সমর কৌশলের ন্যায় জ্ঞান গৌরবেও গৌড়ীয় সাম্রাজ্য ভারতবিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। সংস্কৃত সাহিত্যে পুরাকাল হইতে "গৌড়ীয় রচনা রীতির" যে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা

রচনারীতি। রচনাগৌরবের পরিচয় প্রদান করিতে পারে। ভারতীয় ন্যাটাসাহিত্যে গৌড়ীয় পাত্রগণের "অর্দ্ধ মাগধী ভাষা" ব্যবহার করিবার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। § এই সকল কারণে,

---

* Beals' *Records* Vol. II.

† শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় ইহার উল্লেখ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—A seal cut in the rock at the hill fort of Rhotasgar, District Sahabad, Bengal, bears the inscription "শ্রীমহাসামন্তশশাঙ্কদেবস্য।"

‡ মহাচীন সাম্রাজ্যের বৌদ্ধ ভ্রমণকারী হিয়ঙ্গের গ্রন্থে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনরাজ্যেও অশোকস্তুপ বর্ত্তমান থাকি-বার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। উত্তরবঙ্গে পাহাড়পুর নামক স্থানে এখনও প্রায় দেড়শত ফিট উচ্চ একটী স্তুপের ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান আছে,—তাহা অশোকস্তুপ কিনা, এখনও তাহার যথাযোগ্য আলোচনা হয় নাই, নাটোরের নিকটবর্ত্তী ধানাইদহ নামক পল্লীতে পুষ্করিণী-খনন কালে একখানি পুরাতন তাম্রশাসনের ছিন্নাংশ আবিষ্কৃত হইয়া আমার হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। তাহা "গুপ্তরাজ্য সংবৎসরে" সম্পাদিত দানপত্র। ঐ তাম্র-শাসনের পাঠোদ্ধার করিয়া প্রবন্ধ লিখিবার জন্য তাহা আমার অনুমতি লইয়া শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাই বঙ্গদেশে আবিষ্কৃত সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন তাম্র শাসন।

§ ভরত নাট্যশাস্ত্রে এবং বিবিধ অলংকার গ্রন্থে ইহার প্রচুর প্রমাণ উল্লিখিত হইয়া সকলের নিকটেই সুপরিচিত রহিয়াছে বলিয়া তাহা উদ্ধৃত করা হইল না।

পুরাকালের গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের কথা নানা গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। *

কাশ্মীরাধিপতি জয়াপীড় ছদ্মবেশে পৌণ্ড্র-বর্দ্ধনে উপনীত হইবার এক আখ্যায়িকা রাজ-তরঙ্গিণীতে উল্লিখিত আছে। তিনি পৌণ্ড্র-বর্দ্ধনাধিপতি জয়ন্তের কন্যা কল্যাণদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়া, শ্বশুরকে পঞ্চগৌড়ের অধীশ্বর করিয়া দিয়াছিলেন। এই

জয়ন্ত।

আখ্যায়িকার মূলেও গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের প্রবল প্রতাপের জনশ্রুতি সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। পঞ্চগৌড়েশ্বর জয়ন্তের বিজয়রাজ্য কতদূর ব্যাপ্তিলাভ করিয়াছিল, তাহার বিশেষ কোনও পরিচয় প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই। তাঁহার শাসন সময়ে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্য যে ধনরত্নে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, রাজতরঙ্গিনীতে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৎকালে জ্ঞান-গৌরবেও পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্য জয়াপীড়ের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল। †

জয়াপীড়ের আবির্ভাবের পূর্ব্বে হইতেই কাশ্মীররাজ্যে গৌড়ীয় প্রতাপের পরিচয় ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার কথা রাজতরঙ্গিনীতে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। রাজতরঙ্গিনী এতদিন কবি কাহিনী বলিয়াই পরিচিত ছিল, সম্প্রতি অধ্যাপক ষ্টীন প্রমাণ পরম্পরা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন রাজতরঙ্গিনীর শেষ তরঙ্গ চতুষ্টয়ে যথার্থ ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়! চতুর্থ তরঙ্গে লিখিত আছে,—গৌড়াধিপতি তীর্থদর্শনার্থ কাশ্মীরে গমন করিলে, কাশ্মীরাধিপতি মুক্তাপীড় ললিতাদিত্যের আদেশে গৌড়েশ্বর নিহত হন। ইহাতে উত্যক্ত হইয়া গৌড়ীয় সেনাদল ত্রিগ্রামী নামক তীর্থস্থান অবরোধ করিয়া, রামস্বামীর মন্দির চূর্ণ করিয়া, একে একে আত্মবিসর্জ্জন করে। কবি কহলন এই স্বামি ভক্তির কথা উজ্জ্বল ভাষায় বর্ণনা করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন—"অদ্যাপি মন্দির শূন্য রহিয়াছে, কিন্তু ভূমণ্ডল গৌড়ীয় শৌর্য্য-গৌরবে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে!" ‡

গৌড়ীয় বিজয়রাজ্যের রাজধানী কোথায় ছিল? তাহা এখন নানা তর্কবিতর্কে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। মুসলমানাধিকার প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের নাম সুপরিচিত ছিল,—পালবংশীয়

লক্ষ্মণাবতী।

এবং সেনবংশীয় নরপালগণের বিবিধ তাম্রশাসনে তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহার পর হইতে,—রাজ্য এবং রাজধানী লক্ষ্মণাবতী

* গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের কথা কত গ্রন্থে কি ভাবে উল্লিখিত আছে, তাহা একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধের বিষয়।—এ স্থলে তাহার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ প্রীতিপ্রদ হইবে না।

† নবপর্য্যায় বঙ্গদর্শনের দ্বিতীয় বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় মল্লিখিত "পঞ্চ গৌড়েশ্বর জয়ন্ত" শীর্ষক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

‡ অদ্যাপি দৃশ্যতে শূন্যং রামস্বামি পুরাস্পদং।
ব্রহ্মাণ্ডং গৌড়বীরাণাং সনাথং যশসা পুনঃ।

নব পর্য্যায় বঙ্গদর্শনের দ্বিতীয় বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় মল্লিখিত "গৌড়ের পূর্ব্বকাহিনী" শীর্ষক প্রবন্ধে ইহার বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

উল্লিখিত হইয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের নাম এবং রাজধানীর কথা বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে। এখন কেহ মহাস্থানে, কেহ বর্দ্ধনকোটে, কেহ পাণ্ডুয়া নগরে, কেহ বা পাবনা প্রদেশে রাজধানীর স্থান নির্দ্দেশের চেষ্টা করিতেছেন। মহাচীন সাম্রাজ্যের বৌদ্ধ শ্রমণগণ যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাই সকল তর্কের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। *

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্য বহুদূর পর্য্যন্ত ব্যাপ্তি লাভ করিবার পর, তাহার রাজধানী নানা সময়ে নানা স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিতে পারে। বৌদ্ধশ্রমণগণ কোন্ রাজধানী দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণীত হইবার সম্ভাবনা জটিলাকার ধারণ করিয়াছে।

বৌদ্ধভ্রমণ।

হিয়ঙ্গথ্ সঙ্গের ভারত-ভ্রমণকাহিনী এবং জীবনচরিত নামক চীনভাষা নিবদ্ধ দুই খানি গ্রন্থ ফরাসি জর্ম্মন এবং ইংরাজীভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। তাহাতে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, কামরূপ, কর্ণসুবর্ণ, তাম্রলিপ্ত কজঙ্গল এবং চম্পা নামক স্থানের কথা, তাহাদের অবস্থান এবং দূরত্বের বিষয় যে ভাবে উল্লিখিত আছে, তাহাই তর্কবিতর্কের প্রশ্রয়দান করিতেছে।

সেকালের চম্পা একালের ভাগলপুর, —কর্ণসুবর্ণ বহরমপুরের নিকটবর্ত্তী রাঙ্গামাটী—কামরূপ গৌহাটী,—বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরের স্থান নির্ণয়ের চেষ্টা হইতেছে।

পাণ্ডুয়া।

রাজধানী যেখানেই থাকুক, তাহার পুরাকীর্ত্তি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সমস্ত অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে, মহানন্দীতীরেই রাজধানী সংস্থাপিত

---

* গৌড়ীয় বিজয় রাজ্যের রাজধানী যে নানা সময়ে নানাস্থানে অবস্থিত ছিল, প্রসঙ্গক্রমে সংস্কৃত সাহিত্যে তাহার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। খৃষ্টীয় একাদশশতাব্দীর সমসাময়িক মহাকবি মুরারি "অনর্ঘরাঘব" নামক নাটকে লিখিয়া গিয়াছেন—"চম্পা এক সময়ে গৌড়ীয়গণের রাজধানী ছিল।"

† শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অধিবেশনে "চীন পরিব্রাজকদিগের বঙ্গবিচরণ" নামক যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহাতে স্থান নির্ণয়ের জন্য নানা গবেষণার পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে। ঘোষজ মহাশয় হিয়ঙ্গ থ্সাঙ্গের নাম লইয়া অনেক আলোচনা করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন,—তাহার নাম "জন্-য়ুয়ন-চয়ঙ্"। ইংরাজেরা কলিকাতাকে ক্যালক্যাটা, বালেশ্বরকে ব্যালাসোর, মেদিনীপুরকে মিড্নাপোর, বর্দ্ধমানকে বর্ডওয়ান লিখিতেন; পুরাতন সাহিত্যের মর্য্যাদা রক্ষার্থ সেই সকল নাম এখনও সেই ভাবেই লিখিত হইয়া আসিতেছে। তাহাতে কাহারও বুঝিবার অসুবিধা ঘটিতেছে না। বঙ্গসাহিত্যের প্রথম বিকাশ সময়ে স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ই প্রথমে চীন পরিব্রাজকের নাম "হিয়ঙ্গ থ্সাঙ্গ" বলিয়া প্রচারিত করেন। তাহা ত্যাগ করিয়া, বঙ্গ-সাহিত্যে নূতন বর্ণবিন্যাসের অবতারণা করিবার প্রয়োজন বা সার্থকতা কি, তাহা বোধগম্য হয় না। এই প্রবন্ধের মধ্যে স্থান নির্ণয়ের জন্য যথাযোগ্য আয়াস স্বীকারের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না; কেবল নানা মুনির নানা মতের নির্ঘণ্ট মাত্রই প্রাপ্ত হওয়া যায়। কজঙ্গল এখন কাঁকজোল পরগণা নামে পরিচিত। কামরূপ ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের মধ্যবর্ত্তী নদীর নাম Kalotu কালোতু ব্রহ্মপুত্র নহে—করতোয়া। ব্রহ্মপুত্র পুরাকালে করতোয়ার পশ্চিম দিয়া প্রবাহিত ছিল। এই সকল বিষয়ের যথাযোগ্য আলোচনায় হস্তক্ষেপ করিলে, ঘোষজ মহাশয়ের প্রবন্ধ তথ্যনির্ণয়ের পথ প্রদর্শন করিতে পারিত।

থাকা সম্ভব বলিয়া বোধ হয়। * তথায় পাণ্ডুয়া নগরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পুরাতন সৌভাগ্যগর্ব্বের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহা এখনও পুণ্ড্রসমাজের কেন্দ্রস্থল বলিয়া পরিচিত। তাহার অনতিদূরেই গৌড়নগর, এখনও ধ্বংসাবশেষ ধারণ করিয়া, পুরাকীর্ত্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে।

এই বিপুল বিজয়রাজ্যের যে অংশ এখনও গৌড় নামে পরিচিত, তাহা মহানন্দার উত্তরতীরে অবস্থিত। মালদহের লোকে পশ্চিম তীরের জনপদকে গৌড় এবং পূর্ব্বতীরের জনপদকে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বলিয়া অভিহিত করিয়া আসিতেছেন। এই সাম্রাজ্যের অন্তর্গত যে স্থান মহানন্দার এবং করতোয়ার পশ্চিমে অবস্থিত,তাহার নাম বরেন্দ্র। তাহার সকল স্থানেই পুরাকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার মধ্যে অনুসন্ধান করিলে, এখনও হিন্দুকীর্ত্তির, বৌদ্ধকীর্ত্তির, এবং পাঠানকীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। মহানন্দাতীরেই তাহার সমাবেশ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

পরাজয়।

(১)

ধূলি কঙ্করযুক্ত প্রথম পথটা অতিক্রম করিয়া, সংসারের বিচিত্রপত্রপুষ্পখচিত তোরণদ্বারে যেমনি প্রবেশ করিবে, ঠিক এমনি সময়ে হেমেন্দ্রনাথের জীবনসঙ্গিনী, প্রাণাধিকা পত্নী লীলা একটি মৃত সন্তান প্রসব করিয়া, ইহলোক পরিত্যাগ করিল।

এই দারুণ শোকের বেগ হেমেন্দ্রনাথ সহ্য করিতে পারিল না; না পারিবারই কথা! সে এক মহা দুর্দ্দিনে লীলা হেমেন্দ্রনাথের জীবনপথে সঙ্গিনী হইয়াছিল। যখন একমাসের মধ্যে দুর্দ্দান্ত প্লেগের আক্রমণে হেমেন্দ্রের পিতামাতা ইহজীবন পরিত্যাগ করেন, তখন লীলা নববধূ মাত্র! সেই সময় তাহার জীর্ণ চিত্তসংস্কারে লীলা পিত্রালয়ের স্নেহ আদর ও আপনার কতখানি সুখ কতখানি সাধ বিসর্জ্জন দিয়াছিল তাহা শুধু হেমেন্দ্রনাথই জানে! লীলা যে তাহার সংসারে একমাত্র শান্তি, একমাত্র আনন্দ, তাহার আশা ভরসা, এক কথায় সর্ব্বস্ব ছিল। সে-ই লীলা আজ নাই! সমস্ত সংসার হেমেন্দ্রনাথের চক্ষে একটা ধূমাকার অসার পদার্থ বোধ হইতে লাগিল!

একমাস হইল হেমেন্দ্র, বি, এল, পাশ করিয়াছে, আহা সেদিনের সে আনন্দ ভাষায় প্রকাশ হয় না! লীলাকে সুখী দেখিয়া

---

* বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির সুবিজ্ঞ সদস্য শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় সম্প্রতি উক্ত সভার পত্রিকায় লিখিয়াছেন,—With this direction some place higher up on the **Mahananda** would agree.—J. A. S. B. New Series vol. IV No 5- p. 273.

হেমেন্দ্র আপনার শ্রম সার্থক জ্ঞান করিয়াছিল! তাহার পর কয়দিন ধরিয়া স্বামী-স্ত্রীতে মিলিয়া ভবিষ্যতের কত সুখচিত্র অঙ্কিত করিত; সেই সুরঞ্জিত কল্পনা আজ নিতান্ত মিছার জল্পনায় পরিণত হইয়াছে!

আত্মীয়স্বজন সান্ত্বনা দিলেন,—কেহ বা গদ্‌গদ্‌কণ্ঠে কহিলেন—তোমার দুঃখ কি বাবা, আবার সব হবে!' হেমেন্দ্র কোন কথা কহিল না, নীরবে সব শুনিল! হেমেন্দ্রের অবস্থা ভাল, বয়স অধিক নহে, বিদ্যাও অর্জ্জন করিয়াছে, গৃহে নিকট আত্মীয়ও ছিলেন, সুতরাং ঘটকের আনাগোনা হইল! হেমেন্দ্র ভাবিল, কি পৈশাচিক হৃদয়হীনতা! সেদিন ইহারা যাহাকে অশ্রুজলে বিদায় দিয়াছে, যাহার পবিত্র স্মৃতি এখনো ঘরের চারিধারে বর্ত্তমান—হাতে বোনা কার্পেটের ছবি, আলমারিতে পুতুল, সিঁদুর, মাথার চিরুণি, চুলের ফিতাটি পর্য্যন্ত আজও তেমনি সাজানো, তেমনি অমলিন রহিয়াছে, আর তাহার কথাটা ইহারা ইহারই মধ্যে কিনা এমন নিষ্ঠুর ভাবে ভুলিতে বসিয়াছে!

সেদিন হেমেন্দ্র আপনার কক্ষে বিছানায় পড়িয়া লীলার একখানি ফটো বুকে লইয়া তাহারই কথা ভাবিতেছিল! পার্শ্বে লীলার কালিমাখা চিঠিপত্রগুলি পড়িয়া রহিয়াছে—আহা, ইহাই এখন হেমেন্দ্রনাথের সম্বল। সহসা সে শুনিল বাহিরে ঘটকী তাহার পিতৃব্য-পত্নীকে মৃদুকণ্ঠে কহিতেছে—"তুমি দেখো মা—সে বৌমার চেয়েও সুশ্রী হবে!" হেমেন্দ্রের ইহা সহ্য হইল না। বাহিরে আসিয়া কহিল, "খুড়িমা তোমরা কি আমাকে বাড়ীতে টেঁকতে দিবে না?" "কেন বাবা?" "কেন আবার কি? এরকম জ্বালাতন করলে কিন্তু আমি বাড়ী থেকে চলে যাব! যে সে একটা মাগী এসে এমন করে—" হেমেন্দ্র আর কিছু বলিতে বলিতে পারিল না, তার স্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল! সে তখন বিছানায় পড়িয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিল, "লীলা, লীলা, কেন, কি দোষে তুমি আমাকে ত্যাগ করে গেলে? আমি আজ আশ্রয়হীন, বন্ধুহীন, সহায়হীন! কোথায় তুমি আজ, এসো, কাছে এসো, লক্ষ্মী আমার, সোনা আমার!"

(২)

দিনকতক বিবাহের আলোচনা থামিয়াছিল, আবার ধীরে ধীরে অল্পে অল্পে গল্পে সল্পে সে প্রস্তাব উঠিতে লাগিল। আবার উপরোধ অনুরোধ তার উপর অভিমান,—হেমেন্দ্র অস্থির হইয়া উঠিল, একদিন খুড়িমা হেমেন্দ্রকে বিশেষ করিয়া ধরিয়া নানারূপ বুঝাইয়া সুঝাইয়া কাকুতি মিনতি করিয়া যখন ব্যর্থমনোরথ হইলেন তখন অশ্রুজলে স্নেহমাখা মুখখানি অভিষিক্ত করিয়া বলিলেন "হিমু! আজ যদি দিদি থাক্‌তেন তবে কি তুই তাঁর অনুরোধ এড়াতে পার্‌তিস্। আমি ত তোর মা নই আমার কথা রাখ্‌বি কেন বল্।" এ অমোঘ অস্ত্র, এ মন্ত্রে আজিকার যুদ্ধে হেমেন্দ্রের পরাজয় ঘটিল। সেই মাতৃস্থানীয়া স্নেহময়ীর করুণ কণ্ঠের মর্ম্মভেদী অভিমান-বাক্যে হেমেন্দ্রের দৃঢ়তা ক্ষণেকের জন্য শিথিল হইয়া গেল, সেই দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে হেমেন্দ্র বিবাহে সম্মতি দিল; কিন্তু রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে সে আবার খুড়ীমার নিকট আবদার ধরিয়া

বলিল "আবার পাপ কর আমি আর বিবাহ করিতে পারব না।" তখন আর কে শোনে সে কথা, হেমেন্দ্রের মুখে বিবাহের সম্মতি বাহির হইতে না হইতে সব ঠিকঠাক হইয়াছে; এখন আর ত ফিরিবার উপায় নাই।

শ্রাবণের মেঘ-স্নিগ্ধ কোন এক নিশীথে কলের পুতুলের মত মাথায় টোপর ও গলায় ফুলের মালা দিয়া হেমেন্দ্রনাথ আবার বর সাজিয়া বিবাহ করিয়া আসিল!

আবার সেই বরণ, হুলুধ্বনি, শুভদৃষ্টি আবার সেই বাসর রাত্রি! কিন্তু ফুলের সে গন্ধে আজ কোন মধুরতা ছিল না। বৈদ্যুতিক আলোও তাহার চক্ষে যেন নিষ্প্রভ মনে হইতেছিল! সে যেন কতকটা যন্ত্রচালিতের মত হইয়া পড়িয়াছিল; শুভদৃষ্টির সময় সকলের ব্যগ্র অনুরোধে, পীড়নে, একবার সে নববধূর প্রতি একটা চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিল!

বাসর ঘরে আনন্দ প্রবাহের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে তাহার যখন পূর্ব্ব স্মৃতি জাগিয়া উঠিতেছিল, তখন আপনার হৃদয় যন্ত্রটা কোনমতে চূর্ণ করিবার বিফল বাসনা তাহার মনোমধ্যে বার বার উদয় হইতেছিল!

তাহার মনে পড়িতেছিল, আর এক দিনের কথা! সেও এমনি পরিপূর্ণ আনন্দ মধুর একটি জ্যোৎস্নারাত্রি! সেদিনও এমনি হাসি-আলো-গানের ছড়াছড়ি। কিন্তু আজিকার এ উৎসব-নিশীথের মত তাহা ম্লান ছিল না ত'! হেমেন্দ্র ভাবিল, ঐ তাহার অন্যায়! একজনের প্রতি বিশ্বাসহীনতা করিয়াছে—আবার এ নিরপরাধা বালিকার প্রতি অন্যায় করিবে! অমনি লীলার কাতর চক্ষু দুটি যেন সে দেখিতে পাইল! লীলা কি মনে করিবে?

বাসর ঘরে হেমেন্দ্রের জীর্ণ চিত্তের সংস্কারের জন্য ত্রুটি ছিল না! আমোদে প্রমোদে, গীতে গন্ধে সে কক্ষ অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছিল। তরুণী কণ্ঠে যখন গান গাইতেছিল,

"কত নিশি কেঁদে, পেয়েছি এ চাঁদে,
চাঁদ আজ আর তুই যাস্‌নেরে।"

তখন হেমেন্দ্রের মন গানের দিকে ছিল না। তাহার মনে হইতেছিল, এ সংসার যেন অভিনয়-মঞ্চমাত্র! সেই একদিন শান্ত প্রভাতের বিদায় চিত্র তাহার মনে পড়িল! তাহার ক্রোড়ে শ্রান্ত-শির রাখিয়া লীলা যখন চিরবিদায় গ্রহণ করিল, তখন গৃহে কি একটা হাহাকারের সৃষ্টি হইয়াছিল! সেই বিরাট দুঃখ হাহাকারের অভিনয়ে প্রধান ভূমিকা তাহাকেই গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, আর আজিকার এই উৎসবের বিরাট আনন্দ-হাসির অভিনয়েও প্রধান ভূমিকা তাহারই! হা অদৃষ্ট—এ উভয়ের মধ্যে এত প্রভেদ! হেমেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে রুমালে আপনার নয়নপ্রান্ত মুছিল! তখন বাসরে গান চলিতেছিল

"কেন ধরে রাখা, ওযে যাবে চলে
মিলন-যামিনী গত হলে!"

(৩)

বিবাহের পর রাণী পিত্রালয়ে অধিক দিন থাকিতে পায় নাই! এবার হেমেন্দ্রের

ভগ্নী চারু বধূর মুখে ম্লানিমা লক্ষ্য করিয়া চুপি চুপি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "হ্যাঁ বৌ দিদি তোমাকে দাদা ভালবাসেত?" রাণী উত্তর দিল, "হাঁ!" "আদর করে?" "করে বৈকি!" চারু কিন্তু এ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে নাই। সে আবার বলিল, "তবে তোমার মুখ এত শুকনো কেন ভাই?" "শুকনো আবার কই ঠাকুরঝি! তোমার" যেমন কথা!" "আচ্ছা কাল কি কথা হয়েছিল, বল ত, শুনি!" "না ভাই সে আমাকে বল্‌তে বারণ করে দিয়েছে যে!" বধূর নিকট হইতে কোন কথা বাহির করিতে না পারিলেও চারু এটুকু বুঝিল যে রাণীর সহিত হেমেন্দ্রের সম্পর্কটা তেমন প্রীতি সুমধুর নহে! লীলার সহিত দাদার যখন বিবাহ হয় তখনকার সমস্ত ঘটনা চারুর মনে পড়িতেছিল—তখন উভয়ের মুখ সে কেমন হর্ষোৎফুল্ল দেখিত। লীলা সাধিয়া তাহাকে রজনীর কাহিনী বিবৃত করিত, আর দাদাও কতবার তাহাকে মধ্যস্থ মানিয়া বধূর সহিত প্রণয়-কলহ ভঞ্জন করিত! ক্রীড়া ও কৌতুকের সে কি এক জীবন্ত অভিনয় ছিল। আর এখন কাহারো মুখে সে হাসি নাই। জীবনের যেন এত টুকু স্পন্দন নাই। অথচ রাণীর মত শান্ত মেয়ে বড় একটা দেখা যায় না! রাণীর কথা ভাবিয়া সে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

সে দিন রাত্রে পানের ডিবাটি হাতে লইয়া রাণী যখন শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিল, তখন হেমেন্দ্রনাথ বিছানার উপর পড়িয়া পূর্ব্বকাহিনী ভাবিতেছিল! আকাশে তখন কোথাও একটু মেঘ ছিল না, শান্ত চাঁদের আলোকে চারিধার যেন স্বপ্নময় মনে হইতেছিল, ঝির ঝির করিয়া স্নিগ্ধ বায়ু কক্ষে প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে মশারির ঝালর উড়াইতেছিল, সম্মুখের বারাণ্ডার টবের গাছ হইতে মনোহর পুষ্প-সুরভি ভাসিয়া আসিতেছিল।

হেমেন্দ্রনাথ একদৃষ্টে উন্মুক্ত উদার আকাশের প্রতি চাহিয়াছিল! কয়েকটা নক্ষত্র, প্রস্ফুটিত পুষ্পের মত ইতস্তত: যেন বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে! অদূরে কদম্ব ও চাঁপা গাছের পাতাগুলা মৃদুস্পর্শে কাঁপিতেছিল! হেমেন্দ্র ভাবিতেছিল লীলার কথা! একদিনও সে স্বপ্নে দেখা দেয় নাই! কি নিষ্ঠুর সে! হেমেন্দ্র তাহারই ধ্যানে বিনিদ্র বিভাবরী যাপন করিতেছে, অশান্ত চিত্তে এতটুকু শান্তির প্রত্যাশা করিয়া আকুল হৃদয়ে সে লীলার দর্শন মাগিতেছে, কিন্তু লীলা এক বারও ফিরিয়া চাহিল না! হায় এত প্রেম, এত ভালবাসা, মৃত্যুর পরে কি তার এত টুকু অবশিষ্ট থাকে না, ভগবান! আরো তাহার মনে পড়িতেছিল, লীলার প্রণয়রাগ-রঞ্জিত শত সহস্র চিত্র! সেই একদিন হেমেন্দ্রনাথ থিয়েটারে গিয়াছিল,—অধিক রাত্রে যখন সে গৃহে ফিরিল, তখন দেখে, মেঝের উপর একটা মাদুর বিছাইয়া লীলা তাহাতে শুইয়া হেমেন্দ্রের লিখিত চিঠিগুলি পড়িতেছে! সে ধীরে ধীরে কক্ষে প্রবেশ করাতে লীলা প্রথমটা জানিতে পারে নাই। হেমেন্দ্র কহিল "ঘুমোওনি যে লীলা?" লীলা অমনি শশব্যস্তে উঠিয়া চিঠিগুলা তাড়াতাড়ি আঁচলে জড়াইয়া কোমরে গুঁজিল ও হেমেন্দ্রের জামা চাদর ছড়ি প্রভৃতি যথাস্থানে রাখিয়া

দিল। তাহার পর বাতাস করিতে করিতে কহিল, "কি দেখলে, বল!" তাহাতে হেমেন্দ্র —নিষ্ঠুর হেমেন্দ্র—বলিয়াছিল, "হাঁ,সারারাত থিয়েটারে জেগে এখন আবার তোমাকে তার গল্প বলতে বসি! কাল বলব' এখন!" তাহাতে লীলা আবদার করিয়া বলিয়াছিল, "বল না, লক্ষীটি, এর মধ্যে ঘুমোবে! একটু গল্প করবে না?" হেমেন্দ্র কাতরা বালিকার এই সামান্য কথাটি সেদিন রক্ষা করে নাই! লীলাও ত কই কোন অভিমান করে নাই! সে বেশ প্রসন্নমুখেই শয্যাপ্রান্তে হেমেন্দ্রের বাহু বেষ্টনে আপনাকে ধরা দিয়াছিল ত! তাহার পর আর একদিন হেমেন্দ্র এক বন্ধুর বাড়ীতে বিবাহের নিমন্ত্রণ গিয়া সে রাত্রে ফিরিতে পারে নাই, অতি প্রত্যূষে গৃহে ফিরিয়া দেখে, লীলা মোটেই শয্যায় শয়ন করে নাই, মেঝেতে মাদুরে শয়ন করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, মাথার ও বুকের নীচে হেমেন্দ্রের লিখিত বাঙলা ডায়েরীর খাতা খানি পড়িয়া আছে! লীলার চূর্ণ কুন্তলগুচ্ছ ভোরের সেই স্নিগ্ধমৃদু বাতাসে ঈষৎ উড়িতেছিল! বালিকার এই অদ্ভুত আত্মবিসর্জ্জনে একান্ত মুগ্ধ হেমেন্দ্র তাহার সুন্দর মুখখানিকে চুম্বন করিতেই লীলার ঘুম ভাঙিয়া যায়। সে চমকিয়া বলিল, "কখন এসেছ?" "অনেক ক্ষণ!" "আমাকে ডাকোনি কেন?" "তুমি ঘুমচ্ছিলে; ভাবলুম,—আহা, বেচারী ঘুমুচ্ছে তাই আর ডাকলুম না!" লীলা বস্ত্রাদি সম্বরণ করিয়া উঠিয়া বসিয়া অভিমানে বলিয়াছিল, "যাও, তুমি বড় দুষ্ট, তুমি একবার ডাকলেও না, দুটো কথা কইতে পেলুম না! সকাল হয়ে গেছে এখনি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে"—তখন হাসিতে হাসিতে সে বলিয়াছিল, "নারে পাগলী আমি এই মাত্র এসে জামাজোড়া ছাড়ছি"—বলিয়া আদর করিয়া ম্লান পুষ্পমাল্যটি তাহার শিথিল কবরীতে সংলগ্ন করিয়া দিল! লীলা আবেশবিহ্বল নেত্রে শুধু তাহার পানে চাহিয়াছিল, সে দৃষ্টিটুকু সে কথাগুলি যেন কালিকার ঘটনা! এখনো না ঐ লীলার চুড়ির টুং টাং শব্দটা শোনা যায়! হেমেন্দ্রের চোখ হইতে ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতেছিল।

এমনি সময়ে রাণী কক্ষে প্রবেশ করিল। দ্বাররুদ্ধ করিয়া আরসির টেবিলের উপর পানের ডিবা রাখিয়া শয্যায় হেমেন্দ্রের চরণ-প্রান্তে বসিয়া ধীরে ধীরে তাহার পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। সহসা দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ শুনিয়া রাণী হেমেন্দ্রের শিয়রে আসিল। হেমেন্দ্রের চক্ষে জল দেখিয়া সে একেবারে অঞ্চল দিয়া তাহার চোখ মুছাইতে মুছাইতে বলিল, "কেন—কাঁদছ কেন? বল—বল, লক্ষীটি! বলবে না?" হেমেন্দ্র স্থির দৃষ্টিতে রাণীর পানে চাহিল, দেখিল, রাণীর চোখ ছলছল করিতেছে, সে আপনার বাহু দিয়া রাণীকে বেষ্টন করিয়া গদ্‌গদ্ কণ্ঠে ডাকিল, "রাণী"—

"কেন?" বলিয়া রাণী আর একটু কাছে সরিয়া আসিল। স্বামীর বুকে মাথা রাখিয়া কহিল,—"বল, তোমার মনে কি হচ্ছে বল আমাকে!" হেমেন্দ্র বলিল, "আমি বড় নিষ্ঠুর, না? তোমার মত এমন লক্ষী স্ত্রী যার সে তোমাকে একটুও আদর করে না, ভালবাসেনা! সত্যি আর কারু সঙ্গে

বিয়ে হলে তুমি ঢের সুখী হতে!" "না ও কথা বলো না! আমি সত্যি খুব সুখী হয়েছি! কিন্তু তোমাকে একটুও সুখী করতে পারছি না এই দুঃখ! তুমি দিদির কথা বল আমাকে, আমার বড় ভালো লাগে। আমি দিদির মত হতে চেষ্টা করবো!"

"হুঁ তার কথাই ভাবছিলুম! উঃ তাকে কি ভালোই বাসতুম! মানুষে যতখানি ভালো বাসতে পারে!" রাণী গদ্‌গদ্‌ কণ্ঠে কহিল "আমিও ভালো বাসব!"

হেমেন্দ্র জানালার দিকে চাহিয়া রহিল। পানের ডিবা হইতে পান লইয়া স্বহস্তে হেমেন্দ্রের মুখে পান দিয়া রাণী কহিল, "তুমি দিদির কথা বল আমাকে—"

হেমেন্দ্র কিছুক্ষণ রাণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, পরে কহিল,—"তোমার মুখ অনেকটা তার মুখের মত, তবে তার রঙটা তোমার মত এত ফরসা ছিল না—"

রাণী স্বামীর বুকে মুখ রাখিয়া ধীরে কহিল,—"আমি দিদির মত হবার চেষ্টা করব!" হেমেন্দ্র কহিল, "আহা অভাগিনী সে—"

রাণী কহিল, "না, তাঁকে অভাগিনী বলো না; তাঁর মত কজন হ'তে পারে! তাঁর পায়ের ধূলো পেলে আমি—"

হেমেন্দ্র সাদরে রাণীর মুখ আপনার মুখের উপর টানিয়া চুম্বন করিল, ডাকিল "রাণী—"

রাণী মাথা নাড়িয়া কহিল—"না, রাণী না! তুমি আমাকে দিদির নামে ডেকো। আমাকে সেই মনে কর না কেন!"

(৪)

কিন্তু হেমেন্দ্র কিছুতেই শান্ত হইল না। সে আপনার চিত্তকে যতই সংযত করিতে চেষ্টা করে, তাহার চিত্ত ততই অস্থির হইয়া উঠে!

বন্ধু অমর কহিল, "এ তোমার ভণ্ডামি! রাণীর কথা যা শুনলুম, এমন ত গল্পেও পড়া যায় না! আহা, তোমার জীবনটা একেবারে চুরমার হয়ে গে'ছল, রাণী নিশ্চয় তোমাকে সুখী করবে"

হেমেন্দ্র কহিল—"তা জানি ভাই, রাণীর মত স্ত্রী দেখা যায় না, সে জন্যে আমার আরো দুঃখ হয়। তাকে আমি তেমন ভালবাসতে পারি কই! কেবলি মনে হয় আমি কি পাষণ্ড!"

অমর—"এ তোমার অন্যায়—বিয়ে করেছ যখন—"

হেমেন্দ্র—"সে কথা কি বুঝি না কিন্তু কেবলি তার কথা মনে হয়, তাকে ভুলতে পারি না—"

অমর—"তাকে ভুলবে কি বল? তাকে যদি ভোল তাহলে ত তুমি মানুষ নও! কিন্তু রাণীর কথা ভাবো, এই টুকু মেয়ে তোমার দুঃখ কতখানি বোঝে! তার কথাগুলি কেমন, বল দেখি! বেশ ত একে সে-ই মনে কর না কেন?"

হেমেন্দ্র—"তা চেষ্টা করছি, কিন্তু ঠিক পারি কই!"

হেমেন্দ্র বাড়ীতে বলিয়া কহিয়া দিন কতকের জন্য মুশৌরী বেড়াইতে চলিল।

মুশৌরী হইতে রাণী প্রত্যহ পত্রের আশা করিত কিন্তু তাহার সে আশা মিটিত না!

তাই বলিয়া সে কখনো পত্র লিখিতে এতটুকু অবহেলা করে নাই। এই ১৫ দিন হেমেন্দ্র মুশৌরী গিয়াছে, ইহারই মধ্যে রাণী তাহাকে অন্ততঃ নয়খানি পত্র লিখিয়াছে! বালিকা আদর চাহে না, ভালবাসা চাহেনা—সে চায় হেমেন্দ্রের দুঃখ কিসে দূর হয়! হেমেন্দ্র কিসে সুখী হয়! তাহা হইলে তাহারো সব সাধ মিটে! এ জগতে তাহার আর অন্য কামনা নাই।

হেমেন্দ্র বাড়ীতে চিঠি লেখে—উষাকে লেখে, খুড়িমাকে লেখে, কিন্তু রাণীকে লেখে না। অবশেষে এক দিন সহসা রাণী হেমেন্দ্রের পত্র পাইল। হেমেন্দ্র লিখিয়াছে,—

"প্রিয়তমাসু—

এখানে এসে রোজই প্রায় তোমার এক খানি করে চিঠি পাচ্ছি, কিন্তু উত্তর দেওয়া হয় নি, তার জন্যে কিছু মনে করো না। আমার মনের অবস্থা তুমিত জানই, এখনো সেইরূপ! জগতে কিছুতে আমার শান্তি নেই। তোমাকে বিয়ে করে খুব অন্যায় করেছি! জানি না সে অপরাধের শাস্তি কি! তোমার কোমল হৃদয়ে কত কষ্ট দিচ্ছি কি করবো, নিরুপায়—! আমার হৃদয় বুঝে আমাকে ক্ষমা করো!

আমার জীর্ণ চিত্তকে গড়ে তোলবার জন্য তুমি যে কত চেষ্টা করেছ তা মানুষে পারে না—আমি তোমার সে ঋণ পরিশোধ করতে পারব না! সে অমূল্য প্রেম আমি শুধু মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝেছি! তার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ! সে কৃতজ্ঞতা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না; যাই হোক, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তুমি চির সুখী হও। শারীরিক ভাল আছি! তোমরা ভাল আছ জেনে সুখী হলুম! ইতি

তোমার হতভাগ্য স্বামী

হেমেন্দ্র।

পত্রখানি বার বার পড়িয়া মাথায় ছোঁয়াইয়া বুকে ছোঁয়াইয়াও রাণী যেন তৃপ্তি পাইতেছিল না! জীবনের এক মাত্র পাথেয় স্বরূপ স্বামীর এই 'প্রিয়তমা' সম্বোধন টুকুতে সে সিংহাসনাধিষ্ঠাত্রী রাজ্ঞীর ন্যায় আপনাকে মহীয়সী জ্ঞান করিয়াছে!

(৫)

সহসা একদিন হেমেন্দ্র জ্বরগায়ে বাটি ফিরিয়া শয্যাগ্রহণ করিল। পরিবারবর্গ তাহাকে লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িল। রাণী একেবারে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিল। রাণীকে কেহ একদণ্ড সে কক্ষ ছাড়িতে দেখে নাই। ক্ষুদ্র বালিকা আপনার প্রাণ-পণ শক্তি লইয়া যমের সহিত সংগ্রাম করিল। ডাক্তার আসিয়া যেদিন জীবনের আশা দিলেন, রাণী সেদিন আনন্দে ভগবানের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা জানাইতে গিয়া অশ্রুগোপন করিতে পারিল না—আর একজনকে বার বার প্রণাম করিয়া সে কহিল, "দিদি তুমি আমার হাতে দিয়ে গিয়েছ, এবার কোনমতে যে রক্ষা হয়েছে—সে কেবল তোমার পুণ্যে।"

ডাক্তার আসিয়া কহিল, কেবল সেবার জন্য এ যাত্রা রক্ষা পাইয়াছে; ঘড়ি ধরিয়া খাওয়ান, ঔষধ দেওয়া, মাথায় বরফ ব্যবহার এ সকলের কোনটাতে যদি সামান্য ত্রুটি ঘটিত তাহা হইলে টাইফড হতে কোন মতে রক্ষা করা যাইত না! এবং তিনি

এই বালিকা বধূর ঐকান্তিক সেবা যত্নের কথা বার বার উল্লেখ করিতে ভুলিলেন না।

সেদিন শেষরাত্রে রোগাক্রান্ত হেমেন্দ্র স্বপ্ন দেখিতেছিল! যেন সে লীলার ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া শয়ন করিয়া আছে! লীলা যেন বলিতেছে, "কেন তুমি ওকে এত অযত্ন কর্‌ছ? আমার অদৃষ্ট, তাই চলে গেলুম, কিন্তু আমি তোমাকে রাণীর হাতে দিয়ে নিশ্চিত আছি! সত্যি, আমার সর্ব্বস্ব তুমি ওর মধ্যে পাবে! ওকে দেখো লক্ষীটি, ও আমার ছোট বোন্ ওকে কোন অযত্ন করো না!" সহসা হেমেন্দ্রের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে একেবারে ডাকিল—"লীলা!" নিদ্রাভঙ্গে হেমেন্দ্র চাহিয়া দেখে, রাণী তাহার পায়ের উপর মাথাটি রাখিয়া যেন কত সঙ্কোচে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে! তাহার মনে পড়িল, রাণী তাহার পায়ে হাত বুলাইয়া নিদ্রা আনয়নের চেষ্টা করিতেছিল—তাহার পর কখন নিজে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে আর কি! পাশের খোলা খড়খড়ি দিয়া শেষ রাত্রের চাঁদের আলো আসিয়া তাহার মুখখানির উপর পড়িয়াছে! হেমেন্দ্র দেখিল এ যেন সেই লীলারই মুখ! তাহারি মত চূর্ণ কুন্তলগুচ্ছ কপালখানির উপর উড়িয়া পড়িতেছে—কয়দিনের জাগরণে চিন্তায় মুখখানি যেন সকালে বাসি ফুলের মত শুকাইয়া ম্লান হইয়া পড়িয়াছে! হেমেন্দ্র ভুলিয়া আবার ডাকিল "লীলা, ও লীলা;" "উ!" রাণীর নিদ্রাভঙ্গ হইল, অপ্রতিভভাবে উঠিয়া বসিয়া আবার সে হেমেন্দ্রের পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল।

হেমেন্দ্র হাত বাড়াইয়া ডাকিল, "রাণী এসো কাছে এসো!"

রাণী সরিয়া কাছে আসিল। হেমেন্দ্র তাহার হাতখানি আপনার রোগশীর্ণ হাতে ধরিয়া কহিল, "রাণী এইমাত্র তাকে স্বপ্নে দেখলুম! তোমার দিদিকে! তোমাকে অনাদর করি বলে কত সে দুঃখ করলে!

রাণী সাগ্রহে কহিল, "দিদি আর কি বল্‌লেন বল,—

হেমেন্দ্র রাণীর চিবুকে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল,—"আর বল্‌লে তুমি সে-ই আমাকে মাপ কর রাণী—আমি আর তোমাকে অযত্ন করব না—অনাদর করব না, ভাল বাস্‌ব!"

আনন্দে রাণীর নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, স্বামী রোগমুক্ত হইয়া তাহাকে যে আদর করিয়াছেন, এ অপ্রত্যাশিত সুখের মাত্রাটুকু সে সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিতেছিল না!

রাণী কহিল, "আমাকে শুধু দাসী বলে পায়ে স্থান"—

হেমেন্দ্র তাহার মুখখানি আপনার বুকের উপর টানিয়া ধীরস্বরে কহিল—"না, না, পায়ে কেন—বুকের ধন আমার তুমি, বুকে করে তোমায় রাখব! আমার খালি বুকখানি পূর্ণ করে থাকো—লক্ষী আমার"—

তখন দু'একটা পাখী সেই উষালোকে সবেমাত্র কুহরিয়া উঠিয়াছে এবং রাস্তা দিয়া থিয়েটার প্রত্যাগত বালকের দল গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে,—

"আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু
পেখনু পিয়ামুখচন্দা"—

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

প্রাণের কথা।

প্রাণং দেবা অনুপ্রাণন্তি। মনুষ্যাঃ পশবশ্চ যে।
প্রাণো হি ভূতানামায়ুঃ। তস্মাৎ
সর্ব্বায়ুষমুচ্যতে।
সর্ব্বমেব ত আয়ুর্যন্তি। যে প্রাণংব্রহ্মোপাসতে।
—তৈত্তিরীয়োপনিষত্, ব্রহ্মানন্দবল্লী।

শুনিয়াছি, বয়স হইলে, লোকের প্রাণের মায়া কমিয়া আসে। যার কমে না, সে অধম, ঘোর সংসারী। বয়সের সঙ্গে আমার কিন্তু প্রাণের মমতা কমে নাই, বরং বাড়িয়াই বুঝি বা চলিয়াছে। এ জন্য আমাকে অধম বলিতে হয়, বল। অধম যে নই, স্পর্দ্ধা করিয়া এমন কথাও বলিতে পারি না। তোমরা অধম বলিলে, গায়ে বড় লাগে সত্য, যেন তপ্ত তৈলের ছিটা পড়ে, মন প্রাণ তাতে চিড়বিড় করিয়া উঠে। তোমরা আমার আপনার জন নও, তাতেই বুঝি অমন হয়। আবার অধম বলিয়া তোমাদের আনন্দ হয়, তোমাদের অভিমান পুষ্ট হয়, তাই তাতে আমার অভিমানে এমন আঘাত লাগে, কিন্তু আমি নিজেকে অধম বলিয়া জানি বা না জানি, অনেক সময় ভাবিয়া থাকি। আমার নিজের মুখে যখন আমি নিজেকে অধম বলি, তখন প্রাণে আরাম পাই। নিজেকে নিজে নীচু করার একটা মহত্ব আছে, তারই জন্য আপনাকে অধম বলিয়া মানাতে আমি কুণ্ঠিত নহি! অধম যে নই,—এমন কথা তাই বলিতে চাহি না। কিন্তু প্রাণকে ভালবাসি এই জন্য আমি অধম, এ কথা তোমরা বলিলেও আমি শুনিব না। বয়স ফুরাইয়া আসিল, কিন্তু প্রাণের মায়া কমিল না, এজন্য আমি একরত্তিও লজ্জিত নই; প্রাণের সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ হইবে ভাবিতে অসহ্য যাতনা হয়, একথা স্বীকার করিতে আমি বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত নহি। প্রাণ আমার অতি প্রিয়, এ প্রাণের চাইতে প্রিয়তর এ জগতে আর কিছুই নাই। এই প্রাণ আমার প্রীতির মাপকাঠি। যা'কে নিরতিশয় প্রীতি করি তা'কে প্রাণতুল্য বলিয়া সম্বোধন করি। যার চাইতে জগতে আর কিছু প্রিয়তর আছে বলিয়া মনে হয় না, তাকে, প্রাণ বলিয়া ডাকি। প্রিয়তম যে তাকে প্রাণ বলিতে প্রাণ জুড়াইয়া যায়। এ জগতে যা কিছু প্রিয়, তা কেবল এই প্রাণের জন্য। এই প্রাণের সেবা করিয়া তারা সকলে প্রিয় হইয়াছে! স্ত্রী পুত্র পরিবার, আত্মীয় বন্ধু বান্ধব, সমাজ স্বদেশ, দেব মানব সকলে প্রিয় এই প্রাণের জন্য। এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড নিয়ত এই প্রাণের সেবা করিয়া এত প্রিয় হইয়াছে। এমন যে প্রিয় প্রাণ, ইহাকে ছাড়িব, ভাবিলে কষ্ট হয়, এ আর বিচিত্র কি?

এ প্রাণকে বড় ভালবাসি, কিন্তু তাকে ভাল করিয়া এখনো চিনি না। ভাল করিয়া যদি জানিতেই পারিতাম, তবে বুঝিবা এ প্রেমও থাকিত না। জানি অথচ জানি না; যত জানি তত জানি না, যত নিকটে আসি

ততই যেন আরো দূরে সরিয়া যায়, এই যে আলো-আঁধারের বিচিত্র লীলা, তাহাতেই প্রেম জন্মে, তাতেই প্রেম বাঁচে ও বাড়ে। যাকে ভালবাসি সে চিরকাল আমার চাইতে বড় থাকিবে। যাকে একেবারে জানিয়া ফেলিলাম, সে তো মুঠোর ভিতরে আসিয়া পড়িল। সে তো ছোট হইয়া গেল। তার প্রতি প্রেম আর তেমন ভাবে, তেমন জ্বলন্ত পিপাসা বুকে লইয়া ছুটিয়া যায় না। আর ঐ পিপাসাই প্রেমের প্রাণ।

জানি, জানি, মনে জানি ; কিন্তু আমি
জানিনে :—
চিনি, চিনি, মনে চিনি ; কিন্তু আমি
চিনিনে ;—

ইহাই প্রেমের উপজীব্য। প্রাণকে আমি জানি না, তাই এত ভালবাসি। যদি এ জনমে প্রাণকে ভাল করিয়া একবার জানিয়া ফেলিতে পারিতাম, তবে তার মায়া আপনি হয়ত কাটিয়া যাইত। বয়সের সঙ্গে যাদের প্রাণের মায়া সত্য সত্যই কাটিয়া যায়, বুঝিবা তারা প্রাণকে ভাল করিয়া জানিয়া ফেলে। আর জানুক বা না জানুক, যতটা সম্ভব—একেবারে তার শেষটা দেখিয়াছে, অন্ততঃ এ অভিমান তাদের জন্মে। নইলে প্রাণের মায়া ছুটে কিসে? তারা এই দেহকেই প্রাণ বলিয়া ধরিয়া লয়, এ সকল ইন্দ্রিয়কেই প্রাণ বলিয়া গণনা করে, তাই দেহ যত দুর্ব্বল হয়, ইন্দ্রিয় যত বিকল হয়, ততই প্রাণও শেষ হইয়া আসিতেছে ভাবিয়া, তা'র প্রতি মমতাশূন্য হইয়া পড়ে। তারা যন্ত্রকে যন্ত্রী বলিয়া ধরে। আধারকে আধেয় বলিয়া ভাবে। যন্ত্রকে জানিয়াই যন্ত্রীকেও জানিয়া ফেলিয়াছে, তাঁর দৌড় কত তাহা দেখিয়াছে, মনে করে। তাই তাদের প্রাণের মায়া কমিয়া যায়। কিন্তু আমি এখনো প্রাণকে চিনিলাম না। প্রাণের স্বরূপ এখনো বুঝিলাম না এ প্রাণের ভিতরে কত কি যে আছে না আছে, তার কিছুরই সন্ধান এখনো পাইলাম না। এ জন্ম বুঝি এই ভাবেই যাবে। কত জন্ম যে এইভাবে যাবে তাহারই বা ঠিকানা কোথায়? বয়স বাড়িল, আয়ু ফুরাইতে চলিল, কিন্তু এ প্রাণকে জানা হইল না, তাই ইহাকে এত ভালবাসি। এ প্রাণের উৎপত্তি কোথায়, ইহার স্থিতি কিসে, ইহার গতি ও পরিণাম কি,—এ সকল কিছুই জানি না, কিছুই বুঝি না। খুঁজিতে গেলে, আপনাকে অনন্ত অসীমে হারাইয়া ফেলি। এ জনমে একটুকু মাত্র মনে হয়, যেন বুঝিয়াছি যে এই প্রাণ, হেয় বস্তু নহে। ইহা ক্ষুদ্র নহে। ইহার মধ্যে যেন এই বিশাল বিশ্ব লুকাইয়া আছে। জানিয়াছি শুধু এই যে, এ প্রাণ নিত্য বস্তু, শাশ্বত সনাতন। ঊর্দ্ধমূলোঽবাকশাখঃ এষোঽশ্বত্থ সনাতন,—মনে হয় এই প্রাণই সেই শ্রুতি-কথিত সনাতন অশ্বত্থ বৃক্ষ যাহার মূল ঊর্দ্ধে অনন্ত দেবপিতৃলোকে, আর যাহার শাখা প্রশাখা নিম্নে এই মরলোকে অনন্ত-ভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে। এই প্রাণের উৎপত্তি কোথায় জানি না, জানি কেবল, পিতৃকুল, মাতৃকুল, দুই পবিত্র কুলধারা এই প্রাণেতে গঙ্গা যমুনার মত সম্মিলিত হইয়া ইহাকে পরম পবিত্র ত্রিবেণী তীর্থে পরিণত

করিয়াছেন। প্রতি নিঃশ্বাসে, প্রতি প্রশ্বাসে আমি আজন্মকাল এই পবিত্র সঙ্গমক্ষেত্রে স্নান করিয়া পবিত্র হইয়াছি। পিতাতে মাতাতে, দুই দুই প্রাণধারা মিলিত হইয়া তাঁহাদের প্রাণের সৃষ্টি করিয়াছিল; অথবা তাই কেন বলি, তাঁহাদের মিলনে দুই নহে, চারি; চারি নহে, আট; আট নহে, ষোড়শ; ষোড়শ নহে, বত্রিশ; বত্রিশ নহে, চৌষট্টি; চৌষট্টি নহে, শতাধিক, সহস্রাধিক,—কত কুলধারা, কত প্রাণধারা যে এক একটি প্রাণেতে আসিয়া মিলিত হয়, তার সংখ্যা করে কে? এই প্রাণ ধরিয়া যখন উচ্চে বহিয়া চলি,—অল্পক্ষণ মধ্যে এক অসংখ্য-শাখ, অনাদ্যনন্ত প্রাণস্রোতে গিয়া আত্মহারা হইয়া যাই। তখন দেখি এই প্রাণই পবিত্র সুরধণী, সকল প্রাণের প্রতিষ্ঠা বিষ্ণুপাদপদ্মে এই প্রাণধারার উৎপত্তি। এই প্রাণের দিকে যখনই তাকাই তখন উদার চরিত না হইয়াও, সমগ্র বসুধাকে কুটুম্ব বলিয়া আলিঙ্গন করিতে সাধ যায়। কত শত কত সহস্র, কত লক্ষ, কত কোটী কোটী প্রাণধারা মিলিয়া এক একটী ক্ষুদ্র প্রাণের সৃষ্টি করে, তার গণনা করিবে কে? শত শত মন্বন্তর ব্যাপী প্রাণন চেষ্টার শেষ ফল রূপে এই ক্ষুদ্র প্রাণ ফুটিয়া উঠিয়াছে, ইহার মর্য্যাদার সীমা কোথায়? কত যুগ যুগান্ত ব্যাপিয়া, কত দেব, কত মানব, কত দেবর্ষি, কত রাজর্ষি, কত মহর্ষি, কত জ্ঞানী, কত কর্ম্মী, কত যোগী, কত ভক্ত, কত আশাভরে, কত যত্নে, কত আদরে, কত ভাবে, এই প্রাণের পরিচর্য্যা করিয়া, কত শিক্ষা দীক্ষা দিয়া, আপনাদের আজন্ম সাধিত, সাধনসম্পত্তি দ্বারা অভিষিক্ত করিয়া, ইদানীং এই সংসারে, এক ক্ষুদ্র পরিবারে, এক নরদম্পতির পরম পবিত্র প্রাণযাগের যজ্ঞফলরূপে, এই ক্ষুদ্র প্রাণকে ফুটাইয়াছেন,—ইহা যখন মনে হয়, তখন, সত্য বলি, এ প্রাণকে আর আমার বলিতে সাহস হয় না। এ যে বিশ্বপ্রাণ—এ যে হীরণ্যগর্ভ। এ যে প্রজাপতি। পবিত্র পুরুষযজ্ঞে ইহার উৎপত্তি। যে যজ্ঞের দেবতা কাম, ছন্দ বেদমাতা গায়ত্রী, ঋষি বিশ্বস্য মিত্রং—বিশ্বামিত্র; পুরুষ প্রেমস্নাত হইয়া যে যজ্ঞের অগ্নিতে আপনাকে আপনি শ্রদ্ধা সহকারে, আহুতিরূপে অর্পণ করেন, সেই মহাযজ্ঞ হইতে এই প্রাণের উৎপত্তি। এ প্রাণের মহত্বের শেষ কোথায়? এমন প্রাণকে ভালবাসি, ইহার জন্য লজ্জিত হইব কেন?

এই বিশাল বিশ্ব এই প্রাণকে আশ্রয় করিয়া আছে। এই জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যদেবতা, অনাদি কাল হইতে প্রাণের দ্বারস্থ হইয়া, ইহার নিকটে, নিয়ত আপনার জীবনের সম্যক সফলতা ভিক্ষা করিতেছেন। যে রূপতন্মাত্রা জ্যোতির্ম্ময় সবিতার প্রাণ স্বরূপ; তাহা আপনার সার্থকতার জন্য এই প্রাণমুখাপেক্ষী চক্ষু দুটীর মুখ চাহিয়া আছে। চক্ষুর জন্য রূপের সৃষ্টি, না রূপের জন্য চক্ষুর সৃষ্টি কে বলিবে? তেজ আগে না চোখ আগে কে জানে? কিন্তু প্রাণের আশ্রয় করিয়া, প্রাণের মধ্যে যে ইহারা পরস্পরের সফলতা সম্পাদন করে, এ তো প্রত্যক্ষ কথা,—ইহা অস্বীকার করিব কেমনে। যে শব্দতন্মাত্রা প্রাচীন ঋষিকুলপুঞ্জে আকাশ দেবতার প্রাণ, তাহা আপনার সফলতার

জন্য শ্রুতিযুগলের মুখাপেক্ষী হইয়া আছে। যে স্পর্শতন্মাত্রা বায়ুদেবতার প্রাণ তাহা সেইরূপ আপনাকে চরিতার্থ করিবার প্রত্যাশায় ত্বকের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকে। যে রসতন্মাত্রা জলদেবতা বারুণীর প্রাণ, তাহা আপনার সফলতার জন্য এই প্রাণাশ্রিত রসনার প্রতি চাহিয়া থাকে। যে গন্ধতন্মাত্রা এই ধরিত্রী পৃথিবী দেবতার প্রাণ, তাহা এই ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের আশ্রয়ে আপনার সফলতা লাভ করিয়া থাকে। পঞ্চতন্মাত্রাত্মক এই পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চভূতাত্মক এই বিশাল জগতপ্রপঞ্চ এই পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের, এবং এই পঞ্চেন্দ্রিয়, আপন আপন সফলতা লাভের জন্য এই প্রাণের শরণাগত হইয়াছে। এবং এই প্রাণই বিশ্বম্ভর,—বিশ্বকে ভরণপোষণ করিতেছে। সৃষ্টি লীলায় এই প্রাণই মহাবিষ্ণু। ব্যষ্টিভাবে, এই প্রাণই ক্ষিরোদশায়ী, জীবান্তর্যামি; সমষ্টিভাবে, এই প্রাণই নারায়ণ বা বিশ্বমানব। এই প্রাণই ভগবানের পরা প্রকৃতি।

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খংমনোবুদ্ধিরেবচ
অহঙ্কারং ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিত স্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মেপরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার,—আমার এই বিভিন্ন অষ্ট প্রকারের প্রকৃতি। এ সকল আমার নিকৃষ্ট প্রকৃতি, আমার অন্য এক শ্রেষ্ঠ প্রকৃতি আছে,—সে জীবপ্রকৃতি, যাহাদ্বারা, হে মহাবাহো! আমি এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করিয়া রহিয়াছি।

এই প্রাণই, এই পরা জীবপ্রকৃতি। এই প্রাণের দ্বারাই ভগবান সমুদায় জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। সৃষ্টিলীলায় এই প্রাণই লীলাময়ের প্রধান সহায়। এমন যে বস্তু, এমন যে মহান্, এমন যে ,পবিত্র, পরম তত্ত্ব, তাহাকে ভালবাসি, ইহাতে লজ্জার কথা কি আছে?

তোমরা তা' জান না। সংসারের লোকে সে খবর রাখে নি। কিন্তু যে দিন এই ক্ষুদ্র প্রাণ ভূমিষ্ঠ হয়, সে দিন এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে সাড়া পড়িয়াছিল। দেবলোক, পিতৃলোক, সিদ্ধলোক, গন্ধর্ব্বলোক, নরলোক, সুরলোক, যক্ষরক্ষ-অসুর-লোক,—সকল লোকে সে দিন সাড়া পড়িয়াছিল। বালকেরা নদীতীরে দাঁড়াইয়া ক্রীড়াচ্ছলে নদীগর্ভে উপলখণ্ড নিক্ষেপ করিয়া, নদীজলের তরঙ্গভঙ্গ দেখিয়া আমোদ করে,—তারা জানে না যে এই এক একটী সামান্য তরঙ্গে বিশাল সাগরবক্ষ পর্য্যন্ত অদৃশ্যে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছে। শিশুরা সাবান জলে ফুঁ দিয়া আকাশে বুদ্‌বুদ উড়াইয়া, তার গায়ে ইন্দ্রধনুর রং ফুটাইয়া করতালি দিয়া নৃত্য করে, তারা জানে না যে এই এক একটী বুদ্‌বুদ যখন ফাটিয়া আকাশে মিলিয়া যায়, তখন নিখিল বায়ুমণ্ডল স্পন্দিত হইয়া হইয়া উঠে। তেম্নি আমরাও জানি না যে এক একটী ক্ষুদ্র মানবশিশুর প্রথম নিঃশ্বাস যখন এই পৃথিবীতে পড়ে, তখন নিখিল বিশ্বে রোমাঞ্চ উঠিয়া থাকে এই ক্ষুদ্র জীবের সামান্য নিঃশ্বাসের সঙ্গে কত স্নেহ, কত প্রেম, কত আনন্দ, কত বিষাদ, কত আশা, কত আশঙ্কা—যে বিশাল বিশ্বপ্রাণে

শিহরিয়া উঠে, তার খবর কে রাখে? তার ওজন জানে কে? বুভুক্ষিত দেবতারা, তৃষিত পিতৃলোকেরা, আসিয়া তখন ইহার সূতিকাগারকে জনাকীর্ণ করিয়া তোলেন। মা, তুমি জান না যে তোমার শয্যাতল তখন সকল তীর্থের সারতীর্থ হইয়া দাঁড়ায়।

তোমরা এই ক্ষুদ্র নবজাত প্রাণকে একরত্তি মানুষ, এক মুটো মাংসপিণ্ড দেখিয়া অবজ্ঞা করিতে পার। কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ দেবতারা জানেন, এই একরত্তি জীব, এই এক মুটো রক্ত মাংস বস্তু কি? তাঁরা জানেন এই এক বিন্দু প্রাণ, আজ বিশাল বিশ্বের অনাদি সঞ্চিত কর্ম্মফলের বোঝা মাথায় করিয়া এই পৃথিবীতে আসিয়াছে। একঃ প্রজায়তে লোকঃ একোঽনুভুঙ্‌ক্তে সুকৃতমেক এবচ দুষ্কৃতং—জীব একাকী জন্মগ্রহণ করে, একাকীই সুকৃত দুষ্কৃত ভোগ করে,—কথা মিথ্যা নহে। কিন্তু সে একাকী হইলেও, অগণ্য জীবের কর্ম্মফলের বোঝা মাথায় লইয়া জন্মিয়া থাকে। এই তো তার মহত্ব। একাকী জন্মিয়া সে বহুজীবের, বহুযুগের সঞ্চিত কর্ম্ম ক্ষয় করিতে প্রবৃত্ত হয়। খ্রীষ্টীয়ানেরা বলেন, বিশ্বপিতা পরমেশ্বর, পাপী জগতের পরিত্রাণের জন্য, আপনার একমাত্র পুত্রকে বলিদান করিয়াছেন। অজ্ঞলোকে ভাবে, জগতের ইতিহাসে, দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে, জুদিয়াভূমে, ক্যালভেরী ক্ষেত্রে, একবার মাত্র এই পবিত্র প্রায়শ্চিত্তের এই মহান পুরুষযজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। কিন্তু উক্ত জ্ঞানীরা জানেন যে এ প্রায়শ্চিত্ত, কেবল একবার মাত্র হয় নাই। জগতের আদি হইতে, পুরুষ পরম্পরায় এই পবিত্র প্রায়শ্চিত্ত, এই মহান্ পুরুষযজ্ঞ সকল দেশে সকল সমাজে নিয়ত অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। প্রত্যেক জীবের জীবন আবরণ, এই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে। প্রত্যেক প্রাণী সমুদায় বিশ্বের কর্ম্মফল ভোগ করিতে জন্মগ্রহণ করিয়া, এই প্রায়শ্চিত্তের সাধন করে। প্রাণীমাত্রেই, জগতের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য, এ সংসারে জন্ম লইয়া থাকে। কারো ভাগ্যে এ সমাধা হয়, কারো ভাগ্যে বা হয় না, কিন্তু সকলেই এই মহাযজ্ঞের স্বধা রূপে বিশাল বিশ্বের নিখিল কর্ম্মকুণ্ডে, বিশ্বপিতা বিধাতা-পুরুষ কর্ত্তৃক, আহুতি প্রদত্ত হইতেছে। কবে কোন্ ঐতিহাসিক যুগে, কোন্ অজ্ঞাত কারণে, মাতা বসুন্ধরা একবার বিক্ষুব্ধ হইয়া, কোথায় কি বিষরাশি উদ্গীরণ করিয়াছিলেন, তারই জন্য পৃথিবীর সে সকল ভূভাগ আজি পর্য্যন্ত বিষধর বীজানুপুঞ্জে পরিপূর্ণ হইয়া আছে। এই সকল ভূভাগে যেই জন্মা'ক না কেন, সেই যে বসুধার এই প্রাচীনকৃত কর্ম্মবোঝা মাথায় লইয়া আসে, এবং আমরণ পর্য্যন্ত এই প্রাণনাশী জীবানুপুঞ্জের সঙ্গে যুজিয়া সেই প্রাচীন পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত করে,—ইহা কি সত্য নহে? কেন যে মাঝে মাঝে সূর্য্য দেহে স্ফোটক প্রকাশিত হয়, পণ্ডিতেরা এখনো ইহার তত্ব আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন নাই; কিন্তু এই সকল সৌরস্ফোটকে বা Sunspot এ পৃথিবীর আবহাওয়ার যে বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া থাকে, এ কথা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এই সৌরস্ফোটক নিবন্ধন বায়ুমণ্ডলের স্বভাব-বিপর্য্যয় যখন ঘটে, তখন যে প্রাণীই সে

বায়ুমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করুক না কেন, সবিতার এই কর্ম্মফলের বোঝা স্বল্পবিস্তর পরিমাণে তাহাকে বহিতেই হয়। মাটীর দোষগুণ যে কেবল উদ্ভিদেই ফুটিয়া উঠে, তাহা নহে; —প্রাণীকেও পূর্ণ মাত্রায় তাহার ভাগী হইতে হয়! জলের দোষগুণ, বায়ুর দোষ-গুণ,—পঞ্চমহাভূতের সমুদায় সুকৃত দুষ্কৃতের ভার এ জগতে স্বল্পবিস্তর পরিমাণে, আপন আপন প্রকৃতি অনুযায়ী, প্রত্যেক জীবকেই বহন করিতে হইতেছে। আর পূর্ব্বপুরুষের দোষগুণের ভার যে সকল মানুষকেই বহিতে হয়, এ তো প্রত্যক্ষ কথা। পিতার কর্ম্ম-বোঝা মাথায় লইয়া পুত্র জন্মগ্রহণ করে। একরত্তি শিশুও তার সামান্য ইচ্ছার ব্যাঘাত জন্মিলে, যে ক্রোধোবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া, বিকারগ্রস্থ রোগীর ন্যায়, দিক্‌বিদিক্‌ জ্ঞানশূন্য হইয়া আপনার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিক্ষেপে প্রাণহানির আশঙ্কা পর্য্যন্ত জাগাইয়া তোলে,—এ কি কেবল তার নিজের কর্ম্মের ফলে, না, পিতার ক্রোধ, মাতার অপস্মার, পিতামহের পারুষ্য, মাতামহের মাৎসর্য্য, এইরূপ পুরুষ পরম্পরাগত সঞ্চিত কর্ম্মের পরিণাম? জীব একাকী জন্মগ্রহণ করে, এ কথা সত্য, কিন্তু সে কেবল আপনার কর্ম্ম-বোঝা মাথায় লইয়া কর্ম্মটুকু মাত্র ক্ষয় করিতে এ সংসারে আসে, ইহা সত্য নহে। এই বাংলা দেশে জন্মিয়া, এই মাটীর দোষ-গুণের বোঝা কি সকল বাঙ্গালীকে বহিতে হইতেছে না? মাটীর গুণে জলের গুণে, হাওয়ার গুণে, বঙ্গবাসী বাঙ্গালী হইয়াছে, শিখ শিখ হইয়াছে, রাজপুত রাজপুত হই-য়াছে, গুজ্‌রাটী গুজরাটী হইয়াছে, মারাঠা মারাঠা হইয়াছে,—তামিল তৈলঙ্গী সকলেই আপনার দেহে আপন আপন মাটীর দোষ-গুণের বোঝা বহিতেছে; কেহ বা দীর্ঘা-কৃতি কেহ বা খর্ব্বকায়, কেহ বা বলিষ্ঠ কেহ বা দুর্ব্বল, কেহ বা কর্ম্মঠ কেহ বা অকর্ম্মণ্য হইয়াছে,—ইহা কি সত্য নহে?— মানুষ কেবল নিজের সুকৃত দুষ্কৃতের বোঝা লইয়াই এ সংসারে জন্ম গ্রহণ করে এই যদি সত্য হয়, তবে সংসারের সকল সম্বন্ধই শিথিল ও গ্রন্থিহীন হইয়া পড়ে। একের সঙ্গে অপরের সুখদুঃখের ও পাপ পুণ্যের এই যে বিপুল, এই যে জটিল বন্ধন, তাহা যে নিতান্তই কাল্পনিক, মায়িক, অলীক হইয়া দাঁড়ায়। তবে এজগতে কে আর কার অপেক্ষা রাখে? কে কার জন্য দায়ী হয়? পিতার পুত্রের জন্য, পুত্রের পিতার জন্য, পতির পত্নির জন্য, পত্নির পতির জন্য, প্রভুর ভৃতের জন্য, ভৃতের প্রভুর জন্য, রাজার প্রজার জন্য, প্রজার রাজার জন্য, বন্ধুর বন্ধুর জন্য, কারো জন্য কাহারো আর কোনো দায়িত্ব থাকে না।

তুমি কার, কে তোমার, কারে বলরে আপন,
মোহমায়া নিদ্রাবশে, দেখিছে স্বপন,—

ইহাই সংসারের সকল তত্ত্বের সারতত্ত্ব হইয়া দাঁড়ায়। স্নেহের, প্রীতির, প্রেমের, ভক্তির, দয়ার, দাক্ষিণ্যের, এ সকলের কিছুরই আর কোনো সত্য ও সারবত্তা থাকে না। এই যে পরস্পরাপেক্ষীভাব, যাহা হইতে স্নেহ, প্রেম, ভক্তি, দয়া, দাক্ষিণ্য, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম,—সকলের উৎ-পত্তি, এ সকল,—জীব কেবল আপনারই কর্ম্মফল ভোগ করিতে সংসারে আসে,

কেবল আপনিই আপনার কর্ম্মের ভালমন্দ দ্বারা আবদ্ধ হয়, এ যদি সত্যিই সত্য হয়,—তবে এ সকলের আর কোনো আশ্রয় রহিল কি? দশের কল্যাণের সঙ্গে একের কল্যাণ জড়িত, দশের ভাল মন্দের উপরে একের ভালমন্দ প্রতিষ্ঠিত, দশের সুখের ভিতর দিয়া একের সুখ, দশের তৃপ্তির ভিতর দিয়া একের তৃপ্তি, দশের উন্নতির মধ্য দিয়া একের উন্নতির পন্থা,—এই যে সমাজস্থিতি হেতু, এই যে লোকধর্ম্ম,—এ সকলের আর কোনো প্রতিষ্ঠা থাকে কৈ? ফলতঃ জীব একাকী জন্ম গ্রহণ করে, এ কথা সত্য; কিন্তু বহুলোকের বহুযুগের সঞ্চিত কর্ম্মের বোঝা মাথায় লইয়া সে জন্মায়, আর জন্মিয়া এই নিখিল বিশ্বের বিশাল কর্ম্ম-জালেতে সে আবদ্ধ হয়, এও অতি সত্য। যে কর্ম্মবোঝা লইয়া সে সংসারে আসে, তাহা এখানে আপনার সজাতীয় সমুদয় কর্ম্মকে টানিয়া আনে। পাপ পাপকে টানিয়া লয়, পুণ্য পুণ্যকে টানিয়া আনে। এইরূপে পরস্পরের সুকৃত দুষ্কৃতের বোঝা নিয়ত বাড়িয়া যায়। লৌহচূর্ণ মিশ্রিত গন্ধকচূর্ণের মধ্যে একখণ্ড চুম্বক ফেলিয়া দিলে, যেমন আশে পাশের সমুদায় বিচ্ছিন্ন লৌহকণা তার গায়ে আসিয়া আপনি লাগিয়া যায়, সেইরূপ প্রত্যেক প্রাণীর নিজের প্রকৃত দুষ্কৃতি, চতুপার্শ্বস্থ জড় ও জীব সকলের পূর্ব্বসঞ্চিত ও অধুনাকৃত, সুকৃত দুষ্কৃতকে আপনার মধ্যে আনিয়া ফেলে।—"তুমি কার কে তোমার" বলিয়া এ অপরিহার্য্য নিয়তি পরিহার করা যায় না। কেউ-আমার, আমি কারো হই বা না হই,—আমার পাপ পুণ্যের ভাগী তারা, তাদের সুকৃত দুষ্কৃতের ফলভোগী আমি। এ সম্বন্ধ সত্য। এ সম্বন্ধ নিত্য। মায়িক বলিয়া, চক্ষু বুঝিয়া, ইহাকে অগ্রাহ্য করিলে চলিবে কেন?

ফলতঃ ইহা মায়িকও নহে। তোমাকে আমা হইতে, আমাকে তোমা হইতে, যে পৃথক, অসম্বন্ধ, বলিয়া ভাবি,—এই যে আমি আমি, তুমি তুমি করি, এই যে দুনিয়ার সুখ দুঃখের ভাগবাটোয়ারা করিয়া আপনারটী আপনি গুছাইয়া লইতে চাই, ইহাই মায়ার খেলা। এই বিচ্ছিন্ন জ্ঞানই মায়িক। কিন্তু তুমি আমি যে মূলে এক, একই প্রাণ-সাগরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গভঙ্গ, একই জ্ঞান-সূর্য্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিরণ খণ্ড,—একই অনাদ্যনন্ত নিত্যপ্রদীপ্ত পাবকরাশির সামান্য স্ফুলিঙ্গমাত্র,—ইহাই সত্য।

তদেতত্‌ সত্যম্‌—

যথা সুদীপ্তাত্‌ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ
সহস্রশঃ প্রভবন্তে স্বরূপাঃ।
তথাক্ষরাত্‌ বিবিধাঃ সৌম্য ভাবাঃ
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি॥

ইহাই সত্য, হে সৌম্য! যে যেমন প্রজ্জ্বলিত অগ্নি হইতে অগ্নিরূপ সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গ প্রসূত হয়, সেইরূপ অক্ষয় পুরুষ হইতে বিবিধ প্রাণী সকল জন্মগ্রহণ করিয়া, পুনরায় তাঁহাতেই প্রত্যাবৃত্ত হয়। এই একেতে সকলে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া, এই একে, সূত্রে মণিগণাইব—সূত্রে যেমন হারের মণি সকল গাঁথা থাকে, তেমনি সকলে গাঁথা বলিয়া,—জড়ে ও জীবে এই বিচিত্র সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়। যে প্রাণ আমাতে, সেই প্রাণ

তোমাতেও, তাই তোমাকে আমি বুঝি। যে জ্ঞান আমার বুদ্ধিকে উন্মুক্ত করিতেছে, তাহাই তোমার বুদ্ধিকেও প্রকাশ করিতেছে বলিয়া তোমাকে আমি জানি, আমাকে তুমি জান। একই প্রেম, একই স্নেহ, একই দাক্ষিণ্য,—সমুদায় বিশ্বকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে বলিয়া, আমার ও তোমার ও এই বিশাল জনসমাজের স্নেহপ্রেম দয়া দাক্ষিণ্যের সম্বন্ধ সকল প্রতিষ্ঠিত ও প্রকাশিত হইতেছে। সেই মহান একে, সেই পরম-তত্ত্বের, সেই নিখিলরসামৃতমূর্ত্তি ভগবানে, সংসারের বিচিত্র সম্বন্ধ সকল প্রতিষ্ঠিত। তাঁহা হইতে যখন এ গুলিকে পৃথক্ করিয়া দেখি, তখনই এ সকল মায়িক হইয়া দাঁড়ায়, এ সকলের কোনো সত্য ও সারবত্তা আর থাকে না। তখন সত্যি সত্যি,—

তুমি কার, কে তোমার, কারে বলরে
আপন!
মিছে মায়া নিদ্রাবশে, দেখিছ স্বপন—

ইহাই সত্য হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু আমাকে ও আমার যাঁরা তাঁদের সকলকে যখন ভগবানের মধ্যে দেখি,—

এক ভানু অযুত কিরণে,
উজলে যেমতি সকল ভুবনে,
(তেমতি) তাঁর প্রীতি হইয়ে শতধা—
বিরচয়ে সতীর প্রেম,
জননী-হৃদয়ে করে বসতি—

এই যখন প্রত্যয় করি,—তখন এই মায়াবরণ সরিয়া গিয়া, সংসারের সকল সম্বন্ধ, সকল সুখ, সকল দুঃখ, সকল ভেদাভেদ, সকল ধর্ম্মাধর্ম্ম, সকল কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যকে সত্য করিয়া তোলে। তখন আর "তুমি কার কে তোমার, কারে বলরে আপন,"—এই বলিয়া এই স্নেহপ্রেম দয়াদাক্ষিণ্যের এই ধর্ম্মকর্ম্মের—গুরুতর দায়িত্ব ও কঠিন ঋণজাল এড়াইতে পারি না। তখন দেখি—"আমি সবাকার, সবাই আমার, বিশ্ব আমার আপন। জগতের সুখ, জগতের আশা, যত ভালবাসা,—সকলের ভাগী এ অধম জন।" তখনই মিছে মায়া নিদ্রাবেশ কাটিয়া গিয়া,—দিব্য দৃষ্টি লাভ করিয়া, ভারতযুদ্ধক্ষেত্রে অর্জ্জুনের মত, ভগবদ্দেহে নিখিল বিশ্বের অনন্ত সম্বন্ধ সকলকে যুগপৎ একস্থ ও পৃথক্‌ভূত প্রত্যক্ষ করিয়া কৃতার্থ হই।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

কৃষ্ণকান্তের উইল।

(সমালোচনা)

কালিদাস তাঁহার জগৎপূজ্য কাব্যের নাম রাখিয়াছিলেন "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্"। সে কাব্যের প্রধান চিত্র শকুন্তলা, কবি কেবল শকুন্তলার নামানুসারে কাব্যের নামকরণ না করিয়া, তাহার সহিত "অভিজ্ঞান" শব্দের সংযোগ করিয়া দিয়াছেন। এ সংযোগের বিশেষ সার্থকতা আছে; এই শ্রেণীর কবিগণ কখনও নিরর্থক ভাষা

ব্যবহার করেন না। অভিজ্ঞান-অঙ্গুরীয়ের সহিত দুর্ব্বাসার শাপ সংযুক্ত করিয়া, কবি যে অপূর্ব্ব কৌশলের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার দ্বারা কেবল তিনি অস্বাভাবিককে সম্ভবপর করিয়া তুলিয়াছেন এরূপ নহে, এই কৌশলই তাঁহার দুষ্যন্তচরিত্রের গৌরব রক্ষার উপায় স্বরূপ হইয়াছে ; অঙ্গুরীয়ের অবর্ত্তমানে দুষ্যন্ত যেরূপ, যাহা ভুলিবার নহে তাহা ভুলিয়া, শকুন্তলাপ্রত্যাখ্যানে, নিজের পবিত্রতার প্রমাণ প্রদর্শন করিলেন, অঙ্গুরীয়ের পুনরাবির্ভাবে, সেই প্রত্যাখ্যানজনিত মনোবেদনার তীব্রতার দ্বারা, তিনি সেইরূপ তাঁহার শকুন্তলা প্রেমের প্রকৃতত্ব সংস্থাপন করিয়া, সেই প্রকৃতত্বহেতুই যৌবনের লালসাজড়িত প্রথম প্রণয়কে, পরিণত বয়সে, নির্ম্মল অপত্যস্নেহের ভিতর দিয়া, শান্ত-আকারে, সম্ভোগ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। অতএব, দেখা যাইতেছে, অভিজ্ঞান-অঙ্গুরীয় কাব্যের প্রধান পাত্রদ্বয়ের সুখ দুঃখের সহিত কম সম্বন্ধবিশিষ্ট নহে, এবং ইহা দুষ্যন্ত-চরিত্রের বিকশন কল্পেও কল্যোপধায়ক।

বঙ্গের কবিও, তাঁহার কাব্যশীর্ষে, "কৃষ্ণকান্তের উইল" নাম অল্পার্থে ব্যবহার করেন নাই, কৃষ্ণকান্ত রায় গল্পগঠনের মেরুদণ্ডস্বরূপ নহে, তাঁহার কাব্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের ভাগ্যবিপর্য্যয়ে, এই উইল কম আধিপত্য প্রকাশ করে নাই। ইহা তাঁহার পাত্রগণের চরিত্র প্রকটনেও বিশেষ সহায়তা করিয়াছে।—কৃষ্ণকান্ত রায় ও তাঁহার কনিষ্ঠ রামকান্ত রায়ে মহা সম্প্রীতি ছিল, উভয়ের একমালি বিষয় সমস্তই জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণকান্তের নামে ক্রীত হইয়াছিল, ভ্রাতার ন্যায়নিষ্ঠায় রামকান্তের বিন্দুমাত্রও সন্দেহ না থাকিলেও, পুত্র গোবিন্দলাল জন্ম গ্রহণ করিলে, ভ্রাতুষ্পুত্রদিগের সহিত কোনরূপ গোলযোগ না ঘটে এই মানসে, বিষয় সম্বন্ধে একটা লেখাপড়া করিয়া লইবার তাঁহার অভিলাষ জন্মিয়াছিল। ভ্রাতার নিকট সে প্রস্তাব করিবার সাহস হইবার পূর্ব্বেই, রামকান্ত পরলোক গমন করিলেন। পরলোক গমন করিয়াও যদি মানুষের আত্মা এ পৃথিবীর কার্য্যকলাপ দেখিতে বাসনা করে, বা দেখিয়া থাকে, তবে রামকান্তের আত্মা দেখিয়াছে, এবং সমস্ত জগৎ-সংসার দেখিয়াছে —রামকান্তের মৃত্যুর পর, কৃষ্ণকান্ত, স্বার্থের বশীভূত হইয়া, ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি অন্যায়াচরণে প্রবৃত্ত হন নাই, তাঁহার কৃত উইল জগৎ-সংসারের নিকট সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে, কৃষ্ণকান্ত রায় সে কালের একান্নবর্ত্তী পরিবারের কর্ত্তৃপদের অযোগ্য ছিলেন না ; কেবল তাহাই নহে, এ উইলে হরলালের অংশ নির্দ্ধারণে কৃষ্ণকান্তচরিত্রের দৃঢ়তাও প্রদর্শিত হইয়াছে। আধুনিক যুগের পূর্ব্বে বা প্রারম্ভ কালে এই শ্রেণীর লোক যত দৃষ্টিগোচর হইত বলিয়া শুনা যায় অধুনা তত হয় না।—কৃষ্ণকান্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র হরলাল, সে কালের পিতার পুত্র হইলেও, এ কালের ছেলে, ত্যাজ্য পুত্র হইবার যোগ্য, তাহা সে প্রকৃত উইলের স্থলে জাল উইল সংস্থাপনের চেষ্টায় প্রমাণ করিয়াছে ; কেবল তাহাই নহে, হরলালের এই স্বার্থময় চেষ্টায়, ব্রহ্মানন্দের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, এবং এই উইল-পরিবর্ত্তন-ব্যাপারেও কবি কেবল তাঁহার

রোহিণী-চিত্রের প্রথম বর্ণপাত করেন নাই, ইহাতে রোহিণী, গোবিন্দলালের প্রতি প্রণয় প্রদর্শনের সুবিধা পাইয়া গোবিন্দলালের অধঃপতন ও ভ্রমরের অদৃষ্টভঙ্গের সূত্রপাত করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছে আবার ভ্রমর গোবিন্দলালের সুখদুঃখের সহিতও, কবি লোক শিক্ষার জন্য যে চিত্র অঙ্কিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহার বিকসন সম্পর্কেও, এ উইল-পত্রেরকম সম্বন্ধ নহে। কৃষ্ণকান্ত রায়, গোবিন্দলালের চরিত্র সংশোধনাভিপ্রায়ে, মৃত্যুকালের পূর্ব্বে উইল পরিবর্ত্তন করিয়া, সম্পত্তি গোবিন্দলালের স্ত্রী ভ্রমরকে লিখিয়া দিয়া গেলেন, কুমতি গোবিন্দলালের হৃদয়ে তাহাতে অভিমান উপজাত করিয়া তাঁহার স্বকীয় অধঃপতনের ও সেই সঙ্গে, ইহজগতে ভ্রমরের সর্ব্বস্ব বিলোপের, সহায়তা করিল। আর সেই কারণেই, সেইরূপ অভিমানের বশীভূতা হইয়াই, গোবিন্দলালের মাতা পুত্র ও পুত্রবধূর মঙ্গল সাধন চেষ্টায় বিরত হইলেন। তাই বলিতেছিলাম অল্লার্থে এই কাব্যের শিরোনাম "কৃষ্ণকান্তের উইল" হয় নাই।

প্রতিভাশালী লেখকের লেখা হইতে উপদেশ সংগ্রহ প্রায় সর্ব্বত্রই করা যাইতে পারে। কন্তু লোক শিক্ষার উদ্দেশ্যে কাব্য প্রণয়ন ভিন্ন কথা। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার প্রথমরচিত আখ্যায়িকাত্রয়,—দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, ও মৃণালিনী—এরূপ কোন উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া, লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। আখ্যায়িকা লিখনে নৈপুণ্য লাভই প্রথম কাব্যত্রয় রচনায় উদ্দেশ্য বলিয়া বুঝা যায়। তাঁহার দুর্গেশনন্দিনী বিদেশীয় আদর্শে গঠিত, কপালকুণ্ডলার আদর্শ স্বদেশের সংস্কৃত সাহিত্যে, আর তৃতীয় কাব্য মৃণালিনীই বোধ হয় তাঁহার প্রথম স্বাধীন চেষ্টা। এই সময়কে, আখ্যায়িকা কাব্য রচনায় তাঁহার শিক্ষা বা অনুশীলন-কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, যদিও অনুশীলন সময়ের অপরিপক্কতা, উদ্ভাবনশক্তির অভাব, বা আখ্যায়িকা-প্রণয়ন-ক্ষমতার স্বল্পতা, এই তিন কাব্যে কিছু পরিলক্ষিত হয় না। তাঁহার আখ্যায়িকা-কাব্য-প্রণয়ন প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ প্রথম তাঁহার বিষবৃক্ষে, সে প্রতিভা যে তাঁহার নিজস্ব ও স্বাভাবিক, অনুকরণার্জ্জিত নহে, এই কাব্যেই তাহা প্রথম বিশেষ রূপে প্রতীয়মান এবং এই কাব্যেই তাঁহার লোকশিক্ষার অভিপ্রায় প্রথম প্রকাশমান দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার পরবর্ত্তী কাব্যগুলির, "দেবী চৌধুরাণী," "সীতারাম" প্রভৃতির শিক্ষা উচ্চতর এবং ভিন্ন প্রকৃতির। কবির ক্ষমতার ক্রমবিকাশও অতি সুন্দর ও শিক্ষাপ্রদ; সোপান পরম্পরা অবলম্বন করিয়া সে ক্ষমতা ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়াছে, উচ্চ হইতে উচ্চতর উদ্দেশ্যের সংসাধনে তাহার পরিণতি দেখিতে পাওয়া যায়। অনুশীলন দ্বারা স্বীয় ক্ষমতা সম্বন্ধে নিশ্চয়তা লাভ করিয়া, কবি মানুষের সামাজিক জীবনের মঙ্গল সাধনাভিপ্রায়ে লোকশিক্ষায় অগ্রসর হইয়াছেন, এবং পরিশেষে মানুষের উচ্চতর কর্ত্তব্য সাধনের পথে নায়কতা অবলম্বন করিয়া, তাঁহার ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতার সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন। তাঁহার "বিষবৃক্ষ"

"চন্দ্রশেখর", "কৃষ্ণকান্তের উইল", তিন খানি কাব্যই লোকশিক্ষার অভিপ্রায়ে বিরচিত এবং তিনেরই মূলগত শিক্ষা একই প্রকারের। সুতরাং "কৃষ্ণকান্তের উইল" বুঝিতে হইলে, এই তিনখানি কাব্যই একত্রে বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। এই কাব্যত্রয়ে কবি বাঙ্গালির প্রকৃত জীবন চিত্রিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, প্রথম দুই খানিতে, কমনীয় কল্পনার সহায়তায়, সে প্রকৃত জীবনকে প্রকৃতাপেক্ষা অধিকতর রমণীয় অথচ সম্ভবপর আকারে গঠিত করিয়া, আদর্শ সংস্থাপনে চেষ্টিত হইয়াছেন, এবং সে আদর্শের বিরোধী ঘটনাবলীর সমাবেশ করিয়া, তাহার পূর্ণতার সাময়িক অভাবের আবির্ভাব করতঃ, লোকশিক্ষার উপায়োদ্ভাবন করিয়াছেন, কৃষ্ণকান্তের উইলে, কল্পনার সাহচর্য্য অনেক পরিমাণে পরিত্যাগ করিয়া, অধিকতর প্রকৃত জীবনের নিম্ন ভূমিতে অবতরণপূর্ব্বক দেখাইয়াছেন, প্রকৃত সুখ ও চিত্তসংযম কিরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ বিশিষ্ট, চিত্তসংযমের অভাবে, মর্ত্তের প্রাবল্যে, স্বর্গের আদর্শও কিরূপে ভাঙ্গিয়া যায়। কৃষ্ণকান্তের উইলে, কবি, স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের একত্র সমাবেশ করিয়া দেখাইয়াছেন এতদুভয়ে প্রভেদ কি, শিখাইয়াছেন চিত্তসংযম ব্যতিরেকে স্বর্গসুখে অধিকার জন্মে না, এবং চিত্তসংযমের অভাবে স্বর্গসুখ অধিকৃত হইলেও, তাহা হইতে বিচ্যুত হইতে হয়। কেবল তাহাই নহে, সে বিচ্যুতি কেবল সে উচ্চ সুখের অবসানে অবশেষিত হয় না, মানুষকে পথের ভিখারী করিয়া রাখিয়া যায়, ইহ সংসার মানুষের পক্ষে বিষতুল্য হইয়া উঠে, তখন মানুষ ইহ জীবনের সকল সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, দিশাহারা হইয়া, শান্তির জন্য ঘুড়িয়া বেড়ায়, বুঝিতে পারে, ইহ সংসার পরিত্যাগ করত এক ভগবৎ পাদপদ্মে মনঃস্থাপন ব্যতীত সে শান্তির আশা কম। বিষবৃক্ষে কবি যে লোকশিক্ষার অনুষ্ঠান করিয়াছেন, কৃষ্ণকান্তের উইলে তাহা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছে। বিষবৃক্ষে কুন্দনন্দিনীর রূপমোহে নগেন্দ্রনাথের চিত্তশাসন ক্ষমতার সাময়িক অভাব হইয়া থাকিলেও তিনি কখনও তাঁহার চিত্তবৃত্তির সমর্থন করেন নাই, আদ্যোপান্ত আত্মানাদর ও অনুতাপে এবং প্রবল চিত্তবৃত্তির সহিত নিরন্তর সংগ্রামে, কালাতিপাত করিয়াছেন, তাঁহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত পাপের সঞ্চার হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল, তাই তিনি অত শীঘ্র চিত্তবৃত্তির সামঞ্জস্য পুনর্লাভ করিয়া ভগ্নোন্মুখ সুখের সংসারের পুনর্গঠনে সমর্থ হইলেন, অল্প প্রায়শ্চিত্তেই তাঁহার পাপের ফলের অবসান হইল। উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার সামাজিক ভাবে গুরুতর পাপ মধ্যে পরিগণিত হইলেও চন্দ্রশেখরে শৈবলিনীর সে উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য সমাজ কতক পরিমাণে দায়ী এবং সে উচ্ছৃঙ্খলতাজনিত শৈবলিনীর অপরাধের কথা ভাবিতে গেলে প্রতাপও শৈবলিনীর বাল্যের সে অতি স্বাভাবিক বিশুদ্ধ প্রেমানুরাগের কথা মনে আসিয়া সে অপরাধকে অনেক পরিমাণে লঘু করিয়া ফেলে। তথাপি সমাজের মঙ্গলকল্পে সকল অবস্থাতেই চিত্তসংযম অপরিহার্য্য এবং একান্ত কর্ত্তব্য, এবং তাহার অভাবজনিত পাপকে সমাজ ক্ষমার চক্ষে

দেখিতে অক্ষম, তাই কবি শৈবলিনীর সে অপরাধের কঠোর প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিয়া শৈবলিনীর স্বেচ্ছাচারে যে অশান্তি ও অমঙ্গলের সংঘটন ঘটিয়াছিল তাহার নিরাকরণ করিয়াছেন, নিরাকরণ করিয়া তাঁহার আদর্শ সৃষ্টির সৌন্দর্য্যবর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু রোহিনী গোবিন্দলালের সমাজ প্রতিকূলতার অনুকূলে কিছু বলিবার নাই। রোহিনী ব্যভিচারিণী, গোবিন্দলাল সে ব্যভিচারিণীর সংসর্গে গমন করিয়া, হেলায় আপনার দেবতুল্য চরিত্রকে কলুষিত করিলেন; নগেন্দ্রনাথ সমাজধর্ম্ম রক্ষার জন্য কুন্দনন্দিনীকে পরিণীতা ভার্য্যা করিয়া লইয়াছিলেন, গোবিন্দলাল সমাজের প্রতি ততটুকু সম্মানও দেখাইলেন না। গোবিন্দলাল রোহিণীর রূপে মুগ্ধ হইয়া, রূপলালসাভুক্ত অনুরাগপ্রাবল্যে অস্থিরচিত্ত হইয়া, চরিত্র রক্ষার জন্য ঈশ্বর সমীপে শক্তি ভিক্ষা করিয়াছিলেন সত্য, রোহিনী হইতে দূরে থাকিয়া যদি সে মোহ অপসারিত করিতে পারেন, সে চেষ্টাও কতক পরিমাণে হইয়াছিল, এবং দুই এক কথায় আপনার অধঃপতন জন্য অনুতাপও প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে চরিত্র রক্ষার জন্য, নগেন্দ্রনাথের ন্যায়, নিরন্তর ধারাবাহিক, সর্ব্বান্তঃকরণ সংযুক্ত যত্ন বা পাপপ্রবৃত্তির সহিত সংগ্রামের কিছুই বুঝায় না, বরং তিনি অতি পামরের ন্যায় আপনার নিরপরাধিনী পতিমাত্রজীবিকা সহধর্ম্মিনীর উপর অন্যায় ক্রোধ ও দোষারোপ করিয়া, নিজের কুপথ গমনের সমর্থন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, গোবিন্দলালের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত নাই, ইহ জীবনে শান্তি পুনর্লাভের সম্ভাবনা তাঁহার ছিল না, তাই তাঁহাকে ইহ সংসার পরিত্যাগ করিয়া, সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বনে ভগবৎ পাদপদ্মে মনঃস্থাপন করিয়া শান্তির অনুসন্ধান করিতে হইয়াছে। সকল সুখের, সকল কল্যাণের আকর, জীবের কল্যাণের জন্য, সুখশান্তির জন্য, যে সকল উপায় করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাকর্ত্তৃক যে সকল সুখসামগ্রী আয়োজিত হইয়া রহিয়াছে, তাহার উপভোগে তাঁহাকে আমরা ক্ষণমাত্র বিস্মৃত হইলেও, আমরা তাঁহার সুখের সংসার ভোগ করিবার অধিকারে বঞ্চিত হই। তাই বুঝি, হিন্দু শাস্ত্রকারগণ হিন্দু সমাজ নিয়ন্তাগণ, আহারে বিহারে, শয়নে স্বপনে, সর্ব্বত্র সর্ব্ব কাজে, ঈশ্বরকে স্মরণ করিবার শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

বিষবৃক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র প্রেমানুরাগের শ্রেণীবিভাগ বা প্রকৃত প্রণয়ের প্রকৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন।—"প্রেম বুদ্ধিবৃত্তিমূলক। প্রণয়াস্পদ ব্যক্তির গুণ সকল যখন বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা পরিগৃহীত হয় হৃদয় সেই সকল গুণে মুগ্ধ হইয়া তৎপ্রতি সমাকৃষ্ট এবং সঞ্চালিত হয়, তখন সেই গুণাধারের সংসর্গলিপ্সা এবং তৎপ্রতি ভক্তি জন্মে। ইহার ফল সহৃদয়তা এবং পরিণামে আত্মবিস্মৃতি ও আত্মবিসর্জ্জন।" ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের মতে প্রকৃত প্রেমানুরাগ; প্রকৃত ভালবাসা, তাঁহার মতে, অন্যের সুখের জন্য আত্মসুখ বিসর্জ্জনে স্বতঃ প্রবৃত্তি। রূপানুরাগকে তিনি প্রকৃত প্রণয় বলিয়া স্বীকার করেন না, তাহা সাময়িক মোহ মাত্র, তাহা ভোগলালসা সমন্বিত বা সম্ভাবিত, তাহা গুণজ প্রণয়ের ন্যায় চিরস্থায়ী নহে। গুণজ প্রণয় রূপজ

প্রণয়াপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর সত্য, কিন্তু মানবহৃদয়ে রূপানুরাগের আধিপত্য কম নহে. এবং রূপানুরাগের মুগ্ধকরী শক্তিও অসীম, কবি এ কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন এবং প্রণয়ের প্রকারভেদের চিত্রাঙ্কনে সিদ্ধহস্ত কবি তাঁহার সুরচিত কাব্যে রূপানুরাগের ছবি কম সন্নিবেশিত করেন নাই। মূলতঃ রূপানুরাগ সম্ভোগলালসাসম্ভূত হইতে পারে, এবং অস্থায়িত্বও হয়ত ইহার প্রকৃতিগত লক্ষণ; কিন্তু সকল স্থলেই যে রূপানুরাগের এই সকল লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় এরূপ বলা যায় না। দুষ্যন্তের শকুন্তলা-প্রণয় কবি তাহার প্রথম বিকাশে লালসাজড়িত করিয়া চিত্রিত করিয়া থাকিলেও, অঙ্গুরীর পুনর্দ্দর্শনে নরপতির শকুন্তলা প্রত্যাখ্যান জনিত অনুতাপ ও অপ্সরস্তীর্থে দাম্পত্য সম্বন্ধে পুনর্মিলন তাহার প্রকৃতত্ব এবং স্থায়িত্ব প্রমাণ করিতেছে। পার্ব্বতীর রূপদর্শনে স্বয়ং মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ যদিও রূপানুরাগ ও সম্ভোগস্পৃহার পরিষ্কার দৃষ্টান্ত, তথাপি, নীলকণ্ঠ যখন, বিনা-নিমন্ত্রণে দক্ষযজ্ঞে গমনোদ্যতা দাক্ষায়ণীকে নিষেধ করিয়া, সতীর দেহত্যাগ সম্ভাবিতস্থলে বলিতেছেন,—"আমার বড় আশঙ্কা হইতেছে, তুমি এ যজ্ঞে গমন করিলে, আমি তোমার যে মুখকান্তি দর্শনে কণ্ঠে হলাহল ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছি, সে মুখকান্তি আর দেখিতে পাইব না—"তখন আর নীলকণ্ঠের সে রূপানুরাগে অন্য ভাব কিছু দেখিতে পাই না। কবির নিজের সৃষ্টি চন্দ্রশেখরে শৈবলিনীপ্রেমও রূপানুরাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, কিন্তু সে মহৎ চিত্রে সর্ব্বপ্রকারেই মহত্ব ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না, বরং জ্ঞানপিপাসুর জ্ঞানার্জ্জন-বৃত্তি অন্তরায় রূপে তাহার সম্ভোগ স্পৃহার পথবর্ত্তিনী হইয়াছে বলিয়াই বুঝা যায়। তবে রূপানুরাগের প্রকারভেদ আছে, আকার-বিশেষে তাহা কেবল ভোগলিপ্সার নামান্তর-মাত্র এবং ভোগে তৃপ্তির সহিত তাহার অবসান। এই শ্রেণীর রূপানুরাগকে প্রেমানুরাগ বা ভালবাসা নাম দিলেও তাহা নীচ প্রকৃতির ভালবাসা এবং তাহার ফল ও পরিণাম বিষময়। এই কথা পরিষ্কার করিবার জন্যই আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রেমানুরাগের ব্যাখ্যার এই ক্ষুদ্র সমালোচনার অবতারণ করিলাম, অন্যথা ইহা অপ্রাসঙ্গিক বিবেচিত হইতে পারিত! কৃষ্ণকান্তের উইলে, রোহিনী-গোবিন্দলালের রূপানুরাগ এই শ্রেণীর, এই জঘন্য প্রকৃতির এবং ইহার ভয়ঙ্কর ও শোচনীয় পরিণাম যাহা তাহা কবি অতি উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। এই স্থলে পরিণয়াবদ্ধ স্ত্রীপুরুষকে পরস্পরের সহায় করিয়া স্ত্রীপুরুষযোগকে পবিত্রতার সম্বন্ধরূপে সংস্থাপন করতঃ যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলতার নিবারণোপায়স্বরূপ, হিন্দুসমাজনিয়ন্তাগণ সমাজের সুখশান্তির যে অভূতপূর্ব্ব অনন্যানুষ্ঠিত ভিত্তি-স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রতিগমনে কি বিষময় ফলের, কি ভয়ঙ্কর অশান্তির উৎপত্তি হয়, তাহা দেখাইবার উদ্দেশ্যে কবি স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের ছবি পরস্পরের পার্শ্বে সংস্থাপিত করিয়া, প্রকৃতি বৈপরিত্যে উভয় চিত্র উজ্জ্বল করিবার চেষ্টায়, অনন্যলব্ধ ফললাভ করিয়াছেন।

রোহিনী মর্ত্ত্য, ভ্রমর স্বর্গ, গোবিন্দলালের স্বর্গ ক্ষীণ ভিত্তির উপর নির্ম্মিত বলিয়া

সে ভিত্তির গঠন সামগ্রী মধ্যে চিত্ত সংযম ক্ষমতার অভাবহেতু, তাহা মর্ত্ত্যের সংঘর্ষে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। রোহিনীকে কবি সর্ব্বাঙ্গীন মর্ত্ত্যের ছবি করিয়াই আঁকিয়াছেন, তাহার চরিত্রে কবি এরূপ বর্ণপাত কিছু করেন নাই যাহাতে, মর্ত্ত্যের ভিন্ন, উচ্চতর কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। রোহিনী-চিত্রের প্রারম্ভেই কবি এক স্থলে বলিতেছেন :—

"বাবুদের একটা বড় পুকুর আছে—নাম বারুণী—জল তার বড় মিঠা—রোহিনী সেই খানে জল আনিতে যাইত, আজও যাইতেছিল। রোহিনী একা জল আনিতে যায়—দল বাঁধিয়া যত হাল্‌কা মেয়ের সঙ্গে হাল্‌কা হাসি হাসিতে হাসিতে হাল্‌কা কলসীতে হাল্‌কা জল আনিতে যাওয়া রোহিনীর অভ্যাস নহে। রোহিনীর কলসী ভারি, চালচলনও ভারি। তবে রোহিনী বিধবা। কিন্তু বিধবার মত কিছু রকম নাই। অধরে পানের রাগ, হাতে বালা, ফিতাপেড়ে ধূতি পরা, আর কাঁধের উপর চারুবিনির্ম্মিতা কালভুজঙ্গিনীতুল্যা কুণ্ডলীকৃতা দোলায়মানা মনোমোহিনী কবরী। পিতলের কলসী কক্ষে; চলনের দোলনে, ধীরে ধীরে সে কলসী নাচিতেছে—যেমন তরঙ্গে তরঙ্গে হংসী নাচে, সেইরূপ ধীরে ধীরে গা দোলাইয়া কলসী নাচিতেছে। চরণ দুইখানি আস্তে আস্তে বৃক্ষচ্যুত পুষ্পের মত মৃদু মৃদু মাটিতে পড়িতেছিল—অমনি সে রসের কলসী তালে তালে নাচিতেছিল। হেলিয়া দুলিয়া পালভরা জাহাজের মত ঠমকে ঠমকে, চমকে চমকে, রোহিনী সুন্দরী সরোবরপথ আলো করিয়া জল লইতে আসিতেছিল—এমন সময়ে বকুলের ডালে বসিয়া বসন্তের কোকিল ডাকিল—'কুহুঃ! কুহুঃ! কুহুঃ!'

"রোহিনী চারিদিক্ চাহিয়া দেখিল। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, রোহিনীর সেই ঊর্দ্ধবিক্ষিপ্ত স্পন্দিত বিলোল কটাক্ষ, ডালে বসিয়া যদি সে কোকিল দেখিতে পাইত, তবে সে তখনই—ক্ষুদ্র পাখি জাতি—তখনই সে সে শরে বিদ্ধ হইয়া উলটিপালটি খাইয়া, পা গোটো করিয়া, ঝুপ করিয়া পড়িয়া যাইত। * * * * * * * মূর্খ পাখী আবার ডাকিল—'কুহু! কুহু! কুহু!'

"'দূর হ! কালামুখো!' বলিয়া রোহিনী চলিয়া গেল। চলিয়া গেল, কিন্তু কোকিলকে ভুলিল না। আমাদের দৃঢ়তর বিশ্বাস এই যে, কোকিল অসময়ে ডাকিয়াছিল। গরিব বিধবা যুবতী, একা জল আনিতে যাইতেছিল, তখন ডাকাটা ভাল হয় নাই। কেন না কোকিলের ডাক শুনিলে কতকগুলি বিশ্রী কথা মনে পড়ে; কি যেন হারাইয়াছি, যেন তাই হারানতে জীবনসর্ব্বস্ব অসার হইয়া পড়িয়া আছে—যেন তাহা আর পাইব না। যেন কি নাই, কি যেন হইল না, কি যেন পাইব না। কোথায় যেন রত্ন হারাইয়াছি—কে যেন কাঁদিতেছে ডাকিতেছে। যেন এ জীবন বৃথায় গেল—সুখের মাত্রা যেন পূরিল না—যেন এ সংসারের অনন্ত সৌন্দর্য্য কিছুই ভোগ করা হইল না।

"আবার কুহুঃ, কুহুঃ, কুহুঃ!—রোহিনী চাহিয়া দেখিল—সুনীল অনন্ত গগন নিঃশব্দ

অথচ সেই কুহুরবের সঙ্গে, সুর বাঁধা। দেখিল—নবপ্রস্ফুটিত আম্রমুকুল—কাঞ্চন-গৌর, স্তরে স্তরে স্তরে শ্যামলপত্রে বিমিশ্রিত, শীতল সুগন্ধপরিপূর্ণ, কেবল মধুমক্ষিকা বা ভ্রমরের গুনগুনে শব্দিত, অথচ সেই কুহুরবের সঙ্গে সুর বাঁধা। দেখিল—সরোকরতীরে গোবিন্দলালের পুষ্পোদ্যান, তাহাতে ফুল ফুটিয়াছে—ঝাঁকে ঝাঁকে, লাখে লাখে, স্তবকে স্তবকে, শাখায় শাখায়, পাতায় পাতায় যেখানে সেখানে ফুল ফুটিয়াছে; কেহ শ্বেত, কেহ রক্ত, কেহ পীত, কেহ নীল, কেহ ক্ষুদ্র, কেহ বৃহৎ—কোথাও মৌমাছি, কোথাও ভ্রমর—সেই কুহুরবের সঙ্গে সুর বাঁধা, বাতাসের সঙ্গে তাহার গন্ধ আসিতেছে—ঐ পঞ্চমে বাঁধা সুরে। আর সেই কুসুমিত কুঞ্জবনে, ছায়াতলে দাঁড়াইয়া গোবিন্দলাল নিজে।—তাঁহার অতি নিবিড় কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশদাম চক্র ধরিয়া তাঁহার চম্পকরাজি নির্ম্মিত স্কন্ধোপরে পড়িয়াছে—কুসুমিত বৃক্ষাধিক সুন্দর সেই উন্নত দেহের উপর এক কুসুমিতা লতার শাখা আসিয়া দুলিতেছে—কি সুর মিলিল! এও সেই কুহুরবের সঙ্গে পঞ্চমে বাঁধা। কোকিল আবার এক অশোকের উপর হইতে ডাকিল 'কুউ'। তখন রোহিনী সরোবর সোপান অবতরণ করিতেছিল। রোহিনী সোপান অবতীর্ণ হইয়া, কলসী জলে ভাসাইয়া দিয়া কাঁদিতে বসিল।”

কি সুন্দর, আশ্চর্য্য, অসাধারণ লিপিনৈপুণ্য! কি অভূতপূর্ব্ব বর্ণনাকৌশল! রোহিনী-চিত্রের সম্পূর্ণতা ইহাতেই বিদ্যমান —রোহিনীর হাব ভাব, রোহিনীর হৃদয়, রোহিনীর প্রকৃতি, রোহিনী-চরিত্রের সম্ভাবনা এবং যে প্রাকৃতিক অবস্থায়, বাহ্য প্রকৃতির যে প্রভাবপ্রাবল্যে, সে সম্ভাবনার প্রকৃতে পরিণতি, কবি তত্তাবৎ তাঁহার দেবদত্ত ক্ষমতার বলে, এই সংক্ষিপ্ত অথচ সমগ্র বর্ণনা মধ্যে সন্নিবিষ্ট ও স্ফুটমান করিয়াছেন। রোহিনী জীবনের পরবর্ত্তী কার্য্য বা ঘটনাবলি এই চিত্রের বিকাশ বা ব্যাখ্যা মাত্র।

উপরি-উদ্ধৃত কবি লিপি হইতে রোহিনী সম্বন্ধে আমরা আর একটী কথা এই বুঝিতে পারি যে রোহিনী প্রকৃতির প্রভাব অতি সহজে অনুভব করিত। রোহিনী চরিত্র বুঝিতে হইলে, আমাদিগকে, অনেক পরিমাণে তাহার অনুভূতির দিকে দৃষ্টি করিতে হইবে।

বসন্তের কোকিল চিরদিনই ডাকে, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য সকলেরই দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু কোকিলের সে কুহু রব এবং বাসন্তিক প্রকৃতির সে মনোরম শোভা রোহিনীর মনে যে বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিল তাহার সমাবস্থাপন্না সকলে মনেই সেরূপ বিপ্লব উপস্থিত করে না। তাহার এক কারণ, সকল মনের অনুভূতি সমান নহে; আর এক কারণ, যাহারা ধর্ম্মজ্ঞানে মনকে সংযত রাখিতে অভ্যস্ত তাহারা বাহ্যজগতের প্রভাব অনুভব করিলেও, তৎক্ষণাৎ মনকে সে প্রভাব হইতে আকুঞ্চিত করিতে সমর্থ। তাহারা কেবল পাপের কার্য্য হইতে বিরত থাকিতে চেষ্টিত নহে, পাপের চিন্তাকেও তাহারা প্রশ্রয় প্রদান করে না, চিত্তকে সতত নিয়ন্ত্রিত রাখিতে তাহারা চেষ্টা করে, অথবা নিরন্তর

পবিত্র চিন্তানিরত মন সৃষ্টির সৌন্দর্য্যকে পাপচিন্তার সহিত সংযুক্ত করিতে জানে না। রোহিনী প্রবৃত্তিমূলে এ সকলকে বিলাসের সামগ্রীভাবে দেখিত, তাহার মন সেই পথেই অনুধাবিত হইত। রোহিণীর অনুভূতিও প্রবল, চিত্তদমনের শিক্ষা ও অভ্যাসও কম; অতএব বলা বাহুল্য যে রোহিণী প্রকৃতির অত্যাচারে—রোহিণীর হৃদয়ভাব, ও রোহিণীর প্রবৃত্তিকেও, আমরা প্রকৃতির অঙ্গীভূত বলিয়া পরিগণিত করিব—ক্রমে গোবিন্দলালের প্রতি প্রণয়াসক্ত হইয়া উঠিল। রোহিণীর প্রেমানুরাগের ইতিবৃত্ত কাব্যকার নিজে এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন :—

"সেই অবধি নিত্য কলসীকক্ষে রোহিণী বারুণী পুষ্করিণীতে জল আনিতে যায়; নিত্য কোকিল ডাকে, নিত্য সেই গোবিন্দলালকে পুষ্পকানন-মধ্যে দেখিতে পায়।

"যাই হউক, * * গোবিন্দলালের রূপ রোহিণীর হৃদয়পটে দিন দিন গাঢ়তর বর্ণে অঙ্কিত করিতে লাগিল। অন্ধকার চিত্রপট—উজ্জ্বল চিত্র! দিন দিন চিত্র উজ্জ্বলতর, চিত্রপট গাঢ়তর অন্ধকার হইতে লাগিল। তখন সংসার তাহার চক্ষে—যাক্, পুরাতন কথা আমার তুলিয়া কাজ নাই। রোহিণী সহসা গোবিন্দলালের প্রতি মনে মনে অতি গোপনে প্রণয়াসক্ত হইল। * * *

"কেন যে এত কালের পর তাহার এ দুর্দ্দশা হইল, তাহা আমি বুঝিতে পারি না, এবং বুঝাইতেও পারি না। এই রোহিণী এই গোবিন্দলালকে বালককাল হইতে দেখিতেছে—কখনও তাহার প্রতি রোহিণীর চিত্ত আকৃষ্ট হয় নাই। আজি হঠাৎ কেন? জানি না। যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা তাহা বলিয়াছি। সেই দুষ্ট কোকিলের ডাকাডাকি; সেই বাপীতীরে রোদন, সেই কাল, সেই স্থান, সেই চিত্তভাব, তাহার পর গোবিন্দলালের অসময়ে করুণা—আবার গোবিন্দলালের প্রতি রোহিণীর বিনাপরাধে অন্যায়াচরণ—এই সকল উপলক্ষে কিছুকাল ব্যাপিয়া গোবিন্দলাল রোহিণীর মনে স্থান পাইয়াছেন, তাহাতে কি হয় না হয়, তাহা আমি জানি না, যেমন ঘটিয়াছে, আমি তেমনই লিখিতেছি।

"রোহিণী অতি বুদ্ধিমতী, একেবারেই বুঝিল যে, মরিবার কথা। যদি গোবিন্দলাল ঘৃণাক্ষরে এ কথা জানিতে পারে তবে কখনও তাহার ছায়া মাড়াইবে না। হয় ত গ্রামের বাহির করিয়া দিবে। কাহারও কাছে এ কথা বলিবার নহে। রোহিণী অতি যত্নে, মনের কথা মনে লুকাইয়া রাখিল।

"কিন্তু যেমন লুক্কায়িত অগ্নি ভিতর হইতে দগ্ধ করিয়া আইসে, রোহিণীর চিত্ত তাহাই হইতে লাগিল। জীবনভার বহন করা রোহিণীর পক্ষে কষ্টদায়ক হইল। রোহিণী মনে মনে রাত্রিদিন মৃত্যুকামনা করিতে লাগিল।"

আমরা বলিয়াছি, কৃষ্ণকান্তের উইলে, কবি কল্পনার শিখর হইতে প্রকৃত জীবনের নিম্নতর ভূমিতে অবতরণ করিয়া, সংসারের চিত্র অঙ্কিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সংসারে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ অতি জটিল, মনুষ্য হৃদয় ভাবসঙ্কুল, কখন কোন্ ভাবের প্রাবল্যে মনুষ্যহৃদয় কোন্ পথে ধাবিত হয়,

বুঝিয়া উঠা সহজ নহে। বিশুদ্ধ কল্পনার সৃষ্টি বুঝিতে তত কঠিন হয় না, কেন না এরূপ সৃষ্টির প্রস্ফুটনে, তাহার সৌন্দর্য্য সম্পাদনে, যেরূপ গঠন সামগ্রী বা বর্ণপাতের আবশ্যক, কবি তাহার ব্যবহারে ইচ্ছাধীন, সংযোগ বিয়োগে তাঁহার স্বাধীনতা আছে। প্রকৃত জীবন চিত্রিত করিতে হইলে, কবি যেরূপ দেখেন সেই রূপ তাঁহাকে লিখিতে হয়, সেরূপ স্থলে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ বুঝিবার ভার অনেকটা পাঠকের উপর পতিত হয়। প্রকৃত জীবনের চিত্র কবিগণ যাহা দেখিতে পান সর্ব্বদা অবিকল তাহা হইতে গৃহীত হয় এরূপ নহে। কবির সৃষ্টি এরূপ স্থলেও, অনেক সময়েই, কল্পনার সাহায্যে গঠিত হয়। তবে প্রকৃত জীবনের জ্ঞান, এরূপ স্থলে, কবি কল্পনাকে সীমা প্রদান করে। চিত্র কল্পিত হইলেও, প্রকৃত জীবনের প্রতিকল্প তাহাতে আবশ্যক। গতিকেই, প্রকৃত জীবনে মানুষের কার্য্যের কারণনির্দ্দেশ করা সর্ব্বত্র যেমন সহজ নহে, কবিকৃত প্রকৃত জীবনের চিত্রও সেইরূপ সকল স্থানে বুঝিয়া উঠা আয়াস সাধ্য। এক দিকে, যেমন, একই কার্য্য বিভিন্ন প্রবৃত্তিমূলে সংঘটিত হয় বলিয়া তাহার কারণ নির্দ্ধারণে ভ্রমের সম্ভাবনা, অন্য দিকে, সেইরূপ, সংসারে সকল কার্য্য সকল লোকে একই ভাবে না বুঝিয়া, বিভিন্নাবস্থায়, বিভিন্ন লোকে, বিভিন্ন বুদ্ধিতে, একই কার্য্য বিভিন্ন কারণে সংযুক্ত করিয়া দেখে বলিয়া, এ কার্য্যকারণ সম্বন্ধ অধিকতর জটিল হইয়া উঠে। কবি ইচ্ছা করিলে তাঁহার রচিত চিত্রে এ সম্বন্ধ পরিষ্কার রাখিতে পারেন, কিন্তু কাব্যে সংসারের ভাব-রক্ষার অভিপ্রায়ে যদি তিনি অন্যরূপ ইচ্ছা করেন, তাহাতেও তাঁহার স্বাধীনতা আছে। আমাদের বোধ হয় বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কৃষ্ণ-কান্তের উইলে সংসারের এই ইন্দ্রজাল কতক পরিমাণে প্রতিকল্পিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাই তাঁহার প্রধান পাত্রত্রয়ের প্রত্যেকেরই চরিত্র স্থানে স্থানে বুঝিতে অল্পাধিক কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। চিত্র-ত্রয়ের স্থূলরেখা নিচয় দৃষ্টিগোচর করিতে সময়ক্ষেপ করিতে হয় না, অন্যথা কবির অভিপ্রেত শিক্ষার কার্য্য সম্পাদিত হইতে ব্যাঘাতের উৎপত্তি হইত। কিন্তু স্থানে স্থানে কবি যেরূপে তুলিকাসংযোগ করিয়াছেন, তাহাতে যেন কিছু অস্পষ্টতার উদ্ভব হইয়াছে। অথবা তিনি ঘটনাবলি বিবৃত করিয়া বুঝিবার ভার পাঠকের উপর রাখিয়াছেন।

(ক্রমশ)

শ্রীলোকনাথ চক্রবর্ত্তী।

মন্বন্তরে মালগুজারি।

While the country every year became a more total waste, the English Government constantly demanded an increased land tax—W. W. Hunter.

বাঙ্‌লায় যখন কাল মন্বন্তর বিরাজ করিতেছিল তখন কোম্পানী বাহাদুর বাঙ্‌লার দেওয়ানী সনন্দ লাভ করিয়া কেবল ৪।৫ বৎসর কাটাইয়াছেন। তখনো কোম্পানীর রাজস্ব আদায়ের কোন সুব্যবস্থা প্রচলিত হয় নাই। প্রত্যেক জমীদারী প্রত্যেক তালুক তখন সেকালের চিরাচরিত পূর্ব্ব প্রথা মতই সরকারের মালগুজারি দিয়া আসিতেছিল।

ইতিপূর্ব্বে বাঙ্‌লার নাজিম যাহা পারিতেন জমীদারদিগের নিকট হইতে তাহা আদায় না করিয়া ছাড়িতেন না। ইংরাজের অর্থ-পিপাসা শান্ত করিবার জন্যই নবাবকে অনেক সময় বাধ্য হইয়া প্রজাপীড়ন করিতে হইত। * জমীদারগণ সে পীড়া সহ্য করিতেন বটে কিন্তু প্রজাদিগের শোণিত শোষণ করিয়া নবাবকে তুষ্ট করিতেন এবং নিজেরাও লাভবান্ হইতেন। নাজিম এবং জমীদার অথবা জমীদার ও প্রজার মধ্যবর্ত্তী মুৎসুদ্দীগণ সকল সময়েই আপন আপন প্রাপ্য বুঝিয়া লইতেন। এইরূপে দেশের অর্থে সকলেরই পেট ভরিত, কেবল রোদন করিয়া মরিত রামধন ও মবারক।

রাজস্ব আদায়ের এই সকল আলেখ্য সম্মুখে রাখিয়া কোম্পানী বাহাদুর স্বয়ং নিজামতী গ্রহণ করিলেন। তখন ভূমিকর ছাড়াও দেশে ষড়বিংশ প্রকারের কর প্রচলিত ছিল—তখন সরকার বাহাদুর বাঙালীদিগকে 'গুলিখোর' বানাইয়া অহিফেন প্রভৃতির উপর কর আদায় করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, হিন্দুর দেবমন্দিরও সরকারের সিন্দুক পূর্ণ করিবার সহায়তা করিয়াছিল। উপযুক্ত স্থানে এ কাহিনী বর্ণিত হইবে।

কোম্পানীর আমলেও জমীদারগণ তাঁহাদিগের অধীনস্থ প্রজাদিগের নিকট হইতে যথাসাধ্য আদায় করিয়া লইতেছিলেন। সরকার বাহাদুর যতদিন যথারীতি রাজস্ব পাইতেছিলেন ততদিন জমীদারদিগের প্রাপ্যের কোন বিঘ্ন ঘটান নাই। কোন ভূম্যধিকারী আপন দেয় রাজস্ব পরিশোধ করিতে না পারিলে তাঁহাকে কারারুদ্ধ

---

* The country was groaning under a double tyranny—the tyranny of the English, who held the power of the sword *in terrorem* over the head of the Nawab,—the tyranny of the Nawab, who was *obliged* to oppress his unfortunate subjects to the uttermost, in order to be able to satisfy the insatiable greed of the English.—Introduction to the Trial of Maharaja Nundkumar by P. Mitter Esq : Bar-at-law.

হইতে হইত—তাঁহার সম্পত্তির ভার স্বয়ং কোম্পানী বাহাদুর অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া দায়যুক্ত ভূম্যধিকারীকে অবিলম্বে চিন্তামুক্ত ও ভার মুক্ত করিয়া দিতে বিলম্ব করিতেন না! অনেকদিন পর্য্যন্ত বাঙলার এইরূপ ভীষণ অবস্থা ছিল যে অনেকেই কোম্পানীর রাজস্ব পরিশোধ করিতে না পারিয়া কারাগারে বাস করিতেন। মন্বন্তরের ত্রিংশ বর্ষ পর যখন ইংরাজ বাহাদুর বাঙলার শাসনভার যথা-রীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন তখন দেখিয়া-ছিলেন যে রাজস্ব প্রদানে অক্ষম দরিদ্র হত-ভাগ্য বঙ্গবাসীই রাজকারাগার পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে—কোনদিনই আর তাহাদিগের মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই।

কোম্পানীর রাজস্বই ইংরাজ তহশিলদার-দিগের ধ্যান জ্ঞান পরম তপঃ ছিল। যিনি উহা কিস্তিতে কিস্তিতে আদায় করিতে পারিতেন সরকারে তাঁহার প্রশংসার অবধি থাকিত না—অচিরেই তাঁহার পদোন্নতি হইত। সেকালে ইংরাজ তহশিলদারদিগের উন্নতি বা অবনতি, প্রশংসা বা নিন্দার সহিত প্রজার সুখ ও সম্পদের কোন সম্বন্ধ ছিল না। মুর্শিদাবাদের কৌন্সীল এবং কলিকাতার কর্ত্তাগণ মনে করিতেন বাঙলার জমীদারী যেন তাঁহাদিগের ইজারা মহাল—শাসন করিতে হইবে না, ভাল মন্দ কিছু বিচার করিতে হইবে না, রক্ষার কোন বন্দোবস্তের ও প্রয়োজন নাই,—এ মহালের উন্নতিই হউক আর অবনতিই হউক, যেমন দিন যাইবে অমনি কোম্পানী বাহাদুরের জীর্ণ প্যান্টালুনের বিরাট থলি দুইটা আপনা হইতেই পূর্ণ হইয়া উঠিবে! তাই, বাঙলার যে পয়সাটী সেকালে যাহা দিতে পারিত সরকার বাহাদুর নয়ন মুদ্রিত করিয়া তাহার শেষ কানা কড়িটা পর্য্যন্ত তুলিয়া লইতেন, কিন্তু দেশের জন্য অর্দ্ধ পয়সা ব্যয় করিতে হইলেই আকাশের বজ্র যেন মাথায় ভাঙ্গিয়া পড়িত!* কোম্পানী বাহাদুর যখন প্রথম দেশের রাজা হইলেন তখন কবি কালিদাসের বাণী—

> প্রজানামেব ভূত্যর্থং স তাভ্যো বলিমগ্রহীৎ
> সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুমাদত্তে হি রসং রবিঃ॥

মিথ্যা হইয়া গেল!

তখন, 'নাযায়' পরিশোধ করিতে করিতে বঙ্গের কৃষকগণ চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিল। যে সকল প্রজা মরিয়া গিয়াছে অথবা যাহারা নানা অসুবিধায় পতিত হইয়া শেষে নয়নজলে ভাসিতে ভাসিতে আপনাপন গ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছে, তাহাদিগেরই দেয় রাজস্বও জমা হইতে পারিত না! অন্য যাহারা সেই গ্রামে বাস করিত তাহাদিগকেই 'নাযায়' পরিশোধ করিতে হইত। রাম, শ্যাম, যদুর কর, হরি সিন্ধু ও সাধু 'জরু গরু, লাঙ্গল' বিক্রয় করিয়া করিয়া প্রদান করিত—না দিতে পারিলে সমস্ত জীবন ধরিয়া লৌহকারাগারের প্রাচীর বেষ্টন মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া জীবন শেষে নিজ

* It was a matter of the first importance, therefore, to get as much out of the district and to spend as little upon it, as possible.—W. W. Hunter.

অস্থি খণ্ড দিয়া কোম্পানীর ঋণ পরিশোধ করিতে হইত। * সে নাযার করেরও আবার কোন বাঁধা বাঁধি হার ছিল না—উহা তহশিলদারের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত।

বাঙলায় যখন মন্বন্তর তখন বাঙলার অর্থ সংগ্রহের ভার, ইংরাজের এবং লোক রক্ষার ভার পরমেশ্বরের এবং কিয়দংশে নবাবেরও ছিল। ইংরাজ তাই অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। বিহার যখন শ্মশান তখন তথাকার কর্ত্তা সংবাদ দিলেন—এ বৎসর দেশের অবস্থা বিবেচনায় মনে হইয়াছিল বুঝি ২৫ লক্ষের অধিক টাকা আদায় হইবে না। কিন্তু এখনই আমরা তাহার অনেক অধিক আদায় করিয়াছি এবং ভরসা করি বর্ষ শেষে প্রায় ৩৮।৩৯ লক্ষ মুদ্রা আদায় করিতে পারিব।† কার্য্যকালে কোম্পানী বাহাদুর মহানন্দে বিলাতের কর্ত্তাদিগকে জানাইয়াছিলেন—পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা মন্বন্তরের বৎসরে বিহার হইতে ৪২৫৭৪৯ মুদ্রা অধিক আদায় হইয়াছে।‡

এ দিকে মুর্শিদাবাদের খাস কামরায় বসিয়া রিল্ সাহেব লিখিলেন ঢাকা, পূর্ণিয়া ও হুগলি জেলায় সরকারের প্রাপ্য যথারীতি আদায় হইতেছে—কোন কোন স্থানে অগ্রিমও আদায় করা হইয়াছে। সুপারভাইজরগণ বলিতেছেন দুই একটী স্থান ভিন্ন এবার সকল স্থানেই নিয়মমত রাজস্ব আদায় হইবে।§ কোম্পানীর দপ্তর খুলিলেই দেখা যায় যে দারুণ দুর্ভিক্ষ এবং লোকক্ষয় সত্ত্বেও বিহার এবং বঙ্গভূমির নূতন বন্দোবস্ত পূর্ব্বাপেক্ষা উচ্চহারে সম্পাদিত হইয়াছিল —প্রতি বিভাগের রাজকর কড়ায় গণ্ডায় আদায় হইয়াছিল তাহার অনুমাত্র ও ত্রুটী হয় নাই! ¶

সরকারের কর্ম্মচারীগণ নানাভাবে নানা ছন্দে জানাইতে লাগিলেন যে দেশের অবস্থা যেরূপই হউক, কোম্পানীর ইষ্ট সিদ্ধি বিষয়ে তাঁহারা কখনো শিথিল হইবেন না। অনেক স্থান হইতে তখন সংবাদ আসিতে লাগিল যে রাজস্ব বৃদ্ধিই হইবে। নিম্নে কতগুলি পত্র উদ্ধৃত হইল। সেই সকল পত্র হইতেই রাজসাহী, রাজমহল, নদীয়া, ময়েদপুর, যশোহর দিনাজপুর এবং বীরভূমির অবস্থা অনুমান করা যাইবে; সরকারী দপ্তরে এরূপ পত্রের অভাব নাই। নিম্নোদ্ধৃত পত্রগুলি কোম্পানীর রাজস্ব নীতির দর্পণ স্বরূপ।

[রাজসাহী সুপারভাইজর মিঃ রাউসের পত্র।]

(১) কোম্পানীর বার্ষিক রাজস্ব তিন চারি লক্ষ মুদ্রা বাড়িয়াছে।

৮ অক্টোবর। ১৭৭০

(২) রাজস্ব বিষয়ে যাহাতে জমীদারগণ শৈথিল্য না করেন অথবা তহশিলদারগণ

* Bengal General Letter (Revenue Department) 3 Novr, 1772.

† Consultation (Select Committee) 9 June, 1770.

‡ Bengal General Letter (Secret Department) 10 January, 1772.

§ Letter from Mr. T. Reel. Moorshidabad 17 December, 1770.

¶ Bengal General Letter (Secret Department) 12 February, 1771.
Do 10 January, 1772.

অমনোযোগী না থাকেন আমি তদ্বিষয়ে যথোচিত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছি। (২)

১৬ জানুয়ারি। ১৭৭১

(৩) আমি নিম্ন শ্রেণীর প্রজাদের বারংবার নিগৃহীত করিয়াছি ও যুবকরাজা এবং জমীদারদিগকে পুনঃ পুনঃ তাগিদ দিয়াছি; আমি তাহাদিগকে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছি যে বন্দোবস্ত মত প্রাপ্য টাকা অবিলম্বে পরিশোধ করিতে হইবে। দেশে দুর্ভিক্ষই থাকুক আর বন্যাই থাকুক কোন আপত্তিই শোনা হইবে না!

১৯ এপ্রেল। ১৭৭১

রাজমহল।

[রাজমহলের সুপার ভাইজরের পত্র।]

সম্প্রতি রাজমহল এবং ভাগলপুর হইতে আমি যে রাজস্ব পাঠাইয়াছি, পরে আমি তদপেক্ষা অধিক টাকা আদায় করিতে পারিব। তাহা যদি না পারি, তবে আমার অধীনস্থ জেলা গুলির অর্থ-হীন বিধ্বংশ ও দুর্দ্দশা গ্রস্থ অবস্থা স্মরণ করিয়া এখন আমি আপনাদের নিকট যে কৃপার ভিখারী হইহইয়াছি, আপনারা আর কখনো আমাকে সেরূপ দয়া দেখাইবেন না। (কিন্তু ইনি ইতি পূর্ব্বেই হস্তবুদে সামান্য কিছু বৃদ্ধি জমা দেখাইতে ত্রুটী করেন নাই।)

১৬ নভেম্বর। ১৭৭০

নদীয়া

[নদীয়ার রাজা কিশোরচাঁদের আবেদন।]

দুর্ভিক্ষে অনেক প্রজা মরিয়া গিয়াছে,

---

1 Add three or four lacks of Rupees to the company's annual Revenue —8th October 1770.

2 I have been as strict as possible in this respéct lest I should give any encouragement to negligence in the Zamindars or officers of collection.

16th January 1771.

3 I have used repeated severity with the inferior class, and have been continually urgent with the Zemindar and the young Raja, by telling them plainly that.........they must absolutely fulfil the engagement of the formers, in despite of all pleas whatsoever for the famine or inundation.

19th April 1771

4 No balance remains out............2nd September 1771

(Letters from C. W. B. Ruos, Supervisor of Rajshahi)

রাজমহল।

I hope hereafter to realize and remit a larger sum both from the provinces of Rajmahal and Bhagalpur than has been lately remitted, or I shall no longer expect the favour and indulgence which I now entreat from you on account of the impoverished, ruined and miserable state of the Districts under my managements (কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই ইনি হস্তবুদে small increase দেখাইয়াছিলেন)—Letter from Mr. Harwood, Supervisor of Rajmahal to Mr. Becher. 16 November 1770.

নদীয়া।

Owing to the Famine many of the Ryats are dead, and others deserted, yet

অনেক দেশত্যাগী হইয়াছে, তবুও আমি রাজস্ব মাপ দিই নাই যাহা বন্দোবস্ত হইয়াছিল তাহাই আদায় করিয়াছি। (২)

২৮ নভেম্বর। ১৭৭০

মহেন্দপুর।

[কৌনসীলের নিকট বিচার সাহেবের পত্র।]

অবস্থা বিবেচনায় ও সকল দিক দেখিয়া যতদূর সম্ভব আদায় করা হইয়াছে। কোম্পানীর রাজস্ব আদায় করিতে আমি এবং মহম্মদ রেজা খাঁ চেষ্টার ক্রটী করি নাই।

২৪ ডিসেম্বর। ১৭৭০

যশোহর।

[যশোহরের সুপার ভাইজর রুক সাহেবের পত্র।]

(১) যে প্রকার লোক ক্ষয় হইয়াছে তাহাতে···আমি সন্তোষের সহিত জানাইতেছি, আপনারা যে পরিমাণ আশঙ্কা করিয়াছিলেন, রাজস্ব এবার সে পরিমাণ বাকী পড়িবে না। ১লা এপ্রেল। ১৭৭১

(২) মহাশয়গণ আপনারা নিশ্চয় জানিবেন অনাদায়ী টাকা আদায় করিতে আমি সাধ্যমত চেষ্টার ক্রটী করিব না।

৩১ মে। ১৭৭১

দিনাজপুর।

[দিনাজপুরের সুপারভাইজর লরেল সাহেবের পত্র।]

আপনারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক দেখিবেন এবারকার বরাদ্দ (সিক্কা) ১৮,৮৮,৩৬০ টাকা কিন্তু গত বৎসর ৩০শে চৈত্র পর্য্যন্ত দিনাজপুরের খাজনাখানায় ১৪,৬৩,২১৬, টাকা পাওয়া গিয়াছিল। ৪ঠা মে। ১৭৭১

I have allowed the farmers no abatement from the Bondo bust settled with them —Petition of Raja Kishore chand of Nudia : Proceedings of the Provincial Council at Murshidabad 28th November 1770

মহেন্দপুর।

No endeavours were wanting on my part, nor......on the part of Nowab Mahomed Rezakhan to realise to the Company as large a revenue as under such circumstances......could be effected with due consideration.........Letter from Mr Behar to council : 24 December, 1770.

যশোহর।

1 Considering how great was the mortality......I flatter myself that at the close of the year there will not appear so heavy a balance as you seem apprehensive of—1st April 1771.

2 Of this you may be assured, gentlemen, that I shall leave no pains untried in order to reduce it (balance) as much as possible.—31st May, 1771

(Letters from Mr. Rooke, Supervisor of Jessore).

দিনাজপুর।

You will observe that the estimate for this year amounts to sicca Rupees 1888360-9-4-2. The sum received last year into the Dinajpur Treasury to the 30th *choit* was no more than sicca Rupees 1463216-12-16--Letter from Mr. Lawrell, Supervisor of Dinajpur : 4 May, 1771.

বীরভূম।*

[বীরভূমের সুপারভাইজরের পত্রোত্তরে কৌন্সীলের মন্তব্য।]

আপনি যে হিসাব দাখিল করিয়াছেন ও গত বর্ষের রাজস্ব আদায় এবং বর্ত্তমান বর্ষে আপনি যেরূপে আপনার অধীনস্থ জেলাগুলির বন্দোবস্ত করিয়াছেন, আমরা এ সমুদয় দেখিয়া তুষ্ট হইয়াছি। প্রথমটী হইতে বুঝা যাইতেছে যে বৎসরের অবস্থা বিবেচনায় আমরা যাহা আশা করিয়াছিলাম তদ্রূপই আদায় হইয়াছে; পরেরটী হইতে আমরা বুঝিয়াছি যে আগামী বর্ষে রাজস্ব অনেক পরিমাণে বৃদ্ধিই হইবে। মহাশয়, আপনি যেরূপ মনোযোগ ও আয়াসের সহিত কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন, তজ্জন্য, এই সুযোগে, আমরা আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি।

২রা জুলাই। ১৭৭১

এই সকল পত্র পাঠ করিলেই ইহা অনুমিত হয় যে দেশের লোক যদিও অনাহারে মরিয়াছে কিন্তু কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণ রাজকর আদায় করিতে বিন্দুমাত্রও ত্রুটী করেন নাই, বরং কর্ম্মকুশলতার পরিচয় দিবার জন্য করের মাত্রা বৃদ্ধিই করিয়াছিলেন। রাজা দেবীসিংহ, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ এবং মহম্মদ রেজাখাঁর দেশে এজন্য কোম্পানী বাহাদুরের তত দোষ দেখি না। (ক্রমশ)

শোণিত-সোপান।

৫

দন্দোলো হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় তাহাকে দেখিয়া নিনেতা মূর্চ্ছা যায়; এখন তাহার চৈতন্য হইল; নেত্র উন্মীলন করিলে, প্রথমেই নেত্রে হর্ষের ভাব ব্যক্ত হইল, কিন্তু পরক্ষণেই, পেপলিকে দেখিয়া সে ভাবটি চলিয়া গেল। নিনেতা ক্লোটীলডার দিকে মুখ ফিরাইয়া ভয় ও উদ্বেগ পূর্ণ দৃষ্টির দ্বারা তাঁহাকে যেন জিজ্ঞাসা

---

* বীরভূমি।

The amount you have transmitted us as well as the last years collections, as of the settlement of the districts under your supervisorship for the present year meet with our entire approbation. The former satisfy us that the collections have been as well realised as from the circumstances of the season we could have expected and the latter presents us with the prospect of a considerable increase of revenue. We therefore, Sir, take the opportunity of returning you our thanks for the attention and assiduity you have shown in the discharge of your duty.—Proceedings of the Provincial Council, 2nd July, 1771. Reply to the letter of the Supervisor of Beerbhoom.

করিল—দন্দোলোর সহিত, না, কৌণ্ট পেপ-লির সহিত তাহার বিবাহ হইবে?

শ্রীমতী ক্লোটিলডা এই মূক জিজ্ঞাসার অর্থ বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু মনে হইল যেন দুই অঙ্গীকারের মাঝখানে দাঁড়াইয়া তিনি ইতস্তত করিতেছেন। প্রথমে তিনি দন্দোলোকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :—

"এত দেরীতে এলে কেন? আমি নিনেতাকে অন্যের হাতে সমর্পণ করেছি।"

দন্দোলো, নিনেতার মূর্চ্ছায় একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল, এখন আবার প্রকৃতিস্থ হইয়া, উৎসাহের সহিত কথোপকথনে যোগ দিল,—

"নিনেতাকে অন্যের হাতে সমর্পণ করেছেন! আপনি কি তবে আপনার অঙ্গীকার বিস্মৃত হয়েছেন? আপনি চেয়েছিলেন আমি ধনী হই! আমি ধনী হয়েছি···আমি নিনেতাকে ভালবাসি! নিনেতাও যে আমাকে বই আর কাহাকে ভাল বাসে না, তার প্রমাণও আপনি পেয়েছেন। আপনার মেয়েকে কি আপনি অসুখী করতে চান? না, তা অসম্ভব!...নিনেতা স্বাধীন, নিনেতা আমারই হবে···আপনি জানেন না, নিনেতার পাণি গ্রহণের জন্য আমি কত কষ্ট ভোগ করেছি!" ক্লোটিলডা বলিলেন;—

"তোমার প্রত্যাগমনের সংবাদ দেওনি কেন তবে?"

"কৌণ্ট মহাশয় বোধ করি বুঝতে পারবেন···"

এই কথা বলিয়াই, দন্দোলো, কৌণ্টের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল; দৃষ্টি মাত্রে দন্দোলোর মুখ, মড়ার মত ফাঁকাশে হইয়া উঠিল; দুই জনই এক সঙ্গে কি একটা কথা বলিয়া উঠিল···ফর্জ্জা এবং যাহাকে ফর্জ্জা পূর্ব্ব দিনে বস্ত্র বিরহিত করিয়া ছিল সেই ব্যক্তি—এই উভয়ই উভয়কে চিনিল। এক পক্ষে বিস্ময়, অপর পক্ষে হতবুদ্ধিতা—উপস্থিত রঙ্গ দৃশ্যের গতি ফিরাইয়া দিল। দন্দোলো মাথা হেঁট করিয়া রহিল, একটি কথাও আর বলিতে সাহস করিল না। কৌণ্ট পেপলি এই সময়ে একটু লজ্জিত হইয়া ছিল, এখন সাহস পূর্ব্বক সম্মুখে অগ্রসর হইল এবং শ্রীমতী ক্লোটিলডাকে সম্বোধন করিয়া এই কথা বলিল :—

"আমার নিকট আপনি পবিত্র অঙ্গীকারে বদ্ধ হইয়াছেন, আপনার কন্যার সহিত আমার বিবাহ অবশ্যই হইবে এবং আমি আশা করি ঐ লোকটি এতে কিছুমাত্র বাধা দেবে না! আমি যা বলচি তা ঠিক কি না?"—এই কথা বলিয়া অবজ্ঞার ভাবে সমস্ত দন্দোলোর দিকে মুখ ফিরাইল।

দন্দোলো কোন উত্তর করিল না; তাহার অন্তরের মধ্যে ভয়ানক একটা বুঝাবুঝি চলিতেছিল। যে সময়ে সে মনে করিয়াছিল সুখী হইবে ঠিক সেই সময়েই সুখ তাহার নিকট হইতে পলায়ন করিল। দন্দোলো ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়াছে, এবং যাহাকে পাইলে তাহার অনুতাপের তীব্রতার কিছু লাঘব হইত সেই ললনাকে আর একজন লইয়া গেল, তাহাকে আর সে পাইবে না—দন্দোলোর পক্ষে এটা একটা বিষম ব্যাপার—কেননা আমরা জানি

দন্দোলো নাছোড়বন্দা লোক, সেই ত মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিল—ডাকাতি করেই হউক, হত্যা করে হউক, নিনেতাকে আমার পেতেই হবে।

একটু উপহাসের ভাবে কৌণ্ট বলিলেন—"মৌনে সম্মতিলক্ষণ; অতএব আমি আজ রাত্রে আমার প্রিয়তমা বাগদত্তাকে বিবাহ করব। কেবল এই দুঃখ, এই উৎসবের দিনে একটা উৎপাৎ এসে জুটেছে।"

দন্দোলো ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল :—

—"তুমি নিনেতাকে বিবাহ করবে! কিন্তু তা কিছুতেই হবে না। আমি জানি না এ সমস্তের পরিণাম কি হবে, কিন্তু এ কথা আমি নিশ্চয় বল্‌তে পারি নিনেতা তোমার স্ত্রী কখনই হবে না।"

কৌণ্ট মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন :—"তার পরিণাম এই হবে—দস্যুমহাশয়, যদি তুমি বেশী পীড়াপীড়ি কর, তোমাকে ফাঁসি দেওয়াব।"

দন্দোলো আবার পূর্ব্ববৎ স্থিরভাব ধারণ করিল; এদিকে, আর সকলে, এই অভিনয়টা কোথায় গিয়া শেষ হয় তাহারই প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

—"আমি তোমাদের বল্‌চি এ বিবাহে ও কখনই বাধা দেবে না; আর আমি ইচ্ছা করলে, এই কথা ওরই মুখ দিয়ে বলাতে পারি।"

দন্দোলো শুধু এইরূপ উত্তর করিল :—

—"আমি ফিরে যাচ্ছি"—এবং এই কথা বলিয়াই প্রস্থান করিল। যাইবার সময় নিনেতার পানে চাহিয়া একবার শেষ দেখা দেখিয়া লইল। শেষে কি না জানি ঘটে এই আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত হইয়া নিনেতা উহাদের কথা শুনিতেছিল।

দন্দোলোর আকস্মিক প্রস্থানে, শ্রীমতী ক্লোটিলডা বিস্ময়াভিভূত হইলেন এবং এই সমস্ত ব্যাপারের কারণ কি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সহস্র চেষ্টা করিয়াও এই রহস্যের তিনি কোন কূলকিনারাই পাইতেন না যদি কৌণ্ট এই বিষয়ে দুই একটা কথা না বলিতেন। তাঁহার কথাতেই ক্লোটিল্‌ডার সন্দেহ হইল, যেন এক একটা মন্ত্রের দ্বারা পেপলি দন্দোলোকে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে।—"দেখুন, মানুষের জীবনে এমন কতকগুলি গুপ্ত কথা থাকৃতে পারে যে সেই গুপ্ত কথার উপরেই তাহার জীবন নির্ভর করে;—গুপ্ত কথাগুলি যেন তাহার জীবনের চির সহচর হয়ে অবস্থিতি করে; দন্দোলো এ কথা বিলক্ষণ বোঝে,—তাই আপনার প্রতিজ্ঞা পুনঃ স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য সে আর এখানে আস্‌বে না, আমি নিশ্চয় করে বল্‌তে পারি।"

দন্দোলো একেবারেই প্রস্থান করে নাই—একটা পত্র হস্তে করিয়া আবার ফিরিয়া আসিল এবং এইরূপ বলিল :—

"তোমার ভারী ভুল, সেসালোর গির্জ্জায় কালই আমি প্রিয়তমার সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হব।" ক্লোটিলডার দিকে ফিরিয়া কৌণ্ট বলিলেন :—লোকটা পাগল!

"পাগল কি না একটু পরেই দেখা যাবে তখন আমি তোমাকে যা বল্‌ব তাই শুন্‌তে হবে।"

—"তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারচিনে, আর বোধ করি তুমিও আমার

কথা বুঝ্‌তে পারচ না। তা, এঁদের কাছে আমি এখনি একটা গল্প বল্‌ব, তাতেই তোমার সমস্ত পাগলামি ছুটে যাবে।"

—আচ্ছা "মাইকেল" ভায়া তুমি একবার চেষ্টা করে দেখ, আমিও ওঁদের আমোদের জন্য বল্‌ব,—অরণ্যের কোন্ অংশে ওঁরা আসল পেপলিকে পেতে পারেন। তুমি অতি বদ্‌রকমে পেপলির নকল করচ।" এই কথায় কৌণ্টের মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল এবং সহসা দন্দোলোর নিকটে আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল :—

—"যা বল্‌চ তার প্রমাণ ?"

—"প্রমাণ···আমি দেখাতে পারি যদি তুমি ইচ্ছা কর। তোমার বহুমানাস্পদ পেদ্রোলিনো তোমাকে যে পত্র লিখেছিল, আর অরণ্যে তুমি যে কোর্ত্তাটি ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলে, সেই কোর্ত্তার পকেটের মধ্যে এই পত্রখানি ছিল—এই পত্রখানি কি চিন্‌তে পার ?"

সেই পত্রে এই কথাগুলি ছিল :—

প্রিয় মাইকেল,

জোৎদার মাতেয়োর কন্যা নিনেতাকে তুমি ভালবাস; অবশ্য তার রূপলাবণ্যের জন্যই তুমি তাকে ভালবাস, আর ভালবাস বোধ হয় তার ধন ঐশ্বর্য্যের জন্য; পেপ্‌লির কৌণ্টের সহিত তার বিবাহ হবার কথা; এইবার আমাদের দুজনের খুব একটা দাঁও মারবার অবসর হয়েছে। কৌণ্টকে হবু শ্বশুরও চেনে না, বাক্‌দত্তা কন্যাও চেনে না। আমি জানি, কাল কৌণ্ট নিকটবর্ত্তী অরণ্যে, রাত্রি যাপন করবেন। এসো আমরা তাঁর প্রতীক্ষায় থাকি। আর যে সময়ে তুমি তাকে "বৈতরণী নদী" পার করাবে (যে কাজে তোমার খুব রপ্ত আছে) সেই সময়ে আমিও তোমার কতকটা সাহায্য করতে পারব। তুমি কৌণ্টের নাম ও উপাধি ধারণ করে তুমিই নিনেতাকে বিবাহ করবে। অবশ্য আসল কাজের সময় তোমার কোন সাহায্য করতে পারব না—কেননা ও কাজে আমার রুচি নাই; আমি শুধু তোমার চাকর সাজ্‌ব; এবং বিবাহের দুই দিন পরে শ্বশুরের কাছ থেকে তুমি যে টাকা পাবে, আমাকে তার ভাগ দিতে হবে। তার পর, তুমি যাকে এত ভালবাস, তার মন যোগাতে থাক, আমি ততক্ষণ ফ্রান্‌সে গিয়ে আমোদ আহ্লাদে জীবন কাটাই। এ প্রস্তাবে তোমার যদি সম্মতি থাকে, আজ সন্ধ্যার সময় তোমার জন্য অপেক্ষা করব।

পেদ্রোলিনো।"

জাল্ কৌণ্ট পেপলি (এখন হইতে তাহাকে আমরা মাইকেল বলিব) লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া রহিল; কিয়ৎক্ষণ পরে, ক্রোধভরে দন্দোলোর প্রতি এবং ঈর্ষাভরে নিনেতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। তাহার মুখের ভাবে স্থিরসঙ্কল্পহীনতা ও নৈরাশ্য প্রকটিত হইল। তাহার হৃদয়ে ভয়ানক যুঝাযুঝি চলিতেছিল, কি করিবে কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিল না।

পাপের দ্বারা সে যাহা অর্জ্জন করিয়াছিল, এইবার তাহা ত্যাগ করিতে হইবে —তাহা অপেক্ষা ভাগ্যবান, তাহার যে প্রতিদ্বন্দ্বী সেই এখন নিনেতাকে লাভ করিবে। দুই জনই এক পথের যাত্রী।

নিনেতার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া দুই জনই আত-তায়ী হইয়া দাঁড়াইয়াছে—দুই জনই দস্যু-বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে।

এই সময়ে মাইকেলের হঠাৎ একটা উপায় মনে হইল। পেদ্রোলিনোর নিকটে গিয়া সে মৃদুস্বরে দুই চারিটি কি কথা বলিল। পেদ্রোলিনো ছদ্মবেশী প্রভুর আদেশে একটা টেবিলের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল। যখন নিনেতা মূর্চ্ছা যায় সেই সময়ে তাহার জন্য যে পানীয় প্রস্তত হইয়াছিল, সেই পানীয় সেই টেবিলের উপরে ছিল। সে হাত বাড়াইয়া অলক্ষিতে কি একটা গুঁড়া তাহার মধ্যে নিক্ষেপ করিল। তাহার পর মাইকেলের নিকটে গিয়া তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে তাহাকে ইঙ্গিতে এইরূপ জানাইল। তখন মাইকেল মুখে নির্ব্বিকার ভাব ধারণ করিয়া স্বাভাবিক স্বরে শ্রীমতী ক্লোটিল্‌ডাকে বলিল,—

—"আপনি প্রথমে দন্দোলোর নিকটেই প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হয়েছিলেন, অতএব ঐ প্রতিজ্ঞার ফল সেই ভোগ করুক, নিনেতাকে সেই বিবাহ করুক।"

এই কথায়, বালিকার চক্ষু আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। ঠিক্ এই সময়ে, নিনেতার পিতা সেই পানীয়ের সাঙ্ঘাতিক পাত্রটি হাতে করিয়া নিনেতাকে দিল। নিনেতা পাত্র হইতে সেই পানীয় পান করিল।

মাইকেলের মুখ, একটা ভীষণ নারকী ভাবে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। প্রতিশোধ জনিত সুখের আবেশে কাঁপিতে কাঁপিতে সে বলিল;

—"সুখী হও দন্দোলো, আমার উপর সন্তুষ্ট হওয়া তোমার উচিত।"

দন্দোলো কোন উত্তর বলিল না; কিন্তু এই কথাগুলি মাইকেল এমন তীব্র কর্কশ স্বরে বলিয়াছিল যে, দন্দোলো শিহরিয়া উঠিল।

মাইকেল ও পেদ্রোলিনো, হতভাগিনী নিনেতার প্রতি-শেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া এবং তাহার ভাবী পতির সর্ব্ব প্রকার সুখ সমৃদ্ধি কাম করিয়া, ক্ষেত-বাড়ী হইতে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

কিয়ৎক্ষণ পরে, নিনেতা তাহার ভাবী পতির ক্রোড়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল; বক্ষের স্পন্দন থামিল, শরীর শীতল হইয়া পড়িল। দন্দোলো, রোষ সহকারে বলিয়া উঠিল;

—"ঐ পিশাচেরা বিষ প্রয়োগ করেছে! নিনেতা, আমি এর প্রতিশোধ নেব। প্রতিশোধ নিয়ে তবে আমি মরব—এখন পৃথিবীতে আমার এই মাত্র কাজ।" এই কথা বলিয়া দন্দোলো নিনেতাকে বহন করিয়া একটা পাশের ঘরে স্থাপন করিল। দস্যু-পতি কর্ত্তা একটা শয্যার শিয়রে নতজানু হইয়া বালিকার মৃতদেহের সম্মুখে শিশুর ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিল।

(ক্রমশ।)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অতৃপ্তি।

বল মোরে বল পুন বল বারবার
বল সে অমৃত বাণী, তৃষিত শ্রবণে
শুনি স্বর্ণ-একতন্ত্রী রণিত নিক্কণে
হিয়ার স্পন্দনচ্ছন্দ মিলিত ঝঙ্কার।
বল মোরে বাস ভাল, বল পুনরায়,
ফেণিল তরঙ্গ-ভঙ্গ-মুখরিত সুরে
তট-ভূমি চুমি চুমি সিন্ধু যথা গায়
একটি প্রণয় গীতি ফিরি ঘুরে ঘুরে।
অলি বারবার ফিরি একটি গুঞ্জন
গাহে মুকুলের কানে, একটি রাগিণী
গাহে পিক চূতশাখে চির-পুরাতন ;
হৃদয় মন্দিরে মোর দিবস যামিনী
বাজুক্ কণক ঘণ্টা প্রহরে প্রহরে
প্রণয়-আশ্বাস-ভরা তব কণ্ঠস্বরে।

শ্রীঃ—

বিজয়িনী।

আমার হৃদয় খানি লহনি হরিয়া
নিমেষের সম্মোহনে ; রূপ-বহ্নি মাঝে,
উন্মত্ত পতঙ্গ সম, অন্ধকার সাঁঝে
পড়ি নাই মৃত্যু-লোভী। লয়েছ জিনিয়া
পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে সূক্ষ্ম-আকর্ষণে
অপ্রমত্ত চিত্ত মোর, হেমন্ত নিশীথে
শ্যাম-তৃণ-দল-রাজি যথা ক্ষণে ক্ষণে
হিমানীর কণা গুলি নিঃশব্দ ইঙ্গিতে
বক্ষমাঝে লয় টানি ; অরণ্যের স্থানে
ধীরে ধীরে গ্রাম খানি বর্ষ বর্ষ ধরি'
ক্রমে যথা উঠে ফুটি, কুটীরে, উদ্যানে,
শস্য ক্ষেত্রে, সুখ-শোভা-সফলতা ভরি,
হৃদয় প্রান্তর মোর গহন বিপুল
তেমনি করেছ আজি ঐশ্বর্য্যে অতুল!

শ্রীঃ—

শোক।

শোক কি? সে নহে দুঃখ, অসহ্য সে সুখ,
সহিতে পারে না যাহা অস্থি মাংস মেদ,
দলিয়া পেষিয়া যায় চূর্ণ করি বুক,
বক্ষেতে বিঁধিয়া যাহা কক্ষ করে ভেদ!

শোক কি? বিরহ নহে, অসহ্য মিলন ;—
বাহির হইতে যাহা তীব্র বেগভরে
হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে করি অন্বেষণ,
আগ্রহে আত্মারে আত্মা আত্মসাৎ করে!

শোক কি? বিলাপ নহে, বীজমন্ত্র তার ;
শোক কি? নিরাশা নহে, নব আশা ভরা,
শোক কি? সন্ন্যাস নহে, প্রীতি ফুল হার ;
শোক কি? বিস্মৃতি নহে, আপনা পাসরা!

দেবতা পেয়েছে সুধা, মানুষেরা শোক,
কৃতার্থ সৌভাগ্যশালী ধন্য নরলোক!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

লক্ষ্মণসেনের পলায়ন-কলঙ্ক।*

প্রথম ভাগ আদৌ লিখিত হয় নাই, অথচ দ্বিতীয় ভাগ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে, এরূপ গ্রন্থ সকল দেশের সাহিত্যেই নিতান্ত সুদুর্লভ। কেবল বঙ্গসাহিত্যেই এরূপ একখানি মাত্র গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার নাম "বাঙ্গালার ইতিহাস"। পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই "অদ্বিতীয় গ্রন্থ" রচনা করিয়া যেরূপ বিচার বুদ্ধির প্রাখর্য্য প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত মর্যাদা অনুভব করিতে অসমর্থ হইয়া, তাঁহার জীবিত কালেই অনেকেই বাংলার ইতিহাসের প্রথমভাগ রচনা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহার ফলে, বঙ্গসাহিত্যে এক অলৌকিক উপাখ্যান ইতিহাসের মর্যাদালাভ করিয়া, সকলের নিকট সুপরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহা বক্তিয়ার খিলিজির বঙ্গ-বিজয় অথবা লক্ষণসেনের পলায়ন-কলঙ্ক! এই কলঙ্ককাহিনী বন্যাতাড়িত আবর্জ্জনা রাশির ন্যায় রঙ্গালয়ের দ্বারদেশে পুঞ্জীকৃত হইবা মাত্র, তদ্দারা অর্থোপার্জ্জনের সুযোগ লক্ষ্য করিয়া, বঙ্গরঙ্গালয় তাহাকে পরম সমাদরে ক্রোড়ে তুলিয়া লইবার পর, তাহা ক্রমে নিরক্ষর নরনারীর নিকটও সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছে! এতকালের পর সম্প্রতি একজন সুনিপুণ চিত্রকর তাহা লইয়া একখানি চিত্রপট রচনা করিয়া, লক্ষণসেনের পলায়ন-কলঙ্ক চিরস্মরণীয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।* যাহা এইরূপে বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে চিরপরিচিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা যে সর্ব্বথা অলীক, এখন তাহার আলোচনা করিতেও অনেকে অসম্মত হইতে পারেন। কিন্তু স্বদেশের ইতিহাসের সকল ঘটনাই স্বাধীন ভাবে আলোচনা করা কর্ত্তব্য—যাহা সত্য তাহা নির্ণয় করিয়া প্রচলিত ইতিহাসের সংশোধন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য,—কালবিলম্বে অসত্য কখনও সত্যের মর্য্যাদা লাভ করিতে পারে না। লক্ষণসেনের পলায়ন-কলঙ্কের মূলে আদৌ কোন সত্য সংশ্রব বর্ত্তমান আছে কিনা, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহাই সংক্ষেপে আলোচিত হইবে। পূর্ব্বে—অনেক বার "বক্তিয়ার খিলিজির বঙ্গবিজয়" সমালোচনা করিতে গিয়া, প্রসঙ্গ ক্রমে লক্ষণসেনের পলায়ন-কলঙ্কের কিছু কিছু আলোচনা

* শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্রপট দর্শনে লিখিত ও রাজসাহী শাখা সাহিত্য-পরিষদের তৃতীয় বার্ষিক চতুর্থ অধিবেশনে পঠিত।

করিয়াছিলাম।* এখন চিত্রপট প্রকাশিত হইতেছে দেখিয়া মনে হইতেছে--বঙ্গসাহিত্যে যাহা প্রকাশিত হয়, সকল শিক্ষিত বঙ্গবাসী তাহা পাঠ করেন কিনা সন্দেহ।

বক্তিয়ার খিলিজির বঙ্গাগমনের ষষ্টিবর্ষ পরে সুবিখ্যাত মুসলমান ইতিহাস লেখক মিন্‌হাজ-ই-সিরাজ এদেশে উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি "তবকাৎ-ই-নাসেরী" নামক দিল্লী-সাম্রাজ্যের যে ইতিহাস রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার বিংশ পরিচ্ছেদে প্রসঙ্গক্রমে বঙ্গভূমির কিছু কিছু সংক্ষিপ্ত কাহিনী উল্লিখিত হইয়াছে। তাহাতে লিখিত আছে —বক্তিয়ার সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া 'নওদিয়া" নামক রাজধানীতে উপনীত হইবামাত্র "রায় লছমনিয়া" নামক হিন্দু নরপতি পলায়ন করিয়াছিলেন। মিন্‌হাজ বিচার নিপুণ ঐতিহাসিকের ন্যায় এই কাহিনীর সত্যাসত্য নির্ণয়ে অগ্রসর না হইয়া লিখিয়া গিয়াছেন—যাহারা বক্তিয়ারের সহিত বিজয় যাত্রায় বহির্গত হইয়াছিল, তাহাদের মুখে মিন্‌হাজ এই কাহিনী শ্রবণ করিয়াছিলেন। মিন্‌হাজের গ্রন্থ প্রমাণ রূপে উল্লিখিত করিয়া, বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকে এই কাহিনী সংকলিত হইবার পর, ইহা ক্রমশঃ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে। ইহার মূল প্রমাণ মিন্‌হাজের গ্রন্থ—এক মাত্র প্রমাণ মিন্‌হাজের গ্রন্থ—তাহাও এক মাত্র বৃদ্ধ সৈনিকের পুরাতন আখ্যায়িকা। বক্তিয়ার খিলিজির বঙ্গাগমনের ষষ্টিবর্ষ পরে এ দেশে আসিয়া মিন্‌হাজ যে বৃদ্ধ সৈনিকের নিকট এই অলৌকিক কাহিনী শ্রবণ করিয়াছিলেন বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন—তিনি তখন অশীতিপর বৃদ্ধ—তাঁহার সত্য নিষ্ঠা বা আত্মগৌরব ঘোষনার প্রলোভন কতদূর প্রবল ছিল এতকাল পরে তাহার মীমাংসা করিবার সম্ভাবনা নাই!

মুসলমানাগমনের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে যাঁহারা এ দেশের রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করিতেন, সে সকল সুগৃহীতনামা নরপালগণের নানা শাসন লিপি আবিষ্কৃত হইয়া, আমাদিগের নিকটে যে সকল পুরাতত্ত্বের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছে, তাহা সপ্তদশ অশ্বারোহীর অলৌকিক দিগ্বিজয় কাহিনীর সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে না। বাংলার ইতিহাসের প্রধান দুর্ভাগ্য সকল যুগেই সমান ভাবে বর্ত্তমান,—সকল যুগেই তাহা বিজেতার বিদ্বেষপূর্ণ বিকৃত লেখনী হইতে প্রসূত হইয়াছে,—কোন যুগেই দেশের লোকে দেশের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিবার আয়োজন করেন নাই।

বক্তিয়ার স্বাধীন ভাবে প্রাচ্য ভারতে সাম্রাজ্য সংস্থাপনে অগ্রসর হইয়া কিয়ৎ পরিমাণে কৃতকার্য্য হইবামাত্র, দিল্লীর মুসলমান বাদসাহ, তাহাকে দিল্লী সম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠিয়াছিলেন; ইহার জন্য প্রথম হইতেই দিল্লী সাম্রাজ্য এবং গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের মধ্যে কলহ সংঘটিত হইবার সূত্রপাত হয়,—এবং ইহার জন্যই দিল্লীর ইতিহাসলেখকগণ দিল্লীর গৌরব ঘোষণা করিয়া, গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের কলঙ্ক কীর্ত্তন করিয়া ইতিহাস রচনা করিতে প্রবৃত্ত হন। যে সকল মুসলমান বীর শোণিত

* নব্যপর্য্যায় বঙ্গদর্শনে ইহা বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। বং সং।

জয় করিয়া গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন, দিল্লীশ্বর তাঁহাদিগের কোনরূপ সহায়তা সাধন না করিয়াই, তাহাদিগের বিজয় গৌরবের ফলভোগ করিবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠিয়াছিলেন। দিল্লী সাম্রাজ্যের ইতিহাস লেখকের পক্ষে এই সকল কারণে গৌড়ীয় মুসলমানগণের দিগ্বিজয় ব্যাপারকে অনায়াসলব্ধ অকিঞ্চিৎকর যুদ্ধগৌরব বলিয়া ব্যাখ্যা করা অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। মিন্‌হাজের কাহিনী আদৌ কোনও বৃদ্ধ সৈনিকের নিকট হইতে সংকলিত, অথবা তাঁহার কপোলকল্পিত মাত্র, তদ্বিষয়েও সন্দেহশূন্য হইবার উপায় নাই।

যাহা হউক, বক্তিয়ার খিলিজির বঙ্গাগমন সময়ে এ দেশ রাঢ়, মিথিলা, বরেন্দ্র, বঙ্গ এবং বাগ্‌ড়ী নামক ভাগপঞ্চকে বিভক্ত থাকিবার কথা আমরা মুসলমান-লেখকদিগের গ্রন্থেই দেখিতে পাই। তৎকালে এই পঞ্চ বিভাগ গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ও এক রাজার অধীন ছিল। বিক্রমপুর, লক্ষণাবতী এবং লক্ষৌর নামক তিন স্থানে তিনটি রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই বর্ণনায় "নওদিয়া" নামক স্থানে কোনও রাজধানী সংস্থাপিত থাকিবার উল্লেখ নাই। "নওদিয়া" কোথায় ছিল,—তাহা রাজধানী হইলে তৎপ্রদেশে মুসলমান জায়গীর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল কিনা, —রায় লছমনিয়াই বা কাহার নাম—এ সকল প্রশ্নের কোনরূপ সদুত্তর প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই।

গৌড়ীয় ধ্বংসাবশেষের মধ্যবর্ত্তী খালিমপুর নামক আধুনিক গ্রামে ধর্ম্মপাল নামক নরপালের যে তাম্রশাসন আবিষ্কৃত ও স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়ের যত্নে প্রকাশিত হয়, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়,—ধর্ম্মপালের রাজধানী পাটলিপুত্রেই সংস্থাপিত ছিল। তিনি মগধাধিপতি হইয়াও, গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের কিয়দংশে অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। মুঙ্গেরে আবিষ্কৃত দেবপাল নামক নরপালের তাম্র শাসনে দেখিতে পাওয়া যায়—তৎকালে রাজধানী মুদ্গগিরি নগরেই সংস্থাপিত ছিল। তাহার পর বঙ্গভূমির নানা স্থানে—পূর্ব্ব এবং উত্তর বঙ্গে—পাল-নরপালগণের রাজ্য ও রাজধানী সংস্থাপিত হইবার পরিচয় নানা শাসন-লিপিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। পাবনার অন্তর্গত মাধাই নগরে আবিষ্কৃত লক্ষণ সেন দেবের একখানি তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায়—"কর্ণাট ক্ষত্রিয় বংশের" সেন নরপালগণ বঙ্গভূমিতে কিরূপে অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। এই রাজ বংশের বিজয় সেনদেব নামক নরপাল রাজসাহীর অন্তর্গত বরেন্দ্র প্রদেশে প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দির নামক মন্দির প্রতিষ্ঠার সময়ে যে ফলক লিপি রচনা করাইয়া ছিলেন, তাহাতে বিজয়সেন দেবের বিজয় কাহিনী উল্লিখিত আছে। বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেন গৌড়াধিকার করিয়া "গৌড়েশ্বর" নাম গ্রহণ করেন। তিনিও বীর কীর্ত্তির জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণ সেন দেব পশ্চিমে কাশী এবং পূর্ব্বে কামরূপ পর্য্যন্ত বিজয়লাভ করিয়া বীর কীর্ত্তির জন্য বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিলেন। মুসলমান ইতিহাস লেখকগণ বলেন—এই নরপতির নামানুসারে পুরাতন গৌড় নগরের নাম "লক্ষ্মণাবতী" বলিয়া পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। অনেক দিন পর্য্যন্ত এ দেশের

মুসলমান রাজা দিল্লীর ইতিহাস লেখকদিগের গ্রন্থে লক্ষ্মণাবতী রাজ্য বলিয়াই উল্লিখিত আছে। লক্ষ্মণ সেনের বীর পুত্র বিশ্বরূপ সেনের শাসন লিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়,—তিনি বাহুবলে আত্মরক্ষা করিয়া

"গর্গযবনান্বয় প্রলয় কাল রুদ্র"

নামে পরিচিত ছিলেন। মিন্‌হাজ যখন এ দেশে পদার্পণ করেন, তখনও (বক্তিয়ার খিলিজির বঙ্গাগমনের ষষ্ঠি বর্ষ পরেও) পূর্ব্ববঙ্গে লক্ষ্মণসেনের পুত্রগণের অক্ষুণ্ণ অধিকার বর্ত্তমান ছিল—তদ্দেশে তখন পর্য্যন্ত মুসলমান শাসন বিস্তৃত হইতে পারে নাই।

শাসন লিপির ও মুসলমান ইতিহাস লেখকের এই সকল উক্তির সমালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়—বক্তিয়ার সহজে এ দেশে অধিকার বিস্তার করিতে পারেন নাই ;—তিনি যেখানে অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা লক্ষ্মণাবতীর নিকটবর্ত্তী কয়েকটি পরগণা মাত্র এবং সেখানেই মুসলমানদিগের সর্ব্ব প্রথম জায়গীর লাভের প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অধ্যাপক ব্লকম্যান পুরাতন বঙ্গভূমির ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক তথ্য সংকলনের জন্য প্রভূত অধ্যবসায় স্বীকার করিয়া যে প্রবন্ধ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন—দিনাজপুরের অন্তর্গত দেবকোট নামক স্থানে একটি সেনা নিবাস সংস্থাপিত করিয়া, বক্তিয়ার যুদ্ধ কলহে লিপ্ত ছিলেন ; এবং সেই সেনা নিবাসই তাঁহার বিজয় রাজ্যের পূর্ব্বোত্তর সীমা বলিয়া পরিচিত ছিল। এই সেনা নিবাসে ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দের সম সময়ে বক্তিয়ার খিলিজির মৃত্যু হয়। উত্তর বঙ্গের "রাজন্যরাজণ্যকগণ" দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত বাহুবলে স্বাধীনতা রক্ষা করিবার কথা অধ্যাপক ব্লকম্যান স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। এই সকল প্রমাণ অতি বৃদ্ধ মুসলমান সৈনিকের অলৌকিক আখ্যায়িকার সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে না।

সে আখ্যায়িকায় যে "নওদিয়ার" রাজধানী ও "রায় লছমনিয়া" নামক নরপতির উল্লেখ আছে, তাহার সহিতও শাসন লিপির সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে কেহ অনুমান করিয়া লইয়াছিলেন, —"নওদিয়া" নবদ্বীপের অপভ্রংশ মাত্র, "লছমনিয়াও" তবে লক্ষ্মণসেনের অপভ্রংশ। মিনহাজ লিখিয়া গিয়াছেন,—"রাজ্যাব্দের অশীতিবর্ষে বক্তিয়ার খিলিজির দিগ্বিজয় সুসম্পন্ন হইয়াছিল।" তদনুসারে আর একটি অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করা অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল। কাহারও পক্ষে অশীতিবর্ষ রাজ্যভোগ করা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না ;—শৈশবে সিংহাসনে আরোহন করিবার অনুমানও লক্ষ্মণসেনের পক্ষে সুসঙ্গত হইতে পারে না! কারণ, তিনি যে পরিণত বয়সেই পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন, তাহার নানা প্রমাণ ও কিংবদন্তী সংস্কৃত সাহিত্যে সুপরিচিত। বল্লাল ও লক্ষ্মণসেনের মধ্যে যে সকল কবিতা বিনিময় হইত, তাহা এখনও কণ্ঠে কণ্ঠে ভ্রমণ করিতেছে। এরূপ অবস্থায় একটি অসামান্য অনুমানের অবতারণা করা অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল। সকল রাজার পক্ষেই সিংহাসনে আরোহণ করিবার সময় হইতে রাজ্যাব্দ গণনা করিবার রীতি প্রচ-

লিত ছিল ;—লক্ষ্মণসেনের পক্ষে তাঁহার জন্মতিথি হইতে অব্দ গণনা করিবার একটি অসামান্য রীতির অনুমান করিয়া লওয়া হইয়াছিল। "লক্ষ্মণ সংবৎ" নামক একটি অব্দ গণনা রীতি অদ্যাপি মিথিলায় কোন কোন স্থানে প্রচলিত আছে ;—এক সময়ে নানা স্থানে এই অব্দ ধরিয়া শিলালিপি খোদিত হইত। শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয় বুদ্ধগয়ার দুইখানি শিলালিপিতে এইরূপ অব্দ গণনার উল্লেখ দেখিয়া, তাহার সমালোচনা করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন,—"৫১ লক্ষ্মণাব্দের পূর্ব্ব কোনও সময়ে লক্ষ্মণসেনদেবের দেহান্তর সংঘটিত হয়।" মুসলমান ইতিহাস লেখক লক্ষ্মণসেনকে পলায়নকলঙ্কে কলঙ্কিত করেন নাই। তদীয় রাজ্যাব্দের অশীতিবর্ষে দিগ্বিজয়ের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন ;—আমরাই তথ্য নির্ণয়ে অগ্রসর না হইয়া অনুমান বলে "রায় লছমনিয়াকে" লক্ষ্মণসেন বলিয়া ধরিয়া লইয়া, অযথা কলঙ্কে স্বদেশের ইতিহাস মলিন করিয়া তুলিয়াছি। দুঃখ এই, যে বর্ষে এই সকল তথ্য আবিষ্কৃত হইয়া, লক্ষ্মণসেনের অলীক কলঙ্কের অপনোদন করিয়া দিয়াছে, ঠিক সেই বর্ষেই কলা-সমিতির পক্ষ হইতে এক চিত্রকরের "পলায়ন-কলঙ্ক" নামক একখানি সর্ব্বথা কাল্পনিক চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে ; আর সেই সুনিপুণ চিত্রকর—একজন বাঙ্গালী!

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

ঈথর।

বাজিকর যখন দূরে দাঁড়াইয়া দুর্বোধ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে তাহার পুঁতুলগুলিকে নাচাইতে আরম্ভ করে, দর্শক মাত্রেরই তখন বিস্ময়ের উদ্রেক হইয়া পড়ে। বলা বাহুল্য মন্ত্রের আশ্চর্য্য শক্তির উপর বিশ্বাস করিয়া এই বিস্ময়ের উদয় হয় না। সহস্র সহস্র চক্ষুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে এড়াইয়া বাজিকর যে কৌশলে লুক্কায়িত তারগুলিকে টানিয়া ভেল্‌কি দেখাইতেছে দর্শকগণ তাহারি কথা মনে করিয়া বিস্মিত হন।

বাজিকরের ভেল্‌কি ব্যতীত অনেক ভেল্‌কি প্রতিদিন আমাদের নজরে আসিয়া পড়িতেছে। আমরা কোন অতিপ্রাকৃত কারণ নির্দ্দেশ করিয়া তাহাদের ব্যাখ্যান দিবার চেষ্টা করি না। প্রাকৃত শক্তি যখন নানা জটিল অবস্থার ভিতর বিচিত্র আকারে আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়, তখন কেবল মূর্ত্তি দেখিয়া তাহাকে প্রকৃতির দূত বলিয়া চিনিয়া লওয়া সত্যই কঠিন হইয়া পড়ে। কিন্তু এ প্রকার ছদ্মবেশ অধিক দিন ভুলাইয়া রাখিতে পারে না। যে অতিসূক্ষ্ম তার টানিয়া প্রকৃতি দেবী ভেল্‌কি দেখাইয়া থাকেন, তাহা শেষে ধরা পড়িয়া যায়।

আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর হইল জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত্ ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল্ ঐ প্রকার কতকগুলি প্রাকৃতিক ভেল্কির কারণ নির্দ্দেশ করিবার জন্য গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন। বহুদূরে অবস্থিত দুই পদার্থ কি প্রকারে পরস্পরকে আকর্ষণ করে, এবং কোটি কোটি যোজন দূরবর্ত্তী জ্যোতিষ্কের তাপালোক কাহাকে অবলম্বন করিয়া ছুটাছুটি করে, তাহা স্থির করাই গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি এই বিষয়টিকে (Action at a distance) অবলম্বন করিয়া যে একটি জ্ঞানগর্ভ ও নবতত্ত্বপূর্ণ বক্তৃতা পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা আজও অতুলনীয় হইয়া রহিয়াছে।

দূরে দাঁড়াইয়া কোন বস্তুকে সচল করিতে হইলে, একটা সংযোজক পদার্থের একান্ত আবশ্যক। এই সংযোজক পদার্থ অবলম্বনে বল প্রয়োগ করিয়া চালক বস্তু মাত্রকেই সচল করিয়া থাকে। শিলাখণ্ডকে নড়াইতে হইলে আমরা তাহাতে রজ্জু বাঁধিয়া টানিয়া থাকি কিংবা বংশদণ্ড দিয়া তাহাকে ঠেলিতে আরম্ভ করি। শরীরের বল ঐ সংযোজক রজ্জু বা বংশখণ্ডকে অবলম্বনে শিলায় পৌঁছিয়া তাহাকে স্থানচ্যুত করে। মহাশূন্যে অবস্থিত জ্যোতিষ্কগুলি যে পরস্পরকে আকর্ষণ করে, তাহাতে আর মতদ্বৈধ নাই। ইহা কেবল বৃহৎ জড়পিণ্ডেরই বিশেষ ধর্ম্ম নয়। শত সূর্য্যোপম বৃহৎ নক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া অতি সূক্ষ্ম ধূলিকণা পর্য্যন্ত সকলি আকর্ষণধর্ম্মী। জড়বস্তু সকল কি প্রকারে পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণের পরিচালনা করে, তাহা স্থির করিবার জন্য এ পর্য্যন্ত প্রাচীন ও আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ অনেক গবেষণা করিয়া আসিতেছেন। কোন বিষয় লইয়া একাধিক ব্যক্তি গবেষণা করিতে থাকিলে, প্রায়ই শেষে মতের অনৈক্য উপস্থিত হয়। কিন্তু এই ব্যাপারে সকলে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। যখন বহুদূরবর্ত্তী হইয়াও পদার্থ সকল পরস্পরকে টানাটানি করে, তখন নিশ্চয়ই কোন এক অতীন্দ্রিয় পদার্থ দ্বারা সমস্ত ব্যবধান পূর্ণ আছে বলিয়া সকলেরই বিশ্বাস হইয়াছিল, এবং দূরবর্ত্তী পদার্থগুলিকে এই অতীন্দ্রিয় বস্তুই সংযুক্ত রাখে বলিয়া তাঁহাদের প্রত্যেকেই স্থির করিয়া ছিলেন।

কোন জিনিসের এক অংশ ধরিয়া টানিলে সমগ্র জিনিসটাতে টান্ পড়ে। ইহাও একটা অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার। পদার্থের গঠনের খবর জানিতে গেলে, বৈজ্ঞানিকগণ বলেন—পদার্থ মাত্রেই অণুময়, এবং অণুগুলি এ প্রকার ভাবে সুসজ্জিত যে কেহ কাহাকে স্পর্শ করিয়া থাকে না। অর্থাৎ অণুগুলির মধ্যে বেশ একটু বিচ্ছেদ রহিয়া যায়। এই প্রকার সুস্পষ্ট বিচ্ছেদ থাকা সত্ত্বেও, কতকগুলির অণুকে ধরিয়া টানিতে থাকিলে তাহাদের সহিত অপর অণুগুলির সঙ্কলন কেন হয়, তাহা বাস্তবিকই চিন্তার বিষয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ এই ব্যাপারটিরও মীমাংসার জন্য অনেক গবেষণা করিয়াছিলেন, এবং শেষে সিদ্ধান্ত হইয়াছিল, মালার পুষ্পগুলি যেমন বিচ্ছিন্ন থাকিয়াও সূক্ষ্ম সূত্রের দ্বারা বন্ধনে আবদ্ধ থাকে, পদার্থের বিচ্ছিন্ন অণুগুলিও সেই প্রকারে কোন এক সংযোজক পদার্থ দ্বারা নিশ্চয়ই পর-

স্পরের সহিত যুক্ত আছে। আমরা যখন বল প্রয়োগ করিয়া একটি লৌহশলাকাকে বাঁকাইতে আরম্ভ করি, তখন সেই সংযোজক পদার্থই টান্ পাইয়া বাঁকিতে আরম্ভ করে, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহারি সহিত আবদ্ধ অণুগুলি স্থানভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। যে অতীন্দ্রিয় পদার্থটি এই প্রকারে অণুর অবকাশে থাকিয়া তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ রক্ষা করে, এবং বায়ুমণ্ডল ও মহাশূন্যের সর্ব্বাংশে পরিব্যাপ্ত থাকিয়া পদার্থ মাত্রেই আকর্ষণ ধর্ম্মের বিকাশ করে, আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ তাহাকেই ঈথর নামে আখ্যাত করিয়াছেন।

ঈথরের অস্তিত্ব মানিয়া লইবার অপর কোনও আবশ্যকতা আছে কিনা, আমরা এখন আলোচনা করিব। জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত নিউটন সাহেব, তাঁহার মহাকর্ষণের নিয়মাদির আলোচনাকালীন ঈথরের ন্যায় একটা সর্ব্বব্যাপী পদার্থের অস্তিত্বের সম্ভাবনা জানিতে পারিয়াছিলেন। তিনি এক নিবন্ধে (Optical queries) স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, —জড়পদার্থ মাত্রকেই যদি কোন এক অতীন্দ্রিয় পদার্থের মধ্যে নিমজ্জিত বলিয়া মনে করা যায়, এবং এই জিনিসটি জড়ের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র স্বল্পচাপবিশিষ্ট হইয়া পড়ে বলিয়া যদি স্বীকার করা যায়, তবে মহাকর্ষণের নিয়মাদির একটা ব্যাখ্যান পাওয়া যাইতে পারে।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ নিউটনের পূর্ব্বোক্ত কথাগুলির সারবত্তা বুঝিয়া ঈথর নামক একটি জিনিসের অস্তিত্বে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেছেন। ইঁহারা বলিতেছেন, জড়ের মূল উপাদান অর্থাৎ ইলেকট্রনের উৎপত্তি হইবামাত্র সত্যই তাহার পার্শ্বস্থ ঈথরের চাপ কমিয়া যায়। মূল জড়পদার্থ —ইলেক্ট্রনের সহিত অতি অল্পদিন মাত্র আমাদের পরিচয় হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করিতেছেন, ঈথরেরই অংশ বিশেষ কোন প্রকারে বিকৃত হইয়া পড়িলেই ইলেক্ট্রনের উৎপত্তি হয়। এই অনুমান সত্য হইলে নিউটনের কথাগুলিরও সত্যতা প্রতিপন্ন হইবে বলিয়া অনেকে আশা করিতেছেন। সুতরাং ইলেক্ট্রন আবিষ্কারের পর হইতে যে ঈথরের অস্তিত্বের প্রমাণ আরো স্পষ্টতর হইয়া দাঁড়াইতেছে তাহা আর এখন অস্বীকার করা যায় না।

মহাকর্ষণের নিয়মাদির সহিত আমাদের বিশেষ পরিচয় আছে সত্য, কিন্তু এই আকর্ষণ ঠিক্ কি প্রকারে পদার্থে উৎপন্ন হয়, তাহা আমরা মোটেই জানি না। কাজেই ঈথরকে আকর্ষণের উৎপাদক রূপে জানিয়াও এ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বিশেষ বৃদ্ধি পায় নাই। এ জন্য কেবল মহাকর্ষণের অস্তিত্ব দেখিয়া, এখনও ঈথরের অস্তিত্ব স্বীকার করা যাইতেছে না। ঈথরের অস্তিত্ব এক আলোকের উৎপত্তির দ্বারাই বিশেষ ভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

তাপ আলোক এবং বিদ্যুৎ যে পদার্থ বিশেষের দ্রুত স্পন্দন দ্বারা উৎপন্ন হয়, এখন তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু যে জিনিস সেইপ্রকার স্পন্দনে স্পন্দিত হইতে পারে ব্রহ্মাণ্ড খুঁজিয়া তাহার দর্শন পাওয়া ভার। আমাদের পরিচিত কোন পদার্থেরই কম্পনকে আলোক স্পন্দনের অনুরূপ দ্রুত করা যায় নাই। অথচ আলোক-

বহ কোন একটা পদার্থের যে অস্তিত্ব আছে, তাহা সুনিশ্চিত। এই সুনিশ্চয়তার জন্য বৈজ্ঞানিকগণ একটা আলোকবহ পদার্থ মানিয়া লইয়া, তাহাতে আলোক উৎপাদন-উপযোগী অনেকগুলি ধর্ম্মের আরোপ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। গত শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল এক সময়ে বিদ্যা ও জ্ঞানে সকলের অগ্রণী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি ঈথরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিয়া স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, যে মহাশূন্যে গ্রহনক্ষত্রাদি অবস্থিত তাহা কখনই শূন্য নয়। কোন একটি পদার্থ নিশ্চয়ই সেই জ্যোতিষ্ক খচিত অনন্ত স্থানকে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। মানব শক্তি সেই পদার্থটিকে কোন ক্রমে স্থানচ্যুত করিতে পারে না। ইহাই গ্রহের সহিত গ্রহের এবং নক্ষত্রের সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া আসিতেছে। কোটিযোজন দূরবর্ত্তী জ্যোতিষ্কে হাইড্রোজেনের একটি অতিসূক্ষ্ম কণার স্পন্দন আরম্ভ হইলে, ঐ সর্ব্বব্যাপী পদার্থই স্পন্দনগুলিকে আনিয়া রশ্মি নির্ব্বাচন যন্ত্রের (Spectroscope) ভিতরে ক্ষীণ বর্ণছত্রের (Spectrum) উৎপত্তি করে।

আলোকের পরিবাহনই যে, ঈথরের অস্তিত্বের একমাত্র পরিচায়ক এখন আর সে কথা বলা যায় না। চৌম্বক এবং বৈদ্যুতিক ব্যাপারেরও মূলে ঈথরের কার্য্য ধরা পড়িয়াছে। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ফ্যারাডে ঈথরের সহিত বিদ্যুতের সম্বন্ধ আবিষ্কারের জন্য তাঁহার সমগ্র জীবনটি অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ঈথরই যে, চৌম্বক ও বৈদ্যুতিক ধর্ম্মের একমাত্র উৎপাদক পূর্ব্বোক্ত মহাত্মাই তাহা প্রথমে জানিয়াছিলেন।

বিদ্যুৎ ও চুম্বক লইয়া পরীক্ষা করিবার সময় বায়ুশূন্য পাত্রের ভিতর দিয়াও উহাদের শক্তির পরিচালনা প্রত্যক্ষ করিয়া ফ্যারাডে সাহেব মনে করিয়াছিলেন, সম্ভবত বাহিরের কোনও পদার্থ সর্ব্বদা বিদ্যুৎ ও চুম্বকের নিকটবর্ত্তী থাকিয়া ঐ সকল শক্তির প্রকাশ করে। এই অপরিচিত পদার্থের স্বরূপ নিরূপণের জন্য অনুসন্ধান আরম্ভ হইয়াছিল, এবং শেষে আলোকবহ ঈথরকেই বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক শক্তির উৎপাদক বলিয়া চেনা গিয়াছিল। যে ঈথর অনন্ত আকাশকে আচ্ছন্ন করিয়া অবস্থান করিতেছে, এক তাপালোকের পরিবাহন করিয়াই যে তাহার কার্য্য শেষ হইয়া যাইবে, এ কথা ফ্যারাডে সাহেব স্বীকার করিতে পারেন নাই। বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক শক্তির উৎপাদন এবং তাপালোকের পরিবাহন ব্যতীত ইহার আরো অনেক কার্য্য আছে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছিল।

পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিকদিগের গবেষণায় ফ্যারাডে সাহেবের পূর্ব্বোক্ত উক্তিগুলি ভবিষ্যৎ বাণীর ন্যায় সফল হইয়া পড়িয়াছে। ইঁহারা বিদ্যুৎ ও চুম্বকের শক্তির সহিত ঈথরের যোগসূত্র প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন, এবং ঈথরের আরো অনেক কার্য্যের আভাস পাইয়াছেন। অধ্যাপক টমসন্ (Prof J. J. Thomson) পরীক্ষা নিপুণতায় এবং অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞানে বৈজ্ঞানিক সমাজে অতি উচ্চ আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতি অল্পদিন হইল ইনিই বলিয়াছেন,—আমরা

ব্রহ্মাণ্ডে যতপ্রকার জড়বস্তু দেখিতে পাই, তাহা এক ঈথরেরই রূপান্তর মাত্র। তা ছাড়া পদার্থ মাত্রেরই অন্তর্নিহিত শক্তি এবং Momentum প্রভৃতিও সেই ঈথরেরই শক্তি হইতে উৎপন্ন।

ঈথরে পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম গুলির আরোপ করিতে হইলে, তাহাকে অত্যন্ত ঘন পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়ার আবশ্যক হয়। টমসন্ সাহেব এবং সার অলিভার লজ উভয়েই বলিতেছেন, ঈথরকে প্লাটিনম্ প্রভৃতি অত্যন্ত ঘন ধাতু অপেক্ষা সহস্রগুণে অধিক ঘন বলিয়া স্বীকার করা কোনক্রমে অসঙ্গত হইবে না।

জড় পদার্থের সহিত ঈথরের সম্বন্ধটি এখন আলোচনা করা যাউক। ঈথর জিনিসটি নিজে জড় পদার্থ কি না, এই প্রশ্নটির সদুত্তরের প্রত্যাশায় অনেককে বৈজ্ঞানিকের শরণাপন্ন হইতে দেখা যায়— আমরা প্রথমেই এই প্রশ্নটির আলোচনা করিব। ঈথর যে জড় জগতেরই জিনিস তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাকে জড় পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিবার অনেক অন্তরায় আছে। জড়ের সাধারণ ধর্ম্মের সহিত ঈথরের ধর্ম্মের অনেক অনৈক্য দেখা যায়। কাজেই আমরা জড় বলিলে যাহা বুঝি ঈথর তাহা নয়। মোটামুটি বলিতে গেলে, ঈথরকে জড় পদার্থেরই মূল উপাদান বলা যাইতে পারে।

লজ্ সাহেব যে একটি সুন্দর উদাহরণ দ্বারা জড়পদার্থ ও ঈথরের পার্থক্য প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা এখানে সেটির উল্লেখ করার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। লজ্ সাহেব বলিয়াছেন,—একখণ্ড রজ্জুতে একটি গ্রন্থি রচনা করিলে যেমন রজ্জুকে গ্রন্থি দ্বারা রচিত না বলিয়া গ্রন্থিকেই রজ্জু দ্বারা গঠিত বলি, সেই প্রকার ঈথরকে জড়ময় না বলিয়া জড়বস্তু মাত্রকেই ঈথরময় বলা উচিত। সকল জড় পদার্থকেই আমরা স্থানান্তরিত করিতে পারি, কিন্তু কোন শক্তি-দ্বারা ঈথরকে স্থানান্তরে লইয়া যাইতে পারা যায় না। জড় ও ঈথরের এই পার্থক্যটাই বিশেষ সুস্পষ্ট। ঈথর আবর্ত্তিত ও স্পন্দিত হইতে পারে, এবং পার্শ্বে চাপ (Stress) দিয়া নিজে প্রসারিত (Strained) হইবার ও চেষ্টা করিতে পারে, কিন্তু স্থানান্তরিত হইতে পারে না।

ঈথর জিনিসটা যে, সাধারণ কঠিন পদার্থের ন্যায় নয়—তাহা বৈজ্ঞানিক মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। ইহা নিশ্চয়ই কোন দ্রব পদার্থের (Fluid) আকারে সমগ্র বিশ্বকে জুড়িয়া রহিয়াছে বলিয়াই বৈজ্ঞানিক-গণ বিশ্বাস করিয়া আসিতেছেন। এখন প্রশ্ন হইতে পারে,—যে জিনিসটি নিজেই দ্রব তাহা দ্বারা নানা কঠিন বস্তুর উৎপত্তি কি সম্ভবপর? জলের ন্যায় দ্রব বস্তু দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ যে প্রকার অসম্ভব, ঈথর দ্বারায় লৌহ প্লাটিনম্ প্রভৃতি ধাতুর উৎপত্তিও প্রথম দৃষ্টিতে সেইপ্রকার অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা নয়। অনেক সূত্রে দ্রব পদার্থকে ঠিক কঠিন বস্তুর ন্যায়ই কার্য্য করিতে দেখা যায়। লর্ড কেল্‌ভিন এবং অধ্যাপক লজ্ এই সম্বন্ধে অনেক পরীক্ষা করিয়াছিলেন। আমরা এখানে তাঁহাদেরি দুই একটি পরীক্ষার

বিবরণ দিয়া, দ্রব বস্তুর কঠিনবৎ কার্য্যের কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

সাধারণ রেসমের সূত্রকে কখনই লৌহ শলাকার ন্যায় কঠিন বলা যায় না। কিন্তু একটি কপিকলে রেসম সূত্রকে মালাকারে বাঁধিয়া অতি দ্রুতবেগে ঘুরাইতে থাকিলে তাহাকে সত্যই কঠিন হইতে দেখা যায়। এই অবস্থায় সূত্রটিকে ধরিয়া কম্পিত করিতে থাকিলে, কম্পন তরঙ্গাকারে সূত্রের উপর দিয়া চলিতে আরম্ভ করে। হিসাবে দেখা যায়, সূত্র যে বেগে ঘুরিতে থাকে, কম্পনগুলি তরঙ্গাকারে ঠিক সেই বেগেই সূত্রের উপর দিয়া সঞ্চলন করে। * শিকলকে আবর্ত্তিত করিতে থাকিলে, তাহাকেও ঠিক ঐ প্রকারে লৌহ দণ্ডের ন্যায় দাঁড়াইতে দেখা যায়।

জলের ভিতর হাত ডুবাইতে গেলে, হাত অবাধে জলে প্রবেশ করে। এই জলকেই পিচকারির মুখ দিয়া জোরে বাহির করিতে থাকিলে, তাহা কঠিন ইষ্টকের ন্যায় কার্য্য করে। এই অবস্থায় খরধার ছুরিকাকেও জল মধ্যে প্রবেশ করানো দায় হয়। সাধারণ কাগজকে বৃত্তাকারে কাটিয়া ঘুরাইতে থাকিলে, তাহাকে ঠিক লৌহচক্রবৎ কঠিন হইতে দেখা যায়। ইস্পাতের স্থূল ফলকগুলিকে কাটিতে হইলে, চক্রাকার করাতকে ঐ কারণেই দ্রুত ঘুরাইবার রীতি দেখা যায়। সাধারণ লৌহের করাত ঘুরিবার সময় এত কঠিন হইয়া দাঁড়ায় যে, তদ্বারা ইস্পাতের ন্যায় অতি কঠিন জিনিসও অনায়াসে দ্বিখণ্ডিত হইয়া পড়ে।

পূর্ব্বোক্ত উদাহরণগুলি হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে, ঈথর জিনিসটা নিজে দ্রব পদার্থ হইলেও, অতি দ্রুতবেগে ঘূর্ণিত হইলে, তাহাতে কাঠিন্যাদি জড়ের অনেকগুলি ধর্ম্ম আপনা হইতেই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। সুতরাং ঈথর হইতে জড়ের উৎপত্তি কোন ক্রমে অসম্ভব নয়।

নানা প্রকার যন্ত্র সাহায্যে ঈথরকে ঘুরাইয়া তাহার কার্য্য দেখিবার জন্য বৈজ্ঞানিকগণ এ পর্য্যন্ত অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সার অলিভার লজ্ ঈথরে আন্দোলন উপস্থিত করিবার জন্য এক লৌহচক্র নির্ম্মাণ করিয়া সেটিকে প্রতি মিনিটে চারি হাজার বার ঘুরাইয়া এবং তাহার উপর অলোক পাত করিয়া, ঈথরকে চঞ্চল করিতে পারেন নাই। এই সকল দেখিয়া মনে হয়, উহাকে ঘূর্ণিত করিবার কৌশল কখনই সহজে আমাদের করায়ত্ত হইবে না। কিন্তু বৈদ্যুতিক উপায়ে ঈথরকে স্পন্দিত করিবার যে কৌশল আছে, তাহা এখন আর আমাদের অজ্ঞাত নাই। বিদ্যুৎযুক্ত পদার্থকে ঘন ঘন আন্দোলিত করিতে থাকিলে, ঈথর আপন হইতেই তরঙ্গিত হইয়া পড়ে। তা ছাড়া কোন বিদ্যুৎযুক্ত পদার্থকে সহসা বিদ্যুৎ মুক্ত করিলেও ঈথরে তরঙ্গ উঠিতে আরম্ভ করে। এই প্রকারে

* গতিশীল পদার্থের এই অস্থায়ী কাঠিন্যকে শাস্ত্রকারগণ Kinetic rigidity নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই অবস্থায় পদার্থটিতে কোন প্রকার তরঙ্গের উৎপত্তি করিলে, তাহা পদার্থেরই আবর্ত্তণ বেগ প্রাপ্ত হইয়া চলিতে থাকে। গণিতশাস্ত্রের এই সিদ্ধান্তটি ঈথর ঘটিত গণনাশাস্ত্রেরই একটা প্রধান সহায়।

ঈথর-তরঙ্গের উৎপাদন করা এখন অতি সহজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রন্জেন্ রশ্মি (বা X Rays) আজকাল ঐ প্রকার বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়াতেই উৎপন্ন করা হইয়া থাকে।

ঈথরকে গতিশীল করিবার সহস্র চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়াও বৈজ্ঞানিকগণ ইহার অস্তিত্বে কণামাত্র সন্দেহ প্রকাশ করেন নাই। তাপালোক এবং বিদ্যুৎ চুম্বকের প্রত্যেক কার্য্যে ঈথরের অস্তিত্বের যে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাই ইঁহাদের বিশ্বাসকে চিরদিন অক্ষুণ্ণ রাখিবে।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

মন্বন্তরে মালগুজারি।

পূর্ণিয়া যখন মহা শ্মশানে পরিণত হইল—পূর্ণিয়ার অধিবাসীগণ যখন তৃণাদি আহার করিয়া জীবন ধারণ করিল, শেষে পুত্র কন্যাও বিক্রয় করিল—যখন টাকায় ৩ মণের স্থলে ৩০ সের মাত্র চাউল মিলিতেছিল * শেষে যখন তাহাও আর মিলিতেছিল না (নহিলে লোকে তৃণাদি খাইবে কেন?) —তখনো পূর্ণিয়া হইতে সরকারের রাজস্ব যথারীতি আদায় হইয়াছিল! † নদীয়ার যে বন্দোবস্ত হইয়াছিল কোম্পানী বাহাদুর তাহাতেও লাভবান হইয়াছিলেন। ‡

চাকুরী রক্ষার মায়ায় অনেকেই অনেক অকরণীয় কার্য্য করিয়া থাকেন—সুপারভাইজরগণও ছলে বলে কৌশলে রাজস্ব আদায় করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের চরিত্রালোচনা নিষ্ফল। কোম্পানীর একজন অন্যতম প্রধান কর্ম্মচারী রিড সাহেব যখন লিখিয়াছিলেন—মাসিক কিস্তিবন্দী অনুযায়ী রাজস্ব আদায় করিবার জন্য সুপারভাইজরদিগকে বিশেষ করিয়া সতর্ক করা হইয়াছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাঁহারা সর্ব্বান্তঃকরণে সেই আদেশ পালন করিতেছেন, § তখনই বুঝিতে হইবে যে সুপারভাইজরগণ রাজস্ব আদায় করিতে বিন্দুমাত্রও শিথিলতা প্রদর্শন করেন নাই।

রাজস্বের কর্ত্তাগণ (Comptrolling Committee) ফোর্ট উইলিয়ম হইতে মুর্শিদাবাদের কৌন্সিলকে লিখিলেন—দেশের অবস্থা বিবেচনায় যতদূর পার বকেয়া আদায় করিয়া ফেল। যদিও বাংলায় দারুণ দুঃসময় আসিয়াছে, কিন্তু সাবধান, এই দুর্দ্দিনের ছল করিয়া হয়ত অনেকে

* Letter from Mr. Ducarel, Supervisor of Purneah, 3 Feb, 1771

† Letter from Mr. Ducarel, Supervisor of Purneah 3 Decr, 1770.

‡ Bengal General letter (Revenue Department) 27 February, 1773.

§ Letter from Mr. Reed, Member of the Provincial council to the President and Council : 17 Decr, 1770.

কোম্পানী বাহাদুরকে ফাঁকি দিবে। আমরা তোমাদের যত্ন ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টির উপরই নির্ভর করিয়া আছি। * মুর্শিদাবাদ হইতে উত্তর গেল—আমরা কয়েক দিন মাত্র এই গুরুতর কার্যভার গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু ইহারই মধ্যে প্রায় পূর্ব্ব বৎসরের সমান অর্থ আদায় করিয়া ফেলিয়াছি !! †

কোম্পানী বাহাদুরের করুণার সীমা ছিল না। তাঁহারা কলিকাতা হইতে সুপারভাইজরদিগকে উপদেশ দিতেছিলেন এই দুর্দ্দিনে প্রজাদিগকে যথা শক্তি সাহায্য করিও, কিন্তু মনে রাখিও যে কোম্পানীর রাজস্বের যেন কোন ক্ষতি না হয়। ‡

সুপারভাইজরদিগের মধ্যে যাঁহারা দেশের প্রকৃত অবস্থা জানাইয়া কোম্পানী বাহাদুরকে পুনঃ পুনঃ বিরক্ত করিতে লাগিলেন, তাঁহারা রাজসাহীর রাউস সাহেবের মত কোম্পানীর বিরক্তিভাজন হইয়া উঠিলেন। যাঁহারা বাংলার সকল অবস্থা সম্যক জানিয়াও মহম্মদরেজা খাঁর মত স্বদেশবাসীর কণ্ঠচ্ছেদনে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং অনেক প্রজা অন্নাভাবে মরিতেছে ও অনেকে পলায়ন করিয়াছে জানা সত্ত্বেও রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইতে লাগিলেন—এক কপর্দ্দকও মাপ দিলেন না § এবং ঢাকার মিডল্‌টন সাহেবের ন্যায়—যে টাকা বহু বৎসর হইতে অনাদায়ী ছিল তাহা পর্য্যন্ত নূতন করিয়া আদায়ের ব্যবস্থা করিলেন, তাঁহারা অনতিবিলম্বে সরফরাজ হইয়া উঠিলেন ! ¶

মুদ্রার পরিবর্ত্তে শস্য দিয়া রাজস্ব পরিশোধ বাংলার চির প্রচলিত প্রথা। কিন্তু মন্বন্তরের সময় ধান্যের অভাব হইয়াছিল। বাঙ্‌লার রামধন ও মবারক তখন নগদ মুদ্রায় রাজস্ব পরিশোধ করিতে চাহিল। ইংরাজ তহশিলদার দেখিলেন একটী সুযোগ

* We must enjoin you, gentlemen, to cut your best endeavours for the reduction of it (balance) as far as the circumstances of the country will admit; for though we are sensible of the distress it has suffered, yet we are also sensible that many will endeavour to avail themselves of this public calamity; and we trust to your care and watchfulness to prevent them as much as possible—26 April, 1771.

†...The year was ha f elapsed when we proceded to execute the trust reposed in us, and that under the most discouraging circumstances, we have been so successful, as to realise a revenue nearly equal to that collected in the preceding year.—9th May 1771.

‡ Consultation (Select committee) 7 Decr, 1769.

§ Proceedings of the Prov. council at Moorsedabad 24 Nov. 1770

¶ The increase, as I have stated it, appears inconsiderable,...the sum of Rs. 129537-1-3 has been abated in the settlement as an *allowed deficiency*...The Zemindars have agreed to pay this difference in future—in fact it must be deemed an increase, having never before been collected.

Letter from Mr. Middleton on circuit, at Dacca 18th May 1771

সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে—তিনি ধান্যের মূল্য তিন টাকা করিয়া মণ ধার্য্য করিলেন অথচ পূর্ব্বে এক টাকায় এক মণ মিলিত! যাহারা এই হিসাবে টাকা দিতে অসমর্থ হইল তাহারা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল—যাহারা পলায়ন করিতে পারিল না তাহারা একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। * ইতিহাস তাই জিজ্ঞাসা করে শুধু কি এক বৎসরের অজন্মায়—এক বৎসরের মন্বন্তরেই সোণার বাংলা শ্মশান হইয়াছিল?

প্রবল বন্যায় যে সকল স্থানে নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল—বাঁধ ভাঙ্গিয়া যে সকল স্থান জলমগ্ন হইয়াছিল, সেই সকল স্থানের প্রজাদিগের জন্য কোম্পানী বাহাদুর একান্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন বটে—এবং তখনকার মত নিজ ব্যয়ে ভগ্ন বাঁধ সংস্কৃত করিয়াছিলেন কিন্তু—এই কিন্তুতেই চিরকাল বাংলার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া আসিতেছে! সরকার বাহাদুর বাঁধ বাঁধিলেন বটে কিন্তু সুপারভাই-জরদিগের কানে কানে কহিয়া দিলেন—যদি দেশের প্রথাবিরুদ্ধ না হয় তবে সুদিন আসিলে প্রজাদের নিকট হইতে বাঁধের খরচাটা আদায় করিয়া লইও। †

রাজসাহীর সুপারভাইজর রাউস সাহেব সর্ব্বদা স্বচক্ষে তথাকার দুর্দ্দশা দেখিতেছিলেন। একে প্রবল বন্যা, তাহাতে আবার ভীষণ দুর্ভিক্ষ! তিনি বুঝিতেই পারিয়াছিলেন, প্রজাদের খাজনা দিবার উপায় ছিল না। তিনি তাই বারংবার কোম্পানী বাহাদুরকে সে কথা জানাইতে লাগিলেন। কোম্পানী বাহাদুর অধীন কর্ম্মচারীর এরূপ ধৃষ্ট ব্যবহার দেখিয়া বিরক্ত হইয়াছিলেন। রাউস সাহেব তাই একান্ত ব্যথিত হৃদয়ে কলিকাতায় লিখিয়াছিলেন—'আমার একান্ত সদিচ্ছা থাকিলেও আমি হয়ত কর্ম্মপটু না হইতে পারি ..আপনারা যে বিরক্ত হইয়াছেন ইহাতে আমি একান্ত দুঃখিত হইয়াছি। আপনারা যদি মনে করিয়া থাকেন যে ভাতুড়িয়া পরগণার আমি যে বর্ণনা করিয়াছি তাহা অতিরঞ্জিত…তাহা হইলে আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, যিনি এ জেলা পরিদর্শন করিতে আসিবেন তিনি যেন নিজে ভাতুড়িয়া পরগণার অবস্থা প্রত্যক্ষ করেন।‡'

উহার ফলে কি হইয়াছিল তাহা এখন জানিবার উপায় নাই। কিন্তু কিছুকাল পরে তিনি পুনরায় কলিকাতায় জানাইয়াছিলেন—'আমার ইহাই বিশ্বাস ছিল যে, যে স্থানের তত্ত্বাবধান ভার আমার উপর অর্পিত হইয়াছে সেই স্থানের সকল অবস্থা—সকল সংবাদ সর্ব্বদা আপনাদের নিকটে নিবেদন করাই আমার প্রধান কর্ত্তব্য। এ কথা আমার কখনো মনে হয় নাই যে এ প্রদেশের দুর্দ্দশার কাহিনী নিবেদন করিলেই, কোম্পানীর রাজস্ব বাকি ফেলিতে প্রজাদিগকে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে।'

সরকার বাহাদুর কলিকাতায় আসিয়া এতদিন কেবল পরের মুখে ঝাল খাইতে-

---

* Letter from Mr. A. Higginson, Supervisor of Beerbhoom 22 Feb. 1771

† Proceedings of the Provincial council at Moorshedabad 1st April 1771.

‡ Letter from Mr. Rous, Supervisor of Rajshahi, Nattore, 5th May, 1771

ছিলেন। তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন মন্বন্তরে বঙ্গের অবস্থা কিরূপ হইয়াছে তাহা স্বচক্ষে দর্শন করাই সঙ্গত। কিন্তু দেশের লোকে চিরদিন যেমন দেশের সর্ব্বনাশ করিয়া আসিতেছে, তখনো তাহাই করিয়াছিল!

কোম্পানী বাহাদুর তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া নায়েব-দেওয়ানের অভিমত জিজ্ঞাসা করিলেন। নায়েব-দেওয়ান অম্লান-বদনে কহিলেন —এখন কি আপনাদের দেশ ভ্রমণে বাহির হওয়া উচিত? এখন বাহির হইলেই বঙ্গের প্রজাবর্গ আসিয়া আপনাদের চরণতলে নিপতিত হইবে এবং তাহাদের দুঃখ দৈন্যের অশ্রু বর্ষণ করিয়া চরণতল ধৌত করিবে! তখন প্রজাদের অবস্থা দেখিয়া আপনারা 'তক্কভি' প্রদান না করিয়া ফিরিতে পারিবেন না। এখন আবাদের সময়, যদি জমীদারগণ কোন প্রকারে—পাকে-চক্রে আবাদে বিলম্ব ঘটাইয়া ফেলেন তবেই আমো সর্ব্বনাশ হইবে। আবাদ শেষ হউক—বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ হউক—তারপর আপনারা দেশের অবস্থা দেখিতে বাহির হইবেন।* কোম্পানী বাহাদুর আর নড়িলেন না। আমরা শুদ্ধ ইংরাজেরই দোষ দিয়া থাকি—কিন্তু একথা বিবেচনা করি না সেই ষোড়শ শতাব্দী হইতে আজ পর্য্যন্ত নীরব ইতিহাস অঙ্গুলি নির্দ্দেশে সর্ব্বদা দেখাইয়া দিতেছে যে বিদেশী ইংরাজ অপেক্ষা স্বদেশী আমরাই অধিক অপরাধী।

বাংলার লোক খাইতে পাইল না—অনাহারে মরিয়া গেল—যাহারা নিতান্তই মরিল না তাহারাও পলায়ন করিল, কিন্তু কোম্পানী বাহাদুরের রাজস্ব কমিল না বরং —আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল! মহম্মদ রেজা খাঁ ইংরাজ বাহাদুরের নিকট নিবেদন করিলেন —'যদিও দেশে এক বিন্দু বারিপাত হয় নাই, তবুও ১৭৭০ খৃঃ অব্দের রাজস্ব যতদূর সম্ভব সমস্তই আদায় করিয়াছি, যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে এখন তাহা আদায় করিলে প্রজাগণ বিনষ্ট হইবে—দেশ ধ্বংস হইবে এবং আগামী বর্ষের রাজস্বেরও বিশেষ ক্ষতি হইবে, রেজা খাঁ যদিও লিখিয়াছিলেন যে তখনো কিছু রাজস্ব আদায় করিতে বাকী ছিল—কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এক কপর্দ্দক ও অনাদায়ী ছিল না! বর্দ্ধমানের মহারাজা তেজচাঁদ কোম্পানী বাহাদুরকে জানাইয়াছিলেন—দারুণ দুর্ভিক্ষে বঙ্গ-প্রজা একেবারে নিষ্পিষ্ট হইলেও রাজস্ব সম্পূর্ণ আদায় হইয়াছে—কিছুই বাকী বকেয়া নাই! বাঙলা যাহা দিতে পারিয়াছিল ফৌজদার রুস্তুম খাঁ সে সমস্তই শোষণ করিয়া কোম্পানীর অর্থালয় পূর্ণ করিয়াছিলেন। মহম্মদ রেজা খাঁ পুনঃ পুনঃ কোম্পানী বাহাদুরকে জানাইয়াছিলেন—আমি যথাশক্তি সরকারের ইষ্টসিদ্ধি করিতেছি—দোহাই ধর্ম্মের—আমার কোন শৈথিল্য নাই!

অবশেষে যখন হিসাব নিকাশের সময় আসিল তখন দেখা গেল যে দুর্ভিক্ষের পূর্ব্ব বৎসর কোম্পানী বাহাদুর বাঙলা হইতে যে পরিমাণ রাজস্ব আদায় করিয়াছিলেন মন্বন্তরের বৎসরে তাহা অপেক্ষা শতকরা দশ টাকা করিয়া অধিক আদায় করিয়াছিলেন! কিন্তু হেষ্টিংস সাহেব বলিয়াছিলেন ১৭৬৮-৬৯খৃঃ

* Extract from the Bengal Committee of Revenue 1st April, 1771.

অব্দে (মন্বন্তরের পূর্ব্ব বৎসর) বাঙ্গলায় যে রাজস্ব আদায় করা হইয়াছিল তাহাকেই আদর্শ বলা যাইতে পারে! যখন বঙ্গভূমি শ্মশান হইল তখন কোম্পানী বাহাদুর বাঙ্গলা হইতে তাঁহাদের আদর্শেরও অধিক আদায় করিয়াছিলেন! বর্ত্তমান সদাশয় গবর্ণমেণ্ট কি এমন পারিতেন? হিন্দু নৃপতি বা মুসলমান নবাব কি এমন করিয়াছিলেন? পূর্ব্বে কেহ যাহা পারেন নাই—কোম্পানী বাহাদুর তাহা পারিলেন! *

বাঙ্গলার রামধন ও মবারক কি করিবে? তাহারা চিরদরিদ্র চির অনশন-ক্লিষ্ট চির-প্রপীড়িত চির-অর্থশূন্য। রামধন তাহার কণিষ্ঠ পুত্রকে বিক্রয় করিল, মবারক তাহার কন্যাকে বিক্রয় করিয়া সেই অর্থে কোম্পানীর ঋণ পরিশোধ করিল! তবুও তাহারা মরিল না—বঙ্গভূমি একেবারে সাহারার মরু হইল না! ইহা বিধাতার আশীর্ব্বাদ কি অভি-সম্পাত তাহা বুঝিতে পারি না। বাঙ্গলার ইতিহাস নাই—বাঙ্গলার রামধন ও মবার-কের কাহিনী কেহ লেখে না; কিন্তু যে সকল দেশের ইতিহাস আছে তাহার কোন এক খানিতেই কি দেখিয়াছ যে দেশের রামধন ও মবারক রাজস্ব পরিশোধের জন্য গৃহের অন্যান্য তৈজসের সহিত পুত্র-কন্যাও বিক্রয় করিয়াছে? বাঙ্গলার কৃষক তাহাই করিয়াছিল! † তাই এক জন ইংরাজ বড় দুঃখে কহিয়াছেন—

The condition of agricultural labourers in India is a disgrace to any country calling itself civilised.‡

সমাপ্ত।

শ্রী—

---

* রাজস্বের হিসাব।

Bengal General Letter (Rev. Dept.)

3rd Novr. 1772.

Bengal year 1175 or 1769-69. net collections— 15254856-9-4-3

Bengal year 1176 or 1769 the year of dearth, which was production of the famine in the following year— 13149148-6-[illegible]-2

Bengal year 1177 or 1770 the year of the fam ine and mortality— 14006030- 7-3-2.

Bengal year 1178 or 1771 — 15726576-10-2-1

Deduct the amount of deficiencies occasioned in the revenue by unavoidable losses to Govt.—392915-11-12-3

15333660 14-9-2

† The Ryots both of Bengal and Behar, when much reduced or harassed by the Government free their very children to raise money, much less do they spare their effects and cattle.

Consultation (Select Committee) 7th December, 1269.

c. f. Bolt's Consideration on Indian affairs (1772).

‡ W. R. Robertson (Agricultural Department) Madras.

মহম্মদীয় অভ্যুদয়।

আরবের মরুভূমি অতিক্রম করিয়া তখনও মুসলমানের জয়পতাকা প্রোথিত হয় নাই, স্বয়ং মহম্মদ তখনও মদিনায় রাজত্ব করিতেছেন, এমন সময়ে মুসলমান দূত বসরার শাসনকর্তার নিকট ধর্ম্মবার্ত্তা লইয়া তথায় চলিল।

বসরা তখন রোম সাম্রাজ্যের অধীনে, তখন পূর্ব্ব রোমের অধীশ্বর হিরাক্লিয়স সিজর উপাধি লইয়া অন্তিয়কা নগরে অধিষ্ঠিত। তখন সাগরজলকণাসিক্ত, বায়ু সেবিত, সুখ-সেব্য, মনোহরফল-পুষ্প-শোভিত, সিরিয়ার উদ্যান ভূমি রোমীয় বিলাসের-আলয়; তখন সিরিয়ার জগৎ বিখ্যাত রূপ লাবণ্যের মাধুরী, অন্তঃসার শূন্য অবসাদ-পূর্ণ রোমান জাতির ধ্বংসের কারণ স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। যে সময়ে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের সংযমিতা রাজপ্রাসাদের বিলাসিতার সহিত একত্রে বস বাস করিতে আপত্তি দেখে নাই, যে সময়ে ধর্ম্মের জন্য উৎপীড়িত দরিদ্রের পর্ণকুটীর হইতে বিস্তৃত হইয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম সিজরের রাজপ্রাসাদে স্থান পাইয়াছে, যে সময়ে নব প্রতিষ্ঠিত মুসলমান ধর্ম্ম বস্ত্রাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় কতিপয় মরুবাসী অর্দ্ধ-সভ্য আরববাসীর মধ্যে আবদ্ধ, সেই সময়ে একদিন মহম্মদের কাসেদ, হরেদ—বসরায় পত্র লইয়া চলিল, পথি মধ্যে হিরাক্লিয়সের প্রতিনিধি ও আরবীয় খ্রীষ্টান-দের নেতা শেরহিল কর্ত্তৃক হরেদ ধৃত হইল। দূত আপনার পরিচয় ও কর্ত্তব্য কিছুমাত্র গোপন না করাতে শেরহিল তাহার প্রাণদণ্ড করেন। হরেদ রক্তে মোটাগ্রামের ভূমি সিক্ত হইল। অজ্ঞাত-নামা মোটাগ্রাম ইতিহাসে স্থান পাইল, মুসলমান ও খ্রীষ্টানের বহু শতাব্দী ব্যাপী যুদ্ধের সূচনা হইল।

হরেদের হত্যা সংবাদ মহম্মদের নিকট পঁহুছিল; তিনি দূতের মৃত্যু বার্ত্তায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও প্রতিশোধের জন্য অধীর হইয়া পড়িলেন। তিন সহস্র সৈনিক যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইল, পিতৃ শত্রু বিনাশ করিতে, হরেদ-পুত্র জৈদ সেনাপতিরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন। মহম্মদের পিতৃব্য-পুত্র জাফর দ্বিতীয় সেনাপতি, ও তাহার পর অবদুল্লা রৌহুয়া স্থান পাইলেন। মুসলমান সেনা এই প্রথম বৈদেশিক যুদ্ধের জন্য যাত্রা করিল।

ক্রমে শত্রুদলকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া শেরহিল আপন ভ্রাতাকে তাহাদের পর্য্যবেক্ষণ জন্য পঞ্চাশ জন সৈনিক সহ পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু মুসলমানগণ তাহাদের চিনিতে পারিয়া অচিরাৎ বিনষ্ট করিল, শেরহিল ভগ্ন দূতের মুখে শত্রুর বল বিক্রম শুনিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন এবং হিরাক্লিসের নিকট সবিশেষ সংবাদ পাঠাইলেন।

হিরাক্লিয়ঃ সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র বিজ্ঞ রাজনৈতিকের ন্যায় কার্য্য করিলেন। তিনি শত্রুকে উপেক্ষা না করিয়া এক বিপুল সেনার আয়োজন করিয়া শত্রু নাশের জন্য পাঠাইয়া দিলেন।

যদি সংখ্যাধিক্য, উৎকৃষ্ট শস্ত্র, উত্তম শিক্ষা বা কায়িক বল, জয়লাভের নিশ্চিত কারণ হইত তাহা হইলে সেই রোমান সেনা অবাধে অক্লেশে উপস্থিত যুদ্ধে জয়লাভ করিত। কিন্তু মনুষ্য শরীরে এমন এক অশরীরী উপাদান আছে যাহা জাগ্রত হইলে জগতের সমস্ত পরিজ্ঞেয় বিষয়কে পরাজয় করিয়া নূতন যুগের অবতারণা করে। সেই অশরীরী উপাদান, সেই অশরীরী বল, —ভাব তরঙ্গ। যখন কোন জাতি সেই ভাব তরঙ্গের দ্বারা উৎক্ষিপ্ত হয়, তখন সেই জাতি নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আপনার আগ্নেয় স্রোতে চারিদিক উদ্ভাসিত করিয়া আপনার গন্তব্য পথ প্রজ্জ্বলিত করিয়া অক্ষয় পদ-চিহ্ন রাখিয়া চলিয়া যায়। জগৎ অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকে। দার্শনিক কারণ অনুসন্ধান করে, কবি যশোগীতি পাঠ করে। ঐতিহাসিক তাহার কার্য্য কলাপ লিপিবদ্ধ করে। কিন্তু অতর্কিতে কোথা হইতে যে তাহা আসিল কেহই বুঝিতে পারে না।

উভয় সেনা পরস্পরকে লক্ষ্য করিয়া নানা গতি প্রতি-গতি ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিল। নিয়তির গতি বুঝিবে কে? এইরূপ নানা কৌশল চালনার পর দুই দল সেই মোটা গ্রামে আসিয়া পরস্পরের সম্মুখীন হইল।

বহ্নিমুখ পতঙ্গের ন্যায় সেই ক্ষুদ্র মুসলমান সৈন্য বিপুল অরাতিকুলকে আল্লা হো আকবর রবে আক্রমণ করিল। প্রথম সংঘর্ষেই জেদ পিতৃরক্ত-সিক্ত ভূমিতে আপনার রক্তপাত করিয়া যেন পিতৃঋণ পরিশোধ করিয়া চিরনিদ্রায় শায়িত হইল। মহম্মদের আজ্ঞানুযায়ী জাফর সেনা চালনা করিতে লাগিলেন। ভীষণ যুদ্ধে তাঁহারও মৃত্যু হইল। এবার মহম্মদ নিয়োজিত আবদুল্লার পালা। আবদুল্লা সেনানায়ক হইলেন। ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। আবদুল্লা রণশায়ী হইলেন। সেনানায়ক শূন্য, যুদ্ধ কিরূপে চলিবে? সেই যুদ্ধক্ষেত্রে একজন বিংশতি বর্ষীয় যুবা অপরিমিত বলের সহিত, অসাধারণ সাহসের সহিত, অপূর্ব্ব কৌশলের সহিত যুদ্ধ করিতে ছিল, মুসলমানসেনা তাহাকে নায়ক মনোনীত করিল। মুসলমান-ধর্ম্মে নবদীক্ষিত—খালেদ আজ সমবেত মুসলমান সেনার দ্বারা সমরক্ষেত্রে মুসলমান ধর্ম্মের মান রক্ষার ভার প্রাপ্ত হইল। তখন সেই মুষ্টিমেয় মুসলমান সেনা, সাগরদুর্ব্বার শত্রু-দলকে সংক্ষুব্ধ করিয়া যুদ্ধ চালাইতে লাগিল। রাত্রি আসিল, যুদ্ধ বন্ধ হইল। রোমানগণ পরদিন শত্রু নির্ম্মূল করিবে আশা করিয়া, উষাগমের প্রত্যাশায় বসিয়া রহিল। পূর্ব্বাকাশ পরিষ্কার হইল, রোমানগণ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া শত্রুর সম্মুখীন হইল। কিন্তু তাহারা আসিয়া যাহা দেখিল তাহা কল্পনাতীত;—রাত্রিকাল মধ্যে মুসলমান সেনা অনেক গুণে পরিবর্দ্ধিত হইয়া আহবে তাহাদিগকে আহ্বান করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে, বহুদূর পর্য্যন্ত তাহাদের ব্যাপ্তি, নব সূর্য্যকিরণে তাহাদের শস্ত্রের বিকাশ; একি,

পূর্ব্বদিনের যুদ্ধে কি কেবল মহম্মদীয় সেনার পুরোভাগ মাত্র ছিল? আজ কি এই মহাচমূ নিশাযোগে তাহাদের নাশের জন্য অলক্ষিত ভাবে আসিয়া স্বদলের পুষ্টি সাধন করিয়াছে? রোমান স্তম্ভিত, ভীত, চকিত ও বিব্রত হইল। পলায়নপর শত্রুকে খালেদ আক্রমণ করিলেন, কিন্তু অনুসরণ করিলেন না। বহুসংখ্যক রোমান সৈন্য হত হইল, খালেদের বীরত্ব ও রণনৈপুণ্যের এই প্রথম বিকাশ। তিনি রোমান সেনার প্রাতঃকালে রণসজ্জায় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই আপনার ক্ষুদ্র চমূকে এমন ভাবে সাজাইয়া রাখিলেন যে শত্রু তাঁহার সৈন্য রচনা দেখিয়া, সংখ্যার অনুমান করিতে না পারিয়া ভয়ে পলায়ন করিল। তিনিও জয়োল্লাসে উন্মত্ত হইয়া তাহাদের অনুসরণ করিলেন না। কাসেদ হরেদের হত্যার প্রতিশোধ হইল, মোটার বিজন ক্ষেত্র রোমানরক্তে রঞ্জিত হইল, খালেদ সসৈন্যে মদিনায় ফিরিলেন।

তিনি মক্কানগর বিনা ক্লেশে উদ্ধার করিলেন, হৈনির রণক্ষেত্রে তাঁহার আসুরিক বিক্রম দেখিয়া লোকে আশ্চর্য্য হইল। ইহুদিদিগের উত্তেজনায় হোক, অথবা হিরাক্লিয়সের প্রতিশোধক আক্রমণের বাধা দিবার জন্যই হোক, মহম্মদ সিরিয়া অভিযানের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে এরূপ কার্য্য হইতে নিরস্ত হইতে অনুরোধ করিতে লাগিল—রোম সাম্রাজ্যের অতুল বল বিক্রমের সহিত তাঁহার ক্ষুদ্র শিষ্য সম্প্রদায় কিরূপে সমকক্ষ হইবে? মহম্মদ কিছুতেই শুনিলেন না। সভা করিয়া শিষ্য মণ্ডলীর নিকট হইতে চাঁদার ব্যবস্থা হইল। প্রিয়তম শিষ্য ও আত্মীয় আবু বাক্কর আপনার সর্ব্বস্ব গুরুর আয়োজিত যুদ্ধের জন্য দান করিলেন। অপর অপর শিষ্যগণ আপনাদের সামর্থ্যের অনুরূপ দান করিল। ত্রিশ হাজার সৈন্য সমবেত হইল, আবু বাক্কর সেনানায়ক হইলেন, খালেদ পুরোগামী অশ্বারোহী সেনার অধ্যক্ষরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন। অন্য অন্য সেনাপতিদিগকে বিভাগীয় আধিপত্য দেওয়া হইল। মহম্মদ স্বয়ং সেনার উৎসাহ বর্দ্ধন জন্য সঙ্গে চলিলেন।

কিন্তু অতি কুক্ষণে এই অভিযান আরম্ভ হইল। দেশে দুর্ভিক্ষ, তাহাতে মরু অতিক্রমের ক্লেশ, আরবসেনা অস্থির হইয়া পড়িল, আহার সংগ্রহ অসম্ভব হইয়া উঠিল; আরবের শেষ উপায় উষ্ট্রমাংস, মহম্মদীয় সেনার এক্ষণে তাহাই অবলম্বন হইল, তাহারা আপনাদের সম্ভারবাহী উষ্ট্রের মাংস খাইয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিল।

মহম্মদ এক সভা করিলেন, এক্ষণে কি কর্ত্তব্য তাহার বিচার আরম্ভ হইল। বিচারে সাব্যস্ত হইল—সসম্ভার সেনার প্রত্যাগমন। কিন্তু মহম্মদ বিপক্ষকে মুসলমান অসির বলের পরিচয় না দিয়া ফিরিতে অনিচ্ছুক, তিনি সমস্ত সৈন্যকে ফিরিতে আজ্ঞা দিয়া, চারিশত কুড়ি জন মাত্র অশ্বারোহিকে খালেদের নেতৃত্বে দুমৎউল জানদল্ দুর্গ অধিকার করিতে আজ্ঞা দিলেন। নির্ভীক খালেদও স্তম্ভিত; মহম্মদ, শত্রু বিনা আয়াসে তাঁহার হস্তগত হইবে বলিয়া আশ্বাস দিলে, খালেদ বিনা বাক্যব্যয়ে দুর্গ অধিকার

করিতে চলিলেন। দুর্গপতি শীকার করিতে বহির্গত হইয়াছিলেন, তিনি খালেদ কর্তৃক ধৃত হইলেন। দুর্গ সহজেই মুসলমানের হস্তগত হইল।

কিছুদিন পরে মহম্মদের মৃত্যু হইল। আবুবাক্কর প্রথম খলিফা হইলেন। এই সময়ে আরবের স্থানে স্থানে প্রবঞ্চক ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকের প্রাদুর্ভাব হয়, এই সকলের মধ্যে প্রধান সুজিয়া নাম্নী খৃষ্টান রমণী, ও মোসেলিয়া নামক একজন মহম্মদের শিষ্য। মহম্মদের মৃত্যুর পর মোসেলিয়া নিজেকে ঈশ্বর প্রেরিত ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক বলিয়া জাহির করে।

মোসেলিয়ার কুহকে অভাগিনী সুজিয়ার অধঃপতন হয়, কিন্তু তাহার শিষ্য মালেক, মুসলমান ধর্ম্মের বিরোধী হইয়া দাঁড়ায়। মালেক পূর্ব্বে মুসলমান ছিল ও মহম্মদ শিষ্য ওমার তাহার আত্মীয় ছিলেন। এক্ষণে খালেদ মালেকের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন। তাঁহাকে বলিয়া দেওয়া হইল যে যদি মালেক তাহার অপকর্ম্মের জন্য অনুতাপ করে ও মুসলমান ধর্ম্মের উপর আস্থা প্রদর্শন করে খালেদ যেন তাহাকে ক্ষমা করেন। খালেদ মালেককে পরাজিত করিয়া তাহার শিরশ্ছেদ করেন ও তাহার অসামান্যরূপবতী বিধবা পত্নীকে বিবাহ করেন।

খালেদের কার্য্যের নানারূপ কারণ আরোপিত হইল; ওমারের প্ররোচনায় খালেদকে মদিনায় ডাকাইয়া পাঠান হইল, খলিফা খালেদের আত্ম সমর্থনে তৃপ্ত হইলেন, কিন্তু ওমারের ক্রোধ সমান রহিল।

খালেদ মোসলিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন, ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল, অনেকবার মহম্মদীয় সেনা যুদ্ধে পশ্চাদপদ হইল, কিন্তু খালেদের অটল বিক্রমে শেষে জয়লাভ হইল। হতভাগিনী সুজিয়ার পতন পক্ষের আধার মোসলিয়ার "জীবনোদ্যান" নামে প্রমোদোদ্যানের সম্মুখে মহাযুদ্ধে মোসলিয়া সসৈন্যে নিহত হইল। সেই অবধি উহার নাম 'মরণোদ্যান' হইল। মোজিয়া নামক জনৈক বন্দীর কৌশলে মোসলিয়া পক্ষের যুদ্ধে হতাবশিষ্ট পরিত্রাণ পাইল। খালেদ রক্তাক্ত হস্তে মোজিয়ার রূপবতী কন্যার পাণিগ্রহণের প্রস্তাব করিলেন। সমস্ত মুসলমান সেনা অসন্তুষ্ট হইল। এই ঘোর যুদ্ধে বিস্তর মুসলমান হত হইয়াছে, সমগ্র মুসলমানমণ্ডলী শোকসন্তপ্ত হইয়া অশৌচ গ্রহণ করিয়াছে, এ মুসলমান সেনাপতির বৈবাহিক আনন্দে মাতিবার সময় নয়, মোজিয়ারও কুলনাশককে কন্যা সম্প্রদান করিতে ইচ্ছা নয়, সেও যৌতুকচ্ছলে বিস্তর অর্থ চাহিয়া বসিল। খালেদ কোন বিষয়ে পশ্চাদপদ হইবার পাত্র নহেন, তিনি তাহা দিয়াই বিবাহ করিলেন। খালেদের বিরুদ্ধে মদিনায় আবেদন গেল খলিফা তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া পত্র লিখিলেন। খালেদ তাহা উপেক্ষা করিয়া বলিলেন, ইহা বৃদ্ধ ওমারের কার্য্য।

খলিফা খালেদকে পারস্য বিজয়ে নিয়োজিত করিলেন। খালেদের হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। নূতন রাজ্যে তিনি মুসলমান ধর্ম্ম প্রচার করিবেন, সেখানকার ধর্ম্ম প্রচারের সহিত তাঁহার নাম ইতিহাসে অক্ষয়

অক্ষরে লিখিত থাকিবে। কবিগণ তাঁহার বীর্য্য কাহিনী গান করিবে। কল্পনায় তিনি কত আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন।

খালিফার আজ্ঞার পরিবর্ত্তন হইল, তাহাকে ডামাস্কসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিতে আজ্ঞা হইল, অন্যকে পারস্য বিজয়ের ভার দেওয়া হইল। ক্ষুব্ধ হৃদয়ে খালেদ ডামাস্কস্ অভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করিলেন, মনে করিলেন, এও ওমারের কার্য্য। ডামাস্কসের সম্মুখে নানা যুদ্ধ হইল, খালেদ আপনার বীরত্বের অনুরূপ নানা অদ্ভুত কার্য্য করিলেন। ডামাস্কসের অবরোধ আরম্ভ হইল। প্রায় এক বৎসরকাল অবরোধ চলিতেছে, এমন সময়ে মদিনা হইতে রাজদূত আসিল; খালেদের সহযোগী আবু ওবেদা পত্র পাইলেন, তিনি পত্রের মর্ম্ম প্রকাশ করিলেন না। খালেদ দূতকে মদিনার সংবাদ জিজ্ঞাসা করাতে সে আবু বাক্করের মৃত্যু সংবাদ দিল, খালেদ নবনির্ব্বাচিত খালিফার নাম জিজ্ঞাসা করাতে দূত উত্তর করিল, ওমার। ওমারের খালিফাপদ প্রাপ্তির কথা শুনিয়া নিজের সৈন্যাপত্য বিচ্যুতির আশঙ্কা প্রকাশ করাতে দূত নীরব রহিল। খালেদ আর কিছু বলিলেন না। কিন্তু কাজে তাঁহার কিছুমাত্র ঔদাস্য হইল না, বরং অধিকতর উৎসাহের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। আবু ওবেদার সেনাপতির পদে উন্নতি, ও খালেদের অবনতির কথা সেনার মধ্যে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। একদিন একজন সৈনিক আবু ওবেদাকে প্রধান সেনাপতির অভিবাদনে অভিবাদন করিল। চারিদিকে হৈ চৈ, পড়িয়া গেল।

খালেদ, আবু ওবেদাকে তাহার এইরূপ প্রকৃত কথা গোপন করার জন্য অনুযোগ করিতে লাগিলেন, তাঁহার ন্যায় বন্ধুর এরূপ করা ভাল হয় নাই বলিলেন।

আবু ওবেদা তখন ঐরূপ নিদারুণ বাক্য বলিতে আপনাকে অক্ষম বলিয়া জানাইলেন, শেষে খালেদকে তাহার অধীনে অশ্ব সৈন্যের অধ্যক্ষতা গ্রহণের জন্য বিনয় করিয়া বলিলেন, খালেদ আপনার অবমাননা ভুলিয়া স্বজাতির ও স্বধর্ম্মের জন্য হীনতা স্বীকার করিলেন।

ওমারের আদেশ মত সেনাপতি সমরুকে পালাষ্টিনের দিকে পাঠান হইল। এ দিকে ডামাস্কসের সম্মুখে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। অবরুদ্ধ শত্রু মধ্যে মধ্যে অতি প্রচণ্ড ভাবে বহিরাক্রমণ করিতে লাগিল, কিন্তু যেখানে রণস্রোত খরতর, সেই খানেই খালেদের ভীষণ মূর্ত্তি, যেখানেই শত্রুর বল প্রাবল্য সেই খানেই খালেদের প্রচণ্ড অসির ঝন্‌ঝনা।

এ দিকে রোমান সৈন্যের সমাবেশ অধিক হইতে লাগিল, চারিদিক হইতে রাজ আজ্ঞায় সৈন্য আসিয়া জুটিতে লাগিল। সমরু বিপন্ন হইয়া পড়িলেন, আবু ওবেদা, কি করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া খালেদকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন, খালেদ চিরসিদ্ধ প্রতিভার সহিত তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, সমরুর পশ্চাৎ ভাগের শত্রুদলকে আক্রমণ করিতে হইবে, এবং নিজে তাহার নায়কতা স্বীকার করিলেন।

বালবেক নামক স্থানে ঘোরতর যুদ্ধে

শত্রুর পরাজয় হইল। খালেদ পুনর্ব্বার আসিয়া ডামাস্কসের অবরোধে যোগ দিলেন। ডামাস্কসবাসিরা বশ্যতা স্বীকার করিল।

শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়, আবুওবেদা খালেদের সহিত আসিয়া, সমরুর সৈন্যের সহিত মিলিলেন। রোমান সেনাপতিগণ নিশ্চিন্ত ছিলেন না; তাঁহারা ও শত্রুকে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন, কিন্তু যুদ্ধের পূর্ব্বে আরবদের ভয় দেখাইয়া নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। দূত রোমান সৈন্যের অতুল বলের কথা বুঝাইয়া আরবদিগকে যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত হইতে বলিলেন, ফল কিছুই হইল না। তখন তাঁহারা আবার দূত পাঠাইলেন, দূত আরবদের এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য কি ও তাঁহারা কি হইলে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবে এই সব জিজ্ঞাসা করিল। এইবার আরব দূত রোমান শিবিরে গমন করিল। জগতের ঐশ্বর্য্য-পূরিত নানা দিগদিগন্ত হইতে বিলাস সামগ্রী দ্বারা সুসজ্জিত রোমান ভোগের অনুমত ইন্দ্রভুবন সদৃশ রোমান শিবিরে, দীনবেশে আরব মৈয়ু গমন করিল। সঙ্গে দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই, মৈয়ু নিজের অশ্বের বল্গা নিজে লইয়া রোমান শিবিরে প্রবেশ করিলেন। দাস আসিয়া অশ্ব রক্ষার ভার লইতে গেল। আরব কখন নিজের অশ্বের ভার অন্যের হস্তে দেয় না বলিয়া, আরব তাহাকে নিরস্ত করিল।

মনোহর চিত্রপট তুল্য আসনে সমবেত রোমান সেনাপতিগণ উপবিষ্ট, মৈয়ুর জন্য তুল্য আসন বিস্তারিত হইল, মৈয়ু আসন গ্রহণ করিলেন না। পুনঃ পুনঃ আসনে বসিতে বলাতে বলিলেন,—সত্য বটে, আরব কখন দণ্ডায়মান হইয়া কাহারো সমক্ষে আপনার বক্তব্য বলিবে না এই প্রভুর আজ্ঞা। এই বলিয়া মৈয়ু আসন গুটাইয়া ভূমিতলে বসিলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে মৈয়ু বলিলেন:—স্রষ্টা যে তৃণময় হরিৎ বর্ণের আসন ভূপৃষ্ঠে আপনার সৃষ্ট সকল জীবের জন্য বিস্তারিত করিয়া রাখিয়াছেন তাহা অপেক্ষা অন্যতর আসন গ্রহণ করিয়া মানবের আপনার ঔদ্ধত্যের পরিচয় দেওয়া উচিত নয়।

রোমান সেনাপতি অর্থদানে আরব-দিগকে যুদ্ধ হইতে বিরত করিবার চেষ্টা করিলেন। মৈয়ু বলিলেন:—সিরিয়া বাসি-দের মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ ভিন্ন যুদ্ধ অনিবার্য্য।

দুর্গ ও প্রাকার বেষ্টিত দুর্জ্জেয় কোয়েল নগর, সম্মুখে ষাট সহস্র রোমান সৈন্য সুদক্ষ সেনাপতিগণ পরিচালিত হইয়া অবস্থিত, সাঁইত্রিশ হাজার আরব আবু ওবেদা খালেদ ও সমরুর অধীনে তাহাদের আক্রমণের জন্য প্রস্তুত রহিল।

মুসলমান ইতিহাসবেত্তাগণের মতে শত্রুসংখ্যার তুলনায় এই যুদ্ধে মুসলমান সৈন্যের সংখ্যা অন্যান্য যুদ্ধের অপেক্ষা অধিক ছিল। ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল, বিষলিপ্ত শস্ত্রের প্রহারে আরবগণ অস্থির হইয়া পড়িল, তাহারা আর তিষ্ঠিতে পারিল না, ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। এ সময়ে খালেদ কোথায়? তাহার সেই স্বজন-অভয়দাত্রী বিপক্ষ-সংহারিণী মূর্ত্তি কোথায়?

খালেদ মুহা হুঙ্কারে অজস্র অস্ত্রপাতের মধ্য দিয়া শত্রুকে আক্রমণ করিলেন, সৈন্য-

গণ মহা উৎসাহে আল্লা হো আকবর রবে তাঁহার অনুসরণ করিল, কোন বাধা বিঘ্ন মানিল না। আরবের জয় হইল। এগার হাজার রোমান রণক্ষেত্রে শায়িত রহিল, অবশিষ্ট সেনা কোয়েলের দুর্গে আশ্রয় লইল।

হামেস (বর্ত্তমান-এমেসা) নগর মুসলমান কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইল। হিরাক্লিয়ঃ পুনঃ পুনঃ হামেসবাসিগণকে মুসলমানগণের নিকট নগর অর্পণ করিতে নিষেধ করিয়া পাঠাইতে লাগিলেন, কিন্তু কোয়েল যুদ্ধ সংবাদে ভীত হামেসবাসিগণ অল্পকাল মধ্যেই শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করিল। মৈদান (বর্ত্তমান তেসিথান) হামেসের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিল। মুসলমানগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া সিরিয়ায় ও পালাষ্টিনে ধর্ম্ম প্রচারে ব্যস্ত হইল।

হিরাক্লিয়ঃ কোয়েলের যুদ্ধ সংবাদে, বিশেষতঃ হামেসের আত্মসমর্পণে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন। তিনি সমবেত পারিষদগণের সমক্ষে সেনাপতিগণের সম্বন্ধে অনেক অনুযোগ করিয়া বলিতে লাগিলেন :—এই সকল পরাজয়ের কারণ কি? রোমান জাতির অসংখ্য সৈনিক, উৎকৃষ্ট প্রহরণ, সুন্দর রণশিক্ষা, না, ক্ষুদ্রকায় আরবের তুলনায় তাহাদের মহাদেহের অপরিমিত বল? ইহার মধ্যে কোনটী আমাদের এই লজ্জাকর পরাজয়ের কারণ? আমাদের 'সেনাপতিগণের, বিপক্ষের প্রতি অযথা উপেক্ষা কি আমাদের পরাজয়ের কারণ নয়? তাহাদের ঔদাস্ত কি আমাদের সর্ব্বনাশের মূল নয়? এক্ষণে এই নন্দন কানন সদৃশ সিরিয়া দেশ আমাদের ত্যাগ করিতে হইবে ইহা ভিন্ন আর গত্যন্তর দেখিতেছি না।

বৃদ্ধতম পারিষদ উঠিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন :—মহারাজ এ আরবের পাশব শক্তি রোমানের পাশব শক্তিকে জয় করে নাই। আরবের ধর্ম্ম নীতি, আরবের ভোগ বিলাস বিরতি, আরবের ধর্ম্মানুষ্ঠিতি ও তাহার কর্ত্তব্যানুগতি একীভূত হইয়া এমন এক শক্তি উৎপন্ন করিয়াছে যে তাহা আমাদের পক্ষে অজেয় হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ফল যাহাই হোক আপনার অসীম ক্ষমতার অনুরূপ চেষ্টা না করিয়া সিরিয়া দেশ শত্রু হস্তে নিক্ষেপ করা উচিত নয়।

পারিষদের পরামর্শ হিরাক্লিয়ঃ সম্যক্ অবধান করিলেন। পুনর্ব্বার যুদ্ধের জন্য বিপুল আয়োজন হইল। চারি লক্ষ সেনা সমবেত হইল। প্রধান সেনাপতি বাহান, সেনানায়ক হইয়া যাত্রা করিলেন।

মুসলমানেরা, ধর্ম্ম প্রচারের জন্য সিরিয়া পালাষ্টিনে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, বিপক্ষের এই মহা সেনা সংগ্রহের কথা শুনিয়া আবু ওবেদা ত্রস্ত হইলেন, তিনি মদিনায় নূতন সৈন্য সাহায্যের জন্য লিখিয়া পাঠাইলেন, উপস্থিত দলবল লইয়া হামেস নগরে আশ্রয় লইলেন এবং যুদ্ধে পশ্চাৎপদ হইবেন কি না, তাহাও খালিফাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন। মদিনা হইতে বড় সাহায্যের আশা আসিল না। অধিকন্তু খালিফা সম্মুখ সমরে বিমুখ হইতে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন। এ অবস্থায়—কি করা উচিত তাহা নির্দ্ধারণের জন্য হামেস সহরে সভা বসিল।

সকলেরি প্রায় একই মত হইল। এত অল্প সৈন্য লইয়া সুদক্ষ সেনানী-পরিচালিত

দিব্যঅস্ত্র-সজ্জিত বিরাট রোমান চমূর সহিত প্রকাশ্য সমর ক্ষেত্রে যুদ্ধ করা একরূপ অসম্ভব, এরূপ অবস্থায় হামেসের দুর্গের অন্তরালে থাকিয়া যুদ্ধ করা মন্দ নয়। সকলের মত লওয়া হইল, সকলেই প্রায় একমত হইলেন, এমন সময়ে হোবারা সকলের মতের প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন আরব মরুৎসহচর সে মরুভূমে মরুদ্বেগে ছুটিয়া বেড়াইতে পাইলে প্রকৃতিস্থ থাকে, তাহাকে প্রাচীরের দ্বারা আবদ্ধ রাখিলে তাঁহার প্রকৃতির বিকৃতি হইবে, তাহার কার্য্য-কুশলতা যাইবে; প্রাচীর বেষ্টনে তাহার রক্ষা হইবে না, তাহার নাশ হইবে।

হোবারার কথার যাথার্থ্য সকলে স্বীকার করিল, এবং হামেস ত্যাগ করিল মরুকুমার আরবগণ মরুদ্বেগে অনাবদ্ধ ভূমে বিচরণ করিতে চলিল, বাহান সসৈন্যে হামেস অধিকার করিলেন, হামেসের পুনরুদ্ধার হইল।

বাহান বিশাহাজার সৈনিকে এক এক রণ-চতুষ্ক প্রস্তুত করিয়া যুদ্ধার্থ বাহির হইলেন। হিরামুখ নদীর তীরে ঘোরতর যুদ্ধ হইল, আরবগণ মধ্যস্থলে অসংখ্য শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া ছুটিতে লাগিল, এবার বুঝি চন্দ্রকলা চিহ্নিত পতাকা শ্যেন চিহ্নিত পতাকার পদতলে লুণ্ঠিত হয়! মথিত সেনার মধ্য হইতে খালেদ-পরিচালিত দশ সহস্র আরব অশ্বারোহী ভীম গর্জ্জনে বাহির হইয়া বজ্রবিক্রমে শত্রুদল আক্রমণ করিল, যুদ্ধের গতি ফিরিল। রোমান সেনা ছিন্ন ভিন্ন হইল। পলায়নপর বহু রোমান হিরমুখের জলে ডুবিল। বাহান বহুযত্নে হতাবশিষ্ট সেনাকে পুনর্ব্বার শত্রুবিরুদ্ধে পরিচালিত করিলেন। বিষাক্ত শস্ত্রাঘাতে আরবসেনা জর্জ্জরিত হইল, আবার বুঝি যুদ্ধের গতি ফিরে।

অসংখ্য কুলিশ সম্পাত মধ্যে, উভয় সৈন্যের মধ্য স্থলে ঐন্দ্রজালিক খালেদ দণ্ডায়মান, ভয় নাই, ক্ষয় নাই, আপন সেনাকে উদ্দীপিত করিতেছেন। খালেদের অভয়প্রদ মূর্ত্তি দেখিয়া আরবসেনা প্রকৃতিস্থ, তাহার উৎসাহে পুনরুসাহিত হইল, আল্লাহো আকবর রবে তাঁহার অনুসরণ করিল। রোমান সেনার যে পলাইল সে বাঁচিল, যে রহিল সে মরিল, কেহ অক্ষত দেহ রহিল না। সমস্ত রণক্ষেত্র রোমান রক্তে রক্তময় হইল। মৃতদেহে ভূমি আচ্ছাদিত হইল আরবের সম্পূর্ণ জয়লাভ হইল, খৃষ্টান পতাকা চিরদিনের জন্য সিরিয়া হইতে অন্তর্হিত হইল।

যুদ্ধাবসানে বাহানের শব, শবস্তূপের মধ্যে পাওয়া গেল। বর্ম্মমুক্ত করিয়া দেখা গেল শরীরের কোন স্থানে ক্ষত চিহ্ন নাই। কেহ রোষ, কেহ ক্ষোভ, কেহ ভয় তাহার মৃত্যুর কারণ নির্দ্দেশ করিল।

সে দিনকার রক্তময়ী রণভূমি দেখিয়া লোকে বুঝিল, যে কি কারণে খালেদের আবাস-শিবির পূর্ব্বদিন রক্তবর্ণে রঞ্জিত ছিল।

হিরমুখের যুদ্ধের পর আরব সেনা জেরুসেলাম অবরোধ করিল। অবরুদ্ধ নগরবাসীগণ ভয়ে ওমারের নিজের হস্তে নগর সমর্পণ করিতে চাহিল ওমার নিজে আসিয়া নগর অধিকার করিলেন। ওমারের মুখে

খালেদের কোন প্রশংসাই প্রকাশ পাইল না। কিন্তু সমগ্র আরবজাতি তাঁহাকে সিরিয়ার প্রকৃত বিজেতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে লাগিল। কবির মুখও নীরব রহিল না। কবি অসোথ তাহার বীরত্ব সুন্দর গাথায় প্রকটিত করিলেন।

উদার খালেদ অসোথকে প্রভূত অর্থ দান করিলেন। মন্দজনে তাঁহার দানের মন্দ ব্যাখ্যা করিল। খালেদ এত অর্থ পাই-লেন কোথায়, যে অকাতরে অসোথকে এত টাকা দেন, তিনি অবশ্যই লুণ্ঠিত ধন অযথা-রূপে আত্মসাৎ করিয়া থাকিবেন।

ওমারের আজ্ঞায় তাঁহার বিচার আরম্ভ হইল। খালেদের এই বিচার কালের ব্যবহার সর্ব্বজনকে মুগ্ধ করিয়াছিল। যে খালেদ সর্ব্ব-রণজয়ী, চিরবিজয়ী আজ তিনি সামান্য অপরা-ধীর মত নিজের উষ্ণীষের দ্বারা গললগ্নবাসী ও বিচারকের সামান্য ভৃত্যের দ্বারা ধৃতগলবস্ত্র হইয়া বিচারের জন্য উপস্থিত হইলেন।

তাঁহার সম্পত্তির অর্দ্ধেক মূল্য স্বরূপ প্রভূত অর্থদণ্ড হইল। তিনি দোষী সাব্যস্ত হইলেন।

ইহার পর আর খালেদের নাম কোন সামরিক বিবরণে দেখা যায় না। তিনি অতি দীনভাবে স্বগৃহে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে দুঃখ করিয়া বলিতেন, যে দেহ ঈশ্বরের ও দেশের কার্য্যে অকাতরে শত্রুর শত অস্ত্রের মধ্যে নিক্ষেপ করিতেন, তাহা সেই মহৎ কার্য্যে নিঃশেষ না হইয়া, পরিত্যক্ত জীর্ণ লৌহখণ্ডের ন্যায় নষ্ট হইতে চলিল, এই তাঁহার বিশেষ পরিতাপ।

দুঃখে হোক সুখে হোক দিন সমভাবে কাটিয়া যায়। খালেদেরও দিন কাটিতে লাগিল। তাঁহার দুঃখের অবসান হইল। এই অকৃতজ্ঞ পৃথিবী ত্যাগ করিয়া তিনি চিরদিনের জন্য বিদায় হইলেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ইচ্ছাপত্রে দেখা গেল;—একখণ্ড তরবার, একটী অশ্ব, ও একজন ক্রীতদাস মাত্র তাঁহার সম্পত্তি; তিনি তাহা বীরগণের মধ্যে সমভাগে ভাগ করিয়া দিতে বলিয়াছেন।

তখন খালেদের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারা গেল, তিনি যে নিজের অর্থ প্রাচুর্য্য বশতঃ অসোথকে প্রভূত অর্থ দান করিয়া ছিলেন তাহা নয়, তিনি তাঁহার ঔদার্য্যগুণে ঐরূপ করিয়াছিলেন।

ওমারের ক্ষোভের সীমা রহিল না। তিনি যখনই খালেদ জননীকে রোদন করিতে শুনিতেন তখনই বলিতেন খালেদ জননী একমাত্র সুপুত্র জননী, পুত্রের শোকে কাহারও যদি রোদন করিবার অধিকার থাকে তাঁহারই আছে।

খালেদ আদর্শ মুসলমান ছিলেন। যে সকল গুণে মুসলমানগণ অতি অল্পকাল মধ্যে জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করে খালেদে সেই সকল গুণ অসাধারণ পরিমাণে ছিল। তাঁহার অসামান্য বীরত্ব, অদ্ভুত রণকৌশল ভীমকর্ম্মা আরব জাতির মধ্যে বীরাগ্রণ্য নাম দিয়াছিল। তাঁহার চরিত্র অতি উদার, তিনি সাধু বাক্করের শোকে সন্তপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ওমারের সম্বন্ধে ঈর্ষা প্রকাশ করিতে, বা ওমারের নিন্দা করিতে কেহ শুনে নাই। ওমারের সম্বন্ধে তাঁহার মত বড় ভাল ছিল

না, কিন্তু যেদিন হইতে ওমার খালিফা হইলেন, খালেদ, ওমারকে তাঁহার পদোচিত সম্মান করিতে ক্রটী করেন নাই। আবু ওবেদার সহিত তাহার ব্যবহার অসাধারণ নিঃস্বার্থতার নিদর্শক। তাঁহার চরিত্রের যে দোষ, তাহা মুসলমান সমাজশিক্ষার দোষ।

সংসার স্ত্রী ও পুরুষকে লইয়া; উভয়ের চরিত্র ঔৎকর্ষে সমাজের ঔৎকর্ষতা হইয়া থাকে। মুসলমান সমাজে স্ত্রীচরিত্রের স্থান নাই। মুসলমান সমাজ, পুরুষের সমাজ, পুরুষ একাই কার্য্যের কর্ত্তা। মুসলমান পুরুষার্থপ্রবৃত্তিনী প্রকৃতিকে মানে না। সংসার তাহার একার লীলাভূমি। সে নারীর সাহচর্য্য মানে না, নারী তাহার কাছে নিকৃষ্ট জীব, অশ্ব গবাদির মধ্যে। ধন ধান্যের মধ্যে, রত্নমাণিক্যের মধ্যে, কিন্তু তাহার সমকক্ষা সহচরী নয়। সে ভোগ্য বস্তু, সে কখন সংসারে সমভাগিনী নয়। সেই জন্যই দেখিতে পাই, মুসলমান যেমন যুদ্ধে শক্রর অসিচর্ম্ম অধিকার করিতে প্রস্তুত শক্রর অশ্বগজ অধিকার করিতে প্রস্তুত, শক্রর ধন রত্ন অধিকার করিতে প্রস্তুত, তেমনি তাহার স্ত্রী কন্যা অধিকার করিতে প্রস্তুত। তাহার শক্রর ধনরত্নাদি লুণ্ঠন করাতে যেরূপ ধর্ম্মের দ্বারে দায়িত্ব, তাহার স্ত্রী কন্যাকে বন্দীকরা তাহার অপেক্ষা অধিক দায়িত্বের কাজ নয়। মুসলমানের মতে বিবাহ বন্ধন, পার্থিব বন্ধন; ইহার সঙ্গে ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই, সেই জন্য মুসলমান যে কোন বিধর্ম্মিনীকে বিবাহ করিতে পারে। এই সকল কথা স্মরণ রাখিলে খালেদের মালেকের বিধবা পত্নীকে ও মোজিয়ার কন্যাকে বিবাহ করার রহস্য বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু তিনি কাল বিবেচনা না করিয়া স্বজাতির শোককে উপেক্ষা করিয়া বিবাহ উৎসবে মত্ত হন সেই জন্যই মুসলমানগণ ক্রুদ্ধ হয়, নচেৎ তাঁহার বিবাহে তাহারা কোন দোষ দেখে নাই।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র চন্দ্র।

কৃষ্ণকান্তের উইল।

(সমালোচনা)

আমরা রোহিণীর প্রেমানুরাগের ইতিবৃত্ত উদ্ধৃত করিয়াই, রোহিণী চিত্র, এ কাব্যের অন্যান্য চিত্রের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গীন বুঝিবার পক্ষে বাধার কথার উল্লেখ করিয়াছি। আমরা প্রথমতঃ গোবিন্দলালের প্রতি রোহিণীর প্রেমানুরাগের কথাই বুঝিবার চেষ্টা করিব, কেন না, রোহিণীকে বুঝিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে তাহার প্রেমের কথা বুঝা নিতান্ত আবশ্যক। রোহিণীর যে সময়ের কথা আখ্যায়িকায় প্রথম বর্ণিত হইয়াছে, তখন রোহিণী তাহার পূর্ণ যৌবনে উপনীতা এবং সম্ভোগ-স্পৃহা রোহিণীর মনে তখন একান্ত প্রবলা।

এই সম্ভোগস্পৃহাই রোহিণীর সকল ভাবের, সকল কার্য্যের কারণস্বরূপ, রোহিণী সম্বন্ধে সকল ব্যাখ্যার ইহাই মূলসূত্র। যৌবন-সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে, এই ভোগলিপ্সায় যখন রোহিণীর মন অধিকৃত হইল, তখন হইতেই, সে লালসার পরিতৃপ্তির প্রধান সামগ্রী রূপবান্ পুরুষ, তাহার বাসনার বস্তু হইয়া উঠিল; তখন, গোবিন্দলালের কমনীয় কান্তি যে তাহার চিত্তকে আকৃষ্ট করিল না, ইহা অসম্ভব। তবে গোবিন্দলালের গাম্ভীর্য্য চরিত্রবত্তা এবং তাঁহার ভ্রমরানুরাগ রোহিণী অবগত ছিল, তাই সে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে সাহস করিত না। অন্ততঃ তাঁহার চরিত্রবত্তার আলোচনা করিলে, তাহার মনে আশার সঞ্চার হইত না। তথাপি অকর্ষণের বস্তু হইতে কেহ দূরে থাকিতে চায় না। প্রিয় বস্তুর দর্শন জনিত আনন্দের সহিত তাহা লাভ করা যে সহজ সাধ্য নহে ইহা ভাবিয়া সে প্রিয় বস্তুর চিন্তন হইতে মনকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করা দূরে থাকুক, প্রত্যুত, রোহিনী গোবিন্দলালকে একমাত্র চিন্তার বিষয়ীভূত করিয়া মনকে তন্ময় করিয়া তুলিল। ইহ জীবনের অন্য কোন মূল্য আছে বা হইতে পারে, ভোগসুখ ভিন্ন জীবনের কোন মহত্তর নিয়োগ লইয়া মানুষ এ পৃথিবীতে জন্মিয়া থাকিকে এরূপ কথা তাহার চিন্তার প্রাকার মধ্যে কখনও প্রবেশ লাভ করিত না, সুতরাং রোহিণী তাহার প্রবৃত্তি, তাহার হৃদয়বেগ নিয়ন্ত্রিত করা প্রয়োজন বোধ করিল না। চিত্তকে নিয়ন্ত্রিত না করিয়া প্রবৃত্তিস্রোতে ভাসাইয়া দিলে, অনন্ত দুঃখ সম্ভাবিত হয়, সংযমের কঠোরতা আপাতঃ ক্লেশকর হইলেও, তাহার সাধনাতেই মানুষের ইহকালে এবং পরকালে প্রকৃত সুখ, রোহিণী তাহার প্রবৃত্তিপ্রবল হৃদয়ে তাহা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, উদ্দাম প্রবৃত্তি এবং তৎপরিপোষণশীলা স্বভাব শক্তির নিকট হৃদয়কে ছাড়িয়া দিতে কিঞ্চিৎ-মাত্রও সঙ্কুচিত হইল না। বরং প্ররোচন-শীল প্রকৃতির কার্য্যে উৎসাহ বোধ করিতে লাগিল। পোড়া কোকিলের কুহুরবে জ্বালাতন হইয়া "দূরহ, কালামুখো!' বলিয়া রোহিণী কোকিলকে গালি দিত সত্য, কিন্তু রোহিণীর হৃদয়ের সুরের সঙ্গে সে কুহুরব সুর বাঁধিত না, আমরা এরূপ বুঝি না। সে কাল পাখীর হৃদয়োদ্‌ভ্রান্তকারী কুহুরব এবং তাহার সঙ্গে সুর বাঁধা সুনীল, অনন্ত, নিঃশব্দ গগণ; নব প্রস্ফুটিত, কাঞ্চনগৌর, শীতল-সুগন্ধ-পরিপূর্ণ, ভ্রমর গুনগুনে শব্দান্বিত, শ্যামল পত্রবিমিশ্রিত আম্রমুকুলের স্তরশ্রেণী, শ্বেত-রক্ত-নীল-পীত, ক্ষুদ্র-বৃহৎ, বায়ু-প্রবাহে সৌরভসঞ্চারী, লক্ষলক্ষ পুষ্পস্তবক, এবং এ সকলের সঙ্গে বারুণীতীরবর্ত্তী পুষ্পোদ্যানে ছায়াতলে দণ্ডায়মান, কুসুমিত-বৃক্ষাধিক-সুন্দর, চম্পকরাজিনির্ম্মিত স্কন্ধোপরি দোলায়মান নিবিড়-কৃষ্ণ-কুঞ্চিত-কেশদাম শোভিত গোবিন্দলালের উন্নত দেহতরু; এ সকলের সঙ্গে রোহিণীর মন সুর বাঁধিত বলিয়াই, রোহিণী জ্বলিয়া পুড়িয়াও, এ সকলের মধ্যে বিচরণ করিতে ভালবাসিত। এইরূপে রোহিণীর হৃদয় ক্রমে বিবশ হইয়া উঠিল, এবং অন্য দিকে গোবিন্দলালকে পাইবার সম্ভাবনা কিছু না দেখিয়া, দুঃখভারাক্রান্ত হইতে লাগিল। এই দুঃখের ভার হৃদয়ে লইয়া,

পূর্ব্ববৎ প্রকৃতিপ্রপীড়িত হইয়া, রোহিণী এক দিন সন্ধ্যার সময় বারুণী পুষ্করিণীর সোপানোপরি বসিয়া কাঁদিতেছে,এমন সময়ে গোবিন্দলাল সহসা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রোহিণী অসম্ভাবিতের সংঘটন দেখিয়া অথবা গোবিন্দলালের চরিত্রবত্তার কথা স্মরণ করিয়া চমকিয়া উঠিল, তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। কিন্তু গোবিন্দলালের এই অসময়ের করুণায় তাহার মনে আশার সঞ্চার হইল, কেবল আশার সঞ্চার নহে, সে আশ্বাসিতও বোধ করিতে লাগিল, দ্বিতীয় বার জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিল "এক দিন বলিব। আজ নহে। এক দিন তোমাকে আমার কথা শুনিতে হইবে।" অতঃপর রোহিণী ক্রমশ গোবিন্দলালের নিকটবর্ত্তী হইতে চেষ্টা করিতে লাগিল এবং, গোবিন্দলাল বন্দরখালি হইতে ফিরিয়া আসিলে, ভ্রমরের অনুপস্থিতি সময়ে গোবিন্দলালের উদ্যান গৃহে তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা সম্পাদন করিয়া, মনোরথের চরিতার্থতা বোধ করতঃ,গৃহে প্রত্যাগমন করিল। ইহার পর প্রসাদপুরে রোহিণী চরিত্রের শেষ পরিণতি, রোহিণী সেখানে বারাঙ্গনারূপে গোবিন্দলালের বিলাসসঙ্গিনী ; এই খানেই কবি রোহিণীকে সম্পূর্ণ নিরাবরণ করিয়া পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। নিশাকরসহ প্রেমালাপনের অভ্যন্তরে গোবিন্দলাল যখন রোহিণীকে গলা টিপিয়া ধরিয়া গৃহে লইয়া তাহাকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে আহ্বান করিতেছেন, এবং রোহিণী কাতরস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছে—"মারিও না! মারিও না! আমার নবীন বয়স, নূতন সুখ! আমি আর তোমায় দেখা দিব না, আর তোমার পথে আসিব না। এখনই যাইতেছি। আমায় মারিও না।" তখন আমরা জাজ্বল্যমান দেখিতে পাইতেছি রোহিণীর প্রেমানুরাগ একমাত্র সম্ভোগস্পৃহা হইতেই উদ্ভূত, তাহার অন্য কোন মূল নাই। আমরা যত দূর বুঝি, ইহাই রোহিণীর প্রেমানুরাগের ইতিবৃত্ত। কবিলিখিত সে প্রেমকাহিনীর সহিত আমাদের এ ইতিবৃত্তের সম্পূর্ণ মিল নাই। কবির কাহিনী যে দিন বারুণীর ঘাটে গোবিন্দলাল রোহিণীর প্রতি অসময়ে করুণা প্রদর্শন করিলেন সেই দিন হইতে আরম্ভ হইয়াছে, বাল্যকাল হইতে পরিচিত গোবিন্দলালের প্রতি হঠাৎ কেন রোহিণীর হৃদয় আকৃষ্ট হইল, কবি তাহা বুঝিতে পারেন নাই। আমরা সে কথা বুঝিবার জন্য কবিনির্দ্দিষ্ট কালের পশ্চাৎ ভাগে কিছু গমন করিয়াছি। রোহিণীর বারুণীর ঘাটে অত দীর্ঘ ক্রন্দনের জন্য একমাত্র কোকিল বেচারিকেও যেন আমরা দায়ী করিতে পারি না। রোহিণী সংসারের লোক, তাহার চরিত্রব্যাখ্যার জন্য অনুমানের আশ্রয় লইতে কবি আমাদিগকে একটু স্বাধীনতা দিয়াছেন বলিয়া মনে করি। তাহাতে যদি পাঠকদিগের কাহারও আপত্তি থাকে তবে তাঁহারা বুঝিতে পারেন, রোহিণী অন্যের সুখে ঈর্ষা করিত, তাহার বৈধব্য দুঃখের কথা নিরন্তর ভাবিত, তাহার সহিত যোগদান করিয়া দুষ্ট কোকিলই তাহাকে কাঁদাইয়াছিল, আর সে ক্রন্দনের অনুচিত দৈর্ঘ্য দেখিয়া যদি কেহ সন্দেহ করেন যে, গোবিন্দলালের করুণাকর্ষণ

করিবার জন্যই রোহিণী ওরূপ ফাঁদ পাতিয়া বসিয়া ছিল, তাঁহাকেও আমরা কিছু বলিতে পারি এরূপ মনে হয় না।

আমরা বলিয়াছি, সংসারে লোকের কার্য্য দেখিয়া তাহার কারণ নির্দ্দেশ করা সকল সময়ে সহজ নহে, এবং কবি, কৃষ্ণকান্তের উইলে, বিশেষতঃ সে কাব্যের এই রোহিণী চরিত্রে, সংসারের এই অবস্থা প্রতিবিম্বিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এ চরিত্রের এক ভাগের একরূপ ব্যাখ্যা করিলে, অন্য ভাগ তাহার সহিত সঙ্গত করা কঠিন হইয়া উঠে; রোহিণী চতুরা,—এ প্রকৃতির রমণীগণ চতুরাই হইয়া থাকে—সে কখন্ কোন্ ভাবে কি চালে চলিতেছে তাহা সম্পূর্ণ বুঝিয়া উঠা যায় না, আবার রোহিণীর অনুভূতি-শক্তি-বিশিষ্ট হৃদয় প্রকৃতির প্রভাবে বা আশা, আশঙ্কা, নৈরাশ্যাদির ফলে, কখন কি ভাবে বিলোড়িত হয়, তাহাও বুঝা কঠিন। বারুণীর ঘাটে গোবিন্দলালের সকরুণ ব্যবহারে আশ্বাসিত হইয়া রোহিণী ক্রন্দন পরিত্যাগ করিয়া গৃহে গেল। আবার রোহিণী কেন এরূপ ভাবে যে, গোবিন্দলাল তাহার প্রেমানুরাগের কথা ঘুণাক্ষরে জানিতে পারিলে, তাহার ছায়া মাড়াইবে না, তাহাকে গ্রাম হইতে বিদূরিত করিতেও পারে। বোধ হয়, সামঞ্জস্য করিবার জন্য এইরূপ বুঝিতে হইবে—গোবিন্দলাল রোহিণীর দুঃখে সহানুভূতি ভিন্ন এরূপ কোন করুণার নিদর্শন তাহাকে দেখান নাই, যাহাতে সে মনে করিতে পারিত, গোবিন্দলাল কর্ত্তৃক এক দিন না এক দিন তাহার মনোরথ পূর্ণ হইবে; কাজেই, রোহিণীর মনে, আকাঙ্ক্ষার প্রাবল্যে তন্মুহূর্ত্তে আশার সঞ্চার হইয়া থাকিলেও, অধিকতর প্রকৃতিস্থ হইয়া, সম্ভব অসম্ভব চিন্তা করিয়া রোহিণী পুনরায় আশঙ্কান্বিত হইল, তাহার আশার মূল আছে বোধ করিতে পারিল না। যদি গোবিন্দলালের অনুগ্রহ সম্বন্ধে রোহিণীর মনে এইরূপ আশঙ্কারই উদয় হইয়াছিল, তবে আবার বন্ধনের দশায় সে তাঁহাকে প্রণয়-সম্ভাষণ করিতে সাহস করিল কিরূপে? কেবল তাহাই নহে, সামান্য সূত্রাবলম্বন করিয়া, সেই বাদলের দিনে, উদ্যান গৃহে, রোহিণী কেমন গোবিন্দলালের সমীপবর্ত্তিনী হইল। এই সকল সাহসের কার্য্যের অনুকূলে, গোবিন্দলাল হইতে, রোহিণী যে কোনরূপ উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছিল, এ বিচিত্র চরিত্রের ইতিহাসে তাহার কোন আভাস নাই। স্থূল কথা আশা আশ্বাস, আশঙ্কা, সকলই অবস্থা বিশেষে রোহিণীর মনে উদিত হইত, এবং রোহিণীর আকাঙ্ক্ষার বস্তু সম্বন্ধে, অবস্থাভেদে রোহিণীর ব্যবহারও ভিন্নপ্রকৃতিক হইত। মোটের উপর রোহিণী ক্রমে গোবিন্দলালের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, যদিও যে পর্য্যন্ত মিলন সম্পন্ন না হইয়াছিল, আশঙ্কা ও নৈরাশ্য সময়ে সময়ে রোহিণীর মনকে সঙ্কুচিত করিত।

রোহিণী সম্বন্ধে অন্যান্য কথা—

রোহিণী প্রথম বার উইল পরিবর্ত্তন করিয়াছিল, হরলাল তাহাকে বিধবা বিবাহের বিধানানুসারে বিবাহ করিবার প্রলোভন দেখাইয়াছিল বলিয়া; সে দ্বিতীয় বার উইল পরিবর্ত্তন

করিল, সে তাহার প্রণয় পাত্র গোবিন্দলালের যে অনিষ্ট সাধন করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার নিরাকরণ করিবার জন্য। সম্ভোগস্পৃহাকৃষ্ট নরনারীও পরস্পরকে ভালবাসে, এবং তাহাদের পরস্পরের প্রতি অনুরাগ অন্যের প্রতি ক্ষুধার্ত্তের অনুরাগাপেক্ষা উচ্চতর না হইলেও, যে কাল পর্য্যন্ত সে ভাব তাহাদের চিত্ত অধিকার করিয়া থাকে সে কাল পর্য্যন্ত সে অনুরাগকে তাহারা প্রকৃত প্রণয় বলিয়াই মনে করে, এবং কার্য্যেও অনেকটা সেই ভাবই দেখাইয়া থাকে। অতএব রোহিণী যে তাহার প্রণয় পাত্রের উপকারার্থেই দ্বিতীয় বার উইল পরিবর্ত্তন করিতে গিয়াছিল, এ কথা বিশ্বাস করিতে কাহারও আপত্তি হইবার সম্ভাবনা নাই! তবে যদি কেহ রোহিণীর প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া তাহার সাহস, তাহার বুদ্ধি, তাহার স্পৃহার কথা ভাবিয়া এরূপ অনুমান করেন যে প্রণয় পাত্রের হিতসাধন চেষ্টায় এমন অবস্থার যোগ আসিতে পারে যাহাতে তাহাকে তাহার আকাঙ্ক্ষার বস্তুর নিকটবর্ত্তিনী করিবে, ইহাও রোহিণীর চিন্তার বহির্ভূত ছিল না, তবে তিনি সত্য হইতে বহু দূরে বিচরণ করিবেন এরূপ আমরা বলিতে সাহস করি না। প্রকৃত পক্ষে সেইরূপ অবস্থার যোগই ঘটিয়াছিল এবং তাহাতে রোহিণীর মনোরথসিদ্ধির পথ অনেকটা পরিষ্কার করিয়া আনিল।—

রোহিণী জলমগ্ন হইবার কথা।—

গোবিন্দলালের চরিত্রবত্তার ভয়ে রোহিণী যখন তৎপ্রতি তাহার অনুরাগের কথা অতি যত্নে মনের মধ্যে লুকাইয়া রাখিতেছিল, অথচ লুক্কায়িত অগ্নির ন্যায় সে অনুরাগ তাহার চিত্তকে দগ্ধ করিয়া আসিতেছিল, তখন একবার রোহিণী মৃত্যু কামনা করিয়াছিল। কিন্তু রোহিণী তাহার ভোগ লালসা অতৃপ্ত রাখিয়া মরিতে পারে নাই। এবার ভ্রমরের কথায় রোহিণী অনায়াসেই বারুণী পুকুরে গিয়া জলমগ্ন হইল। ভ্রমরের সুখে তাহার ঈর্ষা, ভ্রমরের কথা তাহার গায়ে সহিত না, তাই কি এত অভিমান? না, ভ্রমরের নিকট গোবিন্দলাল তাহার প্রণয়কাহিনী ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহাতেই এরূপ অভিমান সঞ্জাত হইয়াছিল? বুঝি বা গোবিন্দলালের প্রতি অভিমানই তাহাকে কতক পরিমাণে এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত করিয়া থাকিবে। বুঝি বা, গোবিন্দলালের এরূপ ব্যবহারে, তাঁহাকে পাইবার সম্বন্ধে রোহিণীর মনে বিশেষ নৈরাশ্যের উদয়ও হইয়াছিল। তরুণবয়স্কা রমণীদিগের পক্ষে এরূপ অবিমৃশ্যকারিতা অনেকটা তাহাদের স্বভাবসুলভও বটে। তবে রোহিণী অন্যরূপ বলিয়াছে। রাত্রিদিন দারুণ তৃষা, হৃদয় পুড়িতেছে—সম্মুখেই শীতল জল, কিন্তু ইহ জন্মে সে জল স্পর্শ করিতে পারিবে না। আশাও নাই। তাই মরিতে রোহিণী কৃতসংকল্প, এবার গোবিন্দলাল বাদী হইলেন, বারান্তরে তাঁহার চক্ষুর অগোচরে মরিবে। ইহা রোহিণীর কেবল মুখের কথা নাও হইতে পারে। রোহিণী অহরহ গোবিন্দলালের সংসর্গকামনা করিতে করিতে প্রকৃতই সে সংসর্গ বিহনে জীবন অবহনীয় বোধ করিত, এবং হয়ত ভোগ-

লিপ্সার নিরতিশয় প্রাবল্যহেতু, তাহার তৃপ্তির অভাব জনিত দুঃখের ভার বহনে অসমর্থ বোধ করিয়া জীবন বিসর্জ্জনে সে দুঃখভার হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা করিত। ইচ্ছার কার্য্যে পরিণতি এরূপ স্থলে কতদূর স্বাভাবিক তাহাই বিবেচনার কথা। তবে যুবতীর অবিমৃশ্যকারিতা অনেক সময়ে অস্বাভাবিককেও সম্ভবপর করিয়া তুলে। কবি রোহিণীর প্রেমকাহিনী লিখিতে লিখিতে কখন কখন ব্যঙ্গের ভাষাও ব্যবহার করিয়াছেন। আমরা জানি না সে ব্যঙ্গের ভাষার অর্থ কি? আমরা বুঝি না এই অদ্ভুত সংসারের জীবকে আমরা কি ভাবে গ্রহণ করিব। সংসারে সত্য ও ছায়া, প্রকৃত ও অনুকরণ এরূপ অপরূপ ভাবে মিশ্রিত যে সে ভোজবাজীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করা মানুষের অসাধ্য। রোহিণী যে তাহার ধর্ম্মরক্ষার জন্য দেবতাদিগকে আহ্বান করিতেছে, তাহার মধ্যেও যেন আমরা তাহার মর্ত্ত্যের ভাবই দেখিতে পাই, তাহার মধ্যেও যেন তাহার ভোগাকাঙ্খা বিদ্যমান। এ সংসারে লোকে ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে, ধর্ম্মের কথা বলিতে বলিতে, পাপাচরণের কথা ভাবে, পাপের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। রোহিণীও তাহাই করিত। রোহিণী মর্ত্ত্যের জীব বলিয়াই তাহাকে বুঝা কঠিন, কবি যেন সেই কথাই বুঝাইবার জন্য তাহাকে এরূপ বিচিত্র করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।

রোহিণীর ভ্রমরের প্রতি শত্রুতার কথা।

রোহিণীর দুর্ণাম রটিল, রোহিণী মনে করিল, ভ্রমরই তাহার মূল। ইহার ভিতর রোহিণীর সরলতা থাকিতেও পারে। কেননা, কবি বলিয়াছেন, রোহিণী ভাবিল আর কাহার এত জ্বালা। আবার ভ্রমরের সর্ব্বনাশে যদি রোহিণীর আনন্দ, তবে এরূপ না ভাবিলেই বা সে সর্ব্বনাশের অনুষ্ঠানের কারণ সংস্থাপন হয় কোথা হইতে? সংসারে লোকে জানিয়া শুনিয়াই যে মিথ্যা কারণ যুটাইয়া আনে তাহা নহে, অনেক সময়েই মন যাহা চায় আমরা অজ্ঞানে তাহা কল্পনা করি, এবং মনের বেগাধিক্যে কল্পিত ও সত্যে প্রভেদ করিতে পারি না। চতুরা রোহিণী সম্বন্ধে ততটুকু উদারতা দেখাইবারও প্রয়োজন নাই। কলঙ্কের কথা পরিহার করিতে যে রোহিণী এত যত্নবতী ছিল, সেই রোহিণী, গোবিন্দলালের সহিত তাহার অসং সম্বন্ধের কলঙ্ক রটনা হইলে, আপনা হইতেই তাহা প্রমাণ করিতে বসিল। কৃষ্ণকান্তের উইলের পাঠকগণ অবগত আছেন, সে কিরূপে সাজিয়া গিয়া, নিরপরাধে, ভ্রমরের অদৃষ্টলিপির সফলতার পথ পরিষ্কার করিয়া আসিল। রোহিণী কি কেবল ভ্রমরকে জ্বালাইবার জন্যই এরূপ করিল? হইতেও পারে, কেননা ঈর্ষানল কম জিনিস নহে। আবার রোহিণী যাহা বলিয়া কার্য্যক্ষেত্রে নামিত, তাহার অন্তরালে লুক্কায়িত কিছু থাকিত অনুমান করিলে এ কথাও অবিশ্বাস যোগ্য নহে যে, রোহিণী ভাবিয়াছিল ভ্রমর-গোবিন্দলালের মনভঙ্গ করিয়া দিতে পারিলে তাহার নিজের পথ পরিষ্কার হইবে। প্রকৃতও তাহাই হইয়াছিল। সংসারে লোকের কার্য্যের ফল দেখিয়া যদি প্রণোদনকারী

কারণের অনুমান করিতে হয়, তবে এ অনুমানকে অসিদ্ধ বলিতে পারি না। অতএব দেখা যাইতেছে যে কবি রোহিণীকে এরূপ করিয়া গড়িয়াছিলেন যে অনেক স্থলেই তাহার কার্য্যাদির একাধিক কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কবি নিজে কোথায়ও কারণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কোথায়ও বলিয়াছেন যেরূপ ঘটিয়াছে তিনি সেইরূপ লিখিয়াছেন, কিসে কি হইয়াছে, বুঝাইতে পারেন না। ইহাতে বোধ হয় যেন কারণ অনুমান করিয়া রোহিণীকে বুঝিবার চেষ্টা করা কবির অনভিপ্রেত নহে। যদি তাহাই হয়, তবে বলিতে হইবে রোহিণী নূতন রকমের চিত্র, এবং রোহিণীতে সংসারের ভাববিশেষ সম্পূর্ণ প্রতিফলিত করিয়া কবি নূতন রকমের ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন।—

রোহিণীর সম্বন্ধে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আর দুই একটী কথা।

রোহিণীর প্রথম প্রণয় সম্ভাষণে গোবিন্দলাল বুঝিলেন, "যে মন্ত্রে ভ্রমর মুগ্ধ, এ ভুজঙ্গীও সেই মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়াছে," তিনি মনে করিলেন "দর্পণস্থ প্রতিবিম্বের ন্যায় রোহিণীর হৃদয় দেখিতে পাইলেন।" আমরা আশা করি পাঠকগণ মধ্যে কেহ রোহিণীর প্রেমানুরাগকে এই ভাবে দেখিবেন না। গোবিন্দলাল সরলচিত্ত, সংসারানভিজ্ঞ এবং তাঁহার অধঃপতনের জন্য রোহিণীকে তাঁহার এই ভাবে দেখিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। তিনি স্বর্গের পবিত্র সুন্দর জিনিস হইতে মর্ত্ত্যের পঙ্কিলতাকে পৃথক করিতে পারিতেছিলেন না, পবিত্রতাকে অপবিত্রতার সংস্পর্শে আনিয়া পবিত্রতাকে অবজ্ঞাত করিতেছিলেন।—রোহিণীকে গোবিন্দলাল গুলি করিয়া মারিলেন অর্থাৎ হিন্দু যাহাকে অপমৃত্যু বলে রোহিণীর তাহাই ঘটিল। রোহিণীর পাপে তাহার উদ্ধার নাই, তাই কবি তাহার এরূপ মৃত্যুর বিধান করিয়াছেন,—ভ্রমরের জীবনাবসান হইলে বিকৃত মস্তিষ্ক গোবিন্দলাল আত্মহত্যার কল্পনা করিতেছেন, রোহিণী নরক হইতে তাঁহাকে সেই মহাপাতকের পথে আহ্বান করিতেছে। পাপীয়সী জীবনে গোবিন্দলালের নৈতিক চরিত্রের অধঃপাত সাধন করিয়াছিল, মরণেও তাঁহার আত্মার নিরয়গমনের পথ প্রশস্ত করিবার চেষ্টায় ছিল। জীবনে নানা-বয়সে রোহিণী যেরূপই প্রতীয়মান হইয়া থাকুক, এই স্থানে আবার কবি তাহাকে তাহার প্রকৃত বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন, নরকেও পাপিষ্ঠা পাপ চিন্তায় বিরত হয় নাই! অথবা নরক যন্ত্রণা হইতে আপনার উদ্ধারের অন্য সম্ভাবনা না দেখিয়া, গোবিন্দলালের সঙ্গে জড়াইয়া থাকিলে, যদি ভ্রমরের পুণ্যে সেই সঙ্গে উদ্ধার পায়, রোহিণী গোবিন্দলালকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করিয়া সেই স্বার্থের অনুসন্ধান করিতেছিল, নীচ স্বার্থই রোহিণীর প্রকৃষ্ট প্রকৃতি, সুতরাং এ ভাবেও রোহিণী তাহার নিজ বর্ণেই প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার পার্থিব প্রেমানুরাগ কখনও, তাহার প্রেমপাত্রের মঙ্গলের জন্যও, স্বার্থত্যাগ করিতে সমর্থ হয় নাই।

আমরা রোহিণীকে মর্ত্ত্যের ছবি বলিয়াছি। আশা করি আমরা রোহিণীর সম্বন্ধে যাহা লিখিলাম তাহাতে সে কথা

পরিস্ফুত হইয়াছে। রোহিণী হিন্দুর মেয়ে, হিন্দু সমাজে লালিতপালিতা, হিন্দুর শিক্ষা সংস্কার সকলই তাহার ছিল, পাপপুণ্য কাহাকে বলে তাহা সে বিশেষ রূপেই জানিত, কিন্তু তাহার প্রকৃতিতে সম্ভোগ-স্পৃহার রাজত্বে, সে তাহার শিক্ষাদীক্ষা পাপপুণ্যজ্ঞান ভুলিয়া, সকল প্রকার পাপাচরণেই প্রবৃত্ত হইতে পারিত। সে অর্থের লোভে উইল চুরি করিয়া, বিশ্বাস-ঘাতকতার কার্য্যে অসম্মতা হইয়াছে, আবার সম্ভোগলালসার তৃপ্তির উপায়স্বরূপ হরলালকে পাইবে আশায় সহজেই সে অপকার্য্য করিয়া আসিয়াছে। আমরা বলিয়াছি রোহিণী বড় কলঙ্কের ভয় করিত, কিন্তু তার ভোগ-লিপ্সা—যাহা স্ত্রীলোকের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কলঙ্ক, তাহা তাহার ভয়কে পরাভূত করিয়াছিল। রোহিণী প্রকৃত প্রেমানুরাগ কাহাকে বলে জানিত, গোবিন্দলালের নিকট, প্রকৃত বিশ্বাসে হউক বা দেখাইবার জন্য হউক, সে প্রেমানুরাগের অভিনয় করিতেও পশ্চাৎপদ হয় নাই, আবার অসংকোচে নিশাকরের আয়ত চক্ষুর অনুগামিনী হইয়া, তাহার প্রেমানুরাগের প্রকৃতি প্রদর্শন করিয়াছে। গোবিন্দলাল প্রদত্ত স্থানান্তর গমনের সৎপরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার রূপদর্শনের জন্য ছুটিয়াছে, তাহারই মধ্যে রোহিণী তাহার বিধবার ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য দেবতাদিগকে ডাকিতেছে। জীবনসন্ধ্যায় এবং মরণের পর রোহিণী তাহার আত্ম প্রকৃতির পরিচয় প্রদান যদিও আমাদিগকে করিয়াছে, তথাপি জীবনে রোহিণী নানারূপ অপ্রকৃত বর্ণ ধারণ করিয়া আমাদিগকে প্রতারিত করিবার চেষ্টায় শৈথিল্য করে নাই! রোহিণী সম্ভোগ-স্পৃহার সহিত প্রেমানুরাগের অভিনয়, ধর্ম্মজ্ঞানের সহিত পাপ চিন্তা ও পাপাচারণ ইত্যাকার বিরোধ সম্বন্ধের অদ্ভুত মিশ্রণরূপে আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে মর্ত্তের প্রকৃত ছবি দেখাইয়াছে। রোহিণীর নামটিও কবি বিশেষ বিবেচনা করিয়াই রাখিয়াছেন। রোহিণী নক্ষত্রের জাত ফলের মধ্যে লিখিত আছে:—"সুচারু-দেহোবিলসংকলেবরঃ স্মরাগ্নিনাকুলিতা-খিলাশয়ো যো রোহিণীজঃ।" রোহিণী নক্ষত্রের প্রভাবে জন্ম গ্রহণ করিয়া যদি মানুষ বিলাস নিরত এবং সম্যক স্মরাধিকার-গত হয়, তবে অবশ্য রোহিণীতে কাম এবং বিলাসকামনার উৎস নিহিত রহিয়াছে মনে করিতে হইবে।

ক্রমশ—

শ্রীলোকনাথ চক্রবর্ত্তী।

হিন্দু ও মুসলমান।*

হিন্দু মুসলমানের মধ্যে অসদ্ভাব ঘটিয়া বর্ত্তমান সময়ে নানা উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে, ইহা সকলেই অনুভব করিতেছেন। বাস্তবিক কি উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে "অসদ্ভাব" ঘটিয়াছে? আমার বিবেচনায় এ কথা ঠিক নহে। আমরা তিন শ্রেণীর মুসলমানগণের সহিত একত্র বসবাস করিতেছি। নিম্ন, গ্রাম্য ও শিক্ষিত। মুসলমানগণের সহিত আমাদের অসদ্ভাব নাই,ইহা সত্য কথা। তাঁহাদের কতকাংশের সহিত আমাদের মাত্র রাজনৈতিক অনৈক্য। গ্রাম্য সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দু মুসলমানের সদ্ভাব চিরকাল বর্ত্তমান ছিল, এখনও বর্ত্তমান আছে, দেশ কাল পাত্র ঘটিত ব্যাপারে মাত্র তাহাদের সহিত হিন্দুদের কতক মতান্তর ঘটিয়াছে, মনান্তর ঘটে নাই। তাহাদের গ্রাম্য সম্বন্ধ বেশ প্রীতির ছিল। বর্ত্তমান সময়ে সে সম্বন্ধ ঠিক থাকিলেও মতান্তরের দরুণ একটু বিচলিত হইয়া পড়িবার আশঙ্কা হইতেছে। নিম্নশ্রেণীর মধ্যে উপরি-উক্ত উভয় শ্রেণীর মতান্তরের দরুণ মনান্তর ঘটিয়া নানা স্থানে হিন্দু মুসলমানের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিয়াছে ও তাহাদের রাজদ্বারে তলব হইয়াছে, অনেকে বিচার অপরাধী হইয়াছে, এক ঘটনায় নানা ঘটনার অবতারণা করিতেছে। এমন কি অভিজ্ঞতার দ্বারা অনুভব করিয়াছি লাঠি বাজিতে এখন কে অধিক সমর্থ, তাহা লইয়া গ্রামে গ্রামে একটা রেশারেশি চলিতেছে। মহরমের সময় ত্রিপুরা অঞ্চলে পূর্ব্বে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যেরূপ লাঠি তলোয়ার প্রভৃতি ক্রীড়া কৌশল এবং তাহাতে যে উভয় সম্প্রদায়ের প্রীতি উৎস দেখা যাইত, এ বৎসর তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে; আগরতলায় মহরমের সময় ব্রিটিশ ত্রিপুরা হইতে দলে দলে গ্রাম্য মুসলমানের তাজিয়া আসিত, তাহাদের মধ্যে হিন্দু খলিফা (ওস্তাদ) থাকিত। খেলায় যদি মুসলমানকে হারাইয়া হিন্দুর জয় হইত দলের মুসলমান তাহাকে বহন করিয়া বাড়ী লইয়া যাইত। এ বার সে দৃশ্য লুপ্ত হইয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তে এখন কোথাও কোথাও হিন্দু মুসলমানের মধ্যে রেশারেশির অঙ্কুর দেখা যাইতেছে। সেদিন লেখকের এক জন শিক্ষিত হিন্দু বন্ধু কলিকাতায় একটু স্পর্দ্ধা সহকারে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ত্রিপুরায় হিন্দুগণই লাঠি বাজিতে সমধিক পটু। তাঁহার মনোগত ভাবে ইহা স্পষ্ট অনুভব করিয়াছিলাম যে হিন্দুর গর্ব্বটা একটু মুখরোচক। কিন্তু এ কথাও সত্য যে মুখরোচক দ্রব্য সব সময় পাকস্থলীর

* এই প্রবন্ধ অনেক দিন পূর্ব্বে আমাদের হস্তগত হইয়াছিল। বঃ সঃ।

পক্ষে সুপাচ্য হয় না। এবং পাকস্থলীর যদি কোনরূপ দুর্ব্বলতা থাকে তাহার পক্ষে মুখরোচক জিনিষ বিষবৎ হইয়া পড়ে।

পূর্ব্বোক্ত তিন শ্রেণীর মুসলমানের সঙ্গে (উত্তম মধ্যম নিম্ন) হিন্দুদের ঐরূপ তিন দলের মধ্যে মতান্তর ঘটিয়া বিবাদে পরিণত হইয়াছে। ইহার একমাত্র কারণ এই যে শিক্ষিত শ্রেণীর মুসলমানগণের সহিত মতান্তর ঘটার দরুণ ক্রমে তাহা নিম্নস্তরে গড়াইয়াছে। মুসলমান গুণ্ডারা কুমিল্লায় যে বিষম উৎপাৎ ঘটাইয়া একটি ভয়াবহ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে তাহার একমাত্র কারণও মতান্তর উদ্ভূত। কুমিল্লায় এ দুর্দ্দশা ঘটিবার বহু পূর্ব্বে লেখকের হিন্দু বন্ধুদিগকে ইহার জন্য সাবহিত হইবার জন্য অনেক প্রয়াস পাইয়াছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় যদিচ সকলে মন প্রাণ সমর্পণের জন্য মুখে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু কার্য্য করিবার বেলায় কেহই অগ্রসর হইলেন না—বরং সভা করিয়া রিজলিউসন করিয়া কোন কোন মুসলমান ভাগ্যবন্তকে "বয়কট" করা হইয়াছিল। তাহার সঙ্গে যে হিন্দু যোগ দিলেন, তিনিও মুসলমান স্পর্শে "Boycott" সামাজিক দণ্ড ভোগ করিয়াছিলেন, তারপর যা হইবার হইয়াছে। এখন হিন্দু মুসলমানগণের মধ্যে ঝগড়া উপস্থিত। এখানে একটি কথা বলিয়া রাখি, এই স্বদেশী ব্যাপারে নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানগণের মধ্যে যে স্বদেশী ভাব দেখিয়াছিলাম তাহাতে বাস্তবিক মনে হইয়াছিল যে "স্বদেশী" ভাব বুঝি ভারতে জয়পতাকা প্রোথিত করিবে। একজন ইংরাজ বন্ধুর সহিত একটি মুসলমান জোলার আলাপ হয়, বন্ধুটি বাঙ্‌লা জানেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "বন্দে মাতরম্ বল কেন?" উত্তরে মুসলমান বলে "হুজুর, দশে কয় তাই কই।" বন্ধুটি পুনঃ জিজ্ঞাসা করেন "তুমি বিলাতি মাল বেচনা কেন?" উত্তরে "হুজুর দেশের কর্ত্তারা বাবুরা কয় দেশের জিনিষে দেশে টাকা থাক্‌ব, বিদেশিরে টাকা দেবার কি দরকার!" বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে একটি কথায় বর্ষা কষ্ট দূর হইয়াছিল। কিন্তু হায়! এক্ষণে সেই ত্রিপুরাতেই হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কি কাণ্ড না ঘটিয়াছে?

ইহার কারণ কি? একমাত্র কারণ হিন্দু ও মুসলমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে মতান্তর। এই মতান্তর ক্রমে নিম্নগামী হইয়া মনান্তর ঘটাইয়াছে। এই মতান্তরের কারণ কি? রাজনৈতিক বিষয়ে হিন্দু মুসলমানের এক মত হইতেছে না। এমন কি এই রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে অনেক হিন্দু ভাগ্যবন্তকেও নির্লিপ্ত দেখা যাইতেছে। মুসলমান আবহমান কাল হইতে হইতেই রাজ দরবার প্রিয়, এবং দরবারের জন্য ব্যগ্র। এই দরবারি ভাব মুসলমানি, কাজেই মুসলমানের দরবার গত প্রাণ। তার উপর আবার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাহারা অসমর্থ, কাজেই "সন্তানের মধ্যে যেজন মূঢ়মতি, জননীই তাহার আশ্রয় সমধিক এবং জননীর স্নেহও তার পরে সমধিক।" ইহা স্বাভাবিক। তারপরে, স্বরাজ্য স্থাপিত হইবার কাল ও বিলম্ব আছে, যদিও হাইকোর্ট হইতে "স্বরাজ" শব্দের অর্থ হইয়াছে Self-

Government. রাজপুরুষগণ এই শব্দের অর্থান্তর করিবেনই এবং তাহার উপর সিদিশানের মোহর ছেপ্ত করিবেন, ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই ; যে পর্য্যন্ত স্বরাজ স্থাপনের একটা ঠিকঠাক না হইবে সে পর্য্যন্ত মুসলমান দরবার ছাড়িতে পারে না, কারণ তাহা সে জাতির পক্ষে অধর্ম্ম।

বিশেষ, এই ভারতবর্ষ কিং এডওয়ার্ডের ভারত সাম্রাজ্য। "King can do no wrong" ইহার ব্যাখ্যায় এই প্রতীয়মান হয় যে ভারতে এখন পর্য্যন্ত রাজা কোন অন্যায় করেন নাই ; ইংলণ্ডের ভারত সম্রাট তাহার মন্ত্রী সভা ও পার্লিয়ামেন্ট যাহা করেন তাহার বিকৃত অর্থ করিলে সাম্রাজ্যের কোন ক্ষতি হইবে না। যে পর্য্যন্ত আমরা ইংরাজ সাম্রাজ্য ভুক্ত থাকিব, সে পর্য্যন্ত আমাদের সম্রাটের দোহাই চলিবে, মুসলমান ভ্রাতাগণ ইহা জানেন। আরও জানেন সাম্প্রদায়িক দ্বেষ শূন্য দৃঢ় ব্রত এবং একতাবদ্ধ "আয়রলণ্ড" চীৎকার ও মারপিট করিয়াও অদ্য পর্য্যন্ত স্বরাজ পায় নাই, যাহারা স্বরাজ বলিয়া চীৎকার করেন তাহারা "পাষাণে সে চাহে জলে"র ন্যায় পিপাসার গান গাহিবেন। মুসলমান তত দিনে রাজ ভোগ খাইয়া রাজসম্মান পাইয়া তৃপ্ত হইবেন। কারণ তাঁহাদের গানে "যব হাম গুজরি তব দুনিয়া গুজরি" লক্ষ্ণৌ ঠুংরিতে সর্ব্বদা বাজিতেছে। যে পর্য্যন্ত স্বরাজের সম্প্রদায় তাহাদের প্রাপ্য আদায় করিয়া দিনের আলোকে স্পষ্টভাবে স্বরাজ্যের ভিত্তি স্থাপন না করিবেন, তত দিন মুসলমানগণ তাহাতে কখনও বিশ্বাস করিবেন না ; কাজেই যতদিন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মতান্তর রহিয়াছে নিম্নস্তরে মনান্তর ঘটিবেই এবং শিক্ষিত হিন্দু মুসলমানের মধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলনের মতান্তর যত বৃদ্ধি হইবে, নিম্নস্থ যে উৎপাৎ ততই বাড়িবে। তাহার ফল হিন্দু মুসলমান উভয়েই পাইবে। রাজারও ঐ আদেশ, কাজেই হিন্দু মুসলমান ইংরাজি দরবারে যখন এক হইবেন না তখন আমাদের ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই ঘটিবে।

ভারতবর্ষ ইংরাজের সাম্রাজ্য ; তাঁহাদের এই সাম্রাজ্য এখনও সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এখনও ভারত সাম্রাজ্যের সীমানায় নানা বিভীষিকা বর্ত্তমান রহিয়াছে ; এখনও ভারত সমুদ্র পথে ইংরাজ শত্রুর গতাগতির আশঙ্কা রহিয়াছে ; এখনও হিমাচলের দুর্ভেদ্য হিম প্রাচীরের উত্তর অঞ্চলে ইংরাজ শত্রুর গুপ্ত মন্ত্রণার আশঙ্কা করা যাইতেছে ; এখন আফগান বন্ধুটিকে হাতে রাখিয়া তাহাকে শিখণ্ডীর ন্যায় ব্যবহারের জন্য ভারত সম্রাটের বিশেষ প্রয়োজন। এখনও ভারতে সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন আছে এখনও ভারতে তাহাদের বাসা বাঁধার আশঙ্কা আছে, কাজেই স্বরাজ ইংরেজ এখ[illegible]দের সহসা দিবে না। আমরা যতই কেন [illegible] প্রণয়ন না, তাহারা এই অনুগ্রহ করিতে[illegible] কখ[illegible] শক্তিমান নহে। ঘরের ছে[illegible] [illegible]রের কাঁদিতেছে, শত্রুর সহিত মাম[illegible] [illegible] আমরা উকিল মোক্তারকে দিতে [illegible]পারি। বৃত্তিকার কাঁদে কাঁদুক! ইংরাজ দ[illegible] সূত্র দ্বারা সংস্কৃত ঘরের জন্য সর্ব্বপ্রথ[illegible] ও বৈকল্পিক পদ সাধন কি ইংরেজ Hom[illegible] সেই আকারের পৃথক্ [illegible]াছে কল্পনা করিয়াছেন।

পক্ষে সুপাচ্য হয় না। এবং পাকস্থলীর যদি কোনরূপ দুর্ব্বলতা থাকে তাহার পক্ষে মুখরোচক জিনিষ বিষবৎ হইয়া পড়ে।

পূর্ব্বোক্ত তিন শ্রেণীর মুসলমানের সঙ্গে (উত্তম মধ্যম নিম্ন) হিন্দুদের ঐরূপ তিন দলের মধ্যে মতান্তর ঘটিয়া বিবাদে পরিণত হইয়াছে। ইহার একমাত্র কারণ এই যে শিক্ষিত শ্রেণীর মুসলমানগণের সহিত মতান্তর ঘটার দরুণ ক্রমে তাহা নিম্নস্তরে গড়াইয়াছে। মুসলমান গুণ্ডারা কুমিল্লায় যে বিষম উৎপাৎ ঘটাইয়া একটি ভয়াবহ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে তাহার একমাত্র কারণও মতান্তর উদ্ভূত। কুমিল্লায় এ দুর্দ্দশা ঘটিবার বহু পূর্ব্বে লেখকের হিন্দু বন্ধুদিগকে ইহার জন্য সাবহিত হইবার জন্য অনেক প্রয়াস পাইয়াছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় যদিচ সকলে মন প্রাণ সমর্পণের জন্য মুখে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু কার্য্য করিবার বেলায় কেহই অগ্রসর হইলেন না—বরং সভা করিয়া রিজলিউসন করিয়া কোন কোন মুসলমান ভাগ্যবন্তকে "বয়কট" করা হইয়াছিল। তাহার সঙ্গে যে হিন্দু যোগ দিলেন, তিনিও মুসলমান স্পর্শে "Boycott" সামাজিক দণ্ড ভোগ করিয়াছিলেন, তারপর যা হইবার হইয়াছে। এখন হিন্দু মুসলমানগণের মধ্যে ঝগড়া উপস্থিত। এখানে একটি কথা বলিয়া রাখি, এই স্বদেশী ব্যাপারে নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানগণের মধ্যে যে স্বদেশী ভাব দেখিয়াছিলাম তাহাতে বাস্তবিক মনে হইয়াছিল যে "স্বদেশী" ভাব বুঝি ভারতে জয়পতাকা প্রোথিত করিবে। একজন ইংরাজ বন্ধুর সহিত একটি মুসলমান জোলার আলাপ হয়, বন্ধুটি বাঙ্‌লা জানেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "বন্দে মাতরম্ বল কেন?" উত্তরে মুসলমান বলে "হুজুর, দশে কয় তাই কই।" বন্ধুটি পুনঃ জিজ্ঞাসা করেন "তুমি বিলাতি মাল বেচনা কেন?" উত্তরে "হুজুর দেশের কর্ত্তারা বাবুরা কয় দেশের জিনিষে দেশে টাকা থাক্‌ব, বিদেশিরে টাকা দেবার কি দরকার!" বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে একটি কথায় বর্ষা কষ্ট দূর হইয়াছিল। কিন্তু হায়! এক্ষণে সেই ত্রিপুরাতেই হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কি কাণ্ড না ঘটিয়াছে?

ইহার কারণ কি? একমাত্র কারণ হিন্দু ও মুসলমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে মতান্তর। এই মতান্তর ক্রমে নিম্নগামী হইয়া মনান্তর ঘটাইয়াছে। এই মতান্তরের কারণ কি? রাজনৈতিক বিষয়ে হিন্দু মুসলমানের এক মত হইতেছে না। এমন কি এই রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে অনেক হিন্দু ভাগ্যবন্তকেও নির্লিপ্ত দেখা যাইতেছে। মুসলমান আবহমান কাল হইতে হইতেই রাজ দরবার প্রিয়, এবং দরবারের জন্য ব্যগ্র। এই দরবারি ভাব মুসলমানি, কাজেই মুসলমানের দরবার গত প্রাণ। তার উপর আবার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাহারা অসমর্থ, কাজেই "সন্তানের মধ্যে যেজন মূঢ়মতি, জননীই তাহার আশ্রয় সমধিক এবং জননীর স্নেহও তার পরে সমধিক।" ইহা স্বাভাবিক। তারপরে, স্বরাজ্য স্থাপিত হইবার কাল ও বিলম্ব আছে, যদিও হাইকোর্ট হইতে "স্বরাজ" শব্দের অর্থ হইয়াছে Self-

Government. রাজপুরুষগণ এই শব্দের অর্থান্তর করিবেনই এবং তাহার উপর সিদিশানের মোহর ছেপ্ত করিবেন, ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই; যে পর্য্যন্ত স্বরাজ স্থাপনের একটা ঠিকঠাক না হইবে সে পর্য্যন্ত মুসলমান দরবার ছাড়িতে পারে না, কারণ তাহা সে জাতির পক্ষে অধর্ম্ম।

বিশেষ, এই ভারতবর্ষ কিং এডওয়ার্ডের ভারত সাম্রাজ্য। "King can do no wrong" ইহার ব্যাখ্যায় এই প্রতীয়মান হয় যে ভারতে এখন পর্য্যন্ত রাজা কোন অন্যায় করেন নাই; ইংলণ্ডের ভারত সম্রাট তাহার মন্ত্রী সভা ও পার্লিয়ামেন্ট যাহা করেন তাহার বিকৃত অর্থ করিলে সাম্রাজ্যের কোন ক্ষতি হইবে না। যে পর্য্যন্ত আমরা ইংরাজ সাম্রাজ্য ভুক্ত থাকিব, সে পর্য্যন্ত আমাদের সম্রাটের দোহাই চলিবে, মুসলমান ভ্রাতাগণ ইহা জানেন। আরও জানেন সাম্প্রদায়িক দ্বেষ শূন্য দৃঢ় ব্রত এবং একতাবদ্ধ "আয়রলণ্ড" চীৎকার ও মারপিট করিয়াও অদ্য পর্য্যন্ত স্বরাজ পায় নাই, যাহারা স্বরাজ বলিয়া চীৎকার করেন তাহারা "পাষাণে সে চাহে জলে"র ন্যায় পিপাসার গান গাহিবেন। মুসলমান তত দিনে রাজ ভোগ খাইয়া রাজ-সম্মান পাইয়া তৃপ্ত হইবেন। কারণ তাঁহাদের গানে "যব হাম গুজরি তব দুনিয়া গুজরি" লক্ষ্ণৌ ঠুংরিতে সর্ব্বদা বাজিতেছে। যে পর্য্যন্ত স্বরাজের সম্প্রদায় তাহাদের প্রাপ্য আদায় করিয়া দিনের আলোকে স্পষ্টভাবে স্বরাজ্যের ভিত্তি স্থাপন না করিবেন, তত দিন মুসলমানগণ তাহাতে কখনও বিশ্বাস করিবেন না; কাজেই যতদিন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মতান্তর রহিয়াছে নিম্নস্তরে মনান্তর ঘটিবেই এবং শিক্ষিত হিন্দু মুসলমানের মধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলনের মতান্তর যত বৃদ্ধি হইবে, নিম্নস্থ যে উৎপাৎ ততই বাড়িবে। তাহার ফল হিন্দু মুসলমান উভয়েই পাইবে। রাজারও ঐ আদেশ, কাজেই হিন্দু মুসলমান ইংরাজি দরবারে যখন এক হইবেন না তখন আমাদের ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই ঘটিবে।

ভারতবর্ষ ইংরাজের সাম্রাজ্য; তাঁহাদের এই সাম্রাজ্য এখনও সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এখনও ভারত সাম্রাজ্যের সীমানায় নানা বিভীষিকা বর্ত্তমান রহিয়াছে; এখনও ভারত সমুদ্র পথে ইংরাজ শত্রুর গতাগতির আশঙ্কা রহিয়াছে; এখনও হিমাচলের দুর্ভেদ্য হিম প্রাচীরের উত্তর অঞ্চলে ইংরাজ শত্রুর গুপ্ত মন্ত্রণার আশঙ্কা করা যাইতেছে; এখন আফগান বন্ধুটিকে হাতে রাখিয়া তাহাকে শিখণ্ডীর ন্যায় ব্যবহারের জন্য ভারত সম্রাটের বিশেষ প্রয়োজন। এখনও ভারতে সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন আছে এখনও ভারতে তাহাদের বাসা বাঁধার আশা আছে, কাজেই স্বরাজ ইংরেজ এখনও সহসা দিবে না। আমরা যতই কেন কাঁদি না, তাহারা এই অনুগ্রহ করিতে এখনও শক্তিমান নহে। ঘরের ছেলে উপবাসে কাঁদিতেছে, শত্রুর সহিত মামলায় অর্থরাশি উকিল মোক্তারকে দিতে [illegible]তেছে—ছেলে কাঁদে কাঁদুক! ই[illegible] দয়া মায়া তাহাদের ঘরের জন্য সর্ব্বপ্র[illegible]দত্ত হয়—ভারতে না কি ইংরেজ Hom[illegible]made জিনিষ দেয় না।

Export মাল রপ্তানি করে। এমন অবস্থায় Home rule পাইবার ভরসা আকাশ কুসুম। সবুরে মেওয়া ফলে এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে সবুরের দরকার আছে। এ প্রবাদও মুসলমানি। কাজেই মুসলমানগণ মহাজন বাক্য লঙ্ঘন করিবেন না, বরং আগা খাঁ পুরোহিত এ জন্য স্বস্ত্যয়ন ইত্যাদি করিবেন, এবং রাজ দরবারে ধন্না দিবেন। যাহারা ইহা করিতে চান না, বরং ইহাকে লঘুতা মনে করেন তাহাদের সহিত মতান্তর ঘটিবেই। সভা রেজলিউসন করিয়া কাগজে কড়া কথায় গালি মন্দ বলে বলুক, তাহাতে ক্ষতি যাহা হইবে তাহা উভয়তঃ ভোগ্য হইবে। স্বপ্নে রাজ্যলাভ শুধু কল্পনাকে চরিতার্থ করে মাত্র। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঐক্য সদ্ভাব প্রীতি যাঁহারা বাস্তবিক আকাঙ্ক্ষা করেন তাঁহাদের পক্ষে মনান্তর দূরের জন্য ব্যবস্থা না করিলে "নহ্যৌষধি পরিজ্ঞানাৎ ব্যাধি-শান্তিঃ কচিৎ ভবেৎ"।

শ্রীমহিমচন্দ্র ঠাকুর।

কাতন্ত্র কলাপ ব্যাকরণ।

সংস্কৃত শব্দ শাস্ত্রে আমরা সুপ্রাচীন আট খানি ব্যাকরণের নাম ও তাহার আট জন গ্রন্থকারের নাম শুনিতে পাই। তন্মধ্যে কেবল পাণিনি প্রণীত "অষ্টাধ্যায়ী পাণিনীয় ব্যাকরণ" এক্ষণে সংস্কৃত পণ্ডিতদিগের নিকটে পরিচিত, "ঐন্দ্র" "চান্দ্র" প্রভৃতি ব্যাকরণের সংবাদ আর পণ্ডিতমণ্ডলী রাখেন না। পাণিনীয় সূত্রে আমরা অনেক বৈয়াকরণ ঋষির নাম দেখিতে পাই, সেইরূপ বৈয়াকরণ দিগের মত সঙ্কলনের সময়ে পাণিনীয় সূত্রে স্পষ্টতঃ "কলাপের" নামোল্লেখ নাই। বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতদিগের একান্ত বিশ্বাস যে ব্যাকরণের ছায়াবলম্বনে কলাপ ব্যাকরণ লিখিত। তাঁহাদিগের বদ্ধমূল সংস্কারের কারণ বঙ্গদেশীয় টীকাকারগণ সেই ভাবের কথা লিখিয়াছেন। আবার কোন কোন টীকাকার কলাপ ব্যাকরণের উৎপত্তি সম্বন্ধে পিতামহীর রূপকথার মত সেই আকারের একটী আখ্যায়িকারও সৃষ্টি করিয়াছেন। কাশী প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিত-দিগের কিন্তু এরূপ সংস্কার নাই; সে দেশে কলাপ ব্যাকরণের অধ্যয়ন অধ্যাপনা না থাকিলেও তাঁহারা কলাপ ব্যাকরণকে আর্ষ বলিয়া স্বীকার করেন। সর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য এই ব্যাকরণের রচয়িতা বলিয়া এদেশে প্রসিদ্ধি। বঙ্গীয় টীকা-কারগণও সেইরূপ লিখিয়াছেন, কলাপ সূত্রে বা সূত্র মালায় শেষ গ্রন্থকারের নাম নাই। বৃত্তিকার দুর্গসিংহ রচিত নমস্কার শ্লোকে আমরা "সার্ব্ববর্ম্মিকং" এই পদটি

দেখিতে পাই। এই "সার্ব্ববর্ম্মিকং" পদটী দেখিয়াই টীকাকারগণ ও পণ্ডিতগণ সর্ব্ববর্ম্মাকে কলাপের গ্রন্থকার স্থির করিয়াছেন। আচার্য্য সর্ব্ববর্ম্মা কলাপের সূত্রকার হইলেও পাণিনীয় অপেক্ষা কলাপ যে আধুনিক প্রমাণ হয় না। পাণিনীয়ের ছায়াবলম্বনে কলাপ যে লিখিত, সে বিষয়েও কোন প্রমাণ পাই না। বৈয়াকরণ-কেশরী দুর্গসিংহ যে বৃত্তিতে ও টীকাতে কলাপ সূত্রের ব্যাখ্যায় পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়া পাণিনীয় মতের খণ্ডন করিয়াছেন, পাণিনীয়ের সূত্রাধিক্যে উপহাস করিয়াছেন, আবার কোন কোন স্থলে পাণিনীয় সূত্রের দৃষ্টান্তে সেই অনুকরণে বক্তব্য সূত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন; তাহার দ্বারাতেও পাণিনীয় অপেক্ষা কলাপ আধুনিক প্রমাণ হয় না,—দুর্গসিংহই আধুনিক প্রমাণ হয়। কেহ কেহ বেদের অন্যতম ব্যাখ্যাকর্ত্তা দুর্গাচার্য্যকে দুর্গসিংহ বলিতে চাহেন; দুর্গাচার্য্য ও দুর্গসিংহ এক কিনা সে বিষয়ে আমরা এ পর্য্যন্ত অব্যর্থ প্রমাণ পাই নাই। স্মার্ত্তশিরোমণি রঘুনন্দন, কাব্য গ্রন্থের অদ্বিতীয় টীকাকার মল্লিনাথ ও পাণিনীয়ের প্রসিদ্ধ টীকাকারগণ "দুর্গসিংহের" নামোল্লেখ করিয়াছেন। গৌড়েশ্বর লক্ষণ সেনের মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ আচার্য্য পশুপতির পুত্র জয়ন্ নৈয়ায়িক গোপীনাথ তর্কাচার্য্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীপতিদত্ত কৃত পরিশিষ্টের টীকাকার গোপীনাথ লক্ষণ সেনের সমসাময়িক; সুতরাং শ্রীপতিদত্ত লক্ষণ সেনের পূর্ব্ববর্ত্তী। দুর্গসিংহ যে কলাপ সূত্রের ব্যাখ্যায় অর্থ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া প্রয়োগ সাধন করিয়াছেন ও রাশি রাশি পানিণীয় সূত্রের খণ্ডন করিয়াছেন, শ্রীপতি দত্ত আবার তাহারই খণ্ডন করিয়া পাণিনীয় সূত্রের সার্থকতা দেখাইয়া পরিশিষ্টের রচনা করিয়াছেন। সুতরাং দুর্গসিংহ শ্রীপতি দত্ত অপেক্ষা প্রাচীনতম। বোপদেব যে তাঁহার কবিকল্পদ্রুমে "পাণিন্যমরজৈনেন্দ্রাঃ বলিয়া আট জন শাব্দিকের নামোল্লেখ করিয়াছেন; তন্মধ্যে "অমর" কে, জানিবার বিষয়। অমর সিংহ প্রসিদ্ধ কোষ "নামালিঙ্গানুশাসনের" রচয়িতা। ব্যাকরণের পুস্তক লিখিতে যাইয়া বোপদেব কি কারণে একজন কোষকারের নামোল্লেখ করিলেন? যে আট জন শাব্দিকের নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে তন্মধ্যে এক অমর ভিন্ন সকলেই ব্যাকরণের রচয়িতা। কোষকার বলিয়া অমরের নাম গৃহীত হইলে আরও ব্যাড়ি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন কোষকারদিগের কাহারও কাহারও বা সকলের নামোল্লেখ হইত। এই জন্য আমরা বোপদেবের উল্লিখিত অমরকে কেবল কোষকার মনে করিতে পারি না, কোষকার বলিয়া তিনি বোপদেব কর্ত্তৃক অভিনিন্দিত হইয়াছেন মনে করিতে পারি না; প্রত্যুত তিনি একজন ব্যাকরণে প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ছিলেন বলিয়া [illegible] করিতে পারি। ভারতবর্ষে যে ক[illegible] ব্যাকরণ প্রচলিত আছে তদ্ভি[illegible]রের রচিত অন্য কোন ব্যাকরণে[illegible] আমরা এ পর্য্যন্ত দেখি নাই বা শুনি[illegible]। বৃত্তিকার দুর্গসিংহ সংক্ষিপ্ত কলাপ সূত্র দ্বারা সংস্কৃত ভাষায় প্রচলিত সমস্ত বৈকল্পিক পদ সাধন করিতে না পারিয়া সেই আকারের পৃথক্ পৃথক্ শব্দ আছে কল্পনা করিয়াছেন।

আশ্চর্য্যের বিষয়! দুর্গসিংহের সেই সেই কল্পিত শব্দ অমর সিংহের "নামলিঙ্গানুশাসনে" ঠিক সেই সেই আকারে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। পাণিনী প্রভৃতি বৈয়াকরণগণ "মাস" "হৃদয়" প্রভৃতি শব্দের ও "ক্রোষ্টু" শব্দের স্থানে বিভক্তি বিশেষে "মাস" "নিশ্" প্রভৃতি ও "ক্রোষ্টৃ আদেশের বিকল্পে বিধান করিয়াছেন। কলাপে সে আকারের কোন সূত্র নাই, দুর্গসিংহ "মাস" "নিশ" প্রভৃতি শব্দ আছে অঙ্গীকার করিয়া কলাপের পৃথক সূত্রের আবশ্যকতা নাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অমরকোষেও "মাস" "নিশা" প্রভৃতি শব্দের ও শব্দের পৃথক্ সত্তা স্বীকৃত হইয়াছে। বৈয়াকরণগণের সঙ্কেত সত্বেও অমর সিংহের সেই সেই শব্দের পৃথক স্বীকারে কি প্রয়োজন ছিল বুঝিতে পারা যায় না। এই জন্য আমরা বলিতেছি অমরসিংহ পৃথক্ ব্যক্তি নহেন, দুর্গসিংহই অমরসিংহ। এই জন্যই তিনি কলাপে যাহা বলিয়াছেন, ঠিক অমর কোষেও তাহাই বলিয়াছেন। ধরিতে গেলে অমরসিংহের "নামলিঙ্গানুশাসন" খানি প্রকারান্তরে কলাপেরই পরিশিষ্ট গ্রন্থ। পাণিনি লিঙ্গানুশাসনের সূত্র করিয়াছেন, ...পের তাহা নাই। অমরসিংহ লিঙ্গানুশাসন ...খিয়াছেন। বিশেষ্য নিঘ্নবর্গে ও... সঙ্ক... কৃৎ, তদ্ধিত ও স্ত্রীত্বের প্রয়োগ দেখাই... । পাণিনীয়ে যখন এই সকল প্রয়োগের ... প্রক্রিয়া আছে, তখন আর পৃথক্ করিয়া ঐ সকল প্রয়োগের প্রদর্শন করিবার প্রয়োজন বোধ হয় না। কেবল কলাপের পরিশিষ্ট বলিলে এ আপত্তির খণ্ডন হয়। অবশ্য সেই সেই বর্গে কলাপের ব্যবহৃত সংজ্ঞা অমরসিংহ গ্রহণ না করিয়া পাণিনীয়ের ব্যবহৃত সংজ্ঞার গ্রহণ করিয়াছেন; তাহার উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। যেমন দুর্গসিংহ বক্তব্য করিতে যাইয়া বা কলাপ সূত্রের ব্যাখ্যান্তর করিতে যাইয়া উদাহরণ-স্থলে পাণিনীয় সূত্রের উল্লেখ করিয়াছেন; অমরসিংহও সেইরূপ. উদাহরণ দেখাইবার উদ্দেশ্যেই পাণিনীয় সঙ্কেতিত প্রত্যয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। কলাপের বৃত্তিকারের প্রকৃত নাম দুর্গসিংহ নহে। দুর্গসিংহ বৃত্তিকারের উপাধি। "দুর্গে বিষমে সিংহ ইব সিংহঃ" টীকাকারগণ দুর্গসিংহ এই পদের এই অর্থ করিয়াছেন। দুর্গসিংহের নাম দুর্গসিংহ হইলে অর্থ করিবার কি প্রয়োজন ছিল; এই জন্যই আমরা বলিতেছি, দুর্গসিংহ নাম নহে, দুর্গসিংহ উপাধি। দুর্গসিংহ যাঁহার উপাধি, সেই মহাপুরুষের প্রকৃত নাম কি, এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলিব, তাঁহার নাম অমরসিংহ। যে যে কারণে আমরা অমরসিংহ ও দুর্গসিংহকে এক বলি, তাহার কতক কতক কারণ পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে অমর-সিংহ ও দুর্গসিংহের ধর্ম্মমত এক কিনা দেখা আবশ্যক। বিভিন্ন ধর্ম্মমত হইলে আমরা যে সিদ্ধান্ত করিতেছি, তাহা অপসিদ্ধান্ত হইবে। উজ্জয়িনীপতি ভারতসম্রাট বিক্রমাদিত্যের একটী নব-রত্নমণ্ডিত-সভা ছিল, তাহারই অন্যতম রত্ন অমরসিংহ। এই অমরসিংহ বৌদ্ধ ছিলেন বলিয়া প্রবাদ। সংস্কৃত "নবরত্ন" নামে যে একখানি ক্ষুদ্র কাব্য আছে, তাহাতে "ধন্বন্তরি ক্ষপণকা-মরসিংহশঙ্কু বেতাল ভট্টঘটকর্পর কালি-

দাসঃ" ইত্যাদি লিখা আছে। "ক্ষপণক" বৌদ্ধদিগের একটী উপাধি, এই উপাধি অমরসিংহের বৌদ্ধত্বের পরিচায়ক; আরও পরিচায়ক তাঁহার কোষের নমস্কার শ্লোক। নমস্কার শ্লোকে তিনি আর্য্যজাতির স্বীকৃত কোন দেব দেবীর নাম করেন নাই, ঐশ্বর্য্যের জন্য ও নির্ব্বাণলাভের জন্য জ্ঞান ও দয়ার সিন্ধুস্বরূপ যে মহাপুরুষের নির্ম্মল গুণ সমূহ আছে, সেই অক্ষয় পুরুষ সেবনীয় হউন এই আকারের শ্লোক লিখিয়াছেন। এই সকল বিশেষণ দেবোচিত বিশেষণ নহে, কোন মুক্তাত্মা মহাপুরুষের বিশেষণ। অমরসিংহ স্বর্গবর্গে দেবতাদিগের নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে যাইয়া প্রথমেই বুদ্ধদেবের নাম্ কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক শাক্যসিংহের "সঃ" "সঃ" করিয়া বিষ্ণুর অবতার বুদ্ধের সহিত এক করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। দুর্গসিংহও বৌদ্ধ ছিলেন, কলাপের 'পরিভাষাবৃত্তির নমস্কার শ্লোক,' দুর্গটীকার শ্লোক ও কলাপবৃত্তির নমস্কার শ্লোক তাহার পরিচায়ক। "ভগ্নং মারবলং যেন নির্জ্জিতং ভবপঞ্জরং। নির্ব্বাণপদমারূঢ়ং তং বুদ্ধং প্রণমাম্যহম্" এইটী পরিভাষা বৃত্তির শ্লোক, ললিতবিস্তরে লিখা আছে বুদ্ধ শাক্যসিংহ মারবল জয় করিয়াছিলেন, অমরসিংহও বুদ্ধের নামের তালিকায় "মারজিৎ" এক নামের উল্লেখ করিয়াছেন। "শিবমেকমজং বুদ্ধমর্হত্তং তং স্বয়ম্ভুবং। কাতন্ত্র বৃত্তিটীকেয়ং নত্বা দুর্গেণ রচ্যতে" এইটী দুর্গটীকার প্রথম শ্লোক। কলাপ-বৃত্তির প্রথমে যে শ্লোকটী লিপিবদ্ধ হইয়াছে, বঙ্গদেশে সে শ্লোকটী শিবের নমস্কার শ্লোক বলিয়া প্রসিদ্ধ। দুঃখের বিষয়, সে শ্লোকটী এই :—"দেবদেবং প্রণম্যাদৌ সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বদর্শিনং। কাতন্ত্রস্য প্রবক্ষ্যামি ব্যাখ্যানং সার্ব্ববর্ম্মিকং"। "সর্ব্বজ্ঞ" হইলে "সর্ব্বদর্শী" হয় স্বতঃসিদ্ধ; সুতরাং "সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বদর্শিনং" বলিবার আবশ্যকতা দেখা যায় না। টীকাকারগণ ইহার উপপত্তি করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছেন; ইতিহাস না জানিয়া সেই নিষ্ফল চেষ্টা আকাশগাত্রে অস্ত্রপাতের ন্যায় কেবল পরিশ্রমেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। "সর্ব্বজ্ঞঃ সুগতো বুদ্ধঃ" ইত্যাদি অভিধান আছে, এই অভিধান দর্শনে বুঝিতে পারা পারা যায় অন্যান্য নামের ন্যায় "সর্ব্বজ্ঞ" একটী বুদ্ধের নাম; সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া সর্ব্বদর্শী বলাতে পৌনরুক্ত দোষের সম্ভাব হয় নাই। যদি অমরসিংহের সহিত দুর্গসিংহের ধর্ম্মমতের পার্থক্য থাকিত, তাহা হইলে দুর্গসিংহ ও অমরসিংহকে এক বলিতে পারিতাম না। যখন সেই সেই শ্লোকের দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে উভয়েই বৌদ্ধ ছিলেন উভয়েই বুদ্ধদেবের অনুবর্ত্তী ছিলেন, সেবক ছিলেন ও সেই মতে আস্থাবান্ ছিলেন, তখন আর কোনরূপ সংশয় করিবার কারণ নাই। কলাপ-ব্যাকরণের সূত্র প্রণেতা "তিঙন্ত' পর্য্যন্তের সূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, কৃদন্তের সূত্র প্রণয়ন করেন নাই। কাত্যায়ন "কৃদন্তের" সূত্র রচনা করিয়াছেন। কাত্যায়নের পাণিনীয় "বার্ত্তিক" দেখিয়াছি, "পালি ব্যাকরণের" সূত্র দেখিয়াছি, আর কলাপের কৃৎপ্রকরণের সূত্র দেখিয়াছি। কলাপ ব্যাকরণকে সম্মুখে রাখিয়া কাত্যায়ন তাঁহার পালি

ব্যাকরণ রচনা করিয়াছেন, কলাপ সূত্র ও পালিসূত্র দেখিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। কাত্যায়ন পাণিনীয়ের "অচ্" "হল" সংজ্ঞা গ্রহণ করেন নাই, কলাপের "স্বর" "ব্যঞ্জন" সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছেন, "বর্গ" সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছেন, "ঘোষবন্ত" সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছেন, "অঘোষ" সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছেন। আবার কলাপের সন্ধির সংজ্ঞাপাদের শেষেই যেমন প্রয়োজনবশতঃ ব্যঞ্জন হইতে স্বরকে বিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা আছে, অপর ব্যঞ্জনকে যেমন পূর্ববর্ত্তী ব্যঞ্জন বা স্বরের সহিত সংযুক্ত করিবার ব্যবস্থা আছে, পালি ব্যাকরণের কাত্যায়ন সেইরূপ সন্ধির সংজ্ঞা প্রকরণের শেষেই সেই উভয় ব্যবস্থার প্রদর্শন করিয়াছেন। কলাপের সংজ্ঞা "সবর্ণ" "অসবর্ণের" গ্রহণ করিয়াছেন, কলাপের ব্যবহৃত "অনুপদিষ্ট" শব্দের গ্রহণ করিয়াছেন, নামার্থে প্রযুক্ত পাণিনীয়ের "প্রাতিপদিক" সংজ্ঞার গ্রহণ করেন নাই, কলাপে "লিঙ্গ" সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছেন। কারকের কলাপের সূত্র "যস্মাদপৈতি ভয়মাদত্তে বা তদপাদানং," কাত্যায়নের পালির সূত্র, "যস্মাদপেতি ভয়ম্ আদত্তে বা তদপাদানং" ইত্যাদি ইত্যাদি আর কত কি দেখাইব। আশ্চর্য্যের বিষয়, কলাপের অপাদান সূত্রে দুইটী "তিঙন্ত" ক্রিয়া পদ আছে, মধ্যে "ভয়ম্" বলিয়া একটী কৃদন্ত ক্রিয়াপদের ব্যবহার আছে কাত্যায়নও ঠিক কলাপের অনুকরণ করিতে যাইয়া প্রক্রমভঙ্গদোষের অবতারণা করিয়াছেন, "ভয়ং" লিখিতে তাঁহার ভয় হয় নাই। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কি বলিতে পারি পালি- ব্যাকরণ-প্রণেতা কাত্যায়ন কলাপের কৃৎপ্রণেতা কাত্যায়ন নহেন? কাত্যায়নেরই নামান্তর বররুচি, কৃতের টীকাকার নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি জানিতেন না, না জানিয়াই গোলে পড়িয়াছেন। তিনি দুর্গসিংহের "কাত্যায়নেন তে সৃষ্টাঃ" এই কৃৎবৃত্তির প্রথম শ্লোকাংশ দেখিয়া মহর্ষি কাত্যায়নকে কৃৎসূত্রের প্রণেতা অবধারণ করিয়াছেন, বররুচি কৃত কৃৎসূত্র বলিয়া যে প্রবাদ আছে ও প্রাচীন টীকাকারদিগের লিপি আছে 'কাত্যায়নোহি বররুচিনামাপি পরিগৃহ্য' এইরূপ [illegible]র অবতারণা করিয়া এই উভয় মতের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, যে কাত্যায়ন যখন পালি ব্যাকরণ লিখেন, তখন পানিনিকৃত সংস্কৃত ব্যাকরণ দেখেন নাই, দেখিলে অন্ততঃ কারক লিখিতে যাইয়া ঐরূপ অসাবধানতা গ্রহণ করিতেন না। লক্ষণ (Definition) করিতে হইলে নৈয়ায়িকেরা যে নিয়মের প্রবর্ত্তনা করিয়াছেন, তাহার অনুসরণ করিতেন। 'যতোঽপৈতি' অর্থ কি? যাহা হইতে অপায় হয়, তাহার নাম অপাদান। অপাদান এই সংজ্ঞার প্রয়োজন কি? প্রয়োজন অপাদানে কারকে পঞ্চমী বিভক্তি হইবে। এই সূত্রগত "যতঃ" শব্দের পরেও পঞ্চমী বিভক্তি আছে, অপাদান কি বুঝি না, অপাদানেরই লক্ষণ এই সূত্রটী, তাহাতেও পঞ্চমী বিভক্তি দ্বারা অপাদান অর্থের প্রতিপাদন করা হইতেছে। ন্যায় মতে এটি ভয়ঙ্কর দোষ। আশ্চর্য্যের বিষয়, যে বঙ্গদেশে নৈয়ায়িকগণ বংশখণ্ড-

নির্ম্মিত-লেখনী দণ্ডদ্বারা রাশি রাশি ন্যায় গ্রন্থের প্রণয়ন করিয়াছেন, উনবিংশ শতাব্দীতে সেই বঙ্গদেশে বসিয়া শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় ৺বিদ্যাসাগর মহাশয়ও কলাপের অনুকরণে দোষদুষ্ট সূত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। ভগবান্ পাণিনি এই দোষের পরিহারের নিমিত্ত 'ধ্রুবমপায়েঽপাদানং' ইত্যাদি সূত্রের প্রণয়ন করিয়াছেন। বৃহৎ কথাসরিৎসাগরে লিখিত আছে, উপবর্ষ-পণ্ডিতের ছাত্রদিগের মধ্যে কাত্যায়ন সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিভাশালী, আর পাণিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধম! উপাধ্যায় উপবর্ষের পত্নী পাণিনির অল্পবুদ্ধি দেখিয়া মহাদেবের তপস্যা করিবার জন্য নিযুক্ত করেন, মহাদেব তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া পাণিনিকে একখানি নূতন ব্যাকরণ প্রদান করেন। পাণিনি সেই ব্যাকরণ প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া এই ব্যাকরণের নাম পাণিনীয়। সেই ব্যাকরণ হস্তে লইয়া পাণিনি কাত্যায়নের সহিত সপ্তাহকালব্যাপী বিচারে প্রবৃত্ত হয়েন। যখন প্রতিভাশালী কাত্যায়ন কর্ত্তৃক পাণিনি পরাজিত হইতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে মহাদেব আকাশমণ্ডলে এক হুঙ্কার করেন, সেই হুঙ্কারেই কাত্যায়নের "ঐন্দ্র" ব্যাকরণ নষ্ট হয় এবং পাণিনি কর্ত্তৃক কাত্যায়ন পরাজিত হন। পরাজিত হইয়া তিনি মহাদেবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়েন, মহাদেব কিন্তু তাঁহাকে পাণিনির ব্যাকরণেরই অবশিষ্ট পূরণ করিতে আদেশ করেন। সেই জন্যই অগত্যা কাত্যায়ন পাণিনীয়ের বার্ত্তিক রচনা করেন, এই পর্য্যন্ত কথা সরিৎসাগরের কথা। কথাসরিৎসাগর আখ্যায়িকাগ্রন্থ হইলেও কাত্যায়নের এই গল্পটী আকাশে অট্টালিকা নির্ম্মাণের ন্যায় অসত্য বলিয়া বোধ হয় না। অতিরঞ্জন থাকিতে পারে থাকুক, উপবর্ষ পণ্ডিতের ছাত্র যেমন পাণিনি তেমনই কাত্যায়ন ইহা সত্য। কাত্যায়নের সহিত পাণিনির জিগীষা ছিল তাহা সত্য, পরে উভয়ে উভয়ের শাস্ত্র চর্চ্চায় মুগ্ধ হইয়া বন্ধুত্ব করিয়াছিলেন তাও সত্য। সেই বন্ধুত্বের পরিণামই পাণিনীয় গ্রন্থের কাত্যায়ন কর্ত্তৃক বার্ত্তিক রচনা। পাণিনীয় ব্যাকরণ নির্ভুল বলিয়াই পাণিনীয় নিকট কাত্যায়নকে অবশেষে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল। কাত্যায়ন কলাপের একখানি বৃত্তি লিখিয়া যান। দুর্গটীকায় সেই বৃত্তির উল্লেখ আছে। দুর্গসিংহ কখনও কাত্যায়ন এই নামের উল্লেখ করিয়াছেন, কখনও বররুচি এই নামের উল্লেখ করিয়াছেন। কাত্যায়নের বৃত্তিতে কাত্যায়ন আরও অনেক নূতন সূত্রের বা বক্তব্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই সূত্র বক্তব্য সমন্বিত বৃহৎ কলাপব্যাকরণ 'ঐন্দ্র' কিনা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। "ভুবনেশ্বরে" যে কলাপব্যাকরণ প্রচলিত আছে, তাহা দুর্গসিংহের বৃত্তিসমন্বিত নহে, বর্দ্ধমান উপাধ্যায়ের বৃত্তি তাহাতে সংযোজিত। অবশ্য তাহাতে অনেকগুলি অতিরিক্ত নূতন সূত্র দেখিতে পাওয়া যায়। বর্দ্ধমানের বৃত্তি দেখিয়া "প্রক্রিয়া" নামক আর একটী বৃত্তি রচিত হইয়াছে। সেই প্রক্রিয়া বৃত্তিই সাধারণতঃ ভুবনেশ্বরে প্রচলিত। আমি "প্রক্রিয়াবৃত্তি" দেখিয়াছি, বর্দ্ধমানের বৃত্তি দেখি নাই, ভুবনেশ্বরবাসী পণ্ডিত-ভাস্কর দাসের মুখে শুনিয়াছি, তাঁহার গৃহে বর্দ্ধমানের বৃত্তি ও কাত্যায়নের বৃত্তি উভয়ই আছে।

(ক্রমশঃ]

শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন।

৬

সেই ব্যাঘ্র-হৃদয় দন্দোলো, যে নির্দ্দয়ভাবে কত লোকের রক্তপাত করিয়াছে—সেই ভীষণ দস্যু ফর্জ্জা,—নিনেতার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার পূর্ব্বে, সমস্তক্ষণ বিষাদ-জড়তায় আচ্ছন্ন ছিল। অতীত জীবনের জন্য অনুতাপ হইয়াছে বলিয়া, কিংবা পাছে তার প্রতিদ্বন্দ্বী তাহার দস্যুবৃত্তির কথা প্রকাশ করিয়া দেয় এই ভয়ে সে যে এইরূপ বিষাদে আচ্ছন্ন হইয়াছিল তাহা নহে। যে তার হৃদয়কে অবিরত অধিকার করিয়া ছিল, দস্যুবৃত্তির সময় যাহার স্মৃতি তাহাকে বল দিয়াছিল এবং সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া কত মহাপাপের মূল্যে যাহাকে পাইয়াছে বলিয়া সে বিশ্বাস করিয়াছিল এবং সেই সময় আর এক জন আসিয়া যাহাকে তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইল, সেই যুবতী ললনার মৃত্যুতেই সে এইরূপ বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল।

দন্দোলো, নিনেতার শিয়রে উবু হইয়া বসিয়াছিল; শব-বহনের যে সব বিষাদময় পূর্ব্বোদ্যোগ চলিতেছিল, তাহার প্রতি সে কিছু মাত্র লক্ষ্য করে নাই। তাহার পর যখন শবের সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে যাইতে হইল, তখন সে এক বিন্দু অশ্রু মোচন করিল না—কোন কথা না কহিয়া, কিছুরই প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া সে সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

সে যাই হোক্, ভজন-মণ্ডপ হইতে বাহির হইবামাত্র তাহার একটু জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, তাহার স্বকীয় চরিত্র আবার প্রকাশ পাইল; পারিবারিক সমাধি-মন্দিরে নিনেতার মৃতদেহ যখন ন্যস্ত হইল, তখন দন্দোলো মনে মনে শপথ করিল,— মাইকেলকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া প্রিয়তমার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে হইবে।

তার পর সমস্ত দিন দন্দোলো এইরূপ বিষাদে নিমজ্জিত ছিল। দুহিতার মৃত্যুর পর, মাতেয়োর সমস্ত স্নেহ-মমতা দন্দোলের উপর আসিয়া পড়ে। নিজে শোকগ্রস্ত হইলেও মাতেয়ো দন্দোলোকে সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করিল। মাতেয়ো সমস্ত সন্ধ্যাটা দন্দোলোর নিকটে রহিল, কিন্তু বিশ্রামার্থ শয্যা গ্রহণ করিতে দন্দোলোকে কিছুতেই রাজী করাইতে পারিল না। তখন অগত্যা মাতেয়ো ক্লোটিলডার সেবাতেই ব্যাপৃত হইল। এই অবসরে দন্দোলো ক্ষেত-বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া, নিনেতার সমাধি স্থানের অভিমুখে গমন করিল। যে তাহার জীবন সর্ব্বস্ব ছিল সেই নিনেতার মৃতদেহের নিকট গেলেও তাহার কতকটা সান্ত্বনা হইবে এইরূপ সে আশা করিয়াছিল।

শিলাবৃষ্টির শিলায় সমস্ত পথটা আচ্ছন্ন হইয়াছিল; চাঁদ মাঝে মাঝে মেঘে ঢাকিয়া যাইতেছিল, তবু সেই চাঁদের আলোতেই দন্দোলো পথ চিনিয়া লইল। শিলাবৃষ্টিতে পথটা পিছল হইয়াছে। একটু দূরে সে একটা

পায়ের শব্দ শুনিতে পাইল; তাহার পর ভ্রমরগুঞ্জনের ন্যায় কতকগুলি লোকের কণ্ঠস্বরও তাহার কানে আসিল। ফিরিয়া দেখিল, যেন কতকগুলা মনুষ্য মূর্ত্তি; সেই সময়ে চাঁদ মেঘে ঢাকিয়া গেল, আবার সমস্ত অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। দন্দোলো না থামিয়া বরাবর চলিতে লাগিল এবং যেন এক প্রকার অশিক্ষিত সহজ জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হইয়া গন্তব্য স্থানে ঠিক আসিয়া পৌঁছিল। আর দুই চারি পা অগ্রসর হইবা মাত্র একটা আলো দেখিতে পাইল। আলোটা দপ্ করিয়া জ্বলিয়া আবার নিবিয়া গেল। দন্দোলো থামিল। এবার চোখের ভ্রম কিংবা অলীক কল্পনা নহে। আর কোন ব্যক্তি, দন্দোলোর পূর্ব্বেই ঐ স্থানে আসিয়াছে। ঐ আলোকে দন্দোলো নিনেতার সমাধি স্থান চিনিতে পারিয়াছিল। না জানি, আর কে এ সময়ে মৃতদিগের পুণ্য মন্দিরে অনধিকার প্রবেশ করিতে সাহস পাইবে? দন্দোলো কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিল। একজন বলিল—

"কি অদ্ভুত কাজেই আমরা আজ বেরিয়েছি! আমাদের এ যেন জলের উপর খাঁড়ার ঘা মারা হচ্চে। মনে কর যেন নিদ্রাবস্থাতেই আছে; তা হলেও, যে শীতে আমরা জমে যাচ্চি, সেই শীতে, আর বাতাসের অভাবে ওকি মারা যাবে না?" আর একজন উত্তর করিল:—

"আমাকে এখন সাহায্য কর ও সব তোমায় ভাব্‌তে হবে না"।

"যদি তার সঙ্গে তার সমস্ত ধন ঐশ্বর্য্য থাকৃত কিংবা নিদেন পক্ষে অলঙ্কারগুল থাকৃত, তা হলেও বুঝতেম্ এ একটা কাজের মত কাজ বটে; কিন্তু তাত কিছুই নয়। আমরা একটা মৃতশরীর ভিন্ন এখানে আর কিছুই পাব না।"

"চুপ কর বল্‌চি, পৃথিবীর সমস্ত ধন রত্নের চেয়েও ওকে আমি ভালবাসি; আমি কোন বাধা মানৃব না; ওকে আমায় পেতেই হবে; এসো আমরা দুজনে এই পাথরটা টেনে বার করি। শুধু একজন খনক মাটির মধ্যে পাথরটাকে ঠেলে ঢুকিয়ে দিয়েছে।'

যে দুই ব্যক্তি এইরূপ বাক্যালাপ করিতেছিল, নিনেতার দেহ যে পাথরের দেরাজে বদ্ধ ছিল তাহারা সেই দেরাজটা উঠাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, এমন সময়ে দন্দোলো সেই খানে অগ্রসর হইল। একটা লণ্ঠনের আলোক রশ্মি তাহাদের মুখের উপর পড়িতেছিল; সেই আলোকে দন্দোলো মাইকেলকে চিনিতে পারিল। সে-ই পেপলির জাল্-কৌণ্ট, নিনেতার গুপ্তঘাতক। দান্দোলো শত্রুকে দুই হাতে জাপটিয়া ধরিয়া এই রূপ বলিল:—

"তুই ভাবিস্‌নি আমি এখানে আস্‌ব; বিষঘাতী কাপুরুষ, তোরই এই যোগ্য কাজ বটে; যাকে বিষ খাইয়ে মেরেছিস, তারই কবরের ধারে দাঁড়িয়ে আবার তার কবরকেও কলুষিত করছিস্।'

এই মর্ম্মঘাতী বাক্যে মাইকেল কিছুমাত্র বিচলিত হইল না; দন্দোলোর বাহুবন্ধন হইতে একটা হাত বিমুক্ত করিয়া মাইকেল ছোরা বাহির করিবার চেষ্টায় ছিল; কিন্তু দন্দোলো তাহা পূর্ব্বেই লক্ষ্য করিয়াছিল, এবং দ্বিগুণ বলপ্রয়োগ করিয়া সেই ছোরা

তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইল; এই কাড়াকাড়িতে তাহার হাতে যে একটা খোচা লাগিয়াছিল সে তা টেরও পায় নাই। দন্দোলো সেই ছোরা লইয়া মাইকেলের বুকে বসাইয়া দিল। মাইকেল ধরাশায়ী হইল। তার মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না।

এই ঘটনাটা এত চকিতের মধ্যে হইয়া গেল যে, মাইকেলের পাপ-সহকারী সেই পেদ্রোলিনো, ইচ্ছা করিলেও মাইকেলকে সাহায্য করিতে পারিত না। সাহায্য করিবে বলিয়া সে মনেও করে নাই; দন্দোলোর প্রচণ্ড রুদ্র ভাব দেখিয়া সাহায্য করা দূরে থাকুক, সে পলায়নের চেষ্টায় ছিল। লণ্ঠনটা পেদ্রোলিনো হইতে দূরে থাকায়, ঘোর অন্ধকারের মধ্যে, সে কয়েক পা মাত্র অগ্রসর হইতে পারিল।

এই ভীষণ কার্য্য সাধন করিয়া দন্দোলো লণ্ঠনটা হস্তে লইয়া পেদ্রোলিনোর অভিমুখে গমন করিল; মনে করিল, মাইকেলের ন্যায় তাহাকেও যমালয়ে প্রেরণ করিবে। কিন্তু পেদ্রোলিনো তাহার পদতলে নতজানু হইয়া যোড়করে তাহার নিকট এইরূপ অনুনয় করিল:—

—"প্রভু, আমাকে মের না। আমার কথা শোনো, আমি যা বলি তা শুনলে তুমি আমাকে ধন্যবাদ দেবে। তোমার বাগদত্তা ভাবীপত্নী মরে নাই, তুমি আবার যাতে তাকে পেতে পার তার জন্য আমি সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি।"

এই কথা শুনিয়া দন্দোলো সঙ্কল্পিত কার্য্য হইতে ক্ষণেকের জন্য বিরত হইল। পেদ্রোলিনো বলিতে লাগিল:—

—"মাইকেল মাতেম্নোর মেয়েকে ভালবাস্‌ত; সে তাহাকে বিষ খাওয়ায় নি; সেই সরবতের কোন মারাত্মক গুণ ছিল না, সেই সরবত খেলে শুধু ঘুমিয়ে পড়্‌তে হয়।"

দন্দোলো আর কোন কথা শুনিল না; প্রচণ্ড বল প্রয়োগ করিয়া সেই পাথরের দেরাজটাকে টানিয়া আনিল এবং তাহার ছোরার আঘাতে শবাধারের একটা তক্তা উড়াইয়া দিল।

নিনেতা মরে নাই। আলোর রশ্মি তাহার সুপ্ত চেতনাকে উদ্‌বোধিত করিল, কিংবা বাক্‌স ভাঙ্গার আঘাত-শব্দে সরবতের নেশাটা ছুটিয়া গেল। যে কারণেই হউক, নিনেতাকে যখন দন্দোলো বাহুপাশে আবদ্ধ করিল তখন নিনেতার চৈতন্য ফিরিয়া আসিয়াছে। যেন তখনও একটা স্বপ্ন দেখিতেছে এই ভাবে নিনেতা চক্ষু উন্মীলন করিল এবং তাহার প্রণয়ীকে এই রূপ বলিল:—

"এতক্ষণ তুমি কেন আমাকে এখানে একলা ফেলে গিয়েছিলে? আমাদের বিবাহস্থানে লোকেরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।"

—"নিশ্চিন্ত হও, আমি তোমার হ'য়ে প্রতিশোধ নিয়েছি"। এই কথা বলিয়া দন্দোলো মাইকেলের মৃত দেহের উপর লণ্ঠনের আলোক নিক্ষেপ করিল। নিনেতা ভীত হইয়া বলিয়া উঠিল "এ কি! আমরা এখন কোথায় আছি?" তাহার পর, চারিদিকে অন্ত্যেষ্টির উপকরণ সমূহ নিরীক্ষণ করিয়া আতঙ্কে আবার মূর্চ্ছিত হইল। দন্দোলো বক্ষের উপর নিনেতাকে চাপিয়া

সরিয়া এবং পেড্রোলিনোর দিকে ফিরিয়া এইরূপ বলিল :—

"তোকে আমি মার্জ্জনা করলাম ; তুই এখন আমার কাজে নিযুক্ত হ'। এ দেশ ছেড়ে আমরা চলে যাব—আর এখানে ফিরব না। এই বিষয়ে তুই আমার সাহায্য কর। আমরা সমুদ্র পার হয়ে যাব—আর তুই আমার সাহায্য কর্—তোকে আমি ধনী করে দেব।"

এই অমূল্য বোঝা লইয়া, দলোলো পেড্রোলিনোকে পথ দেখাইল—পেড্রোলিনো লণ্ঠন হস্তে লইল ; সমাধি স্তম্ভ সমূহের মধ্য দিয়া উভয়ে অতি কষ্টে পথ চিনিয়া চলিতে লাগিল।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গৃহপ্রতিষ্ঠা।*

পরিষদের গৃহ।

সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ!

আপনাদিগের সম্ভাষণচ্ছলে দুই চারিটী কথা বলিবার জন্য সভাপতি মহাশয় আমাকে আদেশ করিয়াছেন। আমি আন্তরিক আনন্দের সহিত তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছি। আজ বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের গৃহ প্রতিষ্ঠা। প্রায় ১৫ বর্ষ পূর্ব্বে এই পরিষদের জন্ম হয়, এত দিন ইঁহার স্বপদে দাঁড়াইবার শক্তি হয় নাই, আজ ইনি স্বীয় চরণে নির্ভর করিয়া একেবারে দ্বিতল হর্ম্ম্যে আরোহণ পূর্ব্বক তথায় প্রতিষ্ঠিত হইলেন দেখিয়া সকলেই আনন্দিত হইয়াছেন। এই আনন্দের দিনে—পরিষদের এই গৃহপ্রতিষ্ঠা মহোৎসবে—যোগদান করা আমাদের বিশেষ শ্লাঘার বিষয়। তাই আজ পরিষদের প্রতি আমার অকৃত্রিম সংস্রব জানাইবার জন্য ও আপনারা যে উৎসবে ব্যাপৃত হইয়াছেন উহাতে আমিও সংসৃষ্ট আছি ইহা প্রকাশ করিবার জন্য, এখানে উপস্থিত হইয়াছি।

মধ্যযুগে ভারতের জাতিহীন সাহিত্য ও সাহিত্যহীন জাতি।

সভ্যগণ! বাঙ্গালার ইতিহাসে—বলিতে কি ভারতের ইতিহাসে—আজ এক স্মরণীয় দিন। এই দিনের মাহাত্ম্য এক্ষণে আমরা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না। দুই তিন শত বর্ষ পরে এই দিন ইতিহাসে সুবর্ণাক্ষরে লিখিত হইবে এবং এই দিনের ঘটনাবলী লইয়া কত আন্দোলন ও আলোচনা হইবে। গত চারি সহস্র বর্ষ মধ্যে

---

* গত ২১শে অগ্রহায়ণ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গৃহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে পরিষদের নিম্নতলের সভায় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই মর্ম্মে বক্তৃতা করেন। দ্বিতলের সভায় লোকাধিক্য হওয়ায় পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সভাপতিত্বে এই সভা হইয়াছিল। সভার বিস্তারিত বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে। বঃ সঃ।

এরূপ দিন কখনও উপস্থিত হয় নাই। শুনিয়াছি ইতিহাসের প্রারম্ভে কয়েক জন ঋষি পবিত্র সলিলা সরস্বতী নদীর তীরে বাস করিয়া তথায় একটী ভাষার প্রবর্ত্তন করিয়া ছিলেন, কালক্রমে উহা সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যে বিস্তার লাভ করিয়া বর্ত্তমান সংস্কৃত সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছে। এই সাহিত্য নানা জাতি-বিপ্লব ও রাষ্ট্র-বিপ্লব অতিক্রম করিয়া অপ্রতিহতভাবে ধীরে ধীরে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে স্বীয় আধিপত্য সংস্থাপন করিয়াছে। সকল যুগেই ভারতে অসংখ্য প্রাদেশিক ভাষা প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধ গ্রন্থে প্রধানতঃ দামিল, অন্ধক, যোনক প্রভৃতি অষ্টাদশ প্রাদেশিক ভাষার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল ক্ষুদ্র ভাষাকে কখনও স্থানচ্যুত কখনও আত্মসাৎ বা কখনও উল্লঙ্ঘন করিয়া সংস্কৃত সাহিত্য সর্ব্বত্র স্বপ্রভাব বিকীর্ণ করিয়াছে। কাশ্মীরী, পঞ্জাবী, মহারাষ্ট্রী, বাঙ্গালী, উড়িয়া, দ্রাবিড়ী প্রভৃতি সকলেই সংস্কৃত সাহিত্যকে নিজের বলিয়া মনে করেন কিন্তু সংস্কৃত ইঁহাদের কাহারও মাতৃভাষা নহে। ইঁহাদের প্রত্যেকের মাতৃভাষা পৃথক্। গান্ধারের পাণিনি, উজ্জয়িনীর কালিদাস, বিদর্ভের ভবভূতি, গুজরাটের মাঘ, বাঙ্গালার চন্দ্রগোমী ও দ্রাবিড়ের দিগনাগ—ইঁহারা কখনও একভাষায় কথোপকথন করেন নাই কিন্তু ইঁহাদের রচিত সাহিত্যের ভাষা অবিকল একরূপ। সেইজন্য আমার মনে হয় ঐতিহাসিক যুগে অন্ততঃ মধ্যযুগে সংস্কৃত কোন জাতিবিশেষের ভাষা ছিলনা। অর্থাৎ সেই সময়ে ভারতে এমন কোন নির্দ্দিষ্ট জাতি ছিল না যাহার মাতৃভাষা, সংস্কৃত। এইরূপে সংস্কৃত ভাষা কোন নির্দ্দিষ্ট জাতির মধ্যে নিবদ্ধ না থাকায় জাতি বিশেষের উত্থান বা পতনে সংস্কৃত সাহিত্যের কোন রূপান্তর ঘটে নাই। ভারতে কত জাতির উদয় ও বিলয় হইয়াছে কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্য সমস্ত পরিবর্ত্তন বিপ্লবের মধ্যে অবাধিতভাবে অগ্রসর হইয়াছে। তাই কাশ্মীরের কবি সোমেন্দ্র স্বীয় পিতা মহাকবি ক্ষেমেন্দ্রের অবদানকল্পলতা নামক সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

সংসক্তনেত্রামৃতচিত্রচিত্রাঃ
কালেন তে তে বিগতা বিহারাঃ।
সরস্বতী তূলিকয়া বিচিত্র-
বর্ণক্রমৈর্যোল্লিখিতাবদানাঃ।
তাতেন যোঽয়ং বিহিতো মহার্থৈঃ
সমুন্নত পুণ্যময়ো বিহারঃ।
ন তস্য নাশোঽস্তি যুগক্ষয়েঽপি
জলানলোল্লাস পরিপ্লবেন॥

"নেত্রানন্দ দায়ক ও অমৃতময়ী তুলিকাদ্বারা নানা বর্ণে চিত্রিত সেই সেই (পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত) বিহার সমূহ কালের স্রোতে বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু আমার পিতা অবদানকল্পলতারূপ যে পুণ্যময় বিহার নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যাহার অর্থগৌরবে সাধুগণ পুলকিত হন, এবং যাহার অধ্যায় সমূহ সরস্বতী স্বয়ং যেন তুলিকা দ্বারা নানা বিচিত্র বর্ণে অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার নাশ নাই; যুগান্তকালে জলের উল্লাসে বা অনলের চপলতায় এই অবদানকল্পলতার ক্ষয় হইবেনা"।

সংস্কৃত সাহিত্যের অব্যাহত গতি।

এক সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক শাক্য-মুনি সংস্কৃত ভাষার স্থানে মাগধী বা পালি ভাষা ভারতে প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন. কিন্তু তাঁহার চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ফলবতী হয় নাই। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ত্রিপিটক ও কতিপয় ধর্ম্মগ্রন্থ পালিভাষায় বিরচিত হইয়াছিল কিন্তু কিয়ৎকাল পরেই এই ভাষার প্রচার রুদ্ধ হয় এবং সংস্কৃত ভাষায় বৌদ্ধগ্রন্থ লিখিত হইতে আরম্ভ হয়। জৈন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাবীর স্বামী সংস্কৃত ভাষার পরিবর্ত্তে ভারতে প্রাকৃত ভাষা চালাইবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি ও সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হন নাই। ৪৫ খানি জৈন সিদ্ধান্ত ও অপর কতিপয় জৈন গ্রন্থ প্রাকৃত ভাষায় রচিত হইয়াছিল বটে কিন্তু কিছুকাল পরেই ঐ ভাষায় প্রচার বন্ধ হয় ও সংস্কৃত ভাষায় জৈন গ্রন্থ লিখিত হইতে আরম্ভ হয়। অধুনা যে সকল বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থ বিদ্যমান আছে তাহার অধিকাংশই সংস্কৃত ভাষায় রচিত। বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে যে প্রাকৃত ও পালি ভাষার ব্যবহার হইয়াছিল তাহা সংস্কৃত হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নহে। উহারা এক প্রকার সুখোচ্চার্য্য সংস্কৃত ভাষা। পালি যে সংস্কৃত মূলক ভাষা তাহা নিম্নলিখিত বৌদ্ধ বচনে অবগত হওয়া যায় :—

"সা মাগধী মূল ভাসা
নরা যা য়াদিকপ্পিকা।
ব্রাহ্মণা চাস্‌সুতালাপা
সম্বুদ্ধা চাপি ভাসরে।

"সেই মাগধী (পালি) ই মূল ভাষা। কল্পের প্রারম্ভে যখন অপর কাহারও আলাপ শ্রবণ করেন নাই তখন ব্রাহ্মণ ও সম্বুদ্ধগণ এই ভাষায় কথোপকথন করিতেন।"

জৈন গ্রন্থে লিখিত আছে :—

মুত্তূণ দিট্‌ঠি বায়ং কালিয় উক্কালিয়ংগ সিদ্ধংতং
থীবাল বায়ণত্থং পাইয় মুইয়ং জিনবরেহিং॥

"জিনবর (মহাবীর) দৃষ্টিবাদ ব্যতীত অপর সিদ্ধান্ত সমূহ স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ ও মূর্খগণের সুবিধার জন্য প্রাকৃত ভাষায় স্মরণ করিয়াছেন।"

নব্য বঙ্গের জাতীয় সাহিত্য।

বস্তুতঃ সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে এ পর্য্যন্ত কেহই সাহসী হন নাই! যাঁহারা প্রতিযোগিতা করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন তাঁহারাও ব্যর্থ হইয়াছেন। ইহা দেখিয়াও আমরা পরম সাহসিকের কার্য্য করিতে বসিয়াছি। বাঙ্গালা সাহিত্যকে আজ আমরা সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতিদ্বন্দ্বী করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিলাম। বাঙ্গালা জাতির অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা সাহিত্যের অভ্যুদয় হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যকে এখন আর আমাদের অগ্রাহ্য করিবার উপায় নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি মধ্যযুগে ভারতে জাতি ছিল কিন্তু সাহিত্য ছিলনা এবং সাহিত্য ছিল কিন্তু জাতি ছিল না, অর্থাৎ তৎকালে বাঙ্গালী, মহারাষ্ট্রী, দ্রাবিড়ী, উড়িয়া, পাঞ্জাবী, কাশ্মীরী, আসামী প্রভৃতি যে সকল জাতি বাস করিত তাহারা স্বীয় মাতৃভাষার উপর ভিত্তি করিয়া কোন সাহিত্য গঠন করে নাই এবং উহাদের মধ্যে কোন জাতিই সংস্কৃতকে আপনার মাতৃভাষা বলিয়াও

গ্রহণ করে নাই। কাজেই মধ্যযুগে ভারতে জাতির সহিত সাহিত্যের বিচ্ছেদ ছিল। অধুনা প্রকৃতির বিচিত্র বিবর্ত্তনে বঙ্গদেশে জাতির সহিত সাহিত্যের অপূর্ব্ব মিলন হইয়াছে। আজ পবিত্র ভাগীরথী তীরে সহস্র সহস্র বাঙ্গালী সমবেত হইয়া একপ্রাণে মাতৃভাষার উপর ভিত্তি করিয়া অভিনব আদর্শে বাঙ্গালা সাহিত্যের গঠন করিলেন। এই সাহিত্যের পরিণাম কি হইবে এবং এই জাতিরই বা পরিণাম কি হইবে ভাবিয়া স্থির করা যায় না। পরিষদের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে চতুর্দ্দিকে যে মহা-জন-সমুদ্র তেজঃ হর্ষ ও উৎসাহে বিচরণ করিতেছেন তাহা দেখিয়া আমার ধ্রুব বিশ্বাস হইতেছে আমরা কোন অনন্যসাধারণসাধ্য সিদ্ধির জন্য অতর্কিত ভাবে ধাবমান হইতেছি।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

দশপদী কবিতা।

মাঝি বসে' আছে হা'লে, বসে' আছে দাঁড়ে যারা দাঁড়ি,
নৌকা মধ্যে যাত্রীসম বসে আছো তোমরা মরাবোঝা;
নৌকাখানি এ প্রকাণ্ড মহানদে যাচ্ছে দিয়ে পাড়ি,
দেখে তোমরা ভাবছো নৌকা চালানোটা নিতান্তই সোজা।
ভাব্‌ছো দিয়ে ঠেলে ফেলে মাঝি দাঁড়ি মাঝি, বস্‌বে গিয়ে নিজে,
চালাবে এ নৌকাখানি, পাড়ি দিয়ে চলে' যাবে পাড়ে;
—অথচ শেখোনি নৌকা চালানোটা—সে বিদ্যাটা কি যে;
অথচ হাল' ধর্ত্তে চাহো, বস্‌তে কেহই চাহোনাক দাঁড়ে;
অথচ সে যাত্রায় আছে ঘূর্ণী এবং চড়া পদে পদে;
অথচ ঝড় উঠ্‌তে পারে যখন তখন সেই মহানদে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

বঙ্গদর্শন।

বাংলার কাহিনী।

সূচনা।

Every country, almost every parish in England has its annals; but in India, vast provinces, greater in extent than the British Islands, have no individual history whatever.—W. W. HUNTER.

যে দেশের প্রতি গ্রামে থার্ম্মপলি, প্রতি গৃহে লিওনিডস্ সে দেশেরও ইতিহাস ছিল না—ইংরাজ উহা লিখিয়াছেন, লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। কিন্তু আমরা ভারতবাসী হইয়াও সে ইতিহাস লিখিতে পারি নাই—ভারতবর্ষের এমনি দুরদৃষ্ট! ভাগীরথী-তরঙ্গ-বিধৌতা ফলফুলপূরিতা কুসুমিত-তরু-রাজি সুশোভিতা শস্যশ্যামলা স্বর্ণপ্রসবিনী জগদ্ধাত্রীস্বরূপা বঙ্গভূমি—সপ্ত শত বর্ষের লুণ্ঠনেও যাঁহার রত্নরাজি এখনও নিঃশেষ হয় নাই,—ত্রিসপ্তকোটী কণ্ঠ এখন যাঁহার জয় গান করিতে শিখিয়াছে—যাঁহার সন্তানগণ জ্ঞানে কর্ম্মে শিক্ষায় মহনীয়—যাঁহার দুহিতা-গণ দানে অন্নপূর্ণা, স্নেহে জগদ্ধাত্রী, রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী—যাঁহারা তিতিক্ষায় বসুমতী, ক্ষমায় ভগবতী, রমণীগৌরবে যাঁহারা সাবিত্রী—খনা, লীলাবতী, ভবানী, শরৎসুন্দরী যে দেশের, সে দেশেরও ইতিহাস নাই—কোন দিনই ছিল না! যে দেশের বীরাঙ্গনা রণরঙ্গে চণ্ডিকা—কৃপাণ করে বিধর্ম্মী শত্রুর শির ছিন্ন করিয়া শৈলপ্রাচীর সুদৃশ দুর্গপ্রাকার হইতে দুর্গমূল প্রবাহিনী ভীমবেগশালিনী করতোয়া তরঙ্গ মধ্যে আত্মবিসর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিতা হয়েন নাই—এখনও যাঁহার পুণ্যকীর্ত্তি স্মরণ করিয়া মুগ্ধ নরনারী অধুনা সঙ্কীর্ণ-শরীরা করতোয়ার পূতবারি স্পর্শে পবিত্র হয়—হায়রে অদৃষ্ট! সে দেশেরও ইতিহাস নাই! সে দেশের জনপ্রবাহও এমনি, যে তাহারা নিজেকে চিনিতে পারে নাই!

যখন দেশে হিন্দুর রাজত্ব ছিল, যখন ক্ষত্রিয় রাজেন্দ্রগণ ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ দেবতার বর স্বরূপ শিরে ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণেরই আদেশে এবং উপদেশে দেশ শাসন করিতেন, যখন এ দেশের কাব্যনিকুঞ্জ কবিকুল-কলকণ্ঠ-মুখরিত,—তখনও দেশের ইতিহাস ছিল না—সংযম-নিয়ম-বিধির ভিতর দিয়া শুধু সমাজ-শাসনের কাহিনী তখন বর্ত্তমান ছিল।

শেষে যখন পাল-নরপালবংশ ধরার

ধূলির সহিত মিশিয়া গেল, যখন হূণগর্ব্ব-খর্ব্বকারী প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরজয়ী কালরুদ্রসম সেনবংশ অতীতের চিরবিস্মৃত অনন্তগর্ভে নিমজ্জিত হইল—আজ যে মোগল পাঠান ক্রীড়াপটে বিদ্যমান, যখন তাহাদিগের "আল্লা আল্লাহো'' বা "দীন্ দীন্" রবে সুদূর শৈল-প্রান্ত পর্য্যন্ত কম্পিত ও প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল, তখন তাঁহারা ইতিহাস লিখিয়াছিলেন। সেই সকল ইতিহাসের বৃহৎ কলেবরে কেহ বা অনুগ্রহ করিয়া বাংলার জন্য একটু স্থান দিয়াছিলেন, কেহ বা সে মুষ্টিভিক্ষাও দিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন! তাহাই এককালে বাংলার একমাত্র ইতিহাস ছিল!

তার পর ইংরাজ ব্যাপারী পণ্য মাথায় করিয়া বাংলার বাজারে বিক্রয় করিতে আসিল। তখনও মোগলের চিতা একেবারে নির্ব্বাপিত হয় নাই বটে, তখনও মোগল-রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নাই বটে, কিন্তু তাহার রাজসিংহাসন তখন দীর্ঘকালের ব্যসনে শক্তিহীন এবং একান্ত বার্দ্ধক্যজীর্ণ হইয়াছে।

কিছুকাল গেল; ইংরাজব্যাপারী এক দিন তাহার কাচপূর্ণ বাণিজ্য তরণী ভাগীরথী মধ্যে ডুবাইয়া দিয়া বাংলার বক্ষের উপর 'কুঠি' বা শিল্পশালা নির্ম্মাণ করিয়া কুঠিয়াল হইয়া বসিল। তাহার পর একদিন সুপ্রভাতে ইংরাজ দেখিল, বিশাল বঙ্গভূমি তাহাদেরই চরণ স্পর্শ করিয়া মুক্তি ভিক্ষা চাহিতেছে! ইংরাজের কুঠি রাজপ্রাসাদ হইল, মোগলের জীর্ণ শীর্ণ পুরাতন রাজ-সিংহাসন তখন অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে মতিঝিলের এক পার্শ্বে হতাদরে পড়িয়া রহিল! সেই দিন হইতে ইংরাজ আমাদের ঐতিহাসিক। বৈদেশিক পর্য্যটক-গণও ইতিপূর্ব্বে ইতিহাস লিখিয়াছিলেন।

ইংরাজ আমাদের ঐতিহাসিক! 'সাত সমুদ্র তের নদী' পার যাহারা বাস করে—যাহারা আমাদের দেশ চিনে না, সমাজকে জানে না, ভাষা বুঝে না—যাহারা এক শত-ছিন্ন প্যাণ্টালুন, জীর্ণ কোট এবং এক গাছি বেতের ছড়ি হস্তে লইয়া দুই দিনের জন্য আসিয়া, এদেশের অর্থে শূন্যথলি পূর্ণ করিয়া, ল্যাণ্ডো বেরুস্ ব্রুহাম্ চালাইয়া, মোটরকারে হাওয়া খাইয়া অবশেষে একজন ভূমিশূন্য বা 'ক্যাসেল' শূন্য 'নাইট'রূপে আপনার গৃহে ফিরিয়া যায়—তাহাদিগের সেই দুই দিনের ভ্রমণকাহিনীও আমাদের দেশের ইতিহাস! 'রাজেন্দ্র সঙ্গমে দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে'—যাঁহারা সেই মত এদেশে আসিয়া তিন মাসেরও অধিক কাল থাকেন না—সেই তিন মাসেরও আবার তিন দিন জয়পুরে, চারি দিন দিল্লীতে, দুই দিন মান্দ্রাজে পাঁচ দিন কলিকাতায় কাটাইয়া শুধু 'ডিনার' 'বল্' 'পার্টি' 'ম্যাটেণ্ড' করিয়া, বিলাতের সংবাদ পত্রের জন্য সংবাদ যোগাইয়া, ভারতের 'নোট" লিখিয়া লইয়া লণ্ডনে প্রস্থান করেন, তাঁহারাও ভারত-কাহিনী রচনা করিয়া থাকেন; সে রচনাও আমাদের দেশের ইতিহাস! সকল ইংরাজ ঐতিহা-সিকই যে বসন্তের কোকিল, শরতের পূর্ণচন্দ্র, কাঙালীর সাধের উদ্যানে সোহাগের 'ক্যামেলিয়া'—তাহা নহে; অনেকে এমনও আছেন যাঁহারা তাঁহাদিগের জীবনের কর্ম্ম-পর্ব্ব ভারতবর্ষে সমাপন করিয়াছেন—বাংলার

নিকট চির কৃতজ্ঞ বলিয়া যাঁহারা কর্ম্মাবসানেও বাংলাকে ভুলিতে পারেন নাই—বিদেশী হইয়াও বাংলার সহিত আপনাকে মিশাইয়া দিয়াছেন, তাঁহাদিগের রচিত ভারত-কথাই আমাদিগের প্রধান ইতিহাস।

দুই একজন ভিন্ন তাঁহাদিগের সকলের ইতিহাসেই কেবল ঘনঘোর পাঞ্চজন্য-নিনাদ আছে, সৈনিকের রণকোলাহল আছে, আর আছে রণবিজয়ী জনবুলের বিজয়-বিজ্ঞাপন। পলাশী-প্রাঙ্গণে কয়টী আম্র বৃক্ষ ছিল, ইংরাজের ইতিহাসে তাহাও পাইব। কিন্তু সেই সকল আম্রবৃক্ষ বা আম্রনিকুঞ্জ গড়িয়া তুলিতে যাহার দেহের শোণিত শীতল হইয়াছিল, ইংরাজের ইতিহাসে তাহার সুখ-দুঃখের হর্ষ বিষাদের কাহিনী পাইব না, অথচ সেই মবারক নস্য ও রামধন দাসের কথাই আমাদের বাংলার ইতিহাস। ইংরাজের অশ্বারোহী সেনা বা ইংরাজের পদাতিক কত শস্যক্ষেত্র দলিত করিয়া এক দিনে কত ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়াছে, ইংরাজের লিখিত বাংলার বা ভারতের ইতিহাসে তাহার সন্ধান পাইব, কিন্তু চৈত্রের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড—আষাঢ়ের অবিশ্রাম বারিপাত—মাঘের দারুণ শীত সহ্য করিয়াও যাহারা সেই সকল শস্যক্ষেত্র উর্ব্বর করিয়াছিল—যাহাদিগের জীবন মরণ সেই খণ্ড খণ্ড ভূমি গুলির সহিত চির-সম্বন্ধ-বদ্ধ তাহাদিগের কাহিনী লিখিবার মত কয়-জন ইংরাজ ঐতিহাসিক এদেশে আসিয়াছেন!

ইংরাজ শাসনের প্রারম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত অনেক ইংরাজ ঐতিহাসিক প্রাচ্যের ইতিহাস লিখিয়াছেন কেহ বা আমাদিগকে কাপুরুষ, শঠ, ভীরু বলিয়া জগতের সম্মুখে পরিচিত করিয়াছেন—কেহ বা বাংলার ইতিহাস না লিখিয়াও করতালি-চঞ্চল বক্তৃতামঞ্চ হইতে ভাষা শানাইয়া আমা-দিগকে অনৃতবাদী বলিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়া-ছেন। ইনি হয়ত বাঙ্লার ইতিহাস লিখিলে লিখিতে পারিতেন—কিন্তু না লিখিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন, আমরাও তাই সেই দুষ্ট সারমেয়-তাড়িত ভিখারীর মত কহিতেছি—Goodbye to your charity, pray, call back your dog! আর ভিক্ষার কাজ নাই! মহাশয়, অনুগ্রহ করিয়া আপনার কুকুরটাকে নিবৃত্ত করিলে আমি বাঁচি! সকল ইংরাজ ঐতি-হাসিকই যে আমাদিগকে গালি দিয়াছেন, তাহা নহে, কেহ বা সত্য কথা গোপন না করিয়া বলিয়াছেন—বাঙালীর ন্যায় সুচতুর বুদ্ধিমান জাতি অবজ্ঞার পাত্র নহে।

জাতি! নেশন্ বলিলে ইংরাজ যাহা বুঝেন, হায়, আমরা যদি সেই রকম একটা জাতি হইতে পারিতাম, তাহা হইলে এত কালের দাপেও আমাদিগের কোন ক্ষতি হইত না। ইংরাজ এদেশে আসিয়া বাঙালীকে যেমন দেখিয়াছিলেন, লর্ডমেকলে তাহারই ইতিহাস লিখিয়াছিলেন! কিন্তু মেকলের বঙ্গবাসী এবং সত্য বঙ্গবাসী কি এক? তাহা নহে। তখন মোগলের অতি-দীর্ঘ অত্যাচারে বঙ্গবাসী অবসন্ন; বাঙ্লার ধনকুবেরগণ—যাঁহারা সর্ব্বদাই দেশের মুখ-পাত্র, নেতা, সর্ব্বকার্য্যে আদর্শ, সর্ব্বসাধারণের নায়ক—তাঁহারা তখন শক্তিহীন, দেশের

নায়কতা করিবার ক্ষমতা আর তখন তাঁহাদিগের ছিল না। মেকলে সাহেব সেই সময়ের বঙ্গবাসীর চিত্র লিখিয়াছেন—বাঙালীর চিত্র নহে। কিন্তু আমরা যদি সত্য সত্যই একটা জাতি হইতে পারিতাম তাহা হইলে মোগলের সেই দীর্ঘ অত্যাচার অসম্ভব হইয়া উঠিত। * ইস্‌লামের প্রবর্ত্তন কালে এই জাতীয়তার অভাবই বৈদেশিকদিগকে বিজয় লাভের সুবিধা ঘটাইয়া দিয়াছিল—এ দেশবাসীর জাতীয় অবনতির পথ সুগম করিয়াছিল। নতুবা ঐতিহাসিক মেকলে বাঙালীর আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিবার সুবিধা পাইতেন না।

মেকলে প্রভৃতি ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ যে কত ছন্দো-বন্ধে প্রাচ্যে ইংরাজ শক্তির প্রতিষ্ঠার কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নির্ণয় করে কাহার সাধ্য। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে বলিতে হইবে যে সেগুলি প্রাচ্যের ইতিহাস নহে—প্রতীচ্যের ইতিহাস! সে সকল ইতিহাস কেবল ইংরাজ শাসনের বা ইংরাজ শাসকের কাহিনী মাত্র—ইংরাজ যাহাদিগের রাজা, সেগুলি তাহাদিগের ইতিহাস নহে। যদি তাহা হইত, তবে এই রেলওয়ে টেলিগ্রাফের দিনে—কয়েক বৎসর মাত্র পূর্ব্বেও, ইংরাজ-রাজধানী হইতে মাত্র পাঁচ ঘণ্টার পথ দূরে অবস্থিত বাঙ্‌লার ভাগ্যবিপর্য্যয়ের লীলা-নিকেতন বীরভূমির কথা-প্রসঙ্গে একজন নিরপেক্ষ ইংরাজ ঐতিহাসিককে বলিতে হইত না,—"Virbhumi is quite unexplored"—বীরভূমি সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত!

তাই ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন ভারতবর্ষের একজন সত্য ঐতিহাসিক বড় দুঃখ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন,—"The Silent millions who bear our yoke have found no annalist."—অর্থাৎ সেই কোটি মূক প্রজা, যাহারা আমাদিগের শাসন-শৃঙ্খল বহন করিতেছে, তাহারা একজনও ঐতিহাসিক পায় নাই!' ইহা ইংরাজের পক্ষে দুঃখের কারণ বটে, কিন্তু আমাদিগের পক্ষে লজ্জার কারণ! এতদিন আমরা ইতিহাস লিখিতে জানিতাম না—ইতিহাসের আবশ্যকতা এবং সমাদর বুঝিতাম না; কিন্তু এখন ত আমরা ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি, এখন ত বুঝিয়াছি যে জাতীয় ইতিহাসই জাতীয় উন্নতির সোপান, এখন ত আমরা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছি যে 'আমাদের ছিল' বলিয়া এতদিন যে গর্ব্ব করিতেছিলাম—এ যুগে শুধু সে গর্ব্বের কোন মূল্য নাই; এখনও কি বাঙালীর এই কলঙ্ক দূর হইবে না?

যদি না হয়, তাহা হইলে বুঝিব—আমাদের স্বদেশ ব্রত গ্রহণ নিষ্ফল হইয়াছে! যাহারা আপনাকে চিনে না তাহারা কি কোন দিন পৃথিবীর ইতিহাসে একটা জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবে? আমাদের 'কি ছিল' তাহার আলোচনাও যেমন প্রয়োজন, আমরা কত সহিয়াছি তাহার

* A strong spirit of nationality would have rendered such protracted oppression impossible. W. W. Hunter.

চিন্তাও ততোধিক প্রয়োজন। আমাদের ছিলও সব—আমরা হারাইয়াছিও সব। কিন্তু আমরা যাহা সহিয়াছি, আজিও তাহার অনেক সহ্য করিয়া আসিতেছি! তা' যদি না হইবে তবে ইংরাজ রাজপুরুষ বলিবেন কেন —*India must be bled**—ভারতের রক্তমোক্ষণ করিতেই হইবে! ভারতের অসীম নির্ভর-দণ্ডকে শতধা ভগ্ন করিয়া তবে কেন তিনি বলিবেন যে দীনপালিনী ভারতেশ্বরীর পবিত্র ঘোষণা-পত্র একটা কপটতা মাত্র—উহা রাজনৈতিক কপটতা, অর্থাৎ—"Political hypocrisy"!

আমাদের সে কাল আর এখন নাই যখন রাজকুমার কর্ম্মকার দাদা হইত, হারাধন তন্তুবায় ছিল মামা, রায় জমীদারের জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিদাস ফেলু নাপিতকে ডাকিত 'ফেলু কাকা'—আর তাহার ঠাকুরদাদার আমলের বৃদ্ধ পেয়াদা নুর মহম্মদকে বলিত 'বুড়ো দা'; সেকাল আর আমাদের নাই যখন রামচন্দ্রদাস—জাতিতে কৈবর্ত্ত, পেষা গোমস্তাগিরি—আহারান্তে তাহার বাটীর প্রাঙ্গনের পত্রবহুল আম্র বৃক্ষতলে এক খানি জীর্ণ মাদুরে উপবিষ্ট হইয়া, নানা অঙ্গভঙ্গিতে কৃত্তিবাসী রামায়ণ পাঠ করিত এবং প্রতি-বেশী যাদু, সিধু, নিধু, বিধু, মাধু—এমন কি দিলু, হাজি পর্য্যন্ত জমীদারের খাজনা দিতে আসিয়া, একটা মান ও একছড়া পক্ক রম্ভা ভূমিতলে রাখিয়া এক মনে তাহা শুনিত, আর মধ্যে মধ্যে বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিত যাদু এক পা থামিয়া কেমন করিয়া তন্দ্রায় ঢুলিয়া পড়িতেছে ও ক্ষিপ্রহস্তে স্কন্ধস্থিত লাল রঙের ডুরিয়া গামছাখানা টানিয়া লইয়া নিজের ঘর্ম্মাক্ত দেহ ও তন্দ্রাসক্ত নয়নদ্বয় মুছিয়া ফেলিতেছে।

সেকাল আমাদের গিয়াছে যখন ঝুমঝুম্-পুর গ্রামের মাসী ক্ষান্তমণী—বয়স আন্দাজ চল্লিশ, বিধবা কি সধবা তাহা অজ্ঞাত—এক ক'সে পান ও এক ক'সে তামাকের পাতা গুঁজিয়া গ্রামের জমীদার নবীন রায়ের জননীকে ডাকিয়া বলিত, কেমন করিয়া খাজনার দায়ে বিশুর ছেলে বাঁধা পড়িয়াছে, কোম্পানীর লোকে তাহাকে লইয়া গিয়াছে—দেশে যে ঘোর "অকাল" তাহা পর্য্যন্ত মানে নাই!

সেদিন চলিয়া গিয়াছে, যখন দাদা-ঠাকুরের বাটীতে যে বৈঠক বসিত—সেই বৈঠকে গ্রাম শাসিত হইত, গৃহস্থ নির্ব্বিবাদে নিদ্রা যাইত, গ্রাম্য জমীদার ভীত হইত, পদ্মমুখী, পার্ব্বতী প্রভৃতি যুবতী হইলেও অনায়াসে কলসীকক্ষে জল আনিতে যাইতে পারিত—চৌধুরীদের আম্রনিকুঞ্জে লুকাইয়া থাকিয়া কেহ তাহাদিগকে দেখিত না! সে দিন চলিয়া গিয়াছে, যখন পাঁচ টাকায় দুর্গোৎসব হইত, একজন ফকির মাসে এক টাকা ব্যয় করিলে কালিয়া-পোলাও খাইয়া কাটাইতে পারিত, যখন, টাকায় ৮ মণ চাউল পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া বাংলার নবাব ঢাকার সিংহদ্বার রুদ্ধ করিয়া তাহার শিরোভাগে গর্ব্বভরে লিখিয়া দিয়াছিলেন—"যে নবাবের রাজ্যকালে পুনরায় টাকায় ৮ মণ করিয়া চাউল বিক্রীত হইবে, তিনি যেন এই রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত করেন।" সেকাল আর নাই যখন মুর্শিদকুলী খাঁর আমলে চাউলের সাধারণ দর ছিল টাকায় ৫।৬ মণ;

* Lord Salisbury (Prime Minister) in 1875.

সেকাল আর হইবে না যখন সায়েস্তা খাঁর দর্প চূর্ণ করিয়া সরফরাজ খাঁ ঢাকার সেই রুদ্ধ তোরণ মুক্ত করিয়াছিলেন!

ইতিহাস বলিয়া দিতেছে যে এমন দিনও ছিল যখন ১ জিতালে * ২॥৹ সের ঘৃত মিলিত, ১ মণ চাউলের দাম ছিল ৫ জিতাল, ১ মণ লবণ ২ জিতালে পাওয়া যাইত। তার পর এমন দিন আসিয়াছিল, যখন তৈল এবং ঘৃতের দর প্রায় এক ছিল, যখন ২ মণ চাউলের দাম ছিল আট আনা, যখন ৩টী মোহরে এক থান ঢাকাই মসলিন পাওয়া যাইত, যখন ১ সের লবণের দাম ছিল ১ পাই মাত্র।

বাংলায় এমন দিনও গিয়াছে যখন ১ টাকায় এক মণ দশ সের চাউল বিক্রীত হইতেছিল বলিয়া দেশে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল! এমন দিনও ছিল যখন বঙ্গসন্তানগণ স্পর্দ্ধা করিয়া গাহিতে পারিতেন—

"চির কল্যাণময়ী তুমি ধন্য,
দেশ বিদেশে বিতরিছ অন্ন,
জাহ্নবী-যমুনা বিগলিত-করুণা,
পুণ্য-পিযুষ-স্তন্য-বাহিনি।
অয়ি! ভুবন-মনোমোহিনি!"

তখন বাংলার অন্নে করোমাণ্ডেল বাঁচিত, মস্‌লিপত্তন্ বাঁচিত—তখন সিংহল মালদ্বীপ প্রভৃতিতে বাংলার চাউল যাইত। তারপর এমন দিন আসিয়াছিল যখন বাংলায় টাকায় ৩ সের চাউলও পাওয়া যায় নাই—যখন দীন বঙ্গবাসী অনাহারে মরিয়াছিল—যখন ক্ষুধার তাড়নে জননী তাহার মৃত সন্তানকে আহার করিয়াছিল!

এমন দিন বাংলায় ছিল যখন বাঙালী জনার্দ্দন আহান্ কোম্ম তোপ নির্ম্মাণ করিয়াছিল তাহা অদ্যাপিও মুর্শিদাবাদে বাঙালীর কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ বিরাজ করিতেছে, এমন দিনও ছিল যখন বাংলার বাদ্‌শাওয়ালী বা মুলকময়দান, বিষ্ণুপুরের সেই প্রসিদ্ধ তোপ, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নামাঙ্কিত গলিত-লৌহ-বিনির্ম্মিত বৃহৎ কামান এবং এতদ্ভিন্ন রাশি রাশি পিত্তল নির্ম্মিত আগ্নেয়াস্ত্র বাংলার শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছিল! বাংলায় এমন কামানও ছিল যাহার ক্ষমতা পরীক্ষা করিয়া মহামতি রেনেল্ সাহেব বলিয়াছিলেন যে উহা হইতে ৬ মণ ভার গোলা নিক্ষিপ্ত হইতে পারিত!

বাংলায় যেমন কামান ছিল, কৃপাণ ছিল—যেমন ঘৃত, তৈল, তণ্ডুল ছিল, তেমনি কাটোয়ায় এবং কৃষ্ণনগরে ভাস্কর্য্য, ঢাকায় মস্‌লিন, কাশীমবাজারে রেসমী বস্ত্র, রঙ্গপুরে সতরঞ্চ, মেদিনীপুরে সূক্ষ্ম মাদুর ও মস্‌নদ্—তেমনি স্থাপত্যে গৌড়ের হর্ম্ম্যশ্রেণী, মুর্শিদাবাদে কাঠরার মস্‌জিদ, মুর্শিদকুলিখাঁর চেহেল্‌স্তুন—ঢাকার সেই নবাবী মস্‌নদ প্রভৃতিও বাংলার অতুল কীর্ত্তি—কনকাক্ষরে লিখিত বাংলার গৌরবের ইতিহাস।

এখনও সেই গ্রাম আছে, সেই শ্যামস্নিগ্ধ বৃক্ষতল আছে কিন্তু সে দাদাঠাকুর আর নাই, সে বৈঠক আর নাই, সে সচ্ছলতা আর নাই; এখনও সেই ঢাকা আছে, সেই মুর্শিদাবাদ আছে, কিন্তু এখন বন্দুকের শব্দ শুনিলে বাঙালী তাহার দুই কর্ণে অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করায়, এক বিন্দু রক্ত বাহির হইবে ভয়ে তাহার আদরের গোপালের হস্তে একখানি ছুরি পর্য্যন্ত দেয় না—বাঙালী আর কামান গড়িবে কি! সে কান্তমণী, নবীন

নাপিত এখনও আছে বটে, কিন্তু তাহারা আর গ্রামের সংবাদ রাখে না। নবীন নাপিত এখন গ্রামের "কলেজ আউট" নবীন বাবুদিগের নিকট পড়িতে শিখিয়াছে—"বসুমতী" ক্রয় করিবার সঙ্গতি তাহার হইয়াছে—সে এখন হনোলুলুর সংবাদ রাখে—তাহার বাল্য লীলার রঙ্গস্থল ঝুমঝুমপুর গেল কি থাকিল সে তত্ত্ব করিবার অবসরই এখন নাই!

ক্ষান্তমণীর জমীদার-দিদি গঙ্গা লাভ করিয়াছেন। নবীনারা ক্ষান্তকে সেকেলে বলিয়া আর তেমন ভাল বাসে না—তাহার সহিত আর তেমন করিয়া মনের কথা কহে না—আমরা বড় আদর করিয়া যে তাহাদিগকে পড়িতে শিখাইয়াছি "আর ছি ছি! কুন্দনন্দিনি! তুমি চোরের স্পর্শে কাঁপিলে কেন?"—তাই একটু অবসর পাইলেই তাহারা এখন ভাবে 'কুন্দনন্দিনী বিষ খাইয়া মরিয়াছিল কেন?' আমরা আজ না হয় তাহাদিগের হস্তে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র বাবুর "বঙ্গ-লক্ষ্মীর ব্রত-কথা" দিতেছি, কিন্তু এতদিন ত যত্ন করিয়া শিখাইয়া আসিয়াছি—

"আজি যে রজনী যায় ফিরাইব তায়
কেমনে?
কেন নয়নের জল ঝরিছে বিফল
নয়নে?
এ বেশভূষণ লহ সখি লহ,
এ কুসুম-মালা হয়েছে অসহ,
এমন যামিনী কাটিল বিরহ-শয়নে।
হায়, যে রজনী যায় ফিরাইব তায়
কেমনে?"

আমরা এতদিন শ্মশানে দাঁড়াইয়া খেলা করিয়াছি, বেদনা বুকে লইয়া গান গাহিয়াছি, সুতরাং কর্ম্মফল কিছুদিন ভোগ করিতেই হইবে! আমরা চিরদিন কেবল সহ্য করিয়াই আসিতেছি, বোধ হয় অনন্ত কাল ধরিয়া সহ্যও করিব—কিন্তু খরচের খাতায় কি পরিমাণ ওয়াশীল পড়িয়াছে, মধ্যে মধ্যে তাহার একটা হিসাব-নিকাশ করা কি সঙ্গত নহে?

সেই গ্রাম, যাহার সহিত বাঙ্‌লার সুখ-দুঃখের, বিপদ-সম্পদের, সমৃদ্ধি-দারিদ্র্যের চিরসম্বন্ধ—সেই গ্রাম, যাহা লইয়া বঙ্গভূমি—সেই নুরমহম্মদ, জবান্ আকন্দ, নবীন যোগী, সেই রামধন দাস ও মবারক নস্য যাহাদিগকে লইয়া বাংলার রাজত্ব—যাহারা না থাকিলে বাংলার রাজা একদিনও টিকিতে পারেন না—তাহাদিগের কাহিনী লিখিবার কেহ নাই, ইহা কি কম দুঃখের কথা!

আমরা "স্বদেশী"—আমরা বাঙালী; আমরা আমাদের প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের যে অংশটুকু না বুঝিয়াছিলাম, ইংরাজ বিদেশী হইয়াও বহুপূর্ব্বেই আপন স্বার্থের খাতিরে তাহা বুঝিয়াছিলেন—সাধে কি ইংরাজ আমাদিগের রাজা! ইংরাজ বুঝিয়াছিলেন যে জেলা-বোর্ডের ভাইস্-চেয়ারম্যান রাধামাধব সাহা, অথবা মিউনিসিপ্যালিটীর 'খোকার টাটি' হরিনাথ রায়, অথবা গোবিন্দপদ মুখো রায় বাহাদুর কিংবা 'অনারারী' রমেশচন্দ্র তাহাদিগের কেহ নহে——ইহারা মরিলে ইংরাজ মরিবে না, কিন্তু কিনু সর্দ্দার ও জবান আকন্দ, রামধন দাস ও মবারক নস্য বাঁচিলে তবে ইংরাজ বাঁচিবে; ইংরাজ বুঝিয়াছিলেন যে হলধর, কিনু, জবান্ বাচিলে

তবে রায় বাহাদুর বাঁচেন, 'সি, আই, ই' বাঁচেন, রাজাবাহাদুর বাঁচেন। দেশের রাজা হইয়া এ কথাটা ইংরাজ নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছিলেন—কিন্তু বিলম্বে; এবং যেমন করিয়া বুঝিলে আমাদের উপকার হইত তেমন করিয়া বুঝেন নাই!

(ক্রমশ)

সামাজিক প্রসঙ্গ।

বহুদিন পূর্ব্বে কাশী বেড়াইতে যাই। প্রতিদিন সকালে গঙ্গার ধারে যাইতাম—দেখিতাম কত দূর ব্যাপিয়া ভগ্ন মন্দির সকলের বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডগুলি গঙ্গাতটে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। ভাবিতাম—এ সকল দিয়া সে সকল সুবৃহৎ মন্দিরের গ্রন্থি রচনা করিয়াছিল কে? তাহাদের নাশই বা করিল এমন কন্ম-নাশা শক্তি কার? মণিকর্ণিকার ঘাটেও একদিন দেখিলাম সেইরূপ দুইখণ্ড প্রস্তর পড়িয়া রহিয়াছে! তাহার একখণ্ডের উপর তখন একটি শবদাহ হইতেছিল!—মণিকর্ণিকার ঘাট কাশীতে বাঙালীর শ্মশান, দেখিয়া শুনিয়া ভাবিতে ভাবিতে গৃহে ফিরিলাম।

এখন যখন দেশে আসিয়া যেখানে সেখানে ঘুড়িয়া বেড়াই, মনে হয় যেন বিশাল এক শ্মশান ক্ষেত্রে বেড়াইতেছি; সমগ্র শ্মশান যুড়িয়া এক বৃহৎ চিতা জ্বলিতেছে, ধক্ ধক্ করিয়া চিতাগ্নি জ্বলিতেছে; অগ্নিশিখায়, চিতাধূমে আকাশমার্গ রক্ত পাটল হইয়াছে। চিতায় জ্বলিতেছে আমাদের সমাজ, চিতায় জ্বলিতেছে আমাদের দেশাচার। এই ভাগীরথীর উপকূলে, এই পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর উপকূলে, সমতুল্য কাশী বঙ্গভূমে জ্বলিতেছে বঙ্গীয় সমাজ;—যে অমর কীর্ত্তি সমাজ-মন্দির গ্রথিত হইয়াছিল, তাহা কালের বন্যায় ভগ্ন, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, তাহার বিশাল ভিত্তি প্রস্তরের উপর চিতা সাজাইয়া জ্বলিতেছে—বঙ্গীয় সমাজ। এই ভারতের মণিকর্ণিকাভূমে,—বঙ্গভূমে—জ্বলিতেছে বঙ্গীয় সমাজ, বসিয়া দেখিতেছেন—কালরূপী মহাকাল!

হিন্দুর স্বদত্ত প্রাচীন নাম বর্ণাশ্রমী; কর্ম্মভেদে বর্ণভেদ এই জাতির লক্ষণ। পূর্ব্বে অসবর্ণ বিবাহ হিন্দুসমাজে প্রচলিত ছিল। এখন তাহা সম্পূর্ণরূপ রহিত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

কোন কোন ক্ষত্রিয় সমাজে অসবর্ণ বিবাহ এখনও প্রচলিত আছে, ঐ সকল ক্ষত্রিয় হীনবর্ণের কন্যা বিবাহ করা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ মনে করেন না। হাড়ি প্রভৃতি নিম্নতম শ্রেণীর লোকে হিন্দুসমাজভুক্ত যে কোন স্ত্রী কিম্বা পুরুষকে, স্বশ্রেণীভুক্ত করিতে বিমুখ নয়।

হিন্দু সমাজের এই বর্ণবিভাগ হইতে অনেক

সুফল ও কুফল ফলিয়াছে; এই বর্ণ বিভাগ একাধারে সমাজের বিষ ও অমৃত দুই রক্ষা করিয়াছে। ইহা হইতেই হিন্দুজাতির স্থিতি, ইহা হইতেই হিন্দু জাতির বর্ত্তমান অবনতি। এক বংশের পুরুষ পরম্পরা এক ব্যবসা অবলম্বন বা এক শিল্পের অনুধাবন করাতেই হিন্দু জাতির শিল্পাদিতে এত উন্নতি, এত উৎকর্ষ। সাহিত্যে ও ধর্ম্মতত্বে ফল উচ্চতর;—সংস্কৃত ভাষা জগতে অতুলনীয়া, যেমন ভাষার পরিপাটা তেমনি ভাব সঙ্গতি; উপনিষদের দার্শনিক ধর্ম্মপ্রকাশ হইতে কালিদাসাদি কবিগণের ভাববিকাশ সকল বিষয়েই যে অরুণচ্ছটায় জগৎ উদ্ভাসিত তাহার তুলনায় পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের ভাববৈভব অকিঞ্চিৎকর। কি সাহিত্যে কি বিজ্ঞানে, কি ধর্ম্মশাস্ত্রে কি দর্শন শাস্ত্রে কি অঙ্ক শাস্ত্রে কি চারু শিল্পে কি স্থপতি কার্য্যে, সকল বিষয়েই প্রাচীন ভারতের উন্নতি দেখিয়া সমগ্র পৃথিবী চমৎকৃত! এই সকল বিভবের মধ্যে একটী বিষয়ের অভাব দেখিতে পাওয়া যায়, সেটী ঘোর অভাব, সে অভাব ইতিহাসের; সেই অভাবের ফলও বিষময়, ইতিহাস-শূন্য জাতীয় জীবন, কর্ণশূন্য জলযানের সমান। মহাজনাঃ যেন গতাঃ স পন্থা। যে পিতৃগণ জগতে শ্রেষ্ঠ আরাধ্য, যাঁহাদের পদচিহ্ন অনুসরণই জীবনের গন্তব্য পথ, যাঁহাদের পদচিহ্ন ভৃগুপদ চিহ্নের ন্যায় হৃদয়ে ধারণ করিয়া জগতের মহাপুরুষগণ আপনাদের কর্ম্মক্ষেত্রে অভিসরণ করেন, সেই পদচিহ্ন যদি কোন জাতির কাছে, বালুকাক্ষেত্রের ক্ষণবিধ্বংসি চিহ্নের ন্যায় কালের প্রতি ফুৎকারে বিলীন হয়, সেই জাতির প্রলয়ের ঝঞ্ঝাবাতে পথনির্দর্শক হইবে কে? "বৎস যদি মহাজন হইতে চাও মহাজনগণের জীবনী পাঠ কর" ইহা এক মহাপুরুষের উক্তি। অপঠিত চরিত্রের মহাজন চরিত পাঠই চরিত্র গঠনের প্রকৃষ্ট উপায়। আবার সেই মহাজন যদি আপ্তজন হন, তাহা হইলে আত্ম শ্লাঘা আসিয়া জাত্যাভিমান ও বংশাভিমান মূর্ত্তিতে ঐ চরিত্র গঠন কার্য্যে সোণায় সোহাগা হইয়া দাঁড়ায়।

হিন্দুদের কোন রাজনৈতিক ইতিহাস নাই। কোন সামাজিক ইতিহাসও নাই। আছে কেবল তাহাদের এই ভগ্ন অসংস্কৃত সমাজ, বহু কালের ভগ্ন অসংস্কৃত সমাজ, আছে কেবল এই মুমূর্ষু সমাজের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কার্য্যাবলী, আছে কেবল মৃত রাজাদের মৃত অনুশাসনাবলী।

প্রথমে, এই বর্ণাশ্রমজাতি বিবিধ বর্ণে বিভক্ত হইয়া, আশৈশব সবর্ণবিদ্যায় শিক্ষিত হইয়া, পুরুষপরম্পরা একভাব পরম্পরায় পরিচালিত হইয়া, নানা বিষয়ে উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই সুবন্দোবস্তের মধ্যেই প্রায় প্রথম হইতে একটী ঘোর অভাবের সৃষ্টি হইল। প্রথম হইতেই উচ্চশিক্ষা ও বিষয় বিদ্যা শিক্ষা ভিন্ন খাতে পরিচালিত হইল। উচ্চ শিক্ষাভিমানী ব্রাহ্মণ, দর্শন ও সাহিত্যে মনোনিবেশ করিলেন; বিষয় বিদ্যা, নিরক্ষর সাধারণ লোকের হাতে রহিল। যদি সেই সময়ের ইতিহাস থাকিত, হয় ত আমরা দেখিতে পাইতাম যে আবদ্ধ স্রোতের দোষ তখন হইতেই

সমাজে প্রবেশ করিয়াছে, তখন হইতেই স্বাধীন চিন্তার অভাব কার্য্যে পরিলক্ষিত হইয়াছে। যে উচ্চ শিক্ষা পাশ্চাত্য জাতি সকলকে অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ কত বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও জগতের সকল বিষয়ের শীর্ষস্থান দিয়াছে, সাধারণ ভাবে তাহারই অভাবই আমাদের প্রায় সকল অনিষ্টের মূল। যদি আমাদের সেই কালের ইতিহাস থাকিত হয়ত আমরা দেখিতে পাইতাম আমাদের সকল কার্য্যে সেই উদার ভাব লোপ পাইয়া পাশ্চাত্য ভূমির তমোযুগের ন্যায় আমাদের দেশও এক তমোযুগের তামসে আচ্ছন্ন, উচ্চ শিক্ষা ও স্বাধীন চিন্তা সন্ন্যাসীর গিরিগুহায় ও ব্রাহ্মণ মণ্ডলীর নিভৃতাবাসে আবদ্ধ। এমন সময়ে এক ভাবের বন্যা ছুটিল—সমস্ত বন্ধন ছিঁড়িল, সমস্ত দেশ প্লাবিত হইল। হিমাচলের পাদদেশ হইতে নূতন ভাবগঙ্গা প্রবাহিত হইয়া সমাজের আবিলতা নষ্ট করিল। হিন্দুসমাজের প্রাচীন শিক্ষা ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের নূতন দীক্ষা একীভূত হইয়া এক নবীন জাতিকে গড়িয়া তুলিল। নবীন উৎসাহে স্বাধীন চিন্তা সমস্ত জাতীয় কার্য্যে প্রকটিত হইল। কি চারুশিল্পে কি বিজ্ঞান করে, প্রাচীন ভারতের যাহা কিছু গৌরবের বিষয় দেখিতে পাও, তাহার অধিকাংশই বৌদ্ধকালের সৃষ্টি।

কালে বৌদ্ধধর্ম্মের পতন হইল, ব্রাহ্মণগণের রাজনীতির নিকট কপিলাবস্তুর রাজকুমারের সাম্যনীতি নিরস্ত হইল। বোধ হয়, এই সময়ে প্রকৃতিপুঞ্জকে ব্রাহ্মণগণ নূতন করিয়া নানা বর্ণ বিভাগে পুনঃ বিভক্ত করেন, ও বৌদ্ধকালে তাহাদের অল্প বিস্তর মিশ্রণ হেতু আমাদিগকে নানাশঙ্করজাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বঙ্গদেশের সাধারণ নবশাখগণের ও অন্য অন্য জলাচরণীয় জাতিগণের আকৃতি প্রকৃতি ও জাতীয় ব্যবসায় দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে তাহারা অন্ততঃ আংশিক বৈশ্যবর্ণ সম্ভূত।

আর্য্য জাতির আদি অবস্থায়, প্রকৃতিপুঞ্জের সাধারণ ব্যবসায় ভূমিকর্ষণ ও গোমেষাদি পালন ছিল, ক্রমে আর্য্যগণ যেমন সভ্যতা পথে অগ্রসর হইতে লাগিল, সমাজের নূতন নূতন অভাব দূর করিতে বৈশ্যগণ ভিন্ন ভিন্ন শাখায় বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় অবলম্বন করিল, তাহাতে নবশাখগণের প্রথম সৃষ্টি।

ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের তিরোধানের পর, বঙ্গের ব্রাহ্মণমণ্ডলী তথাকার রাজগণকে, সাধারণ প্রকৃতি পুঞ্জকে, কিছু কঠোর হস্তে অনুশাসনের ব্যবস্থা দেন, তাহাদের পরামর্শে ব্রাহ্মণ ব্যতীত সমস্ত বাঙালীর জাতিত্ব শূদ্রত্বে পরিণত করা হইল। বঙ্গের সেনরাজাদের রাজত্বকালে বঙ্গদেশে এই ব্রাহ্মণত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়; কিন্তু তখনও তথায় প্রাচীন স্মৃতি মতে অশৌচ আদির ব্যবস্থা চলিতে ছিল। ক্রমে মুসলমান প্রভাব বঙ্গে বাড়িতে লাগিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গের অজলাচরণীয়গণ হিন্দু সমাজে প্রকৃষ্টরূপ স্থান না পাইয়া মহম্মদীয় ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিল। পরবর্ত্তী কালে খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচারকদিগের প্ররোচনায় অনেক অজলাচরনীয় ঐরূপ খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে। বাংলায় হিন্দু সমাজ এইরূপে সমাজনেতৃদিগের

ক্ষমতা লালসায়, ও ভবিষ্যৎ ধর্ম্মবিপ্লব রোধ কামনায় আপনার ক্ষাত্র শক্তি হারাইতে বসিল। দুর্নীতির বশবর্ত্তী হইয়া হিন্দু সমাজের যে দুর্গতি, তাহা তাহার জাতীয় দৌর্ব্বল্যে চিরদিনই প্রতীয়মান, বিশেষতঃ বর্ত্তমান হিন্দু মুসলমানের বিরোধে তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। পশ্চিম ভারতের সমাজ নেতা ব্রাহ্মণগণ নূতন ক্ষত্রিয়কুল অগ্নিকুলের সৃষ্টি করিয়া আপনাদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন। অগ্নিকুল ভারতের ভাবী হিন্দু মুসলমানের যুদ্ধেরই অগ্নি পরীক্ষায় আপনাদের ক্ষাত্র শক্তির বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছে। মহাভারতের সময় হইতে ব্রাহ্মণগণ অনেকে একাল পর্য্যন্ত ক্ষাত্রবৃত্তি অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন, তাহাতে পশ্চিম ভারতের ক্ষাত্র শক্তি অনেক পরিপুষ্ট; কিন্তু বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণগণ শস্ত্রজীবি নয়, তাহারা চিরকালই শাস্ত্রজীবী; তাহাদের ব্যবস্থার গুণে দেশের উচ্চশ্রেণীর মধ্যে ক্ষত্রিয় শক্তি লোপ পাইল। শাস্ত্রের বৈষম্যব্যবস্থায় উপক্ষত্রিয়গণের অনেকে হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিল। এইরূপে বঙ্গদেশ এক প্রকার ক্ষাত্র শক্তি শূন্য হইল। তারপর বঙ্গের পরশুরাম স্মার্ত্ত শিরোমণির আবির্ভাব; পরশুরাম আপনার শস্ত্রবলে যাহা না করিতে পারিয়াছিলেন, স্মার্ত্ত শিরোমণি আপনার শাস্ত্রবলে তাহা অপেক্ষা অধিক করিলেন। তাঁহার ব্যবস্থাতে ব্রাহ্মণ ব্যতীত সমগ্র বঙ্গীয় সমাজ দাস সমাজে পরিণত হইল। এমন কি সংস্কৃতালোচী বঙ্গের বৈদ্যকুলকেও হীন দাস শ্রেণীতে পরিণত করিবার চেষ্টার ক্রটী হয় নাই। তাহাদের জন্যও একমাস অশৌচের ব্যবস্থা করা হইল। ভারতের অন্যস্থানে প্রচলিত স্মৃতির মতে কেবল অন্ত্যজ জাতির জন্য একমাস অশৌচ ব্যবস্থা। সেখানে পাল্কীবাহক 'কাহার'ও এক মাস অশৌচ পালন করে না। কি উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণকুল স্বদেশকে এইরূপে নিগৃহীত করিয়াছিলেন তাহা ঠিক বলা যায় না; সম্ভবতঃ যাহাতে ভাবীকালে সমাজে আর কোনরূপ ধর্ম্মবিপ্লব ঘটিতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে করিয়া থাকিবেন। ফল বিপরীত ঘটিল। জাতি নির্জ্জীব হইল; বিদেশী আসিয়া ক্ষত্রিয়ের শূন্য স্থান অধিকার করিল। ভিন্ন ধর্ম্মীর সহিত, বঙ্গদেশ হিন্দুর ভাগের হইল; আবার চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের সহিত ধর্ম্মের নূতন স্রোত দেশে প্রবাহিত হইল। সমস্ত দেশকে শূদ্রদেশে পরিণত করাতে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ প্রকারান্তরে আপনাদের মর্য্যাদার ক্রটী করিলেন : তাঁহারা দেখিলেন তাঁহাদের দশা "বল মা [illegible] দাঁড়াই কোথা" হইয়া উঠিয়াছে : শূদ্রময় দেশে "অশূদ্র প্রতিগ্রাহী" হইয়া যজন যাজন প্রতিগ্রহক্রিয়াদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ অসম্ভব হইয়া উঠিল। অশূদ্র প্রতিগ্রাহিত্ব গুণ হইয়া উঠিল, তাহা আর প্রায় শ্রেণীগত গুণ রহিল না।

আদর্শ ক্ষাত্র শক্তি দেশে রহিল না, তাহার অভাবে সমস্ত বাঙালী জাতি ক্ষাত্রতেজ হইতে অনেক অন্তরে পড়িল। দাম্ভিক বিদেশী প্রকৃত তত্ত্বের অনুসন্ধান না করিয়া বাঙলার জল মাটীতে বাঙালীর দৌর্ব্বল্যের কারণ দেখিল। যদি সে পক্ষপাতিত্বের আবরণ উন্মোচন করিয়া সরল দৃষ্টিতে দেখিত তাহা হইলে বুঝিতে পারিত :—

যে দেশে মাংসভোজী শার্দ্দূল, পশুরাজসিংহ অপেক্ষা পরাক্রমী, যে দেশে উদ্ভিদ্‌জীবী খড়্গী জগতের সকল জীব অপেক্ষা বলশালী, সে দেশ কেবল হতভাগ্য মানবের পক্ষে দৌর্ব্বল্যের কারণ হইতে পারে না। তাহার দৌর্ব্বল্যের কারণ অন্যত্র অনুসন্ধান করিতে হইবে।

ব্রাহ্মণ হিন্দু সমাজের কর্ত্তা, ব্রাহ্মণ হিন্দুবিধির বিধাতা। বর্ণাশ্রমগণের মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধ অতি দূর। হিন্দুদিগের মধ্যে একব্যক্তি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া অন্যের সহিত যে কোন আত্মীয়তায় আবদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু বর্ণাশ্রমগণের মধ্যে একবর্ণের লোক কোন ক্রমে বর্ণান্তরে প্রবেশ করিতে পারে না। সমাজে সকল বর্ণেরই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ব্রাহ্মণের সহিত। অরিষ্ট গৃহে জীবনের প্রথম সংস্কার হইতে চিতাগ্নি প্রজ্বলিত হওয়া পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রমীর পদে পদে ব্রাহ্মণের প্রয়োজন। কোন বর্ণের নিঃশেষ হউক, নূতন বর্ণবিশেষের সৃষ্টি হউক, সমাজের হিন্দুয়ানী বজায় রাখিবার পক্ষে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। কিন্তু ব্রাহ্মণ শূন্য হিন্দু সমাজ এক মুহূর্ত্তও চলিতে পারে না। আত্মাশূন্য জীব, এবং ব্রাহ্মণ-শূন্য হিন্দু সমাজ সমানই কথা; ভিন্ন বর্ণের লোকের পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ একমাত্র ব্রাহ্মণকে লইয়া। এক গুরুর শিষ্যত্ব এক পুরোহিতের পৌরহিত্য ভিন্ন অন্য সূত্রে বিভিন্ন বর্ণের লোকের পক্ষে পরস্পরের সহিত আবদ্ধ হইবার কোনরূপ সম্ভাবনা নাই। এরূপস্থলে ব্রাহ্মণ যেরূপভাবে সমাজ শাসন করিবেন সমাজ সেইরূপ ভাবে চালিত হইবে ইহা আর অসম্ভব কি?

মুসলমান শাসনকালে, বঙ্গদেশে হিন্দুক্ষাত্র-শক্তির অনেক হ্রাস হইলে বৈশ্যবৃত্তি সকল একরূপ চলিতে লাগিল। নবশাখগণ ব্রাহ্মণের চক্ষে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইলেও কার্য্যতঃ তাহারা আপনাদের বৃত্তি অনেকটা অক্ষুণ্ণ রাখিল। কিন্তু এই সময় হইতে হিন্দুগণের বর্ণবিভাগ প্রকৃত পক্ষে শিথিল হইতে আরম্ভ হইল। ভিন্ন ধর্ম্মী রাজা রাজ সংসারে চাকুরীদানে বা সমাজে লোকের উপজীবিকা সম্বন্ধে বর্ণাশ্রমের বর্ণবিভাগের উপর কোন লক্ষ্য রাখিলেন না। বর্ণভেদে সহানুভূতির অভাব হিন্দুসমাজের প্রকৃতিগত দোষ; এক্ষণে বর্ণগত বৃত্ত্যানুবর্ত্তিতার যে গুণ তাহার লোপ পাইবার সূত্রপাত হইল। কিন্তু সূত্রপাত হইল মাত্র। পুরুষ পরম্পরা একব্যবসা অবলম্বন করিয়া লোকে সচ্ছন্দে দিনপাত করিতেছিল, সুতরাং তাহারা একদিনে স্ববৃত্তি ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হয় নাই। জমীদারগণের মধ্যে অনেকে হিন্দু ছিলেন, তাঁহারা আপন আপন এলেকায় হিন্দু সমাজের আচার ব্যবহার অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টিত রহিলেন।

ভারতে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিল। মুসলমান রাজ্যের অবসান এবং ইংরেজ রাজ্যের স্থাপন হইল, সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী শিক্ষার সহিত বাংলার সমাজে ধীরে ধীরে বিপ্লব ঘটিল। বর্ণভেদ অনুসারে ব্যবসায় ভেদ উঠিয়া গেল। বর্ণভেদ রহিল কেবল বিবাহাদি সামাজিক সংস্কারগত কার্য্যে। সকল বর্ণের লোকই, আপনার অবস্থায় কুলাইলে, আপনার সন্তান-দিগকে, ইংরেজী শিক্ষা দিবার জন্য ব্যগ্র

হইল। এদিকে রাজকীয় শিক্ষাবিভাগ, বিশেষতঃ খৃষ্ট মতাবলম্বী বিভিন্ন ধর্ম্ম প্রচারক সম্প্রদায় ভারতবর্ষীয়দিগকে স্বল্প ব্যয়ে পাশ্চাত্য বিদ্যা শিক্ষার সুব্যবস্থা করিয়া দিল। সকল বর্ণের মেধাবী বালকগণ আপনাদের বর্ণগত জাতি ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া ইংরেজী বিদ্যা শিক্ষায় মন দিল। প্রতিভাসম্পন্ন ব্রাহ্মণ কুমার সংস্কৃত অলোচনা পরিত্যাগ করিয়া রাজকীয় চাকুরী পাইবার আশায় ইংরেজী শিক্ষা করিতে ইংরেজী বিদ্যালয়ে নিযুক্ত হইল। তীক্ষ্ণবুদ্ধি বৈদ্য-বালক আয়ুর্ব্বেদ পাঠ পরিত্যাগ করিয়া ইংরেজী পাঠে মনোনিবেশ করিল। এইরূপে সকল বর্ণজাতির বুদ্ধিমান বালকেরা জাতি ব্যবসা পরিত্যাগ করাতে বর্ণাশ্রম-অনুমোদিত ব্যবসা সকলের অবনতি হইতে লাগিল। দেশে ইংরেজী শিক্ষার যতই বিস্তার হইতে লাগিল, ঐ সকল জাতীয় ব্যবসার ততই অবনতি হইল। যে সকল স্থূল বুদ্ধি যুবক ইংরেজী শিক্ষার অনুপযুক্ত প্রধানতঃ তাহারাই জাতি-ব্যবসায় লইয়া পড়িয়া রহিল। যে সকল বুদ্ধিমান যুবক অভাববশতঃ ইংরেজী শিক্ষা করিতে না পারিয়া, অগত্যা জাতি ব্যবসা শিক্ষা করিতে বাধ্য হইল,তাহারা আপনাদের বিষয়কর্ম্মে উন্নতি লাভ করিতে পারিলেই আপনাদের সন্তানদিগের আর জাতিব্যবসা শিক্ষা দেওয়া উপযুক্ত বোধ করিল না। তাহারা সন্তানদিগকে ইংরেজী শিখিতে দিল। অপর দিকে পাশ্চাত্য বিদ্যা পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্র, এবং পাশ্চাত্য শিল্প,—ভারতীয় সাধারণ বিদ্যা, ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদ, ভারতীয় শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায় নিযুক্ত হইল। স্বাধীন চিন্তা ও উচ্চশিক্ষার ক্রোড়ে লালিত, রাজকীয় স্নেহে পরিবর্দ্ধিত পাশ্চাত্য জ্ঞান ও কর্ম্ম-স্রোত, প্রতিভা-বিহীন হতাদর বর্ণাশ্রমের কর্ম্মকাণ্ডকে নষ্ট করিল। বর্ণাশ্রমের বর্ণবিভাগের আর কোন অর্থ রহিল না। রহিল কেবল বর্ণাশ্রমের প্রকৃতিগত দোষ ;—সম্মিলনী শক্তির অভাব। এই শক্তির অভাবের জন্যই সাধারণ প্রকৃতিপুঞ্জ আবহমান কাল রাষ্ট্রবিপ্লবে নিরপেক্ষ। যখন ভারতের ক্ষাত্র শক্তি ক্ষত্রিয়োচিত পরাক্রমে মুসলমান আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া ক্ষত্রিয়োচিত পরিণাম প্রাপ্ত হইল ; তখন আর বিদেশীর হস্ত হইতে স্বাধীনতা রক্ষা করে এমন আর কেহই রহিল না। এইরূপে যখন ভারতে রাজশক্তির বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে তখনই প্রজা-পুঞ্জ উদাসীন দ্রষ্টারূপে রাষ্ট্রবিপ্লব দেখিয়াছে মাত্র, কোন পক্ষের প্রতি কার্য্যতঃ কোনরূপ সহানুভূতি দেখায় নাই।

সমাজভুক্ত মানব জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সমাজের অধীন। রোগে বল, শোকে বল, উৎসবে বল, ব্যসনে বল, সকল বিষয়ে সমাজ, তুমি যে তাহার অধিকার ভুক্ত এই কথাটী তোমাকে অনুভব করায়। সমাজের সামাজিক হইতে গেলে, সমাজ-অনুজ্ঞাত সংস্কার দ্বারা তোমাকে সংস্কৃত হইতে হইবে।

বর্ণাশ্রম-সমাজ ব্রাহ্মণ-প্রধান সমাজ, ব্রাহ্মণ, বর্ণাশ্রমদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠবর্ণ, ব্রাহ্মণ সমাজনেতা, ব্রাহ্মণ সমাজের বিধাতা, সমাজ রক্ষা করিতে গেলে, বর্ণাশ্রমের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে গেলে, বর্ণকে রক্ষা করিতে হইবে।

সমাজকে সৎপথে রাখিতে গেলে সমাজ-নেতাকে স্বাধীনচেতা হওয়া চাই। স্বাধীন-চেতা হইতে গেলে স্বাধীনবৃত্তি হওয়া চাই। অন্নচিন্তা অনেক সময়ে প্রতিভা, প্রজ্ঞা ও বিদ্যাবত্তার দাহিকা জ্বলন্ত চিতা, একথা অনেকবার অনেক প্রাজ্ঞ বলিয়াছেন, একথা আর নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। এই চিন্তায় যাহাতে ব্রাহ্মণের স্বাধীনতা নষ্ট না হয়, যাহাতে সমাজনেতা ব্রাহ্মণকে অন্য বর্ণের দয়া দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করিতে না হয়, অথচ যাহাতে নিজের অন্নের চেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত হইতে না হয়, যাহাতে নিজের শাসনের গুণে, বিনা ক্লেশে, বিনা চেষ্টায় অনায়সলব্ধ অন্নদ্বারা সমাজনিয়ন্তাগণ আত্মরক্ষা করিয়া সমাজের উন্নতিকল্পে আপনাদের সমস্ত সময় অতিবাহিত করিতে পারেন, সমাজ তাহার বন্দোবস্ত করিল।

কি রাজা, কি প্রজা, কি ধনী, কি নির্ধন, কি ব্রাহ্মণ, কি অব্রাহ্মণ সকলেরই সংস্কারময় বর্ণাশ্রম জীবনের সকল সংস্কারে সাধারণত একই ব্যবস্থা। অরিষ্টগৃহে নবজাত সন্তানের নবজীবনের ঐহিক মঙ্গলকামনায় প্রথম দেব আরাধনা হইতে, শ্মশানশায়ী বিগতাত্মা বর্ণাশ্রমীর পারত্রিক পরিতৃপ্তির জন্য পূরক পিণ্ড দান কার্য্য অবধি সকল বিষয়ে, সেই বর্ণী ব্রাহ্মণের আবশ্যক, সেই বর্ণী ব্রাহ্মণের প্রতিপালনের ব্যবস্থা। সংস্কারকামী বর্ণাশ্রমী হিন্দু যেখানে যাউক, সেইখানে তাহার ব্রাহ্মণের আবশ্যক, সেই খানেই তাহার ব্রাহ্মণ প্রতিপালন কর্ত্তব্য। ইহাই বর্ণাশ্রম সমাজের মূল ভিত্তি, ইহাই বর্ণাশ্রম সমাজের মৌলিক নীতি। ইহার বলে এই অদ্ভুত বর্ণাশ্রম সমাজে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া পবিত্র আর্য্যভূমিতে যে অপূর্ব্ব ভাষা অপূর্ব্ব দর্শন অপূর্ব্ব বিজ্ঞান প্রভৃতি প্রণয়ন করিয়াছে, তাহা বিপুল পৃথিতলে অনন্যদৃষ্ট অভাবনীয় সৃষ্টি।

যে উচ্চ শিক্ষা, যে স্বাধীন চিন্তা, যে প্রাচীন চিন্তা প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণমণ্ডলীর তীব্র প্রতিভাকে জগতে অতুলনীয়া করিয়াছিল, যদি সেই উন্নত শিক্ষার সেই স্বাধীন চিন্তার স্রোত বর্ণাশ্রম সমাজের সকল স্তরে সঞ্চারিত হইত, তাহা হইলে প্রাচীন ভারতের কালগ্রস্ত চারু শিল্পের অবশিষ্ট অংশে প্রাচীন গ্রীসের জিয়সের দৈবগাম্ভীর্য্য ও মাধ্যকালীয় ইতালীর মাদোনা মাধুরীর অপেক্ষা অধিকতর 'গম্ভীর মধুরে'র সমাবেশ দেখিতাম।

ব্রাহ্মণ-শাসিত বর্ণাশ্রমের প্রকৃতিপুঞ্জ কেবল মাত্র বংশানুক্রমী "বিষম বিদ্যায়" শিক্ষিত হওয়াতে তাহাদের কার্য্যাবলীতে উন্নত শিক্ষার উন্নত-ভাব কিছুমাত্র বিকশিত নাই। তাহাদের চারুকার্য্যে সুশিক্ষিত হস্তের পরিচয় সর্ব্বত্রই বিদ্যমান, কিন্তু মার্জ্জিত মস্তিষ্কের লক্ষণের সর্ব্বত্রই অভাব। তাহাদের স্থপতি কার্য্য প্রভৃতিতে যাহা কিছু মার্জ্জিত চিন্তার লক্ষণ লক্ষিত হয়, তাহার অধিকাংশই হিন্দুসমাজের বৌদ্ধ-কালের সঙ্কীর্ণপথত্যাগী চিন্তা বিস্তৃতির ফল।

বৈদেশিক সংস্পর্শে ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজ লুপ্ত প্রায়; ব্রাহ্মণ অপর বর্ণের শঙ্কায় স্ববর্ণ ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া নানাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে; কিন্তু তাহার সমাজ শাসনে তাহার সম্বন্ধ অনেকটা ঠিক রহিয়াছে! এখনও হিন্দুগণ ব্রাহ্মণ-প্রবর্ত্তিত আহার

অনুসারে আপনাদের শাস্ত্রোক্ত সংস্কার সম্পন্ন করিয়া সমাজ রক্ষা করিতেছে। যেদিন ব্রাহ্মণের প্রাধান্য লোপ হইবে সেই দিন হিন্দু-ধর্ম্মের লোপ হইবে। সমাজে ব্রাহ্মণেতর বর্ণের মধ্যে কত বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে; কিন্তু ব্রাহ্মণ নাম, বর্ণাশ্রমকে বহির্ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতেছে। এক্ষণে সমাজ অন্তঃসার শূন্য, সামাজিক কার্য্য উদ্দেশ্য শূন্য।

সমাজ, শাসক ও শাসিতের সঙ্গতি; সমাজ, নিয়ন্তা ও নিয়ন্ত্রিতের সমবায়। উৎসবে, ব্যসনে, রোগে, শোকে, বিপদে, সম্পদে—সমাজের সকল কার্য্যে;—কখন দান রূপে কখন দক্ষিণারূপে, কখন স্থাবর মূর্ত্তিতে, কখন অস্থাবর মূর্ত্তিতে, নানা আকারে সমাজ আপনার দেয় দিয়া, সমাজ শাসক ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্য রক্ষা করিতেছে।

স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ, এই শিক্ষা, কি গীতার ভগবৎ উক্তি কি ধর্ম্মব্যাধ কাহিনী প্রভৃতি পৌরাণিক খ্যাতি কি শূদ্রনিধন রূপ নাটকীয় বিবৃতি সকল বিষয়েরই উদ্দেশ্য, সকল বিষয়েরই আচেষ্টিত মত! এই শিক্ষার দ্বারা সমাজের সকল বিভাগকে নিয়ন্ত্রিত রাখিয়া ব্রাহ্মণমণ্ডলী সমাজ চালাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন! তাহাতেই তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত সমাজ চলিয়াছিল। ইহা ভিন্ন পাশ্চাত্য সভ্যতা, যে সকল উদ্ভাবনা দ্বারা বর্ত্তমান কালে আপনাকে বহুমানগর্ব্বিতা মনে করে সেই সকল উদ্ভাবনা অতি প্রাচীন কালে উদ্ভাবিত হইয়া বর্ণাশ্রম সমাজকে রক্ষা করিতেছিল! উৎসব, মারীভয়, দুর্ভিক্ষ ও রাষ্ট্রবিপ্লব এই চারি বিষয় সমাজ নিয়ন্তার ভাবিবার বিষয়; সমাজ থাকিলেই তাহার উৎসব চাই; যেমন পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি অপগম করিবার পক্ষে বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদ বিশেষ প্রয়োজনীয়, সামাজিক ক্লান্তি দূর করিবার জন্য উৎসব তেমনি প্রয়োজনীয়। ইহাতে সামাজিকগণের পরস্পরের মধ্যে সহৃদয়তায় বৃদ্ধি পায়। কখন জাতীয় পর্ব্বাহে কখন ব্যক্তিবিশেষের সমাজ-অনুজ্ঞাত সংস্কারকালের যজ্ঞে ইহার বিকাশ। এই সকল পর্ব্বাহ, এই সকল যজ্ঞ সমাজভেদে ও সমাজের রুচিভেদে, সকল দেশে ও সকল কালে আচরিত হইয়া থাকে।

এই সকল যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান বিষয়ে, হিন্দু সমাজে সাধারণের যে স্বতঃ প্রবৃত্ত সাহায্যের ব্যবস্থা, যে বারোয়ারীর বন্দোবস্ত আছে, সে বিষয়ে মনোনিবেশ পূর্ব্বক অনুধাবন করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। পাশ্চাত্য জগতের "পরিণাম ভাণ্ডার" (Provident Fund) ও ইহার কাছে হার মানিয়া যায়! বর্ণাশ্রমশিশুর জন্ম হইতে তাহার সংস্কারময় জীবনের শাস্ত্রানুজ্ঞাত সংস্কার মালা আচরিত হইতে চলিল। আত্মীয় স্বজন সকলেই আপনাদের সাধ্যমত অবশ্য-দেয় আর্থিক ও যজ্ঞোপযোগী মিষ্টান্নাদির সাহায্য লইয়া আনন্দ উৎসবে যোগ দিলেন! ইহা হইতে "সামাজিকতা" বা "লৌকিকতার" সৃষ্টি। পূর্ব্বে এই সামাজিকতার বিশিষ্ট অর্থ ছিল। যতদিন বর্ণাশ্রম জাতিগণের মধ্যে জাতি অনুসারে ব্যবসা নির্দ্দিষ্ট ছিল, ততদিন প্রায় এক বর্ণ-জাতির লোক সকলের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থায় একরূপ সাম্য-ভাব ছিল। সুতরাং যে কোন ব্যক্তির

আত্মীয় স্বজনের মত "লৌকতা" তাহার বস্ত্রাদিতে ব্যবহারোপযোগী হইত। এখনও দূর পল্লীগ্রামে, কোন কর্ম্ম উপলক্ষে কোন গৃহস্থের খাটীতে যজ্ঞ হইলে গ্রামস্থ এক ব্যক্তির পুষ্করিণীর মাছ অপর ব্যক্তির খাগানের পাতা তৃতীয় ব্যক্তির গাছের ফল কর্ম্মকর্ত্তার প্রকৃত উপকারে আইসে; কিন্তু সাধারণতঃ এখন আর এই লৌকিকতার কোন অর্থ নাই। এখন এক বর্ণ-জাতির তো কথাই নাই, এক পরিবারের মধ্যে ব্যক্তিগণের উপজীবিকা ভেদে এত অবস্থার ভেদ দাঁড়াইয়াছে যে এক ভ্রাতার বহু আয়াস-দত্ত সামগ্রী অপর ভ্রাতার পক্ষে "লোষ্ট্রবৎ" হইয়া থাকে, সে দ্রব্যাদি কর্ম্মকর্ত্তা ধনী ভ্রাতার কোন কাজে লাগে না।

সমাজ রক্ষা করিতে গেলে সমাজের বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে যাত্রাদির "পেলা" দেওয়ার সৃষ্টি। কর্ম্মকর্ত্তার অবস্থা অনুসারে সামান্য টাকায় যাত্রাওয়ালা ও কীর্ত্তনওয়ালার সহিত চুক্তি হইত, তাহার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব সকলে আসিয়া যাত্রার রসাস্বাদন করিয়া,—কীর্ত্তনের হরিগুণগান শুনিয়া গায়কের পুরস্কার স্বরূপে আপনার আপনার সাধ্যমত পেলা দিয়া পরিতুষ্ট করিত। ইহা ছাড়া এইরূপে পাঁচ জনের অর্থে, রামায়ণ গান, মহাভারতের গান, চণ্ডীর গান ও পুরাণের কথকতা প্রভৃতি বিশুদ্ধ আমোদ ও ধর্ম্মচর্চ্চার ব্যবস্থা ছিল। কেবল ইহাতেই সমাজের পরিতৃপ্তি হইত না! প্রকাশ্য বারোয়ারীতে সাধারণের চাঁদায় আমোদ আহ্লাদের বন্দোবস্ত ছিল। "দশের লড়ী একের বোঝা।"

এই নীতির উপরে নির্ভর করিয়া পূর্ব্বেকার বাঙালী সমাজে কর্ম্মকাণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। কোন ভদ্র লোক তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ প্রতিষ্ঠিত শ্যামসুরের সেবার কথায় বলিয়াছিলেন —তিলকরাম ঠাকুর মহাশয়ের সময় শ্যামসুন্দর ছিলেন 'বিগ্রহ', তাঁহার পৌত্রাদির সময়ে শ্যামসুন্দরের সেবা করা হইয়াছিল 'নিগ্রহ', এখন আমাদের আমলে উনি হইয়াছেন গলগ্রহ।"

এখন সামাজিক আচার, সামাজিকগণের অবস্থা ভেদে হইয়া উঠিয়াছে গলগ্রহ, অনেকে এই সামাজিক আচার যে গলগ্রহ তাহা বুঝিতে পারিয়াছে তাই তাহা উঠিয়া যাইতেছে। আন্তরিকতাহীন সমাজে সহৃদয়তা শূন্য ব্যয়সাপেক্ষ সামাজিকতা বিড়ম্বনা। আত্মীয়ে আত্মীয়ে অবস্থার সাম্যভাব নাই, আত্মীয়ে আত্মীয়ে সহৃদয়তা নাই, আছে কেবল বাহির-কুটুম্বিতা; এই বাহির-কুটুম্বিতার ফলে সাধারণের পক্ষে আত্মীয়তা রক্ষা করা হইয়াছে গলগ্রহ, ধনী কর্ম্মকর্ত্তার পক্ষে সাধারণ নিমন্ত্রিতের অভ্যর্থনা করা হইয়াছে নিগ্রহ। ইহা ছাড়া সমাজে আড়ম্বর-প্রিয়তা ও বিলাসিতা প্রবেশ করিয়াছে; তাহার ফলে কর্ম্মকর্ত্তা যে সকল দ্রব্যাদি লৌকিকতা পায় তাহা ক্রিয়া উপলক্ষে ব্যবহার করিতে তাহার লজ্জা বোধ হয়, অথচ তাহাই দিতে তাহার নিমন্ত্রিতগণের প্রাণান্ত হইয়া থাকে। এই সকল কারণে লৌকিকতা-রূপে সমাজে স্বতঃ প্রবৃত্ত সাহায্য প্রথা ক্রমে উঠিয়া যাইতেছে। যাহা সমাজে বিড়ম্বনা মাত্র তাহা যত শীঘ্র সমাজ হইতে তিরোহিত হয় ততই ভাল।

পাশ্চাত্য সভ্যতা বহু জনাকীর্ণ স্থান সকলকে মারিভয় হইতে রক্ষা করিবার যে যে উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে তাহার নাম "বিচ্ছিন্ন নিবাস" (Segregation)। এই "বিচ্ছিন্ন নিবাস"-প্রথা হিন্দু সমাজে বহুকাল ধরিয়া, বোধ হয় হিন্দু সমাজের সৃষ্টি হইতে, আবহমান কাল ধরিয়া প্রচলিত।এই বিচ্ছিন্ন-নিবাস প্রথা হিন্দুর কাছে নূতন নয়, একটু মনোনিবেশ করিয়া আপনার সামাজিক আচার সকল পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, আপনার ঘরেই হিন্দু তাহার সুন্দর ব্যবস্থা দেখিতে পাইবে; দেখিতে পাইবে না তাহাতে কেবল পাশ্চাত্য সভ্যতার নিষ্ঠুরতা, দেখিতে পাইবে না তাহাতে কেবল পাশ্চাত্য সভ্যতার হৃদয়-শূন্যতা, দেখিতে পাইবে না তাহাতে কেবল পাশ্চাত্য সভ্যতার নির্ম্মমতা।

বসন্তাদি সংক্রামক রোগের ব্যবস্থা লক্ষ্য কর; রজকগৃহে রোগীর ও রোগীর পরিবারস্থ সকলের বস্ত্র প্রেরণ নিষিদ্ধ; রোগীর পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের ক্ষৌরকর্ম্ম নিষিদ্ধ; এই সকল উপায়ে রোগের ব্যাপ্তি নিবারণের ব্যবস্থা। রোগীর পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া, রোগীর সেবায় নিযুক্ত রহিল। মৎস্য মাংস প্রভৃতি পদার্থ, যাহার ব্যবহারে রোগের বৃদ্ধি হয়, রোগীর আবাসবাটীতে তাহার প্রবেশ পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ; রোগীর বাসগৃহ শান্তিদাত্রী দুর্গতি-হরা ভগবৎশক্তির আরাধনা-গৃহে পরিণত হইল। ধূপ ধুনার সৌগন্ধ এবং গন্ধপুষ্পের সৌরভ, বাটীর সর্ব্বত্র পূতিগন্ধ নষ্ট করিয়া রোগীর ও রোগীর শুশ্রূষা-নিরত ব্যক্তিগণের মনের প্রফুল্লতা বৃদ্ধি করিয়া রোগ বীজ নাশ ও রোগ ব্যাপ্তির ত্রাস অপগত করিল। এই রূপে ভগবৎভক্তির সহিত নৈসর্গিক শুচি মিলিয়া, আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক বল একযোগে প্রবল হইয়া, রোগীর ও রোগীর শুশ্রূষানিরত জনের রোগ হইতে অব্যাহতি পাইবার বিশ্বাসকে অটল করিল। অদৃষ্টবাদী হিন্দু-চিকিৎসক আপনার হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত কর্ত্তব্য জ্ঞান ও ভবিতব্যতার উপর নির্ভর করিয়া নিঃসঙ্কোচে রোগীর চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষায় তাঁহার অদৃষ্টবাদ নষ্ট হয় নাই। রোগী আরোগ্য হইল। নিম্ব হরিদ্রা চূর্ণ দ্বারা তাহার দেহের রোগের বীজ নষ্ট করিয়া আরোগ্য-স্নানের পর তবে সে সাধারণে মিশিতে পাইল। এই রূপে আত্মীয়স্বজনের মধ্যে থাকিয়া, সাধারণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, আপনার জনের সেবায় যাহাতে রোগীর চিকিৎসা চলে, সেই উদ্দেশে হিন্দু শাস্ত্র মতে এইরূপ "বিচ্ছিন্ন নিবাসের" ব্যবস্থা। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য বিজ্ঞানানুমোদিত আপ্তজনবিরহিত, হৃদয়শূন্য নির্জ্জন কারাবাস বর্ণাশ্রমসমাজের "বিচ্ছিন্ন নিবাস" নয়।

হিন্দু ধর্ম্মের সকল ব্যবস্থাতেই আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক দুই ভাবের সমবায় দেখিতে পাওয়া যায়। দেহ ও আত্মা লইয়া মনুষ্য। উন্নতিকল্পে যে সমাজে আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক উভয় উন্নতির ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া না যায় সে সমাজ মনুষ্যের পক্ষে প্রকৃষ্ট সমাজ হইতে পারে না।

মৃতের সম্মানে জীবিতের আত্ম-সম্মান। এই মৃতের সম্মান মানব সমাজে নানা মূর্ত্তিতে

বিকশিত। কোথাও সমাধি-ক্ষেত্রের সমাধিস্তম্ভে, কোথাও চিত্রশালার চারু চিত্রে, কোথাও ভাস্করের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তিতে এই মৃতের সম্মান মূর্ত্তিমান রহিয়াছে! কিন্তু ইহাতেও মানবপ্রকৃতি তৃপ্ত নয়! কি সভ্য, কি অসভ্য, কি পৌত্তলিক, কি নাস্তিক, সকল সমাজই আপনার অনুশাসনে এই মৃতের অর্চ্চনার ব্যবস্থা করিয়াছে। ইহা হইতেই অশৌচ গ্রহণের সৃষ্টি,—ইহা হইতেই শ্রাদ্ধাদির কল্পনা। আধ্যাত্মিক তত্ত্বে একাগ্রতা ও আধিভৌতিকে উদাসীনতা, ইহাই হিন্দু শাস্ত্রের অপবাদ, ইহাই হিন্দু শাস্ত্রের কলঙ্ক; হিন্দু শাস্ত্র যে, অশৌচ শ্রাদ্ধ প্রভৃতি আধ্যাত্মিক বিষয়ের ব্যবস্থাতে অতি ব্যস্ত থাকিবে তাহাতে কিছুমাত্র আশ্চর্য্য হইবার কথা নাই।

হিন্দু পরিবার একান্নবর্ত্তী; একান্নবর্ত্তিতা একোপজীবিকার অনুকূল। বর্ণাশ্রমের ব্যবস্থামতে এক পরিবার কেন, এক বর্ণ জাতি, এক উপজীবী। দশজন মিলিয়া এক কার্য্য করিলে দশজনে তাহার সমান ফলভাগী। দশের পরিশ্রমের উপলব্ধ ধন দশে ভোগ করিবে, ইহাতে কোন বিবাদ বিসম্বাদ বা মনোবাদের আশঙ্কা নাই, এই জন্যই হিন্দু সমাজে একান্নবর্ত্তিতা অবাধে আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছিল। বর্ত্তমানে জামগ্রামে বাণিজ্যোপজীবি নন্দীগোষ্ঠী বহু পুরুষপরম্পরা একান্নবর্ত্তী। ঐরূপ, পূর্ব্বে, দেশে সর্ব্বত্র সকল পরিবারের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যাইত। এক্ষণে পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে ব্যক্তিগত পার্থক্য অত্যন্ত অধিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন হয়ত এক ভাই আপনার বিদ্যার ও প্রতিভার বলে বিচারালয়ে বিচারপতির পদে প্রতিষ্ঠিত, আর এক ভাই হয়তো সামান্য বেতনভোগী কেরাণী, সুতরাং দুইজনের পদগত ও অর্থগত পার্থক্য অত্যন্ত অধিক হওয়াতে দুইজনের একান্নবর্ত্তিতা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে; পূর্ব্বে তাহা ছিল না, সেই জন্যই হিন্দু সমাজে একান্নবর্ত্তিতা অতি সাধারণ ব্যাপার ছিল। সাত পুরুষ এক ভিটায় বাস করিয়া এক অন্নে থাকিয়া যে দিন কাটাইয়া যাইবে ইহা লোকের পক্ষে বড় অসম্ভব ছিল না। শত পুরুষের পর মানুষ এক অন্নে না থাকুক এক ভিটায় বাস করিবে, ইহা প্রাচীন কালে অতি সম্ভবপরই ছিল। এই অবস্থার উপরই বর্ণাশ্রমের অশৌচের ব্যবস্থা।

বাটীতে মরণাপন্ন রোগী থাকিলে, রোগজনিত হউক অথবা রোগীর শুশ্রূষা করিতে গিয়া অসাবধানতা বশতই বা হউক, বাটীর বায়ু প্রভৃতি দূষিত হইয়া খাদ্যাদি দূষিত করিবার খুব সম্ভাবনা। এই উদ্দেশ্যেই বাটীতে মৃত্যু ঘটিবার অব্যবহিত পরেই পাকস্থালী প্রভৃতি সমস্ত মৃৎপাত্র ত্যাগ, তৈজস এবং গৃহাদির সংমার্জ্জনা, বস্ত্রাদি ধৌতকরণ, মৃতব্যক্তির সংস্পৃষ্ট বস্ত্রাদি বর্জ্জন এবং সর্ব্বত্র গোময় মিশ্রিত জল সিঞ্চনাদির ব্যবস্থা! এই রূপে সমস্ত বাটী পূত করা হয় (disinfected)। গ্রামের দূরে, মনুষ্যের আবাসভূমির অনেক অন্তরে শবদাহ করিয়া সংকারকগণ আপনাদের দেহ অবগাহন-স্নানে পরিষ্কার করিবে। অন্য পরিবারের যাহারা সৎকার কার্য্যে যোগ দিয়া-

ছিল, তাহারা স্নানের পূর্ব্বে ক্ষৌরকর্ম্ম দ্বারা দেহের গ্লানি দূর করিবে। পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের অশৌচান্ত পর্য্যন্ত ক্ষৌরকর্ম্ম নিষেধ, ধৌত করিবার উদ্দেশে রজককে বস্ত্রদানও নিষেধ; এই রূপে মৃতব্যক্তির সমস্ত পরিবারবর্গকে সমাজ হইতে "বিচ্ছিন্ন" থাকিয়া রোগের বীজ-বিস্তার হইতে সাবধান থাকিতে হইবে। গৃহ হইতে শব স্থানান্তর করিবার পর অন্ততঃ দিবসার্দ্ধকাল, সংকারকদিগের দেহ বহির্বায়ু দ্বারা বিশুদ্ধ করার ব্যবস্থা। ইহা হইতেই, সূর্য্য দেখিয়া সংকার করিতে যাইলে তারা দেখিয়া এবং তারা দেখিয়া প্রস্থান করিলে সূর্য্য দেখিয়া গৃহপ্রবেশের বিধি। সংকারকগণ সকলে সমবেত হইয়া, মৃতব্যক্তির বাটিতে আসিয়া অগ্নিস্পর্শ প্রভৃতির দ্বারা আপনাদের দেহ পুনর্ব্বার পূত করিয়া, শোক-সন্তপ্তদিগকে সান্ত্বনা করিয়া আপন আপন স্থানে গমন করিবে। মৃত ব্যক্তির পরিবার-বর্গ অশৌচান্ত পর্য্যন্ত সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া, রোগ-ত্রাস হইতে সমাজকে অভয় দিয়া, অশৌচান্তে পুনর্ব্বার পাকস্থালী পরিত্যাগ করিয়া, গৃহাদির সংস্কার সংমার্জ্জনার পর আবার সামাজিক কার্য্যে যোগ দিবে। *

বিভিন্ন বর্ণের পক্ষে বিভিন্ন অশৌচান্ত কালের ব্যবস্থা কেন? যে বর্ণ যত উন্নত, যে স্বভাবতঃ যত সংস্কৃত, তাহার পক্ষে অশৌচের কাল তত অল্প। সাগ্নিকের গৃহে সর্ব্বদাই হোমাগ্নি প্রজ্বলিত, হোমাগ্নি-ধূমে গৃহাদি সর্ব্বদাই সংস্কৃত, সেখান হইতে রোগবীজের বিস্তৃতির আশঙ্কা অতি কম, এই জন্যই সাগ্নিকের পক্ষে তাহার অসবর্ণের অপেক্ষা অল্প কাল অশৌচের ব্যবস্থা। হীনবর্ণ স্বভাবতঃই প্রাকৃত, তাহাদের গৃহাদি স্বভাবতঃই অসংস্কৃত, তাহার উচ্চ বর্ণের লোক অপেক্ষা সে শোকে অধিক অভিভূত হইয়া অধিক কাল গৃহ সংমার্জ্জনা প্রভৃতি কর্ত্তব্য কার্য্যে অমনোযোগী থাকিবে ইহাই সম্ভব; এই জন্য তাহাদের জন্য দীর্ঘকাল অশৌচ পালনের ব্যবস্থা। ইহা ব্যতীত শিক্ষিত ব্যক্তির আধ্যাত্মিক অবস্থা যত শীঘ্র শোকপাশ ছেদনে সক্ষম, প্রাকৃত জনের প্রকৃতি প্রায়ই তত শীঘ্র পারে না; সেই জন্য শ্রাদ্ধাদি কার্য্য উচ্চ বর্ণের লোকের দ্বারা সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়া যে সময়ে সম্ভব, হীনবর্ণের লোকের পক্ষে সেই সময়ের মধ্যে শ্রাদ্ধাদির জন্য প্রস্তুত হওয়া সম্ভব নয়।

সমাজের অবস্থা এখন আর সেরূপ নাই, এখন আর বর্ণাশ্রমের কর্ম্ম বর্ণধর্ম্ম অনুসারে অনুশাসিত নয়। কেবল ব্রাহ্মণের যাজন কর্ম্মে অনার্বর্ণ হস্তক্ষেপে সক্ষম হয় নাই; তাহাতেই ব্রাহ্মণ-প্রতিষ্ঠিত বর্ণাশ্রম সমাজ

* সবর্ণের মধ্যে যাহাদের একত্র অন্ন পাক হওয়ার সম্ভব, অর্থাৎ যাহাদের একান্নবর্ত্তী পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিশেষ সম্ভব তাহারা "সপিণ্ড।" যাহারা এক জলাশয়ের জলে সরে, যাহাদের এক বস্তুতে বাস সম্ভব, তাহারা "সমানোদক।" যাহারা এক ক্ষেত্র কর্ষণ করে, যাহাদের এক গোচারণে গবাদি চারিত হয় অর্থাৎ যাহাদের এক গ্রামে বাস সম্ভব, তাহারা "সগোত্র"। পূর্ব্বে আমাদের দেশে, এক গোষ্ঠী এক গ্রাম লইয়া, সমস্ত লোকে বাস করিত। স্যাক্সন্ আমলে ইংলণ্ডেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল।

এখনও দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু সকল ব্রাহ্মণ এখন শাস্ত্রব্যবসায়ী নয়, অনেক দ্বিজ বন্ধু ইংরাজী শিক্ষার গুণে নানা উপজীবিকা অবলম্বনে সচেষ্ট, আবার অনেক ব্রাহ্মণেতর বর্ণের লোক শিক্ষা ও দীক্ষার গুণে এই সকল দ্বিজ বন্ধুগণের অপেক্ষা আধ্যাত্মিক অবস্থায় হীন নয়, এই সকল কারণে এখন আর বর্ণভেদে অশৌচ পালনের নিয়ম-ভেদের কোন অর্থ নাই। এই জন্যই কার্য্যের কারণ দেখিতে না পাইয়া, অশৌচ পালনের নিয়মে বর্ণভেদে অনুশাসন ভেদ দেখিয়া, লোকে সমাজনিয়ন্তা ব্রাহ্মণকে পক্ষপাতিত্ব দোষে দূষিত মনে করে।

প্রাচ্যদেশ দয়া ধর্ম্মের জন্য বিখ্যাত। কি হিন্দুধর্ম্ম, কি মুসলমানধর্ম্ম, কি বৌদ্ধধর্ম্ম, সকল ধর্ম্মেই, দয়াধর্ম্ম ধর্ম্মশীলের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম এবং দান কর্ম্মীর প্রধান কর্ম্ম বলিয়া শিক্ষা দেয়। এই শিক্ষার বলে মুষ্টিভিক্ষাই ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ দীক্ষা। "আর সব ঝুটা, শাচ্চা মুঠা।" এই শিক্ষার বলে দেবারাধনার পবিত্র স্থানের পরিবর্ত্তে অতিথি নিবাসের নাম ধর্ম্মশালা। এই শিক্ষা জাতির মজ্জায় প্রবিষ্ট, ভাষার ভাব বিকাশে ব্যক্ত; এদেশে অন্নাভাবের নাম "অনশন মৃত্যু-কাল"(Starvation)নয়, এদেশে অন্নাভাবের নাম "দানের অক্ষমতার কাল"——দুর্ভিক্ষ। দান এদেশে অন্ন সংস্থানের নিরূপক, উদর-পূরণ অন্ন সংস্থানের নিরূপক নয়;—অন্ততঃ পূর্ব্বে ছিল না।

সমাজ নিয়ন্তাগণ "বর্ণভেদে ব্যবসায় ভেদ" এই অনুশাসনের বলে দেশের শিল্পের উন্নতি করিয়া দেশে ধনাগমের পথ ও দয়া-ধর্ম্মের শিক্ষা দিয়া বর্ণাশ্রম সমাজকে অন্ন কষ্ট হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করেন।

রাষ্ট্রবিপ্লব বর্ণাশ্রম সমাজের প্রকৃতির বিপরীত। যে শক্তির প্রভাবে সমাজে রাষ্ট্রবিপ্লব সম্ভবপর, বর্ণাশ্রম সমাজে সে শক্তির সম্পূর্ণ অভাব। যখন দেশের প্রজা-শক্তি একীভূত হইয়া এক কেন্দ্রস্থ হয় তখন তাহার সম্যক পরিচালনা না করিতে পারিলেই রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটান সহজ হইয়া উঠে।

রাষ্ট্রবিপ্লব ও রাজপরিবর্ত্তন এক জিনিস নহে। যখন সমগ্র রাষ্ট্রে সমগ্র প্রকৃতিপুঞ্জের মধ্যে ভাববিপ্লব ঘটিয়া রাজ-শক্তির পরিবর্ত্তন ঘটায় তখনই যথার্থ রাষ্ট্রবিপ্লব। যখন কোন ভিন্ন ক্ষাত্র-শক্তি রাজকীয় ক্ষাত্র শক্তিকে নষ্ট করিয়া তাহার স্থান অধিকার করে তাহার নাম রাজ-পরিবর্ত্তন। এই রাজ পরিবর্ত্তনের ফলে কখন কখন কতকটা নিঃশব্দে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়া থাকে। নূতন রাজশক্তি যখন বৈদেশিক, তাহার অধিরো-হণের সঙ্গে সঙ্গে দেশে নূতন চিন্তার ও নূতন বৈদেশিক ভাবের সমাগম এবং অনেক সময়ে নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়; ইহার ফলে পূর্ণ রাষ্ট্রবিপ্লব হইয়া থাকে। ভারতে মুসলমান আগমনে ও পাশ্চাত্য সমাগমে এইরূপ রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়াছে। এইরূপ পরকীয় রাষ্ট্রবিপ্লব হইতে আত্মরক্ষা, দেশের ক্ষাত্রশক্তির পরিপুষ্টি ভিন্ন অসম্ভব। জগতের ইতিহাসে, বর্ব্বর ক্ষাত্র শক্তির প্রভাবে অনেক সভ্যতম জাতির বিনাশ, ইহার দৃষ্টান্ত স্থল।

বর্ণাশ্রম সমাজে, ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থে প্রণোদিত; ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রে, ভিন্ন ভিন্ন

স্বার্থে আকৃষ্ট; ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তিতে পরিচালিত। এ সকল কেন্দ্রের আকর্ষণী সূত্র ব্রাহ্মণের হাতে। এইরূপে সমগ্র বর্ণাশ্রম সমাজ ব্রাহ্মণ-পরিচালিত। এতদ্ভিন্ন, শাস্ত্রমতে রাজা জগতে ঈশ্বরের আবির্ভাব, এক মাত্র তিনিই ধর্ম্মাবতার পদের বাচ্য। রাজশক্তি রাজন্যকুলে ন্যস্ত, এই জন্য এই কুলেই অবতার রূপে ভগবৎশক্তি অভিব্যক্ত। একমাত্র পরশুরামই এই আচারের ব্যভিচার। কিন্তু তাহার মাতুলকুল ক্ষত্রকুল; তিনি ক্ষাত্র-ব্যবসায়ী। তাহার দৃষ্টান্ত "ব্যাচারেই সাচারের প্রচার" এই ন্যায়ের প্রতিপোষণা। বর্ণাশ্রম সমাজ এই সকল নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া রাষ্ট্রবিপ্লব-শক্তি-বিহীন।

রাবণের মৃত্যুবাণ মন্দোদরীর নিকট। সদ্যজাত ক্ষুদ্র সুকুমার শিশুর জরা ও মৃত্যুর বীজ তাহার জীব-পরমাণুর সহিত চির-সংযোগে উপ্ত। হিন্দু সমাজ-নিয়ন্তা, আজন্ম-শস্ত্র-ব্যবসায়ী ক্ষত্রি শক্তির উপর কেবলমাত্র নির্ভর করিয়া, জাতির ক্ষাত্রশক্তি পরিপুষ্টির উপায়ান্তর না রাখিয়া সমাজকে অন্তরাষ্ট্রবিপ্লব শক্তি হইতে রক্ষা করিতে গিয়া, বহিশত্রুর ভারত অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের দাসত্বের পথ পরিষ্কার করিয়া দিল।

ঐতিহাসিক চূড়ামণি দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, যে দিন ভারতে নবক্ষাত্র শক্তি—রাজপুত শক্তি—বীরত্বের অপূর্ব্বকীর্ত্তি প্রদর্শন করিয়া শেষে পাঠানের ভীষণবলে, উন্নত রাজাসন হইতে ভূতলে পাতিত হইল, সে দিন আর মুহূর্ত্তকাল তাহার পৃষ্ঠপর হইয়া দাঁড়ায় জীর্ণ কণ্ঠগত-জীবন হিন্দু জাতির মধ্যে এমন আর কেহ রহিল না!

কথাটা কি ঠিক? তখন হিন্দু জাতির জাতীয় জীবন হইতে রাজপুত জাতির জাতীয় জীবন কি স্বতন্ত্র? তখন সমগ্র হিন্দু-জাতির জীবন প্রবাহ হইতে রাজপুত জাতির জীবন প্রবাহ এমনই কি বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত যে, যে সময়ে রাজপুতশক্তি জাতীয় গৌরবের পূর্ণ সীমায় স্ফীত, সেই সময়েই হিন্দু জাতীয় জীবনীশক্তি নিদাঘ-পীড়িত মৃত সরিতে পরিণত? ইহা কি নয় যে ভারতের ক্ষাত্র শক্তি মুসলমান কর্তৃক নষ্ট হইল, সেচিত-সলিল জলাশয়ের জলের ন্যায় সে স্থান পূরণ হইল না, নিঃক্ষত্রিয় দেশ বিদেশী ক্ষাত্র শক্তির নিকট চিরদিনের জন্য দাসত্ব স্বীকার করিল? যদি দেশ "বর্ণভেদে কর্ম্মভেদ" নীতির বশবর্ত্তী না হইত, যদি ক্ষাত্রশক্তি পরিপোষণী শক্তি সমগ্র জাতীয় ধমনীতে প্রবাহিত থাকিয়া সমগ্র জাতিকে পরিপুষ্ট রাখিত, তাহা হইলে সেই জাতীয় দুর্দ্দিনে চৌহানের শোণিত বিন্দু ভূতলে পতিত হইতে না হইতে লক্ষ চৌহানের উদয় হইয়া রণস্থল নব চৌহানে পরিপূর্ণ করিত। কিন্তু বিজেতার বিজয়-লক্ষ্মী পূর্ব্বেই হিন্দুর সমাজে অলক্ষিতে প্রবেশ করিয়া আপনার চামুণ্ডা জিহ্বা বিস্তার করিয়া রাখিয়াছিল। ফল ভারতের চিরপরাধীনতা।

ভারতে বৈদেশিক রাজত্বের প্রবর্ত্তন হইল। ভিন্নধর্ম্মীর আগমনে বর্ণাশ্রম সমাজে ক্ষাত্র শক্তির অপচয় ও প্রতিপক্ষ সমাজে ক্ষাত্র শক্তির উপচয় হইতেই লাগিল। পূর্ব্ব হইতেই বঙ্গের আদর্শ ক্ষাত্রশক্তির এক প্রকার নাশ হইয়াছিল। এক্ষণে কোথাও বা বিদেশীয় পীড়নের বলে, কোথাও বা

হিন্দু-মুসলমান ধর্ম্মের বৈষম্য-সাম্য-নীতির সংঘর্ষের ফলে, বঙ্গের অবজ্ঞাত উপক্ষত্রিয় সমাজ বহুল পরিমাণে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। রাজপ্রসাদ লাভের লোভও তাহাতে যোগ দিতে ছাড়িল না। এই সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্মের সাম্য শিক্ষা, বৈষ্ণবের নবতন্ত্রের দীক্ষারূপে যদি বঙ্গদেশকে রক্ষা না করিত তাহা হইলে মুসলমান প্রাবল্যে বঙ্গে হিন্দুয়ানী রক্ষা করা ভার হইত! পূর্ব্ববঙ্গের অবস্থা স্মরণ করিয়া একথা আর বুঝিতে বোধ হয় কাহারও বাকী থাকিবে না। বহিরাক্রমণে যখনই হিন্দু সমাজের আসন টলিয়াছে, তখনই তাহার সম্প্রসারিণী শক্তি ধর্ম্মের বিভিন্ন শাখার আকারে বিকাশ পাইয়া তাহাকে রক্ষা করিয়াছে; পঞ্জাবে(?) শিক্ষা ধর্ম্মে, বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম্মে, বর্ত্তমান কালে ব্রাহ্ম ধর্ম্মে তাহার পরিচয়।* এই রূপে বর্ণাশ্রম সমাজ আপনার সম্প্রসারিণী শক্তির গুণে আংশিক রক্ষা পাইল কিন্তু সংস্পর্শ দোষে তাহার অস্থি মজ্জা পর্য্যন্ত সংস্পৃষ্ট হইল।

বর্ণাশ্রম বহুকেন্দ্রী। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থ; সেই স্বার্থের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তাহাদের কর্ম্ম পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে পরিভ্রমণ করে, সেই জন্যই এই বহুকেন্দ্রী সমাজকে এক কেন্দ্রে সংযত করা এক স্বার্থে আকৃষ্ট করা, এক কক্ষে পরিচালনা করা, এত আয়াসসাধ্য, সেই জন্যই ভারতের সম্প্রদায় সমূহের তৎপরতার মধ্যে এত প্রভেদ; সূক্ষ্ম বুদ্ধি কুর্জ্জন তাহা বুঝিয়াছিলেন, এবং তাহার উপর নির্ভর করিয়া বাংলার ব্যবচ্ছেদ কালে তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন; যখন দেশে আন্দোলনের প্রথম তরঙ্গ উঠিল তখন তিনি মনে করিলেন ইহা আন্দোলন ব্যবসায়ীদের লোষ্ট্রনিক্ষেপে নিশ্চল বঙ্গে জলকুঞ্চন মাত্র, জাতীয় মর্ম্ম-স্পর্শী সংক্ষোভের ভীষণ উত্তাল নয়।

কুর্জ্জনের অপেক্ষা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি রাজপুরুষ ইংরাজ পক্ষ হইতে কেহ কখন ভারতে পদার্পণ করেন নাই, তাঁহার সমকক্ষের সংখ্যাও অতি বিরল; তিনি ভারতবাসীর প্রকৃত দৌর্ব্বল্যের কারণ বুঝিতেন, তিনি বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের পূর্ব্বে সেই দৌর্ব্বল্যের সন্ধিস্থান নিরীক্ষণ করিয়া পরীক্ষা করিয়া তাহার গ্রন্থি শিথিল রাখিতে চেষ্টা করেন। তিনি জানিতেন এই বহুকেন্দ্রী জাতিকে বিষয় বিশেষ হইতে নিশ্চেষ্ট রাখিতে গেলে উহাদের বন্ধন গ্রন্থি শিথিল রাখিতে হইবে, সেই জন্য তিনি বর্ণাশ্রম সমাজকে তাহার বর্ণ প্রাধান্য বিচারে প্রবৃত্ত হইতে উত্তেজিত করেন। কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র।

তাঁহার প্রণোদিত বর্ণপ্রাধান্য-আন্দোলন, —প্রত্নতত্বের তর্কের ন্যায়, পুরাজগতের জীব জাতিবিশেষের অস্থি খণ্ডের দ্বারা তাহার কঙ্কাল গঠনের সম্ভবপরতার বিচারের ন্যায়, —ব্যক্তি কতিপয়ের আগ্রহাতিশয় বৃদ্ধি করিয়া থাকিলেও তাহাতে সমাজের সংক্ষোভ কিছু মাত্র হয় নাই। বহু শতাব্দীর শাসনে ও সংস্পর্শে হিন্দু সমাজ অনেক বিষয়ে

* একবার কোন কলেজের এক ইংরাজ মিশনারী অধ্যাপক দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন—'I teach boys Christianity, boys turn Brahmos'.

অন্তঃসারশূন্য, সেই রূপ বর্ণভেদ এখন কেবল যৌন নির্ব্বাচনে পরিলক্ষিত। রাজদ্বারে তাহার কোন সম্মান নাই, অর্থ উপার্জ্জনে তাহার কোন প্রাধান্য নাই; এক যৌন নির্ব্বাচনেই উহা পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু সে যৌন নির্ব্বাচনেও তাহা কেবল সীমা রেখার কার্য্য করিতেছে মাত্র; বর্ণকে বর্ণান্তর হইতে পৃথক রাখিয়াছে মাত্র। বিশেষতঃ যে সামাজিক আচারে বিদেশী রাজার হস্তক্ষেপের কোন অধিকার নাই, যে সামাজিকতায়-রাজদ্বারে কোন আদর নাই, লোকে, সে বিষয়ের বিচার কর্ত্তা বিদেশী রাজাকে মানিবে কেন? বল্লাল সেন কোন্ কালে মরিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার প্রবর্ত্তিত কৌলিন্য প্রথা আজিও বঙ্গীয় হিন্দু সমাজকে ব্যতিব্যস্ত রাখিয়াছে; বল্লালের সময়ে কৌলীন্য স্বীকারে লোকের স্বার্থ ছিল, সেই স্বার্থের স্রোত সামাজিক আচারের আকার ধরিয়া এখনও কৌলীন্যকে জীবিত রাখিয়াছে। বিদেশী রাজপুরুষ-প্রণোদিত জাতি বিচারে হিন্দু সমাজের কোন স্বার্থ নাই সুতরাং তাহা নিরর্থক হইল। যে বিষয়, প্রকৃতভাবে হোক বা অপ্রকৃত ভাবেই হোক, দেশের লোককে স্বার্থ বুঝাইতে পারিয়াছে তাহাই সফল হইয়াছে।

নদীর একধার ভাঙে অপর ধার গড়ে। এইরূপে নূতন খাতের সৃষ্টি হয়; নদী নূতন খাতে প্রবাহিত হয়। বৈদেশিক অধিকারে বর্ণাশ্রম ভাঙিল; নিঃশব্দে অপরধারে পলি পড়িতে লাগিল, নূতন পাড় গড়িয়া উঠিল; পাড়ের মাথা দেখা দিয়াছে মাত্র, কিন্তু বর্ণাশ্রম-তটের শত মন্দির শোভিত নগর উপনগর ধূলায় বিলুণ্ঠিত। বিদেশী রাজা বর্ণাশ্রমের 'বর্ণভেদে কর্ম্মভেদ' নীতি মানিল না। যাহাকে যোগ্য মনে করিল, যাহাকে মনের মতন মানুষ পাইল বিদেশী রাজপুরুষ তাহাকেই রাজ সংসারে কর্ম্ম দিল; বিদেশী রাজার নিকট হিন্দু কর্ম্ম প্রার্থীগণের জাতির খাতির খাটিল না। প্রথম প্রথম উচ্চবর্ণের লোক আপনাদের শিক্ষার গুণে রাজ-সংসারে কর্ম্ম পাইতে লাগিল, কিন্তু সাধারণ লোকে যখন দেখিল তাহাদের রাজ সংসারে কর্ম্ম পাইবার পক্ষে তাহাদের বর্ণহীনতা আর কোন প্রতিবন্ধক নয় তখন তাহারা আপন আপন সন্তানগণকে অনুরূপ শিক্ষা দিতে লাগিল, এইরূপে ক্রমে ক্রমে সমাজের সকল বর্ণের লোক ধীরে ধীরে কর্ম্মক্ষেত্রে সমান ভাবে মিশিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে সকল শ্রেণীর লোক পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ট ভাবে মিলিতে আরম্ভ করায় তাহাদের মধ্যে উচ্চ নীচ ভাব লুপ্ত হইল; উচ্চ বর্ণের লোক, অবস্থা বিশেষে, আর নীচ বর্ণের ব্যবসায়কে আপনার উপজীবিকা রূপে অবলম্বন করিতে পক্ষান্তরে ঘৃণা বা অপমান বোধ করিল না। চিরদিনই উচ্চ পদস্থ লোক নিম্ন পদস্থের সকল বিষয়ে আদর্শ; কি অশনে, কি ভূষণে, কি আমোদে প্রমোদে, হিন্দু সমাজ ধীরে ধীরে বিদেশী সমাজের অনুকরণ আরম্ভ করিল; বিদেশী রাজা বিজিত প্রজার এইরূপ সামাজিক অবনতিতে আপনার রাজসিক উন্নতি, এবং হিন্দু সমাজের আচারভ্রষ্টতাতে আপনার অভিষ্ট সিদ্ধি মনে করিল। কিন্তু প্রতি কার্য্যেরই ভাল মন্দ দুই দিক আছে, তাই

সমাজের এই ভাঙা, গড়ার মধ্যে, ভিতরে ভিতরে এক নূতন শক্তি আসিয়া বিজিত জাতির আশ্রয় গ্রহণ করিল। তাহাদের সামাজিক পার্থক্য লোপের সহিত তাহাদের সামাজিক অনৈক্য লোপ পাইতে বসিল, তাহারা এক যোটে কার্য্য করিতে শিখিল; তাহার ফল বর্ত্তমান রাজনৈতিক আন্দোলন। বর্ত্তমানে এই শক্তি অতি ক্ষীণ হইলেও ইহার বিকাশ সম্বন্ধে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। রাজশক্তি ইহার সম্যক উপলব্ধি করিতে না পারিয়া বর্ত্তমান সঙ্কটে পড়িয়াছে। দুর্জ্জন বহুকেন্দ্রী বর্ণাশ্রম সমাজের মৌলিক দৌর্ব্বল্যের উপর নির্ভর করিয়াও তাহার নূতন বলের উপচয় বুঝিতে না পারিয়া বিভ্রাট ঘটাইয়াছেন।

কালে, যদি হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান প্রভৃতি সকলে আপনাপন ধর্ম্ম পার্থক্য ভুলিয়া এক রাজনৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ হয় তাহা হইলে এই অধঃপতিত জাতির পুনরুন্নতি সম্ভবপর হইতে পারে।

ক্রমশ—

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র চন্দ্র।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ। *

সাহিত্যই মানব সভ্যতার জীবন, মানব সভ্যতার প্রধান নিদর্শন। সাহিত্যের ও কলাবিদ্যার পরিমাণ ও গৌরব অনুসারে পৃথিবীর অতীত ও বর্ত্তমান জাতি সমূহের সভ্যতা পরিমিত হইয়া থাকে। কালস্রোতে অনেক বিষয়েরই পরিবর্ত্তন হয়; দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা রূপান্তর ধারণ করে; রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন প্রায়ই লক্ষিত হয়। ভাষার ও সামাজিক অবস্থার, নিয়তই পরিবর্ত্তন হইতেছে। কিন্তু অতীত কালের প্রসিদ্ধ জাতিগণের সাহিত্যময়ী সভ্যতার নিদর্শনের লোপ হয় না। পুরাতন গ্রীক গিয়াছে, পারসিকগণের সহিত যুদ্ধের পর এথেন্স প্রমুখ দেশসমূহের সভ্যতার পরাকাষ্ঠা প্রাপ্তির অন্যান্য নিদর্শন কেবল ইতিহাসস্থ হইয়াছে, কিন্তু হোমার, পিণ্ডার, ইস্কিলাস, সফোক্লিস, ইউরিপিডিস, প্লেটো, এরিস্টটল্ প্রভৃতি সাহিত্যসেবিগণের কীর্ত্তি সজীব রহিয়াছে। পেরিক্লিজের নাম ইতিহাসস্থ, কিন্তু সাহিত্যসেবিগণ কেবল ইতিহাসস্থ নহেন। পুরাতন রোম গিয়াছে, অগাষ্টাস্ প্রভৃতি কীর্ত্তিমান সম্রাটগণের নাম মাত্র আছে, কিন্তু ভার্জিল, হরেস্ প্রভৃতি এখনও আমাদের সঙ্গী। ভারত-

* বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের গৃহপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ।

বর্ষের সরস্বতী ও দৃষদ্বতীর আর অস্তিত্ব নাই; বৈদিক সময়ের আর্য্যভূমির প্রাকৃতিক অবস্থা হইতে এখনকার প্রাকৃতিক অবস্থা বিলক্ষণ বিভিন্ন। সময়ের কুঠারাঘাতে, বিজয়ী সৈন্য ও বিদেশী রাজগণের অস্ত্রাঘাতে, আর্য্য সন্তানদিগের মধ্যেও এই বিভিন্নতা দেদীপ্যমান। এমন কি ধর্ম্মেরও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আমরা সেই পুরাতন আর্য্যদিগের সন্তান তাহাই সহজে বোধগম্য হয় না; কিন্তু সে সভ্যতার লোপ হইলেও, বেদ, উপনিষৎ, মন্বাদি স্মৃতি, মহাকবি কালিদাস প্রভৃতির কাব্য পূর্ব্ব সভ্যতার অনশ্বর চিহ্ন স্বরূপ দেদীপ্যমান রহিয়াছে। সবই লোপ পাইয়াছে, কিন্তু সাহিত্যের লোপ হয় নাই। পঞ্চদশ খৃষ্টশতাব্দীর বিজয়নগরের হিন্দুরাজ্য চারি শত বৎসর হইল বিলুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু তখনকার গ্রন্থাবলি এখনও আমাদের করতলগত। তবে অনেক কাব্যেরই লোপ হইয়াছে, সম্ভবতঃ অনেক ভাল ভাল গ্রন্থ কালস্রোতে নিমগ্ন হইয়াছে। ইংলণ্ডের অনেক প্রসিদ্ধ লেখক বলিয়াছেন যে কালস্রোতে অনেক গৌরবান্বিত গ্রন্থ গুরুত্ব-নিবন্ধন ডুবিয়া গিয়াছে; তাহারা ভাসিয়া আইসে নাই,—অকর্ম্মণ্য গুরুত্বহীন গ্রন্থ অনেক কাল ভাসিয়া আসিয়া পড়িতেছে, তাই আমরা এখনও তাহাদিগকে পাইতেছি। উপমাটী সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও কথাটী অনেকাংশে সত্য। আমরা যে অনেক গ্রন্থ পাই নাই তাহা ঠিক, অন্ততঃ বাংলা দেশেরই অনেক পুরাতন গ্রন্থ কালস্রোতে আমাদের নিকট ভাসিয়া আইসে নাই। গ্রন্থকারের জীবদ্দশায় অনেক গ্রন্থেরই প্রতিষ্ঠালাভ ঘটিয়া উঠে না। এমন কি শ্রীকণ্ঠপদলাঞ্ছন মহাকবি ভবভূতিকেও মালতী-মাধবে বলিতে হইয়াছে—

> যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং,
> জানন্তি তে কিমপি তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ।
> উৎপৎস্যতে মম তু কোপি সমানধর্ম্মা,
> কালো হ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী॥

আমাদের দেশের অনেক কবির, এমন কি অনেক ভাল ভাল কবির গ্রন্থ লুপ্তপ্রায় হইয়া থাকিবে। অনেক গ্রন্থই যে আমরা পাই নাই, অনেকই যে শ্রীরামপুর বা বটতলার প্রকাশকদিগের হাতে আসে নাই, অনেকই যে গুপ্তভাবে রহিয়াছে, তাহার বিশিষ্ট নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। সাহিত্য-পরিষদের একটী প্রধান উদ্দেশ্য, সেই সকল গ্রন্থের আবিষ্কার ও প্রকাশ। পরিষৎ এই বিষয়ে কতকটী কৃতকার্য্য হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে অনেক কার্য্যের আশাও আছে।

যে সকল গ্রন্থ পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে, ভিন্ন ভিন্ন পুরাতন পুঁথি দেখিয়া তাহার পাঠ সংশোধন করা পরিষদের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। তজ্জন্য অনেক অর্থ ব্যয় হইয়াছে। অনেক সংশোধিত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

পরিষৎ কেবল পুরাতন সাহিত্য লইয়া ব্যস্ত নহে; অধুনাতন সাহিত্যসেবিগণের যথোচিত মর্য্যাদা রক্ষা করা, তাহাদিগের সাহিত্যসেবাকার্য্যে সাধ্যমত সহৃদয়তা প্রকাশ করা, ইহার একটী প্রধান উদ্দেশ্য। যাহাতে কাব্য ও বিজ্ঞানের আলোচনা বৃদ্ধি হয় এবং গ্রন্থসংখ্যা ক্রমশঃ অধিক হয়, যাহাতে সংলেখকের সংখ্যা অধিক হয়

তজ্জন্ত পরিষৎ বিশেষ যত্ন করিতেছে। প্রতি মাসের অধিবেশনে প্রত্নতত্ব, পুরাতন কাব্য, নূতন সাহিত্য বিষয়ের আলোচনা হইতেছে। কেবল সাহিত্যসেবী কেন, যাঁহারা সাহিত্যসেবায় সহায়তা করেন, যাঁহারা সাহিত্যসেবিগণকে উৎসাহিত করেন, তাঁহাদিগের যথোচিত সম্মাননাও পরিষদের উদ্দেশ্য। পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষে যিনি বঙ্গীয় সাহিত্যের পুষ্টির জন্য যত্নবান তিনিই সাহিত্যপরিষদের সমাদরের পাত্র। তাঁহারা অনেকেই পরিষদের সভ্য। স্বর্গীয় কবি বা বৈজ্ঞানিকগণও অনেকেই মর্ম্মর বা চিত্রপটে নিবেশিত হইয়া বঙ্গীয় সাহিত্যের পুষ্টিসাধনে সহায়তা করিতেছেন। তাঁহাদিগের মূর্ত্তিই অনুকরণেচ্ছা উদ্রেকের মূল হইতে পারে। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, ভূদেব, বঙ্কিমচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র, অক্ষয়কুমার প্রভৃতি সাহিত্য-বীরগণ স্বর্গস্থ হইয়াও এই মন্দিরে জীবন্তস্বরূপ বিরাজমান হইয়া বঙ্গীয় সাহিত্যের উন্নতিতে সহায়তা করিতেছেন।

"Lives of great men all remind us
We can make our lives sublime ;
And, departing leave behind us,
Foot-prints on the sands of time".

যাঁহারা সাহিত্যসেবিগণকে সাহায্য করিয়া বঙ্গদেশকে ঋণী করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন তাঁহাদিগের স্মৃতি-রক্ষার্থও সাধ্যমত আয়োজন হইয়াছে ও হইতেছে। ভারতবর্ষে Westminister Abbey'র ন্যায় গৃহ নাই, কবির স্থান (Poets' Corner) নাই। সাহিত্য-পরিষৎ ক্ষুদ্রভাবে সেই অভাব দূরীকরণার্থ চেষ্টা করিতেছে।

বৈজ্ঞানিক পরিভাষাও পরিষদের দৃষ্টির অন্তর্গত। বৈজ্ঞানিক শব্দ স্থিরীকরণ করা বঙ্গের বর্ত্তমান অবস্থায় বিশেষ আবশ্যক। সমগ্র ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক শব্দের একত্ব যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তদ্বিষয়ে মতভেদ হইতে পারে না। বাংলা দেশের Central Text-Book Committee, বৈজ্ঞানিক শব্দের একত্ব স্থাপনার্থ যত্ন করিতেছেন। কিন্তু এই গুরুতর কার্য্যের সফলতা লাভ সময়সাপেক্ষ।

বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাস এখনও বিশিষ্ট রূপে সঙ্কলিত হয় নাই। ইতিহাস ক্ষেত্র সুবিস্তীর্ণ; তাহার অনেক অংশই তমসাবৃত; কখনও যে সে সকল অংশে জ্ঞানরশ্মি প্রবেশ করিবে এরূপ আশাও নাই। পুরাকালে বঙ্গদেশ আর্য্যগণের ত্যাজ্য ছিল। ভূতত্ত্ব-বিদ্‌গণের মতে এককালে ইহা বঙ্গোপ-সাগরের লবণাম্বু দ্বারা আবৃত ছিল, কিন্তু বহু শত বর্ষ পূর্ব্বে বঙ্গের নবদ্বীপ মানব নিবাসের উপযুক্ত হইয়াছে। কতকাল পরে বঙ্গভূমি সুসভ্য আর্য্য জাতির বাসস্থান হইয়াছে তাহা বলা যায় না। দুই সহস্র বৎসরের পূর্ব্বের অবস্থাও অজ্ঞাত। দ্বাপর যুগে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গের অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া যায়, কিন্তু ঐতিহাসিক কোনও নিদর্শন নাই। পঞ্চদশ শতবর্ষ পূর্ব্বে বঙ্গভূমি বৌদ্ধ জগতের অন্তর্গত ছিল, এই মাত্র জানিতে পারা যায়। আদিশূর রাজার পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্ম এখানে প্রবল ছিল। রাজারাও বৌদ্ধ ছিলেন। পালি যেমন এক প্রকার প্রাকৃত ভাষা এবং যেমন ইহা বৌদ্ধগণ সাধারণ লোকের অববোধনার্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন, বঙ্গদেশেও

তদ্রূপ তৎকাল-প্রচলিত সাধারণের বোধগম্য ভাষা বৌদ্ধ শ্রমণ ও ভিক্ষুক দ্বারা গৃহীত হইয়া থাকিবে। হয়ত সেই ভাষাই—তৎকালের শ্রমণ ও ভিক্ষুগণের আদৃত ভাষাই—বর্ত্তমান বঙ্গ ভাষার মূল। তখনকার পুঁথি প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত হইলে আমাদের ভাষার মূলের আবিষ্কার হইতে পারে। তখনকার কতক তাম্রলিপি ও শিলালিপি পাইলেও বঙ্গ ভাষার ভিত্তির আবিষ্কার হইতে পারে। তবে খুব সম্ভব বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণ বাংলার প্রাকৃত ভাষা ব্যবহার করিতেন। তাহাতেই কবিতা ও গীতি রচিত হইত এবং সাধারণ লোক উপদিষ্ট হইত। আদিশূর বঙ্গের কতক বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্ম্ম পুনঃ স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে সংস্কৃত সাহিত্যের পুনরুত্থান হইয়া থাকিবে। বেণীসংহার নাটক সেই সময়ে রচিত হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ। অন্যান্য গ্রন্থও সংস্কৃতে রচিত হইয়াছিল। বৈদিক ধর্ম্মের পুনরুত্থানের সহিত সংস্কৃত সাহিত্যের পুনরুত্থান খুবই সম্ভবপর।

সেনরাজগণও সংস্কৃত সাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। বল্লাল সেন দানসাগর গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। লক্ষ্মণ সেনের নবরত্ন-সভা সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিয়া যশোরশ্মি বিকীর্ণ করিয়াছেন। বৌদ্ধযুগে যে বঙ্গভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল, সেন-রাজগণের রাজত্বকালে তাহা আর পরিবর্দ্ধিত হয় নাই। সেনরাজগণের সময়েই সংস্কৃত সাহিত্যের নিঃসন্দেহে পুনরুত্থান হইয়াছিল এবং সেই সময়ে অজয় নদীর কূলে মধুর কোমলকান্তিপদাবলীরচয়িতা জয়দেবকবি 'গীতগোবিন্দ' প্রণয়ন করিয়া শিক্ষিত সমস্ত ভারতবাসিকে আনন্দে আপ্লুত করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্য সেনরাজগণের অন্তর্দ্ধানের পর ধীরে ধীরে পুষ্টিলাভ করিয়াছে। মুসলমান রাজত্বের প্রারম্ভের পর তিন শত বৎসরে কত কি গ্রন্থ বাঙ্লা ভাষায় রচিত হইয়াছিল তাহা নিরাকরণ করা সহজ নহে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সেই সময়ের সাহিত্যের ইতিহাস সঙ্কলন কার্য্যে অভিনিবিষ্ট হইয়াছেন। কত দিনে কত পরিশ্রমে সফলতা লাভ হইবে বলা যায় না। কিন্তু ইহা নিশ্চয় বলা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবে পূর্ব্বেই বাংলাভাষা গঠিত হইয়াছিল; বাংলায় অনেক পদ্য ও গীতি রচিত হইয়াছিল; পয়ার ছন্দঃ বিলক্ষণ প্রচলিত হইয়াছিল।

মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কাল বঙ্গভাষার প্রকৃত পুনরুত্থানের সময়। এই সময়কেই বঙ্গ-সাহিত্যের "Renaissance Period" বলা যাইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের সময় ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী সময়ের সাহিত্যের ইতিহাস সংগ্রহ করা কঠিন নহে। বৈষ্ণব, শাক্ত ও শৈব সকল প্রকার গ্রন্থই সেই সময় হইতে রচিত হইতে থাকে।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ ও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত আর্য্যজাতির ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও মানসিক প্রবৃত্তির পুনর্বিকাশের সময়। এই যুগপৎ অভ্যুত্থানও আশ্চর্য্যের বিষয়। ইউরোপে লুথার, কেলভিন্ প্রভৃতি মহাপুরুষেরা

পোপের আধিপত্য অস্বীকার করিয়া যে সময়ে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের নববিধান করিতেছিলেন, যে সময়ে ইগনেসিয়াস লয়লা পুরাতন খৃষ্টীয় ধর্ম্মের রক্ষার নিমিত্ত ও তাহার সংস্কারের নিমিত্ত নূতন Jesuit শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, প্রায় সেই সময়েই ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ধর্ম্মবিপ্লব আরম্ভ হইয়াছিল। খ্রীষ্টিয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগেই সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক কবীরের নবধর্ম্ম খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, ও বল্লভাচার্য্য বিশেষ যত্নসহকারে বালগোপাল সেবা প্রচার করিয়া শিলাতটে সুপ্রসিদ্ধ অশ্বত্থবৃক্ষতলে আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ভারতে ধর্ম্মের পুনরুজ্জীবন ও অবশ্যম্ভাবী জাতীয় বিপ্লব উপস্থিত হইলে মেঘনির্ম্মুক্ত নভোমণ্ডলে যে জ্যোতিষ্মান নক্ষত্রপুঞ্জের উদয় হইয়াছিল, তন্মধ্যে নবদ্বীপ চন্দ্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি চৌদ্দশত সাত শকে হিমসেকশূন্য সুনির্ম্মল পৌর্ণমাসী নিশায় ভারতভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া সুকোমল সুশীতল প্রেমামৃত-রসে জগৎ আপ্লুত করিয়াছিলেন। তাঁহার হরিনামামৃতাস্বাদবিহ্বল শিষ্যসহচরগণ খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমেই কঠোর কর্ম্মকাণ্ডের পরিবর্ত্তে সুমধুর প্রেমভক্তিময় ধর্ম্মবিস্তার করিয়াই তৃপ্ত হন নাই, পরন্তু শ্রুতিমধুর, রসাত্মক কৃষ্ণলীলাময় গাথা রচনা ও সেই সুধাময় ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক চৈতন্যদেবের জীবনচরিত প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ প্রণয়ন দ্বারা বঙ্গভাষার অভিনব শক্তিসঞ্চার করেন। এই সময়েই রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণ গঙ্গেশোপাধ্যায়কৃত তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থের ব্যাখ্যাদি প্রণয়ন দ্বারা নব্যন্যায়শাস্ত্রে যুগান্তর উপস্থিত করিতেছিলেন। এই সময়েই চৈতন্যদেবের সহাধ্যায়ী স্মার্ত্তচূড়ামণি রঘুনন্দন পূর্ব্বপ্রচলিত নিবন্ধকারদিগের মত খণ্ডন করিয়া, উন্নত সমাজের উপযোগী অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব নামক নূতন ব্যবস্থাগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

এই সময়েই গুরু নানক (১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে) ইরাবতী নদীতীরে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বধর্ম্মপ্রচার করণানন্তর ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে সেই পবিত্র ক্ষেত্রেই পরলোকগত হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ এক মহাসাগরের উপকূল হইতে অপর মহাসাগরের উপকূল পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সমকালে ধর্ম্মবিপ্লব ও ভক্তিস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন সাহিত্য ও সংস্কৃত, লাটীন ও গ্রীক প্রভৃতি প্রাচীন ভাষার অনুশীলন-স্রোত প্রবর্দ্ধিত হইয়াছিল এবং ঐ অনুশীলন হইতেই আধুনিক ভাষা-সমূহের প্রচার ও প্রাদুর্ভাব হইতে লাগিল। আর্য্যজগতের এই পুনরভ্যুত্থানকালেই বিজয়নগরেও, নবদ্বীপের ন্যায়; বেদ, বেদান্ত, দর্শন ও স্মৃতিশাস্ত্রের বিশেষ অনুশীলন হইয়াছিল। প্রবল তমোময় বাত্যাবর্ত্তে কাব্যপ্রদীপসমূহ নির্ব্বাপিত হইয়াছিল, সাহিত্যজগত মহা প্রলয়ে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল; কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই পুনরায় জগতের সাহিত্য সম্পত্তি অভিনব কলেবর ধারণ করিয়া প্রলয়-পয়োধিজল হইতে পুনরুত্থিত হইতে লাগিল, স্থানে স্থানে বিজ্ঞানের ভিত্তি সংস্থাপিত হইতে লাগিল, এবং মানবপ্রকৃতির নৈস-

পিক গতি অবাধে ক্রমোন্নতির অভিমুখে প্রধাবিত হইল।

দেড়শত বৎসরের মধ্যেই ভারতবর্ষে প্রকৃত আফগান ও পাঠান সাম্রাজ্যের অবসান হইয়াছিল এবং তাহা বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। মালব, গুজরাট, জোয়ানপুর, মুলতান ও বঙ্গদেশ স্বাধীন মুসলমান রাজগণের অধীন হইয়াছিল, এবং দক্ষিণে বামিনী রাজ্য বিলক্ষণ প্রতাপান্বিত হইয়াছিল। মানবজাতির পরম শত্রু তাতার তাইমুরলঙ্গ (১৩৯৮ অব্দ) ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল মানবশোণিতে রঞ্জিত করিয়া দিল্লী নগর লুণ্ঠন করিয়া ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, দিল্লীতে যে নামমাত্র সাম্রাজ্য ছিল, তাহারও লোপ হইয়াছিল। তাহার পর মোগল সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় ও লয় পাঠান সাম্রাজ্যের ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তিমাত্র। মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংশপ্রায় হইলে পুনরায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যরূপ যে তরঙ্গনিচয় উত্থিত হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে ব্রিটিশসাম্রাজ্য মহাসাগরে মিশ্রিত হইয়া লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে। যাহা হউক, উক্ত দেড় শত বৎসর অর্থাৎ খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ ভারতবর্ষের বিষম বিপৎকাল। কিন্তু এই কালে হিন্দুর হিন্দুত্ব, হিন্দুর সাহিত্য, হিন্দুর সভ্যতা অনির্ব্বচনীয় জীবনীশক্তিপ্রভাবে মুমূর্ষাবস্থায় জীবন ধারণ করিয়াছিল; একবারে মৃত্যুদশা প্রাপ্ত হয় নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উৎপত্তিই অনেক ইতিহাস-বেত্তার মতে ভারতবর্ষের পুনরভ্যুত্থানের কারণ রাজ্যরক্ষায়; রাজ্যশাসনে, হিন্দুর সাহায্য আবশ্যক হওয়ায় জাতীয়জীবনে নূতন প্রাণবায়ু সঞ্চারিত করিয়াছিল। এই সকল ক্ষুদ্র রাজ্য হইতে বঙ্গদেশীয় অনেক জমীদারীর উৎপত্তি; অধিকাংশ রাজাই বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এবং তাঁহারা বিক্রমাদিত্য ও ভোজরাজ প্রভৃতির অনুকরণ করিয়া রত্নমণ্ডলী দ্বারা পরিবৃত থাকিতেন। কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ইংরাজ আমলেও রত্ন-পরিবৃত থাকিতেন। বর্ত্তমান জমীদারগণের মধ্যে অনেকেই বিদ্যোৎসাহী।

আর্য্যজাতির এই পুনরুত্থানযুগের স্রোত বহুদিন প্রবাহিত হইয়াছিল। বৃন্দাবন দাস, শ্রীকৃষ্ণ দাস, জয়ানন্দ ও গোবিন্দ দাস প্রমুখ বৈষ্ণব কবিগণ বাংলা ভাষায় এবং "মুরারিমুরলী ধ্বনি সদৃশ" মুরারি ও কবিকর্ণপুর প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণ এবং গদাধরাদি দার্শনিকগণ সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্যরত্নসমূহ বঙ্গে বিকীর্ণ করিয়া বঙ্গের সভ্যতাজ্যোতিঃ ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিয়াছেন। এদিকে শাক্তগণেরও সাহিত্যে মনোযোগ পড়িল। অনতিবিলম্বেই ওজস্বী স্বভাবকবি কবিকঙ্কণমুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী দামন্যার নিকটস্থ দামোদরের কূলে বসিয়া শক্তির প্রাধান্য প্রকাশ করিয়া সুললিত গীত গাহিতে লাগিলেন—"অজয় নদীর কূলে, অশোক তরুর মূলে, কামরসে কামিনী মূর্চ্ছিত।" "কীর্ত্তিবাস" কৃত্তিবাস মহাকবি বাল্মিকীকে বঙ্গাবরব দিলেন এবং কায়স্থ কাশীদাস পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণকে অষ্টাদশ পুরাণের সার সংগ্রহ, ব্যাসদেবের শেষ কীর্ত্তি মহাভারত, বঙ্গভাষায় শুনাইতে লাগিলেন।

সংস্কৃত সাহিত্যের আদরের কিছুমাত্র হ্রাস না হইয়া বঙ্গীয় সাহিত্য শনৈঃ শনৈঃ সুন্দর অবয়ব ধারণ করিতে লাগিল।

ইংরাজ শাসন-সংস্থাপনের সমকালেই আবার বঙ্গীয় সাহিত্য একটু অধিক দীপ্তি-মান্ হইল। বিপ্লবের পর শান্তি। ঘোরতর মন্বন্তরের পর পৃথিবীর সুজলা শ্যামলা মূর্ত্তি বঙ্গের কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরকে মধুর কবিতায় 'অন্নদামঙ্গল' রচনায় উত্তেজিত করিল। ভক্ত রামপ্রসাদ ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া বঙ্গবাসিগণকে ভক্তিরসে প্লাবিত করিলেন। অনতিপরেই দাসু রায়, রামবসু, হরুঠাকুর, আণ্টুনি সাহেব, চিন্তামণি প্রভৃতি কবিগণ রসাত্মক বাক্য দ্বারা বঙ্গদেশকে মোহিত করিতে লাগিলেন।

দুরন্ত সিপাহবিদ্রোহ ভারতভূমিকে আলোড়িত করিয়াছিল। বিদ্রোহশান্তির পরই মহারাণী ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া স্বয়ং ভারতশাসন-ভার গ্রহণ করিলেন। তৎকালীন শাসনকর্ত্তাদিগের সুব্যবস্থায় ভারতবর্ষে পুনঃ শান্তি সংস্থাপিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে শান্তির অপরিহার্য্য ফলস্বরূপ কবি ঈশ্বরচন্দ্র, মদনমোহন ও মধুসূদন এবং বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার প্রভৃতি গদ্য রচয়িতৃগণ বঙ্গসাহিত্যকে অসামান্য সৌষ্ঠব দান করিলেন। অনতিপরেই দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যসেবকগণ বঙ্গসাহিত্যকে ভারতবর্ষে সাহিত্যের আদর্শ করিয়া তুলিলেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সেই সাহিত্যবীরগণের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিয়া তাঁহাদের গৌরব চিরস্মরণীয় করিতে যত্নবান্ হইয়াছে।

বর্ত্তমান সাহিত্য-সেবিগণ অনেকেই পরিষদের সভ্য, অনেকেই এখানে উপস্থিত আছেন। তাঁহারা সকলে অর্থশালী না হইলেও, বঙ্গের তাঁহারা রত্নস্বরূপ।

বিদ্যা নাম রূপমধিকং প্রচ্ছন্নগুপ্তং ধনং
বিদ্যা ভোগকরী যশঃশুভকরী বিদ্যা গুরূণাং গুরুঃ।
বিদ্যা বন্ধুজনো বিদেশগমনে বিদ্যা পরং দৈবতং
বিদ্যা রাজসু পূজ্যতে ন হি ধনং বিদ্যাবিহীনঃ পশুঃ।

বাল্মীকি, ব্যাস, হোমর প্রভৃতি মহাকবিগণের আর্থিক অবস্থা যেরূপই থাকুক না কেন, তাঁহারা সহস্র সহস্র বর্ষ কত শত লোকের যশের ও অর্থের আকর হইয়াছেন। কত শত গদ্য পদ্য লেখক, কত সহস্র গায়ক, তাঁহাদিগের অভ্রভেদী অনন্তরত্ন-প্রভব গিরিগুহা হইতে রত্নচয়ন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়াছেন। কোন সম্রাটও সেরূপ লোকপ্রতিপালক হইতে পারেন না।

মধুসূদন এক বাল্মীকির সম্বন্ধেই বলিয়াছেন,

"তব পদচিহ্ন ধ্যান করি দিবা নিশি
পশিয়াছে কত যাত্রী যশের মন্দিরে,
দমনিয়া ভবদম দুরন্ত শমনে—
অমর। শ্রীভর্ত্তৃহরি, সূরি ভবভূতি
শ্রীকণ্ঠ; ভারতে খ্যাত বরপুত্র যিনি
ভারতীর কালিদাস সুমধুরভাষী;
মুরারি মুরলীধ্বনি-সদৃশ মুরারি
মনোহর, কীর্ত্তিবাস কৃত্তিবাস কবি,
এ বঙ্গের অলঙ্কার!"

মহারাজা, রাজা ও অন্যান্য ধনশালী বিদ্যোৎসাহিগণের নিকট প্রার্থনা এই যে

তাঁহারা বিক্রমাদিত্য, ভোজরাজ প্রভৃতি চিরস্মরণীয়কীর্ত্তি নৃপতিগণের অনুকরণে সাহিত্য পরিষদের পরিবর্দ্ধনার্থ যত্নবান হউন। সাহিত্য-সেবিগণের আর্থিক অবস্থা প্রায়ই ভাল নয়, কেবল তাঁহাদের উপর নির্ভর করিলে পরিষদের উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ সফলতা লাভের আশা সামান্য, তাঁহারা সান্তঃকরণে বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিবিধানে কৃতসংকল্প হইয়া বঙ্গদেশের কৃতজ্ঞতাভাজন হউন। ভারতবর্ষ এখন ভিন্ন দেশীয় সম্রাট দ্বারা শাসিত। তিনি ও তাঁহার প্রতিনিধিগণ ভারতবর্ষের উন্নতির নিমিত্ত সাধ্যমত যত্ন করিতেছেন। বিভিন্ন-জাতীয় হইলেও তাঁহারা ভারতবর্ষীয় ভাষা ও সাহিত্য সমূহের উন্নতির নিমিত্ত বিবিধ প্রকারেই চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যাইতে পারে না। এদেশের ভূস্বামিগণ পুরাকাল হইতে বিদ্যোৎসাহী ও সাহিত্যসেবিগণের পৃষ্ঠপোষক। মুসলমানদিগের রাজত্বকালে ভারতবর্ষের দুর্দ্দিনেও, তাঁহারা সংস্কৃত সাহিত্য ও দেশীয় সাহিত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদিগের গুণেই তাঁহাদিগের যত্নেই, হিন্দু ধর্ম্মের, হিন্দুকীর্ত্তির ও দেশীয় সাহিত্যের রক্ষা ও উন্নতি হইয়া আসিয়াছে। এখনও বঙ্গসাহিত্য তাঁহাদিগের মুখাপেক্ষী। সাহিত্য-পরিষদের আবাসস্থল হইয়াছে কিন্তু রক্ষিত ধনভাণ্ডার ব্যতীত ইহার স্থায়িত্ব সন্দেহজনক। বাসভূমি থাকায় অনেক উপকার হইতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চিত অর্থ না থাকিলে গৌরব রক্ষা করা সহজ হইবে না। রক্ষিত ধনভাণ্ডারের জন্য পরিষদের রাজন্যগণের উপর নির্ভর করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। অন্ততঃ পঞ্চাশ হাজার টাকা ন্যস্ত না থাকিলে পরিষদের মহৎ উদ্দেশ্যসমূহ কার্য্যে পরিণত করা দুরূহ হইবে। দেশের হিতসাধন, সাহিত্য-সেবিগণের প্রতিপালন অনেক পরিমাণে ন্যস্ত ধনভাণ্ডারের উপসত্বের উপর নির্ভর করিবে। বঙ্গবাসিমাত্রেই এ বিষয়ে সাহায্য করিতে পারেন, পরিষদের বর্ত্তমান সভ্যগণ প্রয়োজনীয় ধনসঞ্চয়ের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতে পারেন, কিন্তু বঙ্গীয়সমাজের শীর্ষস্থ ভূস্বামী ও তাদৃশ অর্থশালিগণই ইহার স্থায়িত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ।

প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ
সরস্বতী শ্রুতমহতাং মহীয়তাম্। *

---

* বঙ্গীয় ১৩০১ অব্দের ১৭ই বৈশাখে খৃষ্টীয় ১৮৯৪ অব্দের ২৯শে এপ্রেল বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রায় চৌদ্দ বৎসর পরে সেদিন ইহার গৃহ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। সে দিন সাহিত্য-পরিষদ গৃহে লক্ষ্মী সরস্বতীর বরপুত্রগণের যেরূপ সমাবেশ হইয়াছিল সে দৃশ্য বঙ্গদেশে নূতন। সে দিন সকলের মুখে যে উৎসাহ ও হর্ষের চিহ্ন দেখা গিয়াছিল তাহা বঙ্গসাহিত্যের পক্ষে বড় আশাপ্রদ। ভরসা করি, বঙ্গসাহিত্যের উন্নতির জন্য এ উৎসাহ স্থায়ী হইবে ও বাংলার এই সাহিত্য-মন্দিরে জননী বঙ্গভাষার মূর্ত্তি দিন দিন উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। বঃ সঃ

আমার ভাষা।

১

আজি গো তোমার চরণে জননি!—আনিয়া অর্ঘ করি মা দান—
ভক্তি-অশ্রু-সলিল-সিক্ত শতেক-ভক্ত দীনের গান।
মন্দির রচি মা তোমার লাগি'— পয়সা কুড়ায়ে 'পথে পথে মাগি',
তোমারে পূজিতে মিলেছি জননি, স্নেহের সরিতে করিয়া স্নান।

কোরাস্ { জননি বঙ্গভাষা, এ জীবনে চাহিনা অর্থ, চাহি না মান ;
যদি তুমি দাও তোমার ও দুটি অমল কমল চরণে স্থান।

২

জানো কি জননি, জানো কি, কত যে আমাদের এই কঠোর ব্রত!
(—হায় মা যাহারা তোমার ভক্ত, নিঃস্ব কি গো মা তারাই যত!)
তবু সে লজ্জা তবু সে দৈন্য, সহেছি মা সুখে তোমার জন্য ;
তাই দুহস্তে তুলিয়া মস্তে ধরেছি—যেন সে মহৎ মান।

কোরাস্। জননি বঙ্গভাষা—ইত্যাদি।

৩

নয়নে বহেছে নয়নের ধারা, জ্বলেছে জঠরে যখন ক্ষুধা,
মিটায়েছি সেই জঠর জ্বালায়, পাইয়া তোমার বচন সুধা ;
মরুভূমে সম যখন তৃষায় আমাদের মাগো ছাতি ফেটে যায়,
মিটায়েছি মাগো সকল পিপাসা তোমার হাসিটি করিয়া পান।

কোরাস্। জননি, বঙ্গভাষা-ইত্যাদি।

৪

পেয়েছি যা কিছু কুড়ায়ে তাহাই, তোমার কাছে মা এসেছি ছুটি ;
বাসনা—তাহাই গুছায়ে যতনে সাজাবো তোমার চরণ দুটি ;
চাহিনা ক কিছু, তুমি মা আমার, এই জানি, কিছু নাহি জানি আর ;
—তুমি গো জননি হৃদয় আমার, তুমি গো জননি আমার প্রাণ।

কোরাস্। জননি বঙ্গভাষা—ইত্যাদি।*

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

---

* গত ২১শে অগ্রহায়ণ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গৃহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে গীত।

মন্বন্তরের পরিশিষ্ট।

পুরস্কার।

But it is reported that Mr. Graham, who was a great friend of Mahomed Reza ghan, had said, that since his endeavours had failed in saving and sheltering that Minister, it was proper that Shytab Roy who was in a similar office, and upon ill-terms with Mahomed Reza ghan, (but for whose deposition and arrest there was no order from Europe) should partake of the other's disgrace. Mutagherin—vol iii.

ক্ষত্রিয় রাও সিতাবরায় শাজেহানাবাদে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি দরিদ্র ছিলেন; অল্প বেতনে আগা সলিমব্ নামক এক ব্যক্তির কর্ম্ম করিতেন। শাজেহানাবাদ পরিত্যাগ করিয়া সিতাবরায় কালক্রমে আজিমাবাদে আসিয়াছিলেন। এই আজিমাবাদই শেষে তাঁহার বিপুল কর্ম্মভূমি হইয়াছিল।

সিতাবরায়ের অসাধারণ প্রতিপত্তি ও কর্ম্ম-কুশলতা ছিল। তিনি ক্রমে ক্রমে আজিমাবাদে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইলেন—মুর্শিদাবাদেও তাঁহার প্রতিপত্তির অভাব রহিল না। মহম্মদ রেজা খাঁর মিত্র-সংখ্যা যেমন অতি অল্প ছিল, সিতাবরায়ের তেমনি অত্যন্ত অধিক ছিল। দয়া দাক্ষিণ্য দূরে থাক্ কোম্পানীর রাজস্ব বিভাগের মুসলমান কর্ত্তা যেমন নারীধর্ম্ম পর্য্যন্ত সর্ব্বদা পদদলিত করিতেন, সৌজন্য জানিতেন না; পণ্ডিতের সম্মান বুঝিতেন না—রাজস্ব-বিভাগের হিন্দু ক্ষত্রিয় কর্ত্তা তেমনি বিনয়ে, শীলে, চরিত্র গৌরবে সকলের প্রিয়পাত্র ছিলেন—কখনও কাহাকেও কটু কথা কহিতেন না। মুসলমান রেজা খাঁ উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও যেমন বাংলার অভিসম্পাত-ভাজন হইয়াছিলেন, ক্ষত্রিয় সিতাবরায় তেমনি সকলের আশীর্ব্বাদ হইতে দণ্ডেকের জন্যও বঞ্চিত হন নাই।

রাও সিতাবরায় যদিও শেষে মসিজীবী হইয়াছিলেন, কিন্তু অসি চালনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন; ইংরাজ কাপ্তান নক্স পর্য্যন্ত সিতাবরায়ের অসামান্য বীরপণা দেখিয়া অশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং এক দিন বলিয়াছিলেন—ইনিই একজন প্রকৃত নবাব, আমি এমন নবাব জীবনে কখনও দেখি নাই। ইংরাজ বাহাদুর গুণের এবং জ্ঞানের সম্মান চিরদিনই করিতে জানেন। তাঁহারা মহারাজ সিতাবরায়কে পরম শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন—সে শ্রদ্ধা মহম্মদ রেজা খাঁ পাইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। রেজা খাঁ যেমন মণি বেগম এবং বব্বু বেগমের সহিত নানাবিধ গোলযোগেই জীবন কাটাইয়া ছিলেন—রাবিয়া বেগমকে প্রতারিত করিয়া তাঁহার সমুদায় সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়াছিলেন—সিতাবরায় তেমনি সময়ে,

সন্ধিতে, রাজসভায় রাজনৈতিক আলোচনায় সময়ক্ষেপ করিয়াছিলেন; একজন লর্ড ক্লাইবের অনুগ্রহে, আর একজন আপন প্রতিভাবলে ও গুণপণায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

মহারাজা সিতাবরায়ের সে দীর্ঘ কাহিনী বর্ণনীয় হইলেও, এ স্থান তাহার উপযুক্ত নহে। বাদসাহ সাহ আলমের নিকট তাঁহার দৌত্য, তাঁহার এলাহাবাদ গমন, তাঁহার অসীম সাহস বলে ইংরাজের এলাহাবাদ দুর্গ বিজয়, অবশেষে সুজা-উদ-দ্দৌলার পরাজয়,—সরকার বাহাদুরের চুনারগড় অধিকার, অবশেষে ইংরাজ ও সুজা-উদ্-দ্দৌলার সন্ধি সংঘটন প্রভৃতি বর্ণনীয় হইলেও এ প্রবন্ধে তাহাদের স্থান নাই।

লর্ড ক্লাইব লোক চরিত্র চিনিতেন। নহিলে মোগল বিজয়ে যে দেবতা যাহাতে তুষ্ট তাঁহাকে সেইরূপে ফুল জল দিতেন না। তিনি লোক চিনিয়াছিলেন বলিয়াই এলাহাবাদ গমনকালে মহম্মদ রেজা খাঁকে না লইয়া মহারাজা সিতাব রায়কে সঙ্গে লইয়াছিলেন। মহারাজার কর্ম্মনিপুণতা দেখিয়া কোম্পানী-বাহাদুর তাঁহার উপর নিতান্ত তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে আজিমাবাদের সর্ব্বময় কর্ত্তা করিয়াছিলেন। ইহাই শেষে তাঁহার কাল হইয়াছিল।

মহম্মদ রেজা খাঁ যখন মুর্শিদাবাদে, মহারাজা সিতাবরায় তখন আজিমাবাদে উভয়েই উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত—উভয়েই উচ্চ রাজসম্মানে গৌরবান্বিত। সেই সময় বাংলায় মন্বন্তর দেখা দিয়াছিল। মহারাজা সিতাব রায় দুঃখীর দুঃখে অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। তাঁহার আজিমাবাদের উদ্যানে প্রতিদিন সহস্র সহস্র হিন্দু ও মুসলমান আহার পাইতে লাগিল। শুধু আহার নহে তাঁহার আদেশে দরিদ্রদিগের মধ্যে অর্থ বিতরিত হইতে লাগিল * এমন কি অহিফেন, সিদ্ধি, তামাক প্রভৃতিও বিতরিত হইয়াছিল।

একদিন তিনি শুনিলেন যে কাশীতে অল্প মূল্যে চাউল পাওয়া যাইতেছে। অমনি তাঁহার ভৃত্যগণ ছুটিল—তিনি নিজের লোক জন দিয়া, নিজের নৌকায় কাশী হইতে চাউল আনাইয়া তথাকার খরিদ দরে আজিমাবাদে বিক্রয় করিতে লাগিলেন। প্রতি মাসে তিনবার করিয়া চাউল আসিতে লাগিল। এদিকে মহম্মদরেজা খাঁ তখন মুর্শিদাবাদ বন্দরের তণ্ডুলপূর্ণ তরণী লুণ্ঠন করিতেছিলেন। যখন কোম্পানী বাহাদুরের তহশিলদারগণ জ্ঞানান্ধ হইয়া প্রজাদিগকে ধ্বংস করিতেছিলেন, † যখন মহম্মদরেজা খাঁ সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়া সরফরাজ হইতেছিলেন এবং সর্ব্বদা জানাইতেছিলেন যে রাজস্ব আদায়ে তাঁহার বিন্দুমাত্রও শৈথিল্য নাই ‡ বরং সেই ভীষণ দুর্ব্বৎসরেও ৭৬ সালের রাজস্বভার কড়ায় গণ্ডায় আদায়

* Mutagherin

† Letter from Mr. Harwood: 28 March, 1770 "But from motives of false policy and self interest, the collectors...have pressed so very hard upon the ryots...that their ruin has inevitably followed'.

* Letter from Mahomed Reza khan : 15 May, 1770.

করিতেছিলেন *—যখন রেজা খাঁ বেশ বুঝিতেছিলেন যে কোম্পানীর সমুদায় রাজস্ব আদায় করিয়া লইলে স্বর্গতুল্য বঙ্গভূমি জাহান্নমে যাইবে এবং প্রজাবর্গ ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে, তবুও ন্যায্য রাজস্ব ত আদায় করিতেই ছিলেন বরং তাহার উপর শতকরা দশ টাকা করিয়া অধিক আদায় করিলেন—তখন মহারাজা সিতাবরায় ইংলণ্ডেশ্বরকে লিখিয়াছিলেন :—

'মহারাজাধিরাজের রাজস্ব ১১ মাস আদায় হয় নাই, ইহা শুনিয়া আপনি বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন; আমিও এ সংবাদে একান্ত বিস্মিত হইয়াছি। দাসদিগের নিতান্ত অনিষ্টকর এই সংবাদ যে সম্পূর্ণ মিথ্যা, ইহা যে আজ আমি প্রভুর সমক্ষে নিবেদন করিবার সুযোগ পাইয়াছি তাহা নিরতিশয় সুখের কারণ। হিসাব নিকাশের সরকারি কাগজ পত্র আমি সম্প্রতি মুর্শিদাবাদ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি; সে সমুদয় অত্রসহ প্রেরিত হইল। সেই সকল কাগজপত্র পর্য্যবেক্ষণ করিলেই দেখা যাইবে যে ৫ মাসের রাজস্ব বাকি পড়িয়াছে, ১১ মাসের নহে, এবং প্রভু যে সেইজন্য আমাদিগকে কঠিন ভাষায় তিরস্কার করিয়াছেন আমরা সে তিরস্কারেরও যোগ্য নহি।

'রাজসিংহাসন যাঁহাদিগকে দাখিলা দিয়া থাকেন, তাঁহারা যদি রাজস্ব প্রদান করিতে বিলম্ব করেন তাহাতে আমাদের অপরাধ কি? তহবিলের অবস্থা বিবেচনায় আমি সর্ব্বদাই রাজসিংহাসনের প্রাপ্য যথা সময়ে দিবারই চেষ্টা করি। এ বৎসর রাজস্ব যে কিছু অধিক পরিমাণে বাকি পড়িয়াছে, সে সম্বন্ধে আমাদের অনেক কথা আছে—প্রভু সে সমুদয় অবগত আছেন।

'দীর্ঘকাল-স্থায়ী দারুণ অনাবৃষ্টিতে এ প্রদেশের অধিকাংশ স্থল উৎসন্নে গিয়াছে। কেবল যে বাৎসরিক ফসলই বিনষ্ট হইয়াছে তাহা নহে—কর্ষণীয় ক্ষেত্র গুলিও আর আবাদের যোগ্য নাই। ইহার ফলে দুর্ভিক্ষ এবং মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত। এই সকল কারণেই রাজস্বও কমিয়া গিয়াছে এবং তহবিলের অবস্থাও নিতান্ত শোচনীয় হইয়াছে; কিন্তু আমাদের ব্যয়ভার কমে নাই, পূর্ব্ব মতই আছে। খুব হিসাব করিয়া চলিয়াও আমরা আর সে ভার বহন করিতে পারিতেছি না। এমন অবস্থায় রাজসিংহাসনের প্রাপ্য পৌঁছিতে যদি কিছু বিলম্ব ঘটে তাহা হইলে, আমাদিগের অক্ষমতা বা কোন দুরভিসন্ধিই যে সেই বিলম্বের হেতু এরূপ কথা মনে করা প্রভুর পক্ষে সঙ্গত নহে; কারণ, কেবল দায়ে পড়িয়াই এই বিলম্ব ঘটিতেছে। ইহা স্থির নিশ্চয় যে প্রভুর সুবিধা ও সর্ব্ব বিষয়ে তুষ্টি সাধন জন্য আমরা সর্ব্বদাই যথাশক্তি যত্ন করিতে প্রস্তুত আছি।' †

ইংলণ্ডাধিপতির সিংহাসনতলে মহারাজা সিতাবরায়ের নিবেদনের প্রতি অক্ষরে যে

---

* do do : 2 June, 1770.

† I observe with no small astonishment that your Majesty expresses surprise at your tribute being 11 months in, arrear, and I am happy in this opportunity of undeceiving you in one affair so misrepresented and injurious to

তেজঃ, যে নির্ভীকতা ফুটিয়া রহিয়াছে—মহম্মদ রেজাখাঁর তাহা ছিল বলিয়া বোধ হয় না। উদ্ধৃত পত্রের প্রতি ছত্রে দেশের দুর্দ্দশাগ্রস্ত ক্ষুধিত পীড়িত প্রজাদিগের জন্য যে প্রশান্ত সমবেদনা কাঁদিয়া ফিরিতেছে, রেজাখাঁর হৃদয়ে কি তাহা ছিল? মহারাজা সিতাব রায় কি কোন দিনও কলিকাতার কৌন্সীলে জানাইয়াছিলেন যে দেশের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় বটে, কিন্তু ষোল আনা রাজস্ব আদায় করিতে আমার শৈথিল্য নাই! তবুও বাংলার প্রাচীন বিখ্যাত ঐতিহাসিক বলিয়াছেন—"পরবর্ত্তী গ্রন্থে দর্শিত হইবে, সে কালের অবস্থার যত দোষ, রেজাখাঁর তত অধিক নহে।" প্রবীণের কথাই সত্য হউক। *

মহম্মদ রেজা খাঁ এবং মহারাজা সিতাব রায় একই কালে এদেশের কর্ম্মভূমিতে অবতরণ করিয়াছিলেন কিন্তু এক জন দানব আর এক জন দেবতা বলিয়া ইতিহাসে খ্যাত। সেই ইতিহাসই আবার সাশ্রুনয়নে বলিতেছে যে দুষ্টবুদ্ধি ইংরাজ জন্ গ্রেহামের শঠতায় মহারাজা সিতাব রায় মহম্মদ রেজাখাঁর সহিত কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন!

জন্ গ্রেহাম মহম্মদ রেজাখাঁর বন্ধু ছিলেন। তিনি দেখিলেন রেজা খাঁকে বন্দী করিবার জন্য তাঁহারই উপর আদেশ আসিয়াছে—সে আদেশ অবহেলা করিবার শক্তি তাঁহার ছিল না। রেজাখাঁকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি নানাবিধ চেষ্টা করিলেন; সকল চেষ্টাই যখন বিফল হইয়া গেল তখন তিনি আপনার চরিত্র প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন! তিনি জানিতেন যে রেজাখাঁ সিতাব রায়ের উপর নিতান্ত বিরক্ত। রেজাখাঁ পদচ্যুত হইয়া কারারুদ্ধ থাকিয়া অপমানিত হইবেন আর তাঁহারই শত্রু সিতাবরায় তখনও আজিমাবাদের গদিতে গৌরবে সম্ভ্রমে বসিয়া থাকিবেন—ইহা কখনই হইতে পারে না! মহম্মদ রেজাখাঁও যেখানে,

your servants. Copy of the Royal Account as it has been transmitted to me from Moorshedabad I now enclose, that your Majesty may be satisfied that the arrears are due for 5 months and not 11, and we have not merited the style of asperity with which your Majesty has been pleased to censure us. If those persons to whom you grant receipts, protract their payments, we are not to blame. It has been my study to observe as much regularity in the payment of your tribute as our finance admit. This year we have many pleas to urge for the deficiencies which have happened, and to which your Majesty can not be insensible. Great part of these provinces have been desolated by long and excessive droughts, which have not only ruined each successive harvest for some time past, but also lastly rendered the ground unfit for sowing, or any other species of cultivation. The consequence has been famine and mortality distress and depopulation, by which the revenues have been diminished, and our resources generally mankind. In the mean time our expenses continue equal to former times, and with all that economy can effect are still too heavy for us to sustain. In such a situation if your Royal tribute be occasionally delayed, your Majesty must not impute it to backwardness or design, since it really is the effect of scarcity alone, and, I assure you, we are always ready to exert every effort for your august satisfaction, and convenience.—Letter to the King. 6 May 1770.

* 'বাঙ্গালার নবাবী আমল।'

মহারাজা সিতাবরায়কেও তথায় যাইতে হইবে! এই নিদারুণ বন্ধুবাসন্য মহারাজার সর্ব্বনাশ সাধন করিল।

বিলাত হইতে কেবল রেজাখাঁকে বন্দী করিবার আদেশ আসিয়াছিল—সে আদেশ-পত্রে সিতাবরায় সম্বন্ধে কোন কথাই ছিল না। গ্রেহাম সাহেব ভাবিলেন তাহার উপায় আমি করিতেছি। তিনি কলিকাতায় এক খানি পত্র লিখিলেন। কি লিখিলেন তাহা তিনিই জানিতেন। কিন্তু তাহারই ফলে মহারাজা সিতাবরায়কেও বন্দী ভাবে কলিকাতায় পাঠাইবার আদেশ হইল।*

যিনি ইংরাজের মঙ্গল কামনায়, ইংরাজের যুদ্ধে, ইংরাজের সন্ধিসংঘটনে প্রাণপাত করিয়াছিলেন, যাহার গুণে সেকালের ইংরাজ সম্প্রদায় তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন—সম্মান করিতেন—আজ সেই মহারাজা সিতাব রায় এক জন নগণ্য ইংরাজব্যাপারীর ঘৃণিত শঠতায় আপনার বজরার মধ্যে অবরুদ্ধ হইয়া বিচারের জন্য কলিকাতায় প্রেরিত হইলেন! ইহারই নাম বিধিলিপি!

লাঞ্ছিত মহারাজা শেষে কলিকাতায় আসিলেন। দুই মাস মধ্যে, বিনাবিচারেই তাঁহার কর্ম্মচ্যুতির আদেশ হইয়া গেল! কোম্পানীর ঘোষণাপত্র বজ্রগম্ভীরস্বরে ডাকিয়া কহিল—"সরকারের রাজস্ব বিভাগের দেওয়ান মহারাজা সিতাব রায় কর্ম্মচ্যুত হইয়াছেন। আজিমাবাদের ইংরাজ কৌন্সীল এখন হইতে তাঁহার স্থান গ্রহণ করিবেন। রাজস্ব বিভাগের কর্ম্মচারীগণ এখন হইতে কৌন্সীলের আদেশ অবলম্বনে কার্য্য সম্পাদন করিবেন। কিন্তু মহারাজা সিতাব রায় নিজামতির কার্য্য পরিদর্শন পদে 'পাকা' হইলেন। সে বিভাগের কর্ম্মচারীগণ এখন হইতে মহারাজার আজ্ঞায় কার্য্য করিবেন।" রেজা খাঁ কিন্তু কোম্পানী বাহাদুরের নিকট এই অনুগ্রহ পান নাই।

মহারাজা ঘৃণায় লজ্জায় অপমানে মৃতবৎ হইলেন।

তিনি ইংরাজের হস্তে এরূপ পুরস্কার আশা করেন নাই! কোম্পানী বাহাদুর আদেশ করিলেন যে রেজাখাঁ ও সিতাবরায়ের বিচার স্বতন্ত্র দিনে হইবে। যাহাতে একজনের জবাব শুনিয়া আর একজন তাঁহার সমাগত একটা কৈফিয়ৎ গড়িয়া তুলিতে না পারেন এই উদ্দেশ্যেই উক্ত প্রকার আদেশ প্রকাশ করা হইয়াছিল। তিনি সর্ব্ববিষয়ে নির্দ্দোষী ছিলেন। দীর্ঘ এক বৎসরের বিচারে ও বিবেচনায় কোম্পানী বাহাদুর স্থির করিলেন যে মহারাজা সিতাবরায় সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী। তিনি সগৌরবে মুক্তিলাভ করিলেন।

পুনরায় সরকার বাহাদুরের ঘোষণা পত্র কহিল—কোন কারণ বশতঃ (।•) মহারাজা সিতাবরায়ের সাধুতা সম্বন্ধে কলিকাতার কৌন্সীলের এবং বিলাতের প্রধান কর্ত্তা-

* Djou-gram, in consequence of such a management, wrote such letters to the Governor, that he obtained an order for recalling Shytab Roy also, and for putting him in confinement, as well as Mahomed Reza khan.

Mutagherin, vol (iii)

দিগের সন্দেহ জন্মিয়াছিল। কিন্তু দীর্ঘকালের তীক্ষ্ণ পরীক্ষায় জানা গেল যে সে সন্দেহ ভিত্তিহীন। সে অগ্নি-পরীক্ষায় কেবল মহারাজার সাধুতা, ইংরাজের প্রতি অনুরাগ এবং ইংরাজের কর্ম্মে একান্ত উৎসাহই প্রকাশ পাইয়াছে। ইংরাজের হস্তে তিনি যে কঠোর ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছেন, উহা নিতান্ত অন্যায়ই হইয়াছে! তিনি ইংরাজের যে সকল অমূল্য উপকার করিয়াছেন তাহাতে সে কঠোর ব্যবহার সর্ব্ব বিষয়ে অনুপযোগী হইয়াছে!*

ইংরাজ বাহাদুর দুঃখিত হইলেন বটে এবং মহারাজার গৌরব-বৃদ্ধি মানসে তাঁহাকে একটী খেলাত্ প্রদান করিলেন; একটী হস্তি ও কতকগুলি মণি মুক্তা উপঢৌকন দিয়া ইংরাজ তাঁহার সম্মান বৃদ্ধি করিলেন এবং পুনরায় তাঁহারই হস্তে আজিমাবাদের রাজস্ব বিভাগের কার্য্যভার অর্পণ করিতেও কুন্ঠিত হইলেন না, কিন্তু মহারাজা সিতাবরায়ের হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল; এই সকল পুরস্কার লাভ করিয়াও তিনি হৃদয়ের বিষম ক্ষত মিলাইতে পারিলেন না, অল্পকাল মধ্যেই দারুণ পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া শত্রুতাও মিত্রতা হইতে রক্ষা পাইলেন—কোম্পানীর প্রদত্ত পুরস্কার গ্রেহাম সাহেবের কীর্ত্তি-চিহ্ন স্বরূপ ধরাতলে পড়িয়া রহিল!

শ্রী :—

নীল-কণ্ঠ।

(উপন্যাস)

খাঁ বাবুদের প্রবীণ দেওয়ান নীলকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার অবগুণ্ঠনাবৃতা পরিবেশন-নিরতা, যুবতী গৃহিণী, শ্রীমতী ষোড়শী বালাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আরে,ছি', তুমি যে হাঁসালে, মন্মথের নিকট আবার লজ্জা!" ষোড়শী এই কথায় যেন আরও একটু সঙ্কুচিতা হইল, তাহার সেই মৃণাল-নিন্দিত, চম্পক-গৌর কর-ধৃত রজত-অন্নপাত্র-শোভিত পুষ্পিতা-দেহ-লতাখানি একটু কাঁপিয়া উঠিল! বেচারী তখন ত্রস্তে আত্ম সম্বরণ করিয়া অন্ন পাত্র স্বামীর সম্মুখে রাখিয়া কুন্দদন্তে অধর টিপিয়া, অবগুণ্ঠন মধ্য হইতে, তাঁহার প্রতি এক বিশাল-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল! কিন্তু বৃদ্ধ স্বামী মহাশয় তখন সম্মুখস্থিত-সুশোভিত-অন্ন-ব্যঞ্জনের প্রতি লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতে-ছিলেন, কাজেই সে বাণে তাঁহাকে আহত করিতে পারিল না! ঠিক সেই মুহূর্ত্তে মন্মথ মুখ তুলিয়া, নীলকণ্ঠকে কি বলিতে যাইতে-ছিলেন, ষোড়শীর সেই সম্মোহন-নয়ন-বিশিখ, তাঁহারই নয়নে পড়িল! ষোড়শী অপ্রতিভ হইয়া মুখ ফিরাইয়া, মন্থরগমনে চলিয়া গেল

---

* Mutagherin-Vol iii.

তপ্ত কাঞ্চন-নিভ সে সুবর্ণ, সুচারু-বস্ত্রাবরণ ভেদ করিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। পুরাকাল হইতে, ভুবনমোহিনী যোড়শী অন্নপূর্ণারা বুঝি বৃদ্ধেরই অনুগতা হইতে ভাল বাসেন!

আহারাদি শেষ হওয়ার পর নীলকণ্ঠ মন্মথকে উপলক্ষ করিয়া বলিলেন, "যাও ভায়া তোমার নূতন ঠান্ দিদির কাছ হতে পান নিয়ে এস!" মন্মথ একটু ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, বৃদ্ধ আবার কৌতুক করিয়া বলিলেন, "তোমারও লজ্জা হলো না কি? রাঙ্গা-বউয়ের কথা কি ভুলে গেলে", বলিতে বলিতে বৃদ্ধের যেন কিছু ভাবান্তর হইল, কোন্ দিনের একটা পুরাতন সুখ-স্মৃতি যেন তাঁহার হৃদয়তন্ত্রীকে সহসা আহত করিল! কিন্তু নীলকণ্ঠ নিমেষে আবার আত্মসম্বরণ করিয়া লইলেন, মন্মথকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "আমি বলচি, তা আর ভয় কেন, যাও" বলিয়া একটু হাঁসিলেন। মন্মথ তখন অগত্যা তাঁহার মন্মথ-নিন্দিত, কুমার-সুলভ-সুকুমার সৌন্দর্য্য-কিরণ বিকীর্ণ করিতে করিতে গৃহমধ্যে যথায় সম্মুখে পানের বাটা রাখিয়া অবগুণ্ঠিতা ঠান্ দিদি দাঁড়াইয়া, সেইখানে গেলেন। মন্মথ যোড়শীর সম্মুখে প্রণত হইলেন, দূর হইতে নীলকণ্ঠ পত্নীকে বলিলেন "নাতিকে আশীর্ব্বাদ করলেনা?" যোড়শী তখন হাসিমুখে পানের-ডিবাটী সরাইয়া দিল, ডিবা সরাইতে যাইয়া তাঁহার অবগুণ্ঠন একটু সরিয়া গেল! সেই সময় মন্মথ আর একবার সে রাহু-মুক্ত বদন-চন্দ্র দর্শন করিলেন, আর একবার তাঁহারে যুগল আঁখি, ছুটী সলজ্জ আঁখির সহিত মিলিল।

যোড়শীকে তখন কার্য্যান্তরে যাইতে দেখিয়া নীলকণ্ঠ গৃহিণীর প্রতি, একটী বিদ্রূপের ক্ষুদ্র-বাণ প্রয়োগ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না! বৃদ্ধ সহজে রসের সাগর, আজ আবার সে সাগরে জোয়ার বহিয়াছে। তামাসাটী এই, "বলি নাতিকে ত পান দিলে, কিন্তু পুরাতনে অযতন কেন, আমার "ছেঁচা" কই।"

"ছেঁচা বিজ্ঞান" বোধ হয় সকল পাঠক পাঠিকার জানা নাই! দন্তহীন নীলকণ্ঠ তাম্বুল চর্ব্বণে অশক্ত হইলেও তাম্বুল-রসে বঞ্চিত হইবার বাসনা রাখিতেন না! তাই তাঁহার জন্য পান সাজিয়া হামাল-দিস্তায় ছেঁচিয়া দিতে হয়। তারই নাম "ছেঁচা," তরুণী ভার্য্যা শ্রীমতী যোড়শী স্বহস্তে প্রত্যহ বৃদ্ধকে "ছেঁচিয়া দেন," আর বৃদ্ধ ছুটী বেলায় আহারান্তে নিমীলিতপ্রায় চক্ষে সুরভি-তাম্রকূটের ধূম সংযোগে এই তাম্বুল-রস গলাধঃকরণ করেন।

কিন্তু এইখানে একটু রসভঙ্গ করিতে হইতেছে, আগেকার গোটা কতক কথা এখন বলিবার প্রয়োজন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বল্লভপুরের খাঁ বাবুরা বড় জমীদার। নীলকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায় সুদীর্ঘ চত্বারিংশবর্ষ এই সংসারের কার্য্যে সংসৃষ্ট, এবং ত্রিশ বৎসর "এক কলমে" অপ্রতিহত প্রভাবে "দেওয়ানী" করিয়া আসিতেছেন, বলিতে

কি তাঁহারই বুদ্ধি কৌশলে ও যত্নে এ ষ্টেটের এত উন্নতি! রায় রামেশ্বর খাঁ বাহাদুর যে "রায় বাহাদুর" উপাধি পাইয়াছিলেন তাও কেবল দেওয়ান নীলকণ্ঠের কার্য্য প্রণালীর গুণে, প্রজার দুঃখ বিমোচনে, দুর্ভিক্ষ দমনে, সাধারণের হিত সাধনে, তিনি স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া মুক্তহস্তে ব্যয় করিতেন। এ সকল কীর্ত্তির প্রতি গবর্ণমেণ্ট উপেক্ষা প্রদর্শন করেন নাই। বিনা চেষ্টায়, বিনা যত্নে, রামেশ্বর বাবু "রায় বাহাদুর" উপাধি পাইয়াছিলেন। রায় বাহাদুর নীলকণ্ঠকে অকপট চিত্তে বিশ্বাস করিতেন, পরের উপর এতটা নির্ভর একালের কেহ বড় করে না। পিতার আমলের কর্ম্মচারী বলিয়া রায় বাহাদুর নীলকণ্ঠকে খুড়া সম্বোধন করিতেন, কেবল সম্বোধন নহে, পিতৃব্য জ্ঞানে যথোচিত সম্মানও করিতেন, তাঁহার নিজের যে খরচের প্রয়োজন হইত, তাহাও তিনি বালকের ন্যায় দেওয়ান খুড়ার নিকট চাহিতেন, ভ্রমেও কখন তাঁহার প্রতি হুকুম জারী করিতেন না। নিজে কেবল সঙ্গীত-চর্চ্চায় ও দেশ ভ্রমণে দিন কাটাইতেন।

এতটা বিশ্বাসের এতটা নির্ভরতার কারণও যথেষ্ট ছিল, নীলকণ্ঠের সততা, চরিত্রের নির্ম্মলতা, ধর্ম্মে একাগ্রতা, দেশ-প্রসিদ্ধ! পরম শত্রুতেও তাঁহার এ গুণ-গ্রামের সুখ্যাতি না করিয়া থাকিতে পারিত না।

এইরূপে নীলকণ্ঠের দিন বেশ সুখে শান্তিতে কাটিতেছিল, কিন্তু সহসা পঞ্চাশ বৎসর বয়সে তাহার সুশীলা পত্নী তাঁহাকে অকূল সংসার সমুদ্রে ভাসাইয়া, ইহধাম ত্যাগ করিয়া গেলেন, নীলকণ্ঠের গৃহ অন্ধকার হইল, বৃদ্ধ বয়সে পত্নী-বিয়োগ-যন্ত্রণা বড় অসহনীয়! বৈষ্ণব কবি প্রণয়িণীকে—

শীতের ওড়নী পিয়া গিরিষির বা
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না;

বলিয়া আদর করিয়াছেন, এ স্তুতি সকলের পক্ষে সর্ব্বথা সত্য কি না জানি না। কিন্তু বৃদ্ধের পক্ষে ইহা নিগূঢ় সত্য! বৃদ্ধ বয়সে এই "না" হারাইয়া নীলকণ্ঠ সংসার দরিয়ায় "হাবুডুবু" খাইতে লাগিলেন, "ন গৃহং গৃহমিত্যাহুঃ গৃহিণী গৃহমুচ্যতে" তবে আর এখন কিসের গৃহধর্ম্ম," অপত্যহীন নীলকণ্ঠ তখন স্থির করিলেন শাস্ত্রের বচনই মানিতে হইবে, "পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ!" ক্রমে নীলকণ্ঠের এ সংকল্প রায় বাহাদুরের কর্ণেও উঠিল! রায় বাহাদুর তখন দেওয়ান খুড়ার শূন্য-গৃহ পূর্ণ করিতে প্রয়াসী হইলেন। প্রথমতঃ খুড়া মহাশয় কিছুতেই একার্য্যে সম্মত হন নাই। "এ বয়সে আর কেন?" কিন্তু শেষে অনেক যুক্তিতর্কে, অনুরোধে, উপরোধে, খুড়া আবার নূতন দার-পরিগ্রহ করিয়া রুদ্ধ গৃহে প্রবেশ করিতে স্বীকৃত হইলেন। নীলকণ্ঠ ধনে, মানে, জনে, কুলে শীলে, কিসে কম? কেবল "কিঞ্চিৎবয়ে দোষ," কিন্তু একে পুরুষ, তায় কুলীন, সে দোষ ত ধর্ত্তব্যই নহে, নীলকণ্ঠ কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত একটা আপত্তি করিয়াছিলেন, "এ বিবাহে কোনরূপ ধুমধাম করা হইবে না। গোপনে গোপনে কোন প্রকারে এ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। "বিলক্ষণ, তাহলে খুড়ার শাশুড়ীর

মন তুলিবে কেন” বলিয়া রায় বাহাদুর সে সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন, স্বয়ং বর কর্ত্তা হইয়া রায় বাহাদুর মহা আড়ম্বরে দেওয়ান খুড়ায় বিবাহ দিয়া আনিলেন, বিবাহ-সভায় বৈবাহিকের পরিহার বস্ত্র কে লইবে প্রশ্ন উঠিলে, রায় মহাশয়—‘এই যে আমি; বরের বাবা উপস্থিত’ বলিয়া গম্ভীর-ভাবে দাঁড়াইয়া উঠিলেন—সভা মঞ্চ উচ্চহাস্যে মুখরিত হইয়া উঠিল। রায় বাহাদুর সে বৎসর পরগণায় গিয়া যত টাকা নজর পাইয়াছিলেন, সে সমস্তই এ বিবাহে ব্যয় করিলেন। এ বিবাহে বিবিধ বিধানে এতটা সমারোহ হইয়া গেল যে, নীলকণ্ঠের প্রথমটীতে এবং তাঁহার ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের তিপ্পান্নটী বিবাহতেও ইহার এক আনা রকমের ব্যয় হয় নাই।

বিবাহে এতটা খরচ পত্র করায়, নীলকণ্ঠ বড়ই অপ্রতিভ হইয়াছিলেন, তিনি এ সম্বন্ধে কত দিন রায় বাহাদুরকে কত রকমে অনুযোগ করিতেন, নিজেকেও গালি দিতে ছাড়িতেন না। একদিন নীলকণ্ঠ রায় বাহাদুরকে বলিতেছিলেন বাবাজী লোকে আজ কাল তোমাকে অমুক রাজার বাপের সহিত তুলনা দেয়!

রায় বা—কেন বাপু!

খুড়া—তা বুঝি জান না, সেই রাজা বিড়ালের বিবাহে ষাট হাজার খরচ করে ছিলেন।

রায়—তাতে তার বাপের সঙ্গে আমার তুলনা কেন?

খুড়া—শুনইত, একদিন ঐ রাজা তাঁর শ্যালিকার নিকট এই বিড়ালের বিবাহের ধূম ধামের কথা তুলিয়া—বড় বড়াই করিতে-ছিলেন, তাহাতে তাঁহার শ্যালিকা একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিয়াছিলেন, এ আবার ভারি কথা আমার দিদির শ্বশুর মহাশয় এক বাঁদরের বিয়েতেই এক লাক টাকা খরচ করেছিলেন,—রাজা প্রথমে রহস্যটা তলাইয়া বুঝেন নাই, মিছে কথা বলিয়া উড়াইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু শ্যালিকারত্নের অধরে বিদ্রূপের চাপা হাঁসি দেখিয়া, শেষে অপ্রতিভ হইয়া হাঁসিয়া উঠিয়া শ্যালিকার বুদ্ধির প্রশংসা করিলেন।

রাজার শ্যালিকার এই পরিহাসের মূল কথাটা অনেকেই জানেন না কিন্তু অমুক রাজার বাপ বাঁদরের বিয়েতে যে এক লাখ টাকা খরচ করে ছিলেন এ কথাটা একটা প্রবাদের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে! এইজন্যেই তোমার খুড়োর বিয়ের কথায় তোমাকে সেই রাজার বাপের সঙ্গে তুলনা দিচ্চে!’

রায় বাহাদুর “খুড়ো কি বলে বাপু,” বলিয়া কথাটা চাপা দিতেন।

এইরূপ প্রায়ই চলিত।

কিন্তু রায় বাহাদুরের এত টাকা বৃথায় ব্যয় হয় নাই, আর নব বধূর পিতা মাতাও কন্যার “ষোড়শী” নাম করণ বৃথায় করেন নাই, কুলীনের ঘরে “ষোড়শী” পাওয়া কঠিন নহে সত্য কিন্তু তেমন সুন্দরী “ষোড়শী” লাখে এক!

নীলকণ্ঠ তখন আবার নূতন করিয়া সংসার পাতিলেন, সে গৃহ-অরণ্য আবার উদ্যানে পরিণত হইল! বৃদ্ধ তখন পুনশ্চ যুবার উৎসাহে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, রায় বাহাদুরের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল, এখন তিনি আবার নিশ্চিন্ত মনে, দেশ ভ্রমণে ও সঙ্গীত চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিতে পারিলেন, কিন্তু বড় অধিক দিনের জন্য নহে, দেশ-ভ্রমণপ্রিয় রায় বাহাদুরের সহসা সেই মহা দেশ হইতে ডাক আসিল। মাত্র পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে তিনি মহা প্রস্থান করিলেন, অন্তিম সময়ে গঙ্গাতীরে একবিংশবর্ষীয় পুত্র মন্মথকে নীলকণ্ঠের হস্তে সমর্পণ করিয়া, রায় বাহাদুর রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বলিয়াছিলেন ‘খুড়ো আমিত চলিলাম, মন্মথ রহিল ইহাকে জীবন থাকিতে পরিত্যাগ করিও না।” নীলকণ্ঠ তখন শোকে বড় কাতর, প্রথমে সে কথার কোন উত্তর করিলেন না। কিন্তু রায় বাহাদুর বার বার পীড়াপীড়ি

করিতে লাগিলেন, শেষে সেই গঙ্গাতীরে নীলকণ্ঠ প্রতিজ্ঞা করিলেন আজীবন তিনি মন্মথকে ত্যাগ করিবেন না! তখন নিশ্চিন্ত হইয়া মন্মথকে খুড়ার সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া, রামেশ্বর এ নশ্বর দেহ ত্যাগ করিলেন।

ক্রমশঃ

নবযুগের উৎসব। *

নিজের অসম্পূর্ণতার মধ্যে সম্পূর্ণ সত্যকে আবিষ্কার করতে সময় লাগে। আমরা যে যথার্থ কি, আমরা যে কি করচি, তার পরিণাম কি, তার তাৎপর্য্য কি, সেইটি স্পষ্ট বোঝা, সহজ কথা নয়।

বালক নিজেকে ঘরের ছেলে বলেই জানে। তার ঘরের সম্বন্ধকেই সে চরম সম্বন্ধ বলে জ্ঞান করে। সে জানে না সে ঘরের চেয়ে অনেক বড়—সে জানে না, মানবজীবনে সকলের চেয়ে বড় সম্বন্ধ তার ঘরের বাইরেই।

সে মানুষ সুতরাং সে সমস্ত মানবের। সে যদি ফল হয় তবে তার বাপ মা কেবল বৃন্তমাত্র; সমস্ত মানববৃক্ষের সঙ্গে একেবারে শিকড় থেকে ডাল পর্য্যন্ত তার মজ্জাগত যোগ।

কিন্তু সে যে একান্তভাবে ঘরেরই নয়, সে যে মানুষ, একথা শিশু অনেক দিন পর্য্যন্ত একেবারেই জানে না। তবু একথা একদিন তাকে জান্‌তেই হবে যে, ঘর তাকে ঘরের মধ্যেই সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করবার জন্যে পালন করচে না—সে মানবসমাজের জন্যেই বেড়ে উঠ্‌চে।

আমরা আজ পঞ্চাশ বৎসরের উর্দ্ধকাল এই ১১ই মাঘের উৎসব করে আসচি। আমরা কি করচি, এ উৎসব কিসের উৎসব, সে কথা আমাদের বোঝবার সময় হয়েছে; আর বিলম্ব করলে চল্‌বে না।

আমরা মনে করছিলুম আমাদের এই উৎসব ব্রাহ্মসমাজের উৎসব। ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁদের সম্বৎসরের ক্লান্তি ও অবসাদকে উৎসবের আনন্দে বিসর্জ্জন দেবেন, তাঁদের ক্ষয়গ্রস্ত জীবনের ক্ষতিপূরণ করবেন, প্রতিদিনের সঞ্চিত মলিনতা ধৌত করে নেবেন; মহোৎসবক্ষেত্রে চিরনবীনতার যে অমৃত উৎস আছে তারি জল পান করবেন এবং তাতেই স্নান করে নবজীবনে সদ্যোজাত শিশুর মত প্রফুল্ল হয়ে উঠবেন।

এই লাভ এই আনন্দ ব্রাহ্মসমাজ উৎসবের থেকে গ্রহণ যদি করতে পারেন তবে ব্রাহ্ম সম্প্রদায় ধন্য হবেন কিন্তু এই টুকুতেই উৎসবের শেষ পরিচয় আমরা লাভ করতে পারিনে। আমাদের এই উৎসব ব্রাহ্মসমাজের চেয়ে অনেক বড়। এমন কি, একে যদি ভারতবর্ষের উৎসব বলি তাহলেও একে ছোট করা হবে।

আমি বলচি আমাদের এই উৎসব মানবসমাজের উৎসব। একথা যদি সম্পূর্ণ প্রত্যয়ের সঙ্গে আজ না বল্‌তে পারি তাহলে চিত্তের সঙ্কোচ দূর হবে না; তাহলে এই উৎসবের ঐশ্বর্য্যভাণ্ডার আমাদের কাছে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হবে না; আমরা ঠিক জেনে যাবনা কিসের যজ্ঞে আমরা আহূত হয়েছি।

আমাদের উৎসবকে ব্রাহ্মোৎসব বল্‌ব কিন্তু ব্রাহ্মোৎসব বলবনা এই সঙ্কল্প মনে নিয়ে আমি এসেছি; যিনি সত্যম্ তাঁর আলোকে এই উৎসবকে সমস্ত পৃথিবীতে আজ প্রসারিত করে দেখ্‌ব; আমাদের এই প্রাঙ্গণ আজ পৃথিবীর মহাপ্রাঙ্গণ; এর ক্ষুদ্রতা নেই।

একদিন ভারতবর্ষ তাঁর তপোবনে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—

* গত মাঘোৎসবের রাত্রিতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্তৃক পঠিত।

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে
দিব্যধামানি তস্থুঃ—
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং
তমসঃ পরস্তাৎ"

হে অমৃতের পুত্রগণ যারা দিব্যধামে আছ সকলে শোন—আমি জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে জেনেছি।

প্রদীপ আপনার আলোককে কেবল আপনার মধ্যে গোপন করে রাখ্‌তে পারে না। মহান্তম্ পুরুষং—মহান্ পুরুষকে মহৎ সত্যকে যাঁরা পেয়েছেন তাঁরা আর ত দরজা বন্ধ করে থাকতে পারেন না; এক মুহূর্ত্তেই তাঁরা একেবারে বিশ্বলোকের মাঝখানে এসে দাঁড়ান; নিত্যকাল তাঁদের কণ্ঠকে আশ্রয় করে আপন মহাবাণী ঘোষণা করেন; দিব্যধামকে তাঁরা তাঁহাদের চারিদিকেই প্রসারিত দেখেন; আর, যে মানুষের মুখেই দৃষ্টিপাত করেন, সে মূর্খই হোক আর পণ্ডিতই হোক্, সে রাজচক্রবর্ত্তী হোক্ আর দীন দরিদ্রই হোক্, অমৃতের পুত্র বলে তার পরিচয় প্রাপ্ত হন।

সেই যেদিন, ভারতবর্ষের তপোবনে অনন্তের বার্ত্তা এসে পৌচেছিল, সে দিন ভারতবর্ষ আপনাকে দিব্যধাম বলে জান্‌তেন, সেদিন তিনি অমৃতের পুত্রদের সভায় অমৃতমন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন; সে দিন তিনি বলেছিলেন—

"যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি,
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে"

যিনি সর্ব্বভূতকেই পরমাত্মার মধ্যে এবং পরমাত্মাকে সর্ব্বভূতের মধ্যে দেখেন তিনি কাউকেই আর ঘৃণা করেন না।

ভারতবর্ষ বলেছিলেন—"তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি"—যিনি সর্ব্বব্যাপী তাঁকে সর্ব্বত্রই প্রাপ্ত হয়ে তাঁর সঙ্গে যোগযুক্ত ধীরেরা সকলের মধ্যেই প্রবেশ করেন।

সেদিন ভারতবর্ষ নিখিল লোকের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলেন; জলস্থল আকাশকে পরিপূর্ণ দেখেছিলেন; ঊর্দ্ধপূর্ণমধ্যপূর্ণমধঃপূর্ণং দেখেছিলেন—সেদিন সমস্ত অন্ধকার তাঁর কাছে উদ্ঘাটিত হয়ে গিয়েছিল, তিনি বলেছিলেন, "বেদাহং" আমি জেনেছি, আমি পেয়েছি।

সেই দিনই ভারতবর্ষের উৎসবের দিন ছিল; কেননা সেইদিনই ভারতবর্ষ তাঁর অমৃতযজ্ঞে সর্ব্বমানবকে অমৃতের পুত্র বলে আহ্বান করেছিলেন—তাঁর ঘৃণা ছিল না, অহঙ্কার ছিল না। তিনি পরমাত্মার যোগে সকলের মধ্যেই প্রবেশ করেছিলেন। সে দিন তাঁর আমন্ত্রণধ্বনি জগতের কোথাও সঙ্কুচিত হয়নি; তাঁর ব্রহ্মমন্ত্র বিশ্বসঙ্গীতের সঙ্গে একতানে মিলিত হয়ে নিত্যকালের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল—সেই তাঁর ছিল উৎসবের দিন।

তার পরে বিধাতা জানেন কোথা হতে অপরাধ প্রবেশ করল। বিশ্বলোকের দ্বার চারিদিক হতে বন্ধ হতে লাগ্‌ল—নির্ব্বাপিত প্রদীপের মত ভারতবর্ষ আপনার মধ্যে আপনি অবরুদ্ধ হল। প্রবল স্রোতস্বিনী যখন মরে আস্‌তে থাকে তখন যেমন দেখ্‌তে দেখ্‌তে পদে পদে বালির চর জেগে উঠে তার সমুদ্রগামিনী ধারার গতিরোধ করে দেয়, তাকে বহুতর ছোট ছোট জলাশয়ে বিভক্ত করে;—যে ধারা দূরদূরান্তরের প্রাণদায়িনী ছিল, যা দেশদেশান্তর সম্পদ্ বহন করে নিয়ে যেত, যে অশ্রান্ত ধারার কলধ্বনি জগৎসঙ্গীতের তানপুরার মত পর্ব্বতশিখর থেকে মহাসমুদ্র পর্য্যন্ত নিরন্তর বাজ্‌তে থাক্‌ত—সেই বিশ্বকল্যাণী ধারাকে কেবল খণ্ড খণ্ড ভাবে এক একটা ক্ষুদ্র গ্রামের সামগ্রী করে তোলে—সেই খণ্ডতাগুলি আপন পূর্ব্বতন ঐক্যটিকে বিস্মৃত হয়ে বিশ্বনৃত্যে আর যোগ দেয় না, বিশ্বগীতসভায় আর স্থান পায় না,—সেই রকম করেই নিখিল মানবের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্বন্ধের পুণ্য ধারা সহস্র সাম্প্র-

স্বাস্থিক বালুরচরে খণ্ডিত হয়ে গতিহীন হয়ে পড়ল। তার পরে, হায়, সেই বিশ্ববাণী কোথায়? কোথায় সেই বিশ্ব প্রাণের তরঙ্গদোলা? রুদ্ধ জল যেমন কেবলি তয় পায় অল্পমাত্র অশুচিতায় পাছে তাকে কলুষিত করে, সেই জন্যে যে যেমন স্নানপানের নিষেধের দ্বারা নিজের চারিদিকে বেড়া তুলে দেয়, তেমনি আজ বদ্ধ ভারতবর্ষ কেবলি কলুষের আশঙ্কায় বাহিরের বৃহৎ সংস্রবকে সর্ব্বতোভাবে দূরে রাখ্‌বার জন্যে নিষেধের প্রাচীরে তুলে দিয়ে সূর্য্যালোক এবং বাতাসকে পর্য্যন্ত তিরস্কৃত করেছেন, কেবলি বিভাগ, কেবলি বাধা;—বিশ্বের লোক গুরুর কাছে বসে যে দীক্ষা নেবে সে দীক্ষার মন্ত্র কোথায়, সে দীক্ষার অবারিত মন্দির কোথায়—সে আহ্বানবাণী কোথায় যে বাণী একদিন চারিদিকে এই বলে ধ্বনিত হয়েছিল—

"যথাপঃ প্রবতাযন্তি যথা মাসা অহর্জরম্ এবং মাং ব্রহ্মচারিণোধাত ,আয়ন্ত সর্ব্বতঃ স্বাহাঃ"—

জল যেমন স্বভাবতই নিম্নদেশে গমন করে, মাস সকল যেমন স্বভাবতই সংবৎসরের দিকে ধাবিত হয়, তেমনি সকল দিক হতেই ব্রহ্মচারিগণ আমার নিকট "আসুন স্বাহা!" কিন্তু সেই স্বভাবের পথ যে আজ রুদ্ধ; ধর্ম্ম, জ্ঞান, সমাজ তাদের সিংহদ্বার বন্ধ করে বসে আছে—কেবল অন্তঃপুরের যাতায়াতের জন্যে খিড়কির দরজার ব্যবহার চল্‌চে মাত্র।

সত্যসম্পদের দারিদ্র্য না ঘটলে এমন দুর্গতি কখনই হয় না। যে বলতে পেরেছে "বেদাহং" আমি জেনেছি তাকে বেরিয়ে আসতেই হবে, তাকে বলতেই হবে "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।"

এই রকম দৈন্যের নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে সমস্ত দ্বার জানালা বন্ধ করে যখন ঘুমচ্ছিলুম এমন সময় একটি ভোরের পাখীর কণ্ঠ থেকে আমাদের রুদ্ধ ঘরের মধ্যে বিশ্বের নিত্যসঙ্গীতের সুর এসে পৌঁছিল—যে সুরে লোকলোকান্তর যুগযুগান্তর সুর মিলিয়েছে, যে সুরে পৃথিবীর ধুলির সঙ্গে সূর্য্য তারা একই আত্মীয়তার আনন্দে ঝঙ্কৃত হয়েছে—সেই সুর একদিন শোনা গেল।

আবার যেন কে বল্লে "বেদাহমেতং"—আমি এঁকে জেনেছি! কাকে জেনেছ? "আদিত্য বর্ণং"—জ্যোতির্ম্ময়কে জেনেছি—যাঁকে কেউ গোপন করতে পারে না। জ্যোতির্ম্ময়? কই তাঁকে ত আমার গৃহসামগ্রীর মধ্যে দেখ্‌চিনে।—না, তোমার অন্ধকার দিয়ে ঢেকে তাঁকে তোমার ঘরের মধ্যে চাপা দিয়ে রাখোনি—তাঁকে দেখছি তমসঃ পরস্তাৎ—তোমাদের সমস্ত রুদ্ধ অন্ধকারের পার হতে। তুমি যাকে তোমার সম্প্রদায়ের মধ্যে ধরে রেখেছ, পাছে আর কেউ সেখানে প্রবেশ করে বলে মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দিয়েচ, সে যে অন্ধকার—নিখিল মানব সেখান থেকে ফিরে ফিরে যায়, সূর্য্য চন্দ্র সেখানে দৃষ্টিপাত করে না—সেখানে জ্ঞানের স্থানে শাস্ত্রের বাক্য, ভক্তির স্থানে পূজাপদ্ধতি, কর্ম্মের স্থানে অভ্যস্ত আচার—সেখানে দ্বারে একজন ভয়ঙ্কর 'না' বসে আছে, সে বল্‌চে, না, না, এখানে না—দূরে যাও, দূরে যাও। সে বলচে কান বন্ধ কর পাছে মন্ত্র কানে যায়, সরে বস পাছে স্পর্শ লাগে, দরজা ঠেলোনা পাছে তোমার দৃষ্টি পড়ে। এত "না" দিয়ে তুমি যাঁকে ঢেকে রেখেছ আমি সেই অন্ধকারের কথা বলছিনে—কিন্তু বেদাহমেতং—আমি তাঁকে জেনেছি যিনি নিখিলের—যাঁকে জানলে আর কাউকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না, কাউকে ঘৃণা করা যায় না—যাঁকে জানলে, নিম্নদেশ যেমন জল সকলকে স্বভাবতই আহ্বান করে, সংবৎসর যেমন মাস সকলকে স্বভাবতই আহ্বান করে, তেমনি স্বভাবত সকলকেই অবাধে আহ্বান করবার অধিকার জন্মে—তাঁকেই জেনেছি।

ঘরের লোক ক্রুদ্ধ হয়ে ভিতর থেকে

গর্জ্জন করে উঠল—দূর কর দূর কর, এ'কে বের করে দাও এ'ত আমার ঘরের সামগ্রী নয়! এ'ত আমার নিয়মকে মান্‌বে না!

না, এ তোমারি ঘরের না, এ তোমার নিয়মের বাধ্য নয়। কিন্তু পারবে না—আকাশের আলোককে গায়ের জোর দিয়ে ঠেলে ফেল্‌তে পারবে না—তাঁর সঙ্গে বিরোধ করতে গেলেও তাকে স্বীকার করতে হবে। প্রভাত এসেছে!

প্রভাত এসেছে—আমাদের উৎসব এই কথা বল্‌চে! আমাদের এই উৎসব ঘরের উৎসব নয়, ব্রাহ্মসমাজের উৎসব নয়, মানব-চিত্তগগনে যে প্রভাতের উদয় হচ্চে এ যে সেই সুমহৎ প্রভাতের উৎসব!

বহু যুগ পূর্ব্বে এই প্রভাত-উৎসবের পবিত্র গম্ভীর মন্ত্র এই ভারতবর্ষের তপোবনে ধ্বনিত হয়েছিল, "একমেবাদ্বিতীয়ং।" অদ্বিতীয় এক! পৃথিবীর এই পূর্ব্বদিগন্তে আবার কোন্ জাগ্রত মহাপুরুষ অন্ধকার রাত্রির পরপার হতে সেই মন্ত্র বহন করে এনে স্তব্ধ আকাশের মধ্যে স্পন্দন সঞ্চার করে দিলেন! একমেবাদ্বিতীয়ং! অদ্বিতীয় এক!

এই যে প্রভাতের মন্ত্র উদয়শিখরের উপরে দাঁড়িয়ে জানিয়ে দিলে, যে, "এক সূর্য্য উদয় হচ্চেন, এবার ছোট ছোট অসংখ্য প্রদীপ নেবাও"—এই মন্ত্র কোনো একঘরের মন্ত্র নয়, এই প্রভাত কোনো একটি দেশের প্রভাত নয়—হে পশ্চিম, তুমিও শোনো, তুমি জাগ্রত হও—শৃণ্বন্তু বিশ্বে—হে বিশ্ববাসী, সকলে শোনো—পূর্ব্বগগণের প্রান্তে একটি বাণী জেগে উঠেছে—বেদাহমেতং—আমি জান্‌তে পারচি—তমসঃপরস্তাৎ—অন্ধকারের পরপার থেকে আমি জান্‌তে পারচি—নিশাবসানের আকাশ উদয়োন্মুখ আদিত্যের আসন্ন আবির্ভাবকে যেমন করে জান্‌তে পারে তেমনি করে।

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃপরস্তাৎ!"

এই নূতন যুগে পৃথিবীর মানবচিত্তে যে প্রভাত আস্‌চে সেই নব প্রভাতের বার্ত্তা বাংলাদেশে আজ আশি বৎসর হল প্রথম এসে উপস্থিত হয়েছিল। তখন পৃথিবীতে দেশের সঙ্গে দেশের বিরোধ, ধর্ম্মের সঙ্গে ধর্ম্মের সংগ্রাম; তখন শাস্ত্রবাক্য এবং বাহ্য প্রথার লৌহ সিংহাসনে বিভাগই ছিল রাজা—সেই ভেদবুদ্ধির প্রাচীর-রুদ্ধ অন্ধকারের মধ্যে রাজা রামমোহন যখন অদ্বিতীয় একের আলোক তুলে ধরলেন তখন তিনি দেখ্‌তে পেলেন যে, যে ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টানধর্ম্ম আজ একত্র সমাগত হয়েছে সেই ভারতবর্ষেই বহু পূর্ব্ব যুগে এই বিচিত্র অতিথিদের একসভায় বসাবার জন্যে আয়োজন হয়ে গেছে। মানব সভ্যতা যখন দেশে দেশে নব নব বিকাশের শাখা প্রশাখায় ব্যাপ্ত হতে চলেছিল তখন এই ভারতবর্ষ বারম্বার মন্ত্র জপ করছিলেন—এক! এক! এক! তিনি বল্‌ছিলেন—ইহ চেৎ অবেদীৎ অথ সত্যমস্তি—এই একেকেই যদি মানুষ জানে তবে সে সত্য হয়—ন চেৎ ইহ অবেদীৎ মহতী বিনষ্টিঃ—এই এককে যদি না জানে তবে তার মহতী বিনষ্টি। এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত মিথ্যার প্রাদুর্ভাব হয়েছে সে কেবল এই মহান্ একের উপলব্ধি অভাবে—যত ক্ষুদ্রতা নিষ্ফলতা দৌর্ব্বল্য, সে এই একের থেকে বিচ্যুতিতে—যত মহাপুরুষের আবির্ভাব সে এই একের প্রচার করতে, যত মহাবিপ্লবের আগমন সে এই এককে উদ্ধার করবার জন্যে।

যখন ঘোরতর বিভাগ বিরোধ বিক্ষিপ্ততার দুর্দ্দিনের মধ্যে কোথায় এই বাংলা দেশে অপ্রত্যাশিত অভাবনীয় রূপে এই বিশ্বব্যাপী একের মন্ত্র—একমেবাদ্বিতীয়ং—দ্বিধাবিহীন সুস্পষ্টস্বরে উচ্চারিত হয়ে উঠল তখন এ কথা নিশ্চয় জান্‌তে হবে—সমস্ত

মানবচিত্তে কোথা হ'তে একটি নিগূঢ় জাগরণের বেগ সঞ্চারিত হয়েছে —এই বাংলা দেশে তার প্রথম সংবাদ ধ্বনিত হয়ে উঠেছে!

আমাদের দেশে আজ বিরাট মানবের আগমন হয়েছে। এখানে আমাদের রাজ্য নেই, বাণিজ্য নেই, গৌরব নেই পৃথিবীতে আমরা সকলের চেয়ে মাথা নীচু করে রয়েছি —আমাদেরই এই দরিদ্র ঘরের অপমানিত শূন্যতার মাঝখানে বিরাট মানবের অভ্যুদয় হয়েছে। তিনি আজ আমাদেরই কাছে কর গ্রহণ করবেন বলে এসেছেন। সকল মানুষের কাছে নিত্য কালের ডালায় সাজিয়ে ধরতে পারি এমন কোনো রাজদুর্লভ অর্ঘ্য আমাদের এখানে সংগ্রহ হয়েছে, নইলে আমাদের এ সৌভাগ্য হত না। আমাদের এই উৎসর্গ বটের তলায় নয়, ঘরের দালানে নয়, গ্রামের মণ্ডপে নয়, এ উৎসর্গ বিশ্বের প্রাঙ্গণে! এইখানেই তাঁর প্রাপ্য নেবেন বলে বিশ্বমানব তাঁর দূতকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তিনি আমাদের মন্ত্র দিয়ে গিয়েছেন "একমেবাদ্বিতীয়ং!" বলে গিয়েছেন মনে রাখিস্, সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে মনে রাখিস্ অদ্বিতীয় এক! সকল বিরোধের মধ্যে ধরে রাখিস্ অদ্বিতীয় এক!

সেই মন্ত্রের পর থেকেই আর ত আমাদের নিদ্রা নেই দেখচি! "এক" আমাদের স্পর্শ করেচেন, আর আমরা ঘর ছেড়ে, দল ছেড়ে, গ্রাম ছেড়ে বিশ্বপথের পথিক হব বলে চঞ্চল হয়ে উঠেছি! এ পথের পাথেয় আছে বলে জানতুম না—এখন দেখ্‌ছি অভাব নেই! ঘরে বাহিরে অনৈক্যের দ্বারা যারা নিতান্ত বিচ্ছিন্ন সমস্ত মানুষের মধ্যে তারাই "এক"কে প্রচার করবার হুকুম পেয়েছে। এক জায়গায় সম্বল আছে বলেই এমন হুকুম এসে পৌঁছিল!

তার পর থেকে আনাগোনা ত চলেইচে; একে একে দূত আস্‌চে। এই দেশে এমন একটি বাণী তৈরি হচ্চে যা পূর্ব্ব-পশ্চিমকে এক দিব্যধামে আহ্বান করবে, যা একের আলোকে অমৃতের পুত্রগণকে অমৃতের পরিচয়ে মিলিত করবে। রামমোহন রায়ের আগমনের পর থেকে আমাদের দেশের চিন্তা, বাক্য ও কর্ম্ম, সম্পূর্ণ না জেনেও, একটি চিরন্তনের অভিমুখে চলেছে। আমরা কোনো একটি জায়গায় নিত্যকে লাভ করব এবং প্রকাশ করব এমন একটি গভীর আবেগ আমাদের অন্তরের মধ্যে জোয়ারের প্রথম টানের মত স্ফীত হয়ে উঠ্‌ছে। আমরা অনুভব করচি; সমাজের সঙ্গে সমাজ, বিজ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞান, ধর্ম্মের সঙ্গে ধর্ম্ম যে এক পরমতীর্থে এক সাগরসঙ্গমে পুণ্যস্নান করতে পারে তারই রহস্য আমরা আবিষ্কার করব। সেই কাজ যেন ভিতরে ভিতরে আরম্ভ হয়ে গেছে। আমাদের দেশে পৃথিবীর যে একটি প্রাচীন গুরুকুল ছিল সেই গুরুকুলের দ্বার আবার যেন এখনি খুল্‌বে এম্‌নি আমাদের মনে হচ্চে। কেন না, কিছুকাল পূর্ব্বে যেখানে একেবারে নিঃশব্দ ছিল এখন যে সেখানে কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্চে! আর ঐ যে দেখ্‌ছি বাতায়নে এক একজন মাঝে মাঝে এসে দাঁড়াচ্চেন! তাঁদের মুখ দেখে চেনা যাচ্চে তাঁরা মুক্ত পৃথিবীর লোক, তাঁরা নিখিল মানবের আত্মীয়; পৃথিবীতে কালে কালে যে সকল মহাপুরুষ ভিন্ন ভিন্ন দেশে আগমন করেছেন সেই যাজ্ঞবল্ক্য বিশ্বামিত্র বুদ্ধ খৃষ্ট মহম্মদ সকলকেই তাঁরা ব্রহ্মের বলে চিনেছেন; তাঁরা মৃত বাক্য মৃত আচারের গোরস্থানে প্রাচীর তুলে বাস করেন না! তাঁদের বাক্য প্রতিধ্বনি নয়, কার্য্য অনুকরণ নয়, গতি অন্ধবৃত্তি নয়; তাঁরা মানবাত্মার মাহাত্ম্যসঙ্গীতকে এখনি বিশ্বলোকের রাজপথে ধ্বনিত করে তুলবেন। সেই মহা সঙ্গীতের মূল ধুয়াটি আমাদের গুরু ধরিয়ে দিয়ে গেছেন—"একমেবাদ্বিতীয়ং!" সকল বিচিত্র তানকেই এই ধুয়াতেই বারম্বার

ফিরিয়ে আন্তে হবে - একমেবাদ্বিতীয়ং।

আর আমাদের লুকিয়ে থাকবার জো নেই! এবার আমাদের প্রকাশিত হতে হবে—ব্রহ্মের আলোকে সকলের সাম্‌নে প্রকাশিত হতে হবে—বিশ্ববিধাতার নিকট থেকে পরিচয়পত্র নিয়ে সমুদয় মানুষের কাছে এসে দাঁড়াতে হবে। সেই পরিচয়-পত্রটি তিনি তাঁর দূতকে দিয়ে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কোন্ পরিচয় আমাদের? আমাদের পরিচয় এই যে আমরা তারা যারা বলে না যে, ঈশ্বর বিশেষ স্থানে বিশেষ স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত, আমরা তারা যারা বলে "একোবশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" সেই এক প্রভুই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, আমরা তারা যারা বলে না যে বাহিরের কোনো প্রক্রিয়া দ্বারা ঈশ্বরকে জানা যায় অথবা কোনো বিশেষ শাস্ত্রে ঈশ্বরের জ্ঞান বিশেষ লোকের জন্যে আবদ্ধ হয়ে আছে, আমরা বলি "হৃদা মনীষা মানসাভিক্লৃপ্তঃ" হৃদয়স্থিত সংশয়রহিত বুদ্ধির দ্বারাই তাঁকে জানা যায়; আমরা তারা যারা ঈশ্বরকে কোনো বিশেষ জাতির বিশেষ লভ্য বলিনে আমরা বলি তিনি অবর্ণঃ এবং বর্ণাননেকান্নি-হিতার্থো দধাতি, সর্ব্ব বর্ণেরই প্রয়োজন বিধান করেন কোনো বর্ণকে বঞ্চিত করেন না; আমরা তারা যারা এই বাণী ঘোষণার ভার নিয়েছি এক, এক, অদ্বিতীয় এক! তবে আমরা আর স্থানীয় ধর্ম্ম এবং সাময়িক লোকাচারের মধ্যে বাঁধা পড়ে থাক্‌ব কেমন করে! আমরা একের আলোকে সকলের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে প্রকাশ পাব। আমাদের উৎসব সেই প্রকাশের উৎসব, সেই বিশ্ব-লোকের মধ্যে প্রকাশের উৎসব, সেই কথা মনে রাখ্‌তে হবে! এই উৎসবে সেই প্রভাতের প্রথম রশ্মিপাত হয়েছে যে প্রভাত একটি মহাদিনের অভ্যুদয় সূচনা করচে।

সেই মহাদিন এসেছে অথচ এখনো সে আসে নি। অনাগত মহাভবিষ্যতে তার মূর্ত্তি দেখ্‌তে পাচ্চি। তার মধ্যে যে সত্য বিরাজ করচে সে ত এমন সত্য নয় যাকে আমরা একেবারেই লাভ করে আমাদের সম্প্রদায়ের লোহার সিন্ধুকে দলিল দস্তাবেজের সঙ্গে চাবি বন্ধ করে বসে আছি; যাকে বল্‌ব এ আমাদের ব্রাহ্ম-সমাজের, ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের! না! আমরা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিনি।

আমরা যে কিসের জন্য এই উৎসবকে বর্ষে বর্ষে বহন করে আস্‌চি তা ভাল করে বুঝতে পারিনি। আমরা স্থির করে-ছিলুম এই দিনে একদা ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়েছিল আমরা ব্রাহ্মরা-তাই উৎসব করি, কথাটা এমন ক্ষুদ্র নয়। "এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নি-বিষ্টঃ" এই যে মহান্ আত্মা এই যে বিশ্ব-কর্ম্মা দেবতা যিনি সর্ব্বদা জনগণের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছেন তিনিই আজ বর্ত্তমান যুগে জগতে ধর্ম্ম সমন্বয় জাতি সমন্বয়ের আহ্বান এই অখ্যাত বাংলাদেশের দ্বার হতে প্রেরণ করেছেন; আমরা তাই বলছি ধন্য, ধন্য, আমরা ধন্য!—এই আশ্চর্য্য ইতিহাসের আনন্দকে আমরা মাঘোৎসবে জাগ্রত করচি। এই মহৎসত্যে আজ আমাদের উদ্বোধিত হতে হবে—বিধাতার এই মহতী কৃপার যে গম্ভীর দায়িত্ব তা আমাদের গ্রহণ করতে হবে!—বুদ্ধিকে প্রশস্ত কর, হৃদয়কে প্রসারিত কর, নিজকে দরিদ্র বলে জেনো না, দুর্ব্বল বলে জেনো না—তপস্যায় প্রবৃত্ত হও, দুঃখকে বরণ কর, ক্ষুদ্র সমাজের মধ্যে আরাম ভোগ করবার জন্যে জ্ঞানকে মৃতপ্রায় এবং কর্ম্মকে যন্ত্রবৎ কোরো না—সত্যকে সকলের উর্দ্ধে স্বীকার কর এবং ব্রহ্মের আনন্দে জীবনকে পরিপূর্ণ করে অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ কর।

হে জনগণের হৃদয়াসন-সন্নিবিষ্ট বিশ্বকর্ম্মা তুমি যে আজ আমাদের নিয়ে তোমার কোন্ মহৎকর্ম্ম রচনা করচ, হে মহান্ আত্মা, তা এখনো আমরা সম্পূর্ণ বুঝতে পারিনি! তোমার ভগবৎশক্তি আমাদের বুদ্ধিকে কোন্‌খানে স্পর্শ করেছে, কোথায় তোমার সৃষ্টিলীলা চল্‌চে তা এখনো আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি—জগৎ সংসারে আমাদের গৌরবান্বিত ভাগ্য যে কোন্ দিগন্তরালে আমাদের জন্যে প্রতীক্ষা করে আছে তা বুঝ্‌তে পারচিনে বলে আমাদের চেষ্টা ক্ষণে ক্ষণে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ছে; আমাদের দৈন্য-বুদ্ধি ঘুচ্‌চে না, আমাদের সত্য উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌চে না, আমাদের দুঃখ এবং ত্যাগ মহত্ত্ব লাভ কর্‌চে না, সমস্তই ছোট হয়ে পড়চে; স্বার্থ আরাম, অভ্যাস এবং লোকভয়ের চেয়ে বড় কিছুকেই চোখের সামনে দেখতে পাচ্চিনে, একথা বলবার বল পাচ্চিনে যে সমস্ত সংসার যদি আমার বিরুদ্ধ হয় তবু তুমি আমার পক্ষে আছ, কেন না, তোমার সংকল্প আমাতে সিদ্ধ হচ্চে, আমার মধ্যে তোমার জয় হবে! হে পরমাত্মন্! এই আত্ম অবিশ্বাসের আশাহীন অন্ধকার থেকে এই জীবনযাত্রায় নাস্তিকতার নিদারুণ কর্ত্তৃত্ব থেকে আমাদের উদ্ধার কর; উদ্ধার কর, আমাদের সচেতন কর; তোমার যে অভিপ্রায়কে আমরা বহন করচি তার মহত্ত্ব উপলব্ধি করাও, তোমার আদেশে জগতে আমরা যে নবযুগের সিংহদ্বার উদ্‌ঘাটন করবার জন্যে যাত্রা করেছি সে পথের লক্ষ্য কি তা যেন সাম্প্রদায়িক মূঢ়তায় আমরা পথিমধ্যে বিস্মৃত হয়ে না বসে থাকি! জগতে তোমার বিচিত্র আনন্দরূপের মধ্যে এক অপরূপ অপরূপকে নমস্কার করি, নানাদেশে নানাকালে তোমার নানা বিধানের মধ্যে এক শাশ্বত বিধানকে আমরা মাথায় পেতে নিই—ভয় দূর হোক্, অশ্রদ্ধা দূর হোক্, অহঙ্কার দূর হোক্, তোমার থেকে কিছুই বিচ্ছিন্ন নেই, সমস্তই তোমার এক অমোঘ শক্তিতে বিধৃত, এবং এক মঙ্গল-সঙ্কল্পের বিশ্বব্যাপী আকর্ষণে চালিত এই কথা নিঃসংশয় জেনে সর্ব্বত্রই ভক্তিকে প্রসারিত করে নতমস্তকে জোড়হাতে তোমার সেই নিগূঢ় সঙ্কল্পকে দেখাবার চেষ্টা করি! তোমার সেই সংকল্প কোনো দেশে বদ্ধ নয়, কোনো কালে খণ্ডিত নয়, পণ্ডিতেরা তাকে ঘরে বসে গড়তে পারে না, রাজা তাকে কৃত্রিম নিয়মে বাঁধতে পারে না। এই কথা নিশ্চিন্ত জেনে এবং সেই মহা সঙ্কল্পের সঙ্গে আমাদের সমুদয় সঙ্কল্পকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সম্মিলিত করে দিয়ে তোমার রাজধানীর রাজপথে যাত্রা করে বেরই; আশার আলোকে আমাদের আকাশ প্লাবিত হইয়া যাক্, হৃদয় বলতে থাক্ আনন্দং পরমানন্দং, এবং আমাদের এই দেশ আপনার বেদীর উপরে আর একবার দাঁড়িয়ে উঠে মানবসমাজের সমস্ত ভেদবিভেদের উপরে এই বাণী প্রচার করে দিক্—

শৃণ্বন্ত বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে
দিব্যধামানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্য বর্ণং
তমসঃ পরস্তাৎ।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

শোণিত সোপান।

দন্দোলো যখন চুপি চুপি প্রস্থান করে, মাতেয়ো তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল। এখন হইতে মাতেয়ো তাহাকে আপনার পুত্রের মত মনে রাখিত, সে চলিয়া যাওয়ায় মাতেয়ো বড়ই চিন্তিত হইল। পরিচারিকা সিল্‌ভিয়া ক্লটিল্‌ডার নিকটে আছে কি না নিশ্চিন্ত জানিয়া মাতেয়ো গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িল। দন্দোলো নিশ্চয়ই তাহার প্রিয়তমার কবরের নিকট গিয়াছে এই মনে করিয়া মাতেয়ো গোরস্থানের পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল।

একজন লোক পথের ধারে বসিয়া ছিল; অন্ধকারের মধ্যে দিয়া হাত্‌ড়াইতে হাত্‌ড়াইতে মাতেয়ো তাহার উপর গিয়া পড়িল; মাতেয়ো তাহাকে দন্দোলো মনে করিয়া যেমন তাহার হাত ধরিবে, অমনি একটা ধাক্কা খাইয়া পিছু হটিয়া পড়িল। সে লোকটা উঠিয়া তাড়াতাড়ি চলিতে লাগিল। তখন মাতেয়ো বলিল :—

"দন্দোলো, এসো, পথের ধারে কেন বসে আছ, বৎস ?"

আচ্ছাদন-বস্ত্রে আবৃত সেই লোকটা আরও দূরে চলিয়া গেল। মাতেয়ো তাহাকে ডাকিল—

"দন্দোলো! দন্দোলো!"

তখন সেই লোকটা ফিরিয়া আসিয়া এরূপ স্বরে একটা কথা বলিয়া উঠিল যে, শোকের আবেগ যদি মাতেয়োকে নির্ভীক করিয়া না তুলিত, তাহা হইলে সেই স্বর শুনিয়া মাতেয়ো নিশ্চয়ই পলায়ন করিত :

"আমি দন্দোলো নই।"

মাতেয়ো আবার সেই পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল; ভাবিল, আমি কি ভুলই করিয়াছিলাম! যেখানে রাস্তাটা বাঁকিয়াছে সেই বাঁকের মুখে পৌঁছিয়া, মাতেয়ো পার্শ্ববর্ত্তী একটা ক্ষুদ্র পাহাড়ের চূড়ার দিকে দৃষ্টিপাত করায় একটা অদ্ভুত দৃশ্য তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিল। অনেকটা দূরে থাকিলেও সে যেন দেখিতে পাইল,—এক জন মানুষ একটা সাদা লম্বা পুলিন্দা বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহার উপর একটা আলো পড়িয়াছে এবং সেই আলোয় বড় বড় রক্তের দাগ দেখা যাইতেছে। মুহূর্ত্তের জন্য সে মনে করিল, বুঝি এক দল বে-আইনী মালের সওদাগর; কিন্তু পরক্ষণেই, দন্দোলোর সহিত সাক্ষাৎ হইলেও হইতে পারে মনে করিয়া ঐ দিকেই চলিতে আরম্ভ করিল। যাইতে যাইতে, একটা বন্দুকের আওয়াজ শুনিতে পাইল এবং মনে হইল সাদা বিন্দুর মত কি একটা জিনিস্ স্থির হইয়া আছে। মাতেয়ো ঐ দিকেই চলিতে লাগিল; পেদ্রোলিনোর নিকটে আসিয়া, একটা অদ্ভুত দৃশ্য তাহার দৃষ্টিগোচর হইল।

দন্দোলো ভূতলে সটান পড়িয়াছে, মস্তক রক্তাপ্লুত, এবং সে আসন্ন মরণের সহিত যুঝাযুঝি করিতেছে। আলুলায়িত-কুন্তলা নিনেত্তা, শব-বস্ত্রে কোন প্রকারে আচ্ছাদিত হইয়া, তাহার প্রিয়তমের দেহের উপর পড়িয়া রহিয়াছে, এবং তাহাকে বাঁচাইয়া তুলিবার জন্য পেদ্রোলিনোর নিকট নানা

প্রকার কাকুতি মিনতি করিতেছে। পেদ্রো-লিনো, লণ্ঠন হাতে দাঁড়াইয়া আছে; এই ভীষণ দৃশ্যের উপর লণ্ঠনের আলো পড়িয়াছে।

পিতাকে দেখিবামাত্র নিতেনা উঠিয়া তাঁহার বাহুপাশে ঝাঁপাইয়া পড়িল। এই সময়ে মাতেয়োর মনে যাহা হইতেছিল তাহা বর্ণনা করা সুকঠিন। সে জাগ্রত কি নিদ্রিত তাহা বুঝিতে পারিতেছিল না। তাহার বিশ্বাস, তাহার কন্যা মরিয়াছে, তাহার মৃত দেহের নিকটে থাকিয়া একটা দিন কাটাইয়াছে; কিন্তু একি অদ্ভুত কাণ্ড, এখানে আবার তাহাকে দেখিতে পাইল, দন্দোলোর পাশে তাহারও দেহ শোণিতাপ্লুত;—আর দন্দোলো গুপ্তঘাতকের অস্ত্রাঘাতে মৃতপ্রায়। যাহা দেখিল, তাহা বাস্তব বলিয়াই মনে হইল না। নির্ব্বিকার-চিত্ত মাতেয়ো—যে এরূপ হত্যাকাণ্ডে কখন অভ্যস্ত ছিল না—সে সুখ কিংবা দুঃখ কিছুই অনুভব করিতে পারিতেছে না; সে বাঁচিয়া আছে মাত্র; সে দস্তুর মত কাজ করিয়া যাইতেছে মাত্র। কিন্তু তাহার হৃদয়ের অনুভূতি চলিয়া গিয়াছে,—হৃদয় অসাড় হইয়া পড়িয়াছে।

বলিতে যতটা সময় লাগে তাহা অপেক্ষা অল্প সময়ের মধ্যেই এই সমস্ত ঘটিয়াছিল। মাতেয়ো বিস্ময়-বিহ্বল অবস্থা হইতে একটু সাম্‌লাইয়া উঠিয়াছে এমন সময়ে যেন কাহার পায়ের শব্দ শুনিতে পাইল। দীর্ঘ আচ্ছাদন বস্ত্রে আবৃত—একটা বড় টুপীতে মুখ অর্দ্ধেক ঢাকা [illegible] লোক দ্রুতপদে সেই স্থলে [illegible] মুমূর্ষু দন্দোলোর [illegible]

রূপ বলিল:—"তুই বিশ্বাসঘাতকের কাজ করেছিলি—আমরা তার প্রতিফল দেব বলে' অঙ্গীকার করেছিলেম। আমরা আমাদের কথা রেখেছি। এই তোর বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিফল।"

দন্দোলো অনেক কষ্টে তাহার ক্ষত বিক্ষত মুখ নিনেতার দিকে ফিরাইয়া তাহার শেষ কথা বলিল:—আমি মহাপাপী…ঈশ্বর ন্যায়বান..নিনেতা তুমি আমার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কোরো।"

প্রিয়তমের মৃতদেহের সম্মুখে নতজানু হইয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে নিনেতা এই কথা বলিল:—

"আমি তোমার হতে পারলেম না, এখন আমি একমাত্র ঈশ্বরেরই হলেম।"

৮

দুই বৎসর অতীত না হইতে হইতেই এক দল দস্যু ধরা পড়িল; উহারাই নেপল্‌স-নগরের চতুর্দ্দিকস্থ প্রদেশ ছারখার করিয়াছিল। কয়েক বৎসর ধরিয়া উহারা ঐ সব প্রদেশে আড্ডা গাড়িয়া কৃষকদিগের বিভীষিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। মোকদ্দমা দীর্ঘকাল চলিল; এবং সেই মোকদ্দমায়, পেদ্রোলিনো নামক এক দস্যুর এজাহারে আরও অনেক বদমাইসির কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। বিচারে সকল অপরাধীরই প্রাণদণ্ড আদিষ্ট হইল।

উহাদিগকে বধ্যভূমিতে লইয়া যাইবার সময়ে, অপর দিক্ হইতে আর এক দল লোক আসিতেছিল। ধর্ম্মমঠের সন্ন্যাসিনীরা একটি সন্ন্যাসিনীর মৃতদেহ লইয়া [illegible] করিল, [illegible] পশ্চাতে যে জনতা ছিল,

সেই জনতার মধ্যে, পেত্রোলিনো, নিনেতার পিতাকে চিনিতে পারিল।

উহারা নিনেতারই মৃতদেহ সমাধিস্থানে লইয়া যাইতেছিল। এই দস্যুদের মোকদ্দমার কথা নিনেতারও কানে আসিয়াছিল। (এখনও ইটালির প্রসিদ্ধ ডাকাতি মোকদ্দমার মধ্যে এই মোকদ্দমাটি দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা হয়)—এই মোকদ্দমার মধ্যে, কর্জ্জা নামধারী দন্দোলোর নাম বারম্বার ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। রোগগ্রস্ত নিনেতা যাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিত, তাহার নামে এইরূপ কলঙ্ক রটনা হওয়ায়, সেই মনস্তাপে তাহার পীড়া আরও বাড়িয়া উঠিল, একমাত্র ধর্ম্ম যাহাকে সান্ত্বনা দিয়া এতদিন বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, মৃত্যু তাহাকে এই দুঃখময় সংসার হইতে মুক্তি দান করিল।

(সমাপ্ত)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর।

দুই ইচ্ছা।*

আমাদের এই উৎসব মিলনের উৎসব।

এর মধ্যে দুটি মিলন আছে। যেমন বিবাহ উৎসবের কেন্দ্রস্থলে আছে বরকন্যার মিলন এবং তাকে বেষ্টন করে আছে আহুত অনাহুত রবাহুতের মিলন—পরিচিত অপরিচিত আত্মীয় অনাত্মীয় সকলের মিলন—তেমনি আমাদের প্রত্যেকের পক্ষে এই উৎসবের কেন্দ্রস্থলে আছে আমার সঙ্গে আমার অধীশ্বরের মিলন এবং সেই মূল মিলনটিকে অবলম্বন করে বিশ্ব সাধারণের সঙ্গে আনন্দ-মিলন।

আজ প্রভাতে সর্ব্বপ্রথমে সেই মূল কথাটিকে নিয়ে এই উৎসবের রাজ্যে প্রবেশ করতে চাই—সব মিলনের মূলে যে মিলন, যেখানে কেউ কোথাও নেই, জগৎ সংসার নেই কেবল আমি আছি আর তিনি আছেন, সেইখান দিয়ে যাত্রা আরম্ভ করব—তার পরে সেই একটিমাত্র বৃন্তের উপর স্থির নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে হৃদয়পদ্মের একশো দলকে একেবারে বিশ্বভুবনের একশো দিকে ফুটিয়ে তোলা যাবে—তখন একের থেকে অনেকের দিকে প্রসারিত হয়ে উৎসব সম্পূর্ণ হবে।

অতএব এই পবিত্র শান্ত সময়ে গভীরতম নিভৃততম একলার কথা দিয়ে প্রভাত আরম্ভ করা যাক্। কোন্‌খানে আমি আর তিনি মিল্‌চেন সেইটে একবার চেয়ে দেখি।

রোজই ত দেখা যায় সকাল থেকেই সংসারের কথা ভাব্‌তে সুরু করি। কেন না, সে যে আমার সংসার। আমার ইচ্ছাটুকুই এই সংসারের কেন্দ্র। আমি কি চাই না চাই, কি রাখ্‌ব কি ছাড়্‌ব, এই কথাটাকেই মাঝখানে নিয়ে আমার সংসার।

যে বিশ্বভুবনে বাস করি তার ভাবনা আমাকে ভাব্‌তে হয় না! আমার ইচ্ছার দ্বারা সূর্য্য উঠ্‌চে না, বায়ু বইচে না, অনুপরমাণুতে মিলন হয়ে বিচ্ছেদ হয়ে সৃষ্টিরক্ষা হচ্চে না। কিন্তু আমি আমার নিজের ইচ্ছাশক্তিকে মূলে রেখে যে সৃষ্টি গড়ে তুলছি তার ভাবনা আমাকে সকলের চেয়ে বড়

* গত ১১ই মাঘ প্রাতে আদি-ব্রাহ্মসমাজে লেখক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক পঠিত।

ভাবনা করেই ভাব্‌তে হয়, কেন না সেটা আমারি ভাবনা।

তাই এত বড় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের বৃহৎ ব্যাপারের ঠিক মাঝখানে থেকেও আমার এই অতিছোট কথা আমার কাছে ছোট বলে মনে হয় না, আমার প্রভাতকালের সামান্য আয়োজন চেষ্টা প্রভাতের সুমহৎ সূর্য্যোদয়ের কাছে লেশমাত্র লজ্জিত হয় না, এমন কি, তাকে অনায়াসে বিস্মৃত হয়ে চল্‌তে পারে।

তবেই ত দেখছি দুইটি ইচ্ছা পরস্পর-সংলগ্ন হয়ে কাজ করচে। একটি হচ্চে বিশ্বজগতের ভিতরকার ইচ্ছা, আর একটি আমার এই অতি ক্ষুদ্র জগতের ভিতরকার ইচ্ছা। রাজা ত রাজত্ব করচেন, আবার তাঁর অধীনের তালুকদার সেও সেই মহা-রাজ্যের মাঝখানেই নিজের রাজত্বটুকু জমিয়েছে। তার মধ্যেও রাজৈশ্বর্য্যের সমস্ত লক্ষণ আছে—কেন না ঐ ক্ষুদ্র সীমাটুকুর মধ্যে তার ইচ্ছা, তার কর্তৃত্ব আছে।

এই আমাদের আমি-জগতের মধ্যে ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককে রাজা করে দিয়েছেন। যোক রাস্তার ধুলো ঝাঁট দিচ্চে সেও তার আমি-অধিকারের মধ্যে স্বয়ং সকলের শ্রেষ্ঠ। যিনি ইচ্ছাময় তিনি "যাব-চ্চন্দ্রদিবাকরৌ" আমাদের প্রত্যেককে একটি করে ইচ্ছার তালুক দান করেছেন।

আমাদের এই চিরন্তন ইচ্ছার অধিকার নিয়ে আমরা এক একবার অহঙ্কারে মত্ত হয়ে উঠি। বলি, যে আমার নিজের ইচ্ছা ছাড়া কাউকেই মানিনে। এইরূপে সকলকে লঙ্ঘন করার দ্বারাই আমার ইচ্ছা যে স্বাধীন এইটে স্পর্দ্ধার সঙ্গে অনুভব করতে চাই।

কিন্তু ইচ্ছার মধ্যে আর একটি তত্ত্ব আছে। স্বাধীনতায় তার চরম সুখ নয়। শরীর যেমন মনকে চায়, বস্তু যেমন বস্তুকে আকর্ষণ করে, ইচ্ছা তেমনি ইচ্ছাকে না চেয়ে থাকতে পারে না। অন্য ইচ্ছার সঙ্গে মিলিত হতে না পারলে এই একলা ইচ্ছা আপনার সার্থকতা অনুভব করে না। সে মায়ের কাছ থেকে কেবল সেবা চায় না, সেবার সঙ্গে মায়ের ইচ্ছাকেও চায়—বলে যে, বন্ধু ইচ্ছা করেই প্রেমের সঙ্গে আমার উপকার করুক—এমন কি উপকার নাও করুক কিন্তু তার ইচ্ছা যেন আমার দিকেই আসে—আমি যেন তার অনিচ্ছার সামগ্রী না হই।

এমনি করে ইচ্ছা যেখানে অন্য ইচ্ছাকে চায় সেখানে সে আর স্বাধীন থাকে না, সেখানে নিজেকে তার খর্ব্ব করতেই হয়। আমি যেমনি ইচ্ছে তেমনি চল্‌ব অথচ অন্যের ইচ্ছাকে বশ করে আন্‌ব এ ত হয় না। গৃহিনীকে বাড়ীর সকলেরই সেবিকা হ'তে হয় তবেই তিনি বাড়ীর সকলের ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছাকে সম্মিলিত করে গৃহকে মধুর করে তুলতে পারেন!

এই যে ইচ্ছার অধীনতা এত বড় অধীনতা ত আর নাই। আমরা দাসতম দাসের কাছ থেকেও জোর করে ইচ্ছা আদায় করতে পারি না, অতএব সেই ইচ্ছা যখন আত্মসমর্পণ করে তখন আর কিছুই বাকী থাকে না।

তাই বলছিলুম—ইচ্ছাতেই আমাদের স্বাধীনতার সবচেয়ে বিশুদ্ধ স্বরূপ, তেমনি এই ইচ্ছার মধ্যেই অধীনতারও সকলের চেয়ে বিশুদ্ধ মূর্ত্তি। ইহা, অহঙ্কারের মধ্যে

আপনাকে স্বাধীন বলে প্রকাশ করে সুখ পায় বটে, কিন্তু তার চেয়ে বড় সুখ পায় প্রেমে আপনাকে অধীন বলে স্বীকার করে।

ঈশ্বরের ইচ্ছার মধ্যেও এই ধর্ম্মটি দেখ্‌তে পাচ্চি—তিনিও ইচ্ছাকে চান। এইজন্যই—চাইতে পারবেন বলেই—আমার ইচ্ছাকে তিনি আমার করে দিয়েছেন। বিশ্বনিয়মের জালে তাকে একেবারে নিঃশেষ বেঁধে ফেলেন নি। বিশ্বসাম্রাজ্যে আর সমস্তই তাঁর ঐশ্বর্য্য কেবল ঐ একটি জিনিস তিনি নিজে রাখেন নি। সেটি আমার ইচ্ছা—ঐটে তিনি কেড়ে নেন না, চেয়ে নেন—মন ভুলিয়ে নেন। একটি জিনিস আছে যেটি আমি তাঁকে সত্যই দিতে পারি। ফুল যদি দিই সে তাঁরি ফুল, জল যদি দিই সে তাঁরি জল,—কেবল ইচ্ছা যদি সমর্পণ করি সে আমারি ইচ্ছা বটে।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর এইখানে তাঁর ঐশ্বর্য্য খর্ব্ব করেছেন। আমার কাছে এসে বল্‌ছেন—আমি রাজ খাজনা চাই নে, আমাকে প্রেম দাও!—হে প্রেমস্বরূপ! তোমাকে প্রেম দিতে হবে বলেই তুমি এত কাণ্ড করেছ। আমার মধ্যেই এই এক সৃষ্টিছাড়া "আমির" লীলা ফেঁদে বসেছ এবং আমাকে এই একটি ইচ্ছার সম্পদ দিয়ে সেটি পাবার জন্য আমার কাছেও হাত পেতে দাঁড়িয়েছ, তাই যদি না হ'ত তবে এ গানটি গাহিতে কি আমার সাহস হ'ত?—

"নাথ হে, প্রেমপথে সব বাধা ভাঙিয়া দাও,
মাঝে কিছুই রেখো না রেখো না—
থেকো না থেকো না দূরে!"

এ কেমন প্রার্থনা? এ প্রেম কার সঙ্গে? মানুষ কেমন করে এ কথা কল্পনাতেও এনেছে এবং মুখেও উচ্চারণ করেছে যে বিশ্বভুবনেশ্বরের সঙ্গে তার প্রেম হবে? বিশ্বভুবন বল্‌তে যতখানি বোঝায় এবং তার তুলনায় মানুষ যে এত ছোট যে কোন অঙ্কের দ্বারা তাহার পরিমাণ করা দুঃসাধ্য! এমন যে অচিন্তনীয় ব্রহ্মাণ্ডের পরমেশ্বর—তাঁরই সঙ্গে এই কণার কণা অণুর অণু বলে কি না প্রেম করবে! অর্থাৎ, তাঁর রাজসিংহাসনে একেবারে তাঁর পাশে এসে বস্‌বে? অনন্ত আকাশে নক্ষত্রে নক্ষত্রে তাঁর জগৎযজ্ঞের হোমহুতাশন যুগযুগান্তর জ্বল্‌চে আমি সেই যজ্ঞক্ষেত্রের অসীম জনতার এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে কোন্ দাবীর জোরে দ্বারীকে বল্‌চি এই যজ্ঞেশ্বরের এক শয্যায় আমাকে আসন দিতে হ'বে।

মানুষ জগদীশ্বরের সঙ্গে প্রেম করতে চায় একি তবে অত্যাকাঙ্খার অশান্তোন্মত্ততা, অহঙ্কারের চরম পরিচয়?

কিন্তু অহঙ্কারের একটা যে লক্ষণ নিজেকেই ঘোষণা করা সেটা ত এর মধ্যে দেখ্‌ছিনে—এ যে নিজেকে একেবারে বিলুপ্ত করা! তাঁর প্রেমের জন্যে যে লোক ক্ষেপেছে সে যে নিজেকে দীপ করে সকলের পিছনে এসে দাঁড়ায়; যাঁরা ঈশ্বরের প্রেমের দরবারে দরবারী তাঁদের পায়ের ধুলা পেলেও সে যে বাঁচে!

সেই জন্য জগৎসৃষ্টির মধ্যে এইটে সকলের চেয়ে আশ্চর্য্য বলে বোধ হয় যে মানুষ তাঁর প্রেম চায় এবং সকল প্রেমের চেয়ে সেইটেকেই বড় সত্য বড় লাভ বলে চায়।

কেন চায়? কেন না, সে যে অধিকার পেয়েছে। হোন্ না তিনি বিশ্বজগতের রাজাধিরাজ, এই প্রেমের দাবী তিনিই জন্মিয়েছেন আবার প্রেমও তাঁহার সঙ্গে। এতে আর ভয় লজ্জা কিসের?

তিনি যে আমাকে একটি বিশেষ "আমি" করে তুলে সমস্ত জগৎ থেকে স্বতন্ত্র করে দিয়েছেন। এক দিকে বিরাট ব্রহ্মাণ্ড আর একদিকে আমার এই 'আমি' এ রহস্য কেন? এই ছোট আমিটির সঙ্গে এই পরম আমিটি মিলবেন!

এমন যদি না হ'ত তবে তাঁর জগৎ রাজ্যের একলা রাজা হয়ে তাঁর কিসের আনন্দ? কোথাও তাঁর কোন সমান নেই তিনি কি ভয়ঙ্কর একলা কি অনন্ত একলা। তিনি ইচ্ছা করে কেবল প্রেমের জোরে এই তাঁর একাধিপত্য বিসর্জ্জন করেছেন! তিনি আমার এই 'আমি' টুকুর আনন্দ নিকেতনে বিশেষ করে নেমে এসেছেন,—বন্ধু হয়ে ধরা দিয়েছেন, বলেছেন—"আমার চন্দ্র সূর্য্যের সঙ্গে তোমার নিজের দামের হিসাব করতে হবে না। কেন না ওজন করে তোমার দাম নয়। তোমার দাম আমার আনন্দের মধ্যে, তোমার সঙ্গেই আমার বিশেষ প্রেম বলেই তুমি হয়েছ, তুমি আছ।

এই খানেই আমার এত গৌরব যে তাকে সুদ্ধ আমি অস্বীকার করতে পারি; বল্‌তে পারি—"আমি তোমাকে চাইনে"—সে সকল কথা তাঁর ধুলো জলকে বলতে গেলেও তারা সহ্য করে না, তারা তখনই মারতে আসে। কিন্তু তাঁকে যখন বলি "তোমাকে আমি চাইনে, আমি টাকা চাই, খ্যাতি চাই" তিনি বলেন, "আচ্ছা বেশ।" বলে চুপ করে সয়ে বসে থাকেন।

এদিকে কখন এক সময় হুঁস হয় যে আমার আত্মার যে নিভৃত নিকেতন সেখানকার চাবি ত আমার খাজাঞ্চীর হাতে নেই—টাকা কড়ি ধন দৌলত কোন মতেই সেখানে গিয়ে পৌঁছায় না,—বাইরে আবর্জ্জনার মত পড়ে থাকে! সেখানে ফাঁক থেকেই যায়। সেখানকার সেই একলা ঘরটিকে মহান্ একলা ছাড়া কেউ কোন মতেই ভাব্‌তে পারে না। যে দিন বলতে পারব চন্দ্রসূর্য্যহীন এই একলা ঘরটিতে তুমি আমার আর আমি তোমার সেই দিন আমার "আমি" জন্মের মত সার্থক হবে!

আমাদের অন্তরাত্মার "আমি" ক্ষেত্রের একটা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ছাড়া নিকেতনে সেই আনন্দময়ের যে যাতায়াত আছে জগৎ জুড়ে তার নিদর্শন পড়ে রয়েছে। আকাশের নীলিমায়, বনের শ্যামলতায়, ফুলের গন্ধে সর্ব্বত্রই তাঁর সেই পায়ের চিহ্ন ধরা পড়েছে যে! সেখানে যদি তিনি রাজবেশ ধরে আস্‌তেন, তাহলে জোড় হাত করে মাথা ধূলায় লুটিয়ে তাঁকে মানতুম—কিন্তু ঐ জায়গায় তিনি যে বন্ধুর বেশে ধীরপদে আসেন, একেবারে একলা আসেন—সঙ্গে তাঁর পদাতিকগুলো শাসন দণ্ড হাতে জয় ডঙ্কা বাজিয়ে আসে না—সেই জন্যে পাপ ঘুম ভাঙতেই চায় না, দরজা বন্ধই থাকে।

কিন্তু এমন করলে ত চলবে না। শাসনের দায় নেই বলেই লক্ষীছাড়া যদি প্রেমের দায় স্বীকার না করে তবে তার জন্ম জন্ম সে কেবল দাসদাসানুদাস হয়েই

ঘুরে মর্‌বে। মানব জন্ম যে আনন্দের জন্ম সে খবরটা সে একেবারেই পাবে না। তবে, অন্তরের যে নিভৃততম আকাশে চন্দ্র সূর্য্যের দৃষ্টি পৌঁছায় না, যেখানে কোনো অন্তরঙ্গ মানুষেরও প্রবেশপথ নেই—যেখানে কেবল একলা তাঁরই আসন পাতা, সেইখান্‌কার দরজাটা খুলে দে, আলো জেলে তোল, যেমন প্রভাতে সুস্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্চি তাঁর আলোকে আমাকে সর্ব্বাঙ্গে পরিবেষ্টন করে আছে যেন ঠিক তেমনি প্রত্যক্ষ বুঝতে পারি তাঁর আনন্দ তাঁর ইচ্ছা তাঁর প্রেম আমার জীবনকে সর্ব্বত্র নীরন্ধ্র, নিবিড় ভাবে পরিবৃত করে আছে। তিনি তপস্যা করে বসে আছেন তাঁর এই আনন্দ মূর্ত্তি তিনি আমাদের জোর করে দেখাবেন না বরঞ্চ তিনি প্রতিদিনই ফিরে ফিরে যাবেন, বরঞ্চ তাঁর এই জগৎজোড়া সৌন্দর্য্যের আয়োজন প্রতিদিনই আমার কাছে ব্যর্থ হবে তবু তিনি এতটুকু জোর করবেন না। যেদিন আমার প্রেম জাগবে সে দিন তাঁর প্রেম আর লেশ মাত্র গোপন থাক্‌বে না। কেন যে "আমি" হয়ে একদিন এত দুঃখে দ্বারে দ্বারে ঘুরে মরচি সে দিন সেই বিরহ-দুঃখের রহস্য এক মুহূর্ত্তে ফাঁস হয়ে যাবে।

হে আমার প্রাণের প্রাণ, জগতের সর্ব্ব সাধারণের সঙ্গে সাধারণ ভাবে আমার মিল আছে—ধূলির সঙ্গে পাথরের সঙ্গে আমার মিল আছে, পশু পক্ষীর সঙ্গে আমার মিল আছে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে আমার মিল আছে। কিন্তু এক জায়গায় একেবারে মিল নেই—যেখানে আমি হচ্চি বিশেষ। আমি যাকে "আমি" বল্‌চি এর আর কোন দ্বিতীয় নেই। এ যে ঈশ্বরের অনন্ত সৃষ্টির মধ্যে অপূর্ব্ব—এ কেবলমাত্র "আমি", একলা "আমি", অনুপম অতুলনীয় "আমি"। "আমি"র যে জগৎ সে একলা আমারই জগৎ—সেই মহা বিজন লোকে হে আমার অন্তর্যামী তুমি ছাড়া আর কারো প্রবেশ করবার কোনো জো নেই।

প্রভু, সেই যে একলা আমি, বিশেষ আমি, তার মধ্যে তোমার বিশেষ আনন্দ, বিশেষ আবির্ভাব। সেই বিশেষ আবির্ভাবটি আর কোনো দেশে কোনো কালেই নেই। আমার সেই বিশিষ্টতাকে আমি সার্থক করব প্রভু! এই 'আমি' নামক তোমার সকল হতে স্বতন্ত্র এই যে একটি বিশেষ লীলা আছে এই বিশেষ লীলায় তোমার সঙ্গে যোগ দেব—একের সঙ্গে এক হয়ে মিল্‌ব!

এই "আমি"টিকে অনাদিকাল থেকে তুমি বহন করে আস্‌চ। কত সূর্য্যচন্দ্রগ্রহ-তারার মধ্য দিয়ে এ'কে তোমার পাশে করে হাতে ধরে নিয়ে এসেছ, কিন্তু কারো সঙ্গে একে জড়িয়ে ফেল নি! কোন্ নীহারিকার জ্যোতির্ম্ময় বাষ্পনিচয় থেকে অনুপরমাণুসঞ্চালনা করে কত পুষ্টি কত পরিবর্ত্তন, কত পরিণতির ভিতর দিয়ে এই আমিকে আজ শরীরে ফুটিয়ে তুলেছ! তোমার সেই অনাদিকালের সঙ্গে সে আমার এই দেহটির মধ্যে সঞ্চিত হয়ে আছে। অনাদিকাল থেকে আজ পর্য্যন্ত অনন্ত সৃষ্টির মাঝখান দিয়ে একটি বিশেষ রেখাপাত হয়ে এসেছে, সেটি হচ্চে "আমি"র রেখা। সেই তুমি আমার অনাদি পথের চালক, অনন্ত পথের অদ্বিতীয় বন্ধু, তোমাকে আমার সেই একলা

বন্ধুরূপে জীবনের মধ্যে উপলব্ধি করব। আর কিছুই তোমার সমান না হোক্, তোমার চেয়ে বড় না হোক্! আর, আমার এই যে একটা সাধারণ জীবন, যা নানা ক্ষুধা তৃষ্ণা চিন্তা চেষ্টা দ্বারা আমি সমস্ত তরুলতা পশুপক্ষীর সঙ্গে একত্রে মিলে ভোগ করছি সেইটেই নানাদিকে প্রবল হয়ে না উঠে। আমি যেখানে জগতের সামিল সেখানে তোমাকে জগদীশ্বর বলে মান—কিন্তু 'আমি' রূপে তোমাকে আমার একমাত্র বলে জান্‌তে চাই! এই 'আমি' ক্ষেত্রেই আমার সব দুঃখের চেয়ে পরম দুঃখ তোমার সঙ্গে বিচ্ছেদ অর্থাৎ অহঙ্কারের দুঃখ।—আমার সব সুখের চেয়ে পরম সুখ তোমার সঙ্গে মিলন অর্থাৎ প্রেমের সুখ। এই অহঙ্কারের দুঃখ কেমন করে ঘুচ্‌বে সেই ভেবেই বুদ্ধ তপস্যা করেছিলেন এবং এই অহঙ্কারের দুঃখ কেমন করে ঘোচে সেই জানিয়েই খৃষ্ট প্রাণ দিয়েছিলেন। হে পুত্র হতে প্রিয়, বিত্ত হতে প্রিয়, হে অন্তরতম প্রিয়তম, "আমি"-নিকেতনেই যে তোমার চরম লীলা, এই জন্যেই ত এইখানেই এত নিদারুণ দুঃখ, এবং সে দুঃখের এমন অপরিসীম অবসান! সেই জন্যেই ত এইখানেই মৃত্যু এবং অমৃত সেই মৃত্যুর বক্ষ বিদীর্ণ করে উৎসারিত হচ্চে। এই দুঃখ এবং সুখ, মিলন এবং বিচ্ছেদ, মৃত্যু এবং অমৃত, তোমার দক্ষিণ ও বাম দুই বাহু, এর মধ্যে সম্পূর্ণ ধরা দিয়ে যেন বল্‌তে পারি আমার সব মিটেছে, আমি আর কিছুই চাইনে!

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

নিয়তি।

—:০:—

এ জীবনে কভু তুমি হবে না আমার
জানি তাহা সুনিশ্চয়। প্রতিকূল গ্রহ
অন্ধকার কক্ষচ্ছায়া ফেলি অহরহ
ম্লান-অন্তরাল রেখা মাঝে দুজনার
নিরত রেখেছে টানি। নিয়তি প্রাচীর
লঙ্ঘিবার শক্তি নাই, চিরবন্দী সম
পাষাণ বেষ্টনোপরি হানে সদা শির
অধীর উন্মত্ত চিত্ত। রুদ্ধ বিহঙ্গম,
পিঞ্জরের লৌহাঙ্গুলি-বদ্ধ মুষ্টিমাঝে
ঝাপটিয়া মরে পাখা, কনক উষার
উজ্জ্বল মধ্যাহ্নে কিম্বা নিদারুণ সাঁঝে
যবে তারে দেখা দাও বিচিত্র মায়ায়।
দিক্ চক্রবাল সম, পরশ-আতুর
চিত্তেরে ঘেরিয়া নিত্য আজ বহুদূর।

শ্রী :—

বঙ্গদর্শন।

বাংলার কাহিনী।

Among a highly cultured people the writing of national history may well be left to private efforts; but in modern India no liesurely and lettered class has yet been developed to conduct such researches.

—*W. W. Hunter.*

ইংরাজ সরকার দপ্তর বাঁধিতে চিরদিনই পটু—ইহা ইংরাজের দোষ নহে,—ইংরাজের গুণ। যে দণ্ড হইতে ইংরাজ বাংলায় দাঁড়াইবার স্থান পাইয়াছেন, সেই দণ্ড হইতে বাংলার প্রাত্যহিক জীবনের দৈনন্দিন ইতিহাস ইংরাজের দপ্তরে বাঁধা পড়িয়াছে। এমন কি স্বদেশদ্রোহী মিথ্যাবাদী উমিচাঁদের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সেই জাল সন্ধিপত্র পর্য্যন্ত ইংরাজের দপ্তরখানায় রহিয়াছে।

ইংরাজ বাহাদুর বহুকাল পূর্ব্বেই এদেশে একটা বিরাট বিশাল জরীপ বিভাগ (Survey Department) খুলিয়াছিলেন। সেই বিভাগের কর্ম্মকর্ত্তারা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, গ্রামে গ্রামে শিকল টানিয়া ইংরাজের রাজত্ব সীমাবদ্ধ করিয়াছিলেন। বাহিরের একটা আবরণে অন্তরের মসীচিহ্ন ঢাকিলেও দুই দিনের জন্য উহা ঢাকা পড়ে। ইংরাজের জরীপ বিভাগের তত্ত্বানুসন্ধান সম্বন্ধে আলোচনা করিলেও তাহাই দেখা যাইবে। রাজ-কর্ম্মচারীরা কেবল শিকল টানিয়া, নক্সা লিখিয়া, দপ্তর বাঁধিয়াই সময়ক্ষেপ করিয়াছিলেন—কিন্তু যাহাদিগকে লইয়া রাজত্ব তাহাদিগের সুখ-দুঃখের, জীবন-মরণের কাহিনী সংগ্রহ কার্য্যে একান্ত উদাসীন ছিলেন। ইহার প্রমাণের জন্য অধিক আয়োজনের প্রয়োজন নাই।

ঐতিহাসিকের চক্ষে, আর কিছু না হইলেও, বাংলার তিনটী স্থল মহামূল্যবান। নিরপেক্ষ তত্ত্বগ্রহণেচ্ছু যে বাংলার সেই তিনটী স্থানে দাঁড়াইয়া বিশ্বচক্রের মহা পরিবর্ত্তন দেখিয়া হর্ষে বিষাদে বিস্ময়ে অভিভূত হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বাংলার আদি মধ্য ও বর্ত্তমান এই তিন যুগের তিন জন বা তিন জাতি নরপতি। আদিতে হিন্দু, মধ্যযুগে মুসলমান, বর্ত্তমানে ইংরাজ। রুচি চিরদিনই ভিন্ন। ইংরাজ যে স্থলকে এখন নিতান্ত নগণ্য ও ক্ষুদ্র বলিয়া মনে করেন, হিন্দু ও পাঠানরাজ সেই স্থলে রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়া ঐশ্বর্য্য এবং সমৃদ্ধির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। হিন্দুর এবং পাঠানের অতীত-গৌরববাহিনী মহাসমৃদ্ধিশালিনী সেই নগরী, যাহা একদিন ধনে জনে বঙ্গভূমির গৌরবস্থল ছিল—পাঠান

নৃপতিগণ যে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া আপনাদিগকে মহা সৌভাগ্যশালী বলিয়া মনে করিতেন—যাহাকে হিন্দু নৃপতি দেবতার নৈবেদ্যসম জ্ঞান করিতেন—যাহার শক্তিশালী নরপতিকুল, সুন্দর সুদৃশ্য সুবৃহৎ রাজপ্রাসাদ সমূহ, বিরাট স্তম্ভাবলী, বিশাল সিংহদ্বার একদিন অনন্ত শোভার ভাণ্ডার ছিল—কালের মহাশক্তি প্রভাবে এখন সেখানে ব্যাঘ্রাদি বন্য জন্তু নির্বিবাদে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে—পৃথিবীর যে কোন রাজ্যের ইতিহাসে যে রাজধানী মহা গৌরবের সহিত স্থান লাভ করিতে পারিত—ইংরাজের জরীপ বিভাগের ইতিহাসে তাহার জন্য দরিদ্রের মুষ্টিভিক্ষা স্বরূপ কতটুকু স্থান প্রদত্ত হইয়াছে? একখানি ক্ষুদ্র পুস্তকের পূর্ণ এক পৃষ্ঠার যোগ্য বলিয়াও হিন্দুর সেই প্রাচীন রাজধানী বিবেচিত হয় নাই। কিন্তু সেই বিপুলা নগরী কি আজ ইংরাজকে মনে করাইয়া দেয় না যে যাঁহারা এক সময়ে উহাকে ধনে, জনে শোভায় অতুল করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাঁহারাও এক দিন ইংরাজেরই মত এদেশে দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা ছিলেন!

মুসলমান নবাব যখন বাংলার মসনদে, তাহার শেষ সময়ে ইংরাজ ব্যাপারী বাংলায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তাহার পর যখন ইংরাজ রাজা জরীপ বিভাগ খুলিলেন তখন তাঁহারা মুর্শিদাবাদের সেই, মতিঝিল সেই তক্ত মোবারক, সেই চেহেলসুতুন সেই কাঠরা প্রভৃতি আর পূর্ব্বের চক্ষে দেখিতে পারেন নাই—যে সিংহাসনসম্মুখে কুর্ণিশ করিতে করিতে তাঁহাদিগের অনেকের মেরুদণ্ড বক্র হইয়া গিয়াছিল, * সে সিংহাসন আর তখন ইংরাজের নিকট মহিমামণ্ডিত বলিয়া মনে হয় নাই—তাই মুসলমানের প্রাণপ্রিয়, বাংলার অন্যতম গৌরব স্থল মুর্শিদাবাদের কাহিনী সর্ভে বিভাগের দপ্তরে শুধু অর্দ্ধ পৃষ্ঠা মাত্র স্থান লাভ করিয়াছিল।

ইংরাজ দেশের রাজা হইয়া সুতানটী, কলিকাতা এবং গোবিন্দপুর লইয়া কলিকাতাকে রাজধানী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কলিকাতা এখন গৌরবে সম্ভ্রমে, শোভায় সম্পদে ভারতে অতুল। ইংরাজের বিজয় কীর্ত্তি এখন প্রতিদিন ফোর্ট উইলিয়ম হইতে অগ্নিমুখে নিনাদিত হইতেছে। সেই কলিকাতার কাহিনী লিখিতে গিয়া যদিও সর্ভে বিভাগ অর্দ্ধ পৃষ্ঠায় সারিতে পারেন নাই—এক পৃষ্ঠারও কিছু অধিক স্থান দিতে হইয়াছে, কিন্তু সেই এক পৃষ্ঠারও আবার বেশীর ভাগ সাইরেণ পোতে সঙ্কলিত মিথ্যাবাদী হলওয়েল সাহেবের স্বকপোল কল্পিত অন্ধকূপ হত্যাকাহিনীর উল্লেখেই ব্যয়িত হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে বহু-বিজ্ঞাপিত নবাব-ইংরাজে সমরকাহিনীও বাদ যায় নাই! সর্ভে বিভাগ এইরূপে বাংলার ইতিহাস সঙ্কলন করিয়াছিলেন।

ইংরাজরাজকর্ম্মচারীগণ যে দিন হইতে বাঙ্গালীর গৃহদেবতারও অধিক হইয়াছেন, সেই দিন হইতেই তাঁহারা বঙ্গবাসী ও বঙ্গ

* Before the capture of Calcutta, no Englishman appeared at Murshidabad *except as supplicants* for trading privileges. Since the battle of Plassey, the English were lords and masters.—Early Records of British India.

দেশকে চিনিতে চাহিতেছেন—সিংহ যেমন মৃগের সকল অবস্থা, সকলভাব, সর্ব্বল শক্তি চিনিয়া লয় সেইরূপ। তাই আজ শিকরসিক্ত খসখসের আস্তরণে সমাবৃত কার্পেটমণ্ডিত, কুশনচেয়ার-সুশোভিত, সুসজ্জিত সুরম্য কক্ষে ঘূর্ণ্যমাণ বৈদ্যুতিক পাখার নিম্নে বসিয়া, ইজিপ্সিয়ান সিগারের ধূমোদ্গীরণ করিতে করিতে ইংরাজ মুহূর্ত্তে বলিতে পারেন বাঙালীর গৃহে কতখানা কলম কাটিবার ভোঁতা ছুরি আছে—ধ্বংস করিবার কয়খানা ভগ্ন জীর্ণ বঁটী আছে—শস্য নিড়াইবার জন্য কত খানা মরিচা ধরা কর্ত্তনী আছে! তাই আজ ইংরাজ ইঙ্গিতে বলিতে পারেন প্রতি বাঙালীর গৃহে কয়জন গৃহলক্ষ্মী তাহার সংসার আলো করিয়া রাখিয়াছে।

হিন্দু নরপতি ইহা পারিতেন না, মুসলমান নবাব ইহা জানিতেন না, তাই আজ হিন্দুর শাসনকাহিনী গল্প কথায় পর্য্যবসিত, আর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ মোগল-পাঠান রামচন্দ্রের ভুজার দোকানের কালি-চুণ তৈলাক্তিত লূতাতন্তুপূর্ণ কুলুঙ্গির মধ্যে সযত্নে রক্ষিত! কিন্তু আজ বাঙালী হাসিলে ইংরাজ তাহা লিখিয়া রাখে, বাঙালী রোদন করিলে ইংরাজ তাহার 'নোট' লয়, বাঙালীর গৃহে শ্রীমান কার্ত্তিকের অন্নপ্রাশনে বাদ্যোদ্যম হইলে ইংরাজ কর্ত্তার কর্ণে সে ধ্বনির প্রতিধ্বনি বাজে—তাই আজ বাঙালীর বিবাহ সভা, বাঙালীর শক্তিপূজা ইংরাজের মিউজিয়মে শ্বেতদ্বীপবাসীদিগের তৃপ্তিসাধনের জন্য কাচের ফানুস মধ্যে সুরক্ষিত! ইংরাজ এদেশের রাজা হইবে না ত কি? ইংরাজের দপ্তর খুলিলে দেখিতে পাই যে যে বাণিজ্য বিস্তারের জন্য অষ্টজন ইংরাজ বণিক এক খানি ক্ষুদ্র দেশীয় তরণী মধ্যে পণ্য বোঝাই করিয়া সাগর পথে যাত্রা করিয়াছিলেন—শেষে উড়িষ্যার মোগল শাসন কর্ত্তাকে পূজা করিয়া, তাঁহার চরণ চুম্বন * পূর্ব্বক বাণিজ্য বিস্তারের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, সেই ইংরাজের ভয়েই আবার একদিন বঙ্গবাসী তন্তুবায়কুল আপন আপন বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ বলি দিয়া অক্ষম সাজিতে বাধ্য হইয়াছিল! ইংরাজ এদেশের রাজা হইবে না ত কি? আলীবর্দ্দির মৃত্যুর পর পর্য্যন্তও যে ইংরাজ ব্যাপারী পূজামন্ত্রে নবাব ও ওমরাহদিগকে তুষ্ট করিতে বিস্মৃত হয় নাই—নবাব আরক্তচক্ষু হইয়াছেন শুনিলেই ডিরেক্টর সভা পর্য্যন্ত পূজার ব্যবস্থা করিবার জন্য বিলাত হইতে পত্র লিখিতেন, অনেক সময় যে পূজার আয়োজন করিতে ইংরাজ কোম্পানি-বাহাদুর—যাঁহারা সিরাজদ্দৌলার সংবর্দ্ধনা করিতে ১৫৫৬০ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন—অন্যে পরে কা কথা, যাঁহারা হুগলীর ফৌজদারকেই বার্ষিক ২১০০৲ টাকা প্রদান করিয়া তাঁহাকে তুষ্ট রাখিতেন † তাঁহারাই শেষে পূজাবিধির সমস্ত ব্যয়ভার সুদ সমেত বাঙালীর নিকট হইতে আদায় করিয়া হইয়াছিলেন! মীরজাফরের হিংসা-

* দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—বাংলার কাহিনী।

† Selections from the unpublished Records of Govt.—Rev. Long. P. 8.

সম আরোহণের সূচনাতেই এ বিষয়ের অন্যতম প্রমাণ বর্ত্তমান ;* নবাব মীরকাশেম ও নজমুদ্দৌলার সিংহাসন প্রাপ্তিও কোম্পানী বাহাদুরের অর্থলালসার নিদর্শন। † ইংরাজ, কৌশলী, ইংরাজ শক্তিশালী, ইংরাজ সুচতুর—এক হস্তে চরণ ও অপর হস্তে কণ্ঠ ধরিয়া কিরূপে অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে হয় ইংরাজ তাহা জানেন সুতরাং ইংরাজ ত এদেশের রাজা হইবেনই।

ইংরাজ এদেশের রাজা হইলেন—কিন্তু তাঁহারা সদা অনুসন্ধিৎসু, সদা শঙ্কিত, সদা সন্দিগ্ধচিত্ত। তাঁহাদের প্রতি জেলায় যে দপ্তরখানা আছে তাহাতে রিপোর্ট, মিনিট, প্রোসিডিংএর অভাব নাই, ইংরাজশাসনের প্রথম মুহূর্ত্ত হইতেই তাঁহারা যাহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন সে সমুদায়ই বাংলার প্রতি জেলার দপ্তরখানায় সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। সেই সমুদায়কেই ইংরাজ বাংলার চির-সত্য সনাতন ইতিহাস বলিয়া মনে করে। কখন কখনও কোন ইংরাজকর্ম্মচারী সেই সকল পূর্ব্বপ্রত্যক্ষভূত ঘটনার জীর্ণ বিবরণগুলি সংগ্রহ ও সঙ্কলন করিয়া, ভারতের এবং বাংলার মহামূল্য ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হয়েন! কখনও বা চাকুরী রক্ষার জন্য, কখনও বা রায় বাহাদুর, রাজা বাহাদুর হইবার প্রত্যাশায়, আমরা সেই সকল ইতিহাস—দুই, চারি, পাঁচ অথবা এক শত, দুই শত খণ্ড ক্রয় করিয়া পুস্তকালয়ের আলমারির শোভা বর্দ্ধন করি অথবা বন্ধুবান্ধবগণকে দান করিয়া কৃতার্থ হই।

কিন্তু সেই সকল ইতিহাস কি বাংলার ইতিহাস—বাঙালীর ইতিহাস? কীট-দষ্ট সেই সকল পুরাতন মিনিট, রিপোর্ট, প্রোসিডিং হইতে আমরা যে সমুদায় তথ্য সংগ্রহ করি, অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে সে সকল ঘটনাবলীর সহিত বাঙালীর

* "কোম্পানীর কলিকাতার কর্ম্মচারীগণ এই উপলক্ষে যে অর্থ লাভ করেন, ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের কমন্স সভার কমিটী তাহার এক হিসাব দিয়াছেন—

গবর্ণর ড্রেক	২৮০০০০ মুদ্রা
কর্ণেল ক্লাইব	
মেম্বর স্বরূপ	২৮০০০০
সেনাপতি স্বরূপ	২০০০০০
বিশিষ্ট দান	১৬০০০০০
ওয়াটস্	২০৮০০০০
মেম্বর স্বরূপ	২৪০০০০
বিশিষ্ট দান	৪০০০০০
	১০৪০০০০
মেজর কিল্‌প্যাট্রিক	২৪০০০০
অতিরিক্ত	৩০০০০০
	৫৪০০০০

"বাঙ্গালার ইতিহাস।" নবাবী আমল।

† Torreus' Empire in Asia and Secret Committee held on 10 Feb. 1765.

বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই,—হয়ত বা সে সমুদায়ের অধিকাংশই সমসাময়িক বাঙালীর অজ্ঞাত ছিল!

বাংলার রামধন ও মবারক এক আশ্চর্য্য জীব। পাঠান ধ্বংস হইয়া মোগল আসুক, কিম্বা পালবংশ বিলুপ্ত হইয়া সেন বংশ রাজসিংহাসনে আরোহণ করুক—রামধন দাসের তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না! পাঠানের সহিত মোগলের যুদ্ধে, অথবা মোগলের সহিত ইংরাজের সমরে মবারকের হৃদয়ে কোন তরঙ্গ উঠে না; কিন্তু বর্গীর হাঙ্গামায় মবারক আকুল হইয়া ক্রন্দন করে—নবাবের ফৌজ যদি রামধনের সুবর্ণশস্য পদদলিত করে তবে তাহার বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া যায়। বঙ্গভূমি ইংরাজের রাজত্ব কিন্তু ইহা ইংরাজের নহে—"এ সোনার বাংলা" রামধনের ও মবারকের! অথচ ইহাদের সহিত বাংলার চির-পরিবর্ত্তনশীল রাজনীতির কোন সম্বন্ধ নাই, কিন্তু ইহারাই সে রাজনৈতিক আলোচনার প্রথম ফল ভোগ করে! যদি এরূপ না হইত তবে কি পলাশী-প্রাঙ্গণে ইংরাজের কামান ডাকিতে পারিত? যখন আম্রকানন ধূমাচ্ছাদিত, যখন ভাগীরথী কামান গর্জ্জনে কম্পিতা, যখন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব মীরজাফরের চরণ-প্রান্তে রাজমুকুট স্থাপিত করিয়া যুক্তকরে জীবন ভিক্ষা চাহিতেছেন—তখন বাংলার রামধন ও মবারক দৃঢ়মুষ্টিতে হলচালনা করিতেছিল; তারপর যখন সিরাজের ছিন্নদেহ হস্তিপৃষ্ঠে নগর পরিভ্রমণ করিতেছিল তখনও রামধন এবং মবারক হলচালনায় ব্যস্ত; যে মীরকাশেম বাংলার বাণিজ্য রক্ষাকল্পে ইংরাজের বিষদৃষ্টিতে পতিত হইয়া সিংহাসন হারাইয়াছিলেন, সেই মীরকাশেম যখন যুদ্ধে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন, সেদিনও রামধন এবং মবারক হল চালনাই করিতেছিল।

তাহারা নবাব ও জানে না, মীরজাফরও জানে না—তাহারা ইংরাজও জানিত না, লর্ড ক্লাইবও জানিত না; তাহারা জানে আপন গ্রামপ্রান্তে অথবা কুটীরপার্শ্বে ক্ষুদ্র এক বিঘা জমী—যে জমীতে তাহারা 'সোণা' ফলাইয়াছে; যদি জমিদারের লাঠিয়াল সেই অনন্ত কাঞ্চন-সমুদ্র মন্থন ও লুণ্ঠন করিতে আইসে—রামধন ও মবারক শস্য রক্ষার্থ অনায়াসে প্রাণ দিবে! সেই জমীদার—রামধন ও মবারকের 'পিতা মাতা'—যদি তাহাদিগকে ডাকিয়া স্নেহ বাক্যে বলেন—'তোরা থাকিতে আমার এই বিপদ' উহারা তখনও প্রাণ দিবে! সেই রামধনের ইতিহাসই বাংলার ইতিহাস—সেই মবারকের সুখ-দুখের কাহিনীই বাঙালীর কাহিনী—সেই রামধন এবং মবারক কত সহ্য করিয়াছে, তাহার আলোচনাতেই আমরা কত সহিয়াছি তাহারও আলোচনা হইবে, কারণ আমরা রামধন হইতে ভিন্ন নহি।

বাংলার রামধন যে ভূমি কর্ষণ করে সে তাহার ইতিহাস জানে—গত এক শতাব্দী ধরিয়া সেই জমিতে যে শস্য উৎপাদিত হইতেছে রামধন তাহা বলিতে পারে। কবে কি কারণে কে সেই ক্ষুদ্র ভূখণ্ড হস্তান্তরিত করিয়াছে, কত খাজানা দিয়াছে, এখনই বা কত দিতে হয়—জমিতে জলসেক করিতে কবে কোন্ নালা বা খাল লইয়া কাহার

সহিত কলহ হইয়াছিল, মবারক সে সমস্তই বলিতে পারিবে। কিন্তু ইহাই কি বাঙালীর ইতিহাস?

যে বঙ্গভূমির সহিত রামধনের সেই ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের কাহিনীর সম্বন্ধ রহিয়াছে, সেই বাংলার অতীত সুখ-দুঃখ, সেই বাংলার আকস্মিক বিপদ-সম্পদ, সেই বাংলার রামমোহন, কৃষ্ণদাস, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম প্রভৃতি দেবতা—যাঁহারা রামধনের অন্ন যোজন করিতেন—সেই বাংলার উন্নত শিল্পের চিতাভস্ম, রাজস্বের জন্য কৃষককুলের পুত্র কন্যা বিক্রয়—সেই বাংলার নীলকুঠি—সেই দীনবন্ধু, হরিশ, মিঃ লং—এই সকলই বাংলার ইতিহাস, বাঙালীর ইতিহাস। সেই লোকপূজিতা দীন-পালিনী মহারাণী ভবানী, সেই বালবিধবা তাপসব্রতধারিণী মহারাণী শরৎসুন্দরীর অলৌকিক কাহিনী—ইহাই বাঙালীর হৃদয়ের কথা—বাঙালীর সুখ দুঃখের কথা—বাঙালীর সত্য ইতিহাস।

ইংরাজ বাঙালীর সে ইতিহাস লেখেন নাই বলিয়া ইংরাজকে দোষ দিতে পারি না, কারণ বিদেশী হইয়াও ইংরাজ যতটুকু করিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট—আমাদিগের জন্য মুসলমান এত করে নাই। আমরা যে কিছুই করি নাই সেই কথার উত্তর চিন্তা করিতে গেলে লজ্জায় ম্রিয়মাণ হই। আমরা নবাব সিরাজদ্দৌলার ইতিহাস লিখি, অন্ধকূপ হত্যার অমূঠ প্রমাণ স্মৃতি-চিহ্ন, যাহা আজিও কলিকাতার রাজপথে ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীর নিতান্ত উদ্দীপনাপূর্ণ স্বজন-প্রিয়তার দোহাই দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে, আমরা তাহার উপর প্রবন্ধ লিখিয়া সেই হত্যা কাহিনীর সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করি—আমরা মীরকাশেমের ইতিহাস লিখি, প্রতাপাদিত্যের গান গাহি, আমরা রাণা প্রতাপ, ছত্রপতি শিবাজী লিখিয়া মনে করি কর্ত্তব্য এই খানেই সমাপ্ত হইয়াছে! কিন্তু আমরা আমাদের ইতিহাস লিখিয়াছি কবে? আমাদের সুখ-দুঃখের কথা কহিয়াছি কবে? আমাদের প্রকৃত ইতিহাস সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়াছি কবে?

জাতীয় জীবন সংগঠনে সিরাজ বা মীরকাশেম, প্রতাপ বা সীতারাম, রাণা-প্রতাপ বা শিবাজী যেমন একান্ত প্রয়োজন মনে করি—রামধন ও মবারককেও তেমনি প্রয়োজন বলিয়া বোধ হয়। সিরাজে বা প্রতাপে, শিবাজী বা সীতারামে আমরা আমাদিগকে খুঁজিয়া পাই না; তাঁহাদিগের অনন্ত কীর্ত্তিকাহিনীর মধ্যে আমরা যেন নিতান্তই হারাইয়া যাই; তাই মনে হয় আমরা ঠিক যাহা তাহা সিরাজে নাই, মীরকাশেমে নাই—তাহা সীতারামে নাই, প্রতাপে নাই—তাহা শিবাজীতেও নাই, তাহা রাণার কাহিনীতেও নাই—তাহা আছে রামধনে ও মবারকে, জবান আকন্দে ও কিনুসর্দ্দারে।

ইংরাজের সযত্ন-সঙ্কিত বাঙালীর কাহিনীকে আমি নিষ্ফল বলিতেছি না। ইংরাজ যখন হইতে বিবরণ সংগ্রহ করিতেছেন, তখন বঙ্গভূমির মহা সন্ধিযুগ। তখন অর্দ্ধশতাব্দীর মোগল সম্রাটের গৌরব-রবি সদ্য অস্তগত—বৈদেশিক বণিকের সৌভাগ্য তখন উষার মন্দ আলোকের ন্যায় কেবল একটু দেখা দিয়াছে মাত্র। সেই সন্ধিযুগের কাহিনী নিষ্ফল নহে।

কত বিপদ, কত শঙ্কা, কত সন্দেহের ভিতর দিয়া ইংরাজের বিজয় তখন ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল—সে কাহিনীর প্রতি ছত্রে তাহার পরিচয় আছে। প্রতীচ্য যে কি কৌশলে প্রাচ্যে বিজয় লাভ করিয়াছিল—কোথাও বা রাজ-অমাত্যদিগের অতি নীচ মন্দ অভিপ্রায়, কোথাও বা তাহাদিগের সম্পূর্ণ অযোগ্যতা, কোথাও বা কোন রাজনীতি-বিশারদের অসীম নৈপুণ্য—ইংরাজ-লিখিত বাঙালীর কাহিনীর ভিতর দিয়া আমরা এই সকল আলেখ্যই দেখিতে পাই! কিন্তু চারিদিক বিবেচনা করিলে ইহাই মনে হয় যে বাংলায় ইংরাজের প্রতিষ্ঠা কামানের মুখে নহে, কৃপাণের আঘাতে নহে, কারণ পলাশী ইংরাজের গৌরব নহে।* তাই মনে হয়, ইংরাজের অপরাজিত রাজনৈতিক সাহস ও দুর্দমনীয় ইচ্ছাশক্তি এবং বাঙালীর স্বদেশদ্রোহ বাংলায় ইংরাজকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। ইংরাজের দপ্তর সহস্রমুখে সহস্রভাবে সেই কথাই কহিয়া দেয়। তাই ইংরাজের দপ্তর নিষ্ফল নহে, আবর্জ্জনা নহে, উহাই ইংরাজের পথ-প্রদর্শক।

ইংরাজের দপ্তর আছে, আমাদের কিছুই নাই! জাতীয় ইতিহাস দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ই লিখিয়া থাকেন; আমাদের জাতীয় ইতিহাস নাই, তাই একজন ইংরাজ ঐতিহাসিক কহিতেছেন 'আধুনিক ভারতবর্ষে এখনও এমন শিক্ষিত সম্প্রদায় হয় নাই যাহারা জাতীয় ইতিহাস লিখিবার জন্য প্রয়াসী হইবে!' ইংরাজ ঐতিহাসিকের কথার প্রত্যুত্তরে আমাদের যে কি বলিবার আছে তাহা জানি না। বাংলার ধনকুবের-গণ যেমন হারাধন ও মক্সরকের ছায়া স্পর্শ করিলে স্নান করিয়া পবিত্র হইয়া থাকেন, শিক্ষিত সম্প্রদায়ও তেমনি উহাদিগের দিকে চাহেন নাই। সেই জন্যই বাঙালীর জাতীয় ইতিহাসেরও অভাব। কোন যোগ্য ব্যক্তি এই অভাব মোচনের চেষ্টা করিলে যে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই!

য়ুরোপ ও ভারত।

প্রাচ্যের জ্ঞান-গৌরব বহুদিন হইতেই দূর দূরান্তরে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। প্রাচ্যের পণ্য সম্ভারে যে কত নগর সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল, ইতিহাস এখন তাহা নীরবে দেখাইয়া দিতেছে। সে আজ কতদিনের কথা—তখন মিসরবাসী ও ফিনিক্‌গণ ভূমধ্যসাগরের উপকূলে বাণিজ্য আরম্ভ করিয়াছিল। আরব উপসাগরের তীরবর্ত্তী কতকগুলি স্থান অধিকার করিয়া তাহারা অল্পকাল মধ্যেই সমুদ্র পথে ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য-সম্বন্ধ সংস্থাপিত করিয়াছিল। প্রতীচ্যের সহিত প্রাচ্যের ইহাই প্রথম সম্বন্ধ।†

তখন প্রতিবৎসর গ্রীষ্মের সময় ১২০ খানি বাণিজ্য-তরণী মিসর হইতে ভারতাভিমুখে যাত্রা করিত এবং ভারতের অমূল্য রেসম, দুর্ম্মূল্য প্রস্তরাদি ও নানাবিধ গন্ধ-

---

* Decisive Battles of India—Col. Malleson.

† The works of W. Robertson, vol. xii.

দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া শীতাগমে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিত। * রোমকগণ তখন নিতান্ত বিলাসপ্রিয় ছিল। তাহারা চতুর্গুণ মূল্যে সেই সকল পণ্য ক্রয় করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিত।

তাহার পর যখন ভাস্কো ডা গামা কম্পিত হৃদয়ে ভারতবর্ষকে আবিষ্কার (!) করিতে বাহির হইয়াছিলেন † যখন পর্ত্তুগালবাসীগণ সমস্বরে বলিতে লাগিল 'এই অভিযানে কেবল দেশের অর্থ নষ্ট হইবে ভিন্ন আর কিছুই নহে', তখন কে জানিত যে এমন একদিনও আসিবে যখন বহুবর্ষ ধরিয়া পর্ত্তুগাল ভারতবর্ষের বাণিজ্যক্ষেত্রে স্বাধিকার বিস্তার করিয়া মুসলমান-বাণিজ্যকে কৃপাণের মুখে এদেশ হইতে চিরতরে উৎখাত করিয়া দিবে। কিন্তু কালে তাহাই হইয়াছিল! ‡

বাহুবলে বাণিজ্যবিস্তারের কাহিনী ইতিহাসে পুরাতন নহে; কিন্তু ফিরিঙ্গি বণিক শক্তিমন্ত্রে যত শীঘ্র ভারতে বাণিজ্যাধিকার লাভ করিয়াছিল যত অল্পকাল মধ্যে ভারতের উপকূলে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া পাশ্চাত্য জগৎকে বিস্মিত ও বিমোহিত এবং পরিশেষে ঈর্ষান্বিত করিয়াছিল ইতিহাসে তাহার তুলনা সহজে মিলেনা।

সে কালে ভারতবর্ষের সমৃদ্ধি অতুলনীয় ছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সে সময়ের বিশাল হিন্দু সাম্রাজ্য দাক্ষিণাত্যের বিজয় নগরের উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইতালীর নিকোলো বিজয়নগরের বর্ণনাকালে কহিয়াছিলেন, 'এই নগরের পরিধি ৩০ ক্রোশ,' ঐ শতাব্দীর মধ্যভাগে পারসীক আব্দর রজাক বিজয়নগরে আসিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন এবং দেখিয়াছিলেন দোদুল্যমান তিন সারি মতির মালায় সুশোভিত, হীরকাদি মণ্ডিত কনক সিংহাসনে বিজয়নগরের হিন্দু নরপতি অধিষ্ঠিত থাকেন—তাঁহার কোন কোন গৃহের ছাদ এবং প্রাচীর সুবর্ণপাতে নির্ম্মিত। ¶ এই সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়াই ধনলুব্ধ বৈদেশিক বণিক ভারতবর্ষে আগমন করিত।

কালক্রমে ভারতবর্ষ বৈদেশিকদিগের শক্তি পরীক্ষার রঙ্গস্থল হইয়াছিল। ইস্‌লামের কৃপাণের সহিত খৃষ্টানের ক্রুশের প্রাণান্তকারী সমর ভারত সমুদ্র ও ভারতের উপকূল সমূহে শতবর্ষ ধরিয়া জীবিত ছিল। সেই সময়ে ফিরিঙ্গির অত্যাচারে মালাবার প্রভৃতি ধ্বংশ প্রাপ্ত হইয়াছিল—এখন পর্য্যন্তও ক্ষুদ্র দ্বীপ 'মিটি' শবদ্বীপ নামে পরিচিত থাকিয়া ফিরিঙ্গির অত্যাচার কাহিনীর প্রমাণ দিতেছে! সে দ্বীপ অধিকার করিয়া বিজয়ী ফিরিঙ্গিগণ একজন দ্বীপবাসীকেও জীবিত রাখে নাই! ফিরিঙ্গির অত্যাচার কাহিনী এই কারণে ভারতীয় বাণিজ্যের ইতিহাসে শোণিতের অক্ষরে

* The Ancient Egyptians— Wilkinson, vol I.

† ভারতী পত্রিকায় লিখিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্যের ভাস্কো ডা গামা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ নিচয় দ্রষ্টব্য।

‡ সাহিত্য পত্রিকায় লিখিত শ্রীযুত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় "ফিরিঙ্গি বণিক" এবং ভারতী পত্রিকায় লিখিত শ্রীযুত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্যের "ফিরিঙ্গি বণিকের অত্যাচার" এবং "ফিরিঙ্গির বাণিজ্য" প্রবন্ধগুলি দ্রষ্টব্য।

¶ A forgotten Empire—Sewell, Chap VII.

লিখিত রহিয়াছে। যে কাহিনীর প্রতিবর্ণে প্রমাণিত হয় যে ফিরিঙ্গিরা অত্যাচারের জন্যই অত্যাচার করিয়াছিল—শোণিত পিপাসা নিবৃত্ত করিবার জন্যই শোণিত পাত করিয়াছিল! *

ষোড়শ শতাব্দীতে ইংলণ্ড ভারতবর্ষে উপনীত হইবার জন্য যে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিল তাহার মূলেও ভারতের সমৃদ্ধি বিদ্যমান ছিল। দ্বিতীয় ফিলিপ যে দিন হইতে পর্ত্তুগালকে স্পেইনের অধীনে আনিয়া বন্ধন করিলেন, সেই দিন হইতেই ইংরাজ বুঝিয়াছিল যে সব শেষ হইয়াছে! তাই অনেক ইংরাজ বণিক ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া প্রলুব্ধ হৃদয়ে ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজাবেথের নিকট আবেদন জানাইয়া ভারতে বাণিজ্য করিবার আদেশ চাহিয়াছিল (১৫৮০ খৃঃ অঃ) তাহার পর হইতেই স্পেইন ও পর্ত্তুগালের সমবেত শক্তি নেদারল্যাণ্ডস্ এবং ইংলণ্ডকে পর্য্যুদস্ত করিতে লাগিল।

বিচারে বিতর্কে কিছুকাল অতিবাহিত হইয়া গেল। তাহার পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাঁদা সংগৃহীত হইল, জাহাজ নির্ম্মিত হইল—ইংলণ্ডের কতকগুলি উদ্যমশীল সাহসী বণিক ভারতবর্ষের পণ্য আহরণে নিযুক্ত হইলেন। প্রাচ্যে ইংরাজের "কুঠি" স্থাপিত হইল।†

যে সকল ইংরাজ বণিক সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া তখন প্রাচ্যে বাণিজ্য করিতে লাগিলেন, তাঁহারা অল্পকাল মধ্যেই দেখিলেন বিনা সনন্দেও অনেকে আসিয়া তাঁহাদের লাভের অংশ গ্রহণ করিতেছে। ইংরাজের ইতিহাসে ইহারা "Interlopers" নামে পরিচিত। প্রাচ্যের ইংরাজ কুঠিয়ালগণ স্বার্থরক্ষার জন্য এই সকল ইণ্টারলোপারদিগের বিরুদ্ধে বিলাতে অভিযোগ করিলেন। রাজসিংহাসন হইতে আদেশ হইল—কোম্পানীর অনুমতি পত্র না লইয়া ভারতবর্ষে বাণিজ্য দূরে থাক, বাস করিলেও ইংরাজদিগকে দণ্ডিত হইবে। ‡ রাজাদেশ অমান্য করিয়াও কোম্পানী বাহাদুরের কর্ত্তাদিগকে উৎকোচ প্রদান পূর্ব্বক অনেক ইণ্টারলোপার বহুদিন পর্য্যন্ত এদেশে বিচরণ করিয়াছে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দলভুক্ত হওয়া ধীরে ধীরে ইংলণ্ডের ধনকুবেরদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া উঠিল। ইংলণ্ডেশ্বর তখন স্বয়ং বিলাতের জাহাজ-ঘাটায় যাইয়া

* The Portuguese cruelties were deliberate than vindictive.

Hunter's History of British India, Vo. I, page 140

† Lacauster (James) filled up his Ships with Spices at several of the islands, left a factory of English merchants and seamen and returned to England on September 11, 1603.

Hunter's History of British India, vol. I, page 278.

‡ Any peron not liscensed by the Company who directly or indirectly do *visit, haunt, frequent* or *trade*, into or from any of the said East Indies, shall incur the Royal indignation ; and the forfeiture of their Ships and Goods, half to the Company and half to the erown.—Hunter's History of British India. vol. I. page 287.

কোম্পানী বাহাদুরের জাহাজগুলির নামকরণ করিতে লাগিলেন। ভারতের পণ্য যখন বিলাতে যাইয়া পৌঁছিত তখন রয়াল এক্সচেঞ্জে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইত। ইংলণ্ডের লোক সংবাদ পাইবা মাত্র উন্মত্তের ন্যায় তথায় ছুটিয়া যাইত—গ্রাহক সংগ্রহ করিবার জন্য কোম্পানীর দোকানদারকে আদৌ বেগ পাইতে হইত না। এক খানি টেবিলের উপর একটী মোমের বাতি জ্বালাইয়া কোম্পানীর বড়কর্ত্তা ডাকিতেন 'আচ্ছা মাল যাতা হ্যায়'—যতক্ষণ বাতি জ্বলিত ততক্ষণই শুধু পণ্য বিক্রয় হইত। এই *"candle-auction"* এর সময় লক্ষ পৌণ্ড মূল্যের রেশম, নীল বা মসল্লা মুহূর্ত্তে বিক্রীত হইত। নিলামবাজারে সকলেই ডাকিবার অধিকারী ছিল না। কোম্পানীর কখনও কোন অনিষ্ট করিয়াছেন বলিয়া যাঁহারা কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক বিবেচিত হইতেন, নিলামঘরের প্রাচীর-গাত্রে তাঁহাদের নামের তালিকা ঝুলিত। তাঁহারা ভারতীয় পণ্য স্পর্শও করিতে পারিতেন না!

কোম্পানী বাহাদুর প্রাচ্যে বাণিজ্য করিতে লাগিলেন বটে কিন্তু সে কার্য্য নির্ব্বিবাদে সম্পন্ন হইত না। পর্ত্তুগীজ, দিনেমার প্রভৃতির সহিত তাঁহাদের অনেক কলহ ঘটিত। অবশেষে কাপ্তান হকিনস্ * জাহাঙ্গীর বাদশাহের নিকট হইতে আদেশ লইয়া সুরাটে স্থায়ী কুঠি নির্ম্মাণ করিয়া প্রাচ্যে ইংরাজ প্রতিষ্ঠার ভিত্তি সংস্থাপিত করিতে চেষ্টিত ছিলেন। ফিরিঙ্গি-বণিকগণ আপন স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য কিছু কালের নিমিত্ত বাদশাহের ফর্ম্মাণ উল্টাইয়া দিয়াছিল বটে, কিন্তু কালক্রমে ইংরাজই জয়ী হইয়াছিল। প্রাচ্যের দ্বীপপুঞ্জে ইতিপূর্ব্বেই কোম্পানী বাহাদুরের প্রসর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইংরাজ বণিকগণ ভারতবর্ষে আসিয়া এ দেশীয় বণিকদিগকে নানারূপে নিগৃহীত করিত। প্রাচ্যে স্থায়ী আবাস লাভ করিতে এই কারণেই কোম্পানী বাহাদুরের অনেক বিলম্ব ঘটিয়াছিল।

অবশেষে একদিন কাপ্তান টমাস্ বেষ্ট তপ্তী নদীর মুখে প্রবেশ করিলেন। ফিরিঙ্গিগণ কাপ্তানের সহিত বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল। ফিরিঙ্গির সহিত এক মাস ধরিয়া ইংরেজের নৌযুদ্ধ চলিল। মোগলবাহিনী তীরে দণ্ডায়মান থাকিয়া বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া দেখিল, যে ফিরিঙ্গিদিগকে তাহারা জলযুদ্ধে অজেয় ভাবিয়াছিল, ইংরাজ তাহাদিগকে প্রতিবার পরাজিত করিতেছে। ফিরিঙ্গির দুর্ভাগ্য! তাহারা শত বর্ষের অত্যাচারে ভারতবাসীর চক্ষে আপনাদের যে প্রবল শক্তির পরিচয় দিয়া এদেশে ভীতি উৎপাদন করিয়াছিল—এই এক মাসের জলযুদ্ধেই সে সমস্ত ব্যর্থ হইল! শতবর্ষের উদ্যোগে যে প্রতিষ্ঠা লাভ ঘটিয়াছিল, এক মাসেই সেই দৃঢ়ভক্তি-মন্দির বিচূর্ণ হইল—বাদশাহ শুনিলেন, ফিরিঙ্গি অপেক্ষাও পরাক্রান্ত একটী জাতি ভারতের উপকূলে আবাস স্থান ভিক্ষা করিতেছে—তাহারা ইংরাজ। তিনি ইংরাজের প্রার্থনা গ্রহণ করিলেন। অবিলম্বে সুরাটে ইংরাজের কুঠি নির্ম্মিত হইয়া

* ইনি মোগল সিংহাসনের ভুক্তিসাধনার্থ এদেশীয় রমণীর পাণি পীড়ন করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।

ইংরাজকে ভারতের অদৃষ্টের সহিত এক সূত্রে বাঁধিয়া দিল।

ইংরাজ ব্যাপারী তখন শতকরা ৩।০ টাকা মাত্র শুল্ক দিয়া ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে লাগিল। তাহারা নয় বার গমনা-গমনেই বুঝিতে পারিয়াছিল যে কোন ক্রমে ভারতবর্ষে বাণিজ্য আরম্ভ করিতে পারিলেই কুবেরের ভাণ্ডার হস্তগত হইবে। কেন যে ইংরাজ এরূপ বুঝিয়াছিল নিম্নলিখিত তালিকা দেখিলেই তাহা জানা যাইবে:—

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম নয় অভিযান।* (খ্রীঃ অঃ ১৬৩১-১৬১২)—

অভিযান সংখ্যা।	অভিযানের তারিখ। খৃঃ অঃ	মূলধন। (পৌণ্ড)	কত পৌণ্ড রপ্তানি হইয়াছিল।	কত পৌণ্ডের পণ্য রপ্তানি হইয়াছিল।	জাহাজ এবং খাদ্য দ্রব্যাদির ব্যয়।	কত খানি জাহাজ আসে।	শতকরা লাভ
১	১৬০১	৬৮৩৭৩	২১৭৪২	৬৮৬০	৩৯৭৭১	৪	৯৫
২	১৬০৪	৬০৪৫০	১১১৬০	১১৪২	৪৮১৫০	৪	ঐ
৩	১৬০৭	৫৩৫০০	১৭৬০০	৭২৮০	২৮৬২০	৩	২৩৪
৪	১৬০৮	৩৩০০০	১৫০০০	৩৪০০	১৪৬০০	২	পথে জাহাজ ধ্বংশ হয়।
৫	১৬০৯	১৩৭০০	৬০০০	১৭০০	৬০০০	১	২৩৪
৬	১৬১০	৮২০০০	২৮৫০০	২১৩০০	৩২২০০	৩	১২১ৡ
৭	১৬১১	৭১৩৭৫	১৯২০০	১০০৮১	৪২৫০০	৪	২১৮
৮	১৬১২	৭৬৩৭৫	১৭৬৭৫	১০০০০	৪৮৭০০	৪	২১১
৯	১৬১২	৭২০০	১২৫০	৬৫০	৫৩০০	১	১৬০

অদৃষ্টের ফেরে পড়িয়া পর্ত্তুগাল ১৬১২ খ্রীঃ অব্দে ইংলণ্ডের জন্য ভারত সমুদ্রে বাণিজ্য পথ সুপরিষ্কৃত করিতে বাধ্য হইয়াছিল—আপনার সৌভাগ্য-মন্দির ইংরাজের কামান হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। দশ বৎসর পর পারস্য উপসাগরেও ফিরিঙ্গিদিগের সেই অবস্থা ঘটিয়াছিল। তাই ১৬২২ খ্রীঃ অব্দে ভারতবর্ষে এবং পারস্য উপসাগরে ইংরাজের বাণিজ্য অবাধে চলিতে আরম্ভ করিল। আর কিছু কাল পর ফিরিঙ্গিগণ বুঝিয়াছিল যে ইংরাজও তাহাদের মত ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিবে, ইংরাজকে বাধা দিতে পারে এমন শক্তি তখন আর ছিল না।

বাণিজ্য ব্যাপারে দিনেমারদিগের সহিত যে সমরানল প্রজ্জলিত হইয়াছিল আম্বয়নার হত্যাকাণ্ডে সে অনলে পূর্ণাহুতি হইয়া গেল। দিনেমার কর্ত্তৃক নিষ্পিষ্ট হতভাগ্য ইংরাজ প্রবাসীদিগের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ সে দিন স্বর্গের সিংহদ্বারে বিচারপ্রার্থী হইয়াছিল—সেই আর্ত্তনাদের শেষ প্রতিধ্বনি স্তব্ধ হইতে না হইতেই শান্তি আসিল।

কোম্পানী বাহাদুর যখন ভারতবর্ষে দাঁড়াইবার জন্য একটুকু মাত্র স্থান পাইয়াছিলেন তখন হইতেই যে কি কৌশলে, কি পরিশ্রমে এবং কি অমানুষিক অধ্যবসায় বলে প্রতিদিন ভারতবর্ষে বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিলেন, সে কাহিনী নূতন না হইলেও

* History of British India—Hunter, vol. I, page 29.

একান্ত বিস্ময়পূর্ণ। ঘটনা-বহুল বাণিজ্য বিস্তার কাহিনী অতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা না করিয়া তাহার অন্তর্নিবিষ্ট গূঢ়নীতি উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখাইলে অনেক বিষয়ে জ্ঞান লাভ হইবে বলিয়া ভরসা করি। কোন উদ্যমশীল ঐতিহাসিক কি এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না?

ইংরাজ ও ফরাসী, ফিরিঙ্গি ও দিনেমার সকলেই ভারতবর্ষে লাভের লোভে আসিয়াছিল, কিন্তু ইংরাজের মত কেহই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। ফিরিঙ্গিগণ মনে করিয়াছিল তাহারা সমুদ্র-পথ অধিকার করিয়া থাকিবে—সে পথে অন্য কোন জাতিকে ভারতবর্ষে আসিতে দিবে না। সেই জন্য ফিরিঙ্গির দুর্গ নানাস্থানে জয়পতাকা উড্ডীন করিয়া বৈদেশিকদিগের হৃদয়ে আতঙ্কের সঞ্চার করিত। দিনেমারগণ ভারতের উপকূলস্থিত দ্বীপপুঞ্জ লইয়াই ব্যস্ত ছিল—অন্যদিকে মনোনিবেশ করিতে পারে নাই। ইংরাজ শেষে ভারতবর্ষ জয় করিয়া বসিল।

ফিরিঙ্গিগণ যখন প্রথমে আসিয়াছিল তখন নির্ব্বিবাদে প্রবেশাধিকার পায় নাই। উপকূলস্থিত নৃপতিবৃন্দের সহিত তাহাদিগকে অনেক যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। বহু শোণিত-পাত করিবার পর তাহারা ভারতের উপকূলে একাধিপত্য লাভ করিয়াছিল। দিনেমার-গণও বিনা আয়াসে দ্বীপপুঞ্জে প্রবেশ করিতে পায় নাই। দ্বীপাধিকারী নৃপতিবৃন্দের সহিত তাহাদিগকেও অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল।

ইংরাজ শতবর্ষ ধরিয়া পরাক্রান্ত মোগ-লের নিকট অনেক দণ্ড ভোগ করিয়াছিল—কখন চরণচুম্বন করিয়া কখন বা গলহস্ত প্রদান করিয়া—কখনও অর্থের জন্য গোল-কন্দার যুবরাজকে বন্দী রাখিয়া, কখনও বা গোলকন্দার নৃপতির জন্য পারশিক অশ্ব যোগাইতে প্রতিশ্রুত হইয়া, ইংরাজ ভারতবর্ষে প্রথমে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন।

ফিরিঙ্গিগণ ভারতের উপকূলে একাধি-পত্য লাভ করিয়াই তুষ্ট হইয়াছিল—দিনেমার গণ দ্বীপপুঞ্জে প্রবেশ করিতে পারিয়াই প্রীত হইয়াছিল; কিন্তু ইংরাজের আশা উচ্চ ছিল। ইংরাজ সমগ্র ভারতবর্ষের উপর লক্ষ্য রাখিয়াছিল। তাহারা শুধু বাণিজ্য করিতে আসে নাই—নবরাজ্য জয় করিতে আসিয়াছিল।

ফরাসীরা ভারতবর্ষে আসিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু কতদিনের জন্য? সেকালে এ দেশে অতি বিচক্ষণ সাহসী কুশলী ফরাসীবীরগণ আসিয়াছিলেন—সাহসে বা কৌশলে, শিক্ষায় বা কর্ম্মপটু-তায় তাঁহারা কেহই কোন ইংরাজ অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না, কিন্তু আজ ফরাসীর নাম কোন প্রকারে ভারতবর্ষে জীবিত রহিয়াছে, অথচ ইংরাজ এখন ভারতের রাজা। ইতি-হাস দেখাইয়া দিতেছে যে ফরাসীবীরদিগের পৃষ্ঠ রক্ষার্থ ফরাসীর সর্ব্বময় কর্ত্তার শক্তি নিয়োজিত হয় নাই—কিন্তু ইংরাজ বণিকের পশ্চাতে ইংলণ্ডেশ্বর স্বয়ং কৃপাণ, কামান ও কণক লইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন—য়ুরোপে ইংলণ্ডের প্রতিষ্ঠার সহিত ভারতে ও ইংলণ্ডের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ভারতবর্ষ-লাভ-ব্যাপারে ইংলণ্ডেরই রাজা ও প্রজা মিলিত হইয়া জাতীয় শ্রীবৃদ্ধির জন্য যত্ন করিয়াছিলেন—ফরাসী রা

ডিনেমারের এ সুযোগ ঘটে নাই বলিয়াই তাহারা ভারতবর্ষের হীরকখনির স্বর্ণ-সিংহদ্বার হইতে চিরকালের জন্ত উৎখাত হইয়াছে।

রাজা রামমোহন রায়।

শোক স্মৃতি জাগ্রত এবং জীবন্ত রাখিবার জন্যই শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। মরিলেই কিছু সম্বন্ধ যায় না। যে চির-বাঞ্ছিতের অভাবে ইহজীবন অন্ধকার হইয়া যায়, শ্রাদ্ধবাসরে তাঁহার গুণরাজি স্মরণ করিয়া লোকে ধন্য ও কৃতার্থ হইবে শ্রাদ্ধ তর্পণের ইহাও এক মুখ্য এবং মহান উদ্দেশ্য। রাজা রামমোহন রায়ের জীবিত কালে বাঙালী জাতি তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই। স্বদেশের দুর্দশায় ব্যথিত হইয়া বিদেশে, কত-কাল ভগ্ন-হৃদয়ে, মাতৃভূমির সেই কৃতীসন্তান আজিকার দিনে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়া-ছিলেন। ২৭শে সেপ্টেম্বর বাঙালীর জাতীয় শোকের দিন। স্বর্গীয় সুলেখক অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলিতে হয়, "আমাদের সেই মৃতা-শৌচ অদ্যাপি চলিতেছে এবং চিরদিনই চলিবে।"

রাজার চরিতাখ্যায়ক নগেন্দ্র বাবু বলেন, —"রামমোহন রায় কি? রামমোহন রায় মহা পণ্ডিত, রামমোহন রায় দার্শনিক, রামমোহন রায় ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ—যাহা কেন বল না, এরূপ কোন কথাতেই তাঁহার প্রকৃত ভাব প্রকাশ হয় না। এ দেশে ও জাতির সম্বন্ধে তাঁহার জীবনে যিনি বিধাতার হস্ত দর্শন করেন, তিনিই তাঁহাকে প্রকৃতভাবে দেখেন। রামমোহন রায় বিধাতার হস্তের যন্ত্র। রামমোহন রায় হইতে এ দেশে নবযুগের উৎপত্তি হইয়াছে। তাঁহার জীবনের বিশেষত্ব এই যে এ দেশের উন্নতির সকল দ্বার তিনিই উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্ম সমাজ সংস্কার, রাজ-নৈতিক সংস্কার, ইংরেজী শিক্ষা প্রচার, সতীদাহ নিবারণ, বহুবিবাহ নিবারণ চেষ্টা সকলেরই মূলে তিনি। তাঁহারই জীবন ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া ভারতের সর্ব্ববিধ কল্যা-ণের স্রোত বিধাতা প্রবাহিত করিয়া দিয়া-ছেন। ইংরেজী শিক্ষা ও ব্রাহ্মসমাজ একই সময়ে আরম্ভ হইয়াছে। রামমোহন রায় উভয়েরই মূলে। ইংরেজী শিক্ষা জঙ্গল উৎপাটিত করিয়া ভূমি পরিষ্কৃত করিয়া দিতেছে, ব্রাহ্মসমাজ বীজ বপন করিতেছে।"

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সর্ব্বতো-মুখী প্রতিভাবলে দেশের হিতার্থ বিবিধ উন্নতির দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া গিয়াছেন সত্য, কিন্তু সচরাচর লোকে তাঁহাকে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তয়িতা বলিয়াই জানে। দুর্ভাগ্যক্রমে ইহা সচরাচর স্বীকৃত হয় না যে ব্রাহ্মধর্ম্ম

হিন্দু ধর্ম্মেরই অন্তর্গত, হিন্দু ধর্ম্মেরই শ্রেষ্ঠাংশ মাত্র। খৃষ্টাব্দ ১৮১৮, ২১শে নবেম্বর রাজা জেমস্ পট্‌লি (James Pottle) সাহেবকে ইংরেজীতে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মকে পবিত্র ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন—

Having learnt from Dwarka Nath Tagore that sometime ago you kindly enquired about the institution lately established in Calcutta, professing the doctrines of pure Bramhonism, I feel induced to do myself the honor of presenting you with a copy of the translation of the first discourse delivered in the opening of the institution and to beg of your acceptance of it, as I am convinced from the philanthropic interest you always take in the welfare of the natives that you will encourage anything which you consider calculated to a ameliorate their condition and rescue them from destructive superstition.

গর্ডন সাহেবকে লিখিয়াছিলেন, "ষোড়শ বৎসর বয়সে আমি হিন্দুদিগের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলাম" * * পুনশ্চ, "আমার সমস্ত তর্ক বিতর্কে আমি কখন হিন্দু ধর্ম্মকে আক্রমণ করি নাই। উক্ত নামে যে বিকৃত ধর্ম্ম এক্ষণে প্রচলিত, তাহাই আমার আক্রমণের বিষয় ছিল। আমি ইহাই প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম যে ব্রাহ্মণদিগের পৌত্তলিকতা, তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের আচরণের ও যে সকল শাস্ত্রকে তাঁহারা শ্রদ্ধা করেন ও যদনুসারে তাঁহারা চলেন বলিয়া স্বীকার পান, তাহার মত বিরুদ্ধ।"

রাজার চরিতাখ্যায়ক বলেন, তিনি যে বেদাদি শাস্ত্রকে অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না, ইহা প্রতিপন্ন করিতে কিছুমাত্র আয়াস স্বীকারের আবশ্যকতা নাই। যাঁহারা স্থির নিশ্চয় করিয়াছেন যে রাজা রামমোহন রায় বেদাদি শাস্ত্রকে অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, তাঁহাদের সেরূপ বিশ্বাসের অবশ্য যুক্তি আছে। যুক্তি এই যে তিনি পৌত্তলিকদিগের সহিত বিচারে বেদাদি শাস্ত্রের প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারাই ব্রহ্ম জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। প্রত্যুত পৌত্তলিক মতাবলম্বীদিগের সহিত ধর্ম্মবিচারে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি বেদাদি শাস্ত্রের প্রমাণের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়াছিলেন।" অন্যত্র এইরূপঃ—"অসাধারণ পাণ্ডিত্য সহকারে তিনি হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধে ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে কি বেদ, কি স্মৃতি, কি পুরাণ, কি তন্ত্র সমস্ত শাস্ত্র একমাত্র অনাদি অনন্ত অপ্রতিম পরমেশ্বরকেই প্রতিপন্ন করিতেছে। এত কথা বলিয়াও কিন্তু রাজার জীবনচরিত লেখক স্বীকার করিতে প্রস্তুত নন যে তিনি হিন্দু-সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন! কেন না, "তিনি কখনই শাস্ত্র নিরপেক্ষ যুক্তির আশ্রয় লইয়া কোন ধর্ম্মাবলম্বীর সহিত ধর্ম্মবিচারে প্রবৃত্ত হইতেন না। হিন্দুর নিকটে বেদাদি শাস্ত্র, খৃষ্টানের নিকট বাইবেল এবং মুসলমানের নিকট কোরাণ অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহার নিজমত প্রচারের চেষ্টা করিতেন। "তোমার শাস্ত্র মিথ্যা" একথা তিনি কোন ধর্ম্মাবলম্বীকে কখন বলিতেন না। প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বীর নিকট স্বীয় স্বকীয় বিচার শক্তির

সাহায্যে তাঁহার অবলম্বিত শাস্ত্র হইতে সত্য সকল উদ্ধার করিয়া দিতেন।

রাজার প্রচারিত ধর্ম্ম বেদান্ত প্রতিপাদিত একেশ্বরবাদ নহে এবং নিজে তিনি হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না বলিলে তাঁহাকে যেন আমাদের পর পর মনে হয়। রাজা কখনই উপবীত ত্যাগ করেন নাই এবং ইংলণ্ডে তাঁহার মৃত শরীরেও যজ্ঞোপবীত দেখা গিয়াছিল। ইহাতেই মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে তিনি হিন্দু সমাজভুক্ত ছিলেন। বস্তুতঃ তিনি সর্ব্বশাস্ত্রের সারগ্রাহী উদার-হৃদয় হিন্দু ছিলেন। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী ছিলেন বলিয়াই ধর্ম্মশাস্ত্র মাত্রকে বিজ্ঞানের নিয়মে পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে "পরিস্ফুট হইলে উহা বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদের আকার ধারণ করে এবং হিন্দুজাতির বেদান্ত, য়িহুদী ও খৃষ্টানদিগের বাইবেল এবং মুসলমানদিগের কোরাণ এই তিন ধর্ম্মশাস্ত্রে একেশ্বরবাদ জাতীয় ইতিহাসানুরূপ জাতীয় আকারে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে।"

আমার বোধ হয় রাজা রামমোহন জীবনে যে সকল মহৎকার্য্য করিয়া গিয়াছেন তাহার মধ্যে কিছুই এই হিন্দু ধর্ম্মের সংস্কার তুল্য নহে। ভারতবর্ষের অতি দুর্দ্দিনে তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল। সেই দুর্দ্দিনে ইদানীন্তন কালে হিন্দু জাতিকে তিনিই সর্ব্বপ্রথমে শিক্ষা দিয়াছিলেন যে বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং নীতির ভিত্তির উপরে অদ্বৈত ঈশ্বরের কামনা প্রতিষ্ঠা না হইলে আমাদের শ্রেয় ও প্রকৃত কল্যাণের দ্বার উন্মুক্ত হইবে না, নানারূপে আমরা যখন অধঃপাতের শেষ সীমায় পতিত হইতে ছিলাম, তখন তিনি জাতীয় মানসনেত্র-সমক্ষে হিন্দু জাতির প্রকৃত উন্নত আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। বিস্ময়ে হিন্দুজাতি মানসচক্ষে দেখিতে পাইলেন, ব্রহ্মনিষ্ঠ মহর্ষিগণ গম্ভীর বেদগানে আকাশমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিতেছেন, তাঁহাদের পবিত্র আশ্রমভূমিতে পুরাকালে যে হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল, এখনও তাহা নির্ব্বাপিত হয় নাই।

কয় বৎসর পূর্ব্বে বীরভূমে প্রবাস কালে মধ্যে মধ্যে আমি মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ের বোলপুরস্থ শান্তিনিকেতনে ভ্রমণ করিতে যাইতাম। এই শান্তিনিকেতনের সপ্তপর্ণ বেদিকাতলে উপবেশন করিয়া কত সময়ে ভারতবর্ষের অতীত গৌরব স্মৃতিতে আকুল হইতাম আজ তাহা মনে পড়িতেছে। চারিদিকে সুবিস্তৃত শষ্পমণ্ডিত প্রান্তর; কচিৎ দূরে শৈলমালার নীলাভ রেখায় মিলিয়া গিয়াছে—মধ্যে উন্নত ভূমিখণ্ডের উপর মহর্ষির সেই আশ্রম বৈদিককালের গৌরব স্মৃতির স্তম্ভস্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে। কতবার দেখিয়াছি মহর্ষি হাফেজের মর্ম্মস্পর্শী কবিতামালা আবৃত্তি করিতে করিতে মত্ত হইয়া পড়েন, আর সেই হাফেজ আবৃত্তি করিতে অনুরোধ করিলে হাসিয়া বলেন, "হাফেজ আওড়াইলে যে দেওয়ানা হয়।" কিন্তু তাঁহার জীবনের আদর্শ সেই বৈদিক মহর্ষিগণ। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের প্রভাব চিরদিন তিনি অনুভব করিয়াছেন, স্বচক্ষে কিশোর বয়সে রাজার কার্য্য কলাপ দেখিয়া দেখিয়াও পরিণত বয়সে হিন্দুভাবে তিনি ভোর। তিনি

বলিয়াছেন "আমি প্রায়ই রাজার গাড়ীতে রাজার সহিত যাইতাম। কিন্তু রাজার সহিত আমার প্রায়ই কোনও কথাবার্ত্তা হইত না। আমি তাঁহার সম্মুখে বসিয়া তাঁহার সুন্দর মুখ দর্শন করিতাম। তাঁহার মুখের প্রতি আমি অতিশয় আকৃষ্ট হইতাম। আমি পুত্তলিকার ন্যায় স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতাম। কেবলই রাজাকে দেখিতাম। আমার হৃদয় এক প্রকার গভীর ও অবর্ণনীয় ভাবে পরিপ্লুত হইত। স্পষ্টই বুঝা যায় যে রাজার সহিত আমার কোন নিগূঢ় সম্বন্ধ ছিল! আমি সর্ব্বদাই তাঁহার প্রতি অতিশয় আকৃষ্ট হইতাম। তাঁহার কথাগুলি আমার পক্ষে গুরুমন্ত্র স্বরূপ হইয়াছিল। তাহা হইতেই আমি ক্রমে পৌত্তলিকতা ত্যাগ করিলাম। ঐ কথাগুলি এখনও যেন আমার কানে বাজিতেছে। আমার এই দীর্ঘ জীবনে ঐ কথাগুলি আমার নেতা স্বরূপ হইয়াছে।"

আর এক জনের কথা মনে পড়ে—ইনি স্বর্গীয় পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়। মহর্ষির কথায় "তিনি (রাজা রামমোহন রায়) যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া গিয়াছেন তাহা পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, তিনিও একজন অসাধারণ ব্যক্তি। তিনি পরমেশ্বরকে প্রীতি করিতেন এবং রাজা রামমোহন রায়কেও প্রীতি করিতেন। ঈশ্বরের প্রতি প্রেম এবং রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি প্রেম তাঁহার হৃদয়ে ও চরিত্রে একত্র জড়িত হইয়াছিল। ইহাতেই বুঝা যায় যে যে সময়ে ব্রাহ্ম সমাজ রক্ষা পাইবে বলিয়া কোন আশা ছিল না সে সময়ে তিনি কেবল অতুলনীয় নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সহিত ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়াছিলেন।" এই রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় হিন্দুভাবে অণুপ্রাণিত হন নাই ইহা বোধ করি বলিতে কেহ সাহস করিবেন না এবং রাজার ভাব তিনি যেমন বুঝিতেন এ কালের আমাদের তাহা বুঝিবার সম্ভাবনা নাই। ব্রাহ্ম সমাজের প্রথম উপাসনা পদ্ধতি এবং ব্যাখ্যান পাঠ করিয়া দেখিতে পাই, তাঁহারা সর্ব্বোতোভাবে বেদ বেদান্তের উপর নির্ভর করিয়াছেন, খ্রীষ্টিয়ান এবং মুসলমান ধর্ম্মের সত্য বিষয়ের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল বটে এবং তাহা থাকিবার কথা, কিন্তু কোথাও উপাসনায় তাহার ব্যবহার করেন নাই। মহর্ষির উক্তি কয়বার উদ্ধৃত করিয়াছি, আরো একবার করিতেছি। "রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় একখানি তক্তাপোষের উপর বসিতেন, শতরঞ্চের উপর চাদর বিছান থাকিত, তাহাতেই অন্য লোক বসিতেন। এক্ষণে সমাজ গৃহ সংস্কার হইতেছে। সংস্কার কার্য্য শেষ হইলে আমি পূর্ব্বের ন্যায় বন্দোবস্ত করিব। এই সকল বিষয়ে আমি রাজা রামমোহনের ন্যায় বন্দোবস্ত করিতে ইচ্ছা করিতেছি। ব্রাহ্ম সমাজকে আমরা ইংরেজদের গির্জ্জার ন্যায় করিয়া ফেলিয়াছি—ইহার সংশোধন হওয়া উচিত। উপাসনায় সময় জুতা বাহিরে রাখা উচিত। আমাদের সমাজকে ইংরেজদের গির্জার ন্যায় করা উচিত নহে।"

আমরা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলাম যে রাজা রামমোহন রায় হিন্দুশাস্ত্র অবলম্বন

করিয়া আমাদের মধ্যে বেদান্তানুগামী বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন এবং তিনি জীবনে ও ব্যবহারে সম্পূর্ণরূপে হিন্দু ছিলেন। এক্ষণে তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের দুই একটী কথা বলিব।

ষোড়শ বৎসর বয়সে প্রচলিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধে এক গ্রন্থ রচনা করিয়া রামমোহন গৃহ হইতে তাড়িত হইলেন। সাধারণত বাঙালীর ছেলে রাগ করিয়া মামার বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়া থাকে কিন্তু রামমোহন রায় হিমগিরি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক তিব্বৎ দেশে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানেও শান্তি নাই, বাঙালীর শিষ্ট শান্ত ছেলেটীর মত কেরাণীগিরিতে মন না দিয়া তিনি তিব্বতবাসীর শরীরী দেবতা যে লামা, তাঁহাকে এই সুবিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা মনে করা ভয়ানক কুসংস্কার অকুতোভয়ে ইহা প্রচার করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না। ইহার ফলে মধ্যে মধ্যে তিনি বিপদে পড়িতেন! তিব্বৎ বাসিনী রমণীগণের স্নেহ লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি সকল বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিয়াছিলেন।

এই নির্ভীকতা এবং আত্মসম্মান জ্ঞান রংপুরে চাকরী গ্রহণের সময়েও তাঁহাকে ত্যাগ করেন নাই। কলেক্টর জন ডিগ্‌বির অধীনে কেরাণীগিরি লাভ করিয়া রামমোহন রায় সাহেবের কাছে প্রস্তাব করিলেন যে তিনি কার্য্যের এই সঙ্গে একটা লেখাপড়া করিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া দিন যে যখন তিনি কার্য্যের জন্ত তাঁহার সম্মুখে আসিবেন, তখন তাঁহাকে আসন দিতে হইবে এবং সামান্ত আমলাদিগের প্রতি যে প্রকারে হুকুম জারি করা হয়, তাঁহার প্রতি সে প্রকার করা হইবে না। আস্পর্দ্ধা দেখুন একবার! এ কালের বড় বড় ডেপুটী এবং বৃহত্তর জজ বাবুদের সাহসে যাহা কুলায় না, কেরাণী রামমোহন কোন্ আক্কেলে জেলার কর্ত্তার কাছে এরূপ বেয়াদবি করিতে সাহসী হইয়াছিলেন? আমি নিশ্চয় বলিতে পারি আমার শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেরই মনের ভাব এইরূপ। কিন্তু নিজের মান চিরকাল নিজের কাছে—আমরা যে আত্মসম্মানে জলাঞ্জলি দিয়া "Your Honour" সার করিয়াছি, তাহার পরিণাম ঘৃণা ও বিদ্রূপ ছাড়া আর কিছু নহে। ধর্ম্মানুগত আত্ম সম্মান বোধ এবং স্বাধীনতাপ্রিয়তা প্রচুর পরিমাণে রামমোহন রায়ের ছিল বলিয়াই তিনি মনিব ডিগবি সাহেবকে সে প্রস্তাবে সম্মত করাইতে পরিয়াছিলেন এবং শেষে মানুষের মত মানুষ হইয়া বাঙালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন।

চল্লিশ বৎসর বয়সে গবর্ণমেণ্টের চাকরী ত্যাগ করিয়া রামমোহন ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় আসিয়া বাস করিলেন। আমরা এখনকার বাঙালীরা পেনসন লইয়া আবার একটা সবরেজেষ্টারী কি ম্যানেজারির ফিকিরে কলিকাতায় রাজদ্বারস্থ হই—কেন না, 'পোষা পাখী—পিঞ্জর খুলিলে চাহে পুনঃ প্রবেশিতে পূর্ব্ব কারাগারে।'—কিন্তু মহাত্মা রামমোহন রায় কি করিলেন? তাঁহার জীবনী-লেখক বলেন এখন হইতেই তাঁহার জীবনের কার্য্য প্রকৃতরূপে আরম্ভ হইল। তাঁহার সমুদয় অবকাশ ও অর্থ, শরীর ও মন, জন্মভূমির হিতসাধন ব্রতে

উৎসর্গ করিলেন। যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, তাঁহার অন্য কার্য্য ছিল না, অন্য চিন্তা ছিল না।"

ফলতঃ রামমোহন রায়ের নিজের চরিত্র অনুশীলন বাঙালী জাতির পরম শিক্ষার স্থল। যে সকল গুণের অভাবে আমরা দিন দিন মানুষের বাহির হইয়া পড়িতেছি, তাহা তাঁহার প্রচুর পরিমাণে ছিল। সত্যের প্রতি ঐকান্তিক বিশ্বাস ছিল বলিয়াই তিনি একাকী তাহার অটল ভূমির উপর দণ্ডায়মান হইয়া লোকের অত্যাচার এবং উপহাস, মনকষ্ট ও মানসিক ক্লেশ অবিচলিত চিত্তে সকলই সহ্য করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার অধ্যবসায়ের তুলনা হয় না। বাইশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত যিনি ইংরেজী আদৌ জানিতেন না, তাঁহার পরিণত বয়সের রচনা অতি বড় পণ্ডিতেরও বিস্ময় উৎপাদন করিত। সহমরণ প্রথা উঠিয়া গেলে তিনি গভর্ণর জেনারেলকে যে অভিনন্দন পত্র দিয়াছিলেন তাহা কাহার রচনা এই বিষয় লইয়া সেই সময়ে প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে তর্ক বাধিয়া গেল। কেহ কেহ ঠিক্ করিলেন ইহার লেখক রামমোহন নহেন, আডাম সাহেব। প্রসিদ্ধ ডেরোজিও ক্লাসে আসিয়া সকল শুনিলেন এবং ছাত্রদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তোমরা মানুষ না এই দেয়াল? নারীহত্যা দেশ হইতে উঠিয়া গেল, ইহাতে কোথা তোমাদের আনন্দ হইবে, না মিছামিছি তর্কে মত্ত! রামমোহন ইংরেজীতে কিরূপ সুপণ্ডিত, জান না বলিয়াই তোমরা ঐ অভিনন্দন পত্র আডাম সাহেবের লেখা মনে করিতেছ।" ইংলণ্ডে প্রবাস কালে হিতবাদ দর্শনের প্রণেতা বেন্থাম সাহেব রামমোহন রায়ের ইংরেজী রচনা প্রণালীতে মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, যদি আপনি লিখিয়াছেন বলিয়া আমার জানা না থাকিত, নিশ্চয়ই মনে করিতাম উহা কোন উচ্চদরের ইংরেজ গ্রন্থকারের লেখনী-প্রসূত! সেই পত্রে জেমস্ মিলের ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রশংসা করিতে করিতে বেন্থাম লিখিয়াছিলেন "যে লিপি প্রণালীতে জেমস্ মিল মহাশয়ের তুল্য এমত বলিতে পারি না!" ইংলণ্ডে রাজা যে সকল প্রবন্ধাদি লিখিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশ তাঁহার বাচনিক শুনিয়া অন্যের লেখা—যাহা তিনি অনর্গল বলিয়া যাইতেন, পরে ছাপিবার সময় তাহার আর বড় সংশোধনের প্রয়োজন হইত না। সত্যের অনুরোধে এখানে বলা উচিত যে তাঁহার ইংরেজী উচ্চারণ—প্রণালী তেমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ছিল না। ইংলণ্ডে তাঁহার সমসাময়িক সুলেখক ও সুবক্তাদের এইরূপ মত। সম্ভবত অধিক বয়সে এবং নিজের অন্য-নিরপেক্ষ যত্নে বিদেশী ভাষা শিক্ষায় এ দোষ সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা যায় না।

এই অধ্যবসায় ধর্ম্মভাবের ন্যায় তাঁহার চরিত্রের মেরুদণ্ড ছিল। তাঁহার জ্ঞানার্জ্জন-স্পৃহার অন্ত ছিল না, এবং সর্ব্বকার্য্যের মধ্যে সদা সর্ব্বদা ভগবানের নাম গ্রহণ করিতেও কখন তাঁহার ভুল হইত না। তাঁহাকে যখন তখন ভগবান স্মরণ করিতে দেখিয়া কুমারী হেয়ার এক দিন কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। রাজা উত্তর করিলেন ঐরূপে তিনি মনকে কলুষ চিন্তা হইতে

নিবৃত্ত রাখেন। কুমারী বলিলেন তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন না যে রাজার মনে কখন কোন পাপের ভাব উদয় হইতে পারে। রাজা বিনীত ভাবে কহিলেন—আমরা সবাই পাপী—সকলের মনেই পাপ চিন্তা উদ্রিক্ত হইয়া থাকে!

বিলাতে রাজার সম্মানার্থ সভায় বাউরিং সাহেব বলিয়াছিলেন, "রামমোহন রায়ের বিলাতে আসা যে কতদূর বীরত্বের কার্য্য তাহা ইয়ুরোপবাসীরা বুঝিতে পারেন না। যখন রুষ দেশের সম্রাট পিটর দক্ষিণ ইয়ুরোপের সভ্যতা শিক্ষা করিবার জন্য তথায় গমন করিয়াছিলেন—যখন তিনি তাঁহার রাজ সভার সম্মান পরিত্যাগ পূর্ব্বক সার্ডাম নগরে জাহাজ নির্ম্মাণ শিক্ষা করিতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার যে মহত্ত্ব প্রকাশ হইয়াছিল, তাহা তাঁহার বড় বড় যুদ্ধজয়েও হয় নাই; কিন্তু পিটরকে রামমোহন রায়ের ন্যায় কুসংস্কার পরাভব করিতে হয় নাই—কোন বাধা প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিতে হয় নাই; পিটর জানিতেন যে তাঁহার প্রজাবর্গ তাঁহার কার্য্যে তাঁহার ন্যায় উৎসাহী,—জানিতেন যে যখন তিনি দেশে ফিরিয়া যাইবেন, তাঁহার প্রজাগণ উৎসাহ প্রকাশ করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিবে। রামমোহন রায় পিটর অপেক্ষা কঠিনতর কার্য্য করিয়াছেন। তিনি ব্রাহ্মণ জাতির উচ্চতর সম্মানের অধিকারী হইয়াও যে কার্য্য করিতে সাহস করিয়াছেন, তাহা এ পর্য্যন্ত কেহই করে নাই। তিনি সাহস পূর্ব্বক যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা দশ বৎসর পূর্ব্বে লোকে সম্ভব বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিত না এবং এবং তজ্জন্য তিনি ভবিষ্যতে উচ্চতম সম্মান লাভ করিবেন।"

বাস্তবিক বিলাতগমন তাঁহার পুরুষকারের অতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বিলাতে তাঁহার ন্যায় সম্মান ও আদর অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। সেখানেও তিনি তাঁহার জাতীয় ভাব—হিন্দুভাব—কখন পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি যে ব্রহ্মনিষ্ঠ প্রাচীন মহর্ষিগণের সন্ততিধারা—এ আত্মমর্য্যাদা এক দিনের তরেও তাঁহাকে ত্যাগ করে নাই। বোধ হয় সেই জন্যই তিনি হৃদয়ের ন্যায় বাহ্যেও হিন্দু থাকিতে পারিয়াছিলেন—উষ্ণীষ ত্যাগ করিয়া "হ্যাট" পরিতে পারেন নাই! তাঁহার চরিতাখ্যায়ক বলিয়াছেন "বাস্তবিক তিনি আইন অনুসারে তাঁহার জাতি রক্ষা বিষয়ে সতর্ক থাকিতেন। তাঁহার মৃত শরীরে যজ্ঞোপবীত দৃষ্ট হইয়াছিল।" ইহার চেয়ে বলা ভাল যে হিন্দুভাব রক্ষা করা তিনি গৌরব জ্ঞান করিতেন—নহিলে সাতসমুদ্র পারে যজ্ঞোপবীত ধারণ করুন আর না করুন, কেহ দেখিতে যাইত না। কোনরূপ আত্মগোপনের তাঁহার প্রয়োজন ছিল না। সেই যজ্ঞোপবীত প্রবাসে তাঁহার হৃদয়ে বেদ বেদান্তের পবিত্র স্মৃতি জাগ্রত করিয়া রাখিত।*

---

* এই প্রবন্ধ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লেখক স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় কর্তৃক, মেদিনীপুরে, রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতি-সভায় পঠিত হইয়াছিল। বঃ সঃ

স্মরণে।*

১

সেই চির পুরাতন পথে কি গিয়েছ তুমি
হে কবি নবীন?
সেথা কি প্রকৃতি তোমা' আপনার অঙ্কে তুলি
লয়ে'ছে সে দিন?
তোমার অমর বীণা বাজাইতে যেই করে,
দিলে কার হাতে?
গাহি' উন্মাদনা গীত আর কোন্ ভাগ্যবান
আসিবে পশ্চাতে?

২

একদা আসিলে তুমি বন-বিহঙ্গের মত
মুক্তকণ্ঠে গাহি';
আকাশ, কানন, গিরি প্লাবি' উত্ত কল গীতে
ভয়-কুণ্ঠা নাহি।
সে দিনের সেই গীত প্রেমের মদির কণ্ঠে
লেগেছিল ভালো;
তীরে তরী,—নব যাত্রী—চারিদিকে বসন্তের
প্রভাতের আলো!

৩

তার পর দিলে কবি, বীণার ঝঙ্কার তব
ভূত কথা গাহি';
পতিতের তরে অশ্রু, অশ্রু, হায়, ভারতের
ভাগ্যপানে চাহি'।
গাহিলে অমর গীত— পলাশীতে ভারতের
ভাগ্য-বিপর্য্যয়!
অঙ্গে অঙ্গে করুণার বহাইলে মন্দাকিনী,
দ্রবিলে হৃদয়!

৪

জীবনের অপরাহ্নে গাহিলে উদাত্ত গান
মহাভারতের;—
কুরুক্ষেত্রে মহাশোক, গীতার অমৃত বাণী
কর্ত্তব্য-পথের।
ভক্তি-ভরে কৃষ্ণলীলা গাহিলে হে ভক্ত কবি,
ভাসি' প্রেমনীরে!
আজি কি পেয়েছ স্থান বাঞ্ছিতের পদাম্বুজে
গিয়া সেই তীরে!

৫

আজি গীত অবসান! অনন্তে উড়িয়া গেছে
বন-বিহঙ্গম;
ধ্বনিবে না কবি-কুঞ্জে সে কাকলী মধুস্রবা,
সে সুর পঞ্চম।
সে বীণা নীরব আজি, কে গাহিবে নব তানে,
কে দিবে ঝঙ্কার?
করুণ-কোমল কভু, কভু মেঘমন্দ্রে গুরু,
কে বাজাবে আর?

৬

আজি প্রিয় মূর্ত্তি তব মনে পড়িতেছে কবি,—
সুহৃৎ-বৎসল!
প্রেম-প্রীতি-ভরা সেই বালকের মত হাসি,
হৃদয় তরল।
ঊষার যুগল তারা উজল নয়ন দুটি
দ্রব করুণায়;
শত-স্মৃতি-মাঝে বসি' আজি যে তোমার তরে
করি হায়, হায়!

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।

৩০শে মাঘ, ১৩১৫।

---

* কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের মৃত্যুপলক্ষে।

সমালোচনা।*

সৃষ্টিতে সমালোচনা নাই তখন কেবল বিস্ময়, কেবল আনন্দ। বিশ্বব্যাপিনী তমসার কোলে প্রথম যে দিন জ্যোতিষ্ক-মণ্ডল একে একে বা যুগপৎ ভাসিয়া উঠিল, তখন কেহ সাক্ষীরূপে বর্ত্তমান থাকিলে তাঁহার চিত্ত অভাবনীয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইত, অবশ্য বিস্ময়ে অভিভূত হইত। জ্যোতিষ্কগণ স্থিতিশীল হইলে কি গতিশীল হইলে ভাল হয়, মাসরূপ বিহঙ্গের এক পক্ষ শুক্ল আর এক পক্ষ কৃষ্ণ হওয়াতে সুবিধা হইয়াছে কি অসুবিধা হইয়াছে, এ কথা ভাবিবার অবসর তখন সে কম্পিত চিত্তে স্থান পাইত না। তাহার পরে বিস্ময়ের নিবিড় গাঢ়তা ক্রমে যেমন অপনীত হইতে লাগিল, জীব যেমন বিশ্ব-যন্ত্রে আপনার স্থান চিনিয়া, আপনার সুখ-দুঃখে আপনার ভোগের মাত্রা বুঝিয়া, প্রথমে যাহা নিরবচ্ছিন্ন অনুগ্রহ ছিল তাহাতে আপনার একটা দাবি অনুভব করিয়া ভাল মন্দ বিচারের অবসর পাইল, তখন তাহার গায়ে একটা অতৃপ্তির বাতাস আসিয়া লাগিল, তাহার হৃদয়ে একটা সমালোচনার তাড়না স্ফুরিত হইয়া উঠিল। তখন বিস্ময় এবং আনন্দের বিপরীত ভাব হৃদয়কে অধিকার করিতে লাগিল, কেহ সৃষ্টি-কৌশলে অসামঞ্জস্য কল্পনা করিয়া নাস্তিক হইয়া উঠিল, কেহ বা—

> "স্বর্ণে ন গন্ধঃ ফলমিক্ষুদণ্ডে,
> নাকারি পুষ্পং খলু চন্দনস্য।
> বিদ্যাবিনোদী নহি দীর্ঘজীবী,
> ধাতুঃ পুরে কোঽপি ন বুদ্ধিদাতা॥"

বলিয়া আপনাকে বিশ্ব-স্রষ্টা হইতেও অধিক বুদ্ধিমান মনে করিতে লাগিল।

ভারতের (অথবা জগতের) আদি কবির কণ্ঠ হইতে প্রথম যে দিন ভারতী

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ"

বলিয়া নৃত্য করিতে করিতে বাহির হইলেন, তখন কবি নিজেই বুঝিবা আনন্দাতিশয্যে অভিভূত হইলেন, এবং বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চারিদিক্ চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "এ স্বর্গীয় ধ্বনি কিরূপে কোথা হইতে উত্থিত হইল!" সেই দিনের পর কত যুগ যুগান্তর অতীত হইয়া গিয়াছে, ইহার মধ্যে কত সালঙ্কৃত মাধুর্য্যগর্ভ কবিতার কত রূপ সমালোচনা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সেই প্রাচীন কবিতাটি পবিত্র মন্ত্রের ন্যায় সমালোচনার অতীত রহিয়া কণ্ঠে কণ্ঠে আজিও ধ্বনিত হইতেছে। ঈশ্বরের সৃষ্টি-কার্য্যের সমালোচনা হইয়াছে, কিন্তু বাল্মীকীর প্রথম কবিতার সমালোচনা আজিও হয় নাই।

শিশু মাতৃ-কুক্ষি হইতে ধরণীর কোলে অবতারিত হইয়াই এক অভিনব বিস্ময়ের রাজ্যে প্রবেশ করে। তখন তাহার নিকট সকলই নূতন, সকলই অপরিচিত, সকলই এক একটি বিস্ময়ের আকর। মাতা, ধাত্রী, সূতিকা-সঙ্গিনী, জল, বস্ত্র, গৃহ, দীপ-শিখা,— যাহার উপরে তাহার দৃষ্টি পড়ে, তাহাকেই

* রাজসাহীর গত সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত এবং বঙ্গদর্শনে প্রথম প্রকাশিত।

সে মনে মনে জিজ্ঞাসা করে, "তুমি কে?" তখন ভাল মন্দ বলিয়া তাহার জ্ঞান নাই, সুন্দর কুৎসিত বলিয়া তাহার বোধ নাই, খঞ্জ-কুব্জ-সুঠাম কলেবরে তাহার ভেদজ্ঞান নাই; তখন সে যাহা দেখে যাহা শুনে, তাহাই শোভন, মোহন, অপূর্ব্ব, বিস্ময়কর!

ক্রমে মানুষ, গরু, বিড়াল, কুকুর শিশুর পরিচিত হইতে লাগিল, ক্রমে বিস্ময়ের পরিধিও দূরে সরিয়া পড়িতে লাগিল। শিশু যে দিন প্রথম বাদ্য আবিষ্কার করিল—যে দিন তাহার হাতের বালা (খাড়ু) দুধের বাটীর কাণায় লাগিয়া বাজিয়া উঠিল, সে দিন তাহার কি যে আনন্দ, তাহার মুখভরা হাসি এবং পুনঃ পুনঃ সেই শব্দ উৎপাদন করিবার চেষ্টাই—সে বিষয়ের প্রমাণ। শৈশবের অনন্ত বিস্ময়-ব্যাপার অনন্ত বিস্মৃতি-সাগরে ডুবিয়া গিয়াছে; কিন্তু সর্ব্ব প্রথমে একখানি ছিন্ন শিশু-বোধকে ছাপার অক্ষরে গঙ্গার বন্দনা এবং গুরুদক্ষিণা পাঠ করিয়া যে আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলাম, উচ্চতম কাব্যে আজ অনুসন্ধান করিয়াও সে আনন্দ পাই না, একথা বলিলে অত্যুক্তি হইল বলিয়া মনে করি না।

নিরন্ন দরিদ্র আজ হটাৎ রাজ-ভোগের অধিকারী হইল;—যাহার শাকান্ন যুটিত না, আজ অসংখ্য উপকরণে সজ্জিত স্বর্ণথালী তাহার সম্মুখে উপস্থিত। সে যাহা মুখে দিতেছে, তাহাই তাহার রসনা উপাদেয় অমৃত বলিয়া গ্রহণ করিতেছে, আজ তাহার বাছিয়া খাইবার অবসর বা শক্তি নাই। কিন্তু কিছু দিন গেলেই আর সে অবস্থা থাকে না; তখন সে পক্কান্নে ঘৃতের দুর্গন্ধ পায়, সন্দেশের ভাল মন্দ বিচার করে, মিষ্টান্নের দোষ বাহির করিয়া দেয়।

এই দৃষ্টান্তগুলি চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে, কিছুরই আরম্ভে, বিরলত্বে বা একত্বে সমালোচনের অবসর নাই; যেখানে পরিণতি, বৈচিত্র্য এবং বহুত্ব বর্ত্তমান, সেখানেই সমালোচনা আসিয়া দেখা দেয়। আর একটুকু নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে, যেখানে বুদ্ধি-বৃত্তির পরিচালনা আছে, যেখানে পুরুষকারে-প্রদর্শনের অবসর আছে, যেখানে ভাল বা মন্দ করিবার স্বাধীনতা আছে, সেখানেই সমালোচনা চলে, অন্যত্র নহে। কৃত্রিমতাই সমালোচনার বিষয়, প্রকৃতি ইহার অধিকারের বাহিরে। প্রকৃতির কার্য্যে আলোচনা চলে, তত্ত্বানুসন্ধান চলে, কিন্তু সমালোচনা চলে না। সমালোচনার তিনটি অঙ্গ—প্রশংসা, নিন্দা এবং আদর্শ-নির্দ্দেশ; কিন্তু প্রকৃতির কর্ণ এই তিনেতেই বধির। সুতরাং প্রকৃতিকে ছাড়িয়া—সমগ্র বিশ্ব-ব্যাপারকে ছাড়িয়া—সমালোচনাকে কেবল মানবীয় কার্য্যাবলীর গণ্ডীর ভিতরে আশ্রয় লইতে হইয়াছে।

কিন্তু গণ্ডীর ভিতরে আছে বলিয়া যে সমালোচনাকে কাজ না পাইয়া অবসরে বসিয়া থাকিতে হইয়াছে, এমন নহে। মানবের কার্য্য যেখানে বর্ত্তমান, সমালোচনাও সেখানেই রহিয়াছে; মানবের কার্য্য যেমন অশেষ, সমালোচনাও সেইরূপ অশেষ মূর্ত্তিতেই প্রকাশ পাইতেছে! এমন কার্য্য নাই, যাহা একেবারে নিন্দা-প্রশংসা-বর্জ্জিত, যাহার একটা না একটা নিন্দা বা প্রশংসা না হইতে পারে।

মানবীয় কার্য্য অশেষ হইলেও তাহার মধ্যে কয়েকটিকে প্রধান বলা যাইতে পারে। ধর্ম্ম প্রধান বটে, কিন্তু ইহাকে গুণ বলিব কি কর্ম্ম বলিব বুঝি না; সম্ভবতঃ উভয়ই বলিতে হইবে। ধর্ম্ম কর্ম্ম হইলেও তাহা আধ্যাত্মিক সাধনের ব্যাপার; তাহার এক গুণ বাহিরে প্রকাশ পাইলে শতগুণ ভিতরে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া যায়, সুতরাং তাহার তলা না পাইয়া সেখানে সমালোচনা নিরস্ত নির্ব্বাক্ থাকে। বিজ্ঞান তত্ত্বান্বেষণে ব্যাকুল, মানবের জ্ঞান-ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করাই যেন তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। বিজ্ঞানের ভাগ্যে বিশ্রাম লেখা নাই; সে বহুদিনের অনুসন্ধানে যেমন একটি তত্ত্বলাভ করিল, অমনি আর একটি নূতন তত্ত্বের সংবাদ তাহার প্রাণে আসিয়া পঁহুছিল, সে আবার তাহার পেছনে পেছনে ছুটিল। এই অনুসন্ধানেই বিজ্ঞানের আনন্দ, বিশ্রামে তাহার মৃত্যু। বিজ্ঞান এইরূপে প্রাণপাত করিয়া যে তত্ত্ব সংগ্রহ করিতেছে, তাহাই মানব-জাতির স্থায়ী সম্পত্তি, তাহাই উন্নতির নিদান, তাহাই কার্য্যের নিয়ামক, এবং তাহাই কার্য্যের ভাল মন্দ বিচার করিবার মাপকাঠি। যে কার্য্য বিজ্ঞানের অনুমোদিত, তাহাতেই সাফল্যের আশা করা যায়; বিজ্ঞান-বিরোধী কার্য্য পণ্ডশ্রম মাত্র। বিজ্ঞানই যখন সমালোচক, অর্থাৎ কার্য্যের বিজ্ঞান-সম্মত বিচারই যখন সমালোচনা, তখন তাহার আলোচনা সম্ভাবিত হইলেও সমালোচনা সম্ভাবিত নহে। বিজ্ঞানের আলোচনায় ভ্রান্তি প্রবেশ করিতে পারে বটে, কিন্তু স্বয়ং বিজ্ঞান আবিলতাশূন্য অগ্নি-দ্রাবিত সুবর্ণের ন্যায় শ্যামিকাপরিবর্জ্জিত, বিশুদ্ধ। অগ্নি শীতল, এই কথা বলিলেই তাহার সমালোচনার প্রয়োজন; কিন্তু অগ্নিতে দাহিকাশক্তি আছে, একথা কেহ বলিলে যাহা বুঝি, নিজের মনে মর্ম্মে তাহাই অনুভব করি, সুতরাং ইহার আবার সমালোচনা কি? এ স্থলে বিজ্ঞান বলিতে আমি জড়-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান এবং অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান ইত্যাদি সমস্ত বিজ্ঞানই বুঝিয়া লইতেছি।

যাহাতে উদ্ভাবনী শক্তির পরিচালনা হয়, যাহাতে মানব-হৃদয়ের ভাব-সম্পদ্ প্রকাশিত, স্ফুরিত এবং অভিব্যক্ত হয়, যাহার সম্পাদনে কর্ত্তার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে, যাহা পাঁচজনে করিলে পাঁচ রকম হয় অথবা এক জনেই পাঁচ রকম করিতে পারে, যাহার উৎকর্ষাপকর্ষ কর্ত্তার শিক্ষা রুচি, উদ্দেশ্য, যোগ্যতা, আগ্রহ এবং অভিনিবেশের উপরে নির্ভর করে, এবং যাহার ফলাফল পরোক্ষভাবে বা প্রত্যক্ষভাবে সমগ্র সমাজের বা মানবমণ্ডলীর স্বার্থকে স্পর্শ করে, মানবের সুখ-সৌভাগ্যের পথকে প্রশস্ত করে, মানবের সৌন্দর্য্য-পিপাসাকে বর্দ্ধিত ও পরিতৃপ্ত করে, এমন সকল কার্য্যই সমালোচনার বিষয়ীভূত।

এ কথাগুলি ঠিক হইলে মানবীয় কার্য্যাবলীর অতি অল্প বাদে প্রায় সমস্তই সমালোচনার আমলে আসিয়া পড়ে। এমন কি, কে কিরূপে আহার করে, কে কি ভাবে চলে, কে কি প্রকারে কথা কহে ইত্যাদি বিষয়েরও সমালোচনা লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। সুতরাং নাম

করিয়া সমালোচ্য কার্য্যের অবধি নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। কিন্তু এ সমস্ত প্রকৃত সমালোচন পদের বাচ্য নহে। সাধারণতঃ কাব্যাদি সাহিত্য, চিত্র, সঙ্গীত, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য প্রভৃতি সুকুমার বিদ্যার যে সমালোচন তাহাই সুধী-সমাজে সমালোচনা বলিয়া পরিচিত, পরিগৃহীত, এবং সম্মানিত।

চিত্র, সংগীত প্রভৃতি বিদ্যার কিছুই জানি না; সুতরাং যাহা দেখি, যাহা শুনি, তাহাতেই বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া থাকি। যদি কেহ সংগীতচ্ছলে চেঁচাইতে থাকে, আমি মনে মনে বলি, "বাঃ! বেশ চেঁচাইতেছে, আমিত এমন করিতে পারি না!" বটতলার অমর কীর্ত্তি চিত্রকর স্বর্গীয় (সম্ভবতঃ এখন তিনি স্বর্গবাসী) নৃত্যলাল শীল মহাশয় আমাকে অনেক আনন্দ দিয়াছেন, বটতলার রামায়ণ মহাভারত পাইলে এখনও পাতা উল্টাইয়া ছবিগুলি দেখি। মধ্যে মধ্যে ঐ সকল ছবির হাতে মুখে লালরঙ্গের এক একটা পোঁছ দেখিয়া অর্থ বুঝিতে পারিতাম না, কিন্তু এখন বুঝিতে পারি, ঐ গুলি রঙ্গীন ছবি। সীতার বনবাসে পড়িয়াছিলাম, সীতা পঞ্চবটীর চিত্র দর্শনে বাস্তব দৃশ্য মনে করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন; এক এক বার মনে করিতাম, সে কি এইরূপ চিত্র? একবার কোথায় দেখিলাম, একটি ছবি হাত মেলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, কিন্তু হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি নিম্নদিকে চিত্রিত আছে; তথাপি ছবি দেখিবার লালসা ছাড়িতে পারিলাম না।

কিন্তু বিদ্বান্ হইবার দুরাশায় এক সময়ে কিছু লেখা পড়া শিখিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, আর নিরক্ষর হইয়া থাকা মানুষের স্বভাববিরুদ্ধ বলিয়া এখনও তাহারই নাড়া চাড়া করি, সুতরাং মাতৃভাষার সাহিত্যের সমালোচনা দেখিবার জন্য সময়ে সময়ে মনে বড়ই আকাঙ্ক্ষা হয়। যাহার দোষ গুণ জানি না, তাহার দোষ গুণ জানিবার আকাঙ্ক্ষা দূষণীয় নহে, কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, সে আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইবার কোন উপায় নাই। যাঁহারা বঙ্গভাষার প্রাণ-স্বরূপ যাঁহারা বাঙ্গালী জাতির গৌরব, যাঁহারা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশের শিক্ষাগুরু ও পথ প্রদর্শক, যাঁহারা এই সম্মিলনের অনুষ্ঠান দ্বারা বাঙ্গালীর বিক্ষিপ্ত মনীষাকে কেন্দ্রীভূত করিবার প্রশংসনীয় চেষ্টায় ব্যাপৃত আছেন, যাঁহাদের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা দিন দিন বাঙ্গালীর জাতীয় সাহিত্যকে সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর করিতেছে, তাঁহারাই যখন সমালোচনে উদাসীন, তখন বাঙ্গালীর জাতীয় সাহিত্যের এ অভাব কে দূর করিবে, এ আকাঙ্ক্ষা আর কে পূর্ণ করিবে?

শুনিয়াছি, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের একটা অবশ্য-প্রতিপাল্য নিয়ম আছে, তাঁহারা কোন জীবিত গ্রন্থকারের গ্রন্থ সমালোচনা করিবেন না। এ শুনা কথা, সত্য কি মিথ্যা তাহা জানি না; তবে এ কথা বোধ হয় সত্য যে, উক্ত পরিষদের পত্রিকায় কোন জীবিত গ্রন্থকারের গ্রন্থের সমালোচনা হয় না। যদি এরূপ কোন নিয়ম থাকে, তাহাকে নিন্দা করা যায় না, তাহার উদ্দেশ্যে কোন দোষ আরোপ করা যায় না। বঙ্গ-সাহিত্যের মহারথিগণ সমবেত হইয়া যে নিয়ম অবধারিত করিয়াছেন, তাহাতে ভুল ভ্রান্তির কল্পনা করিতে

পারে, এমন ধৃষ্ট বাঙ্গালীর অস্তিত্ব বোধ হয় নিতাই বিরল। কিন্তু মানুষের একটা স্বভাব এই, যে স্থলে কোন কার্য্যের হেতুবাদ দেখা যায় না, কে সেখানে একটা হেতু কল্পনা করিয়া লয়, একটা উদ্দেশ্য আবিষ্কার করিয়া বসে।

সর্ব্বত্র যেমন হইয়া থাকে, এক্ষেত্রেও সেরূপ হইয়াছে; যাহারা এই নিয়ম সম্বন্ধে চিন্তা করে, তাহারা স্পষ্ট কোন হেতুবাদ না পাইয়া একটা হেতু কল্পনা করিয়া লইতেছে। সেই কাল্পনিক হেতুটা এই।—যাঁহারা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভ্য, তাঁহারা প্রায় সকলেই সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত গ্রন্থকার-শ্রেণী-ভুক্ত। সমালোচনার ভার পরিষৎ গ্রহণ করিলে তাঁহাদিগের মধ্যেই পরস্পরের গ্রন্থ পরস্পরকে সমালোচনা করিতে হইবে। এরূপ করিলে এক প্রকার নিজের গ্রন্থ নিজেরই সমালোচনা করা হয়। এরূপ কাযে লাভ কি? বরং এখন লেখা হইয়া থাকুক, ভবিষ্যৎ বংশ সমালোচনা করিবে। আর একটা কথা এই, সমালোচনা করিতে বসিলেই দোষ প্রদর্শন করিতে হইবে, তখন লেখকের পক্ষ হইতে দোষকে গুণ বলিয়া সমর্থন আরম্ভ হইবে, তাহার ফলে বাদ-প্রতিবাদ হইতে মনোমালিন্য, মনোমালিন্য হইতে বিরোধ, বিরোধ হইতে পরিষদের বিনাশ! সমালোচনা হইতে যখন এতটা অনিষ্টের আশঙ্কা রহিয়াছে, তখন ইহাকে দূরে রাখাই ভাল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই হেতু প্রদর্শন কাল্পনিক মাত্র, কারণ যাঁহারা নিয়ম করিয়াছেন তাঁহারা এ বিষয়ে কিছু বলেন নাই, বলিয়া থাকিলেও আমি তাহা শুনি নাই। কিন্তু ইহাই যদি সমালোচন-পরিত্যাগের কারণ হয়, তাহা হইলে সে জন্য পরিষৎকে দোষ দেওয়া যায় না। কয়েক বর্ষের মাত্র বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ স্থাপিত হইয়াছে, ইহার মধ্যেই ইহা দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহার পরে যদি সমালোচনা আরম্ভ হয়, তাহা হইলে যত সভ্য তত ভাগ হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু বাঙ্গালী হইয়া কেহ এমন মারাত্মক কামনা করিতে পারে না। সাহিত্য-পরিষৎ বাঙ্গালী মাত্রেরই অতি আদরের জিনিস। ইহা বাঙ্গালী সাহিত্য-সেবকদিগের শক্তির একটা কেন্দ্র, দাঁড়াইবার একটা সাধারণ অধিষ্ঠান-ভূমি, ভ্রাতৃত্বের একটা বন্ধন-রজ্জু। চতুর্দ্দিক্ যখন ঝড় বৃষ্টি বজ্রপাতে ছিন্ন ভিন্ন, তখন ইহাই মাথা রাখিবার স্থান। সাহিত্যের জন্যই সমালোচন, সমালোচনের জন্য সাহিত্য নহে; যদি সমালোচন সাহিত্যের উপকার না করিয়া অপকার করিতে চায়—মূলোচ্ছেদ করিতে উদ্যত হয়, তবে এমন সমালোচন অবশ্যই চাই না! কোন কোন শাখাকে ছেদন করিয়াও যদি বৃক্ষকে বাঁচাইতে পারা যায়, বুদ্ধিমানের তাহাও কর্ত্তব্য।

কিন্তু এ বিপদের কি উদ্ধার নাই? এ সমস্যার কি একটা মীমাংসা হইতে পারে না? যেখানে এত প্রতিভার সম্মিলন, সেখানে কি "মরে সাপ না ভাঙ্গে নড়ি" রকমের একটা ব্যবস্থা হইতে পারে না—পরিষৎ না ভাঙ্গিয়া যায়, অথচ সমালোচন চলিতে থাকে, এমন কোন উপায় হইতে পারে না? আমার ত বোধ হয়, পরিষৎ

মনোযোগী হইলে ইহার একটা ব্যবস্থা করিতে পারেন। কোন কোন পরীক্ষায় নাকি নিয়ম আছে, কাগজে পরীক্ষার্থীর নাম ধাম কিছুরই উল্লেখ থাকে না, কেবল একটি সংখ্যা মাত্র থাকে, পরীক্ষক জানেন না তিনি কাহার কাগজ পরীক্ষা করিতেছেন; পরে যখন ফল বাহির হয়, তখন তাহা নামের সঙ্গে মিলাইয়া দেখা হয়। সমালোচন ছাড়িয়া দেওয়া অপেক্ষা এই প্রথা অবলম্বনে কি দোষ হয়? সমালোচনের জন্য একটি সমিতি গঠিত হইল, পুস্তকের আগা শেষ ছাঁটিয়া কেবল মূল গ্রন্থখানি সমালোচকদিগের হাতে দেওয়া গেল, এবং তাঁহারা সমালোচন করিয়া প্রবন্ধটি পরিষদের হাতে দিলেন; ইহাতে গ্রন্থকার জানিলেন না সমালোচক কে, সমালোচকও জানিলেন না গ্রন্থকার কে, অথচ সাধারণে গ্রন্থের দোষগুণ অনায়াসে জানিতে পারিল, জানিয়া উপকৃত হইল।

কেহ বলিতে পারেন, পূর্ব্বকালে সমালোচনা ছিল না, তাই বলিয়া কি প্রাচীন সাহিত্যের আদর কিছু কমিয়াছে? বর্ত্তমান প্রণালীর সমালোচন পূর্ব্বকালে ছিল না বটে, তবে সমালোচন যে ছিলই না, একথা বলা যায় না। কথিত আছে, মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ ন্যায়শাস্ত্র-সম্বন্ধে এক গ্রন্থ লিখিয়া আর একজন পণ্ডিতকে তাহা শুনাইয়াছিলেন; গ্রন্থ শুনিয়া পণ্ডিত তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে অত্যন্ত বিমর্ষ হইলেন। গৌরাঙ্গ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, তিনিও ঠিক ঐ বিষয়ে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন; কিন্তু গৌরাঙ্গের গ্রন্থ যখন এত উৎকৃষ্ট হইয়াছে, তখন সেই গ্রন্থই সকলে পড়িবে, তাঁহার গ্রন্থ কেহ পড়িবে না। গৌরাঙ্গ এই কথা শুনিয়া হাসিলেন, এবং সেই পণ্ডিতকে নিশ্চিন্ত করিবার জন্য তাঁহার নিজের গ্রন্থখানি তৎক্ষণাৎ গঙ্গাগর্ভে ফেলিয়া দিলেন। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, সে কালে যে কেবল সমালোচনা ছিল, এমন নহে, সেই সঙ্গে অসাধারণ উদারতা এবং অসীম স্বার্থত্যাগও ছিল। এখন সেরূপ উদারতা এবং স্বার্থত্যাগ আছে কি না, গ্রন্থকারগণ এবং সমালোচকবর্গই বলিতে পারেন। একজন ইংরাজ লেখক কবিদিগকে লড়াইয়ে মোরগের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন; আমার কিন্তু বোধ হয়, পশ্চিমা বাতাস এ দেশেও কিছু লাগিয়াছে।

প্রাচীন কালে বোধ হয় কেবল সমালোচন উপলক্ষ করিয়া প্রবন্ধ লিখিবার প্রথা বড় একটা ছিল না, টীকা-টিপ্পনীতে প্রসঙ্গ উপলক্ষেই সচরাচর নানা গ্রন্থকারের মতামত সমালোচিত হইত। তখন সমালোচনার বড় বেশী প্রয়োজনও হইত না, কেন না, গ্রন্থকারগণ জীবনব্যাপী অধ্যয়ন দ্বারা যে জ্ঞান উপার্জ্জন করিতেন, সারা জীবনের অভিজ্ঞতায় যে সত্য আপন হৃদয়ে উপলব্ধি করিতেন, তাহা নিজেই ধীর ভাবে সমালোচনা করিয়া, উপযুক্ত ভাষা, ভাব এবং অলঙ্কারে সজ্জিত করিয়া পাঠকের হৃদয়ে সঞ্চারিত করিবার চেষ্টা করিতেন, কাযেই তাঁহাদের গ্রন্থে অন্যের সমালোচনের জন্য তেমন অবকাশ থাকিত না। কিন্তু আজ কালকার এই ব্যস্ততার

দিনে, এই অভিনবতার যুগে সে ভাবের কি আশা করা যায়, না তাহা সম্ভব হয়? কার্লাইল এক স্থলে বলিয়াছেন, একখান ভাল গ্রন্থ লিখিতে বসিলে তাহাতে গ্রন্থকারের স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যায়, গ্রন্থ-সমাপনান্তে কিছু দীর্ঘকাল বিশ্রাম না করিলে গ্রন্থকার পুনরায় লেখনী-গ্রহণে সমর্থ হন না। আমাদের দেশে গ্রন্থকারদিগের মধ্যে কাহারও এ অবস্থা ঘটে কি না জানি না। কিন্তু অনেকের যে সেরূপ দুরবস্থা ঘটে না, ইহা তাঁহাদিগের লেখনীর অবিরাম গতি দেখিয়া বুঝিতে পারি। তাঁহাদের গ্রন্থ-বাহুল্য দেখিয়া অনেক সময়ে তাঁহাদিগকে চতুর্ভুজ বলিব কি দশভুজ বলিব ঠিক করিয়া উঠিতে পারি না। তাঁহাদের সকল গ্রন্থই যদি সমান সারবান্ হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের মস্তিষ্কের সবলতা অসাধারণ বলিতে হইবে। ভগবান্ করুন, তাঁহারা দীর্ঘজীবী হইয়া বঙ্গভাষাকে সমৃদ্ধিযুক্ত, বঙ্গসমাজকে উপকৃত, এবং বাঙ্গালী জাতিকে গৌরবান্বিত করিতে থাকুন।

কিন্তু প্রতিভার সম্ভব ত সর্ব্বত্র হয় না, বাঙ্গালীর মধ্যে প্রতিভাশালী লেখক আছেন বলিয়া আমার মত বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ গ্রন্থকার এদেশে জন্মিতে পারেন না, এ কথা ত কল্পনাই করা যায় না। প্রতিভার বাক্য অর্থের অনুসরণ করে না, অর্থই প্রতিভার বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে চলে, প্রতিভার উক্তির সমর্থন করিবার জন্যই সাহিত্যের আইন কানুন বা অলঙ্কার-শাস্ত্রের সৃষ্টি, এ কথা অবশ্য সত্য হইতে পারে; কিন্তু যাহাদের প্রতিভা নাই, পরিশ্রম আছে, সাহিত্য-সেবায় কি তাহারা অধিকার পাইবে না? অথবা অধিকারের অপেক্ষাই বা কে করে? তাহারা আপনাদের পথ আপনারাই প্রস্তুত করিতে জানে। পুস্তকের বিক্রয় ধরিয়া যদি সাহিত্য-বিস্তারের পরিমাণ অবধারণ করিতে হয়, তাহা হইলে আজিও বটতলার দাবী অগ্রগণ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

অবশ্য বিজ্ঞানকে পায়ে ঠেলিয়া ফেলিতে পারে, প্রতিভাও এমন সর্ব্বশক্তি-শালিনী নহে। বিজ্ঞানের একটা নিয়ম এই, কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বস্তুর বিস্তার যত বাড়ে, গভীরতা তত কমে। প্রতিভাশালী লেখক দিগের গ্রন্থসম্বন্ধে এ কথা খাটে কি না, তাহা তাঁহারা নিজেই বিচার করিয়া দেখিবেন, অন্যের কথার অপেক্ষা করিবেন না। কিন্তু আমি যে সমালোচনার প্রয়োজন মনে করিতেছি, তাহা এই দ্বিতীয় শ্রেণীর অ-প্রতিভ অর্থাৎ প্রতিভাবিহীন লেখক এবং সাধারণ পাঠকের জন্য। সমালোচনায় যে উপকার হয়, অনেক লেখকই তাহা প্রত্যক্ষ করেন। ইহা অতি স্বাভাবিক; নিজের দোষ সকল সময়ে নিজের চক্ষে পড়ে না, অন্যে দেখাইয়া দিলে তবে তাহা সংশোধন করিবার অবসর ঘটে। প্রতিভা যত বড়ই হউক না কেন, তাহার কার্য্যে দোষ থাকিতে পারে না, ইহা বলিলে মানুষকে পূর্ণপ্রজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু পণ্ডিতেরা বলেন, সৃষ্ট জীব পূর্ণপ্রজ্ঞ হইতে পারে না। যাহা হউক, প্রতিভাশালী লেখক সমালোচনের বাঁধাবাঁধি স্বীকার না করিলেও প্রতিভা যখন দুর্লভ সুতরাং প্রবলশালী

লেখকের স্থান এবং উপকারিতা যখন সমাজে আছে, তখন অন্ততঃ তাঁহাদের উপকারের জন্তও সমালোচনার একটা ব্যবস্থা থাকা উচিত। অনেকে পুস্তক লেখেন পুস্তক লেখার জন্ত—হৃদয়ের একটা অদম্য উত্তেজনাকে পরিতৃপ্ত করিবার জন্ত। নূতন পুস্তকের পাণ্ডুলিপি পড়িয়া গ্রন্থকারকে উপদেশ দেওয়া এবং গ্রন্থ-প্রকাশের উদ্যম হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে যাওয়া যে কি কঠিন ব্যাপার, তাহা যাঁহারা কখনও প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহারাই বুঝিয়াছেন। যদি সমালোচনার বহুল প্রচার থাকিত, তাহা হইলে অনেক লেখকই যথাকালে এবং যথা পরিমাণে সাবধান হইতে পারিতেন, নিজের যোগ্যতা বুঝিবার একটা সুযোগ পাইতেন। স্বর্গীয় বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দুই এক জনকে চাবুক মারিয়াছিলেন মাত্র; কিন্তু সেই চাবুক বঙ্গ-সাহিত্যের কত উপকার করিয়াছে, তাহা দেখিয়া কত জনের পৃষ্ঠ সাবধান হইয়াছে, তাহার পরিমাণ কে করিতে পারে? সময়ের একটা কথায় যত উপকার হয়, অসময়ের চাবুকেও তত উপকার করিতে পারে না। কলিকাতার নিকটস্থ কোন গ্রামে এক জন ভদ্রলোক আছেন, তাঁহার এক সময়ে সখ হইল, মদের কুল্পি খাইবেন। তখন তাঁহার ধনের অভাব ছিল না, সুতরাং ইচ্ছা মাত্র কলিকাতা হইতে বাড়ী পর্য্যন্ত বরফের ডাক বসিয়া গেল, প্রত্যহ পুঞ্জ পুঞ্জ বরফ আসিতে লাগিল, কুল্পি জমাইবার জন্ত অবিরাম উৎকট যত্ন চলিল, কিন্তু ক্রমাগত আট দিন যত্ন করিয়াও দেখা গেল, পোড়া মদ আর জমিল না। তখন একটি বন্ধুর নিকট তিনি আক্ষেপ করিলে বন্ধুটি এক কথায় বলিয়াছিলেন, "মদ জমে না।" আট দিন আগে এই কথাটা শুনিলে তাঁহার কত উপকার হইত! সমালোচনা বর্ত্তমান থাকিলে অনেক কথা তাহার মুখে শুনিয়া সময়ে সাবধান হওয়া যাইতে পারে।

গ্রন্থের সমালোচনা ভাবী বংশের জন্ত রাখিয়া না দিয়া গ্রন্থকারের জীবিত কালে হওয়াই ভাল,—ইহাতে তাঁহার নিজেরও লাভ, সমাজেরও লাভ! অতি অল্পসংখ্যক স্বভাব-সংগীত ছাড়া প্রায় সমস্ত সাহিত্যেরই উদ্দেশ্য সমাজের শিক্ষা, সমাজের অভাব-মোচন। সমাজের প্রয়োজন কি, তাহার সাধনে কোন্ উপায়টি প্রশস্ত, এবং সেই উপায়-প্রদর্শনে আমার যোগ্যতা কতটা, এই তিন বিষয়ে পরিষ্কার জ্ঞান থাকা গ্রন্থকার মাত্রেরই অপরিহার্য্য। সমালোচনের পথ উন্মুক্ত থাকিলে এই ত্রিবিধ জ্ঞানলাভ বটে। সহজ হয়, নিজের সর্ব্বজ্ঞতার উপর নির্ভর করিলে ততটা সহজ হয় না। অনেক কার্য্য এমন আছে, যাহার আরম্ভেই একটা পরিষ্কার ধারণা না থাকিলে জিনিসটা ত ভাল হয়ই না, সমালোচন দ্বারা পরে তাহার সংশোধনেরও সম্ভাবনা থাকে না। "এখন ত একটা গড়িয়া তুলি, পরে দোষ গুণ দেখিয়া সংশোধন করিয়া লইব," এই রূপ ধারণা লইয়া কাজ করিলে ড্রেড্‌নটের মত যুদ্ধ-জাহাজ বা তাজমহলের মত স্মৃতি-মন্দির কখনও নির্ম্মিত হইতে পারিত কিনা সন্দেহ। বরং তাহা ও সম্ভব—ড্রেড্‌নট বা তাজমহল

ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করা কষ্ট-সাধ্য হইলেও মানুষের পক্ষে অসাধ্য না হইতে পারে; কিন্তু একটা জাতীয় ভাষা একবার গঠিত হইয়া গেলে আবার তাহাকে ভাঙ্গিয়া পুনর্গঠন করা কঠিন ত বটেই, সম্ভব কি না তাহাই বিবেচ্য।

বঙ্গভাষা এখনও গঠনের অবস্থাতেই আছে; এ গঠনের ক্রিয়া কবে সম্পূর্ণ হইবে, কবে এই বিচিত্র প্রাসাদের উপরে চূড়া বসিবে, তাহা ত্রিকালজ্ঞ না হইলে কেহ বলিতে পারিবেন না। কিন্তু এখন যদি ইহাতে দোষ-বাহুল্য থাকিয়া যায়, এখনই যদি ইহার অঙ্গে অঙ্গে অপূর্ণতা প্রবেশ করে, তবে ভাষা একবার জমাট বাঁধিয়া গেলে আর তাহা দূর করিবার সুবিধা পাওয়া যাইবে না। ঝাঁটা-প্রয়োগে পার্থিব আবর্জ্জনা দূর হয় বটে, কিন্তু সাহিত্য দেহে যে আবর্জ্জনা একবার অঙ্গীভূত হইয়া যায়, তাহা দূর করিবার ঝাঁটা এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই; অস্ত্র-প্রয়োগে যে রোগীর জীবন নিরাপদ রহিবে, দৃঢ়তার সহিত এমন কথা বলিবার ডাক্তারও দেখি না। তবে ভরসা আছে, বর্ত্তমানের ন্যায় ভবিষ্যতেও বঙ্গীয় সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রতিভা জন্ম গ্রহণ করিতে পারেন, কেন না, "কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী।" কিন্তু ভবিষ্যতে যে সকল প্রতিভাশালী মহাপুরুষ জাতীয় সাহিত্যের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ লইয়া আবির্ভূত হইবেন তাঁহারা যে বর্ত্তমান যুগের প্রতি ঐকান্তিক অন্ধ-ভক্তির বশীভূত হইবেন, এখনকার সাহিত্যের ভাষা, ভাব এবং রীতিতে দোষ থাকিলে তাহা দেখিয়াও দেখিবেন না, প্রয়োজন বোধ করিলে নির্দ্দয়ভাবে ছুরি হাতে লইয়া তাহার দেহ ক্ষত বিক্ষত করিবেন না, তাহার প্রমাণ কি? বড় জোর না হয় ভক্তির আবেগে তাহার অঙ্গ স্পর্শ না করিলেন, বড় জোর না হয় প্রাচীন বলিয়া শ্রীপঞ্চমীর দিন পুষ্প চন্দনে গ্রন্থগুলির পূজা করিলেন; কিন্তু ইহাতেই কি বর্ত্তমান লেখকদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইবে? ইহার জন্যই কি এত আয়োজন, এত উদ্যোগ, এত কাণ্ড? যদি ভবিষ্যতেও এ দেশে প্রতিভার অভ্যুদয় হইবে বলিয়া বিশ্বাস থাকে, যদি বর্ত্তমান সাহিত্য দ্বারা বাঙ্গালীর আশা, আকাঙ্খা, শিক্ষা, সভ্যতা, চরিত্র এবং মনস্বিতাকে চিরদিনের জন্য পরিস্ফুরিত এবং পরিচালিত করিবার আশা থাকে, যদি ভারতের ভাষা-সমিতির মধ্যে আদর্শ, গাম্ভীর্য্য শক্তি, সৌন্দর্য্য, বৈচিত্র্য, মাধুর্য্য, ভাব-প্রবণতা এবং স্বাভাবিকতার নিমিত্ত মাতৃ-ভাষার জন্য উচ্চ সিংহাসন রচনা করিয়া রাখিয়া যাইবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে বৈচিত্র্যের মধ্যে শৃঙ্খলা আনিতে হইবে, স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া একতা স্থাপন করিতে হইবে, স্বেচ্ছাচারকে সংযত করিয়া বিজ্ঞানের আদেশের নিকট মস্তক নত করিতে হইবে। ইহা করিতে হইলেই সমালোচনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। যাহাতে বহুলোকের কর্তৃত্ব এবং অধিকার রহিয়াছে, যাহার সম্পাদনে এবং উন্নতি বিধানে বহুলোকের সাহচর্য্য একান্ত অনিবার্য্য, একতা এবং শৃঙ্খলতার অভাবে তাহা কখনই কোথাও সুসম্পাদিত হয় নাই, হইবেও না, এই একতা এবং শৃঙ্খলা কেবল বিজ্ঞানই

দিতে পারে, আর সমালোচনাই সাহিত্যের সেই বিজ্ঞান।

প্রতিভা কেবল লেখকেরই থাকে, পাঠকের থাকিতে পারে না, এমন নহে। পাঠকের মধ্যেও প্রতিভাশালী লোক অনেক থাকেন, এবং লেখনী হাতে লইলে তাঁহারাও সাহিত্য সমাজে উচ্চাসন অধিকার করিতে পারেন; তবে কেহ বা অবসর ও রুচির অভাবে, আর কেহ হয় ত কালির আঁচড়ে লক্ষ্মী অসন্তুষ্ট হইবেন মনে করিয়া লেখনী গ্রহণ করেন না। যাহা হউক, পাঠকের প্রতিভা না থাকিলেও চলে, কেহ ইচ্ছা করিলে সাধারণ বুদ্ধি লইয়া পরিশ্রম করিলে গ্রন্থকারও হইতে পারেন; কিন্তু বিনা প্রতিভায় পরের বুদ্ধি ধার করিয়া সমালোচক হওয়া যায় না। সাধারণ বুদ্ধিতে গালাগালি ঝাল ঝাড়া, বিদ্বেষ প্রকাশ এবং বিদ্রূপ তামাসা চলিতে পারে, কিন্তু প্রকৃত সমালোচনা চলিতে পারে না। সমালোচক সাহিত্য-রাজ্যের শাসক, বিচারক এবং বিধি-প্রবর্ত্তক। তাহাকে প্রতিভার উপরেও প্রভুত্ব করিতে হইবে, প্রাকৃতিক বৈষম্য ও বৈচিত্র্যের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, সে নিজে প্রতিভাসম্পন্ন না হইলে সেরূপ সূক্ষ্ম দৃষ্টি, সেরূপ নিরপেক্ষতা, সেরূপ সহানুভূতি, সেরূপ ন্যায়পরতা, এবং যুগপৎ লেখক ও পাঠকের হৃদয়ে প্রবেশ করিবার সেরূপ ক্ষমতা কোথায় পাইবে? আর তাহা যদি না থাকে তাহা হইলে অযোগ্য বিচারকের বিচার-বিভ্রাট দেখিয়া তাহার প্রতি সাধারণের মনে যেমন ঘৃণা ও অনাস্থা জন্মে, এই রূপ সমালোচনের প্রতিও পাঠক-সমাজের সেই ভাবই জন্মিয়া থাকে।

এই জন্যই সুধী-সমাজে, বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবকদিগের এই সম্মিলন-সভায় সমালোচনের কথাটা তুলিবার প্রয়োজন মনে করিয়াছি। সমালোচনের প্রয়োজন ইহাঁরা উপলব্ধি না করিলে আর কে করিবেন? আবার, সমালোচনে যেরূপ প্রতিভার প্রয়োজন, তাহার প্রত্যাশা কেবল ইহাঁদের নিকটই করি; ইহাঁরা যদি এই অত্যাবশ্যক কার্য্যের ভার গ্রহণ না করেন, তবে এমন যোগ্য পাত্র আর কোথায় পাইব, আর কে উপযুক্ত শক্তি লইয়া বঙ্গীয় সাহিত্য-তরণীর কর্ণধার হইয়া দাঁড়াইবে?

সত্য মিথ্যা জানি না, সমালোচন আরম্ভ হইলে সাহিত্যিক সভা সমিতিগুলি আত্ম-বিরোধে ভাঙ্গিয়া যাইবে বলিয়া বাস্তবিকই যদি কোন আশঙ্কা থাকে, তাহা নিবারণ করিতে যতটুকু প্রতিভার প্রয়োজন, প্রয়োগ দ্বারা তাহার সার্থকতা সম্পাদন করুন। যে অবস্থা যত প্রতিকূল, প্রকৃষ্ট উপায় দ্বারা তাহাকে বশে আনিয়া ততদূর অনুকূল করাই প্রকৃত প্রতিভার কার্য্য। প্রকৃত-প্রতিভাশালী লেখক নিজের দোষ দেখিলে আনন্দিত না হইয়া ক্রুদ্ধ হইবেন, অথবা বুঝিতে না পারিয়া কেহ ভ্রান্ত মত প্রকাশ করিলে তাহার প্রতি খড়্গহস্ত হইবেন, এ কথা মনে করাও যেন প্রতিভার অবমাননা বলিয়া মনে করি। গ্রন্থ যত দিন লিখি, তত দিনই আমার; কিন্তু যে দিন উহা প্রচার করিলাম, যে দিন উহা একটা স্বতন্ত্র নাম-রূপে চিহ্নিত হইয়া পাঠকের

নিকট উপস্থিত হইল, সে দিন হইতে উহা জাতীয় ভাণ্ডারের সম্পত্তি, জাতীয় জনসাধারণের উহাতে সম্পূর্ণ এবং অবিসম্বাদিত অধিকার। যদি কেহ অনুগ্রহ করিয়া আমার গ্রন্থের সমালোচনা করেন, এবং যে সকল দোষ আমার চক্ষে পড়ে নাই তাহা দেখাইয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহার উপর বিরক্ত না হইয়া, বরং তিনি যে আমি জীবিত থাকিতে দোষ-সংশোধনের এই সুযোগটা উপস্থিত করিলেন, এ জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হওয়াই উচিত। আমার মত ক্ষুদ্র বুদ্ধি যে উপকার বুঝিতে পারে, প্রতিভা তাহা দেখিতে পায় না, এ কথা বিশ্বাস যোগ্য নহে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, অনেক সময়েই ইহা ঘটিতে দেখা যায়, অনেক স্থলেই প্রতিভার অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পায়। ছাত্রাবস্থায় একবার একজন ইংরাজ কবির কয়েকটি কবিতা পাঠ্য ছিল। কবিতাগুলি ভালরূপে বুঝিবার জন্য তাঁহার জীবন-চরিত খানি একবার পড়িতে হইল। কিন্তু জীবন-চরিত পড়িতে যাইয়া দেখি কবি নিয়ত আত্মসমর্থনেই ব্যস্ত; কোথায় কে তাঁহার কবিতার কি নিন্দা করিল, সর্ব্বদাই যত্ন সহকারে তাহাই সংগ্রহ করিতেছেন, এবং অনন্তকর্ম্মা হইয়া তাহারই প্রতিবাদে লেখনী চালনা করিতেছেন! তাঁহার সে সকল বাদ-প্রতিবাদ কিছুই মনে নাই; কিন্তু তাঁহার কবিতা এখনও পড়িতে ভাল লাগে। পত্র লিখিয়া তাহা পড়িয়া বুঝাইবার জন্য সেই পত্রের সঙ্গে যাওয়া যেমন, তাঁহার এই ব্যবহারও সেই রূপ মনে করিয়া হাসি পাইত। অবশ্য কোন নূতন গ্রন্থ বাহির হইলে পাঠক-সমাজে তাহা লইয়া বাদ প্রতিবাদ গ্রন্থকারের পক্ষে অতীব সুখ এবং সৌভাগ্যেরই বিষয়; কিন্তু স্বয়ং গ্রন্থকারের পক্ষে সেই বাদ-প্রতিবাদে যোগ দেওয়া, অথবা ইন্দ্রজিতের ন্যায় নিজে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া প্রতিশোধের জন্য বাণ নিক্ষেপ করা, এ উভয়ই তেমন গৌরবাস্পদ বলিয়া বোধ হয় না।

বলিয়াছি, নিন্দা, প্রশংসা, এবং আদর্শ নির্দ্দেশ, এ তিনই প্রকৃত সমালোচনের কার্য্য। কিন্তু অনেকেরই ধারণা, সমালোচনের অর্থই কেবল নিন্দা, কেবল ভর্ৎসনা কেবল বিদ্রূপ। এই ধারণা আছে বলিয়াই গ্রন্থকারেরা সমালোচনার নামে শিহরিয়া উঠেন এবং কেবল বিজ্ঞাপনদাতার সমালোচনেই পরিতৃপ্ত থাকা নিরাপদ মনে করেন। এরূপ ভয়ের যথেষ্ট কারণ ও আছে। গ্রন্থের দোষ থাকিলে তাহা এরূপ ভাষায় এরূপ ভাবে দেখাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, যাহাতে লেখকের হৃদয় কিছুমাত্র ব্যথা না পায়। কিন্তু অনেক স্থলে সমালোচনা পড়িলে বোধ হয়, দোষ প্রদর্শন একটা উপলক্ষ মাত্র, গ্রন্থকারের হৃদয়ে যন্ত্রণা উৎপাদন করাই যেন প্রধান উদ্দেশ্য। সুস্থদেহে একটা বিস্ফোটক জন্মিলে সুনিপুণ অস্ত্র-চিকিৎসকের কর্ত্তব্য, এমন ভাবে অস্ত্রটি প্রয়োগ করা, যাহাতে রোগী কিছুমাত্র যন্ত্রণা অনুভব না করে; এই যন্ত্রণা পরিহারের জন্য কত রকম বোধ-হারক ঔষধেরও আবিষ্কার হইয়াছে। কিন্তু একটি বিস্ফোটকের চিকিৎসা করিতে যাইয়া চিকিৎসক যদি রোগীর সর্ব্বাঙ্গ কাটিয়া ক্ষত বিক্ষত

করেন, তাহা হইলে রোগী কি চিকিৎসককে আশীর্ব্বাদ করিবে, না এরূপ চিকিৎসা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয় মনে করিবে? বাক্যাঘাতের যন্ত্রণা যে অস্ত্রাঘাতের যন্ত্রণা হইতে কিছু ন্যূন, এমন কথা মনে করি না। যিনি সমালোচকের উচ্চাসন গ্রহণ করিবেন, তাঁহাকে বিশেষ সাবধানতার সহিত রোগীকে বাঁচাইয়া রোগ সারাইতে হইবে, আপনার প্রত্যেক বাক্যের সমালোচনা আপনাকেই করিতে হইবে। আবার এমনও দেখা গিয়াছে, যথেষ্ট মিষ্ট ভাষায় সমালোচনা করিলেও গ্রন্থকার বিরক্ত হন। এরূপ গ্রন্থকার হয়ত মনে করেন, তিনি ভুল ভ্রান্তি এবং সমালোচনার অতীত। কিন্তু যে প্রশংসা ব'ই নিন্দার নাম শুনিতে পারে না, তাহার উন্নতি সমাপ্তি-বিন্দুতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে বালকই হউক আর বৃদ্ধই হউক, তাহার আর জ্ঞানের পথে অগ্রসর হইবার আশা নাই। যাহার অনিষ্ট করিবার ইচ্ছা থাকে তাহাকে নিরাবিল প্রশংসা শুনাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। যদি ততদূর নীচে নামিবার শক্তি না থাকে, নীরব হইয়া থাকা ভিন্ন উপায় নাই। ভাষার ওজন এবং ভাবের মাত্রা ঠিক রাখিয়া সমালোচনা করা বড় কঠিন ব্যাপার। অত্যন্ত সাবধান হইতে না পারিলে নিন্দার সময়ে সেই ওজন এবং মাত্রা লক্ষ্যের নিম্নে নামিয়া যায়, এবং প্রশংসার সময়ে তাহার ঊর্দ্ধে উঠিয়া পড়ে! বহু বৎসর হইল কোন সাপ্তাহিক কাগজে একখানি কাব্যের সমালোচনা পাঠ করিয়াছিলাম, সে কথা এখনও মনে আছে, সমালোচক কবিকে একেবারে সপ্তম স্বর্গে তুলিয়াছেন, এবং তাঁহার উক্তির সমর্থনের জন্য কাব্যের অনেকগুলি অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। সমালোচন পড়িয়া হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়; যাহা উপলক্ষ করিয়া সমালোচন লিখিত, অতি আগ্রহের সহিত সেই উদ্ধৃতাংশ পড়িতে যাই; কিন্তু পড়িয়া বুঝিতে পারিনা, সমালোচক মহাশয় কেন এত বাক্যব্যয় করিলেন। একবার মনে করিলাম, বুঝি ইহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ আছে। কিন্তু দুই তিনবার প্রবন্ধটি পড়িয়া তাহার ও কোন আভাস পাইলাম না। তখন এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিলাম যে, ইহার মূলে হয় সমালোচকের লিপি-চাতুর্য্য প্রকাশের অভিলাষ, আর না হয় কবি যতটা বড় নহেন তাঁহাকে ততটা বড় দেখাইবার প্রয়াস বর্ত্তমান। নিন্দাতেই হউক আর প্রশংসাতেই হউক, মাত্রা অতিক্রম করা কিছুতেই সঙ্গত নহে, অতিরঞ্জন কোন পক্ষেরই উপকার করে না। সুধীগণ অগ্রসর না হইলে, প্রতিভা-স্পর্শে ইহাকে পরিশোধিত না করিলে, সমালোচন কখনও সাহিত্যের উপকার করিতে সমর্থ হইবে না।

কেহ কেহ মনে করেন, কেবল দোষ ঘোষণা করিলেই সমালোচনের কার্য্য শেষ হইল, গুণ-কীর্ত্তনে লাভ কি? কিন্তু বাস্তবিক গুণেরও সমালোচনের প্রয়োজন আছে। কাব্যের সৌন্দর্য্যে সকলের হৃদয়ই আকৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু যে যে পরিমাণে বুঝে, সে সেই পরিমাণেই আকৃষ্ট এবং উন্নত হয়। কেবল কাব্য কেন, সাহিত্যের অনেক অঙ্গই সকলে সমান ভাবে এবং একরূপে

বুঝে না। বুদ্ধি অনুসারে বুঝিবার তারতম্য ত আছেই, তা ছাড়া শিক্ষা, দীক্ষা, রুচি, প্রবৃত্তি, সংসর্গ, আলোচনা এবং অভিনিবেশের তারতম্যানুসারে একই কথা ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে বুঝে। কোন কোন তীর্থযাত্রী স্বাধীন ভাবে স্বৈরগতিতে নানা তীর্থ, নানাদেশ ভ্রমণ করে, সাথীর অপেক্ষা রাখে না; কিন্তু অধিকাংশ যাত্রীই সাথীর উপরে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে, সাথী যেখানে লইয়া যায় সেখানেই তাহারা যায়, সাথী যাহা দেখায় তাহাই তাহারা দেখে, সাথী যাহা জানায় তাহাই তাহারা জানে,—সাথী ছাড়া এক পদও তাহারা অগ্রসর হইতে সাহস পায় না। পাঠকদিগের মধ্যেও এইরূপ দুইটি শ্রেণী আছে; এক শ্রেণীর পাঠক আপনা আপনি সাহিত্য-কাননের সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া স্বাধীনভাবে বিচরণ করেন, আর এক শ্রেণীর পাঠক সাথী অর্থাৎ সমালোচকের কাঁধে ভর দিয়া চলেন। সাথী না থাকিলে যেমন অধিকাংশ যাত্রীরই তীর্থ-দর্শন ঘটে না, কেহ বুঝাইয়া দিবার না থাকিলে সেইরূপ এই দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠকের পক্ষেও সাহিত্য-সৌন্দর্য্য বুঝিবার চেষ্টা ঘটিয়া উঠে না, সুতরাং তাঁহারা সাহিত্য-পাঠের ষোল আনা ফল লাভ করিতে পারেন না। যাঁহারা ছাত্র-চরিত্রের সঙ্গে পরিচিত আছেন, তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, এক শ্রেণীর ছাত্র আছে, যাহারা পাঠ্য বিষয় আগে নিজেই বুঝিবার চেষ্টা করে, কেবল যেখানে বুদ্ধি একেবারেই প্রবেশ করে না, সেইখানেই টীকাটিপ্পনী মিলাইয়া দেখে; আর এক শ্রেণীর ছাত্র আছে যাহারা প্রত্যেক বাক্যটি পড়িয়াই টীকার পুস্তক খুলে, নিজে নিজে বুঝিবার জন্য একবার চেষ্টা করিয়াও দেখে না। এইটি হইল অভ্যাসের কথা; আর বুদ্ধি এবং শিক্ষার অল্পতা যাহাদের আছে, তাহাদিগকেও কাজে কাজেই অন্যের উপরে নির্ভর করিতে হইবে। সুতরাং অর্থ, ভাব, এবং সৌন্দর্য্য বুঝাইবার জন্য সমালোচনের বিশেষ প্রয়োজন। বঙ্গ ভাষায় কত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিত হয়, কিন্তু সমাজে তাহার আশানুরূপ ফল দৃষ্ট হয় না। বুঝাইবার লোকের অভাব—প্রকৃত সমালোচনের অভাবই কি তাহার একটা কারণ নহে?

দোষ উদ্ঘাটন হইতে সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ আরও কঠিন; আবার আদর্শ নির্দ্দেশ সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। যে সমালোচনা এই সকল কার্য্য সম্পাদন করিতে যত দূর সমর্থ তাহা সেই পরিমাণে উৎকৃষ্ট।

আদর্শ-প্রদর্শন কেবল উপদেশে হয় না। সত্যবাদী হও, এ একটা নীরস নির্জ্জীব মাধুর্য্য বিহীন উপদেশ কাহারও প্রাণকে স্পর্শ করিতে পারে না, তাহার প্রভাবে গঠিত এবং পরিচালিত করিতে পারে না। কিন্তু ঐ উপদেশই যখন নল, হরিশ্চন্দ্র, দশরথ প্রভৃতির চরিত্রে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে, যখন সত্যকে উজ্জ্বল করিবার জন্য তাহার পশ্চাতে একটি রক্তমাংস-সৌন্দর্য্যময় জীবন্ত উদাহরণ আসিয়া দাঁড়ায়, তখন বাস্তবিকই অন্ততঃ ক্ষণকালের নিমিত্তও সত্যের উজ্জ্বল জীবন দিতে পারিলে জন্ম সার্থক বোধ হয়।

আদর্শ দেখাইবার, সুতরাং শিখাইবার

দুইটি উপায় আছে; প্রথমতঃ কাব্যাদিতে চিত্রিত চরিত্রগুলির বিশ্লেষণ দ্বারা মনস্তত্ত্বের সূত্রগুলি, মানবীয়কার্য্যের উৎসগুলি, মানবীয় ভাব-কুসুমের বৃন্ত-দল-কেশরাদি খুলিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে এক একটি চক্ষের সম্মুখে ধরা; আর দ্বিতীয়তঃ সেই সকল সামগ্রী উপাদান স্বরূপ গ্রহণপূর্ব্বক কাব্য-নাটক-উপন্যাসাদিতে আদর্শ বা লক্ষ্যের অনুরূপ চরিত্র চিত্রিত করা। প্রথমোক্ত কার্য্য সমালোচকের, দ্বিতীয় কার্য্য কবির। সমালোচক বিষয়ের ঔচিত্য এবং অনৌচিত্য বিচার করেন, ভাবের পৌর্ব্বাপর্য্য, মাত্রা, অনুপাত এবং যোগ্যতা অবধারণ করেন; আর কবি এই বিচার এবং অবধারণকে কঙ্কাল স্বরূপ গ্রহণ করিয়া তাহার উপরে ভাষারূপ রক্ত-মাংসের সাহায্যে আপনার শক্তি এবং রুচির অনুরূপ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন। অতএব সাহিত্যের শীর্ষ-ভূষণ স্বরূপ কার্য্যের কথাই যদি চিন্তা করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, সমালোচনা এবং কাব্য পরস্পর বিরোধী নহে, বরং সমালোচনা কাব্যের পুরোবর্ত্তী সাহায্যকারী। সমালোচক হইলেই কবি হওয়া যায়, এ কথা মিথ্যা; কিন্তু কবিকে সমালোচক হইতেই হইবে, এ কথা নিতান্তই সত্য। "নিরঙ্কুশাঃ কবয়ঃ" এ কথা সর্ব্বত্র সমানভাবে খাটে না। কবি ইচ্ছা করিলে অবশ্য তাঁহার সৃষ্ট তিন হস্ত দীর্ঘ সূর্পনখাকে সাত শত যোজন দীর্ঘ নাসা অনায়াসে দিতে পারেন; কিন্তু সে কুৎসিত মূর্ত্তি দেখিবামাত্র লক্ষ্মণের তীক্ষ্ণ বাণ তাহার নাসা ছেদন করিবে।

সমালোচন যখন কাব্যের শত্রু নহে, বরং একটা প্রবল সহায়, তখন ইহাকে আর অধিক কাল উপেক্ষা করা কি উচিত? বিধি-ব্যবস্থা শূন্য রাজ্য যেমন, সমালোচনা শূন্য সাহিত্য-সমাজ কি সেইরূপ নহে? সূত্র এবং দৃষ্টান্ত, এই দুইটির সাহায্যে সকল প্রকার শিক্ষা সম্পাদিত হয়। সূত্র বিষয়টা বলিয়া দেয়, দৃষ্টান্ত তাহার অর্থ বিশদভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেয়। সূত্র বুঝিয়া দৃষ্টান্ত দেখা ছিল প্রাচীন প্রথা, দৃষ্টান্ত দেখিয়া সূত্র বুঝা হইয়াছে নূতন প্রথা। জীবন ধারণ যেমন আহারের উদ্দেশ্য, তৃপ্তি-বোধ তাহার আনুষাঙ্গিক মাত্র; সেইরূপ আমি মনে করি কাব্যাদির প্রধান উদ্দেশ্যই শিক্ষা, আনন্দ-বোধ তাহার আনুষঙ্গিক অবস্থা মাত্র। সমালোচনই এই শিক্ষার সূত্র, কাব্যাদি ইহার দৃষ্টান্ত। অলঙ্কার-শাস্ত্র এই শিক্ষার শৃঙ্খলাবদ্ধ সূত্র সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। অলঙ্কার-শাস্ত্রের নাম লইয়া আমি সঙ্কুচিত হইতেছি। হয় ত কেহ মনে করিতে পারেন, আমাদের অলঙ্কার-গ্রন্থ অনেক আছে, তাহাই ত পর্য্যাপ্ত। আমি এই ভয়েই আদ্যোপান্ত সমালোচন শব্দের ব্যবহার করিতেছি। আজ আমরা যাহাকে সমালোচনা বলিতেছি, কালে তাহাই বঙ্গভাষায় অলঙ্কার-শাস্ত্র হইবে। যে অলঙ্কার আছে, তাহা আমাদের দিদিমার অলঙ্কার, মার গায়ে তাহা খাটিবে না। আমাদের নবযৌবনা মার অঙ্গে সেই অলঙ্কারই শোভা পাইবে, কিন্তু শোভা দিতে পারিবে না। আমাদের স্বভাব-সুন্দরী মার অঙ্গে অঙ্গে সৌন্দর্য্যে-রাশি উথলিয়া পড়িতেছে; এই

নবীন দেহের নবীন অলঙ্কার জ্ঞান-বিজ্ঞানে গঠিত হইবে, প্রেম-ভক্তিতে বিধৌত হইবে, শক্তি-সৌন্দর্য্য মার্জ্জিত হইবে, তবে ত শোভা পাইবে! জগদম্বার কৃপায় আজ বাঙ্গালী জাতির উপরে জগতের চক্ষু পড়িয়াছে; যদি আমরা যত্নের সহিত, ভক্তির সহিত, প্রাণের সহিত, একাগ্রতার সহিত, ঠিক উপাসনার মত পবিত্র নিঃস্বার্থ ভাবের সহিত মাতৃভাষার জন্য খাটিয়া প্রাণপাত করিতে পারি, তবে একদিন আমাদের মাতৃভাষার সৌন্দর্য্য এবং ঐশ্বর্য্য দেখিয়াও জগৎ চমৎকৃত এবং মোহিত হইবে।

প্রকৃত সমালোচনা না থাকাতে আমাদের জাতীয় ক্ষতি কতটা হইতেছে, আমাদের শক্তির কিরূপ অপচয় হইতেছে, সেই সম্বন্ধে গোটা দুই কথা বলিলেই আমার বক্তব্যের উপসংহার হয়।

কাব্যাদি সুকুমার সাহিত্যের বোধ হয় একটা আকর্ষণ, একটা মাদকতা, একটা সম্মোহিনী এবং উন্মাদিনী শক্তি আছে; নতুবা এফুলে এত ভ্রমর ছুটিবে কেন—ইহার দিকে এত বালক-বৃদ্ধ ছুটিবে কেন? তরুণ হৃদয় ত স্বভাবতই সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া থাকে, সুতরাং ইহাতে আশ্চর্য্য বোধ করিবার কিছু নাই; কিন্তু অনেক স্থলে দেখা যায়, বৃদ্ধকে পর্য্যন্ত কাব্যানুরাগে গ্রাস করিয়া ফেলে। শিক্ষা নাই, শক্তি নাই, কিন্তু অনুরাগে পাগল। সংসারের কত ক্ষতি হইয়া যাইতেছে, হয় ত অন্নাভাব ও আছে; কিন্তু সে দিকে ভ্রুক্ষেপ নাই, নিয়ত কাগজ-কলম লইয়া কবিতার ভাঙ্গন-গড়নে ব্যস্ত, নিজের রচনা উচ্চৈঃস্বরে পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়া তাহারই মাধুর্য্যে বিভোর, তাহারই রসাস্বাদনে উন্মত্ত! কেহ সে রচনা শুনিতে চাহে না, তথাপি তাহাকে শুনাইতে হইবে; কেহ যাহাতে প্রশংসার কিছু পায় না, তথাপি তাহার মুখ দিয়া অন্ততঃ "বেশ হইতেছে" কথাটি বাহির করিতে হইবে। এ বিষয়ে অধিক দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নাই, রাজসাহীবাসীর নিকট স্বর্গীয় জয় নাথ বিশি মহাশয়ের নামোল্লেখই যথেষ্ট। স্বর্গীয় বৈকুণ্ঠনাথ গুপ্ত মহাশয়ের কাব্যানুরাগ স্মরণ করিয়া পুঠিয়াবাসী অদ্যাপি আমোদ উপভোগ করিয়া থাকেন। এই সকল বৃদ্ধের কাব্যানুরাগ অবশ্যই প্রশংসনীয়। কাব্যোপাসনায় যে আনন্দ পাওয়া যায় তাহা তাঁহারা নিজে পূর্ণ মাত্রাতেই করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কতগুলি অপরিহার্য্য ত্রুটির জন্য আমরা সে আনন্দ হইতে বঞ্চিত।

যাহা হউক, যাঁহাদের কর্ম্মলীলা শেষ হইয়া আসিয়াছে, এখন "হাতে বৈঠা ঘাটে না," কেবল নৌকায় চড়িয়া "বদর বদর" বলিয়া নৌকা খানি ছাড়িয়া দেওয়ার অপেক্ষা, তাঁহারা না হয় আপনার ভাবে ডুবিয়া, আপনার আনন্দে বিভোর হইয়া জীবনের অবশিষ্ট কয়টা দিন কাটাইলেন, সমাজকে কিছু না দিলেন; কিন্তু যাহাদের শক্তি-সামর্থ্য, জ্ঞান-গৌরব, কর্ম্মঠতা এবং উদ্যমশীলতার উপরে জাতীয় ভাগ্য নির্ভর করিতেছে, সেই সকল তরুণ যুবক যদি শিক্ষক এবং পথ-প্রদর্শক না পাইয়া, সাহিত্যের বিজ্ঞানস্বরূপ সমালোচনে অনভিজ্ঞ থাকিয়া, কেবল নিজের যত্ন, অনুরাগ এবং

অপক্ক জ্ঞান-বুদ্ধির সাহায্যে সুকুমার সাহিত্য লিখিতে থাকে, তবে তাহা অসার এবং অপাঠ্য ভিন্ন আর কি হইবে? অবশ্য বাঙ্গালীর সাহিত্য-ভাণ্ডারে এখন অনেক গুলি আদর্শ গ্রন্থও জমিয়াছে, এবং তাহা যত্নের সহিত পাঠ করিলে নূতন লেখকদিগের প্রভূত উপকারও হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু সাহিত্যের বিজ্ঞান-ভাগ উপেক্ষা করিয়া কেবল আদর্শ গ্রন্থ পড়িয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করিলে বড় জোর তাহা সেই উৎকৃষ্ট গ্রন্থের অপকৃষ্ট অনুকরণ মাত্র হইতে পারে। কিন্তু ইহাই কি তাহাদের চরম লক্ষ্য হইবে? বর্ত্তমান যাহা আছে, যথা কালে তাহার উপরে যদি তাহারা না উঠিল, ভাষায়, ভাবে, সৌন্দর্য্যে এবং উদ্ভাবনী ও উদ্বোধিনী শক্তিতে বর্ত্তমানকে যদি তাহারা অতিক্রম করিতে না পারিল, তবে ভবিষ্যতে বঙ্গভাষা সমৃদ্ধি-শালিনী হইবে, বঙ্গীয় সাহিত্য বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিবে, এ আশা কেমন করিয়া করিব? বাঙ্গালী ভবিষ্যতে মাতৃভাষার যে বিচিত্র এবং উন্নত প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিবে, তাহার ভিত্তি-ভূমির অতি নিম্নস্তরে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া যাঁহারা সেই গৌরব-পুঞ্জ, পৃষ্ঠে বহন করিবার অধিকার পাইবেন, তাঁহারাও ধন্য, তাঁহারাও পুণ্যবান্।

এই উৎসাহী যুবকেরা যাহাতে সাহিত্য-সেবায় কৃতকার্য্য হইতে পারে, তাহার সুযোগদান এবং উপায়-নির্দ্ধারণ সাহিত্যের বর্ত্তমান মহারথীদিগের চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত। এ বিষয়ে কোন ব্যবস্থা আছে কি না জানি না—নাই বলিয়াই বোধ হয়। না থাকিলে অনতিবিলম্বেই কোনরূপ ব্যবস্থা করা একান্ত সঙ্গত। অতি নগণ্য বস্তুরও অপব্যয়-নিবারণ বর্ত্তমান যুগের একটা প্রধান লক্ষণ। ছেঁড়া ন্যাকড়া, ভাঙ্গা বোতল, পরিত্যক্ত কেশ নখ পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিয়া বর্ত্তমান সভ্যতা কত বিলাসের উপকরণ নির্ম্মাণ করিতেছে; আর আমাদের উৎসাহী যুবকদিগের অমূল্য সময় এবং শক্তি এইভাবে বিনষ্ট হইতে থাকিবে, ইহা ভাবিতেও যে হৃদয়ে যন্ত্রণা বোধ হয়।

শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী।

কবি প্রতিভা।

—:•:—

অধঃপতিত বাঙ্গালী আজ বাঙ্গালীর অধঃপতন সঙ্গীত 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্য রচয়িতা নবীনচন্দ্র সেনের স্মৃতি পূজার জন্য সমবেত। যখন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি মহাশয় এই পূজায় স্বয়ং ব্রতী তখন পূজা অবশ্য ষোড়শোপচারেই হইবে। এই ক্ষুদ্র লেখকের পূজোপকরণে ধূপের সুগন্ধ, দীপের উজ্জ্বলতা বা সচন্দন পুষ্পার্ঘ্যের পবিত্রতা বা মনোহারিতা স্নিগ্ধতা বা সৌরভ, কিছুই নাই। নৈবেদ্যের ছোলা মূলার ন্যায় অকিঞ্চিৎকর

একটি প্রবন্ধ লইয়া পূজায় উপস্থিত হইয়াছি। নবীনচন্দ্রের গ্রন্থাবলী রীতিমত সমালোচনা করিতে অগ্রসর হইলাম না, কেন না সে কার্য্য আমার অপেক্ষা অধিকতর চিন্তাশীল ও গুণগ্রাহী লেখকগণ পূর্ব্বে করিয়াছেন এবং এখনও করিবেন। আধুনিক বঙ্গীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে কবিতার প্রধানতঃ দুইটি স্তর, তাহারই আদি স্তরের শেষ কবির স্মৃতি পূজা উপলক্ষে 'কবি প্রতিভা' সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। সভাস্থ সকলের ধৈর্য্য ভিক্ষা করি। প্রবন্ধ নীরস হইবে, শ্রোতৃবর্গ মনে রাখিবেন লেখক কবি বা বাগ্মী নহেন, শিক্ষা ব্যবসায়ী।

কবিগণও সাধারণ মানবের ন্যায় জন্ম মৃত্যু জরার অধীন কিন্তু তাঁহাদের কল্পনাশক্তি, সৌন্দর্য্য বোধ ও ভাব প্রবণতা সাধারণ মানব হইতে বিভিন্ন। তাঁহাদের নিজের হৃদয়ের বৃত্তি গুলি কোমল সুকুমার ও গভীর; আবার তাঁহারা কল্পনা ও অন্তর্দৃষ্টির বলে অপরের চিত্তবৃত্তি ও মনোভাব সূক্ষ্ম ভাবে বিশ্লেষণ করিতে সিদ্ধ হস্ত। এই গুলিতেই তাঁহাদের বিশেষত্ব। পৃথিবীর যাহা কিছু সুন্দর ও মধুর, কবির চক্ষে ও কবির রুচিতে সে সকলই সুন্দর ও মধুর, কিন্তু কবি তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভা বলে সে সৌন্দর্য্য সে মাধুর্য্য ভাষার তুলিকার ও ও ভাবের বর্ণচ্ছটায় যেরূপভাবে ফুটাইয়া তুলেন তাহা সাধারণ মানবের অসাধ্য। আবার পৃথিবীর অনেক অসুন্দর, কুৎসিত কর্কশ বস্তু যাহার ভিতর আমরা বিশেষ একটা রমণীয়তা দেখিতে পাই না বলিয়া অবজ্ঞা করি, প্রকৃত কবি তাহার ভিতরেও একটা সৌন্দর্য্য একটা মাধুর্য্য একটা চমৎকারিত্ব দেখিতে পান ও পাঁচ জনকে দেখাইতে পারেন। হেমচন্দ্র অপরাজিত ফুলকেও সুন্দর দেখিয়াছেন, প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ উপাসক ওয়ার্ডসার্থ ও তাঁহার প্রকৃতিপূজামন্ত্রে দীক্ষিত টেনিসন্ সামান্য ফুল দেখিয়াও ভাবে তন্ময় হইয়াছেন। একের—

To me the meanest flowers that blows
can give.
Phoughts that do often lie to deep
for tears.

এবং অপরের Flower in the craunied wall & কবিতা ও কবিতাংশের আর নূতন করিয়া পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। এই অংশে ওয়ার্ডওসয়ার্থ প্রকৃতির অনন্ত লীলার ও মানব চরিত্রের জটিল তত্ত্বের মধ্যে যে আমাদের সৌন্দর্য্য উপভোগের পথ কত প্রশস্ত করিয়া গিয়াছেন এবং সৌন্দর্য্যের কত প্রচুর উপাদান আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন তাহা রসজ্ঞ মাত্রেই জানেন।

এই সব দেখিয়া মনে স্বতঃই এই প্রশ্ন উদয় হয়, কবির এই সৌন্দর্য্যবোধ কোথা হইতে আসিল? কিরূপে তাঁহার এই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের (Sixth sense) সঞ্চার হইল? কিরূপে তিনি সাধারণ মানব হইতে স্বতন্ত্র উপাদানে গঠিত হইলেন? বিধিদত্ত নৈসর্গিক প্রতিভা ইহার মূলীকৃত কারণ সন্দেহ নাই, কিন্তু তথাপি ইহাও বলিতে হইবে যে কবির বাল্য জীবন এমন ভাবে গঠিত হয় তাহা প্রকৃতির প্রভাব এমন ভাবে অঙ্গীভূত করে, যে প্রথম হইতেই সৌন্দর্য্য বোধের বিকাশ, বিবৃদ্ধি ও পরিপক্কতা জন্মে।

স্কট্‌ ও বায়রণের শিশুহৃদয়ে স্কট্‌লণ্ডের শৈলসরিৎ সুষমা কি গভীর ভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল তাহা তাঁহাদের জীবনীপাঠকের অগোচর নাই। নবীনচন্দ্রের বাল্য হৃদয়েও প্রকৃতির সোহাগের স্থান জন্মভূমি চট্টগ্রামের 'সৌধশিরগিরিমালা, অনিবার প্রবাহিত নির্ঝরিণী, অস্তাচল বিলম্বি রবিকর বিভাসিত অনন্ত নীল ফেনিল সমুদ্র শোভা' কি ভাবে কবিত্ব শক্তির উন্মেষ করিয়াছিল তাহা তিনি নিজেই প্রথম কাব্য অবকাশরঞ্জিনীর ভূমিকায় ও আত্মজীবনীতে প্রকটিত করিয়াছেন। 'ম্যালেরিয়ার লীলাভূমি নিম্নবাংলার আর্দ্র সমতল ভূমিতে বাস করিয়া আমরা এই প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য সম্ভোগবঞ্চিত।

কবিপ্রতিভার আর একটি উপাদান ভাবপ্রবণতা। ইহার মূল অনুসন্ধান করিতে হইলে বংশ ও জনক জননীর চরিত্র আলোচনা এবং বাল্য শিক্ষার প্রকৃতি অনুসন্ধান করিতে হয়। যিনি গিবন বা জন্‌ ষ্টুয়ার্ট মিলের আত্মকাহিনী পড়িয়াছেন তাঁহার বুঝিতে বাকী থাকিবে না যে এই উভয় মনস্বীর যেরূপ পিতার ঔরসে ও যেরূপ মাতার গর্ভে জন্ম এবং যেরূপ শিক্ষা তাহাতে তাঁহাদিগের ভবিষ্যৎ জীবনে কবি হইবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। পক্ষান্তরে মিল্টনের মাতা পিতার স্নেহশীলতা ও তাঁহার বাল্য-শিক্ষা তাঁহাকে ভবিষ্যতে কবি হইবার পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল তাহাও বেশ সহজে বুঝা যায়। নবীনচন্দ্র তাঁহার আত্ম জীবনীতে পিতামহী ও মাতার যে অপার স্নেহশীলতার পরিচয় দিয়াছেন ও গুণী জ্ঞানী দানশীল স্নেহশীল মহানুভব পিতার যে পবিত্র চিত্র অাঁকিয়াছেন তাহা হইতে সহজেই অনুমান করা যায় তাঁহার ভাব প্রবণতার মূল কোথায়? আকরে পদ্মরাগাণাং জন্ম কাচমণেঃ কুতঃ? এ স্থলে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে তাঁহার কবিত্ব শক্তির উন্মেষণে বাল্য শিক্ষক সুকবি জগদীশ তর্কালঙ্কারের বিশেষ কবিত্ব ছিল। ইহা ছাড়া তাঁহাদের বংশে কবিত্বশক্তি অল্প বিস্তর পরিমাণে পূর্ব্ব হইতেই ছিল।

কবি প্রতিভার এই দুইটী উপাদান অনেক সময় 'গুণ' হইয়াও 'দোষ' হইয়া দাঁড়ায়, কবির ব্যক্তিগত চরিত্রে কালিমার রেখাপাত করে। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এইরূপ। শেক্ষপীয়র বলুন, শেলী বলুন, বায়রণ বলুন, বর্ণস্‌ বলুন, কালিদাস বলুন, মাইকেল বলুন, সকলেরই এই দুইটী বৃত্তির আতিশয্যে পদস্খলন ঘটিয়া ছিল। কবিচরিত্র বুঝিতে হইলে এ কথাটা মনে রাখিতে হইবে। যাঁহারা এই দুইটী বৃত্তি বিবেক-বুদ্ধি ও ধর্ম্মবল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন তাঁহারা ধন্য। তাঁহারা সুধু বিস্ময়ের উদ্রেক করিয়া প্রশংসা ভাজন হয়েন না, অপিচ আমাদের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করেন। এই জন্যই আমরা মিল্‌টন্‌ ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ টেনিসনকে পূজা করি।

কবির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ শক্তি তাঁহাকে দার্শনিকের সহিত সমান আসনে স্থান দেয়। কিন্তু দার্শনিকের প্রণালী শুষ্ক নীরস, যন্ত্রের ন্যায় প্রাণহীন, বুদ্ধিবৃত্তিকে চমৎকৃত করে, কিন্তু হৃদয়কে আন্দোলিত প্রতিহত করে না, প্রাণ মাতায় না, কাঁপায় না, জাগায় না। আর—কবি কল্পনার কুহক-

মন্ত্রে, ছন্দের ঝঙ্কারে, ভাবের আবেশে, ভাষার সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য রসে মানব মনের জটিল তত্ত্বগুলি অমন সুচারুরূপে এমন সুকৌশলে, এমন সুস্পষ্ট সজীবভাবে বিশ্লেষণ করেন যে পাঠকের সমক্ষে এক অপূর্ব্ব জগৎ প্রকাশিত হইয়া উঠে, কবির ভাষায় বলিতে গেলে, সেই 'মধুর কোমলকান্ত পদাবলী' কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া প্রাণ আকুল করিয়া তোলে। কবি প্রতিভার এই অংশে সেক্ষপীয়রের কৃতিত্ব জগতের সাহিত্যে অতুলনীয়। ভবভূতি ও কালিদাস, ব্রাউনিঙ্ ও (ছন্দোবদ্ধ পদাবলী রচনা না করিলেও) আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র এই গুণেই শ্রেষ্ঠ। পলাশীর যুদ্ধের প্রথম সর্গে গুপ্ত মন্ত্রণাকারকগণের চরিত্রের বিভিন্নতা সম্পাদনে এবং অন্যান্য সর্গে বিদেশী বীর ক্লাইভ ও স্বদেশী বীর মোহনলালের চরিত্র সৃষ্টিতে নবীনচন্দ্রের এই শ্রেণীর কবিপ্রতিভার যথেষ্ঠ পরিচয় পাই।

এই সূক্ষ্ম বিশ্লেষণশক্তির মূলে মানব মনের জটিল প্রকৃতি সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান নিহিত আছে। যে কবি যে পরিমাণে এই দুর্জ্ঞেয় রহস্য অধিকার করিতে পারিয়াছেন তিনিই সেই পরিমাণে বিশ্লেষণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়া সাহিত্য ক্ষেত্রে যশস্বী হইয়াছেন। এই রহস্যভেদ করিতে হইলে নিজের জীবনে বিচিত্র সুখ দুঃখ, বিচিত্র কার্য্য পরম্পরা, বিঘ্ন বিপত্তি, শোক তাপ সহ্য করিয়া কাব্যের মুকুরে তাহাই প্রতিফলিত করিতে হয়। নিজে ঠেকিয়া না শিখিলে এই জ্ঞান জন্মে না। দুঃখ দারিদ্র্য ও বিবিধ মনঃপীড়া ভোগ করিয়া অমর কবি দান্তে ও মিল্‌টন্ জগৎকে দুইখানি অমূল্য মহা কাব্য দান করিয়াছেন। নবীনচন্দ্রের আত্ম জীবনী পড়িলে বেশ বুঝা যায় কোন মূল হইতে পলাশী যুদ্ধের ন্যায় শোক কাব্য উদ্ভূত হইয়াছে। তাঁহার অবকাশ রঞ্জিনীর পিতৃহীন যুবক যে তিনি নিজেই এ কথা তিনি স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ইহা পড়িতে পড়িতে ভুক্তভোগী জন্‌সনের সারকথাটি মনে পড়ে;—Slow rises worth by poverty depressed. আমরা নবীনচন্দ্রের স্মৃতিপূজার এই বিষাদময় মুহূর্ত্তে সভাস্থ সকলকে কবির স্বরচিত 'আমার জীবন' নামক নিদারুণ দুঃখ কাহিনী পড়িতে অনুরোধ করি।

অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনায় ভারতবর্ষের একটা বিশেষত্ব আছে, চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন। এই বিশেষত্ব ধর্ম্মপ্রবণতা। ভারতীয় কবিচরিত্রে ও এই বিশেষত্বের আলোকপাত দেখিতে পাই, না দেখিলে ক্ষুণ্ণ হই। এই ধর্ম্মভাবের প্রভায় ও কবিপ্রতিভায় মিলিয়া একটা মণিকাঞ্চন যোগ হইয়া পড়ে। যাহা ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসে কেবলমাত্র মিল্‌টনের বেলায় দেখিতে পাই, তাহা আমাদের জাতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে ঋগ্‌বেদের ঋষিগণ হইতে আরম্ভ করিয়া, ব্যাসবাল্মীকির মহাগ্রন্থে, ভবভূতি কালিদাসের কাব্যনাটকে, কৃত্তিবাস কাশীরাম ঘনরাম প্রভৃতির ধর্ম্মাশ্রিত কাব্যে, রামপ্রসাদের সাধক সঙ্গীতে, দাশরথি রায়ের পাঁচালীতে এবং এই ইংরাজী চর্চ্চার দিনেও বঙ্কিমচন্দ্রের এবং নবীনচন্দ্রের কাব্যাদিতে দেখিতেছি।

'আনন্দ মঠ' 'দেবী চৌধুরাণী', 'সীতারাম,' 'ধর্ম্মতত্ত্ব', 'কৃষ্ণ চরিত্র,' ভারতীয় ঔপন্যাসিক প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশ; 'ভানুমতী', 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র,' 'প্রভাস,' 'অমিতাভ' 'খৃষ্ট', 'গীতা,' 'চণ্ডী,' ভারতীয় কবির প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশ। ক্ষেত্র এক-প্রকারের, শিক্ষাদীক্ষা একই প্রকারের, ফল পরিণতিও একপ্রকারের। উভয়েই যৌবনে শিক্ষার গুণে ও যুগধর্ম্মের অমোঘ প্রভাবে প্রচলিত সমাজ ও ধর্ম্ম হইতে কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া পড়িয়াছিলেন, উভয়েই আবার প্রৌঢ় বয়সে স্বকীয় অনুশীলন বৃত্তির সম্যক্ স্ফূরণে এবং মজ্জাগত হিন্দুভাবের প্রভাবে স্বজাতির, স্বসমাজের ও স্বধর্ম্মের মহত্ত্ব বুঝিয়াছিলেন এবং দার্শনিকের সূক্ষ্ম দৃষ্টি কবির প্রতিভা ও উপদেষ্টার প্রাঞ্জল ভাষা সম্মিলিত করিয়া সকলকে বুঝাইয়াছিলেন। হইতে পারে তাঁহাদের সকল সিদ্ধান্তে আমরা শিরোধার্য্য করিব না, তাঁহাদের সকলকথা সর্ব্ববাদিসম্মত বলিয়া পরিগৃহীত হইবে না, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে তাঁহারাই প্রথমে য়ুরোপীয় জ্ঞান ও ভারতীয় জ্ঞানের অপূর্ব্ব সমন্বয় বিধান করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন এবং আমাদের জাতীয় ইতিহাসের পরিবর্ত্তন যুগে একটা নূতন পরিচ্ছেদের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। উদারতা, সার্ব্বদেশিকতা ও সমন্বয় প্রবৃত্তি তাঁহাদের প্রকৃতিগত হইলেও তাঁহারা যে প্রকৃত ভারতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন ইহা নিঃসংশয়। তাই বঙ্কিমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রকে আমাদের বলিয়া শ্লাঘা করিব।*

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

সান্ত্বনা।

আঁধার আকাশ কাঁদে কই কোথা আলো!
আর্ত্ত বায়ু শ্বসি ফিরে দিবস মিলালো;
অন্ধকার ছায়া মেলি গাছ পালাগুলি
ক্ষুধার্ত্ত ব্যাদান সম রহে মুখ তুলি!
হায়রে ক্ষুধার্ত্ত হিয়া, দিন চ'লে যায়
তোর অন্ধকার তবু ঘুচে নাহি হায়!
তবু চেয়ে দেখ—ওই তিমির আকাশে
অনন্ত তারার স্বপ্নে ছায়া সম ভাসে
সান্ত্বনা একটি—তোর প্রাণের গভীরে
সকল তমসা ভেদি' ভরা অশ্রু-নীরে
তেমনি সজল জাগে তেমনি কোমল
মৌন পরিপূর্ণ সুধা—বেদনা বিহ্বল
তারি মাঝে সব শান্তি সকল নির্ব্বাণ
খিন্ন ম্লান জীবনের শুধু পরিণাম!

শ্রীঅং:—

---

* স্বর্গীয় কবির শোক সভা উপলক্ষে ষ্টার রঙ্গমঞ্চে পঠিত।

বঙ্গদর্শন।

শাস্ত্র-সমন্বয়।

পূর্ব্বে এরূপ কোন সময় ছিল না, এখনও নাই, এবং ভবিষ্যতেও হইবে না, যখন মতভেদের অস্তিত্ব জানা যায় না। অতীন্দ্রিয় বস্তু-সম্বন্ধে বিচারে প্রবৃত্ত হইলে মতভেদ না হইয়া থাকে না। পুরুষের বুদ্ধি বিচিত্র, স্বভাব বিচিত্র, রুচি বিচিত্র; বুদ্ধি, স্বভাব ও রুচির বৈচিত্র্যহেতু মতও বৈচিত্র্য ধারণ করে। এজন্য যে-কোন দেশের যে-কোন শাস্ত্রে দৃষ্টিপাত করা যাউক না কেন, তদ্বিষয়ে স্বল্প-বিস্তর মতভেদ দেখা যাইবেই। এবং এই জন্যই বলিতে পারা যায় না যে, বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের যত ধর্ম্মগ্রন্থ আছে, সর্ব্বত্রই একই মত প্রচারিত হইয়াছে। এমন কতকগুলি বিষয় আছে, যাহাতে সকলের একই মত স্পষ্টই দেখা যাইতে পারে; কিন্তু এমন বিষয়েরও অভাব নাই, যাহাতে স্পষ্টই বিভিন্ন-বিভিন্ন মত দেখা যায়। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ—ইহা সমস্ত ঈশ্বরবাদিগণের এক মত; কিন্তু মূলে ঈশ্বর আছেন কিনা—এবিষয়ে অন্যদেশের ন্যায় আমাদের দেশেরও দার্শনিকগণ একমত নহেন।

উপনিষৎ-সমূহে দেখা যায় কোন কোন স্থানে ব্রহ্ম সবিশেষরূপে, আবার কোন কোন স্থানে নির্বিশেষরূপে উক্ত হইয়াছেন। এখানে তত্ত্ব কি? দ্বৈত, অদ্বৈত, না দ্বৈতাদ্বৈত? কেহ বলিবেন দ্বৈত, কেহ বলিবেন অদ্বৈত, এবং কেহ বা বলিবেন দ্বৈতাদ্বৈত। যদি দ্বৈতই তত্ত্ব হয়, তবে অদ্বৈত ও দ্বৈতাদ্বৈত অতত্ত্ব; এবং ইহারা প্রত্যেকে তত্ত্ব হইলে অপর দুইটি অতত্ত্ব! দ্বৈতীর দ্বৈতকে অতত্ত্ব বলিলে সে ছাড়িয়া দিবে না, সে উপনিষৎ হইতে প্রমাণ করিয়া দিবে যে, তাহার দ্বৈত তত্ত্বই, অতত্ত্ব নহে। পক্ষান্তরে অপর বাদীরাও ঐ উপনিষৎ হইতেই নিজের মত সমর্থন করিবেন। দ্বৈতী, অদ্বৈতী বা দ্বৈতাদ্বৈতী সকলেই দৃঢ়তার সহিত বলিবে যে, তাহাদের প্রত্যেকের উদ্ভাবিত মতকে সমস্ত উপনিষৎ একবাক্যে প্রতিপাদন করিতেছে, ইহাতে বিন্দু-বিসর্গ ভ্রম-ভ্রান্তি নাই।

সমস্ত উপনিষৎ যদি একবাক্যে একই তত্ত্ব প্রচার করিত, তবে হয় দ্বৈত, না হয় অদ্বৈত, বা দ্বৈতাদ্বৈত ইহার একটি মাত্র মত আমরা বুঝিতে পারিতাম; একাধিক মতের অস্তিত্ব থাকিতেই পারিত না। কিন্তু যখন তিনজন প্রমাণবাদী ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচার করিতেছেন, তখন বুঝিতে হইবে ঐ উপনিষৎ

একবাক্যে এককথা প্রচার করিতেছে না। বস্তুত তাহাই; সমস্ত উপনিষৎ একই কথা বলে না। এমন কি এক উপনিষদের মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন মত দেখা যায়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—এমন কতকগুলি উপনিষদ্-বাক্য আছে, যাহা দ্বারা ব্রহ্মকে সবিশেষরূপে জানা যায়, আবার আর কতকগুলি বাক্যদ্বারা ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ বলিয়া বুঝিতে হয়। দ্বৈতি প্রভৃতি এক এক সম্প্রদায় এক এক জাতীয় বাক্যকেই প্রধান বা মুখ্যার্থে গ্রহণ করিয়া অপর জাতীয় বাক্যসমূহকে অপ্রধান বা গৌণার্থে ধরিয়া নিজ নিজ মতকেই অভ্রান্ত সত্য বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। যে সব বাক্যে স্পষ্টই দ্বৈত প্রতিপন্ন হয়, অদ্বৈতী নিজের বাখ্যান-নিপুণতায় তাহাকে অদ্বৈত-অর্থে টানিয়া আনিবেন; পক্ষান্তরে দ্বৈতীও তাদৃশ কৌশল-প্রদর্শনে পরাঙ্মুখ নহেন।

শাস্ত্রীয় গ্রন্থসমূহ যদি একজনের রচিত হইত, তবে তাহাতে সাধারণতঃ মতভেদের আশঙ্কা থাকিত না। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। বেদের বিভিন্ন বিভিন্ন ঋষি বিভিন্ন বিভিন্ন সূক্তসমূহ দর্শন করিয়াছেন, বা রচনা করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ গ্রন্থেও এইরূপ; এক এক খানি ব্রাহ্মণ এক-একজনের দ্বারা দৃষ্ট বা রচিত, তাহা মনে হয় না। তাহার পরবর্ত্তী গ্রন্থসমূহের ত কথাই নাই। বৈদিক গ্রন্থের মধ্যেই ত দেখা যায় যে, এক মত খণ্ডিত করিয়া মতান্তর স্থাপন করা হইতেছে। এক ব্যক্তিরও যখন সময়ে সময়ে মত পরিবর্ত্তন দেখা যায়, তখন বহুব্যক্তির গ্রন্থে সর্ব্ববিষয়ে ঠিক একই মত প্রতিপন্ন হইয়াছে, ইহা মনে করিতে পারা যায় না।

এক কথার অর্থ বিভিন্ন-বিভিন্ন শ্রোতার নিকট বিভিন্ন-বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে; যেমন—'সূর্য্য অস্ত যাইতেছে'—এই কথা শুনিয়া চৌর চুরি করার সময়, ও ব্রাহ্মণ সন্ধ্যা বন্দনার সময় আসিয়াছে বুঝিতে পারে। কিন্তু উপনিষৎ প্রভৃতির ত একটি মাত্র কথা নহে, সেখানে যে বহু বহু বাক্য রহিয়াছে। এবং স্পষ্টতঃ তাহারা বিভিন্ন অর্থও প্রকাশ করিতেছে। তবে তাহাকে নিজের প্রয়োজনানুসারে গৌণ বা মুখ্যভাবে গ্রহণ করিবার ক্ষমতা আমরা নিজেই তর্কের দ্বারা উদ্ভাবন করিয়া লইয়াছি

এইরূপে আলোচনা করিলে যদিও আমাদিগকে স্বীকার করিতে হয় যে, সমস্ত উপনিষৎ একবাক্যে দ্বৈত, অদ্বৈত, বা দ্বৈতাদ্বৈত প্রতিপাদন করে না, তবে কতক কতক অংশ, কতক কতক উপনিষদ্‌ ঋষির মতে তাহা প্রতিপাদন করিতে পারে, তথাপি বাদিগণ যে স্ব স্ব মতকে সমস্ত উপনিষদের প্রতিপাদ্য বলিয়া প্রচার করেন, তাহার কারণ এই যে, তাঁহাদিগকে সমস্ত উপনিষৎ "সমন্বয়" করিতে হয়; সমন্বয় করিতে হইলে গৌণ মুখ্য ভাবে শাস্ত্র ব্যাখ্যা না করিলে চলে না, এবং তাহা করিলে সমস্ত শাস্ত্রের একটা মত পাওয়া যায়—এই বুদ্ধি হইতে পারে।

একজন উপনিষদের ঋষি বলিতেছেন—পূর্ব্বে 'সৎ' ছিল; আর একজন বলিতেছেন—পূর্ব্বে 'অসৎ' ছিল; আর একজন বলিতেছেন 'সৎ'ও ছিল না, 'অসৎ'ও ছিল না; আবার একজন বলিতেছেন 'অসৎ' থাকিতে পারে না, 'সৎই' ছিল। ইহাদের সমন্বয় করিতে হইলে, সমন্বয়কারী হয়

একতম পক্ষ গ্রহণ করিবেন, অথবা এই সমস্তকেই পরিত্যাগ করিয়া নূতন আর একটা কিছু উদ্ভাবন করিবেন ; ইহা ভিন্ন সমন্বয় আর কিছু নহে। ইহাতে কি স্থির হইতে পারে যে, সমন্বয়কারী যে সিদ্ধান্ত বা সমন্বয় করিয়াছেন তাহা সমস্ত উপনিষদের সিদ্ধান্ত? সমন্বয়কারী যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা তাঁহার "নিজের" সিদ্ধান্ত। এ বিষয়ে সমস্ত উপনিষদের কোন সিদ্ধান্তই হইতে পারে না।

কর্ম্মকাণ্ড-সম্বন্ধেও এই কথা। বৈদিক গ্রন্থেই দেখিতে পাই ঋষি পূর্ব্ব-পূর্ব্ব প্রচলিত কোন-কোন কর্ম্ম প্রণালীকে খণ্ডন করিয়া নূতন প্রণালীর সন্নিবেশ করিতেছেন। পরবর্ত্তী গ্রন্থ সমূহের ত কথাই নাই। ক্রমে মতভেদে মতভেদে কর্ম্ম বা ধর্ম্ম এত জটিল হইয়া উঠিল যে, তাহার মীমাংসার জন্য নূতন নূতন শাস্ত্র রচিত হইতে লাগিল।* কিন্তু ইহাতে বস্তুতঃ কি মীমাংসা হইয়াছে? যদি মীমাংসা একটা হইত, তবুও বুঝা যাইত যে, যথার্থ মীমাংসা হইয়াছে। বহু মীমাংসাই ত 'মীমাংসা'-নামে প্রচলিত। ইহার মধ্যে কোনটি যথার্থ ও কোনটি অযথার্থ? একটি মীমাংসা হইলেও আমরা তাহাকে সমগ্রশাস্ত্রের মীমাংসা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না, ব্যক্তি বিশেষের মীমাংসা বলিয়া তাহা গ্রহণ করা যাইতে পারে। (এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।)

তর্কের কৌশলে, বা বুদ্ধির প্রভাবে কোন একটি মীমাংসাকে যথার্থ বলিয়া স্বীকার করাইবার জন্য ব্যক্তি বিশেষকে বাধ্য করিতে পারা যায়, কিন্তু সেই মীমাংসাটি যে যথার্থ হইয়াছে, তাহার প্রমাণ নাই। কেহ তর্কে আঁটিয়া উঠিতে পারিল না বলিয়াই যে তাহা তাহার নিকটে বস্তু-তত্ত্ব হইবে, তাহা হইতে পারে না। তোমা অপেক্ষা কোন বুদ্ধিমত্তর তার্কিক আসিয়া অনায়াসে তোমার মীমাংসাকে অযথার্থ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়া দিবে; আবার ইহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট কোন তার্কিক ইহারও মতকে অন্যথা করিয়া দিতে পারে। এইরূপে কেবল তর্ককৌশল দেখাইতে পারিলেই যে বস্তু-তত্ত্ব সেইরূপ হইয়া যাইবে, তাহা হয় না। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিন কালের সমস্ত তার্কিককে যদি এক স্থানে করিয়া মত সংগ্রহ করা যায়, তবে হয়ত কোন যথার্থ মীমাংসা পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ইহা অসম্ভব।

এখন একটা কথা এখানে বিশেষ বিচার্য্য। যদি মীমাংসা বা সমন্বয়ের দ্বারা বস্তুতঃ 'সমগ্র' শাস্ত্রের একটা কোন সিদ্ধান্ত পাওয়া না যায়, † তবে কিরূপে তদনুসারে চলা যাইতে পারে? তর্কের দিক্ দিয়া বলিতে হইলে, বলা যাইতে পারে—"যদি না চলা যায়, না যাউক ; তাহা ত আমার দেখিবার বিষয় নহে, ইহাই বিচার্য্য ছিল যে, সমগ্র শাস্ত্রের একটা মত পাওয়া যাইতে পারে কি না, এবং তাহাতে দেখা গেল যে, সেরূপ মত পাওয়া যাইতে

---

* "ধর্ম্মং প্রতি বিপ্রতিপন্না বহুবিদঃ, কেচিদন্যং ধর্ম্মমাহুঃ, কেচিদন্যং ; সোঽয়মবিচার্য্য প্রবর্ত্তমানঃ কঞ্চিৎ এবোপাদদানো বিহন্যেত, অনর্থং চর্চ্ছেৎ।"—বহুজ্ঞ লোকেরা ধর্ম্মের প্রতি বিপ্রতিপত্তিযুক্ত, কেহ এক ধর্ম্ম বলেন, কেহ অন্য ধর্ম্ম বলেন, অতএব লোক অবিচার-পূর্ব্বক প্রবৃত্ত হইয়া যদি কোনও ধর্ম্ম গ্রহণ করে তবে বিহত অনর্থ প্রাপ্ত হয়।—শাবর ভাষ্য।

† পূর্ব্ববর্ত্তী শাস্ত্রীয় গ্রন্থেই যে-যে বিষয়ের মতভেদ দৃষ্ট হইয়া গিয়াছে, তৎসম্বন্ধেই ইহা বলা হইতেছে বুঝিতে হইবে।

পারে না। কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ এখন তোমাকে করিতে হইবে।"

সমগ্র শাস্ত্রের একটা মত না হইলে কিরূপে চলা যাইবে—এ প্রশ্নটি আপাতত অতি জটিলরূপে প্রতীয়মান হইলেও, একবারে অসমাধেয় নহে। পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, মতভেদ-স্থলে প্রাচীনেরা কি করিয়াছেন। ইহা আলোচনা করিলে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, মতভেদ উপস্থিত হইলে, যাঁহাদের যে মত ভাল বলিয়া বোধ হইয়াছে, যে মতের যুক্তি তর্ক প্রমাণ প্রয়োগ যাঁহাদের নিকট উপাদেয়রূপে বিবেচিত হইয়াছে, তাঁহারা তাহাই গ্রহণ করিয়া চলিয়াছেন। এইরূপে নানা সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছে। কোন কোন সম্প্রদায় কিছু কাল বিপুল প্রভাবে আপন মতপ্রচার করিয়া হয় ত একবারে বিলীন হইয়া গিয়াছে। কোন কোন সম্প্রদায় বা আবার প্রভাবশালী হইয়া হাসিয়া উঠিয়াছে। কখন কখন ইহাদের পরস্পর তুমুল বিবাদ বাধিয়াছে, বাধিয়া মিটিয়াছে, আবার হয়ত জাগিয়া উঠিয়াছে। যেমন ইহা পূর্ব্বকালে হইয়াছে, তেমনই এখনও হইতেছে, এবং ভবিষ্যতেও তেমনই হইবে। ইহাকে কালের ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। সর্ব্বকালেই মতভেদ ছিল, এবং সর্ব্বকালেই লোকেরা এইরূপ ব্যবহার করিয়াছে ও করিবেও। শাস্ত্রই হউক, আর লোকই হউক, কেহই এই গতির প্রতিরোধে সমর্থ নহে।

ইহাই যদি হয়, তবে শাস্ত্রের মতভেদস্থলে, যদি দুই জন দুই মত গ্রহণ করিয়া চলে, তবে ইহাদের কাহাকেও অশাস্ত্রীয় মতের গ্রহণকারী বলিয়া অবজ্ঞা করা চলে না। আমরা পুরাণে দেখিতে পাই, এক ধর্ম্ম সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে বিদ্বেষবশে "নাস্তিক" বা "পাষণ্ড" নামে অভিহিত করিয়াছেন; শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায় পরস্পরকে "নাস্তিক" শব্দে গালি দিয়া থাকেন। মতভেদস্থলেও এক দল অপর দলকে যদি অশাস্ত্রানুসারী বলেন, তবে তাহা শাস্ত্রদৃষ্টিতে নহে, বিদ্বেষ দৃষ্টিতে।

শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী।

শিক্ষা ও মাতৃভাষা। *

আমাদিগের দেশে শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে অধিক সংখ্যক লোকেরই কোনরূপ আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায় না। শিক্ষা সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষগণ যেরূপ ব্যবস্থা করেন, আমরা তাহারই অনুবর্ত্তন করি মাত্র। সাধারণ লোক এ সম্বন্ধে একরূপ উদাসীন। পৃথিবীর সমস্ত সভ্যজাতির মধ্যে শিক্ষার যেরূপ প্রসার ও সমাদর হইতেছে তাহাতে আমাদের এরূপ ঔদাসীন্য যে নিতান্তই লজ্জাকর সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। জর্ম্মণী, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশে

* বিগত ১১ শে মাঘ সোমবার রাজসাহীর সাহিত্য সম্মিলনে লেখক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্, এ কর্ত্তৃক পঠিত হয়।

প্রত্যেক বালক বালিকা যাহাতে প্রাদেশিক শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারে, গবর্ণমেণ্ট নিজব্যয়ে তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রমজীবিদিগের জন্য, মূক ও বধিরের জন্য, অন্ধদিগের জন্য শিক্ষার যে সকল ব্যবস্থা আছে, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

শিক্ষাই সভ্যজাতির একমাত্র মহাশক্তি। যে জাতি যত শিক্ষিত হয়, জীবন-সংগ্রামে ততই সে স্থায়িত্ব লাভ করে। তাই এখনও হিন্দুজাতি বহিরাক্রমণের প্রলয়-বন্যায় পুনঃ পুনঃ বিক্ষুব্ধ হইয়াও আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। গ্রীসের গৌরবসূর্য্য বহুকাল অস্তমিত হইয়াছে—তাহার স্বাধীনতা পরপদদলিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার সাহিত্য-দর্শনময়ী প্রতিভা মানবসমাজে এখনও চির-নূতন রহিয়াছে। রোম গিয়াছে, তাহার সভ্যতার ভাতি সমুজ্জল রহিয়াছে। সভ্যজগৎ ক্রমশঃই উপলব্ধি করিতেছে যে নৈতিক শক্তি, শারীরিক শক্তি অপেক্ষা মহীয়সী। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে যে যুদ্ধবিগ্রহের যুগ চলিয়া যায় নাই, তাহা আধুনিক সভ্যতার অসম্পূর্ণতার নিদর্শন। সমগ্র মানবজাতির আশা, উদ্যম ও লক্ষ্য সভ্যতার দিকে কেন্দ্রীভূত। শিক্ষা মানব-সমাজের কেন্দ্রগামিনী শক্তি। সমাজের বিভিন্ন অংশকে একত্র গ্রথিত করিতে হইলে, দুরূহ জীবনসংগ্রামে জয়লাভ করিতে হইলে, সভ্যজাতিসমূহের মধ্যে আসন প্রাপ্ত হইতে হইলে শিক্ষা ভিন্ন অন্য কোন উপায় আছে বলিয়া আমি জানি না। অথচ এই শিক্ষাসম্বন্ধে আমরা কর্তৃপক্ষের উপর ভার দিয়াই নিশ্চিন্ত। ইহাপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? শিক্ষার প্রণালী সম্বন্ধে সকলেরই ব্যক্তিগত ভাবে ও সাধারণ ভাবে স্বার্থ রহিয়াছে। অথচ এমনই দুর্দ্দৃষ্ট যে এ বিষয়ে আলোচনার একান্তই অভাব!

শুধু জ্ঞানোপার্জ্জন শিক্ষা নহে, শিক্ষা সর্ব্বতোমুখী হওয়া আবশ্যক। প্রকৃত শিক্ষা মানবপ্রকৃতির গভীরতম প্রদেশকে স্পর্শ করে, পরিবর্ত্তন করে ও আলোকিত করে। যে শিক্ষা চারিত্রোৎকর্ষ বিধান করে না; মানসিক ভাব ও বৃত্তিসমূহের সম্যক্‌স্ফুরণে সহায়তা করে না; যাহা কেবল পরকীয় বিদ্যার অনুবৃত্তি মাত্র, তাহা কখনও শিক্ষা নামের উপযুক্ত হইতে পারে না। শিক্ষা মানবপ্রকৃতির পশুত্ব অপনোদন করিয়া তাহাকে দেবত্বে দীক্ষিত করিবে, তবেই সে শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল; নহিলে শিক্ষার অভিনয় হয় মাত্র।

আজকাল অনেকস্থলে বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর নিন্দা শুনিতে পাওয়া যায়। অধিকাংশস্থলেই সে নিন্দা শিক্ষা নীতির উপর বর্ষিত না হইয়া, শিক্ষিত যুবকদিগের ভাগ্যেই হইয়া থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-প্রাপ্ত যুবককে এক অদ্ভুত জীব বলিয়া প্রমাণ করা যেন একটি উপাদেয় কাযের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের প্রকৃত জ্ঞানপিপাসা হয় না, বিশ্ববিদ্যালয় একবার ছাড়িতে পারিলে আর তাহার কথা মনে করে না, এ অপবাদ ত মুখে মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এ অপবাদ কি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিমণ্ডিত যুবক স্বেচ্ছায় মস্তকে বহন করিতেছে? আমরা পরীক্ষাপাশ করিয়াই যদি অপরাধ করিয়া থাকি, তবে আর কাহারও পরীক্ষায়

পাশ করিয়া ক্ষাষ নাই। কিন্তু যে কারখানা বা Factoryতে পাশকরা যুবক নামে বিস্ময়কর পদার্থ প্রস্তুত হইতেছে, সে কারখানার কি কোনো দোষ নাই? যদি তাহা থাকে, তবে জনসাধারণ কবে ইহার সমবেত প্রতিবাদ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইবেন? কবে এ কলঙ্ককালিমা আমাদের গাত্র হইতে প্রক্ষালিত হইবে?

শিক্ষানীতির সংস্কার সম্বন্ধে যে বিপুল প্রশ্ন নিহিত আছে, তাহার মীমাংসা করা এ ক্ষুদ্র লেখকের সীমা ও সাধ্য উভয়েরই অতীত। আমি বর্ত্তমান প্রবন্ধে দুইটি বিষয়ের অবতারণা করিব মাত্র। প্রথম, প্রকৃত-শিক্ষা-বিস্তারের বাঞ্ছনীয়তা; দ্বিতীয়, প্রকৃত শিক্ষার পক্ষে মাতৃভাষার অপরিহার্য্যতা। প্রথমটি সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে কোনও জাতি কখনও শিক্ষা ব্যতীত অভ্যুদয় প্রাপ্ত হয় নাই, কখনও হইবে না। এক সময়ে কতকগুলি অসভ্য বর্ব্বর জাতি বিপুল সংখ্যা এবং প্রকৃত পাশব-বলের প্রভাবে মধ্য-এসিয়া ও উত্তর-ইউরোপ খণ্ডে এক প্রবল বন্যার ন্যায় আসিয়া সভ্যতার সূর্য্য বিলুপ্ত করিবার উপক্রম করিয়াছিল বটে, কিন্তু ধ্বংসের অনুচরগণ অচিরে ধ্বংস প্রাপ্ত হইল, সময়ের গাত্রে একটিও রেখা রাখিয়া যাইতে পারিল না। অথচ রোমক সভ্যতা আজিও স্নিগ্ধ উষার ন্যায় মানবজাতির বিচিত্র জ্ঞানাকাশ ব্যাপিয়া আছে। বাহুবল অচিরস্থায়ী; সভ্যতা অজর অমর। সেই সভ্যতার মূল শিক্ষা।

ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ধর্ম্মের আলোকে প্রদীপ্ত ছিল, তাই আজিও রম্যগোধূলির ন্যায় সে পুরাতন সভ্যতা আমাদিগকে ঘেরিয়া রহিয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার খরজ্যোতি তাহাকে সঙ্কুচিত করিয়াছে সত্য, কিন্তু বিলুপ্ত করিতে সক্ষম হয় নাই। দেবভাষা সংস্কৃত আমাদের সম্মুখে তাহার অতুলনীয় বিত্ত সর্ব্বদা উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু তাহার পূর্ব্বগৌরব কোথায়? সংস্কৃত ভাষার কুঞ্জ-কাননে আর ত নিত্যনূতন সঙ্গীত শুনিতে পাই না, আর ত সে পুরাতন বীণায় নূতন রাগিণী বাজে না! সংস্কৃত সভ্যতার যুগ চলিয়া গিয়াছে! পাশ্চাত্য শিক্ষার সংঘাতে সংস্কৃতকে পরিম্লান হইতে হইয়াছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইংরেজি ও সংস্কৃতের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যখন ইংরেজি ভাষা এদেশে শিক্ষাবিস্তারের অবলম্বন স্বরূপ বলিয়া ব্যবস্থাপিত হইয়াছিল, তখন দেশের ভাগ্য-গঠন বিষয়ে দেশীয়গণের অংশ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ছিল। ইংরেজি জয়লাভ করিল; পাশ্চাত্য সভ্যতার বন্যায় দেশ প্লাবিত হইতে চলিল। কিন্তু অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া এই বিদেশীয়া বাগ্‌দেবীর আরাধনা করিয়া আমাদের মুক্তিপথ প্রশস্ত হইল কৈ? প্রতিবৎসর অগণিত যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার দিয়া ভারতীর মন্দিরে প্রবেশলাভ করিতেছেন; প্রকৃত অর্ঘ্যদান কতজনের ভাগ্যে ঘটে? পুণ্যজ্ঞান পিপাসা মনে জাগে না; অমরত্বের আস্বাদনও ভাগ্যে ঘটে না। উপাধিধারী যুবকের অধ্যবসায়ের অভাব নাই; তাহার শিক্ষা ভিত্তিহীন।

কিন্তু কালের স্রোত ফিরিয়াছে। উষার আগমনে সর্ব্বত্র উন্মেষের লক্ষণ পরিলক্ষিত হইতেছে। নবীনত্বের গৌরব আমাদিগকে

ঋণ গ্রহণে সঙ্কুচিত করিতেছে। শুধু যে বিদেশীয় শিক্ষার গৌরব কমিয়াছে তাহা নহে, বিদেশীয় আচারে উপহাস বর্দ্ধিত হইতেছে, বিদেশীয় শিল্প ধনীর বিলাসগৃহে শোভা হারাইতে বসিয়াছে, বিদেশীয় বুলি বাকাইয়া বলিয়া বাহাদুরী লওয়া কঠিন হইয়াছে। বক্তারা অভ্যস্ত ইংরেজির ছটা ছাড়িয়া মাতৃভাষার দীন খঞ্জ কলেবরে নির্ভর করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সুষুপ্তির বিস্রস্তালস জড়তার অবসানে চৈতন্যের আভাস দৃষ্ট হইতেছে। খেলাধূলার অবসানে ক্ষুধার্ত্ত সন্তান মাতার আহ্বান শুনিয়া ছুটিয়াছে। জোয়ার আসিয়াছে, পালে অনুকূল বাতাস লাগিয়াছে, দিক্ সকল নির্ম্মল হইয়াছে, যাত্রার এই প্রশস্ত সময়। মাতৃভাষার প্রোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দিব্য আলেখ্যের ন্যায় দূর হইতে প্রলুব্ধ করিতেছে। এ শুভলগ্ন যদি ভ্রষ্ট হয় তবে আর কলঙ্কের সীমা থাকিবে না।

বঙ্গভাষাই আমাদের বাঙালীর শিক্ষার একমাত্র স্বাভাবিক ভিত্তি। সর্ব্বজাতির মধ্যেই মাতৃভাষা জাতীয় শিক্ষার অবলম্বন বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। জাতীয়তার দিক ছাড়িয়া দিলেও ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে সুকুমারস্বভাব শিশুগণের চিত্তবৃত্তিস্ফুরণের পক্ষে মাতৃভাষা যেমন অনুকূল ও স্বাভাবিক, অন্য ভাষা কোনক্রমে তেমন হইতে পারে না। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, অতুল সম্পদশালিনী সংস্কৃতভাষা পরিত্যাগ করিয়া দীনা বঙ্গভাষার শরণ গ্রহণ করিব কেন? বহু শতাব্দীর জ্ঞানপুষ্ট ভাষাকে বিদায় দিবার পূর্ব্বে বিশেষ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য নহে কি? তাহার উত্তরে বক্তব্য এই যে সংস্কৃতকে পরিত্যাগ করা আমাদের পক্ষে কখনও সম্ভব নহে। বঙ্গভাষাকে পরিপুষ্ট করিতে হইলে দুইটি স্রোতকে মিশাইয়া দিতে হইবে। বঙ্গভাষা নূতন ও সজীব আকারে সংস্কৃতকে আলিঙ্গন করিবে। বাংলা সংস্কৃতের এক নূতন সংস্করণ হইবে। আমার মনে হয় সংস্কৃত সাহিত্যের সজীবতা সম্পাদন করিতে বাংলা-ই কেবল সক্ষম। সংস্কৃতকে বাঁচাইয়া রাখা প্রত্যেক বাঙালীর কর্ত্তব্য। সুসংস্কৃত বঙ্গভাষা সংস্কৃতকে বাঁচাইয়া রাখিবে। দর্শন বিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদি বঙ্গভাষায় হইতে হইলে সংস্কৃতের সহিত বাংলার ঘনিষ্ঠ মিলন অবশ্যম্ভাবী। কেননা, নূতন ভাব প্রকাশের জন্য নূতন শব্দের প্রয়োজন হইলে, সংস্কৃত অপেক্ষা অন্য কোন ভাষাই আমাদের নিকটতর আশ্রয় নহে। পাছে বঙ্গভাষার উৎকর্ষ ইংরেজি ভাষার অধিকারকে খর্ব্ব ও সঙ্কুচিত করিয়া ফেলে, এজন্য কেহ কেহ এরূপ উৎকর্ষকে সন্দিহান নেত্রে নিরীক্ষণ করিতে পারেন। যদি বাস্তবিকই তাহাই হয়, তাহা হইলেও উপায় নাই। প্রকৃত শিক্ষা মাতৃভাষার অনুগামিনী। প্রকৃতির ইহাই নিয়ম। যে নিয়মে বসন্তে কোকিল গাহে, প্রভাতের বাতাসে ফুল ফোটে,—মাতৃভাষার সংসর্গে শিশুর মানসিক শক্তিনিচয় স্ফুরিত হওয়া তেমনি একটি নিয়ম। আমরা সে প্রাকৃতিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়াছি, কাজেই শিক্ষা বিভ্রাট ঘটিয়াছে। চীনেরা যেমন সৌন্দর্য্যের কুহকে লোহের জুতা পরাইয়া রমণীগণের পা ছোট করিয়া লয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে পায়ের যাহা স্বাভাবিক কার্য্য,—

ভ্রমণ—তাহার শক্তিকে বিনষ্ট করিয়া ফেলে, তেমনি বিদেশীয় ভাষার কঠিন আবরণে বঙ্গীয় যুবকের মনোবৃত্তি ও চিন্তাশক্তি অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। যাহা অস্বাভাবিক তাহাই অমঙ্গলপ্রদ। এই অমঙ্গলকে প্রতিরোধ করিবার জন্য মাতৃভাষার শরণ লইতে হইবে। শিশু যখন হাঁটিতে শিখে, তখন মাতৃভূমির উপরেই সে পা ফেলিয়া ফেলিয়া শিখিয়া থাকে। Parallel Bar বা তারের উপর অভ্যাস করে না। হাঁটিতে শিখিলে তখন Parallel Bar বা Rope-dancingএ বাহাদুরী লওয়া সম্ভব হয়। আমরা নিজের ভাষা দিয়া আরম্ভ করিলে, পরের ভাষাও আমাদের নিকট সরল ও উপকারক্ষম হইবে, শিক্ষাও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, যেখানে ইংরেজির নাগপাশ তত কঠিন নহে, সেখানে বাঙালী প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিতে বিমুখ হয় নাই। বিজ্ঞানে বাঙালীর প্রতিভা অসঙ্কুচিত, আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র তাহার উদাহরণ স্থল। গণিতেও বাঙালী যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

একটি কথা এই, ইংরেজি সাহিত্যের সংসর্গে বাংলা এত পুষ্টিলাভ করিয়াছে, ইংরেজি আমলেই বাংলা গদ্যের সৃষ্টি হইয়াছে, ইংরেজি ভাষা প্রায় পঞ্চবিংশতি শতাব্দীর সভ্যতার ইতিহাস আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়াছে, আমরা ইংরেজিকে পরিত্যাগ করিব কি প্রকারে? করিবই বা কেন? ইংরেজির প্রভাব তিরোহিত হইলে বাংলার দশা কি হইবে কে বলিতে পারে?

আবার কেহ কেহ মনে করেন যে ইংরেজির সাহায্য আমাদের ভাষার পক্ষে আদৌ আবশ্যক নহে। তাঁহারা বলেন ইংরেজির সংসর্গ প্রাপ্তি না হইলে বঙ্গভাষা শৈশব অতিক্রম করিতে পারিত না ইহা সত্য হইতে পারে, কিন্তু আর এ সংসর্গ শুভাবহ নহে। তাহার যেটুকু কায ছিল, তাহা সম্পন্ন হইয়াছে, এখন তাহাকে তাহার সুদূর জন্মস্থানে ফিরাইয়া দাও। এই শ্রেণীর লোকেরা মনে করেন যে, বস্ত্র-শিল্প সম্বন্ধে বিদেশী-বর্জ্জন যেমন অপরিহার্য্য, ভাষা সম্বন্ধেও তাহাই কর্ত্তব্য। বিদেশীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিলে বয়ন শিল্প ও ভাষা অচিরকালের মধ্যে উন্নতিলাভ করিবে।

আমি ঠিক বলিতে পারি না বস্ত্র-শিল্প ও ভাষা সম্বন্ধে একই যুক্তি প্রযোজ্য কি না, তবে আমার মনে হয়, বাংলা ভাষার—বাংলা সাহিত্যের পুষ্টিবিধানের জন্য ইংরেজিকে 'বয়কট' করা অত্যাবশ্যক নহে। 'বয়কট' বলিতে যে বিদ্বেষের ভাব মনে আসে, তাহা যে এরূপ গভীর তত্ত্বমীমাংসার পক্ষে একেবারেই অনুকূল নহে, ইহা বলা বাহুল্য। ইংরেজি সাহিত্যের নিকট বঙ্গভাষা কৃতজ্ঞ। তাহার ঋণ অপরিমেয় ও অপরিশোধনীয়। ইংরেজি সাহিত্যের মধ্য দিয়া বঙ্গভাষা তাহার গতি ও ভবিষ্যৎ গঠন করিয়া লইতেছে। বঙ্গভাষার সে গতিকে ব্যাহত না করিলেই তাহার উন্নতির সহায়তা করা হইবে। যাহা স্বাভাবিক তাহাকে প্রতিরোধ না করিলেই আপনি সে প্রসার লাভ করে। বঙ্গভাষা ইংরেজির সঙ্গত্যাগ না করিয়াও অল্পে অল্পে তাহার ন্যায্য অধিকার আদায় করিয়া লইতেছে। এমন একদিন ছিল যে প্রাথমিক

শিক্ষার সংকীর্ণ ক্ষেত্র লইয়া বঙ্গভাষাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইয়াছিল। এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সমূহের মধ্যে নিতান্ত নগণ্য একটি স্থান পাইবার জন্য বঙ্গভাষাকে দীনভাবে যাজ্ঞা করিতে হইয়াছিল। পদক ও পুরস্কারের লোভে পরীক্ষার্থিগণ ইচ্ছাসুখে, একদিন মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য বাংলা রচনার পরীক্ষা দিতে উপস্থিত হইতেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় সংস্কৃতের পরিবর্ত্তে কোন কোন ছাত্র বাংলা গ্রহণ করিতেন কিন্তু সেরূপ বিকল্প যে নিতান্ত অভাব পক্ষে, তাহা কর্ত্তৃপক্ষগণ জানাইয়া দিতে ত্রুটি করিতেন না। কারণ তাহা না হইলে প্রবেশিকা পরীক্ষায় যাঁহারা বাংলা গ্রহণ করিতেন, এফ, এ পরীক্ষায় তাঁহাদের পথ রুদ্ধ করিয়া দিবার প্রয়োজন কি? এফ, এ পরীক্ষার্থীরা বাংলা গ্রহণ করিতে পারিতেন না। কেবল মেয়েদের জন্য এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইত। তাঁহাদিগকে এফ, এ পর্য্যন্ত বাংলায় পরীক্ষা দিতে দেওয়া হইত।

এরূপ বৈষম্য যে সুব্যবস্থার বিরোধী, তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের নববিধান উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। নববিধানে বঙ্গভাষাকে পূর্ব্বের সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে আবদ্ধ না রাখিয়া সমধিক প্রসার দেওয়া হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষাসমূহে বঙ্গভাষা তাহার ন্যায্য অধিকারে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখন প্রত্যেক বি, এ পরীক্ষার্থীর পক্ষে বঙ্গভাষা অবশ্য গ্রহণীয়। মধ্য পরীক্ষায়ও বাংলা সংস্কৃতের ন্যায় একটি স্বাধীন স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী, ইতিহাসের প্রশ্নের উত্তর ইচ্ছা করিলে মাতৃভাষায় লিখিতে পারিবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারের জন্য যে কমিশন বসিয়াছিল সেই সমিতি উচ্চশিক্ষায় বাংলা সাহিত্যের আলোচনা সমর্থন করিয়া এম, এ পরীক্ষাতেও বাংলা প্রবর্ত্তনের জন্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য"-প্রণেতা শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনকে বাংলা রীডার (Reader) নিযুক্ত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের মাতৃভাষাকে গৌরবমণ্ডিত করিয়াছেন।

বঙ্গীয় বালকের অনেক অমূল্য সময় যে নিতান্ত অনাবশ্যকরূপে বিদেশীয় ভাষার বন্ধুর ও কঙ্করময় পথে বিচরণ করিতে কাটিয়া যায় তাহা বহুদিন হইতে শিক্ষাসংস্কারার্থিগণের মন আন্দোলিত করিতেছিল। বাংলা যাহাতে শিক্ষার ভিত্তিস্বরূপ গৃহীত হয়, বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ প্রথম হইতে এজন্য যথেষ্ট পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া দেশের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। দশ বার বৎসর পূর্ব্বে পরিষৎ বাংলা সাহিত্য বিস্তারের জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করেন। তখন সে আবেদন অগ্রাহ্য হইয়াছিল। কিন্তু এই অল্পকাল মধ্যে শিক্ষানীতির যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। যাহা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে উপেক্ষা ও উপহাসের সামগ্রী ছিল, আজ তাহাই সম্পূর্ণ সফল হইতে চলিয়াছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে পেড্‌লার সাহেব যখন শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর ছিলেন, তখন গবর্ণমেণ্ট শিক্ষাসংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়া ইংরেজি স্কুলে বাংলা ভাষার সাহায্যে শিক্ষা প্রবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিলেন। এতদিনে পরিষদের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত

হইতে চলিল। ইংরেজি স্কুলের নিম্নশ্রেণী সমূহে বাংলা ভাষার সাহায্যে শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলিত হইল। যদিও তাহার ফলে অনেক অদ্ভুত বাংলা সম্বলিত পাঠ্যপুস্তকের সৃষ্টি হইয়াছে কিন্তু সে সকল গুল্মকণ্টক তিরোহিত হইয়া বঙ্গভাষা অচিরকালে দিব্য শাখাপল্লবসমন্বিত হইয়া উঠিবে আশা করা যায়।

শিক্ষাবিভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্যে নিয়পৈক্ষভাবে শিক্ষার নিম্নস্তরে যাহা করিতে-ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় নববিধানে বঙ্গভাষাকে উচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত করিয়া সম্যকরূপে তাহার সমর্থন করিতেছেন।

জাতীয় শিক্ষা পরিষৎও বাংলাভাষার সমুচিত আদর করিতে ক্রটী করেন নাই। শিক্ষাপরিষদের নিয়মানুসারে বাংলাভাষার সাহায্যেই নিম্ন ও উচ্চ উভয়বিধ শিক্ষাই প্রদত্ত হইয়া থাকে। শিক্ষাপরিষদের পরীক্ষা সমূহে বঙ্গভাষাকে মুখ্য ও ইংরেজিকে গৌণ স্থান দেওয়া হইয়াছে।

বঙ্গভাষাকে উচ্চশিক্ষার স্তরে উন্নীত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ—বিশেষত আমাদের বর্ত্তমান ভাইস্-চান্সেলার মহোদয়—সমগ্র বঙ্গদেশের ও বাঙালী জাতির অসীম কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। ইহা সহজেই অনুমেয় যে এই নবব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিতে অনেক বাধা ও বিরোধ খণ্ডন করিতে হইয়াছে। যাঁহারা ইংরেজিশিক্ষার পৃষ্ঠপোষক, তাঁহারা নিশ্চয়ই ইহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন যে নবপ্রবর্ত্তিত প্রথার ফলে ইংরেজির প্রভাব ক্রমে সংকীর্ণ হইতে সংকীর্ণতর হইয়া আসিবে। কিন্তু ইহা মনে রাখিতে হইবে যে বাঙালীর শুভাশুভ এই শিক্ষানীতির উপর নির্ভর করিতেছে। যদি ইহা সত্য হয় যে প্রকৃতশিক্ষা মাতৃভাষার সহিত অবিচ্ছেদ্য গ্রন্থির দ্বারা জড়িত, তাহা হইলে সেই মাতৃভাষারই শ্রীবৃদ্ধি সাধন প্রত্যেক সভ্যতাভিমানী ব্যক্তিরই অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহাতে যদি ইংরেজ প্রভাব পরিম্লান হয়, তবে তাহাই বিধাতার বিধান বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। একটি জাতির শুভাশুভের তুলনায়, এ ক্ষতি অতি তুচ্ছ।

কিন্তু তাহা বলিয়া এখন হইতেই বিলাতী পণ্যের ন্যায় ইংরেজিভাষাকে "বয়কট" করিতে হইবে, ইহা কখনও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। অন্ততঃ এইরূপ প্রবৃত্তি ঠিক স্বদেশ-প্রীতির পরিচায়ক কিনা সন্দেহ স্থল। বরং বঙ্গভাষাকে সৌষ্ঠব সমন্বিত করিবার জন্য ইংরেজি বা পৃথিবীর অন্য কোন শ্রেষ্ঠ ভাষার ঋণ গ্রহণ করা অধিকতর জাতীয়তার পরিচায়ক। হিন্দুরা শিক্ষার জন্য অপরের দাসত্বগ্রহণ পর্য্যন্ত করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। আমাদের মনে রাখিতে হইবে, ইংরেজি-সাহিত্য পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডার আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে, ইংরেজি ভাষা ভারতের বিভিন্ন বিশ্লিষ্ট অংশগুলিকে একতার বন্ধনে বাঁধিয়াছে, পাশ্চাত্যশিক্ষা সংস্কৃত-সভ্যতার স্রোতোহীন স্থির যমুনায় খরস্রোতা ভাগীরথীর ন্যায় তরঙ্গ তুলিয়া দিয়াছে—তাহার সজীবতা সম্পাদন করিয়াছে। এখন পরি-বর্ত্তনের আবশ্যক হইয়াছে। কিন্তু সে পরিবর্ত্তন যাহাতে ধীরে সরলপথে এবং নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে পরিচালিত হয়, তাহাই করা শুভাবহ। অকস্মাৎ কোন দৈহিক পরিবর্ত্তন

ঘটিলে শারীর-প্রণালী যেমন বিকল হইয়া যাইবার সম্ভাবনা, সমাজতন্ত্র তেমনি আকস্মিক পরিবর্ত্তনে বিপর্যস্ত হয়। শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধেও রক্ষণশীলতার প্রয়োজন আছে। অবিমিশ্র উদারনীতি বা রক্ষণশীলতা অপেক্ষা বিবর্ত্তনশীল জাতীয় জীবনে উভয়ের সংমিশ্রণই অধিকতর মঙ্গলজনক। পূর্ব্বপ্রণালী পরিবর্ত্তন করিতেই হইবে, স্বাভাবিক নিয়ম আপনি সে পরিবর্ত্তনের সূচনা করিয়াছে। কিন্তু সে পরিবর্ত্তনকে বিপ্লবে পরিণত করিবার প্রয়োজন নাই

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র।

সাহিত্যে বাস্তবসৃষ্টি।

সাহিত্যে আমরা বাস্তব সৃষ্টি করি বলি। কিন্তু বাস্তবটা কি? বাহিরে যেমনটি আছে তেমনটি যথাযথ ভাবে চিত্রিত করাকেই কি বাস্তব সৃষ্টি বলে? কল্পনায় যাহা মনে হয় তাহাকে রূপ দান করাকে কি বাস্তব সৃষ্টি বলে?

না। তবে বাস্তব ব্যাপারটা কি?

স্বাতন্ত্র্য ও সমগ্রতা এই দ্বৈত জগতের সকল জিনিসেই বিদ্যমান—প্রত্যেক জিনিস একই সময়ে আপনাতে আপনি অথচ একই সময়ে সকলের মধ্যে সকল, প্রত্যেক মানুষও তাই। কিন্তু স্বাতন্ত্র্যে ও সমগ্রতায় অবিচ্ছিন্ন যোগ প্রত্যেক মানুষের জীবনে দেখা যায় না—সাহিত্য বিশেষভাবে সেই যোগটিকে দেখাইয়া দেয়।

যেখানেই সেই যোগ সেখানেই সাহিত্য বাস্তব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে।

যাহা কিছু আছে তাহা আছে বলিয়াই গৌরবান্বিত, জগতের সমস্ত শ্রেষ্ঠকাব্য এই কথাই নানা ভাষায় উচ্চারণ করিতেছে। অংশের মধ্যে সম্পূর্ণ, ব্যক্তের মধ্যে অব্যক্ত, সীমার মধ্যে অসীমকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দেওয়া সকল বড় সাহিত্যের কাজ।

প্রত্যহই তাই কাব্যে ও সাহিত্যে ছোট ছোট জিনিস বড় হইয়া উঠিতেছে—এমন সকল মানুষ, এমন সকল ঘটনা সাহিত্যে অঙ্কিত হইতেছে যাহাদের সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টি উদাসীন ছিল; সাহিত্যে তাহাদের আমরা নূতন করিয়া যেন আবিষ্কার করি।

এটা এত স্বতঃসিদ্ধ সত্যের মত, যে ইহাকে লইয়া তর্কবিতর্ক করিতে ইচ্ছা হয় না। অন্যের কথা ছাড়িয়া দিই, ধর শুধু আমি। আমি জগতের মধ্যে এক জায়গায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, একেবারে নিজের মধ্যে নিজে। আবার সেই জন্যই আমি সমস্ত নিখিলের সঙ্গে নিবিড় ভাবে ঘনিষ্ঠ ভাবে সংযুক্ত; সেই সংযোগের ভাবটি আমার মধ্যে আছে বলিয়াই আমি জীবন ভরিয়া জগতের সঙ্গে নিজের নানা সম্বন্ধ পাতাইতেছি।

জীবনে এইটে আদর্শ; কিন্তু এ আদর্শ জীবনে ফলিয়া ওঠা সকল সময়ে সম্ভব নয় বলিয়া জীবনের পাশাপাশি সাহিত্যকে রক্ষা

করিতে হইয়াছে, যাহার মধ্যে আদর্শটি বিশুদ্ধ সম্পূর্ণ ভাবে স্থান লাভ করিবে।

তত্ত্ব বলে, একই শেষ কথা, কিন্তু সাহিত্য তা বলে না। শুধু একও যা না ও তা। সাহিত্যের কারবার দুই লইয়া। একের সামঞ্জস্য যেখানে দুয়ের মধ্যে ভাঙিয়া গিয়াছে, সেইখানেই শরীরের সঙ্গে আত্মার, ব্যষ্টির সঙ্গে সমষ্টির, সৌন্দর্য্যের সঙ্গে মঙ্গলের, ইচ্ছার সঙ্গে বিধানের, জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর শত সহস্র বিরোধ আসিয়া উঠিয়াছে,—সেই বিরোধ-সমুদ্রের সেতুবন্ধনের কাজে জগতের কবি এবং মনীষিদের অহোরাত্র নিযুক্ত থাকিতে হইতেছে।

সাহিত্যের মধ্যে যে এই সামঞ্জস্যের আদর্শটি কাজ করিতেছে, এ কথা অনেকে বিশ্বাস করেন না। ব্যক্তিবিশেষের রচনা উদ্ধৃত করিয়া তাঁহারা দেখাইতে পারেন, যে তাহাতে এ সকল চেষ্টার নামগন্ধও নাই।

কিন্তু মানুষের সমস্ত ইতিহাসই যে এই সেতুরচনার ইতিহাস। সাহিত্য বল, আর্ট বল, ধর্ম্ম বল, রাষ্ট্রনীতিবল, সমস্তই ত ইতিহাসের অন্তর্গত। ইতিহাসের ভিতর দিয়া যে অভিপ্রায় ব্যক্ত হইতেছে, সে অভিপ্রায় যে সকলকেই বহন করিতে হইবে। কেবল স্বার্থটুকু লইয়া, কেবল অহঙ্কারটুকু লইয়া যদি মানুষের চলিত তবে এত প্রাণপাত কেন, যুগ যুগান্তর ধরিয়া এত রকমের আয়োজন কেন, ক্ষণিক প্রয়োজন সাধনের পরেও আবার তাহার গণ্ডি ভাঙিয়া বৃহত্তর রচনার চেষ্টা কেন? সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যই যদি আদর্শ না হইবে তবে ইতিহাসের বিচিত্র গতির কোন তাৎপর্য্যই পাওয়া যায় না।

তাই আগাগোড়া সমস্ত সাহিত্যের চেষ্টাটা কোন্ দিকে? সে নিশ্চয়ই এই সামঞ্জস্য সৃষ্টির দিকে। রাষ্ট্র, ধর্ম্ম—আর কোন জায়গায় এমনতর সম্পূর্ণ সৃষ্টি করিতে পারি না যেমন পারি সাহিত্যে। তাহার কারণ সাহিত্য প্রয়োজনে আবদ্ধ নয়। প্রয়োজন লইয়া যেখানে কারবার সেখানে আদর্শ যতই বৃহৎ হোক্ না কেন, আদর্শকে স্থানকালপাত্র অনুসারে খর্ব্ব করিতেই হইবে, কিন্তু সাহিত্যে মানবাদর্শের অব্যবহিত প্রকাশ।

বর্ত্তমান সাহিত্যের ধারাটা একবার অনুসরণ করিয়া সাহিত্যে বাস্তবের অভিব্যক্তি কিরূপে হইল দেখিবার চেষ্টা করা যাক্।

ফরাসী বিপ্লবের কাল হইতেই ইউরোপে সাহিত্য নূতন দিক্ ধরিয়াছে। বৈষ্ণবযুগ হইতেই আমাদের দেশে আমাদের সাহিত্য নূতন পথ অবলম্বন করিয়াছে।

এই দুই দেশীয় আধুনিক সাহিত্যের ভাবের এবং চেহারার অনেক মিল আছে। ফরাসী বিপ্লব মানুষের স্বরচিত গণ্ডি ভাঙিয়া মানুষকে বিশ্বের রাজপথে সমস্ত প্রকৃতির মাঝখানে ঠেলিয়া দিয়াছিল, বৈষ্ণবপ্রেম সমাজের দাসত্বের উর্দ্ধে শাশ্বত সৌন্দর্য্যলোকে আমাদের আত্মার স্বাধীনতা ও মুক্তির বার্ত্তা প্রচার করিয়াছিল।

কিন্তু গণ্ডি ভাঙিলেই গণ্ডি ভাঙা যায় না—সামঞ্জস্য চাই বলিলেই সামঞ্জস্য মিলেনা—তাহাকে বহুসাধনায় বহুধৈর্য্যে বহুদিন ধরিয়া রচনা করিয়া তুলিতে হয়। কেবল এটা না—ওটা না—চাই না—চাই না—'অনন্ত না' মানুষকে শূন্যতার মধ্যে টানিয়া লয়, বাস্তব

সৃষ্টি বলে অনন্ত হাঁ, সব হাঁ—সে স্বীকারোক্তি বড় কঠিন।

বৃন্দাবনের আইডিয়াল যেমন প্রথম বৈষ্ণবকুলকে ঘরছাড়া করিয়া দিয়াছিল, তেমনি ইউরোপের অষ্টাদশ শতাব্দী ও উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের সাহিত্য 'বৃহৎ না'র উপরে সৌন্দর্য্যের মায়ালোক নির্ম্মাণ করিয়া বাস্তবলোক হইতে মানুষের চিত্তকে সরাইয়া সেই মায়াপুরীর মধ্যে বিভ্রান্ত করিয়া ঘুরাইয়া ছিল। শেলি বায়রণ-রুশো প্রভৃতির রচনা এক রকমের আইডিয়াল বৃন্দাবন—বাস্তব সংসার হইতে অনেক দূরে।

বাংলাদেশেও এক সময়ে আমরা বলিয়াছি—

ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর।

কেবল মাত্র ভাবুকতার অভিসার যাত্রাকে একসময়ে মানবজীবনের চরমতম যাত্রা বলিয়া মনে হইয়াছিল এবং শূন্য শয়ন গৃহে বসিয়া অর্দ্ধসকল্পনার ঈজিয়ান দ্বীপের উপর কাল্পনিক মায়াপ্রাসাদে আদর্শ প্রেম উপভোগ করিবার আকাঙ্খা একসময়ে যথেষ্ট বলবতী ছিল। তখন আমাদের দেশেও সাহিত্য রোমাণ্টিক আত্মার মুণ্ডিত উর্ব্বশীর মত সৌন্দর্য্যে আপূর্ণ—সাহিত্যের মধ্যে নিত্যকালের সতীমূর্ত্তি দেখিবার মত শুভ অবসর তখনও আসে নাই। বায়রণ শেলি রুশো কিটের মত তখন মাইকেলের ধর্ম্মবিদ্রোহী-রাবণের অজেয় পৌরুষের কাব্য, এবং বঙ্কিমবাবুর রোমাণ্টিক প্রেমের উপন্যাস-গুলি আমাদের সাহিত্যাকাশে নবপ্রভাতের সূচনা করিতে ছিল। বৈষ্ণবীভাব তখনও পূরা হাড়ে মজ্জায়। তখনও সব 'হাঁ'র সময় আসে নাই, বাস্তবের কঠিন অটল মূর্ত্তি সৌন্দর্য্যের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে নাই।

যখন বাস্তব নাই, কল্পনা আছে তখন বিশ্বামিত্রের মত কল্পনাই নিজের সৃষ্টি নিজে করিয়া চলে। সে সৃষ্টির সঙ্গে বিশ্বসৃষ্টি মেলে না। তার জ্ঞান বলে—আত্মপ্রত্যয় বড়, না বাহিরের অনন্ত খণ্ডতার জাল বড়? প্রেম বলে,—দুঃখ মৃত্যু কেন পথে আসিয়া দাঁড়ায়, ইন্দ্রিয় বিকার কেন দেখা দেয়,—তবে কি প্রবৃত্তি ভাল না নিবৃত্তি ভাল? তার সৌন্দর্য্যবুদ্ধি বলে,—সৌন্দর্য্য কেন বরাবর দেখা দেয় না, তার বিকার কেন?—এইরূপে দ্বন্দ্ব ভাঙিতে গিয়া নূতন দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিয়া সেই শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া সে কাঁদিতে থাকে—কোথা সত্য, কোথা প্রেম, কোথা সৌন্দর্য্য, কোথা আনন্দ?

আধুনিক সাহিত্যে যে Lyric cry বলিয়া একটা কথা আমরা বলি সে এই ক্রন্দন—এই ক্রন্দনই এপিসিকিডিয়ন, এই-ই ম্যানফ্রেড কেইন, সেই-ই এমিলে, এই-ই সরোজ অব্ বার্টার।

সাহিত্য পাঠক মাত্রেই জানেন যে জর্ম্মাণ কবি গ্যয়টে ফরাসী বিপ্লবের এই সাহিত্যের রক্তশূন্য ভাব-কুহেলিকার জাল কেমন করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন। গ্যয়টে খৃষ্টধর্ম্মের বিরোধী হইয়া নিজেকে অবিশ্বাসী বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন—আইডিয়ালিজম্ মাত্রকে গ্যয়টে এমন নির্ম্মম চক্ষে দেখিয়াছিলেন।

তাঁহার একটি কারণ ছিল। প্রকৃতির সঙ্গে আত্মার যে ধর্ম্মে মিল নাই—জগৎ যে

ধর্ম্মে যত্র এবং ঈশ্বর দ্রষ্টা, ঈশ্বর জগতে নাই আমাদের মধ্যে নাই—তিনি দূরে—যে ধর্ম্ম একথা বলে, সে আমাদের ভাবরসের মধ্যে নিশ্চয়ই নিমজ্জিত করিবে। সে কখনই বাস্তবের দিকে আমাদের মুখ ফিরাইবে না। গ্যয়টে তাই গ্রীক্ আর্ট ও গ্রীক্ তত্ত্বের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন। গ্রীক্ আর্টে বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতিতে কোন বিরোধ নাই—সেখানে দুয়ের মধ্যে একটা শান্তির সম্বন্ধ বিভ্যমান। গ্রীকদের সম্বন্ধে গ্যয়টে বলিতেছেন "তাহারা নিকটতম সত্যতম বাস্তবতম বিষয়ে এমনি অভিনিবিষ্ট থাকিতে পারিত যে তাহাদের কল্পনাপ্রসূত ছবিতেও একটা হাড় আছে একটা মজ্জা আছে।" বাস্তবের সঙ্গে আদর্শের সামঞ্জস্যের জন্যই গ্যয়টে নিজেকে গ্রীক্ বলিয়া গৌরববোধ করিতেন।

গ্যয়টের জীবনচরিত যাঁহারা জানেন, সরোজ অব্ বাটার বা গজ্ যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন এক সময়ে রোমাণ্টিক ভাব, বাস্তবিকতাশূন্য ভাবরস-সম্ভোগের ভাব গ্যয়টের মনে কি প্রবল ছিল।

ফাউষ্টে তাই গ্যয়টে ঐ প্রকার ভাববিলাসিতার কি পরিণাম তাহা আঁকিলেন। সেটা বিষবৃক্ষের মত একটা সাংসারিক ঘটনার স্বাভাবিক পরিণামের চিত্র নয়, সেটা বাস্তববিচ্ছিন্ন অষ্টাদশ শতাব্দীর অবৈজ্ঞানিক ইউরোপের অবশ্যম্ভাবী পরিণামের ছবি।

তত্ত্বজ্ঞানী ফাউষ্ট মেফিস্টফিলিস ভূতের হাতে পড়িয়া 'চিরন্তন না'র রাজ্যে বিভ্রান্ত হইয়া ঘুরিতেছিল। জ্ঞানকে ভাববিশ্বাস হইতে, সৌন্দর্য্য হইতে, মঙ্গল হইতে, বিচ্ছিন্ন করিলে তাহার যে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি হয় গ্যয়টের মেফিস্টফিলিস ভূতের অবিকল সেই চেহারা। ফাউষ্টকে সে কোন জায়গায় হৃদয় বাঁধিতে দিবে না, সমস্ত জগতের ছবি তার কাছে একটা মস্ত বিদ্রূপ,—সে কেবল না, না, না একটা অনন্ত 'না'র রাজ্যে চিরদিন ঘুরাইবে। ফাউষ্ট মানুষ, তিনি তো ভূত নন্, তাই তাঁহার নিজের অশান্ত প্রবৃত্তির উদ্দাম উচ্ছ্বাস জ্ঞানের সঙ্গে প্রেমের সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে না পারিয়া তাঁহাকে পাপের পঙ্কে ডুবাইল।

কৃষক বালিকা মার্গারীটের তিনি সর্ব্বনাশ সাধন করিলেন; কিন্তু সেইখানেই তাঁহার মুক্তি—সেইখানেই তাঁহার নিকটে জগতের আর একটা দিকের পর্দ্দা খুলিয়া গেল—মানুষকে তিনি অনন্ত জয়পরাজয় উত্থান-পতনের মধ্যে গৌরবান্বিত করিয়া দেখিতে পাইলেন—এই দ্বন্দ্বের মধ্যে সত্যের চিরন্তন মূর্ত্তিকে নিসংশয়রূপে দেখা কেবল জ্ঞানের গতির মধ্যে থাকিলে তাঁহার পক্ষে কদাচ সম্ভব হইত না।

বিজ্ঞানের আদিগুরু গ্যয়টে এইরূপে মানুষকে ভাবকুহেলিকা হইতে বাস্তবে উত্তীর্ণ করিয়া দিলেন। প্রাকৃত অতিপ্রাকৃতে বিরোধ বাধাইয়া খৃষ্টধর্ম্ম যেভাবে মানুষকে প্রাকৃত হইতে দূরে ফেলিয়াছিল, তাহার প্রতি বিদ্রোহ করিয়া গ্যয়টে প্রাকৃতের মধ্যেই প্রাকৃতের অতীত পরম সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিলেন।

আমাদের দেশেও আধুনিক যুগে যে সাহিত্য জন্মিয়াছে, তাহা পুরাতন বৈষ্ণবী-ভাবকে আশ্রয় করিয়া কেবল ভাবুকতার প্রসার বৃদ্ধি করিতেছে না—তাহা আমাদের দেশের প্রকৃতি ও আমাদের দেশের মানুষকে

আশ্রয় করিয়া জীবনের সমস্ত সমস্তাজালকে একে একে উন্মোচন করিতেছে। মানুষকে ইতিহাসের মধ্যে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে বৃহৎভাবে দেখিবার জন্ত তাহার মধ্যে এক প্রকাণ্ড এক বিরাট আহ্বান আছে। এখনও তাহা হয়ত সম্পূর্ণ মূর্ত্তি পায় নাই, এখনও প্রাচীনের সঙ্গে তাহার সুন্দর সামঞ্জস্ত স্থাপিত হয় নাই, এখনও তাহা কেবল আহ্বানমাত্রই; কিন্তু বাস্তবের উপর অধিকার তাহার যে পরিমাণে দেখা গিয়াছে, সেই পরিমাণেই তাহার সম্বন্ধে আমাদের ভবিষ্যৎ আশা। কিন্তু এবিষয়ে এখন অধিক কথা বলা শোভা পায় না।

আমি দেখাইলাম বাস্তবচিত্র সাহিত্যে এত দরকারী কেন। চিন্তার দ্বৈতের মধ্যে বাস্তবের সুন্দর সম্পূর্ণ মূর্ত্তি আমাদের পরিত্রাণ। বাস্তবকে তাই সৃষ্টি করিয়া তুলিতে গেলে একদিকে যেমন আত্মপ্রত্যয়ের দ্বারা কেবল নিজেরি মধ্যে পরিপূর্ণ সত্যের উপলব্ধি চাই, অন্তদিকে তেমনি নানা অভিজ্ঞতা নানা উত্থানপতনের ভিতর দিয়া সেই সত্যকে স্পষ্ট করা চাই—তবেই এ দুয়ের মাঝখানে বিস্তৃত সেতুর মত বাস্তবছবি ফুটিয়া উঠিবে। গ্যয়টের কাব্যে আমরা সেই আভাস পাইয়াছি।

ফরাসী বিপ্লবের সাহিত্য একেবারে বাস্তবশূন্ত উচ্ছ্বাসের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু বৈজ্ঞানিক যুগে সেই ভাবকে রূপের ছন্দে দৃঢ় করিয়া না বাঁধিলে তাহা কূলত্যাগী হইয়া সর্ব্বনাশ ঘটাইত।

কেবল একটা জিনিস গ্যয়টের সাহিত্যে ছিল না; কঠিন সত্যকে আবার গলাইয়া দিতে পারে যে ভক্তি—বৈষ্ণব শাস্ত্র যাহাকে মুক্তির চেয়েও বড় বলিয়াছে—গ্যয়টের সাহিত্যে সেই ভক্তির অভাব ছিল।

মিডিভ্যাল বৈরাগ্য—আত্মায় ও ইন্দ্রিয়ে বিরোধ—অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস—গ্যয়টের ভাল লাগিত না, কিন্তু তাহার মধ্যে আত্মানুভূতির জন্ত প্রাণপণে আত্মবিলোপের কথা আছে, সেই খৃষ্টভক্তিতত্ত্বের দিকে যদি ইউরোপের চোখ না খুলিত তবে গ্যয়টের মত বৈজ্ঞানিক সামঞ্জস্তও একসময়ে মেফিষ্টফিলিসের ভূতের কাণ্ড হইয়া দাঁড়াইত সন্দেহ নাই।

ব্রাউনিং হুইটম্যান প্রভৃতি আধুনিক কবি পাশ্চাত্যসাহিত্যে সেই ভক্তির সুর আনিয়া দিয়াছেন। "সা পরমপ্রেমরূপা অমৃতরূপা"—তাঁহারা ইহারই গান করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রেমের কাছে তাই মানুষের রোগশোক, পাপপুণ্য, ক্রিয়া অক্রিয়া, জীবন-মৃত্যু, তুচ্ছবৃহৎ সমস্তই সার্থক। এ সমস্তেরই ভিতর দিয়া আত্মার গতি, কিছু বাদ দিয়া নয়,—সমস্তকে পরিপূর্ণ করিয়া আমাদের জীবনযাত্রা অনন্তের অভিমুখে চলিয়াছে—ভক্তির দ্বারা বাস্তবকে এমন করিয়া সম্পূর্ণ করিয়া আধুনিক কাব্য দেখিতে পারিয়াছে।

সমস্ত আধুনিক সাহিত্যেই এই প্রকাণ্ড সামঞ্জস্তের ধর্ম্ম কাজ করিতেছে। মানুষের জ্ঞান যেমন অন্তরে বাহিরে মিলিয়া অখণ্ড সত্যকে সমস্ত বিরোধের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতেছে, মানুষের কাব্য তেমনি জ্ঞানকে আনন্দের মধ্যে সাকার সত্যরূপে দাঁড় করাইতে চাহিতেছে। আত্মার মধ্যে যিনি সচ্চিদানন্দ, ইন্দ্রিয়ের মধ্যে তিনিই রূপরূপী

যাত্রবানন্দ—তত্ত্ব ও সাহিত্য আধুনিক যুগে এমন্কি হাতাহাতি চলিয়াছে।

গভীরভাবে তলাইয়া দেখিলে দেখিব সমস্ত আধুনিক সমন্বয় চেষ্টার মধ্যে বাংলা সাহিত্যও একটি স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। কবিরের একটি দোঁহা আছে যে, যে কেহ ভক্ত সে বিশ্বশতদলের পাপড়ির মত;—দিগ্‌দিগন্তর কালকালান্তর হইতে সবাই আসিয়া জুটিতেছে এবং গ্রথিত হইয়া সম্পূর্ণ পুষ্পটিকে প্রকাশ করিতেছে। বাংলা সাহিত্যেরও একটা প্রাপড়ির যেমনি বিশ্বশতদলের মধ্যে ডাক পৌঁছিয়াছে—যে মিলিলেই সমস্ত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া উঠিবে। কিন্তু সে সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার সময় আসে নাই, কারণ চোখ ফুটিবার সময় হইলে যাহা দেখিবার তাহা আপনিই দেখা যায়, যতক্ষণ চোখ বন্ধ, ততক্ষণ কোন দৃষ্টির কথা না বলাই ভাল।

শ্রী—

মন্বন্তরের শেষ।

প্রায়শ্চিত্ত।

As Mahommed Reza Khan had the express orders of the Company and the regulations of the Committee before him for his guidance, we are greatly astonished that he should presume, on such frivolous pretences, to disobey the one, and totally to disregard the other; and it is impossible, after detecting him in such conduct, that we should any longer consider him as a proper object of that full confidence hitherto reposed in him. We have in this transaction the plainest proof of his secretly counteracting our positive commands; and we must conclude that he will not scruple to repeat the same practices, whenever self-interest and a favourable opportunity occur for that purpose.

London Despatch to India; 28th Aug. 1771.

যে কাল মন্বন্তরে বাংলায় সর্ব্বনাশ সংসাধিত হইয়াছিল, যে একবৎসর(দশ মাস!) ব্যাপী মন্বন্তরের ফল ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত চলিয়াছিল, যে মন্বন্তরের কথা স্মরণ হইলে আজিও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, যে মন্বন্তরের সহিত কোম্পানীবাহাদুরের রাজস্ব ঘনিষ্ট সম্বন্ধবদ্ধ ছিল, মন্বন্তরের যে বিরাট নরমেধযজ্ঞকাহিনী শুনিলে—এতকাল পর আজিও শরীরে রোমাঞ্চ হয় তাহার সহিত এদেশের রাজস্ব ও রাজস্বরক্ষকের যেমন সম্বন্ধ ছিল, কোম্পানীবাহাদুর

ও ডিরেক্টর সভার যেমন সম্বন্ধ ছিল—নাটোর, বর্দ্ধমান, দিনাজপুর, বিষ্ণুপুর, বীরভূমি, রাজমহলের যেমন সম্বন্ধ ছিল ততোধিক সম্বন্ধ ছিল মহম্মদ রেজাখাঁর এবং মহারাজা সিতাব রায়ের।

একজন মুসলমান আর একজন হিন্দু ক্ষত্রিয়। উভয়েই কোম্পানীর আমলে শ্রেষ্ঠ রাজসম্মান লাভ করিয়াছিলেন, উভয়েই কোম্পানী বাহাদুরের "জীবনকাঠি" "মরণকাঠির" কর্ত্তা হইয়াছিলেন—উভয়ের চরণতলে নিপতিত হইয়াই রামধন ও মবারক নন্দ অনেক অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিল। বাংলার ইতিহাসে তাই উভয়েই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন—বাংলার হর্ষ ও বিষাদের সহিত উভয়েরই আমরণ সম্বন্ধ।

"পাপিষ্ঠ" মীরজাফর যখন বাংলার নবাব তখন সিরাজ নগরের একজন বৈদ্য হাদিখাঁ আকুলি ঢাকার উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। মহম্মদ রেজাখাঁ সেই হাদিখাঁর পুত্র। নবাব সিরাজুদ্দৌলার জননী আমিনা বেগমের ভগ্নী রাবিয়া বেগমের কন্যার পাণি গ্রহণ করিয়া রেজাখাঁ বেশ সুখে সচ্ছন্দেই কালাতিপাত করিতেছিলেন।

ইতিহাস আমাদিগকে যে সময় মহম্মদ রেজাখাঁর সহিত পরিচিত করিয়া দেয়, তখন তিনি জাহাঙ্গীর নগরের (ঢাকা) নাজিরের পদে প্রতিষ্ঠিত। মহারাজা নন্দকুমার তখন বাংলার দেওয়ান। নবাবসরকারে নন্দকুমারের অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল। রেজাখাঁ নন্দকুমারের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না—বাংলার নবাবের আদেশে তিনি কর্ম্মচ্যুত হইয়া মুর্শিদাবাদের কারাগারে অবরুদ্ধ হইলেন! রেজাখাঁর ইতিহাস হয় ত সেই কারাগারের শৈলপ্রাচীর মধ্যেই চিরদিনের জন্য সমাপ্ত হইত, কিন্তু কাশীমবাজার কুঠির বড়কর্ত্তা মহম্মদ রেজাখাঁকে রক্ষা করিলেন।

বাংলার এবং আজিমাবাদের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করিয়া অল্পকাল মধ্যেই লর্ড ক্লাইব পুনরায় এদেশে আসিয়া উপনীত হইলেন। নন্দকুমারের গৌরবসূর্য্য ইতিপূর্ব্বেই অস্তমিত হইয়াছিল—তিনি কলিকাতায় নজর-বন্দীস্বরূপ বাস করিতেছিলেন। তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছিল। যাঁহারা স্বদেশদ্রোহী বিধাতার বজ্র একদিন না একদিন তাঁহাদিগের শিরে নিপতিত হইবেই হইবে—পৃথিবীর ইতিহাস সহস্রবার ইহার প্রমাণ দিয়াছে। উমীচাঁদ ও মীরজাফর, নন্দকুমার ও মহম্মদ রেজাখাঁ ইহার পরিচয় দিয়াছেন। বাংলার—এমনকি ভারতবর্ষের ভাগ্য একদিন যে নন্দকুমারের করতলবদ্ধ ছিল—যাঁহার বিশ্বাসঘাতকতায় ইংরাজ একদিন চন্দননগর অধিকার করিয়াছিলেন *

* We the servants of the East India Company should always be grateful to that noble-minded and wealthy native merchant of Calcutta—Omichand. It was through his agency that we succeeded to secure the assistance and co-operation of Dewan Non Coomar Foujdar of Hugli. A body of Subadar's troops was stationed within the bounds of Chandranagur previously, to our attack of that place. These troops......were under the command of Dewan Nanda Kumar. If these troops had not been withdrawn it would have been highly improbable to gain the victory.—Proceedings of the Select Committee—10 April, 1757.

যাঁহার বিশ্বাসঘাতকতার জন্যই একদিন ইংরাজবাহিনী বিনা বাধায় পলাশীক্ষেত্রে উপনীত হইয়াছিল, তিনিই একদিন ইংরাজের কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন এবং শেষে ফাঁসিকাষ্ঠে আত্মবলি প্রদান করিয়াছিলেন; উমিচাঁদ—যাঁহার নিকট ইংরাজ চিরকৃতজ্ঞ ছিল—যাঁহার সাহায্যে কোম্পানীর বাণিজ্য লব্ধপ্রসর হইয়াছিল, ইংরাজ কর্তৃক ঢাকার দুর্গ অবরোধকালে তিনিও কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন, অবশেষে ক্লাইবের সেই ইতিহাস-বিখ্যাত জাল সন্ধিপত্রে উমিচাঁদের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত হইয়া গেল; উমিচাঁদ জ্ঞান হারাইয়া উন্মাদ হইলেন! যে মীরজাফরের অনুগ্রহে ইংরাজ আজ বাংলার রাজা—সেই মীরজাফর ইংরাজকর্তৃক সিংহাসনবিচ্যুত হইয়াছিলেন—মীরজাফরের প্রায়শ্চিত্ত মীরণের বজ্রাঘাতে এবং বসন্তরোগে নবীন নবাব নজমুদ্দৌলার মৃত্যুতেই পূর্ণ হইয়াছিল! অনুসন্ধান করিলে স্বদেশের এবং বিদেশের কাহিনীতে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব হইবে না।

ইতিহাসে লর্ড ক্লাইভের একটা "গর্দ্দভের" কথা * শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তাঁহার বোধহয় আর একটীরও প্রয়োজন ছিল। মহম্মদ রেজাখাঁ সাবাৎজঙ্গ বাহাদুরের সে অভাব পূর্ণ করিয়াছিলেন! রেজাখাঁর সৌভাগ্য ফিরিল। কর্ম্মবিচ্যুত কারাবাস-ক্লিষ্ট যে রেজাখাঁ মুর্শিদাবাদের রাজপথে বিচরণ করিতেছিলেন লর্ড ক্লাইবের অনুগ্রহে তিনি "বাহাদুর মুজাফর জঙ্গ" উপাধি প্রাপ্ত হইলেন—শেষে 'মৈন্-উদ্-দৌলা, মুবারিজ-উল্-মুল্‌ক খান্‌খানান্' উপাধি লাভ করিয়া নবাব নজমুদ্দৌলার মন্ত্রীপদে বৃত হইলেন! ইংরাজ বাহাদুর কিন্তু তখনও মহম্মদ রেজাখাঁর কর্ম্মপটুতায় সন্দিহান ছিলেন।† নবাবের সঙ্গে সরকার বাহাদুরের যে সকল রাজকার্য্য হইল মহম্মদ রেজাখাঁ তাঁহার সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলেন। ইতিপূর্ব্বে মহারাজা নন্দকুমারই প্রকৃতপক্ষে বঙ্গ, বেহার এবং উড়িষ্যার নবাব হইয়াছিলেন। মিরজাফর কেবল 'গুলি খাইত' এবং চেহেল্‌সুতুনে দোললীলা করিত। মিরজাফর মৃত্যু-মুখে পতিত হইতে না হইতেই নন্দকুমার বন্দী হইয়া কলিকাতায় আসিলেন; মহম্মদ রেজাখাঁ তখন বাংলার নায়েব-দেওয়ান হইলেন।

মহারাজ সিতাবরায় তাঁহার অক্ষমতা জানাইয়া যখন বলিলেন যে পরলোকগত রাজা রামনারায়ণের ভ্রাতার উপর কোন অত্যাচার করিয়া তিনি কোম্পানীবাহাদুরের অর্থ আদায় করিতে পারিবেন না, তখন তাঁহারই প্রস্তাব অনুসারে লর্ড ক্লাইবের আদেশে মহম্মদ রেজাখাঁ সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। অল্পদিন মধ্যেই আজিমাবাদ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিল যে মহম্মদ রেজাখাঁ সহজ লোক নহেন! রাজকর্ম্মচারিগণ কারারুদ্ধ

* Scott's History of Bengal. † It appears that though Mahomed Reza Khan is a very pliable gentleman, yet we do not very much approve his appointment to the post of Naeb Nazim of Bengal. This gentleman has a very large amount of passive goodness. But we want a very active man who would most willingly lend us valuable assistance in the improvement of our most lawful trade—Select Committee, Sept 1765.

হইল, কেহ বা বিষম প্রমত্ত হইয়া নানা কথা ব্যক্ত করিয়া দিল। রাজ ভ্রাতা অবশেষে সিংহাসন হইতে অপসৃত হইলেন। মহম্মদ রেজাখাঁর খুব নাম বাড়িয়া গেল!

সরকার বাহাদুরের আদেশে মহারাজা সিতাবরায় আজিমাবাদের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিয়াছিলেন—সাইক্স সাহেব এবং রেজাখাঁ মুর্শিদাবাদে থাকিয়া রাজকার্য্য পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। লর্ড ক্লাইবের কর্ত্তব্য ফুরাইল। তিনি তাঁহার দ্বিতীয় গর্দ্দভটীকে মানুষ করিয়া বিলাতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। মহম্মদ রেজাখাঁ তখন রাজস্ববিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া মবারক ও রামধনের শোণিত শোষণে মনোনিবেশ করিলেন—মহম্মদ রেজাখাঁর প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার নিয়োগ সম্বন্ধে সরকারি দপ্তরে যে গূঢ় রহস্য নিহিত রহিয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত পত্র হইতেই প্রকাশিত হইবে। *

বাংলায় যখন মন্বন্তরের প্রবল অনল জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, রেজাখাঁ তখন বাংলার নায়েব দেওয়ান! তিনি তখন রাজস্ব-বিভাগেরও কর্ত্তা! তাই আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে সরকারের বাসনা পূর্ণ করিতে রেজাখাঁর কোন রূপ শৈথিল্য ছিল না।—তাই আমরা দেখিয়াছি যখন বাংলার কর্ষণযোগ্য ভূমি আছে অথচ কৃষক নাই তখন বাংলার রাজস্ব শতকরা দশ টাকা করিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল! কোম্পানী বাহাদুর দেখিলেন মহম্মদ রেজাখাঁ তাঁহাদিগের পরম বন্ধু—রেজাখাঁ জানিলেন কোম্পানী বাহাদুরই তাঁহার সর্ব্বস্ব।

---

* Whereas the old Nabab Meer Jaffer is dead, it is our bounden duty to appoint a new Nabab in his place. There are several candidates for the throne, each of whom calls himself lawful heir to Meer Jaffer. But the most righteous and equitable course to be followed in this emergent affairs should be to put the post of Soobadari to public Sale. Thus it will enable the highest bidder to acquire it by the most lawful means.

Our esteemed president Mr. Spencer has recently arrived here from Bombay. This is an occasion for improving his fortune by the most lawful means. And we the members of the Council should be wanting in our faith in Christianity, if we ever thought of neglecting to avail ourselves of such opportunity for improving our fortune.

The highest bid, made up to this time, is on behalf of Najamoodullah *ie*, two lacs to president Mr. Spencer, one lac twenty thousand five hundred to Middleton, one lac twelve thousands to Mr. Leynster, and to each of Messers Pleydell, Burdutt and Gray one lac only. The hammer be struck and we do ordain that Najammoodullah be placed on the throne of Bengal, Behar and Orissa.

As regards the appointment of a Naeb Nazim, we do further ordain that whereas we hate Nan Coomar who is a shrewd Hindu, not at all pliable, and who is always opposed to the most lawful trade we are carrying on in Bengal, Mahomad Raza Khan a most pliable and energetic Mahomedan gentleman be appointed Naeb Subadar of Bengal, Behar and Orissa. He is a very religious man and is in the habit of saying his prayer six times a day............Secret Select Committee, held on the 10 February, 1765.

কিন্তু রেজাখাঁ একবার বিলাতের ডিরেক্টর সভায় লিখিয়া বসিলেন, ইংরেজ গোমস্তাগণ দেশের শস্য লুটিয়া খাইতেছে—প্রজার অন্ন কাড়িয়া লইতেছে! রেজাখাঁর পত্র বিলাতে যাইবামাত্রই মহা অনর্থ ঘটিল। বিলাতের কর্ত্তাগণ বিরক্ত হইয়া কলিকাতার কোম্পানীকে যেরূপ পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। রেজাখাঁর কপালও এই সময়েই পুড়িয়াছিল!

রেজাখাঁর আয়ের অভাব ছিল না—তাঁহার অর্থও অনেক ছিল। কোম্পানী বাহাদুরের সঙ্গে সঙ্গে চাউল বিতরণ করিবার জন্য রেজাখাঁও কিছু অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি কপর্দ্দকশূন্য বাঙালীদিগের শোণিতে আপন পিপাসা মিটাইতেছিলেন—তাঁহাকে বাধা দিবার কেহ ছিল না, শাসন করিবারও কেহ ছিল না। মুর্শিদাবাদে মন্বন্তর প্রশমনের জন্য যাঁহারা নিযুক্ত হইয়াছিলেন, রেজাখাঁ ছিলেন তাঁহাদিগের কর্ত্তা। তাঁহার তত্ত্বাবধানে মুর্শিদাবাদের এরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল যে এক মুষ্টি চাউল পাওয়া দূরে থাক্—যাহার অর্দ্ধমুষ্টি তণ্ডুল ছিল, সে উহা রক্ষা করিতেও অসমর্থ হইয়াছিল!

রাজা অমৃত সিংহ, মীর সলিমন্ খাঁ প্রভৃতি কয়েকজন লোক রেজাখাঁর অধীনে দুর্ভিক্ষ দমন করিতেছিল। ইহারা মনে করিল বাংলার মন্বন্তর তাহাদের সমৃদ্ধির সোপান। এই সকল পাপিষ্ঠ স্বার্থপর রাক্ষসস্বভাব রাজকর্ম্মচারিগণ কোথায় মুর্শিদাবাদে চাউলের প্রাচুর্য্য ঘটাইবে কি, প্রতিদিন উহা মহার্ঘ করিয়া তুলিল। এই রাক্ষসদলের মধ্যে নিয়ামত্ উল্লা খাঁ বলিয়া একজন লোক ছিল। নিয়ামত্ নবাব মিরজাফরের সামান্য ভৃত্য মাত্র ছিল, পরে রেজাখাঁর গোলাদার হইয়াছিল! এই ত তাহার উচ্চ পদ! কিন্তু সেই নিয়ামত্ পর্য্যন্ত বাংলার মন্বন্তরে ১৮ লক্ষ মুদ্রা সঞ্চিত করিয়াছিল!

যখনই শস্যপূর্ণ তরণী আসিয়া মুর্শিদাবাদের বন্দরে লাগিত, রেজাখাঁর প্রিয় কর্ম্মচারিগণ অমনি সে সকল তরণী লুণ্ঠন করিত, তণ্ডুলাদি গ্রহণ করিয়া যাহা ইচ্ছা একটা মূল্য ফেলিয়া দিত এবং পরে সুবিধা দরে সে সমুদায় বিক্রয় করিত। একদিন কতকগুলি ক্ষুধিত কৃষক একখানি চাউলের নৌকা ঘিরিয়া ধরিয়াছিল, কিন্তু রেজাখাঁর অন্তরতম বন্ধু রাজা অমৃত সিংহ সেই নিরুপায় হতভাগ্যদিগকে বলপূর্ব্বক তাড়াইয়া দিয়া সমস্ত চাউল নিজে লইয়াছিলেন!

রেজাখাঁ যে এসকল কাহিনী জানিতেন না, ইতিহাস তাহা কহে না। বাংলার সেই বেদনার কাহিনী অঙ্গুলি সঙ্কালনে দেখাইয়া দিতেছে যে মন্বন্তর যখন অতিশয় প্রবল, রেজাখাঁর অত্যাচারও তখন নিতান্ত নিদারুণ হইয়াছিল! তিনি বিস্মৃত হইয়াছিলেন যে পৃথিবীতে দয়া বলিয়া একটা ধর্ম্ম আছে—তিনি ভুলিয়াছিলেন যে জাহান্নম ও বেহেস্ত বলিয়াও দুইটা স্থান আছে*—তিনি ইহাও বিস্মৃত হইয়াছিলেন যে তিনি বাংলার নায়েব-দেওয়ান, তাপিতের পিতা, বিপন্নের রক্ষাকর্ত্তা। সকল ভুলিয়া রেজাখাঁ তণ্ডুলপূর্ণ নৌকা

* London Despatch to India—28 Aug, 1771. (Para 18)

ধরিয়া রাখিয়া লক্ষ লোকের প্রাণপাত করিতে লাগিলেন—বলপূর্ব্বক টাকায় ২৫।৩০ সের দরে চাউল ক্রয় করিয়া মুর্শিদাবাদের বাজারে টাকায় ৩।৪ সের দরে বিক্রয় করিতে লাগিলেন। শুধু চাউল নহে, কোন প্রকার আহার্য্যই রেজাখাঁর শ্যেন-দৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইত না। কোম্পানী বাহাদুর তখন বিপুল অর্থরাশি পাইতেছিলেন—রেজাখাঁ সেই অর্থের আধার! কোন্ মূর্খ কনকাধারকে পদদলিত করে? কোম্পানী বাহাদুর মূর্খ ছিলেন না—তাই রেজাখাঁর অত্যাচারের প্রতিবিধান হইত না!

পাপ অধিকদিন প্রচ্ছন্ন থাকিল না! বিলাতের পত্র পাইয়া হেষ্টিংস সাহেব মান্দ্রাজ হইতে কলিকাতায় আসিলেন এবং দুই এক দিন মধ্যেই রেজা খাঁ ও মহারাজা সিতাবরায়কে কারারুদ্ধ করিবার আদেশ দিলেন! রেজাখাঁ কোম্পানীর স্নেহের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াছিলেন, কিন্তু সে নির্ভরদণ্ড অকস্মাৎ দ্বিধাভগ্ন হইয়া গেল। মহারাজা সিতাব রায়ের কথা পরে বলিব। রেজাখাঁকে কলিকাতায় আনিবার আদেশ হইল!

মুর্শিদাবাদের বড়সাহেব গ্রেহাম রেজা খাঁর মিত্র ছিলেন, কিন্তু সরকারের আদেশ অমান্য করিতে পারিলেন না; তাই একদিন নিশীথে, কতকগুলি তেলিঙ্গা পল্টন সমভিব্যাহারে 'নিজাৎবাগ' অবরুদ্ধ করিলেন। রেজাখাঁ তখন দুগ্ধ ফেননিভ সুকোমল শয্যায় শঙ্কাশূন্য শয়নে সুখভোগ করিতেছিলেন, এমন সময় সেই নিদারুণ সংবাদ তাঁহার নিকট পৌঁছিল। আপন ক্ষমতা-দর্পে ও কোম্পানী বাহাদুরের অতিমাত্র স্নেহ লাভে রেজাখাঁ এতই আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন যে, প্রথমে এই সংবাদ গ্রাহ্যই করিলেন না; কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই নিদারুণ সত্য নিষ্ঠুরের মত তাঁহার শিরে আঘাত করিল—রেজাখাঁ নিজের প্রাসাদে নিজেই বন্দী হইয়া ইংরাজের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। রেজাখাঁর উপর ইংরাজ কর্ত্তাদিগের আর কোনরূপ বিশ্বাস থাকিল না। দুই মাস মধ্যে তাঁহার হস্ত হইতে রাজস্ব বিভাগের সকল কর্ত্তব্যভার কাড়িয়া লওয়া হইল! তিনি যে উচ্চ আসনে বসিয়া তাহারই শক্তিপ্রভাবে দেশমধ্যে অত্যাচার করিয়াছিলেন, এখন আবার সেই সিংহাসন হইতে বিচ্যুত হইয়া বন্দীর মত কলিকাতায় আসিলেন! রেজাখাঁর প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল।

কলিকাতায় আসিয়াও রেজাখাঁ বন্দী ভাবেই থাকিলেন। ইংরাজ দরবারে তাঁহার যে সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল সে সমুদয় প্রতিদিন ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল—তখন আর তাঁহার দিকে কেহ বড় ফিরিয়া চাহিল না—তাঁহার প্রার্থনা, তাঁহার আবদার—তাঁহার অনুরোধ সকলই সর্ব্বদা প্রত্যাখ্যাত হইতে লাগিল! বিলাতের কর্ত্তারা যাঁহার উপর বিরূপ ছিলেন, বাংলার ইংরাজের সাধ্য কি যে তাঁহারা আবার সেই রাহুগ্রস্তকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন!

রেজাখাঁ বন্দীই থাকিলেন। দিনের পর দিন যাইতে লাগিল—মাসের পর মাস যাইতে লাগিল, রেজাখাঁ চিৎপুরের একটী বাটীতে যেমন বন্দী ছিলেন তেমনিই রহিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব পার্শ্বচরগণ পর্য্যন্ত তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল; একটু সাহস দিবে এমন

কেহ থাকিল না—দুইটা আশার কথা কহিবে এমন কেহ থাকিল না—কোন বিষয়ে যে পরামর্শ দিবে তেমনও কেহ তখন রেজাখাঁর ছিল না। তিনি ভাবিলেন হয়ত বা তাঁহার সমগ্র জীবনই এইরূপ বন্দীভাবে কাটিয়া যাইবে। তখন অমৃত সিংহ পর্য্যন্ত রেজা খাঁকে ত্যাগ করিয়াছিলেন!

শেষে বিচারের দিন আসিল—সেই শেষের সত্য বিচার নহে—পার্থিব নৃপতির বিচারের ভাণ মাত্র! রেজাখাঁ নিজের কথা নিজে কিছুই বলিতে পারিলেন না। আলি ইব্রাহিম নামক একজন অপরিচিত ব্যক্তি স্বাভিলাষ-প্রণোদিত হইয়া রেজাখাঁর পক্ষ-সমর্থন করিতে লাগিলেন। মহারাজা নন্দকুমার এতদিনে একটা সুযোগ পাইয়াছিলেন;—কিন্তু আলি ইব্রাহিমকে পরাস্ত করিতে পারিলেন না; রেজাখাঁ ইংরাজের বিচারে মুক্তিলাভ করিলেন! মুক্তিলাভ করিয়াও তিনি কিছুকাল কলিকাতায় অপেক্ষা করিয়াছিলেন; ভাবিয়াছিলেন যে যে ইংরাজের পাদুকালেহন করিয়া তিনি দেশের অভিসম্পাত গ্রহণ করিয়াছেন, সে ইংরাজ হয়ত তাঁহার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিবেন এবং মহারাজা সিতাব রায়ের ন্যায় তাঁহাকেও পুনরায় রাজসম্মান প্রদর্শন করিবেন। মাথার উপর ধর্ম্ম আছেন—কোম্পানী বাহাদুর ধর্ম্মের দ্রোহাই অবহেলা করিলেন না! ইতিপূর্ব্বে তাঁহারা নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও মহম্মদ রেজাখাঁকে নায়েব দেওয়ানের পদ প্রদান করিয়াছিলেন।* কিন্তু রেজাখাঁর বিচারের পর কোম্পানী বাহাদুর আর তাঁহাকে পূর্ব্বমত অনুগ্রহ করিলেন না।

প্রাচীন ভারতে ইতিহাস ও ঐতিহাসিক।

এদেশের অনেকের এইরূপ একটা কুসংস্কার আছে, এবং বর্ত্তমান লেখকেরও ঐরূপ একটা কুসংস্কার ছিল যে, প্রাচীন ভারতে ইতিহাস-রচনার পদ্ধতি ছিল না, ঐতিহাসিকও ছিল না। যাঁহারা জ্যোতিষ, গণিত, রসায়ন, দর্শন ও ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, কাব্য অলঙ্কার প্রভৃতি নানা বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া আপনাদের প্রতিভার পরিচয় দান করিয়াছিলেন, পুরাবৃত্তসংকলন সম্বন্ধে তাঁহারা কোনও প্রকার যত্ন প্রকাশ করেন নাই, ইহা আমাদিগের নিকট সময়ে সময়ে বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হইয়াছে; কিন্তু পরক্ষণেই আমরা এই

---

* We are therefore compelled to approve and confirm the appointment of Mahommed Reza Khan—Select committee hed on 19 Sept. 1765. কাশিমবাজারের দেওয়ান রামহরি চাটুর্য্যে অভিজাত কুলোদ্ভব কিনা এই সন্দেহেই রেজাখাঁর সৌভাগ্য ফিরিয়াছিল। সেরূপ সন্দেহ না ঘটিলে রামহরিই দেওয়ান হইতেন।

বলিয়া মনকে প্রবোধ দিয়াছি যে, 'প্রাচীন আর্য্যগণ স্বভাবতই ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন, সংসারের ভাব তাঁহাদিগের উপর কখনই সমধিক প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই; এই কারণে তাঁহারা নর-স্তুতি-মূলক ইতিহাস রচনার চেষ্টা না করিয়া, দৈব-লীলাপূর্ণ কাব্য-পুরাণাদি রচনায় সমধিক সময়ক্ষেপ করিয়াছিলেন। ফলতঃ দেশীয় ভাবে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা না করাই এইরূপ ভ্রান্তির একমাত্র প্রধান কারণ।

পাশ্চাত্য মোহের প্রভাব অতিক্রম করিয়া প্রাচীন বৈদিক ও তৎপরবর্ত্তী সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে জানা যাইবে যে, ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল হইতেই পূর্ব্ব-পুরুষগণের ইতিহাস সংগ্রহ ও আলোচনা করিবার প্রথা প্রচলিত আছে। "ইতিহাস ও ঐতিহাসিক" এই দুইটি পদ আমাদের দেশে অতি প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। মনুসংহিতায় দেখিতে পাই যে, পিতৃ-শ্রাদ্ধ-কালে পূর্ব্বপুরুষদিগের ইতিহাস শুনিবার ও শুনাইবার ব্যবস্থা ছিল,—

"স্বাধ্যায়ং শ্রাবয়েৎ পিত্র্যে ধর্ম্মশাস্ত্রাণি চৈব হি।
আখ্যানানীতিহাসাংশ্চ পুরাণানি খিলানি চ।

মনুসংহিতা ৩,২৩২।

এখানে স্বাধ্যায় (বেদ) ধর্ম্মশাস্ত্র, আখ্যান (সৌপর্ণ মৈত্রাবরুণাদির উপাখ্যান) পুরাণ ও খিলগ্রন্থ (শ্রীসূক্তাদি) প্রভৃতির সহিত 'ইতিহাসেরও' স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ থাকায় স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, সেকালে পুরাণ ও উপাখ্যানাদি "ইতিহাস" পদবাচ্য ছিল না—"ইতিহাস" তদিতর একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র ছিল। মহাভারতে দেখিতে পাই, ভগবান্ বেদব্যাস স্বকৃত কাব্যসম্বন্ধে ব্রহ্মাকে বলিতেছেন,—

"কৃতং ময়েদং ভগবন্! কাব্যং পরমপূজিতং।
ইতিহাস-পুরাণানাং উন্মেষং নির্ম্মিতং চ যৎ।

অর্থাৎ আমি এক পরম পবিত্র কাব্য রচনা করিয়াছি, তাহাতে ইতিহাস ও পুরাণের সমাবেশ করা হইয়াছে। সেকালে পুরাণ ইতিহাসের স্বলাভিষিক্ত হয় নাই—পুরাণ ভিন্ন ইতিহাস যে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র ছিল, তাহা এই মহাভারতীয় উক্তি হইতেও প্রতিপন্ন হইতেছে। সে যাহা হউক, প্রাচীন ভারতে ইতিহাসের সমাদর না থাকিলে মনুসংহিতার ন্যায় ধর্ম্ম-গ্রন্থে শ্রাদ্ধকালে উহা পাঠ ও শ্রবণ করিবার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা কেন থাকিবে?

মনুসংহিতা আমাদের দেশে অতি প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়াই পরিচিত। কিন্তু অধুনাতন কালের পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ উহার আধুনিকত্ব প্রতিপাদনে সবিশেষ যত্ন প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ঐ গ্রন্থকে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে আবার কেহ কেহ বা খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৯ম শতাব্দীতে রচিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। মনুসংহিতা যে বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বের গ্রন্থ, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ আমরা দেখিতে পাই না। ঐ গ্রন্থে বেদপ্রধান ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের যেরূপ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, তাহাতে উহাকে বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের কিঞ্চিৎ অধিক পূর্ব্বের গ্রন্থ বলিয়াই নির্দ্দেশ করিতে প্রবৃত্তি হয়।

বৈদিক সাহিত্যেও আমরা "ইতিহাস" শব্দের ও ঐতিহাসিকদিগের উল্লেখ দেখিতে পাই। বেদের নিরুক্ত-প্রণেতা যাস্ক ঐ দুই শব্দের ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ করিয়াছেন।

পণ্ডিত শ্রীসত্যব্রত সামাশ্রমী মহাশয় বলেন যে, যাস্ক খৃষ্টপূর্ব্ব ১৯শ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন যে, তিনি বৈয়াকরণ পাণিনির বহু-পূর্ব্ববর্ত্তী। গোল্ডষ্টুকারের মতে পাণিনি ৯০০ পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১১০০ পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোনও সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। যাস্ক তাঁহার দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়া থাকিলেও আমরা তাঁহাকে খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি। মহামতি যাস্ক তাঁহার নিরুক্তে "বৃত্র" শব্দের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন যে,—

"তৎ কো বৃত্রঃ ? মেঘ ইতি নৈরুক্তাঃ।
ত্বাষ্ট্রো২সুর ইত্যৈতিহাসিকাঃ।"

অর্থাৎ বৃত্র কে ? নিরুক্তকারদিগের মতে বৃত্র মেঘেরই নামান্তর ; ঐতিহাসিকেরা উহাকে ত্বষ্ট-নামক অসুরের পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।" তাহার পর অশ্বিনীকুমার-দিগের পরিচয়-প্রসঙ্গে তিনি ভিন্ন ভিন্ন আচার্য্যের ভিন্ন ভিন্ন মতের উল্লেখ করিয়া পরিশেষে বলিয়াছেন,—

"রাজানৌ পুণ্যকৃতৌ ইত্যৈতিহাসিকাঃ।"

অর্থাৎ ঐতিহাসিকদিগের মতে অশ্বিনীযুগল দুইজন পুণ্যবান্ নরপতি ছিলেন।" আবার দেবাপি ও আর্ষ্টিসেনের পরিচয় প্রসঙ্গে—

তত্রেতিহাসমাচক্ষতে—

ইত্যাদি উক্তি দ্বারা তাঁহাদিগের ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছেন।

নিরুক্তকার যাস্ক যখন এইরূপ পদে পদেই ঐতিহাসিকদিগের মতের ও ইতি-হাসের উল্লেখ করিয়াছেন, তখন বর্ত্তমান সময়ের প্রায় সার্দ্ধ ত্রিশ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে ভারতে ইতিহাস-রক্ষার কোনও চেষ্টা ছিল না, এমন কথা কেমন করিয়া বলিব ? তবে সে ইতিহাসের প্রকৃতি অবশ্যই বর্ত্তমান সময়ের মত ছিল না; থাকাও সম্ভবপর ছিল না। কারণ, সকল দেশের ইতিহাস রচনার নীতি একরূপ নহে। প্রাচীন কালের ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোকের রচিত ইতিহাসে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের প্রাধান্ত পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু সেকালের কোনও দেশের ইতিহাস-লেখকই বর্ণিত ঘটনাপরম্পরার মধ্যে সময়ের পৌর্ব্বাপর্য্য রক্ষা করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেন না। ভারতের প্রাচীন ঐতিহাসিকগণও ঐ বিষয়ে তাদৃশ মনোযোগী হইবার আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন নাই। সামান্ত মানবচরিত্র, সুদীর্ঘ রাজবংশাবলীর তালিকা বা সমাজের ভিন্ন ভিন্ন সময়ের অবস্থার বিবরণ সংকলন অপেক্ষা দেবোপম আদর্শচরিত্র নরনারীগণের গৌরবকর কার্য্য-কলাপের খণ্ড-চিত্রসমূহ চিত্তাকর্ষক ভাষায় রচনা পূর্ব্বক লোক-শিক্ষায় সহায়তা করা তাঁহারা অধিকতর প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিতেন। সমাজে পূর্ব্বগত মহাপুরুষদিগের গৌরবকর কীর্ত্তিসমূহের স্মৃতি জাগরূক রাখা ও সেই সকল ঘটনাসমূহের আলোচনা দ্বারা জনসমাজে উৎকৃষ্ট রাজনিষ্ঠা, শৌর্য্যবীর্য্য, ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, ঔদার্য্য, দয়াধর্ম্ম ও নীতিচাতুর্য্য প্রভৃতি বিবিধ সদ্‌গুণের আদর্শ স্থাপন করাই প্রাচীনকালের ঐতিহাসিকদিগের নিকট অতীব প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। তাই "ইতিহাস" শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ,—

"ইতি-হ আস। নিপাতসমুদায়ঃ "ইতিহৈবমাসীৎ" ইতি য উচ্যতে স ইতিহাসঃ।"

"নিশ্চিতই এইরূপ হইয়াছিল" এইরূপ হইলেও আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বলিতেন,—

"ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশসমন্বিতং।
পূর্ব্ববৃত্তকথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে।"

প্রকৃত ইতিহাসের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের ধারণা কিরূপ ছিল, উল্লিখিত শ্লোক হইতে তাহা আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি। ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষই তখন লোক-শিক্ষার মূল সূত্র ও আদর্শ ছিল, সেই জন্য সেকালে বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় কার্য্যকারণের সম্বন্ধ-মূলক ও সমাজের ভিন্ন ভিন্ন সময়ের অবস্থা-জ্ঞাপক পূর্ব্বাপর সুসম্বদ্ধ ইতিহাস-রচনায় কাহারও আগ্রহ হয় নাই। ইউরোপেও অতি অল্পদিন হইল, ইতিহাস রচনায় এইরূপ রীতি উদ্ভাবিত হইয়াছে।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১।৩,২) কথিত হইয়াছে যে,—

"দেবা বৈ ব্রহ্মণশ্চান্নস্য চ শমলমপাঘ্নন্। যদ্‌ব্রহ্মণঃ শমলমাসীৎ সা গাথা নারাশংস্যভবৎ। যদন্নস্য সা সুরা। তস্মাদ্ গায়তশ্চ মত্তস্য চ ন প্রতিগৃহ্যং। যৎ প্রতিগৃহ্নীয়াৎ শমলং প্রতিগৃহ্নীয়াৎ"—অর্থাৎ, মনীষিগণ বেদের ও অন্নের মলভাগ নিষ্কাশন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের নিষ্কাশিত বেদের মলভাগকে "নারাশংসী গাথা" (নরস্তুতি-বিষয়িণী গীতি) বলে। অন্নের মলভাগ সুরা নামে পরিচিত। এই কারণে গায়কের ও সুরাপায়ীর নিকট হইতে দান গ্রহণ করিবে না। যদি কেহ তাহাদের নিকট দানগ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহার মলপ্রতিগ্রহ করা হয়।"

ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, অতিপ্রাচীন বৈদিককালে নরস্তুতিবিষয়িণী গীতি সমাজ-মধ্যে বহুপরিমাণে প্রচার লাভ করিয়াছিল। ঐ সকল গীতি "নারাশংসী গাথা" নামে পরিচিত ছিল। ঋগ্বেদে বহু স্থলে অদ্যাপি নারাশংসী গাথার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে বৈদিক সাহিত্যের সংহিতাভাগে নারাশংসী-গাথার বাহুল্য ঘটিয়াছিল। নরস্তুতি গায়ক-দিগের অবস্থা বর্ত্তমান কালের রাজপুতনার ভাটদিগের (চারণদিগের) ন্যায় অতিশোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। হয় ত তাহারা সামান্য অর্থলোভে যে সে লোকের গুণের অতিরঞ্জন করিয়া গাথা রচনা করিত। ফলে নরস্তুতি-গায়কগণ দেশের মনীষীদিগের নিকট নিতান্ত হেয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। পরিশেষে মনীষি-গণের চেষ্টায় বেদ হইতে বহুসংখ্যক "নারাশংসী গাথা" নিষ্কাশিত হয় এবং ঐরূপ সামান্য নরস্তুতিমূলক সাহিত্যের প্রচার-লাঘব-কল্পে-পরিশেষে পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রুতি প্রচারিত হয়। এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে যে, এই সময় হইতেই—

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশসমন্বিতং।
পুরাবৃত্ত-কথাযুক্তং ইতিহাসং প্রচক্ষতে।

ইতিহাসের এই লক্ষণ নির্দ্ধারিত হয়। বর্ত্তমান পার্থিবতার যুগে সভ্যজাতি সমূহের ঐতিহাসিক রুচি অবশ্যই বহুপরিমাণে পরি-বর্ত্তিত হইয়াছে; কিন্তু বোধ হয় সাধারণ লোক-শিক্ষা মূলক ইতিহাসের ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর লক্ষণ আর কিছুই হইতে পারে না। হায়! সে সকল উৎকৃষ্ট প্রাচীন ইতিহাসের সন্ধান এখন কোথায় পাওয়া যাইবে?*

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

* এ প্রবন্ধের ইংরাজি-অনুবাদ "ডনে" (The Dawn)এ প্রকাশিত হইয়াছে।—লেখক।

সামাজিক প্রসঙ্গ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সমাজ স্ত্রী ও পুরুষ লইয়া। স্ত্রী, সমাজ সংরক্ষণী শক্তি; স্ত্রী, সমাজের মূলভিত্তি; স্ত্রী, জননী প্রকৃতির ন্যায়, স্নেহ-প্রস্রবণ স্তন্যধারায় জীবসংসারকে রক্ষা এবং পালন করিতেছে। শিশুর প্রথম ভাব-বিকাশ জননীর মুখ দর্শনে, শিশুর প্রথম ভাব-শিক্ষা জননীর আচরণে; জননী জগতে প্রকৃতিগতা শিক্ষয়ত্রী, জ্ঞানের কাঠিন্যকে স্নেহসিঞ্চনে অমন গলাইতে আর কে পারে? সেই নিমিত্তই পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন,—নির্গুণ-পুত্র জননীর মূর্ত্তিমান কলঙ্ক।—কিসের কলঙ্ক?—জননীর জননীত্বের কলঙ্ক, জননীর স্নেহসিঞ্চনের কলঙ্ক! স্নেহের অসদ্ভাবে সুশিক্ষার অসদ্ভাব। মানবের বাল্যে, স্ত্রীমূর্ত্তি মূর্ত্তিমতী শিক্ষা; যৌবনে, কর্ম্মক্ষেত্রে উদ্দীপনার মূর্ত্তিমতী দীক্ষা; বার্দ্ধক্যে, জরাজীর্ণতা এবং অধৈর্য্যের দিনে সেবিকা মূর্ত্তিমতী তিতিক্ষা। এইরূপে সমাজে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া, এই মৃদন্তরা প্রচ্ছন্ন-সলিলা স্রোতস্বতী সমাজকে সজীব রাখে। প্রলয় কালে তাহার মূর্ত্তি অন্যরূপ; যখন কর্ম্মী পুরুষ কর্ম্মক্ষেত্রে ক্ষতবিক্ষত দেহে শবরূপে নিপতিত, তখন তাহার মূর্ত্তি বিপরীত; তখন সে কর্ম্মীকে পশ্চাতে রাখিয়া নিজে কর্ম্মিণী;—শতানন-বধের অসীতা সীতা, তখন সে করালী কালীমূর্ত্তি—প্রলয়ঙ্করী। পাশ্চাত্য ইতিহাসে ফরাসি-শ্মশানে একবার সেই মূর্ত্তি দেখা গিয়াছিল। বর্ণাশ্রম সমাজের সমাজ নিয়ন্তাগণ এই শক্তি-রূপিণীর শক্তি বিলক্ষণ বুঝিতেন; যাহাতে এই শক্তি সংযত ভাবে সমাজের নির্দ্দিষ্ট খাতে আবদ্ধ থাকে তাহার ব্যবস্থায় চূড়ান্ত করিয়া গিয়াছেন। তোমার জীবন তোমার জন্য নয়, তোমার সুখভোগ তোমার দেহে নয়, তুমি প্রকৃতিরূপিণী তুমি সংসারিণী হইয়াও ব্রহ্মচারিণী, তোমার যাহা কিছু বিকাশ পুরুষাকারে তাহা প্রকাশ। তোমাকে পরের সুখে সুখী হইতে হইবে, তোমাকে পরের দুঃখে দুঃখী হইতে হইবে; তোমার জীবন পরের জন্য। এই শিক্ষার জন্য হিন্দুসমাজে বারব্রতের সৃষ্টি, ইহার চরমসীমা সতীর সহমরণে। রমণী-চরিত্রের উৎকর্ষতা প্রমাণের জন্য, যে অগ্নি-পরীক্ষার অগ্নিকুণ্ড সাগর-পারে লঙ্কা দ্বীপে প্রজ্বলিত হইয়াছিল, তাহা ভারতক্ষেত্রে অনেক দিন জ্বলিয়া ছিল। বীরভূমি রাজপুতনার জহর ব্রতে রাজপুত বীররমণীর যে প্রচণ্ড চিতাগ্নি শিখার কথা চারণ কবির গাথায় গীত, বাংলার ভীরু অপবাদগ্রস্ত পতি-সহগামিনী হিন্দু সতীর দেহ ভস্মকারী অগ্নিতে সেই একই শিখা প্রজ্বলিত।

উদ্দেশ্যই মনুষ্যের কর্ম্মের গুণাগুণের নিরূপক। যে মহতীচ্ছা-প্রণোদিত পুত্রহন্তা ব্রুটস্ স্বদেশ প্রেমিকদের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ আসন পাইবার যোগ্য, যে মহতীচ্ছা-প্রণোদিত বন্ধুহন্তা অপর ব্রুটস্ জগতের পূজ্যপাদগণের মধ্যে পরিগণিত, যে মহতীচ্ছা-প্রণোদিত মাতৃহন্তা পরশুরাম ঈশ্বরপদবাচ্য, যে মহতীচ্ছা-প্রণোদিত স্বজনহন্তা বিভীষণ ধার্ম্মিক-পদবাচ্য, যে মহতীচ্ছা

প্রণোদিত পিতৃবৈরী পরসেবী. প্রহ্লাদ ভক্তশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত,—সেই মহত্তীচ্ছায় প্রণোদিত হইয়া আর্য্যঋষি, কল্পস্থানীয়া ভারতললনার সম্মুখে সহমরণরূপ কঠোর আদর্শ স্থাপন করিয়া উচ্চনৈতিক বর্ণাশ্রম সমাজ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই আদর্শের ফলে সাবিত্রী সীতা প্রমুখ আদর্শরমণী পরম্পরার বর্ণাশ্রম সমাজে আবির্ভাব।

মহম্মদীয় সমাজে রমণীচরিত্রের পূর্ণবিকাশের কোন সম্ভাবনা নাই। মুসলমানের নিকট রমণী ভোগের বস্তু,—শ্রেষ্ঠভোগ্য, কিন্তু ভোগ্য মাত্র। বর্ত্তমানে পাশ্চাত্যবিদ্যায় শিক্ষিত মুসলমান নিজ সমাজের এই কলঙ্ক অপনয়নে বিশেষ চেষ্টিত, কিন্তু যখন ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মুসলমান অপ্রতিহত-প্রতাপ, যখন বেশভূষায় আচার ব্যবহারে মুসলমান সাধারণের অনুকরণীয়, তখন মুসলমান পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ করিতে যাইত না, যাইবার আবশ্যকও বোধ করিত না। তখন মুসলমানের অন্তঃপুরের অবরোধ-প্রথা সভ্যতার কোন অন্নতার লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হইত না। এরূপ অবস্থায় হিন্দু সমাজের রমণীচরিত্রের উপর মুসলমান সামাজিকতার কোন বিশেষ ছায়া পড়িবে তাহার কোন সম্ভাবনা ছিল না।

পাশ্চাত্য শাসনের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য-শিক্ষা আসিয়া জুটিল। নবশিক্ষিত হিন্দু, পাশ্চাত্য "মিশ্রসমাজের" চাকচিক্য দেখিয়া মুগ্ধ হইল। বর্ণাশ্রমসমাজে রমণী যে স্বামীর সহধর্ম্মিণী; বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রধান কর্ম্ম-উদ্দেশ্য যে সমাজবন্ধন; বর্ণাশ্রম সমাজনিয়ন্তা যে রমণীকে নিঃস্বার্থতায় দীক্ষা দিয়া তাহাকে প্রধান বন্ধন সূত্রে পরিণত করেন—তাহার নবশিক্ষার মোহে হিন্দু সে কথা ভুলিল!

অনেকদিনের এক পুরাতন কথা মনে পড়িল;—বঙ্গদর্শন যখন বহুবাজার হইতে প্রকাশিত হইত, সঞ্জীববাবু যখন বঙ্গদর্শনের সম্পাদক ছিলেন, তখন তাঁহার বহুবাজারের বাসাবাড়ীতে সঞ্জীববাবুর নিকট জন কতক বাঙালীযুবক তাঁহার অমৃতময়ী ভাষায় নানা বিষয়ের তত্ত্বকথা শুনিতে কখন কখন আসিত। তিনি তাহাদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া, সাহিত্যের "ষষ্ঠীবুড়ী" সাজিয়া কখন কাব্যবিশেষের সরলভাব, কখন যোগশাস্ত্রের তত্ত্বকথার আবির্ভাব, কখন রহস্যের তথ্য-প্রকাশ, কখন মানবপ্রকৃতির আধ্যাত্মিক বিকাশ বুঝাইবার চেষ্টা করিতেন, হিন্দুয়ানীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণই তাঁহার ঐ সকল বৈঠকী কথার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। একদিন কোন যুবক বাল্যবিবাহরূপ কুপ্রথার কথা তুলিলে, তিনি বলিলেন:—"এমন সুপ্রথা আর নাই, উহাই আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের পারিবারিক সুখের প্রধান কারণ। অন্য অন্য সমাজে বিবাহ দম্পতী বিশেষের যৌন সম্বন্ধ স্থাপন, সমাজভূত পরিবার সমষ্টির মধ্যে পরিবার ব্যষ্টির সংগঠন; তাহাদের মধ্যে গঠিত-চরিত্র নরনারী আসিয়া দাম্পত্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়া নূতন এক পরিবার সৃষ্টি করে। পরিণীত দম্পতীর পরস্পরের পারিবারিক স্বচ্ছন্দ পরস্পরের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে; প্রকৃতি নির্ব্বাচনে তাহারা যদি ভুল করে তবে তাহারা তার দায়ী, তাহারা তার ফলভোগী। আমাদের সমাজের গঠন অন্যরূপ; সুতরাং আমাদের সমাজের বিবাহও অন্যরূপ। আমাদের সমাজ একান্নবর্ত্তী

পরিবার সমষ্টির সমাজ। আমাদের সমাজে নবোঢ়া বধূকে বহুজন-সমষ্টি এক পরিবারের অন্যতম ব্যষ্টিস্বরূপা হইয়া স্বামীগৃহে আসিতে হয়, সুতরাং তাহার প্রকৃতির দোষ গুণের ফলভোগী যাহারা তাহার নির্ব্বাচনও তাহাদের হাতে। আমাদের সংসারে নবোঢ়াবধূ দত্তকা কন্যারূপে সর্ব্বতোভাবে আদৃতা। তাহার প্রকৃতি আচরণ সম্পূর্ণরূপে স্বামীকুলের আচার ব্যবহারের অনুরূপে গঠিত করিয়া লইতে হয়, সুতরাং দত্তক পুত্রের ন্যায়, নবোঢ়াবধূ, যত অল্পবয়স্কা হয় ততই ভাল। পূর্ব্বে এই সকল বালিকাবধূ তাহাদের শ্বশ্রূদের নিকট কন্যা-নির্ব্বিশেষে, শয়নে ভোজনে সকল বিষয়ে লালিত হইত। এইরূপে স্বামীকুল মধ্যে প্রতিপালিতা বালিকা সর্ব্বতোভাবে স্বামীকুলের পরিজন মধ্যে পরিগণিতা হইয়া সম্বন্ধ অনুসারে সকলকেই স্নেহ, শ্রদ্ধা, ভক্তিসহকারে আপ্তবৎ ব্যবহার করিত,—কাহাকেও পর ভাবিত না। দৈব দুর্বিপাকে যদি ঐরূপে লালিতা কোন স্ত্রীলোকের অল্পবয়সে বৈধব্য ঘটিত, সে পতিকুলে বাস করিয়া জীবন কাটাইতে কষ্ট-বোধ করিত না। পরিবারস্থ সকলেও তাহাকে পরজ্ঞান করিত না। তখনকার বাঙালীরমণীগণ বিবাহান্তে প্রকৃত পক্ষে স্বামীর সগোত্রা হইত, কেবল নামে নয়। পূর্ব্বে যাহাদের হস্তে বিবাহের কন্যা নির্ব্বাচনের ভার পড়িত, কিরূপ ঘরের কন্যা আনিলে সংসারের শান্তিভঙ্গ ঘটিবে না তাহাই তাহাদের লক্ষ্য থাকিত। তখনকার দিনে, কুলশীলতা প্রথম লক্ষ্যের বিষয় ছিল; রূপ তাহার পর,—অনেক পর; কুলশীলতার তুলনায় রূপের আদর গণ্যই হইত না।

কোন বিষয় সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর হয় না; এইরূপ কন্যানির্ব্বাচনেও সময়ে সময়ে যে ক্ষতি হয়, বঙ্কিমবাবু তাঁহার গোবিন্দলালের চরিত্র-চিত্রে তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য শিক্ষার সহিত সমাজে পাশ্চাত্যরুচি আসিয়া পড়িয়াছে, এখন রূপের অধিক আদর। পাশ্চাত্য সমাজে রমণী পুরুষের বিলাসের সহচরী, মুসলমান রমণী পুরুষের বিলাসের সামগ্রী; মুসলমান সমাজে তাহার কোন প্রাধান্য নাই; যদি কিছু থাকে, তাহা তাহার প্রকৃতিগত মোহিনীশক্তি উদ্ভূত;—তাহার দৃষ্টান্ত মোগল সিংহাসনে নুরজেহান। পাশ্চাত্য সমাজে রমণী সমাজ-নেত্রী; তিনি গোকুলের রাইরাজা, পুরুষ তাঁহার দ্বারে দ্বারী, পুরুষ তাঁহার উপাসক, পুরুষ তাঁহার দ্বারে ভিখারী—প্রেম-ভিখারী, "দেহি পদমুদারম্" এই ভিক্ষা-মন্ত্রে তাহার দীক্ষা! —এই ভাবের নাম পৌরুষ—Gallantry. এই পৌরুষ-ভাব রাখিতে গিয়া, এই বিলাসের ব্যয় যোগাইতে গিয়া পাশ্চাত্য সমাজ নিঃস্ব, অতুল ঐশ্বর্য্যের ঈশ্বর হইয়াও সমাজে অর্থের অনাটন; সেই অনাটন ঘুচাইতে গিয়া, সেই সত্যভামার মান বাঁচাইতে গিয়া, জগতের-নন্দনকানন লুণ্ঠন করিয়াও তাহার ধন-পিপাসা মিটিতেছে না। পাশ্চাত্য-শিক্ষিত আমাদের মধ্যে আজ সেই বিলাসিতা প্রবেশ করিয়াছে, তাহার ফলে রমণীসমাজে বেশের পরিপাট্য, রত্নালঙ্কারের আধিক্য; তাহাতে রুচির বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া ভাবের বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে বাঙালীর মেয়ে জাহ্নবী-জলের পবিত্রতা দেখিয়া 'গঙ্গাজল' পাতাইয়া মনের জনকে পবিত্র

গঙ্গাজল বলিয়া ডাকিয়া মনে তৃপ্তি পাইত; কিন্তু এখন আর তাহা ভাল লাগে না,—যাহাকে দেখিলে মনের বিমর্ষতা যায়, বিরস প্রাণ সরস হয়, প্রাণের উল্লাস অধরপ্রান্তে দেখা দেয় সে "মেথন হাসি" আর বাঙালীর মেয়ের মধ্যে নাই; মুসলমান-বিলাসের আতর গোলাপ বাঙালীর মেয়ের আদরের ধন হইল, সে আদরের জনকে "আতর" "গোলাপ" বলিয়া না ডাকিয়া আর তৃপ্তি পাইল না; কিন্তু সেই পর্য্যন্ত। মুসলমানের বহির্সমাজ পুরুষ সমাজ, তাহাতে রমণীর স্থান নাই, উচ্চশ্রেণীর মুসলমানবংশীয়াদের দৃষ্টান্ত হিন্দু পরিবারে বড় প্রবেশ করিল না। যে সকল দরিদ্র হিন্দু মুসলমানধর্ম্ম অবলম্বন করিল তাহাদের পরিবারবর্গের মধ্যে স্ত্রীলোকগণ অনেক অংশে তাহাদের হিন্দু ভগিনীগণের মত রহিল। মুসলমান আধিপত্যের সময় বিলাসিতা হিন্দু অন্তঃপুরে আদৌ স্থান পায় নাই, মুসলমানের অবরোধ প্রথা, হিন্দুর অন্তঃপুর প্রথাকে দৃঢ় করিয়াছিল মাত্র। আজ কাল বাঙালী পাশ্চাত্য-শিক্ষায় শিক্ষিত, পাশ্চাত্য-সমাজ তাহার রাজ সমাজ, পাশ্চাত্য সমাজ তাহার আদর্শ সমাজ; প্রাচ্য ছাঁচে পাশ্চাত্য বিলাসিতা ঢালিয়া এক অপূর্ব্ব পদার্থ প্রস্তুত হইল। আতর গোলাপে আর মন ওঠে না, পমেটম ল্যাবেণ্ডার ব্যবহার আরম্ভ হইল; রমণী মহলের সোহাগের "পমেটম" "ল্যাবেণ্ডর" পাতানও আরম্ভ হইল, কিন্তু এবার শুধু এখানে থামিল না;—বিলাসিতা চরমে উঠিল!

আমাদের সমাজ এখন নিঃস্ব, একশত বৎসর পূর্ব্বে এমন কি পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যেরূপ ছিল তাহা অপেক্ষা অনেক নিঃস্ব, কিন্তু বেশভূষাতে, বিলাসিতাতে তখনকার অপেক্ষা শতগুণ বাড়িয়াছে। বিশেষতঃ রমণীমহলে ইহার প্রাদুর্ভাব ক্রমশ অত্যন্ত অধিক দাঁড়াইতেছে, তাহার ফল অতি ভয়ানক।

প্রকৃতপক্ষে বাঙালী সমাজে, আজ কাল দুই প্রকার বিবাহ প্রচলিত। বর্ণাশ্রমসমাজ-নির্দ্দিষ্ট আটপ্রকার বিবাহ মধ্যে ব্রাহ্ম ও আসুর এই দুই প্রকার বিবাহ বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজে প্রচলিত। ব্রাহ্ম প্রথা অনুসারে কন্যাকর্ত্তা উপযুক্ত পাত্র অনুসন্ধান করিয়া উপযুক্ত দান দক্ষিণা সহ সালঙ্কারা কন্যাকে ঈপ্সিত পাত্রে দান করিবেন। এই পদ্ধতির বিবাহ বঙ্গীয় হিন্দুদের উচ্চশ্রেণীর মধ্যেই প্রধানতঃ প্রচলিত। আসুর বিবাহে কন্যাকর্ত্তা পণ লইয়া কন্যাদান করিয়া থাকেন। এই পদ্ধতি অধিকাংশ নিম্নশ্রেণীর বঙ্গীয় হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত। আসুর বিবাহে যদি কন্যাকর্ত্তা অর্থগৃধ্নু হইয়া আপনার শিশু-কন্যাকে আপনার অর্থলোভ চরিতার্থ করিবার জন্য অযথা বয়োবৃদ্ধ পাত্রকে দান না করেন তাহা হইলে বিবাহজনিত দোষে পারিবারিক অশান্তির বিশেষ সম্ভাবনা নাই। ঐরূপ অর্থলোভের ফলে, সমাজে বালবিধবার সংখ্যার আধিক্য দাঁড়াইয়াছে। এই সামাজিক অনিষ্ট কেবল যে বধূ বরের বয়ঃপার্থক্য উদ্ভূত তাহা নয়; অধিকাংশস্থলে অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর মধ্যে আসুর বিবাহ প্রচলিত। বঙ্গীয় হিন্দু সমাজে পুরুষের বিবাহের কোন নির্দ্দিষ্ট বয়স না থাকায় অর্থাভাবে ঐ সকল নিম্নশ্রেণীর পুরুষদের অধিক বয়স পর্য্যন্ত বিবাহ হয় না; বিবাহের পূর্ব্বে ঐ সকল অশিক্ষিত পুরুষগণ

অনেক সময়ে নৈতিক দুর্ব্বলতাবশে আপনাদের স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া, আপনাদের ও পরিবারবর্গের পরিণাম অতি শোচনীয় করে। এই সকল ক্ষেত্রে অনিষ্ট যাহার অধিক, প্রতিকার তাহারই হাতে; কন্যার পিতা যদি অর্থলোভ সম্বরণ করিয়া, উপযুক্ত পাত্রে কন্যাদান করেন, তাহা হইলে ঐরূপ অনিষ্ট হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারেন।

ব্রাহ্ম বিবাহে ঐরূপ অনিষ্টের আশঙ্কা অতি অল্প। ব্রাহ্মবিবাহে কন্যাকর্ত্তার আর্থিক স্বার্থ নাই। তাঁহার স্বার্থ সৎপাত্র নির্ব্বাচন; কিন্তু আজকাল এই সৎপাত্র নির্ব্বাচন করিতে কন্যাকর্ত্তার সর্ব্বনাশ হইতেছে; কন্যার অলঙ্কার ও বরাভরণ ইত্যাদির মূল্যস্বরূপ বরপক্ষের এত অধিক অর্থের আকাঙ্ক্ষা যে তদনুরূপ অর্থ দিয়া একটি সৎপাত্রে কন্যাদান করিতে গিয়া অনেক সময়ে কন্যাকর্ত্তাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। কথাটি কিন্তু বড় আশ্চর্য্য। কন্যা পুত্র সকলেরই আছে, সকলে মিলিয়া একমত হইয়া বিবাহের ব্যয়ভার কমাইয়া দিলে সকলেরই রক্ষা হয়, বিশেষতঃ এইরূপ ব্রাহ্মবিবাহ শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে অধিক প্রচলিত, এই বিষয়ে চেষ্টা আন্দোলনেরও ত্রুটী নাই, তবে এ বিষয়ে সমাজ কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না কেন?

ক্ষত স্থানে ঔষধ লেপন না হইলে বেদনা দূর হয় না। রোগের প্রকৃত তথ্য না জানিতে পারিলে প্রকৃত চিকিৎসার সম্ভাবনা নাই। আজ যিনি বরকর্ত্তা, কাল তিনি অন্য বিবাহে কন্যাকর্ত্তা; সমাজের সকলেরই স্বার্থ এইরূপ বিবাহের ব্যয়ভার কমান, অথচ কেহই তাহার সুবিধা করিতেছে না কেন? ব্যাপার এমনি দাঁড়াইয়াছে যে কাহারও ইহাতে হাত নাই। যিনি বরকর্ত্তা হইয়া কন্যাপক্ষকে অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয় করিতে বাধ্য না করেন, তিনি ব্যক্তি বিশেষকে স্থল বিশেষে সর্ব্বনাশ হইতে রক্ষা করিতে পারেন; কিন্তু সমাজকে এইরূপ সর্ব্বনাশ হইতে রক্ষা করিতে পারেন না। আজকাল সম্পন্ন ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ বরাভরণ ও কন্যার অলঙ্কার ও অন্য দানাদির জন্য কন্যাপক্ষের সহিত চুক্তি না করিয়া আপনাদের পুত্রেরবিবাহে সম্মত হন, তাহাতে তাঁহাদের ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না; সম্পন্নের কুটুম্বিতা সম্পন্নের সহিত; যেরূপ আজকাল বিবাহ উপলক্ষে বরাভরণাদির বাহুল্য হইয়াছে সম্পন্ন ব্যক্তিকে আপনার মর্য্যাদানুরূপ ব্যয় করিতে গিয়া বরপক্ষকে যথেষ্টই দিতে হয়, তাহাতে সমাজে চাক্ষুষ কোন সুদৃষ্টান্ত স্থাপন হয় না। আপনার কন্যা-পুত্রের জন্যই সম্পত্তি, তাহাদের সুখস্বচ্ছন্দের জন্যই সম্পত্তির প্রয়োজন। পূর্ব্বে অনেক সম্পন্ন লোক, কন্যার স্বচ্ছন্দে, ভরণপোষণের জন্য স্বইচ্ছার ভূসম্পত্তি প্রভৃতি দান করিয়া গিয়াছেন। তদনুরূপ দান আজকাল অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু বিবাহ উপলক্ষে তখন এরূপ অলঙ্কারাদির আড়ম্বর দেখিতে পাওয়া যাইত না। এ বাহ্যাড়ম্বর আসিল কোথা হইতে? এ বাহ্যাড়ম্বরের একমাত্র মূল কারণ বাঙালীর বিলাসপ্রিয়তা। পাশ্চাত্য "মিশ্রসমাজে"র সংস্পর্শে আসিয়া বাঙালীর রমণীসমাজ বিলাসপ্রিয় হইয়াছে। বিলাসপ্রিয়তার স্রোত বাঙালীর অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে। যখন পূর্ব্বে বাঙালীর ঘরে

অন্ন বস্ত্রের অভাব ছিল না,তখন বাঙালীর ঘরে এত বসন ভূষণের আড়ম্বর ছিল না, এখনকার শতাংশের একাংশও আড়ম্বর ছিল না। এখন বাঙালী নিরন্ন, কিন্তু বিলাসপ্রিয়তার মোহে অন্ধ হইয়া, বাঙালী নিজের সাংসারিক অশান্তি দিন দিন বৃদ্ধি করিতেছে; আপনার সর্ব্বস্ব বিলাসের চিতায় ভস্মীভূত করিতেছে, চারিদিকে অন্নের জন্য হাহাকার, কিন্তু আপনার বিলাসপ্রিয়তা যে এ হাহাকারের অন্যতম কারণ তাহা বুঝিতে পারিতেছে না।

এখন বসনভূষণে নব বধূবরের বিশিষ্টরূপ সজ্জিত হওয়া চাই। যেরূপ বেশে দশজনের বাড়ীর ছেলে মেয়ে সাজিয়া গুছিয়া সমাজে বাহির হয় সেইরূপ সাজসজ্জা চাই,—কিন্তু দিবে কে? বিবাহ উপলক্ষে সমাজে বর্ত্তমান রুচি অনুযায়ী বাজনা বাদ্য,আনন্দ ভোজ হওয়া চাই;—ব্যয়ভার বহন করিবে কে? পুরুষের বিবাহে বাঙালী সমাজে বয়সাদির বিশেষ কোন বাঁধাবাঁধি নাই, বাঁধাবাঁধির কোন সম্ভাবনাও নাই। যে সমাজে পুরুষ যে কোন বয়সে পুনর্দার পরিগ্রহ করিতে পারে, সে সমাজে পুরুষের প্রথম বিবাহ সম্বন্ধে কোন বয়সের সীমা নির্দ্দিষ্ট থাকিতে পারে না। সুতরাং বরপক্ষ বিবাহের অবসর অপেক্ষা করিতে পারে, কন্যাপক্ষের সে সুবিধা নাই। কন্যাকর্ত্তাকে নির্দ্দিষ্ট বয়সের মধ্যে কন্যাকে পাত্রস্থ করিতেই হইবে। এ কারণে বাধ্য হইয়া প্রকারান্তরে তাঁহাকে একরূপ উভয় পক্ষেরই ব্যয় ভার বহন করিতে হয়; এরূপ ব্যয়ভার বহন করা অনেক সময়ে কন্যাপক্ষের পক্ষে অসম্ভব; এবং ইহাতেই সমাজের এই বিভ্রাট। ইহার ফলে সমাজে আর একটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে; বিবাহের ব্যয় নির্ব্বাহের অর্থের অভাবে ব্রাহ্মবিবাহ প্রথানুগত শ্রেণীর মধ্যে কন্যাসম্প্রদান কালের সীমা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। "কন্যাকালের সীমা" দেশাচারগত, একান্নবর্ত্তী পরিবারপদ্ধতির অনুগত, ধর্ম্ম সংশ্লিষ্ট নয়। যে সমাজে কৌলীন্যানুমোদিত পাত্রের অভাবে অশীতিপরা কুলীনব্রাহ্মণ-কুমারীর চিরকৌমার্য্য, সে সমাজের কন্যা-কালের নির্দ্দিষ্ট সীমা যে আচার সম্মত ধর্ম্ম নিরপেক্ষ নহে তাহার আর প্রমাণের আবশ্যক নাই। হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিবাহের বয়স সম্বন্ধে আচারগত অনেক পার্থক্যও দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাভাবে হয়তো এমন দিন আসিবে যখন কুলীন কুমারীর চিরকৌমার্য্য অন্য অন্য শ্রেণীর অনুকরণীয় হইয়া উঠিবে। যেদিন তাহা ঘটিবে সেদিন সমাজের রুগ্ন দেহে রাজযক্ষার বীজ বপন হইবে।

একদিন, কোন অব্রিটিস্ পাশ্চাত্য শিক্ষকের শিক্ষাদানকালে আমাদের দেশ প্রচলিত কন্যাকালের কথা উঠে; তিনি স্বশ্রেণীস্থ ছাত্রদের বলিলেন,—তোমরা সকল বিষয়ে ইংরেজের কথাও তুলিও না। ইংরেজ কুমারীরা যে বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিতা থাকে তাহা য়ুরোপের অন্যদেশে অনুমোদনীয় নয়। য়ুরোপে চতুর্দ্দশ পঞ্চদশবর্ষীয়া বালিকা বিবাহ পক্ষে যথেষ্ট বয়ঃস্থা বলিয়া বিবেচিতা হইয়া থাকে। তোমাদের দেশের জলবায়ুর সহিত য়ুরোপের জলবায়ুর তুলনায় তোমরা আজকাল যে বয়সে বালিকাদের বিবাহ দাও তাহাই বিবাহের উপযুক্ত বয়স; বিবাহের বয়সসীমা অযথা বৃদ্ধি সমাজের পক্ষে অনিষ্টকর।" তিনি

এই কথা বলিয়াছিলেন, তিনি একজন চিরকৌমারব্রতী খৃষ্টান সন্ন্যাসী। যখন তাঁহার কথার সহিত জুলিয়েটের আপনার অল্প বয়সহেতু বিবাহের অযোগ্যতার কথায় জুলিয়েট-জননীর উত্তর মনে করি তখনই য়ুরোপের পূর্ব্ব-প্রচলিত বিবাহের বয়সে ও আধুনিক বিবাহ-বয়সের পার্থক্য বুঝিতে পারি। য়ুরোপে এককালে খৃষ্টান সমাজে বাল্য-বিবাহও প্রচলিত ছিল। য়ুনানীমণ্ডল এখনও বাল্যবিবাহ উঠাইয়া দিয়াছে, কিন্তু স্ত্রীজাতির পক্ষে তাহারা বিবাহের বয়স চৌদ্দ পনর বৎসর অল্প বিবেচনা করে না।

কথাপ্রসঙ্গে যে কন্যাকালের বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করিলাম তাহাতে সামাজিক "বিবাহ বিভ্রাট" ঘুচে নাই। আমরা অন্নাভাবে অর্থাভাবে নানারূপ কষ্ট পাইতেছি, এরূপ সময়ে যদি আমরা এই দুর্ব্বহনীয় বিবাহ ব্যয়ভারকে কমাইতে পারি, তাহা হইলে অনেকটা সামাজিক কষ্টের লাঘব হয়। ইহা হইতে পারে কি প্রকারে?

সেদিন স্বদেশী সভায়, যে সম্ভ্রান্ত সম্পন্ন পুরুষ, স্বদেশজাত খরস্পর্শ অচিক্কণ কার্পাস বস্ত্র পরিহিত হইয়া সভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, তিনি প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ; যে রাজসভাসদ, অতি-রুক্ষ বস্ত্র-পরিহিত হইয়া রাজসভায় যাইয়া স্বদেশজাত উৎকৃষ্টতর বস্ত্রের অভাবকে তাঁহার রুক্ষবস্ত্র পরিধানের কারণরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তিনি প্রকৃত স্বদেশভক্ত। যে ধনকুবের, আপন ভ্রাতাকে, কন্যার বিবাহ উপলক্ষে মুক্তাসারদানকে দুর্নীতির প্রবর্ত্তনা বলিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিয়াছিলেন, তিনিই স্বশ্রেণীর নেতা হইবার উপযুক্ত।

আজ যদি সমাজের পুরোগামিনী পুরন্ধ্রিগণ, বিলাসপ্রিয়তার মোহ কাটাইয়া সাধারণ বেশে সামাজিক উৎসবে যোগদান করেন, যদি আজ তাঁহারা কাঞ্চনের কঠিনতাকে বিলাস-নিগড়ের নিষ্ঠুরতা মনে করিয়া দূরে ত্যাগ করেন, যদি আজ তাঁহাদের সৎদৃষ্টান্ত বিলাসপ্রিয়তার পাশ হইতে সমাজকে মুক্ত করিতে পারে, তাহা হইলে যক্ষের পাশবন্ধন হইতে উদ্ধার হইয়া সমাজ পুনর্জীবিত হইতে পারিবে।

এ কার্য্য পুরুষের নয়; ইহা পুরুষের সাধ্যাতীত। যতদিন ভূষণপ্রিয়া রমণীর ভূষণপ্রিয়তা রমণীরই দ্বারা সমাজে প্রশমিত না হয়, পুরুষের সাধ্য কি তাহা রোধ করে? যখন আর সমাজে রমণীর বসন ভূষণের বাড়াবাড়ি থাকিবে না তখন আর সমাজকে বসন-ভূষণের জন্য উৎপীড়িত হইতে হইবে না। তাহার সঙ্গে সঙ্গে যদি নৃত্য গীত, ভোজ-উৎসবের বাড়াবাড়ি কমিয়া গিয়া "বরযাত্রনে" বিবাহ-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে বিবাহ ব্যয়ভারে সমাজকে আর উৎপীড়িত হইতে হয় না। মহাজনাঃ যেন গতাঃ স পন্থা। উচ্চশ্রেণীর মধ্যে যাহা প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাই সাধারণে অনুকরণ করে। ভাল ও মন্দে, উচ্চতা ও নীচতাতে মানব সকল বিষয়েই দৃষ্টান্তের দাস।

যে সমাজের বাল্য-বিবাহ মূল ভিত্তি, যাহার প্রত্যেক পরিবার-গঠন বাল্যবিবাহ নীতির উপর ন্যস্ত, সে সমাজে বিধবা বিবাহের স্থান নাই। যে আচার অনুযায়ী কুমারী বাল্যকাল অতিক্রম করিলেই অরক্ষণীয়া, সেই আচারবলে বিধবা অপরিণেয়া। বিশেষতঃ

পতিতচরিত্রা সন্তান, সন্ততির জননীর অন্ত একান্নবর্তী পরিবারের অন্তভুর্ক্ত ব্যক্তিরূপে পরিগণিতা হইবার সম্ভাবনা নাই। বর্ণাশ্রম সমাজে ধর্মের ব্যবস্থা ও আচারের ব্যবস্থা এই দুইএর প্রভেদ করা বড়ই কঠিন। ধর্মতত্ত্ব আচারস্তূপে প্রোথিত, অন্ধকার গুহায় নিহিত; যদি সমস্ত ভারতীয় হিন্দু সমাজ এক আচারে নিয়ন্ত্রিত হইত,তাহা হইলে হিন্দুর আচার হইতে হিন্দুর ধর্ম পৃথক্ করা অসাধ্য হইত। আচার ধর্মের উপচার হইতে পারে, সমাজ শাসিকা শক্তি হইতে পারে, সমাজের ভিত্তি প্রস্তরময় হইতে পারে, কিন্তু আচার সাক্ষাৎ ধর্ম নয়; তত্রাচ যে আচার সমাজের ভিত্তিপ্রস্তর, যে আচার ধর্মের প্রধান উপচার তাহার বিলয়ে সমগ্র সমাজের বিপর্য্যয়ের সম্ভাবনা। বিধবা-বিবাহ হিন্দুসমাজে অতি অল্পপ্রচলিত, বহুকাল হইতে প্রচলিত থাকিলেও অতি অল্পচলিত; বাংলাদেশে অন্ত্যজ শ্রেণীর মধ্যে তাহার প্রচলন ধর্ত্তব্য মধ্যেই নয়। কিন্তু বাংলা দেশের আচার ব্যবহারে বিধবাবিবাহের প্রশ্রয়দান আছে। পশ্চিম অঞ্চলের অনেক "জলাচরণীয়" জাতির মধ্যে বিধবাবিবাহ অসামাজিক কার্য্য বলিয়া বিবেচিত নয়। ঐ সকল জাতি বাঙালী সমাজেও জলাচরণীয়া বলিয়া বিবেচিত; "কাহার" ভৃত্য বহুকাল বাঙালীর বাড়ীতে চাকুরী করিতেছে। তাহার আনীত জল ব্যবহারে বাঙালীর সামাজিক পতন হয় না। বিধবার দেবর-বিবাহ উড়িষ্যা-অঞ্চলে বিলক্ষণ প্রচলিত, এইরূপ বিবাহে একান্ন-বর্ত্তী পরিবারের বিশেষ আশঙ্কা নাই ভাবিয়া উড়িষ্যাসমাজ বোধহয় তাহার প্রচলন ব্যবস্থা করিয়াছিল। ভনিয়াছি্লাম রাজা রাধাকান্ত দেবের সময়ে, বাঙালীসমাজে বিধবাবিবাহের কথা প্রথম উঠে। কোন কর্ম্মকার জাতীয় অবস্থাপন্ন ব্যক্তি তাঁহার অতি অল্পবয়স্কা বিধবা কন্যার পুনর্বিবাহ দিবার মানস করেন। ঐ সম্বন্ধে পণ্ডিত ভবশঙ্কর ও বহুবাজারের পণ্ডিত রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দেন; সেই ব্যবস্থাপত্র রাজা রাধাকান্ত দেবের সভায় আনীত হইলে, বিচারের দিন স্থির হইল; বিচারে ব্যবস্থাপত্র অশাস্ত্রীয় নয় বলিয়া সাব্যস্ত হইল; কিন্তু সামাজিক অবস্থা ও কাল বিবেচনায় সেই বিবাহ অনুমোদিত হইল না। কর্ম্মকার মহাশয়ও কন্যার পুনর্বিবাহ দানে বিরত হইলেন।

বিধবাবিবাহ হিন্দুর রুচির বিরুদ্ধ; হিন্দুর সামাজিক নীতির বিরুদ্ধ, সেইজন্য হিন্দু-সমাজে এতকাল উপেক্ষিত; এবং সেইজন্যই এককালে সতীদাহ প্রবর্ত্তিত ছিল এবং হয়তো আইনের মতে দণ্ডনীয় না হইলে একালেও প্রচলিত থাকিত।

আজ বাঙালী তুমি স্বইচ্ছায় যে সামাজিক আদর্শ নষ্ট করিতে বসিয়াছ, পাশ্চাত্যশাসনের প্রাক্কালে বাঙালী কবি ভারতচন্দ্র সেই আদর্শ লইয়া অপর সমাজের রমণী চরিত্রের তুলনায় হিন্দু রমণীর স্থান কত উচ্চ, তাহা দেখাইয়া কত না গৌরব অনুভব করিয়াছেন!

কবি সমাজের অগ্রণী; কবি ভাব বিকাশ করেন, সমাজ তাহার কার্য্যে তাহা সম্ভবপর করে। কবি চিত্রকর; কবি আদর্শচিত্র আঁকিয়া সমাজের সম্মুখে ধরে, সমাজ তাহার অনুরূপ আপনাকে গড়িতে চেষ্টা করে; কবি হৃদয় দর্পণ, সমাজ তাহাতে আপনার মূর্ত্তির দোষ গুণ দেখিতে পায়। আজ বাঙালী

তুমি যে ব্রহ্মচারিণী মূর্ত্তি স্বসমাজ হইতে তিরোভাব করিতে বসিয়াছ, পাশ্চাত্য কবি নিজের সমাজে তাহার আদর্শ আঁকিয়া দেখাইতেছেন; তুমি যে চিত্র আজ দূরে ফেলিয়া দিবার উপক্রম করিয়াছ ঐ দেখ পাশ্চাত্য "রাজকবি" তাহাই অতি সন্তর্পণে স্বীয় জাতীয় চিত্রালয়ে স্থান দিয়া রক্ষা করিতেছেন।

দোরা ইংরেজ বালিকা, পিতৃব্য-পালিতা; তাহার পিতৃব্যের ইচ্ছা—কর্ত্তব্যপরা স্নেহলতা ভ্রাতৃকন্যাকে, স্ব পুত্রের সহিত বিবাহ দিয়া আপনার স্নেহ নিলয়কে এক সূত্রে বন্ধন করেন; দোরা পিতৃব্যবাক্যে বাগ্‌দত্তা; হতভাগ্য উইলিয়ম পিতৃবাক্য অগ্রাহ্য করিল; পিতৃ আজ্ঞায় গৃহতাড়িত হইয়া ক্ষিপ্তপ্রায় যুবক গ্রামান্তরে গিয়া আক্রোশে ভিন্ন রমণীর পাণিগ্রহণ করিল; অবাধ্য পুত্রকে পিতা ত্যাগ করিলেন; পিতৃব্য বাসে থাকিয়া পিতৃব্যের দত্তকা কন্যারূপে ডোরা তাঁহার সেবা শুশ্রূষায় দিন পাত করিতে লাগিল। নানা কষ্টে পিতৃ-ত্যক্ত ভগ্ন হৃদয় উইলিয়ম অকালে প্রাণত্যাগ করিল। এক মাত্র শিশুর জননী উইলিয়মের বিধবা পত্নী মেরী অসহায়া হইলেন। দোরা মেরীর নিকট চলিল, সমদুঃখভাগিনী ভগিনীর স্নেহে মেরীর অভিমান দূর করিল, উইলিয়ম-পুত্রকে আপনার স্নেহার্দ্র জননী-বক্ষে তুলিয়া লইল, এবং নিজের স্বার্থের ক্ষতি করিয়া তাহাকে তাহার পৈতামহিক স্নেহে প্রতিষ্ঠিত করিল। বহুদিন কাটিয়া গেল, বৃদ্ধ এলানের মৃত্যু হইল, —উইলিয়ম পত্নী মেরী পত্যন্তরগতা হইল। কিন্তু কুমারী দোরা আজীবন ব্রহ্মচর্য্যে অতিবাহিত করিল!——এ চিত্র কোথাকার? ব্রিটিশ-সমাজভুক্ত ভারতের—ভারতের হিন্দু সমাজের!—কবিকল্পিত আদর্শ ইংরেজ-সমাজের! ইহাতে গুরুজনের পুত্রাদির বিবাহ সম্বন্ধে পাত্র পাত্রী নির্ব্বাচনের সর্ব্বতোমুখী ক্ষমতার কথা আছে; ইহাতে পিতার অবাধ্য পুত্র যে ঈশ্বরের অভিশপ্ত তাহার চিত্র আছে; পরিশেষে, পতি যে স্ত্রীর অনন্যগতি—জীবনে ও মরণে একমাত্র কাম্য দেবতা—তাহারও চিত্র আছে। আবার ইহাতে তুলনায় সমালোচন আছে। ইহাতে আমরা দুই খানি চিত্র পাই,—পাশ্চাত্য সমাজের সতী-সেবার চিত্র, পার্শ্বে হিন্দু-সতীর অনুরূপ দোরা-চিত্র; কবি পাশা পাশি দুই খানি চিত্র রাখিয়া তুলনার ভার পাঠককে দিয়াছেন।

কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতা রমণী চরিত্রের বিশ্লেষণ করিতে গিয়া স্ত্রী-জাতিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন। তাঁহার মতে স্ত্রী-প্রকৃতি তিন প্রকার;—উত্তমা, অধমা ও মধ্যমা। উত্তমা প্রকৃতিসম্পন্না স্ত্রী সদা স্বর্গীয়-ছটায় শোভিতা, সদ্গুণ সৌরভে তাঁহার চরিত্র সুবাসিত; সমাজের পঙ্কিল জলে তাঁহার জন্ম হইলেও তিনি পঙ্কজের শোভা ধারণ করেন। পাশ্চাত্য ইতিহাসে লুক্রেসিয়া তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। অধমা প্রকৃতি ঠিক তাহার বিপরীত; সে সমাজের বিভীষিকা, সে স্বজনের কলঙ্ক, সে যে অবস্থায় পড়ুক তাহার চিত্ত-প্রবণতা নীচতার দিকে। মধ্যমাপ্রকৃতি,সাধারণ প্রকৃতি; সে যাহা দেখে তাহা শিখে; সমাজ-শিক্ষা তাহার জন্য। সমাজের আদর্শ উচ্চ করিয়া রাখিতে পারিলে, এই সাধারণ প্রকৃতির রমণীগণ উচ্চ প্রকৃতির আলোকে প্রতিভাত হইয়া সমাজের ও স্বজনের মুখ উজ্জ্বল করেন। ইহাদের অবস্থা দেখিয়া সমাজের আধিদৈবিক

অবস্থা ঠিক জানা যায়। এই প্রকৃতির রমণী দ্বারা সমাজ পরিপুষ্ট। সকল সমাজেই ইহাদের সংখ্যা অধিক।

একজন ইংরেজ অধ্যাপক কোন ইংরেজী কাব্য পড়াইবার কালে বলেন ;—ইংরেজী কবিতার ভাবগ্রহণ করিতে গেলে ইংরেজ হওয়া আবশ্যক।—ঠিক কথা!

ভক্ত না হইলে মহত্ত্ব বুঝিতে পারে না। ব্যথার ব্যথী না হইলে সহানুভূতি হয় না। বর্ণাশ্রমের নীতি বুঝিতে গেলে বর্ণাশ্রমী হওয়া চাই। জীবন যাহাদের মতে কর্ত্তব্যের সমষ্টি, মৃত্যু যাহাদের মতে অপর জীবনের প্রারম্ভ —জীর্ণবাসের পরিবর্ত্তে বাসান্তর গ্রহণ মাত্র, স্বধর্ম্মে থাকিয়া নিধনও যাঁহাদের শ্রেয় জ্ঞান, যাহারা সমাজের সকলেরই কার্য্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া সমাজ চালাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে, তাহারা যে ভাবপ্রবণা রমণীপ্রকৃতিরও সামাজিক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া রাখিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? বর্ণাশ্রম-সমাজ, ব্রাহ্মণকে শান্ত যতি হইয়া সমাজের গুরু পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে বলিয়াছে, এবং ক্ষত্রিয়কে শস্ত্রবিদ্যায় দীক্ষিত হইয়া সমাজ রক্ষা করিতে বলিয়াছে ; এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা; কিন্তু রমণীর শিক্ষা অন্যরূপ। বর্ণাশ্রমের সকল বর্ণের রমণী ধৈর্য্যপরা বীররমণী; বাল্যে তাহার প্রথম শিক্ষা দেবতার নিকট পৃথিবীর ন্যায় সহিষ্ণুতা ভিক্ষা ; তাহার জীবন পরের জন্য, তাহার জীবন সমাজের জন্য, পরের সুখভোগের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সুখ ভোগ শেষ; পরের ঐহিক জীবনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ঐহিক জীবন শেষ ; এই নিষ্কাম ধর্ম্মের তেজে তাহাকে জগতে সর্ব্বদা তেজোময়ী মূর্ত্তিতে বিরাজ থাকিতে হইবে ; মহাশক্তিরূপে এই বর্ণাশ্রম-সমাজকে তাহার রক্ষা করিতে হইবে, তাহার মহাশক্তিরূপিনী মূর্ত্তির তেজোরাশি এই শান্তিময় সমাজের শান্তির অবসাদকে ভগ্ন করিয়া সামাজিকগণকে প্রকৃত শাক্তে পরিণত করিয়া রাখিবে—এই তাহার পক্ষে ব্যবস্থা। এই শিক্ষার বলে ভারতক্ষেত্রে এমনই এক নিষ্কাম যোগের যোগাগ্নি প্রজ্জ্বলিত এবং স্বার্থত্যাগের ত্যাগদীপ্তি প্রদীপ্ত হইয়াছে, যে তাহার পাবিকা শক্তি কি রাজপুতনার ভীষণ জহরব্রতে, কি বাংলার মহাশ্মশানে সর্ব্বত্রই চিতাগ্নিকে পূত হোমাগ্নিতে পরিণত করিয়াছিল!

"চিতায় আরোহি সতী (ফুলাসনে যেন)
বসিলা আনন্দমতি পতি পদতলে
* * * * * *
পুষ্পবৃষ্টি হইল চৌদিকে।
* * *
ইরম্মদরূপে অগ্নি ধাইল ভূতলে,
সহসা জ্বলিল চিতা। সচকিতে সবে
দেখিল আগ্নেয়-রথ......"

পাশ্চাত্য শিক্ষা পাশ্চাত্য ধর্ম্ম পাশ্চাত্য আচার পাশ্চাত্য ব্যবহারের পক্ষপাতিত্ব সত্বেও, যে আদর্শ চিত্র, রমণীচরিত্রের চরম উৎকর্ষ বলিয়া হিন্দুসমাজত্যাগী কবিশ্রেষ্ঠ ত্যাগ করিতে পারেন নাই, যে আদর্শের অভিনয় রাজশাসনে হিন্দু সমাজ হইতে তিরোহিত হইলেও ভারতবাসীর কল্পনা ক্ষেত্র হইতে তিরোহিত হইতে পারে নাই, সেই চিত্রের যুগ্মচিত্র সমাজে বিধবার ব্রহ্মচর্য্যে বিরাজমান। এত দিন বাঙালী-সমাজে বিধবা-বিবাহের আবশ্যক বোধ হয় নাই। অর্থাভাবে সময়ে সময়ে বৃদ্ধ অপাত্রে কন্যাদানদোষে বা

নিয়তির অকাল ব্যবস্থার বশে সমাজে বালবিধবার বিষাদিনী মূর্ত্তির করুণ বিকাশ সত্ত্বেও সমাজ আপন আদর্শ নষ্ট করিতে প্রস্তুত ছিল না। বাঙালী! যদি আজ তোমার শিক্ষার দোষে সমাজে বিলাসিতা প্রবেশ করিয়া থাকে, আজ যদি রমণীহৃদয়ে পরিণয়-জীবন বিলাসাভিনয়ের সূত্রপাত বই আর কিছুই নয় বলিয়া সংস্কার হইয়া থাকে, হিন্দুরমণীর হৃদয় হইতে যদি আজ প্রাক্তন-জন্ম-শিক্ষার স্থায় মজ্জাগত গীতার নিষ্কাম মন্ত্রের দীক্ষা চলিয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে হীনতর আদর্শে তোমাকে সমাজ গঠন করিতে হইবে। কিন্তু মনে রাখিও, তাহা হইলে আজ তুমি জগতের আধিনৈতিক ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের শস্ত্রপ্রয়োগে ত্রিপাদ পশ্চাদ্‌পদ হইলে! শুদ্ধান্তের যে চিত্তশুদ্ধির বলে শতসহস্র বৈদেশিক ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করিয়াছ তোমার সে বলের অনেক হ্রাস হইল!

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র চন্দ্র।

শুভবিবাহতত্ত্ব।*

শুভবিবাহতত্ত্বের গ্রন্থকার বঙ্গসাহিত্যসমাজে অপরিচিত নহেন। বিপ্রদাস বাবুর লেখাতে আড়ম্বর নাই, কিন্তু অনেক প্রয়োজনীয় ও সরস কথা থাকে। তাঁহার গ্রন্থাবলী মনুষ্য জীবনের বিবিধ ভাগে ব্যাপ্ত। তিনি তাঁহার প্রসিদ্ধ "পাকপ্রণালীতে" আহাররূপ জীবনের নিত্যান্ত অপরিত্যাজ্য ও প্রয়োজনীয় ব্যাপারের তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করিয়া, তাঁহার পরবর্ত্তী গ্রন্থ-রচনায় পথে নানা উপাদেয় মানসিক মিষ্টান্ন বিতরণ করিতে করিতে আসিয়া অদ্য তাঁহার "শুভবিবাহ-তত্ত্ব" পাঠককে উপহার দিতেছেন। এই গ্রন্থও মিষ্ট রুচিকর স্বাস্থ্যজনক এবং সারবান্। বিপ্রদাসবাবুর লেখার ভঙ্গীতে সংযম প্রসাদ ও একটা প্রশান্ত বিনীতভাব আছে; তাহা সর্ব্বজন-মনোহর। কি প্রবীণ কি নবীন পাঠক, কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক সকলেই এ গ্রন্থ পাঠ করিয়া আহ্লাদিত হইবেন। তিনি হিন্দু; সুতরাং হিন্দুশাস্ত্রের উপর প্রধানতঃ নির্ভর করিয়া তাঁহার সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তথাপি তিনি ইউরোপীয় বিজ্ঞান উপেক্ষা করেন নাই। কিছুকাল পূর্ব্বে, এ দেশে ইংরাজি শিক্ষার প্রথম যুগে, যাহাই ইংরাজি তাহাই আদৃত এবং যাহা এদেশীয় তাহা অনাদৃত হইয়াছিল। আবার এক্ষণে যাহাই ভারতের তাহাই কেবল আদৃত হইতেছে, যাহা বিদেশের তাহা উপেক্ষিত হইতেছে। কোন সময়ে একদিকে বাড়াবাড়ি হইলে, তাহার পরে বিপরীত

---

* শুভবিবাহতত্ত্ব—শ্রীবিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত। শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত মূল্য ২৲।

দিকেও বাড়াবাড়ি হয়। ইহা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার নিয়ম। তাই কোন কোন সুশিক্ষিত বাঙালীও ভারত-সাহিত্যে বা ভারত ধর্ম্মশাস্ত্রে যাহা যাহা নাই, তাহা জানিবার বা দেখিবার আবশ্যক নাই মনে করেন। এইরূপ পক্ষপাতী সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে আংশিক অন্ধতা আসিয়া পড়িবার আশঙ্কা আছে। ওজ্জন্য বিপ্রদাসবাবু হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ ইউরোপীয় বিজ্ঞান-সম্মত কিনা তাহা দেখিতে সঙ্কুচিত হন নাই। আমাদের ইউরোপীয় বিজ্ঞানের জ্ঞান যতই বাড়িতেছে, ততই আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে আমাদের সনাতন ধর্ম্ম বিজ্ঞানের উপর সংস্থাপিত। এককালে যাহা হিন্দুদিগের কুসংস্কার বলিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিত হাসিয়াছিলেন, অধুনা ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক সবিস্ময়ে দেখিতেছেন যে তথাকথিত "কুসংস্কারের" ভিতর ইউরোপের নবোদ্ভাসিত বিজ্ঞান রহস্যের গভীর তত্ত্ব, সুদূর প্রাচীনকাল হইতে নিহিত থাকিয়া, হিন্দুসমাজকে রোগ ও নাশ হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। ইহা হিন্দুমাত্রেরই গৌরবের বিষয়। কিন্তু তাই বলিয়া কি আমরা প্রাচীন আচার বা শাস্ত্রবচন-দুর্গে নিয়ত বন্দী স্বরূপ থাকিব? বাহিরের বর্ত্তমান সমাজ ও প্রকৃতির সহিত কি আমাদের কোন সংযোগ নাই? অতীতের প্রতি ভক্তিভারে মন্দালস হইয়া, কি বর্ত্তমানের সাক্ষ্য প্রমাণ পরিদর্শন পরীক্ষা এবং অনুসন্ধানপ্রাণ ইউরোপীয় বিজ্ঞানের শিক্ষার উপেক্ষা করিব? কিন্তু কিছুকাল পূর্ব্বে ইউরোপে ধর্ম্ম, বিজ্ঞানের বিক্রমে ভীত হইয়াছিল। একণে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বুঝিতেছেন যে, বিজ্ঞানের বিক্রম যতই বাড়ুক না কেন তাহাতে ধর্ম্মের কোন ভয়ের কারণ নাই। হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র এক্ষণে সাহস করিয়া বলিতে পারে যে ইউরোপীয় বিজ্ঞান যতই উন্নত হউক না কেন তাহাতে হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের কোন ভয় নাই। হিন্দুদিগের যে সৃষ্টিপ্রলয়তত্ত্ব লইয়া তত্রত্য ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ পূর্ব্বে হাসিয়াছিলেন, অধুনা ইউরোপীয় পণ্ডিতপ্রবর হার্বার্ট স্পেন্সারের মূলতত্ত্বের (First Principles) Evolution and Dissolutionএ তাঁহা প্রতিপন্ন হইতেছে। এইজন্য বিপ্রদাস বাবু বিবাহ সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের বিধিকে ইউরোপীয় বিজ্ঞান দ্বারা পরীক্ষা করিতে যে ভীত হন নাই তাহা আহ্লাদের বিষয়। আমরা যখন ধর্ম্মশাস্ত্রের বা অন্য কোন শাস্ত্রের বিধি আলোচনা করি, তখন একটী কথা মনে রাখা আবশ্যক। সকল ব্যবস্থাই, কাল পাত্র ও দেশভেদে যথাযোগ্যভাবে বুঝিতে ও প্রয়োগ করিতে হইবে। আর ইহাও মনে রাখা আবশ্যক যে, সংসারে অধিকাংশ বিষয়েই একান্তিক ও আত্যন্তিক নিশ্চয়তা নাই। ঔষধ প্রয়োগ করিলে রোগ নিবৃত্তি হয়; কিন্তু কখন কখন হয় না। সুতরাং এখানে একান্তিক নিশ্চয়তা নাই। আবার যদি বা নিবৃত্তি হয়, রোগ আবার হইতে পারে, সুতরাং এখানেও আত্যন্তিক নিশ্চয়তার অভাব। হিন্দুরা বিশ্বাস করেন যাগ করিলে স্বর্গসুখ লাভ হয়। কিন্তু অনুষ্ঠানাদির ত্রুটীতে বা অন্য কারণে কখন কখন তাহা লাভ হয় না। সুতরাং এ বিষয়ে একান্তিক নিশ্চয়তা নাই। আর যদি বা স্বর্গসুখ লাভ হয়, তাহা চিরস্থায়ী নহে, পুণ্যক্ষয়ে স্বর্গভ্রষ্ট হইতে হয়। এখানেও আত্যন্তিক নিশ্চয়তা নাই। এইরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে,

জগতের অধিকাংশ বিষয়েই একান্তিক ও আত্যন্তিক স্থিরত্বের অভাব দেখা যায়। সম অবস্থায় প্রত্যেক শক্তি সমভাবে কার্য্য করে বটে; কিন্তু অবস্থাভেদে কার্য্যভেদ হয়। অনেক সময়ে যখন আমরা ভাবি সব অবস্থা সমান আছে তখন প্রকৃতপক্ষে আমাদের অলক্ষিতভাবে কোন একটী প্রয়োজনীয় অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সুতরাং সদৃশ অবস্থায় যে সিদ্ধান্ত শুদ্ধ, অসদৃশ অবস্থায় তাহা অশুদ্ধ হয়। কোন্ অবস্থার পরিবর্ত্তন হওয়ায় অবস্থা অসদৃশ হইয়াছে তাহা না জানাতে, আমরা মনে করি শাস্ত্রবচন মিথ্যা হইল।

এইজন্য শাস্ত্রানুসারে মীমাংসা করিবার সময় আমাদের বিশেষ সতর্ক হইয়া দেখা আবশ্যক যে যে সকল অবস্থায় কোন বিশেষ শাস্ত্রবিধি প্রযুজ্য সেই সকল অবস্থা এই স্থলে বিদ্যমান আছে কি না। আর ইহাও মনে রাখা আবশ্যক যে বিশেষ অবস্থায় বিশেষ বিধি খাটিবে; নূতন অবস্থায় নূতন ব্যবস্থার প্রয়োজন। ঈশ্বরকে যেমন অধিকার ভেদে ভিন্ন ভিন্ন লোক ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপলব্ধি করেন, শাস্ত্রের অর্থ যেমন অধিকার-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন লোকের নিকট ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রতীত হয়, তেমনি অবস্থাভেদে শাস্ত্রের বিধিও ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বা ফল ধারণ করে।

কি সমাজ, কি বাহ্য জগৎ—প্রতি জিনিসই নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। অসভ্য অবস্থায় সমাজে যে নিয়ম খাটে, সভ্য অবস্থায় সে নিয়ম খাটে না। কোন দেশে এককালে শীতের প্রাবল্যহেতু যেরূপ গরম পোষাক আবশ্যক হইত, সেই দেশে কোন কারণ বশত, যদি শীত কমিয়া যায় তাহা হইলে সেরূপ গরম পোষাক আর আবশ্যক হয় না। "পূর্ব্বে এইরূপ করা হইত সুতরাং এখনও এইরূপ করা আবশ্যক," সমাজ বিষয়ে এইরূপ যুক্তি নিতান্ত অসঙ্গত। সুতরাং প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে যে বিধি আছে, তাহা আধুনিক ইউরোপীয় বিজ্ঞান-সম্মত কিনা তাহার আলোচনা করা বিপ্রদাস বাবুর মত বিবেচক ব্যক্তির উপযুক্ত কার্য্য হইয়াছে।

কি সভ্য কি অসভ্য প্রায় সমুদায় জাতি যখনই সমাজবদ্ধ হয় তখনই তাহাদের মধ্যেই বিবাহ প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। মনুষ্য যখন বন্য পশুর মত খাদ্য আহরণের জন্য বনে বনে বিচরণ করে, তখন তাহার নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান থাকে না, সন্ধ্যার সময় যে স্থানে আশ্রয় পায়, সেই স্থানে সে রাত্রি যাপন করে। তখন যেমন সে খাদ্য পাইলেই তাহা লাভ করিবার চেষ্টা করে, তেমনি নারী পাইলেই তাহার গ্রহণেচ্ছু হয়। তখন বিবাহ সম্ভবপর হয় না। তখন, পশুর অবস্থায় পশুর ব্যবহারাদি সম্ভব। কিন্তু যখন পুরুষ ক্রমশ দলবদ্ধ হইতে আরম্ভ করে, অর্থাৎ সমাজের ভিত্তি স্থাপন করে, তখন দেখিতে পায় যে বিবাহে মনুষ্যের অধিকতর সুখ শান্তি ও জীবন রক্ষার সম্ভাবনা। বিবাহে সন্তান প্রতিপালনের সুবিধা হয়, এবং স্ত্রীলোকের কার্য্য নির্দ্দিষ্ট হয়, এবং পুরুষগণ, কি জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় কি অপর জাতির সহিত যুদ্ধ সব কার্য্যই সুবিধার সহিত করিতে পারে; এবং যে জাতির মধ্যে বিবাহ প্রথা প্রচলিত নাই তাহাদের সহজে জয় করিতে পারে।

বিবাহ প্রথার নির্দ্দিষ্ট নারী নির্দ্দিষ্ট পুরুষের ভোগ্য, অপর পুরুষের তাহাতে অধিকার থাকে না। সুতরাং বিবাহ প্রথা সমাজে না থাকিলে নারীলাভার্থে সতত বিবাদ হইত, এবং সন্তানের পিতৃনিরূপণের উপায় না থাকাতে কোন পুরুষই কোন শিশু সন্তান প্রতিপালন করিতে বাধ্য বা ইচ্ছুক হইত না।

বিবাহ অসংযত কামকে সংযত করিয়া প্রেমে পরিণত করে; দেহের সম্পর্কের সহিত আত্মার সম্পর্ক যোজনা করিয়া মানবচিত্তকে সেবা ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য সংসাররূপ একটী চমৎকার ক্ষুদ্র পাঠশালা রচনা করে। শিক্ষাগুণে সেই পাঠশালা অনতিবিলম্বে স্নেহধারাসিক্ত ভক্তিসেবিত মন্দিরে পরিণত হয়। তখন পত্নী জননীতে পরিণতা। তখন মাতৃদেবী স্বর্গীয়া স্বার্থশূন্যা স্নেহের প্রতিমা। যে নিঃস্বার্থ প্রেম স্বর্গের সোপান—মুক্তির পথ, জননীই প্রথমে তাহা স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে —এই বিবাহ রচিত সংসারধামে—আনয়ন করেন। মাতার স্তন যেমন শিশুর বদনে অমিয় ধারা, তেমনি জননীরূপিনী নারীর হৃদয়, রোগশোকতাপক্লিষ্ট মানবের নিকট অবিরামপ্রবাহী স্নেহের প্রাণারাম প্রস্রবণ। বিবাহরূপ মহাবজ্ঞ হইতে এই জননী-দেবীর আবির্ভাব হয়। এই জননী দেবী কি বুদ্ধদেব কি খ্রীষ্ট কি চৈতন্যদেব সকলেরই আদি গুরু; নিঃস্বার্থ সেবা-ধর্ম্ম মন্ত্র ইনিই জগতে প্রথমে প্রচার করেন।

"শুভবিবাহতত্ত্বে" বিপ্রদাস বাবু বিবাহের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিলে আমরা আরও আহ্লাদিত হইতাম। এ সম্বন্ধে *History of Human Marriage* by Westermarck ইত্যাদি নানা পুস্তক ইংরাজি ভাষায় বর্ত্তমান আছে। ঐ সকল পুস্তকের মতামত ভারতের ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত কতদূর মিলে বা মিলে না তাহাও দেখাইলে বেশ হইত। ভরসা করি গ্রন্থকার শুভবিবাহ-তত্ত্বের দ্বিতীয় সংস্করণে এক অধ্যায়ে এই বিষয়টী সন্নিবেশিত করিবেন।

বিপ্রদাস বাবুর পুস্তকে অনেকগুলি সময়োপযোগী বিষয় আছে। এই সকল বিষয়ের সমালোচনাকালে গ্রন্থকার বেশ সহৃদয়তা প্রকাশ করিয়াছেন।—বিবাহে অধুনা যে ঘৃণিত বণিক্‌বৃত্তি ফুটিয়া উঠিয়া সমাজকে পীড়িত ও ব্যাধিগ্রস্ত করিয়াছে, তৎসম্বন্ধে গ্রন্থকার বলিতেছেন—"আজ কাল অর্থ ও অলঙ্কারের উপর বিবাহের ভিত্তি সংস্থাপিত হইয়াছে—পাত্রের পিতা মাতার কেবল অর্থের দিকে টান" "পাঁঠা পাঁঠী বেচার ন্যায় পুত্র কন্যা বিক্রয় করা যে অতি ঘৃণিত, অতি পাপজনক, ও অতি ইতরতা ব্যঞ্জক, তাহা যুক্তি-দ্বারা কাহাকেও বুঝাইতে হয় না।" আপস্তম্ব বলিয়াছেন "সামান্য মাত্র শুল্ক লইয়াও পিতা যদি কন্যার বিবাহ দেন তবে তজ্জন্য তাঁহাকে রৌরব নরকে পতিত হইয়া দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত মলমূত্রাদি ভক্ষণ করিতে হয়।" অত্রি বলিয়াছেন "মূল্য দ্বারা ক্রীত যে স্ত্রী, সে স্ত্রী স্ত্রী-পদবাচ্য নহে; আর তাহার গর্ভজাত পুত্রাদি পিতার পিণ্ডদানে অধিকারী হইতে পারে না।" মনু ব্যবস্থা দিয়াছেন লোভের বশীভূত হইয়া কন্যা বিক্রয় করিলে তাহাকে কন্যা-বিক্রেতা কহে। ইহার পর গ্রন্থকার মহাভারত হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছেন "যে ব্যক্তি তনয়কে বিক্রয়পূর্ব্বক ধন লাভের

আশা করে, এবং যে জীবিকানির্ব্বাহের নিমিত্ত শুল্ক লইয়া কন্যা সম্প্রদান করে, এই উভয় ব্যক্তিই কালসূত্র নামক নিরয়গামী হইয়া মলমূত্রাদি ভক্ষণ করিয়া থাকে।" যাহারা পুত্রের (বা কন্যার) বিবাহে পূর্ব্বে সর্ত্ত করিয়া টাকা লন, হিন্দুশাস্ত্রকারগণ প্রকারান্তরে তাঁহাদিগের জন্য অধোগমনের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি হিন্দুশাস্ত্রের মূলে গভীর জ্ঞান আছে। তবে হয় তাহা আমরা দেখি না, না হয় দেখিয়াও মানি না, না হয় ভুল বুঝি, তাই মরি। পূর্ব্বে বিবাহে যে বণিক্‌বৃত্তি এককালে এত ঘৃণিত ছিল, আধুনিক সমাজে তাহা কেন অনুসৃত হইতেছে বিপ্রদাস বাবু যদি ভাল করিয়া তাহার কারণ নির্ণয় করেন তাহা হইলে আমরা আহ্লাদিত হইব। শ্রীযুক্ত প্রসাদ দাস গোস্বামী মহাশয় তাঁহার "আমাদের সমাজ" নামক পুস্তিকায় ইহার একটী কারণ উল্লেখ করিয়াছেন।—"অগ্রে, দেশের ভদ্রলোক সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন, ধনী, এবং সামান্য লোক। যাহারা ধনী, তাহারা অকাতরে অর্থ ব্যয়াদি করিতে পারিতেন, সামান্য লোকের তাহাতে অনুকরণেচ্ছা বড় জন্মিত না। ** এক্ষণে একটী মধ্যবিত্ত শ্রেণী উৎপন্ন হইয়াছেন তাঁহারা কাহাকেও শ্রেষ্ঠত্ব দিতে চাহেন না, অথচ তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই অবস্থা ভাল নহে। * * ধনিগণ রোসনাই বাজি বাজনা প্রভৃতিতে বিস্তর অর্থ অনায়াসে ব্যয় করেন, মধ্যবিত্তগণ তা পারেন কই? অথচ সে চেষ্টা করেন বা ইচ্ছা করেন, এইটাই না মূর্খতা! যিনি অনেক কষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, তিনিও পুত্রের বিবাহে একদল ইংরাজী বাজনা ও গোটাকতক ঝাড় গেলাস করিবেন!—কোথা হইতে হয়? ব্রিটিশরাজ্যে চুরি ডাকাতি প্রকাশ্যে করা সহজ নয়। তবে টাকা আসিবার উপায় কি?—ভাল বেটা কন্যাদায়গ্রস্তের ঘাড়। অতি সহজ কথা!" * * যাঁহার পুত্র তিনি কন্যার পিতার কাছে প্রকাণ্ড ফর্দ্দ করিয়া পাঠাইলেন * * এমন পাত্রে * * হাজার টাকা নগদ ৫০ ভরি সোনা আর উপযুক্ত দান পণ দিতে পারিবেন? * * রফা হইল পাঁচশত টাকা নগদ, পাঁচশ' ভরি সোনা ইত্যাদি। কন্যার পিতার বাটী খানি বন্ধক দিয়া কোনমতে টাকা সংগ্রহ করিলেন।" বস্তুত বৃথা আড়ম্বর ও বিলাস ও পাপ প্রতিযোগিতায় আমাদের সমাজকে কীট জর্জ্জরিত বংশখণ্ড তুল্য করিয়া তুলিতেছে। আমি অন্যত্র (নব্যভারতে) "বিবাহে ঘৃণিত বণিকবৃত্তি" সম্বন্ধে নাটকাকারে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি। সুতরাং এখন আর অধিক লেখা অনাবশ্যক।

"বিবাহ সম্বন্ধে নিষিদ্ধ বিধি" অধ্যায়টী বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। "বরকন্যার বংশপরীক্ষা" পরিচ্ছেদে প্রয়োজনীয় কথা আছে। "বিবাহ সম্বন্ধে জ্যোতিষতত্ত্ব"ও অতি সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। যাঁহারা ফলিত-জ্যোতিষ বিশ্বাস করেন, তাঁহারা এই অধ্যায়টী পড়িয়া নিজেই পাত্র পাত্রী জ্যোতিষ অনুযায়ী নির্ব্বাচন করিতে পারিবেন। বিবাহসম্বন্ধে এই উৎকৃষ্ট পুস্তকখানিতে এত বিবিধ বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে যে এ প্রবন্ধে তাহার বিস্তীর্ণ সমালোচনা করিবার স্থান নাই। এই পুস্তকে যে কোন ত্রুটী বা অভাব নাই

তাহা বলি না। নদীয়া জেলার বরেন্দ্র স্থান গুলির উল্লেখ সময় গ্রন্থকার দুইটী প্রধান স্থান, কৃষ্ণনগর ও শান্তিপুর ত্যাগ করিয়াছেন। এরূপ ক্ষুদ্র ত্রুটী কোন কোন স্থানে দেখা যাইতে পারে। ইহার সমুদয় মতও যে আমরা নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত তাহা নহে। তবে একথা বলিতে পারি হিন্দু পরিবারে এ পুস্তকখানি রাখিলে মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল নাই, এবং যে পরিবারে ইহা থাকিবে, সে পরিবারের পুরুষ এবং মহিলাগণদ্বারা ইহা আনন্দে পঠিত হইবে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

সুগোলা।

(১)

পার্ব্বত্যভূমি। সন্ধ্যার ঘনান্ধকার পর্ব্বত-সানুদেশে ঘনবিন্যস্ত বৃক্ষবহুল বনপ্রদেশের উপর কৃষ্ণ যবনিকা টানিয়া দিতেছিল; তরু-শ্রেণীর কোলে কোলে এবং তৃণগুল্মাচ্ছাদিত মনুষ্যপদাঙ্কিত স্বল্পপরিসর বনপথে অন্ধকার ক্রমশ জমাট বাঁধিয়া উঠিতেছিল—আর সেই বনপথে এক যুবা অশ্বপৃষ্ঠে একাকী অগ্রসর হইতেছিলেন। অন্যের পক্ষে তাহা গহন হইলেও, অশ্ব এবং অশ্বারোহী উভয়ের নিকটই সে পথের প্রতি তরুগুল্ম সুপরিচিত। তাই নিতান্ত সহজভাবে স্থিরপদে ছায়ামূর্ত্তির ন্যায় সে দুইটি প্রাণী চলিতেছিল। মানব-মনের চঞ্চল সুখ-আশার ন্যায় অস্পষ্ট সন্ধ্যালোক, পত্রান্তরালপথে একএকবার ফুটিয়া উঠিতেছিল, এবং ভুক্তাতীত সুখের মত, বিগত যৌবনের স্মৃতির মত, সুদূর হইতে সন্ধ্যারতির শঙ্খঘণ্টাধ্বনি চঞ্চল বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল। যুবক ঊর্দ্ধে চাহিলেন,—সুদূর পর্ব্বতশীর্ষে, অস্পষ্টমেঘালোকে, মার্ত্তণ্ডদেবের কনকমন্দিরচূড়া নক্ষত্রচ্ছায়ে উদ্ভাসিত হইতেছিল!—নীচে ধ্যানরত গম্ভীর বনভূমি, ঊর্দ্ধে নিশ্চল অনন্ত তারারাজি—সকলেই যেন নীরবে সেই চিরধ্যেয় মহাপুরুষের ধ্যানে মগ্ন হইয়া ছিল!—সম্ভ্রমে ভক্তিতে যুবকের বক্ষ ভরিয়া উঠিল—সেই অনাদিদেবের চরণোদ্দেশে ধীরে ধীরে তাহার মস্তক অবনত হইয়া আসিল!

সহসা সেই গভীর নির্জ্জনতা ভঙ্গ করিয়া কে যেন অদূরে অস্পষ্ট চীৎকার করিয়া উঠিল—সে ধ্বনি অস্ফুট অথচ কাতরতাপূর্ণ—মর্ম্মন্তুদ যাতনাময়! যুবক চকিত হইয়া অশ্বরশ্মি সংযত করিলেন। তারপর শব্দ লক্ষ্য করিয়া বেগে অশ্ব ছুটাইয়া দিলেন।

অন্ধকারে বটবৃক্ষতলে বস্ত্রাবৃত এক মনুষ্যদেহ; আশে পাশে জনসমাগমের চিহ্নমাত্র নাই। যুবক একটু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'কে তুমি? এমন অসহায় অবস্থায় একাকী এখানে রহিয়াছ?'

অতি ক্ষীণ কণ্ঠে ধীরে ধীরে উত্তর আসিল,—'আমি অভাগিনী!'

রমণী দেখিয়া যুবকের আরও দয়া হইল;

অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া কাছে যাইয়া বিনীতভাবে বলিলেন—

"আমি কি আপনার কোনও উপকার করিতে পারি ?"

"উপকার ?"—রমণী কিছুক্ষণ ভাবিলেন, শেষে বলিলেন—"না। আপনার-জন যাহাকে ত্যাগ করিয়াছে, অন্যে তাহার জন্য কেন নিজেকে বিপন্ন করিবে ? না মহাশয়, আমি কিছুই চাহি না। দুঃসাধ্য বসন্তরোগাক্রান্ত বলিয়া আমি স্বজনকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত— আমি মার্ত্তণ্ডদেব-মন্দিরের একজন নর্ত্তকী!"

যুবক সে কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। মানুষ কি এমন হৃদয়হীন হইতে পারে ? যে একদিন আনন্দে হাস্যে ক্রীড়াকৌতুকে সঙ্গিনী ছিল,—তাহার এই দারুণ দুঃসময়ে আসন্নকালে পথপার্শ্বে তাহাকে পরিত্যাগ করা —এই কি মনুষ্যত্ব!—কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়োপভোগই যে বন্ধনের মূলসূত্র, তাহার পরিণাম বুঝি এইরূপই হইয়া থাকে !

দয়ার্দ্র হইয়া যুবক বলিলেন—রমণী! তুমি যেই হও, তুমি এখন বিপন্না। এরূপ অসহায়া অবস্থায় তোমাকে আমি ফেলিয়া যাইতে পারি না।—তোমার আত্মীয়স্বজন বা পরিচিত বন্ধুবান্ধব কি কেহই নাই যার কাছে তোমায় রাখিয়া আসিতে পারি ?"

রমণীর কণ্ঠস্বর ঈষৎ কম্পিত হইয়া উঠিল—

"মহাশয়! ভাই বন্ধু মাতা পিতা— আপনার বলিতে এ সংসারে আমার আর কেহই নাই; আমার মৃত্যুই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তবু, এ গহন বনে, শৃগাল কুকুরের ভক্ষ্য হইয়া এভাবে মরিতে বড় কষ্ট হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে মানুষের মুখ দেখিতে দেখিতে, মানুষের কণ্ঠস্বর শুনিতে শুনিতে যেন মরিতে পারি এখন আমার এইটুকুমাত্র সাধ।"

যুবক রোগিণীর নাড়ী পরীক্ষা করিলেন। তাঁহার ললাটে চিন্তারেখা ফুটিয়া উঠিল!— রোগিণীর অবস্থা তত আশাপ্রদ নহে। যুবক বলিলেন—

আমার বাসস্থান নিকটেই। যতক্ষণ না তোমার আত্মীয়-স্বজনের সন্ধান হয় ততক্ষণ আমার নিকটেই থাকিবে চল। সঙ্গীশূন্য হইলেও আমি বোধ হয় একাকী তোমাকে বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারিব।"

রমণী সে যন্ত্রণার মধ্যেও শিহরিয়া উঠিয়া বসিল; বলিল—

"আমার দেহে কালকূট বিষ; স্পর্শে নিশ্চিত মৃত্যু তা জানেন ?"

যুবক ঈষৎ হাসিলেন;—

'তা জানি! কিন্তু মহাযোগী মহাদেব বিশ্বের পাপের বিষ কণ্ঠে ধারণ করিয়া আছেন, আর আমি কি তোমার এই সামান্য বিষ অঙ্গে গ্রহণ করিতে পারিব না ? জন্মিলে মৃত্যু আছেই। যে বিপন্নকে উদ্ধার করিতে পারে সেই সার্থক।'

সকল আপত্য অগ্রাহ্য করিয়া যুবক তখন সেই গলিত দেহ ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন; তারপর ধীর পাদবিক্ষেপে সন্তর্পণে অন্ধকার পথে অগ্রসর হইয়া চলিলেন। আনতশাখাজটে শুভ্ররশ্মিঅশ্ব বাঁধা রহিল।

(২)

মাতৃহীন যুবরাজ হর্ষের রাজধানীতে তেমন প্রতিপত্তি ছিল না। তাহার কারণ ছিল। প্রৌঢ় কাশ্মীরাধিপতি শঙ্করবর্ম্মমহারাজ

রণাদিত্য শৌর্য্যে বীর্য্যে অসাধারণ পুরুষ হইলেও নৈতিক দুর্ব্বলতার হস্ত অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তাঁহার ন্যায় অর্থগৃধ্নু ও বিলাসী নরপতির সংখ্যা অতি বিরল। তাঁহার বিলাস-সাগরের তরণী, ভোগ-প্রাসাদের ঘরণী, তরুণী দুই মহিষী যন্ত্রবৎ তাঁহাকে পরিচালনা করিতেন। রণাদিত্য নামে মাত্র রাজা ছিলেন,—রাণীদ্বয়ই যথার্থ শাসনদণ্ড চালাইতেন। সুতরাং মাতৃহীন হর্ষ যে অনাদৃত হইবেন, এবং সিংহাসনে তাঁহার দাবী সর্ব্বাগ্রগণ্য হইলেও তিনি যে উপেক্ষিত হইবেন তাহা কিছুই বিচিত্র নহে।

কিন্তু হর্ষের এ সকল স্বার্থের সংগ্রাম, কুটিল মন্ত্রণা, অত্যাচার অবিচার ভাল লাগিত না,—তাই তিনি পিতার অনুমতি লইয়া, রাজধানীর অনতিদূরে উদ্যান-ভবন নির্ম্মাণ করাইয়া কয়জনমাত্র অনুচর সমভিব্যাহারে সেখানে বাস করিতেন। তাঁহার শিশুসুলভ সরলতা, প্রৌঢ়ের ন্যায় বিজ্ঞতা এবং অলৌকিক গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়া,—সামন্তবর্গ এবং প্রজাবৃন্দ তাঁহার সেই নির্জ্জনবাসে কতদিন তাহাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধাভক্তি এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে আসিত,—এবং শত অত্যাচার অবিচারের মধ্যে তাঁহারই মুখপানে চাহিয়া কত আশায় বুক বাঁধিত।

সেই পুর্ব্বতসানুদেশস্থ প্রকৃতিঅঙ্কনাস্ত বিহগ-কূজিত ভবনখানি, প্রকৃতির শিশু হর্ষের বড় ভাল লাগিত। রাজবাটীর সে অভ্রভেদী প্রাচীরবেষ্টিত প্রাসাদাবলি, স্বকৃত স্বার্থ-গণ্ডীঘেরা কঠোর মানব-প্রকৃতির মত, তাঁহাকে সর্ব্বদা ক্লিষ্ট করিত। সেখানের শ্বেত মর্ম্মরময় হর্ম্ম্যশ্রেণী হৃদয়হীনের উপহাস-হাসির ন্যায় তাঁহার কাছে যখন তখন অট্টহাসি হাসিয়া উঠিত। তাই হর্ষ, সেই শ্যাম-শস্পাবৃত পুষ্পপল্লবভারনত তরুচ্ছায়স্নিগ্ধ জননী প্রকৃতির নিকেতনে ছুটিয়া আসিতেন। সেখানে বিদ্রূপ করিবার কেহ থাকিত না, হিংসা করিতে কেহ আসিত না,—সম্ভোগ-লালসা তাঁহাকে পীড়ন করিত না।—সেখানে শিশিরাশ্রু-কম্পিত তৃণদলে, কুমুদ-কহ্লার-শোভিত সুনীল হ্রদ-নীরে, পুষ্পসৌরভবাহী নাতিশীতোষ্ণ মলয়-হিল্লোলে, অনন্ত জ্যোতিষ্ক-খচিত উন্মুক্ত উদার নীল নভতলে জননী-প্রকৃতি তাঁহার অনন্ত স্নেহভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া তাঁহার সন্তানের নিকটে 'পরমানন্দম্‌' বিলাইতেন! সে আনন্দ একা ভোগ করিয়া হর্ষের তৃপ্তি হইত না। উদ্বেলিত অম্বুরাশির ন্যায় তাঁহার সে পরমানন্দ সে অনন্ত প্রেমোচ্ছ্বাস বিশ্ব-জগতের কূলে কূলে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত!

সেই উদ্যান-বাটিকায় হর্ষ পতিতা হতভাগিনী সুগোলাকে আনিয়া স্বয়ং তাহার সেবা শুশ্রূষার ভার লইলেন। সবাই যাহাকে ত্যাগ করিয়াছে—তিনি তাহাকে ত্যাগ করিতে পারিলেন না। সে দীনা হোক্‌ পতিতা হোক্‌—সে বিচারে তাঁহার কি অধিকার? তাঁহার ভার সেবার; তিরস্কারের নহে! ভগবানের কাছে মহাপাপের ক্ষমা আছে,—মানবের কাছে কি সামান্য ত্রুটীরও ক্ষমা নাই?

হতভাগিনী সুগোলা অক্লান্ত সেবা শুশ্রূষার ফলে আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইল বটে, কিন্তু হর্ষ স্বয়ং রোগাক্রান্ত হইলেন।

সুস্থ হইয়া সুগোলা সব শুনিল। সামান্য

একজন পতিতা রমণীর জন্ত যে মহাপুরুষ আপনার রাজ-জীবন বিপন্ন করিয়াছেন তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধায় সম্মানে ভক্তিতে তাহার কৃতজ্ঞ হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল!—সুগোলার শিক্ষা আরম্ভ হইল। আপনার চরিতার্থতা ব্যতীত যাহার অন্ত কামনা কিছু ছিল না, কামনা-পরিতুষ্টিই যাহার সম্ভোগময় জীবনের প্রধানতম উপকরণ ছিল, স্ব-সুখই যে চিরদিন বড় বলিয়া বুঝিয়াছে—আজ সেই স্বার্থময়ী সুগোলার শিক্ষা আরম্ভ হইল; কাঞ্চনস্পর্শে পিত্তল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—সুগোলা পরের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করিতে শিখিল।—মূর্ত্তিমতী করুণারূপিনী জননীর ন্যায় সুগোলা হর্ষের শয্যাপার্শ্ব অধিকার করিয়া বসিল। সে একবারও সে শয্যাপার্শ্ব পরিত্যাগ করে না,—তাহার আহার নাই, নিদ্রা নাই,—ভোগস্পৃহা নাই,—তাহার সমস্ত লক্ষ্য এখন হর্ষাভিমুখী!

রাজপুত্র যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠেন—সে ধ্বনি বিষদিগ্ধ শল্যের ন্যায় সুগোলার অন্তরতম অন্তরে যাইয়া বেঁধে; রাজপুত্রের চক্ষের কোণে অশ্রুকণা দেখা দেয়, আর সুগোলার অন্তর-সাগর মথিত করিয়া তপ্ত অশ্রুবিন্দু ছুটিয়া আসে! সুগোলা, তাঁহার পদসেবা করিতে করিতে একএকবার সে দেব-দুর্লভ চরণ দু'খানি বক্ষের মাঝে চাপিয়া ধরে আর মনে মনে বলে—'প্রভু! তুমি দেবতা! আমায় ক্ষমা কর! আমি ঘোর পাপী, অজ্ঞাতে তোমাকে দিয়া সেবা করাইয়া লইয়াছি—আমায় ক্ষমা কর!—আমার তুচ্ছ প্রাণের বিনিময়ে তোমাকে বিপন্ন করিয়া রাজশ্রীকে অনাথা করিতে চলিয়াছি—আমায় ক্ষমা কর!' আবার এক সময় সে শিহরিয়া উঠিয়া বলে—'না, প্রভু— ক্ষমা চাহি না,—শাস্তি দাও। আমার জীবন লইয়া তুমি বাঁচিয়া উঠ—রাজ্য রক্ষা হোক্!'

ব্যাধির যন্ত্রণায় যুবরাজ অধিকাংশ সময়ই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিতেন, কিন্তু যখনই চক্ষু উন্মীলিত করিতেন তখনই দেখিতেন সুগোলা তাঁহার শয্যাপার্শ্বে তাঁহারই প্রতি চাহিয়া বসিয়া আছে! হর্ষ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিতেন—'সুগোলা, এখনো তুমি বসিয়া আছ? সারাদিনই কি এমনই বসিয়া থাকিবে? তোমার শরীর এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নাই,—তুমি যাও বিশ্রাম কর।'—

সুগোলা যুবরাজের কথায় কোন উত্তর করিতে পারিত না;—শুধু তাহার চক্ষু দুটি অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিত! এমন যথার্থ স্নেহের বাক্য এমন আন্তরিক সহানুভূতি সে জীবনে কখনও পায় নাই! তাহার সমস্ত যেন গোলমাল হইয়া যাইত;—তাহার প্রাণের মাঝে ভাষাহীন কি এক অব্যক্ত ব্যাকুলতা আকুলিত হইয়া উঠিত!

রাজপুত্র সারিয়া উঠিলেন বটে, কিন্তু সুগোলা আর পূর্ব্বের ন্যায় নিঃসঙ্কোচে সহজভাবে তাঁহার কাছে আসিতে পারিত না। রাজপুত্র কোন কথা বলিলে সে উৎকর্ণ হইয়া শুনিত—কিন্তু তাহার আকপোল শ্রবণমূল আরক্তিম হইয়া উঠিত; সঙ্কোচ আসিয়া তাঁহার চরণের গতি মৃদুতর করিয়া দিত; সম্ভ্রমে তাহার দেহলতা আনত এবং সংযত-শ্রী হইয়া আসিত।—এ ভালবাসা, না প্রেম, না পূর্ব্বানুরাগ?—তোমার যা বলিতে হয় বল। আমি কিন্তু জানি—তাহার অনুশোচনা-দগ্ধ

হৃদয়খানি পূজার জন্ম উন্মুখ হইয়া উঠিতেছিল, —এবং তাহার নিজের হীনতার স্মৃতি তাহার এতটা সঙ্কোচ বৃদ্ধি করিতেছিল।

হর্ষ কিন্তু কিছুই বুঝিতেন না; বুঝিলেও তাঁহার উদ্বেগের কোন কারণ ছিল না। মানব আপনারি মনের ছায়া দিয়া বিশ্বকে প্রতিবিম্বিত দেখে! হর্ষের উদার হৃদয় বিশ্বকে আলিঙ্গন করিবার জন্ম সদাই উন্মুখ হইয়া থাকিত,—তাহাতে ক্ষুদ্র গণ্ডীর গ্লানি ছিল না। যেখানে গণ্ডী,—সেইখানেই 'আমিত্ব' এবং স্বার্থ—এবং সেইখানেই গ্লানি।

যেদিন যুবরাজ সুগোলাকে আহ্বান করিয়া মার্ত্তণ্ডদেবের মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অনুরোধ করিলেন—সেদিন সে আর চক্ষের জল রোধ করিতে পারিল না। মনে মনে ভাবিল—'প্রভু! প্রত্যক্ষ দেবতার দর্শন ত মিলিয়াছে,—কোন্ পাষাণ দেবতার কাছে তবে ফিরিব?' বলিল,—

'যুবরাজ! সেখানে ফিরিতে আর ইচ্ছা নাই। আজ্ঞা করুন, আপনার দাসদাসীর মধ্যে একজন হইয়া যেন এখানে আশ্রয় পাই!'

সেইদিন হইতে সুগোলা হর্ষের দাসীশ্রেণীভুক্ত হইল। এদিকে, বিভিন্ন লতাগুল্মসমাবৃতা হইয়া একথা রাজপ্রাসাদের মধ্যে প্রচারিত হইল! মহিষীদ্বয় রাজাকে শুনাইয়া শুনাইয়া বিনাইয়া বিনাইয়া বলিলেন, —'মহারাজ, এ ত আমরা পূর্ব্বেই জানিতাম। তাহা না হইলে প্রাসাদ ছাড়িয়া যুবরাজ স্বেচ্ছায় বনবাস গ্রহণ করিবে কেন? আরো হয়ত কত কি আছে, কে জানে?—হায়, মহারাজ, এই স্বেচ্ছাচারীই তোমার উত্তরাধিকারী!'

রণাদিত্য মনে মনে বিলক্ষণ ক্রুদ্ধ হইলেন; বলিলেন—'হর্ষের শাসন আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে, কাল তাহার ব্যবস্থা করিব।'

(৩)

প্রলয়ান্ধকারের ন্যায় কাল বসন্তব্যাধি সমগ্র কাশ্মীরে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে! গৃহের পর গৃহ, গ্রামের পর গ্রাম একে একে উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে!

বিপদ, মানবের হীনতা এবং মহত্ত্ব উভয়েরি পরিমাপক। বিপদের দিনে সাধারণতঃ মানুষের স্বার্থটা বড় প্রবল হইয়া উঠে,—তাই লোকে আত্মীয় স্বজন ছাড়িয়া, ভ্রাতা ভগ্নিকে ছাড়িয়া, পিতা পুত্রকে ছাড়িয়া—যে যেখানে পারিল পলাইল,—তন্মধ্যে কতক বাঁচিল, কতক আবার স্বাস্থ্যকর স্থানে ব্যাধির বীজ আনিয়া দশ জনকে পুড়াইয়া নিজেও পুড়িল। যাহারা রহিয়া গেল,—তাহারা মার্জ্জার-কবলিত মূষিকের ন্যায় প্রত্যহই মৃত্যুর আশঙ্কা করিতে লাগিল। রাজ্যময় এক মহা অশান্তি প্রধূমিত হইয়া উঠিল। প্রজারা প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে রাজাকে অভিসম্পাত করিতে লাগিল। একদিন এক প্রবীণ ব্যক্তি কোন রাজকর্ম্মচারীকে স্পষ্টই বলিয়া দিলেন—'রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট। এরূপ অক্ষম রাজার রাজ্যে প্রজারা ত মরিবেই!' পরদিন সকলে সভয়ে দেখিল রাজপথ-চতুষ্কে বৃদ্ধের ধৃত-বেণী-ছিন্ন-শির দুলিতেছে!—অশান্তি বাড়িয়াই চলিল!

এমন সময় অকস্মাৎ এক নবীন সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হইল। গৃহে গৃহে দ্বারে দ্বারে অক্লান্তভাবে তিনি আর্ত্তের সেবা করিয়া ফিরিতে লাগিলেন। সে কাল ব্যাধি তাঁহাকে স্পর্শ করিতেও পারিল না। তাঁহার সেই

সু-উন্নত ভস্মাবৃত দেহ,—প্রতিভাব্যঞ্জক বিস্তৃত ললাট, সেই স্বেচ্ছা-গৃহীত সেবা-ভার, সেই অনন্ত সহানুভূতি, এবং সেই দীননম্রভাব—জনসাধারণের নিকটে তাঁহাকে দেবত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিল।—তখন একে একে যুবক-বৃন্দ আসিয়া তাঁহার সেবাভারের অংশ গ্রহণ করিলেন। সন্ন্যাসী তখন তাহাদের লইয়া সেবাব্রতের দল গঠন করিয়া গ্রামে গ্রামে আত্মনির্ভরতার সঙ্গীত গাহিয়া জনসমূহকে উদ্বোধিত করিয়া ফিরিতে লাগিলেন।

(৪)

মহারাজ রণাদিত্য সংশয়াপন্ন পীড়িত; হর্ষও অনুদ্দেশ। সুতরাং কুমার উতঙ্করকে রাজপ্রতিভূস্বরূপ রাখিয়া বৃদ্ধ মন্ত্রীই রাজকার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কুমারের ঔদ্ধত্য এবং অহঙ্কার বৃদ্ধ মন্ত্রীর প্রতিদিনই অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল—তাই তিনি সত্বর রাজার আরোগ্যকামনা করিয়া অবসর গ্রহণের সঙ্কল্প করিতেছিলেন। এমন সময় সহসা একদিন রাজসভামধ্যে ধৃত-জট-গৈরিক-বাস প্রশান্তমূর্ত্তি সেবাশ্রমী সন্ন্যাসীদল দেখা দিলেন। মুগ্ধ সভাসদগণ নিশ্চল হইয়া তাঁহাদের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। সন্ন্যাসীদল গান ধরিলেন—

"—রাজা সে ত তোদেরি মত
আকাশ থেকে পড়েনি সে;
রাজার রাজা জাগেন যিনি
তাঁরি কাছে তাই দাঁড়া এসে।
আপন দুঃখ দৈন্য ব্যাধি
নিজেই কেন কর না দূর?
রাজার পানে চেয়ে চেয়ে
অলস জীবন করলি চূর!
তোরা যদি সবাই মিলে
আপন পায়ে দাঁড়াস ভাই—
দেশটা দেখ্‌বি হবে সোণা,
রাজার একা সে সাধ্য নাই!"

সকলেই সুকণ্ঠ। তাঁহাদের কণ্ঠস্বরে কি যেন সজীবতা ছিল! সে রাগিণীর প্রতি ঝঙ্কারে 'আত্মনির্ভরতার' কাহিনী ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছিল,—সে যেন জড়ত্ব কাটিয়া কর্ম্মের উদ্বোধনসঙ্গীত গাহিতেছিল,—সে যেন চিত্তে নূতন বল, প্রাণে নূতন আশা আনিতেছিল! সভাসদগণ মন্ত্রমুগ্ধবৎ সে সঙ্গীত শুনিতে লাগিলেন।

উতঙ্কর কিছু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। তিনি জানিতেন তাহাদের নেতা কে? বিশ্বস্ত দূতমুখে পূর্ব্বেই তিনি সে সন্ধান পাইয়াছিলেন,—এবং মনে মনে একটা সঙ্কল্প আঁটিতেছিলেন। আজ সে সুযোগ যদি এত সহজে হাতের উপর আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহা কি উপেক্ষা করিতে আছে? উতঙ্কর তখন ন্যায়ের দোহাই দিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—'সন্ন্যাসী! রাজা বিধাতার অংশ; তুমি জনসমূহের সে বিশ্বাস শিথিল করিতেছ। তুমি রাজদ্রোহী!'

'কিসে, রাজপুত্র?'—সন্ন্যাসীর কণ্ঠস্বর গম্ভীর;—'লোককে কর্ম্মে উদ্বোধিত করাটা কি বিদ্রোহের পরিচায়ক?—কর্ম্মেই মুক্তি।—শুধু পরের প্রতি নির্ভর করিয়া থাকিলে কোন মঙ্গল নাই।—আত্মনির্ভরতা চাই, তাহাতে কর্ম্মের একটা দায়িত্ব থাকে;—কর্ম্ম-দ্বারাই ইহলোক জয় করিতে হইবে,—কর্ম্ম-দ্বারাই পরলোকে মুক্তির সাধনা করিতে হইবে!'

'তাহা বুঝি। তত্রাচ তুমি রাজদ্রোহী। তোমারই এইরূপ প্ররোচনায় প্রজারা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। রোগবিষ্ঠ্ তিনিবারণপক্ষে রাজার সাহায্য উপেক্ষা করিয়া তাহারা নিজেদের উপায় অবলম্বন করিতেছে।—একদিন স্বয়ং রাজাকেও হয়ত তাহাদের আবশ্যক হইবে না! —তোমার অপরাধ গুরুতর—আমি তাহা উপেক্ষা করিতে পারি না। আমি তোমার কারাদণ্ড করিলাম।'

সেই মুহূর্ত্তে সন্ন্যাসীর জটাজুট দূরে গেল। সন্ন্যাসী বলিলেন,—'তুমি রাজপ্রতিনিধি; তোমার আদেশ শিরোধার্য্য!'—বিস্মিত স্তম্ভিত সভায় সকলে তখন সমস্বরে উল্লাসধ্বনি করিয়া উঠিল—'জয় যুবরাজ হর্ষজীকী জয়!'

উতঙ্কর ততটা বিস্মিত হন নাই। কারণ, তাঁহার চরের মুখে তিনি হর্ষের এ সন্ন্যাসিত্বের সম্বাদ পাইয়াছিলেন। ক্রোধকম্পিতদেহে সিংহাসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তিনি বলিলেন—'স্থির হও! উল্লাসের আধিক্যটা কিছু নয়! অদ্য এই সভায় আমি প্রভু। সন্ন্যাসী যুবরাজ হউন আর সামান্য প্রজাই হউন, তাহা আমাদের বিচার্য্য নয়। আমাদের বিচার্য্য এই যে তিনি অপরাধী কি না? অপরাধী হইলে—তিনি যুবরাজই হউন আর অপর কেহই হউন, শাস্তি তাঁহাকে গ্রহণ করিতেই হইবে!'

সভায় সকলে নির্ব্বাক্!

'রাজপুত্র!——

"চুপ্ কর, মন্ত্রী। তুমি আমার অধীন, আমি তোমার অধীন নই। সন্ন্যাসীর কারাদণ্ড করিলাম;—পার, রাজাকে বলিয়া হুকুম ফিরাইও" বলিয়া উতঙ্কর সভা ত্যাগ করিলেন।

রণাদিত্যের নিকট আসিলে, মহিষীদ্বয় এবং রাজপুত্রদের প্ররোচনায় উতঙ্করের হুকুমই বাহাল রহিল। যুবরাজ হর্ষ নির্জ্জন প্রাসাদে বন্দী হইলেন।—ক্ষোভে অপমানে বৃদ্ধ মন্ত্রী সেইদিনই কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন।

(৫)

এদিকে রণাদিত্যের ব্যাধি ক্রমশই বাড়িয়া চলিল। রাজবৈদ্যগণ শঙ্কিত হইয়া, গ্রহশান্তির জন্য মহারাজকে মার্ত্তণ্ডদেবের মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। উতঙ্করও সেই সুযোগে সমস্ত রাজক্ষমতা নিজহস্তে একে একে গ্রহণ করিলেন।

সেই মার্ত্তণ্ডদেব-মন্দিরে, জীবনের অপরাহ্নে, অন্তিমশয্যায় শয়ন করিয়া বৃদ্ধ রাজা, যুবরাজ হর্ষের কথা ভাবিতেন। মহিষী বা উতঙ্কর এক দিনও দেখা করিতে আসেন নাই সেজন্য তাঁহার তত দুঃখ নাই। আজ তিনি সব বুঝিতেছিলেন। তাঁহার সে শেষদিনে বৃদ্ধ মন্ত্রী এবং পুরাতন ভৃত্য কয়েকজন যে তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই তাহাতেই তিনি সকল ক্ষোভ ভুলিয়াছিলেন। আর একজন তাঁহার অযাচিত অক্লান্ত সেবিকা জুটিয়াছিল। তাহারি ব্রহ্মচারিণীর বেশ, ভস্মানুলিপ্ত কাঞ্চনদেহ,—জটাবদ্ধ আলুলায়িত কেশ!—সে পরিচর্য্যা, সে স্নেহ-সিক্ত পরিশ্রম, সে সান্ত্বনার বাণী—সে বুঝি মানবীর পক্ষে সম্ভব নয়! রণাদিত্য এক একদিন বলিতেন—'কে তুমি মা? জননীর মত আমার সব দুঃখ জুড়াইতে আমার কাছে এলে? তোমার এই স্নেহ দেখে

আর একজনের কথা যে মনে পড়ে, মা!' রমণীর চক্ষুপল্লব দুটি নত হইয়া আসিত, ধীরে ধীরে সে উত্তর করিত—'বাবা, আমি আপনার একজন সামান্য প্রজা,—আপনার কন্যা!'

তারপর একদিন বৃদ্ধ রাজা সকল শোক-তাপ বিমুক্ত হইয়া স্বর্গারোহণ করিলেন; শেষ সময় সে অন্তিম, শয্যাপার্শ্বে ছিলেন,—বৃদ্ধ মন্ত্রী জয়দেব, সন্তানোপম ভৃত্য কয়জন, আর শুশ্রূষাকারিণী ব্রহ্মচারিণী সুগোলা!

উত্তঙ্ক ইতিপূর্ব্বেই আপনাকে 'মহারাজ' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন!

(৩)

উৎসবালোকে কাশ্মীরাজপ্রাসাদ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার গগনস্পর্শী তোরণ-শীর্ষে উড্ডীয়মান গৈরিক নিশান, তাহার চিত্র-রঞ্জিত অসংখ্য হর্ম্ম্যশ্রেণী, তাহার কক্ষে কক্ষে বিচ্ছুরিতালোক শত শত স্ফটিক দীপাধার, তাহার সুচিত্রিত মর্ম্মরস্তম্ভাবলী—কাশ্মীররাজ-সম্পদের কথা ব্যক্ত করিতেছিল। আজ, উত্তঙ্কের রাজ্যাভিষেকের পূর্ব্বরাত্রে, সে উৎসবে যেন কিছু বিশেষত্ব ছিল,—সে উৎসব আজ যেন তাহার পূর্ণ গৌরবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার উপলক্ষ্যও ছিল। রাজসভায় আজ নৃত্যোৎসব—উত্তঙ্ক নবীনা নর্ত্তকী চম্পককে আজ রাজসভায় আহ্বান করিয়াছেন।

চম্পক কে,—তাহার পরিচয় কি, রাজধানীতে কেহ জানিত না, সেও কাহারে আপন পরিচয় দেয় নাই। এই রাজ্যাভিষেকোৎসব উপলক্ষে অভ্যাগত শত শত নট ভাট বাদক মল্ল ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় অযাচিতভাবে কয়েকদিন মাত্র পূর্ব্বে সহসা সে একাকী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; কিন্তু ইহারই মধ্যে সঙ্গীতশালায় উৎসব-মন্দিরে গৃহে গৃহে মুখে মুখে তাহার সুযশ কথা প্রচারিত। চম্পকের কথা ব্যতীত নাগরিকগণের মুখে অন্য কথা নাই!—কিন্তু চম্পক প্রকাশ্যে ধরা দেয় না; দেবতার ন্যায় সে আপনাকে স্বেচ্ছায় দুলভ-দর্শন করিয়া তুলিল। মাঝে মাঝে সে শুধু রাজন্যবর্গের পট্টাবাসে যাইয়া দেখা দেয়, তাঁহাদের সহিত আলাপ পরিচয় করে এবং চরণ-নূপুর শিঞ্জনে কোমল-রাগিণী-গুঞ্জনে তাঁহাদের সে পট্টভবন আনন্দ-হিল্লোলিত করিয়া তোলে!

—তবু চম্পক সাধারণ নর্ত্তকীর মত নয়। রাজগণও তাহাকে সাধারণ নর্ত্তকীর মত দেখিতে পারিতেন না। সে মূর্ত্তি বিলাসময়ী অথচ গাম্ভীর্য্যপূর্ণা; তাহার সকল লাস্যলীলার অভ্যন্তরে এক মহা-বৈরাগ্যের তাপসীমূর্ত্তির ছায়া যেন সর্ব্বদা প্রতিফলিত হইয়া রহিত! মুগ্ধ হইয়া তাঁহারা তাহার প্রতি চাহিয়া থাকিতেন; বুঝিয়াও তাহাকে তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন না।—সে চরিত্র এমনি অপূর্ব্ব, এমনি বিচিত্র, এমনি রহস্যপূর্ণ! তাঁহাদেরই অনুরোধে আজ চম্পকের রাজ-সভায় নিমন্ত্রণ!

পুরোজনসমূহে সভাসদবর্গে এবং সামন্ত-রাজন্যবৃন্দে সে বিশাল সভা পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে! বেশ পারিপাট্যে ভূষণবিন্যাসে রত্নশোভাধিক্যে এবং দর্পণবিম্বিত আলোক-মালায়, লতাপুষ্পসমালঙ্কৃতা স্ফটিকদীপা-লোকোদ্ভাসিতা সে রাজসভা সজ্জিতা নায়িকার ন্যায় ঈপ্সিত কান্তাভিমুখী হইয়া উঠিয়াছে!

সকল নর্ত্তকীর লাস্যলীলার অবসানে

চম্পক সভামধ্যে দেখা দিল। সে মহতীসভা অমনি নিমেষে স্তব্ধ হইয়া আসিল। চম্পক সমাগত জনসমূহের প্রতি একবার স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া মস্তক আনত করিল—তাহার ম্লান ওষ্ঠপুট ম্লানতর হইয়া আসিল;—চম্পক গাহিল—

'—তোরে ফিরিনু ঢুঁরি
জনম জনম,
ত্যজিনু তোরি লাগি
সরম ধরম;
কোন্ অতীত-তীরে
বাজালি মুরলি রে
ভাসালি আঁখি-ঝোরে
সকল করম!—

সে দেবদুর্লভ সঙ্গীত ঝঙ্কারে, কোন্ কল্পনারাজ্যের চির-কাম্য চির-অনাস্বাদিত সুধা-রস যেন ঝরিতেছিল! মন্ত্রমুগ্ধ চিত্রার্পিতের ন্যায় সকলে সে সঙ্গীত সুধা পান করিতে লাগিলেন।

চম্পক গাহিতে লাগিল—

'কাঁহা সে দেশ ঘর
স্বজন সোদর!—
চাহি সে তোরি পানে
সব ভুলেছি রে!
জগত ইহ পর——
মাঝে এ প্রান্তর,
এ পথে অনন্ত
আমি সে একা রে!
পথ কি ফুরাবে না?
আশ কি মিটিবে না?
—তোর সে খেলা রে,
হামারি মরণ!—
কবে সে নিবি বুকে,
মুছাবি সব দু'খে—
কবে সে সারথক
করিবি জনম?'

—সে রাগিনীর প্রতি ঝঙ্কারে করুণরস কম্পিত হইয়া উঠিতেছিল!—সমবেত জনসমূহের নেত্র ছলছল করিয়া উঠিল; চম্পকের আপন চক্ষুও শুষ্ক ছিল না! উতঙ্কর বলিলেন,—'রমণী,—সুখের দিনে এ বিষাদের গান কেন? উৎসবের গান গাও।'

চম্পক তখন হাসিয়া গান ধরিল,—

'—তুঁহু রসবস
হৃদয়-রায়,
সঁপিনু সবহুঁ
তুহারি পায়!—'

—একি সেই চম্পক? এই লালস-বিলাস ছবি কি সেই পূর্ব্ব গীতের গম্ভীর বৈরাগ্য-মূর্ত্তি? এ রাগিণী আকুল উন্মাদনা পূর্ণ, ইহার প্রতি শব্দ তীব্র আকুলতা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে! ইহার নূপুর-শিঞ্জিত লাস্যময় চরণ-দুখানির গতি, ইহার বিশাল নয়নের বিলোল কটাক্ষপাত, ইহার আলস-লালস অঙ্গ-বিলাস—চম্পকতীব্র-সৌরভবৎ সকলকে চঞ্চল করিয়া তুলিল!

চম্পক গাহিয়া চলিল—

এ থির যৌবন
চির তিয়াষ,
এ অঁধ-আবেগ
আকুলোছাস,
এ অপূর' শত
সাধ হিয়ায়—

শুধু তুহঁ লাগি
লুটিছে হায়!
সরস অধরে
ঝরিছে মধু—
আলিঙ্গ' চাহিছে
পরাণ-বঁধু!
—সুখ সে ক্ষণিক,
—ছোড়ে কে তায়?
জনম—স্বপন,
—মোহ না যায়!
শুধু রহে স্মৃতি,
সবি ফুরায়!—
এ যৌবন, পিয়,
যাবে বৃথায়?

চম্পকের সে অনবেদ্য যৌবনশ্রী, সরস অঙ্গ-লতা, মদির সুরঝঙ্কার এবং ঈষদ্ভিন্ন ফুল্লাধর—মূর্ত্তিমতী কামনার ন্যায় উতঙ্করকে আকুল করিল। মোহমুগ্ধ উতঙ্কর সিংহাসন ছাড়িয়া উঠিলেন—

'—বহুৎ খুব! বিবিজান, কি ইনাম চাও?'

'ইনাম চাহি, মহারাজ! কিন্তু, গোপনে। সকলের কাছে সে কথা বলিতে সাহস হয় না। অভয় দিলে একা মহারাজকে নিবেদন করিতে পারি।'

উতঙ্করের আদেশে সভা নির্জ্জন হইল; তখন চম্পক সিংহাসনের পাদনিম্নে আসিয়া জানু পাতিয়া বসিয়া বলিল—

'মহারাজ! আপনি বিচারক। আমি বিচার প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি। আমার অভিযোগ আছে।'

'কি অভিযোগ?'

'মহারাজ! দেহ অপেক্ষা জীবন মূল্যবান, আবার জীবন অপেক্ষাও মান শ্রেষ্ঠ। মানীর সেই মান যদি কেহ স্বেচ্ছায় কলঙ্কিত করে—তাহার কি শাস্তি?'

'অপরাধের গুরুত্ব বুঝিয়া পাত্রবিশেষে প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত।'

'যে রাজার শত্রু, দেশের শত্রু, তাহার কি শাস্তি?'

'প্রাণদণ্ড!'

'মহারাজ! আমি বিচার চাই!—হর্ষের সম্বন্ধে আপনি কি ব্যবস্থা করিয়াছেন?'

উতঙ্করের ভ্রূ কুঞ্চিত হইল। সামান্ত নর্ত্তকীর ধৃষ্টতা ত কম নহে! উতঙ্কর নীরব রহিলেন।

চম্পক তখন মুখ তুলিয়া চাহিল। সে বিলোল নয়নের মদির দৃষ্টি উতঙ্করের প্রাণে তাড়িৎসঞ্চার করিল। চম্পক বলিল—

"মহারাজ! হর্ষ আপনার শত্রু, দেশের শত্রু;—সে আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় মানকে কলঙ্কিত করিয়াছে! মহারাজ, আমি তার প্রাণদণ্ড প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি!—আমি দানবী, প্রতিহিংসা পূরণ করিতে আসিয়াছি। স্বহস্তে তাহাকে বধ করিতে চাই!'

উতঙ্কর শিহরিয়া উঠিলেন।—এই সম্ভোগময়ী বিলাসিনী মূর্ত্তির অভ্যন্তরে এমন বজ্রকঠোরতা?—প্রতিহিংসার এমন তীব্র মত্ততা! উতঙ্কর একবার নিজের কথা ভাবিলেন—তাঁহারও চিত্ত কি এমনই লেলিহ শিখাময়?—হয় ত তাই!—আপনার গোপন অন্তরের সে পাপচ্ছবি দেখিয়া উতঙ্করের বক্ষ একবার ভয়ে কম্পিত হইয়া উঠিল। কিন্তু সে একবার মাত্র!

উতঙ্কর বলিলেন—'রমণী, কল্য হর্ষের বধাজ্ঞা দিয়াছি। ইচ্ছা কর, অনুজ্ঞাপত্র দিতেছি, তোমার আদেশ মতই বধকার্য্য হইবে।'

নিবিড় আনন্দোচ্ছাসে রমণীর গোলাপী কপোলদেশ অরুণতর হইয়া উঠিল,—তাহার সে বিশাল কৃষ্ণ-নয়ন দুটি উতঙ্করের প্রতি ন্যস্ত করিয়া সে বলিল—'মহারাজ! এই ত তোমার যোগ্য বিচার!—ধন্য তুমি!'

আত্মবিস্মৃত উতঙ্কর সিংহাসন হইতে নামিয়া সহসা চম্পকের সে চম্পক-গৌর করপল্লব ধারণ করিলেন; তার-পর তাহার সে যৌবনারুণ অধরপুটে চাহিয়া চাহিয়া সহসা বলিয়া উঠিলেন—'হাঁ, রমণী, সত্যই আমি ধন্য!'

চম্পকের নয়নদ্বয় চকিতে একবার প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল; কিন্তু সে ক্ষণকালের জন্য। সম্ভ্রমের সহিত আপন হস্ত উতঙ্করের হস্ত হইতে বিচ্যুত করিয়া লিখিত রাজাদেশপত্র গ্রহণ করিয়া নতমস্তকে ধীরে ধীরে সে সভা গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল!

(৭)

শুভ্রপট্টবাসা উতঙ্কর প্রত্যূষে অভিষেকাসনে বসিয়াছেন। চতুষ্পার্শ্বে তীর্থ-সলিল পরিপূর্ণ সারি সারি সুবর্ণ কলস। একপার্শ্বে নিমন্ত্রিত দেশবিদেশস্থ ব্রাহ্মণ এবং অধ্যাপক-মণ্ডলী। বিশাল অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে প্রশান্তমূর্ত্তি ঋত্বিক কুলপুরোহিত গম্ভীরোদাত্তস্বরে মন্ত্রের পর মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যাইতেছেন।

উৎসব উপলক্ষে উতঙ্কর আয়োজনের ত্রুটি করেন নাই। কতক স্বেচ্ছায় কতক বা অনিচ্ছায় পুরবাসিগণ সে উৎসবে অংশতঃ বা পূর্ণভাবে যোগও দিয়াছিল। ভবিষ্যতে পীড়নের ভয়ে সামন্তরাজন্যবর্গও আসিয়াছিলেন —কিন্তু সকলেই হর্ষের কথা ভাবিতেছিলেন, হর্ষকে কারামুক্ত করিয়া সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার ষড়যন্ত্র যে চলে নাই তাহা নহে, কিন্তু তাহার কোন সুবিধাই ছিল না। তত্রাচ নিরুপায় রাজগণ অন্তিম মুহূর্ত্তেও সে আশা পরিত্যাগ করেন নাই। হর্ষের মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞার কথা পুরবাসিগণের নিকটে গোপন ছিল।

অভিষেক ক্রিয়া শেষ হয় হয়,—রাজ-পুরোহিত উতঙ্করের মস্তকে শান্তি-সলিল সেচন করিবেন—এমন সময় বহির্দ্বারে একটা ভীষণ গোলযোগ উঠিল। সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন; স্বয়ং উতঙ্করও আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন। এমন সময় ঝঞ্ঝার ন্যায় বেগে রাজদূত সভার মধ্যে ছুটিয়া আসিল:—

'মহারাজ! সর্ব্বনাশ হইয়াছে! সেই রমণী চম্পক নহে,—যুবরাজের প্রেমভিখারিণী সেই সুগোলা। সে আপন লোক নিযুক্ত করিয়া রক্ষীদের হাত হইতে যুবরাজ হর্ষকে ছিনাইয়া লইয়া নাগরিকগণকে বিদ্রোহে উত্তেজিত করিতেছে; হয় ত এতক্ষণ যুবরাজকে লইয়া প্রাসাদাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে।—মহারাজ——'

'জয় মহারাজ হর্ষদেবকী জয়!'

বজ্রধ্বনির ন্যায় সে ধ্বনি সভাস্থল কম্পিত করিয়া তুলিল।—পলকমধ্যে উন্মত্ত জনস্রোত বন্যাস্রোতের ন্যায় সভার মধ্যে আসিয়া পড়িল! —তখন আর পশ্চাৎপদ হইবার উপায় ছিল না। নিরুপায় উতঙ্কর তখন হর্ষের পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িলেন!

হর্ষ—চির-স্নেহ-প্লুত মলিনশ্রী হর্ষ—সাগ্রহে উত্তঙ্করকে কোল দিলেন। বলিলেন—'ভাই, আমি ত রাজ্য চাহি না। এ রাজ্য তোমার, তুমি ইহার স্বামী—আমি মাঝ হ'তে কে ভাই? তোমার রাজ্য আছে; আমার বনপ্রান্ত আছে—কুটীর আছে,—আমি আর কিছু চাহি না।—তুমিই যে ভাই যথার্থ রাজা, আমি কেবল তোমার ললাটে রাজটীকা পরাইতে এসেছি!'

জনমণ্ডলী স্তব্ধ,—বিস্মিত—নির্ব্বাক! সে মহত্ত্বের চরণপ্রান্তে উত্তঙ্করের গর্ব্বিত শির আপনা হইতে নত হইয়া আসিল। উত্তঙ্কর বলিলেন,—ভাই, তুমি এত মহৎ আমি আগে তা জানিতাম না। তুমি দেবতা, আমায় আজ উদ্ধার করিলে। আমার স্বার্থের গণ্ডী হইতে আমায় মুক্ত করিয়া প্রকৃত মহত্ত্বের পথ দেখাইলে! তুমি গুরু, আমি শিষ্য। এ রাজ্য তোমারই। তুমি যুবরাজ, তুমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা;—আমায় ক্ষমা কর, আমার পাপের ভার বৃদ্ধি করিয়ো না। এ অভিষেকোনুষ্ঠান—তোমারই জন্য; আমার জন্য নহে!"

সুগোলার কাজ শেষ হইয়া আসিয়া ছিল। অনন্ত স্ফুলিঙ্গস্পর্শে তাহার অন্তরের মলিনতা ভষ্ম হইয়া পবিত্র গৈরিকে রূপান্তরিত হইতে-ছিল, এবং তাহাই তাহার অন্তরখানিকে অনুদিন পুণ্যানুলিপ্ত করিয়া তুলিতেছিল।

অত্যধিক মানসিক উদ্বেগ ... অসুস্থ হইয়া একদিন ... বুঝিয়া পাত্রবিশেষে ... করিল। হর্ষ তাহার সে উ... বিস্তৃত হন নাই; কিন্তু কোন শুশ্রূষায় কোন ফল হইল না; জন্মান্তের তীর হইতে তাহার আহ্বান আসিয়াছিল! অন্তিমমুহূর্ত্তে হর্ষের প্রতি চাহিয়া সে বলিল,—'জন্মান্তরের পুণ্যবলে তোমার দর্শন পেয়েছিলাম। তুমি দেবতা,—অভাগিনীকে সেবার ভার দিয়েছিলে। তবু কলঙ্কিনী আমি, জীবনে কতটুকু কাজই বা করিতে পারিলাম!—শুধু তোমার পুণ্যচরিত্রে কলঙ্ক রটনায় কারণ হয়েছি। কিন্তু, যুবরাজ, সেবায় কি পাপ স্পর্শে? তাই যদি, তবে মহাবিশ্বের অনন্তকালের পাপ, অনন্ত কলঙ্কের অনুশোচনা যাঁহার চরণপ্রান্তে চিরদিন লুটাইতেছে—সে ভগবান যে মহাপাপের আধার! তাঁহার ত তবে পাপের সীমা নাই!—আশীর্ব্বাদ কর, জন্মান্তরে আবার যেন তোমার মত দেবতার দর্শন পাই। তাঁহারই চরণপ্রান্তে বসিয়া আপন স্বার্থ ভুলিয়া প্রাণ ভরিয়া পরার্থে যেন এ জীবন উৎসর্গ করিতে পাই!"

---

* রাজতরঙ্গিনীর গল্প হইতে বঙ্গদর্শনের জন্য লিখিত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেনের আখ্যায়িকার ... অবলম্বনে। বং সঃ।

শয্যা-সভার বক্তৃতা।*

...বোসেদের ছোট বৌ ...ল ... ঝুটোপুটি ঝগড়া ...াধিয়ে ...—তাতে কি হয়েছে? ওমা বলো কি গো? এই সেদিন বিয়ে হলো, আর আজই এই! এমন বেহায়াপনা ত বাপের কালেও শুনিনি! আমরা—কি বল্লে? ও কথা মুখে এনো না; এখনও চন্দর সুয্যি উঠ্ছে! খোকা হওয়ার আগে একদিনও কি আমি শাশুড়ির দিকে মুখ তুলে চেয়েছি? কি বল্লে, সে আর ক'দিন? বটে! বিয়ের পর দুবছর সময়টা বুঝি বড় কম হলো? কেন? দু বছরের মধ্যে কি আমি শ্বশুর ঘর করিনি?—সে নামমাত্র? দুবারে যে প্রায় পঁচিশ দিন বাস করে গেছি! সেটা বুঝি ধর্ত্তিব্যির মধ্যে নয়! তা কেউকি তখন আমারি মুখের রা শুনেছে? কি বলছিলে? বলত আর একবার শুনি,—আমার জন্যেই তোমার মা কাশীবাসী হয়েচেন? ওগো কি হবে গো, এমন জল-জেয়ন্ত মিছে কথা ...মুখে একটু আটক খেলেনা! বোলোনা ...না, ... সবে না! নাতি পুতির মুখ দেখে ...হয়েছেন, হিঁদুর বিধবার এ ত ... বড় যে হাস্চো! আবার ... ঠাকুরঝির কথা? বল! মুখ ...! কালে কালে আরও কত শুনতে ... আমার আলার বিধবা বোন্টী তোমার শ্বশুর বাড়ী বাস করচে? আহা, কি কথাই বল্লেন আর কি? নিজের বোনের দোষ আর কে ছাখে বল? আমি বেটি, পরের মেয়ে, যত দোষ নন্দ ঘোষ! বোনটি যে তোমার ভিজে বেড়াল, ঘর ভাঙাবার একখানি, তা বুঝি আর জাননা! রাত্রি দিনই থাক্তেন আমার পিছু লেগে! কেনরে বাপু আমি পরের কথা শুনতে যাব কেন? আমার ত আর কপাল পোড়ে নি—কেন চুপ করব কেন? কিসের ভয়, কারু খাই না পরি? ওরে বাপ্রে,—বোনের নিন্দে গা'য়ে আর সইল না! সে যেন নিজে ঝগড়া করে, আর দোষ হলো আমার! হায়রে, কলিকাল! "হুঁ" তাত এখন বলবেই,—আমি আর যত্ন করেছি, কি না তা আমিই জানি, আর জানেন, যিনি দিন রাত্তির করচেন, সেই বিধেতা পুরুষ! কেন তুমি কি জাননা, তোমাদের বাজারের খাবার খাইয়েছি, বাজারের লুঁচি খাইনে বলে, আমি গোটাকত ফল মুল ও রাবড়ি সন্দেশ খেয়ে এক রকম উপুস করে রাত্তির কাটিয়েছি, তবু একাদশীর দিন রাত্রে ঠাকুরঝিকে কিছুতে আগুনের তাতে রাঁধতে দিই নেই। বরাবরই সকালে উঠলেই আমার মাথা ধরে সারাদিন কষ্ট পাই, তবু দ্বাদশীর দিনে, আটটা বাজার পরে পরেই উঠে, ন'টা বাজতে না বাজতে ঠাকুরঝির

* ... পশ্চিমে থাকায় এতদিন আর বাংলা দেশের শয্যাসভার বক্তৃতার রিপোর্ট দিতে ...

জলখাবারের পয়সা বের করে দিয়েছি। তোমার এই টানাটানির সংসার; ছেলে মেয়েদের জন্তে চারটার জায়গায় পাঁচটা ঝি রাখা আর তোমার কুষ্ঠিতে ছোঁলো না। তা আমি এই টানাটানির মধ্যেও ঠাকুরঝির জল-খাবারের জন্তে দশমী দ্বাদশীতে চার পয়সা,—বল্লে না পিত্তয় যাবে—কোন দিন বা পাঁচ পয়সা পর্য্যন্ত দিয়েছি! বলি, আহা ছেলেমানুষ! কিন্তু স্বভাব না যায়—অমনি বুঝি ঘুম এলো! আমার কথা শুনতে হলেই চোখ্ বুজে আসে? কি! আবার-ঠাট্টা?—[illegible] মত মিষ্টি?—শুনলে [illegible] হয়?—এতটা? বটে, [illegible] আর তোমার [illegible] ও আমার পোড়ার [illegible] "বকে বকে হবি [illegible] বেশ শ্রী[illegible]কে,"—[illegible] রাত্তির! আচ্ছা, আমার এমন [illegible]?—দেখা যাবে, দেখা যাবে—"

শ্রীরিপোর্টার।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

সয়রুল মোতাক্ষরীণ,—"স্বর্গীয় গৌর সুন্দর মৈত্রেয় মহাশয় কর্ত্তৃক মূল পারস্ত হইতে বঙ্গভাষায় অনুবাদিত।"

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্রেয় মহাশয় আপাতত উহার এক ফর্ম্মা মুদ্রিত করিয়া "নমুনা" স্বরূপ প্রচার করিয়াছেন।

বঙ্গ-সাহিত্য-সম্রাট স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর 'চন্দ্রশেখরের' ভূমিকায় সয়রুল মোতাক্ষরীণের উল্লেখ করিয়াছেন। নির্ভর যোগ্য অনেক ঐতিহাসিক বিবরণ মোতাক্ষরীণে পাওয়া যায় বলিয়া তিনি ইহার ইংরাজি অনুবাদের পুনর্মুদ্রণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছিলেন। কারণ, উহার ইংরাজি অনুবাদ গ্রন্থখানিও দুষ্প্রাপ্য। প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বঙ্কিমবাবুর উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া সেই অনুবাদ গ্রন্থ পুনঃপ্রচারের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; ইহার বাংলা অনুবাদের কল্পনাও তাঁহার ছিল, কিন্তু নানা কারণে তাঁহার সে চেষ্টা সফল হয় নাই; এক্ষণে মূল পারস্ত ভাষা হইতে সয়রুল মোতাক্ষরীণের বাংলা অনুবাদ সম্পূর্ণ হইয়াছে ও তাহা মুদ্রিত হইতেছে জানিয়া আমরা বিশেষ আহ্লাদিত হইয়াছি। শুনিয়াছি বঙ্কিমবাবু যখন বহরমপুরে ছিলেন, তখন অনুবাদক মহাশয় [illegible] এ সংকল্পের কথা জানাইয়া বঙ্কিমবাবু[illegible] উৎসা[illegible]ন। এ[illegible] মহাশয়[illegible] সেই সংকল্প কার্য্যে পরিণত [illegible], সুখের কথা বটে, তবে দুঃখের কথা, [illegible] জীবিত নাই।

যে ফর্ম্মা [illegible] হইয়াছে [illegible] প্রথম খণ্ডের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় [illegible]